বনস্পতির বৈঠক

[অখণ্ড সংস্করণ]

প্রবোধকুমার সান্যাল

সাহিত্য সংস্থা
১৪এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
রণধীর পাল
১৪এ টেমার লেন
কলিকাতা-৯

নতুন সংস্করণ
জানুয়ারী—১৯৬০

প্রচ্ছদ ঃ
প্রবীর সেন

মুদ্রাকর
বিশ্বনাথ ঘোষ
নিউ জয়গুরু প্রিণ্টার্স
৩৩ডি মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৯

অতনু ও শান্তনুকে

বনস্পতির বৈঠক

বনস্পতির বৈঠক

বনস্পতির বৈঠক

॥ ১ ॥

ভারত সম্রাজ্ঞী কুইন্ ভিকটোরিয়া মারা গেছেন কিছুকাল আগে। তাঁর ছেলে সপ্তম এডোয়ার্ড এখন সম্রাট। লোকটার নাকি একমাথা টাক এবং স্ফূর্তিবাজ বিলাসী বাবু। নারীপরিবৃত শৌখীন 'সুগন্ধী' পুরুষ।

তাঁরই ছেলে প্রিন্স অফ ওয়েলস্ আসছেন ভারতের রাজধানী কলকাতায়। চারিদিকে সাজ সাজ রব। যাঁরা দেশীয় খয়ের খাঁ, তাঁদের মধ্যে আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারই লাগি কাড়াকাড়ি চলেছে।

১৯০৫, ৭ জুলাই।

অভ্যর্থনা সমিতির সভা বসছে টাউন হলে। আসছেন নবাব, আসছেন রাজা-মহারাজারা। আর আসছেন স্থানীয় নেতৃবৃন্দ—স্যার যতীন্দ্রমোহন ও প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, রাজা শ্রীনাথ ও সীতানাথ রায়, রাজা পিয়ারী মোহন মুখার্জি, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাধাচরণ পাল। আরও অনেকে—যাঁরা মোটা ডোনেশন্ দেবেন। ও'রা আসবেন ল্যাণ্ডো বা ফীটনে। কলকাতার পথে তখন মোটর গাড়ি চলে না। মাঝে মাঝে ট্রামলাইন পাতা হচ্ছিল স্কোয়ারে রাস্তাগুলোয়। পীচের রাস্তা তখনও হয়নি।

প্রসিদ্ধ কবি ফটিকচাঁদ দত্ত 'বেঙ্গলীতে' ইংরেজি এক কবিতায় কলকাতার বর্ষার বর্ণনায় বলেছেন, পথ ঘাট প্রতি বছরের মতো এবারেও দুস্তর। ঠনঠনে

কালিতলায় কোমর অবধি জল। আমহার্স্ট স্ট্রীটে ডুবজল। বহুবাজার বেলেঘাটা অদৃশ্য। তেমনি জঞ্জাল, তেমনি মানুষের দুর্দশা। কিন্তু আর কতদিন ?

৭ই জুলাই মানে আষাঢ়ের চতুর্থ সপ্তাহ। সারাদিন ঝুপঝুপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ অন্ধকার, ঘন মেঘলা। খোয়া বাঁধানো রাস্তার জলকাদা আর খানাখোন্দল মাড়িয়ে ছ্যাকরা গাড়িরা লোহার চাকা মড়মড়িয়ে 'ফিমেলদের' নিয়ে আগাগোনা করছিল। 'ফিমেল্' মানে ভদ্রসমাজের মেয়েছেলে, যারা রাস্তায় কখনও হাঁটে না। যারা হাঁটে তারা বর্ষীয়সী ঝি, রাঁধুনি, মেছুনি, রেজানি, গঙ্গাস্নানের বিধবা বুড়ি বা তিলকচন্দনপরা বার-বণিতা।

আর্সন্ কোম্পানি সেদিন বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, স্কচ হুইস্কি এক পাঁট পাঁচ সিকে। খুচরো পেগ চার আনা। ভিক্‌টোরিয়া মার্কা বড় গিনির মুদ্রা পনেরো টাকা দু' আনা। স্টার থিয়েটারে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নারায়ণী'—ম্যানেজার অমৃতলাল বসু। মোমবাতির ঝাড়ের আলোয় প্লে। স্টানলি বোস আর লুইসের দোকানে অস্ট্রেলিয়ান্ আপেল পঁচিশটে তিন টাকায়। দশ সের বালির পটোল এক টাকা। বড় মুরগির ডিম সাড়ে চার আনা কুড়ি। তাজা কাটা রুই মাছ পাঁচ আনা সের। খাসি-মটন্ পাঁচ আনা। ওসব খাবে সাহেব সুবোরা —যারা থাকে 'ইংরেজ টোলার' ওদিকে। নতুন বাজারে ওদের দাম অনেক কম।

রাত্রে মিটমিটে গ্যাসের আলোয় মাতালরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায় বেশ্যার সন্ধানে। গৃহস্থপল্লীতে ঢুকে ওরা চেঁচামেচি করলেই দরজা-জানলা সব বন্ধ হয়ে যেত। গলিঘুঁজিতে সর্বত্র ঘোড়ার গাড়ির আস্তাবল, গরুর গোয়াল, শ্যাওলাধরা ডোবা, চারদিকে খোলা-খাপরার বস্তি। পুঁটিবাগান, চাল্‌তাবাগান, গোয়াবাগান, নেবুবাগান, সিঙ্গিবাগান, রামবাগান, হাতিবাগান—সব বস্তিতে ভরা। বাগমারি বা পায়রাটুনির ওদিকে দিনের বেলাতেও কেউ যায় না।

৭ই জুলাই, শুক্রবার। জাপানের কাছে রাশিয়া পরাজিত হবার পর থেকে সেই দেশে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে। চীন নাকি তখনও ইংরেজদের হাতে আফিং আর চণ্ডু খেয়ে ঝিমোচ্ছে। চন্দননগরে ফরাসী মদ খেতে যায় কলকাতার ধনী বাবুরা।

আজ শিয়ালদা থেকে হ্যারিসন রোড দিয়ে স্ট্র্যান্ড রোড ধ'রে প্রথম ট্রাম

চললে হাইকোর্ট পর্যন্ত। ওই দৃশ্যটি দেখার জন্য পটলডাঙ্গা আর শিয়ালদার মোড়ে ওই বর্ষার দুর্যোগেও ভিড় জমে গেছে। মসজিদ বাড়ি স্ট্রীটের এক দোকান থেকে বিক্রি হচ্ছে বায়স্কোপের ছবি নির্মাণের সাজসরঞ্জাম। ওখানে নাকি তার জন্য কাঁচা ফিলম পাওয়া যায়। আজ জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইনস্টিট্যুশনে—পরে যার নাম হয়েছিল স্কটিশচার্চ কলেজ—সেখানে বঙ্গসাহিত্য সভার একটি অধিবেশন বসছে। সভাপতি প্রফেসর ম্যাকিন্‌টস। লর্ড কিচেনার এখন ভারতের প্রধান সেনাপতি। লর্ড কার্জন বড়লাট। রাজধানী কলকাতা ওঁদের প্রধান কর্মকেন্দ্র। অ্যাডভোকেট দাশরথি সান্যাল হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিস করছেন। কবিরাজ কেদারনাথ কবিতীর্থ আজ এক সাহিত্যসভায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করবেন ঃ 'জাতীয় জীবনগঠনে সাহিত্যের ব্যবহার। ইংল্যাণ্ডে ভারতের প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানি হচ্ছে।

হঠাৎ বর্ষণমুখর কলকাতার জনজীবনে আগুন লাগল আজ ৭ জুলাই, ১৯০৫। ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড বালফোর ভারতসচিবের মুখ দিয়ে ঘোষণা করলেন বেঙ্গল পার্টিশন্‌! বললেন, এটি ফাইনালি সেট্‌লড্‌!

টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ছিল সারাক্ষণ।

রিপনের ইংরেজির অধ্যাপক এবং বেঙ্গলীর সম্পাদক সুরেন বাঁড়ুয্যে তাঁর কাগজে চিৎকার করেছেন আজ,—এ অন্যায়, এ অবিচার, এ স্বৈরাচার। সমগ্র দেশ শোকসন্তপ্ত। রাজভক্ত ভারত মর্মাহত।

টেলিগ্রামটি এসেছিল এলাহাবাদ থেকে। রিপন কলেজের অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সেটি দেখে আঁৎকিয়ে উঠেছিলেন—বাঙ্গালী জাতির চরম সর্বনাশ। সুরেন বাঁড়ুজ্যেকে ডেকে তিনি বললেন, ৭ জুলাই, ১৯০৫—এই তারিখটি বৃটিশ সাম্রাজ্যের কলঙ্ক দিবস।

পথে-পথে বেরিয়ে পড়ল হাজার-হাজার পুরুষ। ইস্কুল-কলেজ সব বন্ধ। শুধু চারিদিকে পুরুষ,—হাটে, বাজারে, দোকানে পথে-ঘাটে শুধু পুরুষের জটলা। পটলডাঙ্গা, চাঁপাতলা, ছানাপটি, জলের কলের মাঠ, কোম্পানি-বাগান, গ্যাঁড়াতলা, চাষাধোবাপাড়া, চোরবাগান, পোস্তা, পগেয়াপট্টি, রায়বাগান, বারশিমলে,—সর্বত্র পুরুষের গাঁদি লেগেছে। মেয়েরা রান্নাবান্নার ফাঁকে খড়খড়ির ভিতর দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে, পুরুষ-জগতে কি নিয়ে যেন একটা গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে! ওরা ঘুষি পাকিয়ে জেলে যাবার কথা বলছে!

ঠিক সেই তারিখটিতে জাতিয়তাবাদী তরুণ বাঙ্গালী সশস্ত্র বিপ্লববাদের

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিল সুরেন ঠাকুরের বাড়িতে। গোপন নেতৃত্ব নিলেন প্রমথ মিত্র, চিত্তরঞ্জন দাশ, অরবিন্দ ঘোষ, ভূপেন দত্ত, নিবেদিতা, বারীন ঘোষ—আরও কে কে যেন। এবার থেকে আর আপোস নয়। তরবারির আঘাতে বাঙ্গালী জাতিকে যারা দ্বিখণ্ডিত করল, তাদেরকে শাস্তি দিতে হবে!

খুটুর-খুটুর ক'রে একখানা লালরঙের থার্ডক্লাস ছ্যাকরাগাড়ি সেই দুর্যোগের ভিতর দিয়ে আসছিল বহুদূর হাইকোর্টের পাড়ার ওদিক থেকে। পথ যেন আর ফুরোতেই চায় না। জলে কাদায় খোয়ায়—দুর্গম পথঘাট। ট্রামরাস্তা পেরিয়ে হেদুয়ার পূর্বদিকে জেনারেল অ্যাসেম্বলি কলেজ। তারপর বীডন স্ট্রীট পেরিয়ে গোয়াবাগানের পথ। সেই পথে ঢুকে বাঁহাতি সাধুখাঁদের তেলের কল আর ঘিয়ের দোকান। ওটা ছাড়ালে ডানহাতি ঘুরে গেল গোয়াবাগান আর ডালিমতলার গলি—যেদিকে দীনু ধোবা আর গয়লাপাড়ার বস্তি।

কিন্তু ছ্যাকরাগাড়িখানা সাধুখাঁদের যদি ছাড়িয়ে রাধানাথ বোসের গলির মোড়েই রাশ টেনে থামল। রুগ্ন দুটো টাট্টুঘোড়া, হাড় আর পাঁজরা সার। ছুটতে পাবে না বেশি, তাই চাবুক খেয়ে মরে। হাইকোর্টের ওদিক থেকে এ পর্যন্ত পৌঁছতে লাগে ছ'আনা, বর্ষা-বাদলে আট আনা। সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ি—একটু বেশি। ভাড়াটে ফীটন্ ইংরেজটোলায় ঘোরে, এদিকে আসতে চায় না।

সরুগলির মধ্যে ঢুকলে ঘোড়ার গাড়ির পক্ষে ঘুরিয়ে বেরিয়ে আসা কঠিন। সুতরাং ওখানেই সওয়ারি নামল। চার নম্বর বাড়ি এই ত দু পা গেলেই ডান হাতি। গোপাল সুরের নতুন দোতলা বাড়ি। নিচে-ওপর চার পাঁচখানা ঘব, ছাদ, উঠোন, কলতলা, পায়খানা, রান্না-ভাঁড়ারের ঘর। ভাড়া অনেক—বাইশ টাকা। আজকাল সব দিকেই দর বেড়েছে। কলুটোলার বাড়ি এর চেয়ে বরং ভালই ছিল। দু'দুটো গরু রাখার গোয়াল ঘর ছিল সেখানে। ভাড়া নিত কুড়ি টাকা।

যিনি নামলেন তিনি সৌম্যদর্শন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। গৌরবর্ণ, দীর্ঘাঙ্গ এবং স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ। সায়াহ্নকালেও দেখা যাচ্ছিল তাঁর মুখে সামান্য ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি—তার রং উজ্জ্বল তাম্রাভ। ভাড়া চুকিয়ে একটি ছোট হ্যাণ্ডব্যাগ নিয়ে তিনি হনহনিয়ে গলিতে ঢুকলেন।

টাকা দিয়ে তিনি কিছু ফেরৎ নিলেন না দেখে পিছনে দিকে মুসলমান গাড়োয়ান চেয়ে রইল। ভদ্রলোকের পরনে কোঁচানো কালাপাড় ফরাসডাঙ্গার

ধুতি, গায়ে মট্‌কার চুড়িদার পানজাবি, পায়ে চকচকে কালো পামসু। পা দুখানা ধবধব করছে। তার সঙ্গে স্বাস্থ্য আর পৌরুষের প্রদীপ্ত বলশালীতা। নাম—রাজেন্দ্রনাথ সান্যাল। বয়স চল্লিশ ছাড়িয়েছে।

হাঁ, বড়া আদ্‌মি—বুড়ো দাড়িওলা·গাড়োয়ান হঠাৎ ঘোড়াদুটোর গা ঠুকে আদর জানিয়ে বলল, তিনোকো পেট ভর দিয়া— !

বাড়ি ঢুকে ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি দোতলায় উঠে গেলেন। সোজা গেলেন কোণের ঘরটিতে। সেখানে মেঝের বিছানায় শুয়ে আছেন অসুস্থ স্ত্রী। পাশে বসে গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সেই বাগ্‌দিদের মেয়েটা। কাঁচপোকার টিপপরা, হাসিখুশী, শ্যামবর্ণা—নাম রানিদাই।

রাশভারি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। ছয় ফুট লম্বা। বুকের ছাতি দেখলে গা যেন ছম ছম করে। ভয়-তরাসে ছেলেমেয়েরা বাপের আসবার খবর পেলেই আড়ালে গা ঢাকা দেয়! উনি আধুনিক তাই 'শাদা' কেরোসিন তেলের আলো জ্বালেন। বাড়িতে দশ-বারোটা হ্যারিকেন ল্যাম্প। রেড়ির তেলের আলো বা মোমবাতি ওঁর পছন্দ নয়। বাড়িতে রাঁধুনি বামুন ঠাকরুণ, চাকর যোগেন, রাত-দিনের ঝি ন্যাড়াবউ—সবাই তটস্থ ওঁর উপস্থিতির কালে। উনি নিচের তলায় বৈঠকখানায় গেলে সবাই খুশী। সেখানে পান-তামাক ও তাস-পাশার আসর। অন্য একটি নিজস্ব ঘরে মস্ত লাইব্রেরী। চারিদিকে ঠাসা বই। ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত পুঁথি, বিভিন্ন সাময়িক পত্র—হিতবাদী, বঙ্গবাসী, বেঙ্গলী, বঙ্গদর্শন, বহু পুরনো সমাচার দর্পণ, দেশ-বিদেশের নানা গ্রন্থাদি,—আগাগোড়া শুধু বই। মাঝখানে সরু একখানা তক্তার ওপর গাল্‌চে পাতা ফরাস। পাশে রুপো বাঁধানো মস্ত নলের সঙ্গে মোগলাই গড়গড়া।

সকালে বেরোবার আগে উনি জেনে গিয়েছিলেন স্ত্রীর অল্প-অল্প ব্যথা উঠেছে। তাঁর চলাফেরা ও কাজকর্মের প্রতি অনিচ্ছা তিনি দেখেই গেছেন।

রাত্রের দিকে বৃষ্টি বেড়ে উঠলো। কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী। বাচ্চারা খেয়ে দেয়ে বিছানায় উঠেছে। একজন গৃহশিক্ষক প্রথম তিনটি ছেলে-মেয়েকে সকালের দিকে পড়িয়ে যায়। তিনি গ্রাজুয়েট, তাই দশটাকা মাসিক পারিশ্রমিক পান। ছোট দুটি ছেলে ইংরেজি হাই-স্কুলে পড়ে। তারা নাবালক।

প্রবল ঝড়.. বৃষ্টি আবার যেন নতুন করে এল। তার সঙ্গে ছুটছে আকাশ চিরে বিদ্যুদ্দাম, তারই সঙ্গে একটির পর একটি বজ্র গর্জন। এ বছরের এই যেন প্রথম সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক দুর্যোগ। এখনই জল জমছে গোয়াবাগানে আর

ডালিমতলায়, এখনই হাঁটুজল জমবে হেদুয়ার পূর্বদিকে আর এই গলিতে। এ কি ভয়াবহ বর্ষা! এ যেন জন্মাষ্টমীর বৃষ্টিকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

ভদ্রলোক জানলার বাইরে অন্ধকার কলকাতার দিকে তাকালেন। সেই আধমরা কলকাতা আজ জনবিদ্রোহ ঘোষণায় উত্তাল, জাতীয়তাবাদের মহাসংগ্রাম আজ থেকে শুরু। ঝড়ের তাড়নায়, বজ্রের হুংকারে, ঝলসিত বিজলীর তলোয়ারের আস্ফালনে, আকাশভাঙা বর্ষার বন্যাপ্লাবনে—এ যেন কোনও এক অতিকায় দানব সৃষ্টিলোকের ঝুঁটি ধ'রে নাড়া দিয়ে সর্বগ্রাস করতে আসছে!

দেওয়ালের বড় ঘড়িতে টং ক'রে বাজল রাত সাড়ে বারোটা। ঠিক তখনই নবজাত শিশুর উচ্চদীর্ঘ কচিকণ্ঠ শোনা গেল উপর তলায়। রানিদাই ঘরের বাইরে এসে বামুন ঠাকরুণকে চেঁচিয়ে ডেকে বলল, বউগিন্নির একটি ছেলে হয়েছে গো!

এই বলে তৎক্ষণাৎ সে আঁতুড়ঘরে আবার ঢুকল। কিন্তু তার মুখের সুসংবাদটি ভাল করে অনুধাবন করার আগেই আকস্মিক প্রচণ্ড বজ্র গর্জনে বাড়িখানার ভিত যেন কেঁপে উঠল!

ভদ্রলোক অকম্প, অবিচল। বোধ হয় ভাবছিলেন, মাঝে দুটি সন্তান পর পর হয়েই মারা গেছে। এটি তাহ'লে অষ্টম গর্ভের, এবং তৃতীয় পুত্র!

এখন তবে দাঁড়াল মোট ছয়টি সন্তান। বড় মেয়েটি বারোয় পড়ল। বছর দুয়েকের মধ্যে তার বিয়ে দিতে হবে। আর নয়, এবার থেকে হিসেব ক'রে চলা দরকার। বিয়ে করেছেন তিনি একটু বেশি বয়সে,—অর্থাৎ ছাব্বিশ বছরে। সেটা ১৮৮৭ ইংরেজি সাল। সেই কালে তাঁর মামারা গোয়েন্দাদলের মতো গিয়ে গোয়ালিয়রের ওদিক থেকে তাঁকে ধ'রে আনেন কাশীতে। কাশীতেই তাঁর বিয়ে হয়; কাশীতে তাঁর স্ত্রীর জন্ম। নামটি তাই বিশ্বেশ্বরী। সত্যি বলতে কি স্ত্রী তাঁর লক্ষ্মী। বিয়ের পর থেকে তিনি স্থিতিমান হন, নইলে তাঁর যে উচ্ছৃঙ্খল পরিচয় ছিল—না ওকথা থাক, সমবয়সী মামারা বোধ হয় ভালই করেছিল। তিনি মামাদের নাম ধরে ডাকেন, তুই-তুকারি করেন। এখন তিনি ওয়ার্টকিন্সের পার্টনার, মাস-মাস তাঁর প্রায় আড়াইশ' টাকা খরচ। আজকাল দর বেড়েছে সব জিনিসের। খাঁটি দুধ ছ'সের টাকায়। গাওয়া ঘিয়ের দর চোদ্দ আনা। ভাল দাদখানি চাল তিন টাকা মণ হতে চলল। টাকায় মাত্র পাঁচ সের সরষের তেল।

ন'সিকে আড়াই টাকা নৈনিতাল আলুর মণ,—গরীব গৃহস্থরা খাবে কি? এই ত সেদিন উনি একখানা ছোট ফীটন্ গাড়ির অর্ডার দিয়ে এলেন। একটা ভালো ঘোড়াসুদ্ধ গাড়ি-খানার দাম পড়বে সাড়ে তিনশ টাকা। ওদিকে দর্জিপাড়ার জমিটুকুতে একতলা একখানা বাড়ি তুলতে গেলেও হাজার চারেক টাকার কম নয়। আজকাল একটা রাজমিস্ত্রির দিনমজুরি ছয় আনা সাড়ে ছ'আনা।

নবজাত শিশুর চিৎকার শুনছেন তিনি জানলায় দাঁড়িয়ে। গলার আওয়াজ কচি, কিন্তু ওই আওয়াজে যেন প্রবল প্রাণশক্তি! ঝড়বৃষ্টি বজ্রপাত—এবার একটু ক'মে এসেছে। রাত তিনটে।

১৯০৫-এর আশ্বিনে ঝড় নাকি ঐতিহাসিক। বার-শিমলের খোলার চালাঘরগুলো উড়ে গিয়েছিল। ছানাপটির করোগেট টিন ছুটে এসেছিল পটলডাঙ্গায়। দুশ' নৌকোডুবি হয়েছে গঙ্গায়। খানকয়েক ঘোড়ার গাড়ি ছিটকে পড়ে উল্টিয়ে। গয়লাপাড়ার কয়েকটা গরু দড়ি ছিঁড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ল্যাজ তুলে দৌড়য়। হেদুয়ার কয়েকটা দেবদারু গাছ ভেঙ্গে পড়ে ট্রাম-রাস্তায়। চাটুয্যে বাড়ির নতুন বউ নাকি ছাদে উঠেছিল, আশ্বিনে ঝড় তাকে ন্যাংটো করে পরনের শাড়ি উড়িয়ে নিয়ে যায়। সেবারের ঝড় নাকি একটা গল্পকথা।

কিন্তু সেই ঝড় আবার উঠল ওই ভদ্রলোকের পরিবারে কার্তিক মাসের ১১ তারিখে রাত দশটায়!

নিচের তলায় আহারাদি সেরে উনি দোতলায় উঠছিলেন। সিঁড়ির মাঝপথে হঠাৎ জলদগম্ভীর স্বরে উনি একবারটি আর্তনাদ করে উঠলেন, ওরে, ওরে হাওয়া কি নেই কোথাও? হাওয়া—হাওয়া—আ····

ওইটি তাঁর শেষ কণ্ঠস্বর। শোনা যায় উপরের সিঁড়ি পর্যন্ত তিনি পেঁছে-ছিলেন। অতঃপর তিনি ভূতলশায়ী হলেন যেন এক বিশাল শাল্মলী তরু। রোগটার নাম নাকি 'অ্যাপোপ্লেক্সি, ওঠা নাকি সন্ন্যাসরোগ।

অষ্টম গর্ভের ওই সাড়ে তিন মাসের শিশুটা সহসা জননীর কোল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চিৎকার করতে লাগল। সে যেন সমস্তটার প্রতিবাদ করেছে, বিদ্রোহ ঘোষণা করছে বিশ্বব্যাপী সৃষ্টি স্থিতির বিরুদ্ধে। যেন ডাক দিচ্ছে প্রলয় ঝঞ্ঝার আর ভাবী জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার। ডাক দিচ্ছে যেন অন্যায় মৃত্যুর বিরুদ্ধে। তার চিৎকার কিছুতেই থামবে না। শিশু পিতৃহীন হলো।

খবর ছুটল পয়লাপাড়ায়, বাদুড়বাগান আর ভট্টাচার্যি বাগানে। খবর ছুটল গড়পারে। ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস এসে বললেন, অনেকক্ষণ আগে মারা গেছেন!

এলেন শ্বশুরকুলের ভটচার্যিরা, তাঁদের সঙ্গে এলেন মাতুলগোষ্ঠীর ভাদুড়িরা,—শরৎ, গোকুল আর হরিদাস। তাঁদের ছেলেরাও ওই রাত্রে ছুটতে ছুটতে এল। নলিনীমোহন, মোহিনীমোহন, শিবু, রমণী প্রভৃতি। হরিদাসের ছেলেরা আগে এসে পেঁছিল,—তরুণ বালক শিশিরকুমার, তারাকুমার,—না, বিশ্বনাথকে আসতে দেয়নি অত রাত্রে, সে তখন খুব ছোট। সেদিনকার মধ্যরাত্রির দুঃসহ বেদনা ক্ষণে ক্ষণে ফুঁপিয়ে উঠছিল।

শবদেহ কাঁধে তুলছিল তরুণ বয়স্করা। শিশির পরের বছর বুঝি এনট্রান্স পরীক্ষা দেবে। সে ঘন ঘন চোখ মুছছিল। এবার এগিয়ে এসে নাছোড়-বান্দার মতো সে আবদার ধরল; না আমি শুনব না, কিছুতেই শুনব না। আমিও কাঁধ দিয়ে 'বাঙালদাকে' নিয়ে যাব নিমতলায়—।

বাঙাল! হ্যাঁ, আলবৎ বাঙাল! মৈমনসিং, বরিশাল আর ফরিদপুর—অর্থাৎ আচার্য-চৌধুরী, লাহিড়ী আর সাণ্ডেল—এরাই ত ছিল স্টক। বাঙাল না হয়ে যাবে কোথা? তা ছাড়া ভদ্রলোক শৈশব থেকে ছিলেন ভীষণ জেদী ও একগুঁয়ে। দাম্ভিক ও আত্মপ্রত্যয়ী। আত্মাভিমান ছিল প্রবল, তাই অনেক সময়ে ধরাকে সরাজ্ঞান করতেন! অশিক্ষা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে শ্বশুর শাশুড়ি, শ্যালক শ্যালিকা প্রভৃতিকে গ্রাহ্য করতেন না। মামার বাড়ি ছিল শিক্ষিত মহল। সেই দিকে ওঁর ঝোঁক বেশি। ছোট মাতুল হরিদাস ছিলেন ইনজিনিয়র, থাকতেন তিনি বাইরে-বাইরে। তাঁরই জন্য এই ভাগ্নে গিয়ে একদা মেদিনীপুরে মেয়ে পছন্দ করে আসে। পরবর্তীকালে ভাগ্নে হয়ে উঠেছিল ছোট ছোট ভাইদের স্থানীয় অভিভাবক। শিশিরের মা অর্থাৎ ছোট মামী ছিল কুইন্ ভিকটোরিয়ার মতো সুশ্রী ও সুন্দরী।

সে যাই হোক, অতঃপর সকলের চোখ পড়ল ওই চারমাসের কচি শিশুর দিকে। ও শিশু পিতৃহন্তা, যাকে বলে বাপখেগো। দেখছ, কী সাংঘাতিক দুধ টানে? সব যেন নিঃশেষে চুষে নিতে চায়। সাংঘাতিক ক্ষিধে এনেছে সঙ্গে। চেহারাটা একবার দেখেছ? রং ফেটে পড়ছে। ওইটুকু কচি ছেলে, কী স্বাস্থ্য? যেন ঠিক এক বছরের। ওর নাম থাক্ মুলে! মুল কেটে দিয়েছে, তাই মুলে! দেখছ না বাঘের বাচ্চা বাঘ? এক মাথা রাঙা কোঁকড়া

চুল ঝাঁপিয়ে পড়ছে যেন। কালো দুটো চোখে এখন থেকেই নষ্টামি। মরি-বাঁচি বলে রাখলুম, এ ছেলে তোমার ভাল হবে না, বিশু!—বিশ্বেশ্বরীর মেজদিদি মন্তব্য করে গেলেন।

আর একজন কে যেন ব'লে গেল, বাপ গেল অকালে, তার চেয়ে বাচ্চাটা টেঁসে গেলেই পারত। এখন খাবে কি সব? ছ'সের করে দুধ বাঁধা থাকত, এখন থেকে ফ্যান খাইয়ো। একঘর ছেলেপুলে সুদ্ধ সবাইকে পথে বসিয়ে গেল। খরচে-লোক ছিল, এক পয়সা জমায়নি।

একে একে বিদায় নিল লাহিড়িরা, মৈত্ররা, চক্রবর্তী ও ভাদুড়িরা। বলে গেল, আমাদের কর্তব্য আমরা যথাসাধ্য করব বৈকি। সাঁতরাগাছির ওরাও রইল। তবে কিনা এতগুলো নাবালক-নাবালিকার দায়িত্ব·· ওদের মানুষ করে তোলা·· বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশন সবই আছে। মাতামহগুষ্টি ছাড়া কে করবে। এদের আশ্রয় দেওয়া—অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা—

নাবালক দলের জননী শান্ত, স্তব্ধ, অনেকটা যেন আত্মসমাহিত। বয়স আর কত? বছর বত্রিশ। স্বাস্থ্যবতী, পরিশ্রমী ও মৃদুস্বভাব।

এবার মাতামহী এগিয়ে এলেন। প্রবীণা বর্ষীয়সী তিনি। বললেন, ভয় কি, আমি এখনও মরিনি ত! ছোট জামাই আমাকে না হয় মানত না, কিন্তু ও যে আমার ছোট মেয়ে। এক হাঁড়ি ভাত ফোটাব, এক গাল ক'রে সবাই মুখে তুলবে। আমিই ওদের নিয়ে যাচ্ছি। কর্তা আজও বেঁচে। বিশু যে তাঁর আদরের মেয়ে। কিচ্ছু ভয় পাসনে মা। কেউ যার নেই, সেই তিনিই দেখবেন তাকে।

ওই শিশুর অন্নপ্রাশনে রাশ নাম রাখা হয়েছিল, বিভূতি। কেননা ও বোধ হয় শ্মশানের ছাই মেখে উঠেছে। কেউ রাখল, কাশীনাথ—কেউ বা রাখল রাসবিহারী। না, কোনটাই নয়,—ওর নাম থাক্ রাম।

রাম! মন্দ কি! হরধনু ভঙ্গ করবে, তাড়কাকে মারবে, লঙ্কার রাবণ ওর হাতে ধ্বংস হবে। আর ওর বউ কেঁদে কেঁদে মরবে!

শিশুর জননী কাকে যেন একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলেন। তারপর চাপা মৃদুকণ্ঠে ধরাগলায় মাথা নিচু করে বললেন, ওর নাম আমিই রাখব। ও আমার শেষ সান্ত্বনা।

হঠাৎ বজ্রাঘাতে ভেঙে পড়ল একটা সাজানো-গোছানো সংসার। লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল একটি সুখী পরিবারের জীবন ব্যবস্থা। বামুন ঠাকরুণ আর ন্যাড়াবউ

চোখের জল মুছে বিদায় নিল। যোগেন আবার বেরিয়ে পড়ল ভাগ্য অন্বেষণে। ফীটন গাড়ি আর কেনা হল না। দর্জিপাড়ার জমিটুকুতে ঘর-দোর আর উঠবে না।

রাধানাথ বোসের গলির বাড়িখানা যথাসময়ে ছেড়ে দিতে হ'ল।

'হাওয়াগাড়ি' দেখা দিচ্ছে কলকাতায়। ওর সঙ্গে হাওয়া-গাড়িমার্কা সবুজবর্ণ সিগারেটের প্যাকেট। এক প্যাকেট আড়াই পয়সা। ভটচার্যিবাগানে হাওয়া-গাড়ি ঢুকত ছ' মাসে ন' মাসে এক আধখানা। দেখে ভয় পেত সবাই, বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ হয়ে যেত। কি জানি, কলের গাড়ি ত? যদি হঠাৎ ঢুকে পড়ে বাড়ির মধ্যে? বাচ্চারা ভাবত, ওটা বুঝি একটা অতিকায় কোনও জন্তু। রবার টিপে একটা বিকট আওয়াজ তুলে ওটা এগিয়ে আসত। অমনি দে ছুট,—যে যেখানে গিয়ে লুকোতে পারে।

ভটচার্যিবাড়ির বুড়ো উপীনমামা ওর হাওয়াগাড়ির তলায় একদিন চাপা পড়ল। হাওয়াগাড়ি আসছে, উনি ভাবলেন ওঁকেই বুঝি ওটা তাড়া করেছে। সেইজন্য সত্তর বছরের বুড়ো সামনের দিকে ছুটতে আরম্ভ করলেন। তিনিও ছোটেন, পিছনে পিছনে হাওয়াগাড়িও দৌড়য়। বুড়ো মানুষ, ছুটবেন কত? হঠাৎ তিনি শেতলদের বস্তিতে ঢুকে পড়বার জন্য ডান দিকে বাঁক নিতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লেন। ড্রাইভারও বোধ হয় অপটু ছিল। উপীন-মামার পিঠের ওপর দিয়ে গাড়ির চাকা চলে গেল। খোয়ার রাস্তার ওপর রক্তগঙ্গা।

উপীনমামার মাথায় ছিল মেয়েদের মতো বড় বড় চুল। একেবারে শাদা ধবধবে। পরনে ছিল শান্তিপুরের কোঁচানো ধুতি, গায়ে গিলে করা মসলিনের পানজাবি। গান-বাজনার বৈঠকি আসরে তাঁর খুব খ্যাতি ছিল। তিনি বিয়ে করেন নি। কিন্তু তাঁর সুশ্রী চেহারার নাম-ডাক শোনা যেত। ওই বৃদ্ধ বয়সেও চলতি ফ্যাশন অনুযায়ী তাঁর এক অভিজাত বংশীয় রক্ষিতা ছিল। উনি ইদানীং সেই ফুলবাগানেই থাকতেন। সেই নারী 'সতী' ছিলেন কিনা কেউ জানে না, তবে তিনি সাধ্বী রমণী ছিলেন। তাঁর দান-ধ্যান জপতপ ছিল। সবাই তাঁকে মামী বলে ডাকত।

সেই বাচ্চাটা একটু বড় হয়েছে।

অসময়ে ক্ষিধে পেলে চুরি করে খাচ্ছে, বিড়ালছানার পিছনে ছুটছে, চড়াই পাখি ধরার ফিকির খুঁজছে, এবং নেংটি ইঁদুরের মত ছুটোছুটি করছে পুরনো

জরাজীর্ণ বাড়ির আনাচে কানাচে। মাঝে মাঝে ফুড়ুক ফুড়ুক করে বাড়ির বাইরে গলি ঘুঁজিতে ঘুরে আসছে।

সামনে অন্ধ 'গঙ্গার মায়' ছোট্ট একখানা ঘর। বুড়ি যেন কোথায় কার বাড়িতে গিয়ে কাজ ক'রে দেয়, এঁটো পাত কুড়িয়ে কলাইয়ের থালায় করে সেই উচ্ছিষ্টগুলি ঘরে এনে খায়। পা বুলিয়ে আন্দাজে সে হাঁটে। এ-বাড়ির উত্তর-পূব কোণে একটা নিমগাছ। ওই গাছের পাশেই গোলাপী রংয়ের বাড়িখানার নাম 'বেশ্যাবাড়ি,। সেটার ঠিক পাশে পুঁটিবাগানের মোড়ে চক্কোত্তিদের ছাপাখানা। পুঁটিবাগানে ঢুকে দক্ষিণে কয়েক পা গেলেই উত্তরমুখী বাগানবাড়ি। নাম 'সুরধাম'। ওখানে থাকেন ডি-এল-রায়।

ওই বাচ্চাটা জানে না কে ডি-এল-রায়। কিন্তু ওদের বাগানের নিচু পাঁচিলটার ওপর উঠে ফুল ছিঁড়তে গেলেই মালী তেড়ে আসত, বাচ্চাটা তখন ঝাঁপ দিয়ে পড়ত রাস্তায়। নেংটি ইঁদুর মুহূর্তে অদৃশ্য। বাচ্চাটা আজও বালক হয়ে ওঠেনি।

বাড়িতে ওদের অনেক লোক। দিদিরা, দাদারা, মাসি ও মামীরা, বউরা—চৌবাচ্চাটা ছিল অন্ধকার নিচের তলায় দক্ষিণ কোণে। কলতলার গায়ে কারোগেটের চালা। তার সামনে মস্ত বেলগাছ। ওদিকটায় রাত্রের দিকে আসে পিশাচরা, তাদের হাড় চিবনোর কড়মড়ি শব্দ শোনা যায় দোতলা থেকে। তখন চাপা গলায় কে যেন চুপি চপি বলে, 'ভূত আমার পুত, শাঁকচুন্নি আমার ঝি, রামলক্ষ্মণ বুকে আছে করবে আমার কি ?'

ব্যাস, আর ভয় নেই। ওই ওপাশে রাত্রের দিকে শুয়ে আছে ওই দুরন্ত শিশু-বালক—ওর নামই ত রাম ! খোকা আর রাম—দুটো নামই চলছে !

কিন্তু কেমন সেই পিশাচ, কি. রকম দেখতে তারা ? ওই নিচেকার মস্ত চৌবাচ্চাকে ঘিরে বাড়ির মেয়েরা আর বউরা দল বেঁধে কাপড় খুলে স্নান করতে নামে. গায়ে সাবান মাখে—কই তখন পিশাচরা এসে ওদের কাপড়গুলো নিয়ে পালায় না কেন ? খোকা একদিন নিচে গিয়েছিল ওদের স্নান করা দেখতে। ওকে কেউ শিশু-পুরুষ বলে গ্রাহ্যও করে নি। শুধু ওদের মধ্যে একদল এগিয়ে এসে হাসি-হাসি মুখে ওর কান মলে দিয়ে বলেছিল, আবার এসেছিস ? বলে দেবো ?

ও ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল।

না, অন্ধকারে নয়, ভরদুপুরে একদিন ওই কৌতুহলী ছেলেটা সকলের

চোখে ধূলো দিয়ে চৌবাচ্চাটার ওদিকে গিয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত বাড়ি নিশ্চুতি। চৈত্রমাসের হাওয়ার মর্মর উঠেছে বেলগাছে। কাক ডাকছে তন্দ্রা জড়ানো কণ্ঠে। চড়াই আর শালিকের চূর্ণ কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। চালতা বাগানের ওদিক থেকে কালোয়ারেরা ছেনি দিয়ে লোহা কাটছে,—তারই আর্ত আওয়াজ আসছে দূর থেকে।

ওর মাথার চেয়ে চৌবাচ্চাটা অনেক উঁচু। কী আছে, কত জল আছে ওর মধ্যে? হ্যাঁ, সবাই ঘুমোচ্ছে এখন, এই সুযোগ। খোকা হাত উঁচুতে তুলে চৌবাচ্চার পাড় দুহাতে শক্ত করে ধরে হাঁটুর সাহায্যে পায়ের উপর চাপ দিয়ে অতি সাবধানে পাড়ের উপর উঠল। আ, কী সুন্দর ছলছলে ভরা জল! কী গভীর, কী কালো! তলার দিকে ঘন শ্যাওলা, তারই একটা ছায়া উঠেছে উপর দিকে। আ, স্নিগ্ধ-শীতল স্বচ্ছ জল। ভিতর দিকে নিচে নামবার জন্য কয়েকটা সিঁড়ি রয়েছে। ওকে যেন ডাকছে জলের তলা থেকে সেই যক্ষী বুড়ী। সেই ডাক অপ্রতিরোধ্য।

খোকা একটা সিঁড়িতে পা ডুবিয়ে নামল। প্রায় হাঁটুজল, কিন্তু নধর পিছল শ্যাওলা পায়ের তলায়, অথচ মধুর ঠাণ্ডা! যক্ষীবুড়ী আবার হাত বাড়িয়ে দিল, আরও নেমে আয়—তবে ত কোলে নেবো, তবেই ত ভালবাসব! আয়, আয়—ভয় পাসনে।

খোকা দ্বিতীয় সিঁড়িতে নেমে আরও নিচে ডান পা বাড়াতে গিয়ে তার কচি বাঁ-পাখানা পিছলিয়ে গেল।

তারপর! তারপর যক্ষীবুড়ী হা হা করে হেসে দু'হাত বাড়িয়ে ওকে কোলে তুলে নিল। তখনও এই যক্ষপুরী চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঃঝুম।

পেট ভরে জল খাচ্ছিল প্রথমটা, মাছেরা যেমন হাঁ ক'রে টোপ গেলে। তারপর খেতে লাগল প্রাণভরে। এত খাচ্ছে যে কচি দুটো চোখ বেরিয়ে আসছে! তারপরে যক্ষীবুড়ির আর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, শুধু ঘন গূঢ় অন্ধকারে তার হাত-পা নড়ছে, শেষ নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে আরও জল ভিতরে নিচ্ছে। না, আর কিছু মনে নেই।

চোখ খুলে যখন তাকাল, তখন সে বিধবা জননীর কোলে। শাসন নেই, প্রহার নেই, তিরস্কার নেই। শুধু শান্ত স্নেহ-নিবিড় দুটো কালো চোখে জলধারা নেমে এসেছে। চারিদিক থেকে ঘিরে রয়েছে সবাই। ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ল।

এই নিয়ে বার তিনেক সে বাঁচল নিশ্চিত মৃত্যুর গ্রাস থেকে। সেবার পড়ে গিয়েছিল উত্তর দিকে ন্যাড়া সরু বারান্দা থেকে পাশের খোলার চালার ছাদে এবং সেখানে টাল সামলাতে না পেরে একেবারে নিচের তলার নর্দমায়। আর এই ত সেদিন। বেলগাছে উঠতে গিয়েছে শালিক ধরবে, এমন বোকা! পাঁচ গজ আন্দাজ উঠে সরু ডালটায় পা রেখে যেই ডিঙ্গি মারতে গেছে, অমনি মড়-মড়-মড়াৎ। শান-বাঁধানো বেলতলায় শানের ধারে মাথা ঠুকে ছড়-ছড়িয়ে রক্ত। ভাগ্যি কচি দূর্বোঘাস পাওয়া গেল। তাই ছেঁচে দিয়ে তবে রক্ত থামে। একবার রেড়ির তেলের পিদিমে কাগজ পোড়াতে গিয়ে হাত পোড়াল,—এক দোয়াত কালি খরচ হল। তাতেও জ্বালা কমে না, তখন আলুবাটা। অমন দুরন্ত দুর্বার ছেলে, ও কিছুতেই বাঁচতে আসেনি। মরবেই একদিন অপঘাতে। মৃত্যু ওর পিছু নিচ্ছে কথায় কথায়। সেদিন ছোট ছুরিতে আঙ্গুল কেটে গেছে, ও সেই রক্তটা নিয়ে মেঝের ওপর আঁকিবুকি কাটছে! শুনেছ এমন কথা?

একদিন ছেলেটা শুনল সবাই যাচ্ছে ভাগলপুরে পিসিমার বাড়ি, তাকেও নেবে সঙ্গে। ওই একই পিসি, পিসেমশাই জজ। ওরা বড়লোক।

বাড়ি থেকে হাওড়া ইস্টিশান।

বিকেলের দিকে ছেলেটা ওদের সঙ্গে ভাড়াটে ছ্যাকরা ঘোড়ারগাড়িতে উঠল। সেই প্রথম গাড়ি চড়া। কলকাতা তখন ছোট। ধর্মতলা থেকে উত্তরে গিয়ে হাতিবাগান ছাড়িয়ে ফড়েপুকুর পর্যন্ত। ব্যস, তারপর ট্রামডিপো ছাড়ালে দুটো চারটে মুড়ি-মুড়কি আর তেলেভাজার দোকান। মাঝে মাঝে মাড়োয়ারিদের কাপড়-গামছা বিক্রির ছোট ছোট চালাঘর। ওদের গাড়ি চলল কাঁসারিপাড়া আর সিঙ্গিবাগানের ভিতর দিয়ে। কী অধীর পুলক আর দুর্বার কৌতুহল ছেলেটার চোখে। ও যেন চাইছে এই গতিবেগ না থামে। গাড়ির তলার দিকে চারটে চাকা কেবলই ঘুরুক, যেন কিছুতেই থামে না। গাড়ির জানলার বাইরে কী সুন্দর আবিষ্কার, কী বড় বড় উঁচু বাড়ি,—চারিদিক যেন উদ্দাম আর চঞ্চল। পটুটিবাগান বা ভটচার্যিবাগানে এসব কিছু নেই। তাকে গাড়ির চালে উঠতে বা বসতে দেওয়া হয়নি। সে ছোট, সে দুরন্ত। আচ্ছা, আগে সে আরেকটু বড় হোক।

সে রাত্রে রেলগাড়িতে সে ঘুমোয়নি। অন্ধকারের মধ্যে গাড়ি যেন ছুটছে কোন্ দিকে। শুধু তলার থেকে শুনেছে 'যাচ্ছি যাব, খাচ্ছি খাব!' ওর মা শুধু

আঁচলের খুঁটে ওর একখানা পায়ের গোছ শক্ত করে গেরো দিয়ে রেখেছেন পাছে জানালায় ঝুঁকতে গিয়ে সর্বনাশ বাধায়। তখন কোনও গাড়ির জানালায় রেলিং থাকত না।

আর কিছু মনে নেই ভাগলপুরের কথা। বাড়িখানা ছিল মস্ত বড়, তার ভিতরে ছিল মস্ত উঠোন। রাস্তাটার নাম নাকি ছিল 'ওয়েস রোড'। ওরা সবাই মিলে ফিরে এসেছিল মাস দুই পরে। তখন শীতের শেষ।

কলকাতায় সেই একই পুরনো বাড়ি। এ যেন বন্দীশালা, এ যেন ছেলেটাকে দুঃখ দেওয়া হচ্ছে। সে চিনে এসেছে বাইরেটা, দেখে এসেছে মস্ত আকাশ মিলিয়ে প্রকাণ্ড এক পৃথিবী!

দিদি ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিত ছড়া কেটেঃ "ছোট পাখি ছোট পাখি, এসো মোর কাছে। পরিপাটি খাঁচা এক তোমা তরে আছে। সুকোমল মখমল দিব শয্যা পেতে। পাকা পাকা মিষ্ট ফল পাবে তুমি খেতে!"

ছোট পাখি বলল, "না ভাই যাব না আমি তরুলতা ছাড়ি। সুন্দর কাননে মোর আছে ঘরবাড়ি। উড়িতে বাসনা মোর নীলাকাশে ভাসি। হলেও সোনার খাঁচা ভাল নাহি বাসি।"

ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ একদিন ভাত খাবার ঠিক আগে ছেলেটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। ভাতের থালা পড়ে রইল, ছেলে আসে না। মা চটে আগুন। হাতের কাছে বেলুনটা নিয়ে মা ছুটলেন। আজ ওর ঠ্যাং ভেঙে দিয়ে তবে ছাড়ব। দাঁড়া ত—

কিন্তু কোথায় ছেলে? ঘরে-বাইরে কোথাও নেই। তবে কি আবার সেই চৌবাচ্চায়? এক-একজন এক-এক দিকে ছুটল। ছাদে বারান্দায় সিঁড়ির নিচে কলতলায় ঠাকুর ঘরে—না নেই। ছোড়দা ছুটল লালার দোকানের দিকে, সামনের আস্তাবলে, নলিতবাবুর রান্নাঘরে, কাওরাদের বস্তির ভিতরে। না কোথাও নেই। দেখো ত মা ভাঁড়ার ঘরে তেঁতুল চুরি করে খাচ্ছে কিনা? না, সেখানেও নেই। দেখো হয়ত ক্ষিরি নাপতিনির ঘরে গিয়ে ঢুকেছে আলতাপরার লোভে—ওর ত আর লজ্জা-শরম নেই। যাই, একবার দেখে আসি।

না, ছেলেটাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। নিরাশ হয়ে একে একে সবাই ফিরে এল। যারা ওর জ্বালায় রাতদিন অস্থির হ'ত, তারাই আগে কেঁদে

ফেলল। আজ ষষ্ঠীর উপবাস ছিল। সন্তানের কল্যাণ কামনায় মেয়েরা নাকি ষষ্ঠী করে।

বেলা গড়িয়ে গেল। দুপুর পেরিয়ে অপরাহ্ণ। রাস্তায় গিয়ে ঘোরাঘুরি করছে সব। কেউ গেছে শুঁড়িপাড়া, কেউ জেলেটোলা, কেউ বা গেছে চাল্‌তাবাগানের দিকে। মেয়েরা কাঁদতে আরম্ভ করেছে।

ওর মা ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল সদর দরজার দিকে চেয়ে। একে একে সবাই তখন দোতলায় উঠে গেছে। সন্ধ্যার আলো জ্বালা হ'ল রেড়ির তেলে।

এমন যময় এক হিন্দুস্থানী পাহারাওলা হাঁক দিয়ে সদর দরজায় এসে দাঁড়াল। মা এগিয়ে এল, দেখল পাহারাওলার কোলে তাঁর ছেলে। পরনে সেই গেঞ্জি আর ছোট ইজের। পাহারাওলা বলল, মা, আপনার ছেলিয়া ঘুরছিল হাওড়া ইস্টিশনে। বোলে কি, ভাগলপুর যাবে! লেকিন হুঁসিয়ার বাচ্চা আছে, মা। এ মহল্লার নাম জানে, রাস্তার নাম ভি জানে!

পাহারাওলা বকশিস নিল না। জননীর কাছে ছেলেকে দিয়ে খুশী মনে চলে গেল। মা তাকালেন ছেলের দিকে, আর সেই অপরাধী ও আতঙ্কিত শিশু-বালকও মায়ের দিকে তাকাল। রেড়ির পিদিমের আলোয় সর্বশেষ সন্তানের দিকে নিরীক্ষণ করে মা দেখলেন এ সেই মুখ, অবিকল সেই মুখেরই অভিব্যক্তি—যে মুখখানা একদা কার্তিক মাসের রাত্রে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে! এ সেই তারই একটি ক্ষুদ্র অংশ।

ছেলেটাকে বুকের মধ্যে তুলে নিয়ে মা স্নান করাতে গেলেন। যখন তিনি সাবান মাখাচ্ছিলেন, তখন ছেলেটা বলল, ইজেরটা কেচো না মা, ওর মধ্যে একটা জিনিস আছে।

কী জিনিস?—মা বললেন, ছাই আর পাঁশ! কই, বার কর।

ছেলেটা ইজেরের পকেট ঘেঁটে বার করল শালপাতায় একটি মোড়ক। তার মধ্যে রয়েছে একটি আম-সন্দেশ। তারপর থতিয়ে-থতিয়ে সে বলল, চারটে ছিল। তিনটে আমি যে খেলুম, আর এটা তোমার জন্যে! ওই যে, ওই লোকটা কিনে দিয়েছিল!

সেই দিন রাত্রে মেঝের উপর কাঁথার বিছানায় শুয়ে মা কাঁদছিলেন নিঃশব্দে। ছেলেটা শুয়েছিল ওঁর কোলের কাছে। অজ্ঞান ছেলেটা এক সময় প্রশ্ন করল, 'মা, কাঁদছ তুমি? বকেছে কেউ?'

মা জবাব দিলেন না, ওকে শুধু আরও কাছে টেনে নিলেন।

পরদিন হাতে খড়ি। পুজো-আর্চা করে বেলার দিকে শিশু-বালককে রঘু

পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি ক'রে দেওয়া হ'ল। এই ত কাছেই চাল্‌তাবাগানের মোড়ে—রাধাচরণ পালের বাড়ির ঠিক সামনে। এগারোটায় যাবে, তিনটে পর্যন্ত বাঁধা থাকবে।

সেই ভাল। ও একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাচ্ছে। এবার থেকে বাছাধন জব্দ। পড়া না পারলে রঘুপণ্ডিত পিঠের চামড়া তুলে নেবে, দেখিস।

পাঠশালায় ভর্তি করতে গৃহস্থের খরচ হ'ল অনেক। তিনি পয়সা একখানা স্লেট, এক পয়সা দুটো পেন্সিল, বর্ণ-পরিচয় এক পয়সা, বোধোদয় এক পয়সা, এক আনা পণ্ডিতের প্রণামী। মোট দশ পয়সা। মাইনে মাসে দু'আনা।

দেখিস তোরা, ওই ছেলে একদিন চাকরি করবে, এনে খাওয়াবে। আর তোরা হ'লি মেয়ে। মেয়ে না মাটির ভাঁড়। ছেলে হলে আজও শাঁখ বাজে। আর মেয়ে হলে? সাত পুরুষ একেবারে নরকস্থ!—দিদিমা বললেন।

॥ ২ ॥

বর্ষার জলে ভরে যেত পুঁটিবাগানের সংকীর্ণ পথ। সেই পথ দিয়ে ছেলেটা যেত পাঠশালায়। ভোরেই বর্ষা নেমেছে; ঝাপসা জলো হাওয়ায় যখন চারিদিক বিষণ্ন করুণ, শীত-শীত ভাব, কাজে জড়তা,—থৈ-থৈ জল এখানে-ওখানে, ঘরের বাইরে পা বাড়াতে ঠাণ্ডা লাগে, আকাশ আর পাঁচিল আর বেলগাছ যখন বিষাদের অশ্রুতে আর কুহেলীর ছায়ায় ঢাকা, যখন বাইরের পথ থেকে সবাইকে ডেকে আশ্রয় দিতে ইচ্ছা করে,—সেই সময় সকালের বর্ষায় আর ঠাণ্ডায় লুকিয়ে সে বেরিয়ে পড়ত পাঠশালার পথে। সবাই থাকুক আশ্রয়ে, সুখে থাকুক,—ওকে যেতে হবে বাইরে। ওর অন্তর্গূঢ় প্রাণচেতনার সঙ্গে যোগ রয়েছে বাইরের বর্ষার, জল দাঁড়ানো পথের, দুর্যোগের আর ওই দিগন্তজোড়া কাতর ভাবটির। ওদের সঙ্গে ওকে মিলতে হবে, ওদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। ওর সর্বাঙ্গ বেয়ে যখন জলের ধারা নামে, মনে হয় কেমন যেন অদ্ভুত চেতনার ধারা নেমে আসছে। অনেক সময় চোখ বুজে সে থমকে দাঁড়িয়েছে পথে, দেখেছে বন্ধ চোখের উপরে কেমন নিবিড় জলধারা নামতে থাকে। চোখের সামনে থেকে পাঠশালা ভেসে যায়, ভেসে যায় বাড়ীর শাসন, ভেসে যায় শরীরের হিতাহিত জ্ঞান, ভেসে চ'লে যায় ইহকাল আর পরকাল।

গল্পটা অনেক দূর এগিয়েছিল—

পিতলের পিলসুজের ওপর রেড়ির তেলের আলোটা জ্বলছে অনেকক্ষণ থেকে। শিখাটা নিস্তেজ, তেলের অভাবে সলতেটো প্রায় শুকিয়ে এসেছিল। পুরনো ঘরের চূণবালিধ্বসা দেওয়াল পর্যন্ত আলোটা যেন পৌঁছচ্ছে না। ছায়াগুলো নড়ছিল চারদিকের দেওয়ালে।

বাইরে শ্রাবণের বর্ষা নেমেছে। পুরনো ঘরের কড়িকাঠের ফাটল বেয়ে জল চুঁইয়ে নেমে এসেছে ঘরের মেঝেতে। কিন্তু সেই আধমরা আলোটাকে ঘিরে যে ছয়-সাতটি অর্বাচীন ছেলেমেয়ে ব'সে রয়েছে,—ঘনবর্ষার দিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই; তারা গল্পের আসরে তন্ময় হয়ে রয়েছে।

…আওয়াগড় রাজ্য নাকি সাতটি নদীর পার। কত পাহাড় আর কত তেপান্তরের মাঠ ছাড়িয়ে যেতে-যেতে তবে নাকি মস্ত রাজবাড়ী। রাজার নাকি দুই ছেলে; যুবরাজ মহেন্দ্র আর যোগেন্দ্র। যুবরাজ মহেন্দ্র সেপাইসান্ত্রী নিয়ে হাতীর পিঠে চ'ড়ে বেরিয়েছিল মৃগয়ায়। মাথায় তার রাজছত্র। ঘোড়াশাল থেকে গিয়েছিল ঘোড়া, রূপার জড়োয়া সাজ প'রে যুবরাজের অভিযানে। অস্ত্র, লস্কর, খাদ্য সজ্জা—সব মিলিয়ে এক বিরাট শোভাযাত্রা।

দেশ দেশান্তর পেরিয়ে চলেছে সেই রাজকীয় শোভাযাত্রা। অবশেষে যুবরাজ মহেন্দ্রের তাঁবু পড়ল কোন্ এক জনপদে কি এক নদীর ধারে। কাছেই শিবের মন্দির—সেই মন্দিরে সেদিন অক্ষয়-তৃতীয়ার মেলা। মস্ত সমারোহ সেই মেলায়।

গল্পটা অনেকদূর এগিয়েছিল।

হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসলুম, আওয়াগড় কোথায়?

থাম্—একটা ধমক এলো আমার মুখের ওপর, —বললুম না সাতটা নদীর পার?

কি-কি নদী?

গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী-সরস্বতী নর্মদা-সিন্ধু-কাবেরী? নৌকায় গেলে লাগে ছ'মাস, গরুর গাড়ীতে এক বছর, হেঁটে গেলে বাঘের পেটে যায়! যাবি তুই হেঁটে?

চুপ ক'রে গেলুম। একজন তাকালো সভয়ে পিছন দিকে। ঘরের দেওয়াল থেকে বালি ধ্বসেছে। কড়িকাঠ থেকে উইপোকার দড়ি নেমেছে নীচের দিকে, ইঁদুর ছুটেছে এগর্ত থেকে ওগর্তয়, আরসোলা চ'রে বেরাচ্ছে ঘরময়। আলোটা আরো মলিন হয়ে এসেছে।

অক্ষয়তৃতীয়ার মেলায় শিবের পুজো দিতে গিয়েছিল কুমারী যোগমায়া! অমন সুন্দরী মেয়ে ছিল না আর ভূ-ভারতে। মেঘের মতো কালো চুল, আর খগরাজ পায় লাজ নাসিকার কাছে!

যোগমায়া কে ?—আমার চোখে কৌতূহল জ্ব'লে উঠলো।

রাজকন্যে ! আবার কে ?—আরেকজন আমাকে ধমকালো।

না রে না – যোগমায়া হোলো এক গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ে। সদাগরী অপিসে চাকরি করতো তার বাপ। সেই যোগমায়াকে যুবরাজ মহেন্দ্র দেখে একেবারে মুগ্ধ। তিনি গিয়ে সেই ব্রাহ্মণকে বললেন, ঠাকুর, আমি তোমাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করবো। ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করলেন যুবরাজকে। দুজনের বিয়ে হয়ে গেল।

তারপর ?

অসীম কৌতূহল আর উদ্বেগ আমাদের মুখে চোখে। কিন্তু ঘরের বাইরে দালানে শুয়েছিলেন দিদিমা,—তিনি অন্ধকার থেকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে কাতরোক্তি ক'রে বললেন, হুঁঃ, তারপর। তারপর থেকেই ত' সর্বনাশ, বাবা ! 'ওই যে বলে, 'সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'—তাই !

রাজকুমার মহেন্দ্র পরম সমাদরে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে যেতে চাইলেন নিজের রাজ্যে, কিন্তু যোগমায়া রাজী নন্। তিনি ভয়ে আর ভাবনায় মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে রইলেন। কত সাধ্য সাধনা, কত কাকুতি মিনতি,—কিন্তু মেয়ের কি কান্না ! রাজবাড়ি নাকি ভয়ংকর, ঢাল-তরোয়াল নিয়ে থাকে সেখানকার পাহারা, রাজবাড়ীতে গিয়ে একবার ঢুকলে আর কোনদিন বাপের বাড়ী আসা যায় না ; কান্নাকাটি করলে নাকি তারা মাটির তলায় পুঁতে ফেলে।

যোগমায়া প্রাণ ভয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলেন। যুবরাজ মহেন্দ্র মনের দুঃখে মৃগয়া ত্যাগ করলেন। কখনো কখনো সেই ব্রাহ্মণের বাড়িতে দিন কাটান, যোগমায়াকে সাধ্য সাধনা করেন,—আবার বা একসময়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। যোগমায়া বাপের বাড়ী ছেড়ে এক পাও নড়েন না। বড় বেশী তাঁর প্রাণভয়।

বারো বছর পর্যন্ত যুবরাজ মহেন্দ্র যোগমায়াকে নিয়ে যাবার জন্য ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। ইতিমধ্যে পিতার মৃত্যুর পর বড়ভাই যুবরাজ যোগেন্দ্র রাজা হন, কিন্তু রাজবাড়ীর চক্রান্তে তাঁকে কি এক ওষুধ খাইয়ে পাগল করে দেওয়া হয় ; সেই পাগল একদিন এক লাঠির ডগায় একটি পুঁটলি বেঁধে আর মাথায় পাগড়ী জড়িয়ে রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে যান। ছোট যুবরাজ মহেন্দ্র অনেক চেষ্টা ক'রেও যোগমায়াকে না আনতে পেরে অবশেষে বিবাগী হন। তাঁরও দিন কাটে পথে পথে।

আঁক্ !—চেঁচিয়ে ওঠে ছোট বোন। সঙ্গে সঙ্গে একটা হুড়োহুড়ি, সেই গোলমালে পিলসুজসুদ্ধ প্রদীপটা ছিটকে যায় কোথায় ! ব্যাপারটা আর কিছু নয়, অন্ধকারে একটা আরসোলা উড়ে এসে তার নাকে বসেছিল !

গল্পটা সেদিন শেষ হয়নি শ্রাবণের রাত্রে। কিন্তু গল্পটার ভয়াবহ বিয়োগান্ত সম্ভাবনার চিন্তা ছিল সকলের মনে। পাড়ার কোন্ মেয়ে শ্বশুরঘর করতে যায় না,—মনে প'ড়ে যেতো যোগমায়াকে ; কোন্ স্বামী কবে মনের দুঃখে কোথায় চ'লে গেল,—.

অমনি মনে প'ড়ে যেতো রাজ্যহারা পরিব্রাজক যুবরাজ মহেন্দ্রকে। যুবরাজ আমাদের সকলের প্রিয়পাত্র।

হঠাৎ কোনো কোনোদিন মনের ভুলে দিদিমা নিঃশ্বাস ফেলে বলতেন, তাইত, হাঁরে, অনেকদিন ন'জামাইকে দেখিনি, তোরা খোঁজ পেলি কিছু? কোথায় আছে জানিস?

জবাব দেবার মতন কোনো মানুষকে কাছাকাছি পাওয়া যেতো না। সদ্য স্নান সেরে ন'মাসিমা তাঁর চুলের রাশির ডগায় গেরো দিয়ে কাছে এসে দাঁড়াতেন স্থির প্রতিমূর্তির মতন। দিদিমা মুখ তুলে বলতেন, অনেকদিন খবর নেই, বেঁচে আছে ত'?

স্বামীর উল্লেখমাত্র ন'মাসিমার প্রসন্ন সুন্দর মুখে রক্তের আভাস দেখা দিত। শান্তকণ্ঠে বলতেন, ছেলেমেয়ে তিনটের জ্ঞান হয়েছে, এখন ওসব কথা তোলো কেন, মা?

দিদিমার মুখে আর কোনো কথা আসে না, মাসিমা তেমনি দৃপ্তভঙ্গীতে ফিরে চ'লে যান। দিদিমার কাঁধের পাশে আমি পোষা বিড়ালটার মতো ব'সে থাকতুম।

কিছু কি শোকের ছায়া ছিল আমার মনে? কিছু কি বিষণ্নতা? অপরিণত মানস-চেতনার মধ্যে যেন উপলব্ধি করতে পারতুম, নরনারীর ভিতরকার কিছু একটা রহস্য-জনক সম্পর্ক! কোথাও একটা অন্যায় ঘটেছে, কিছু একটা ভুল থেকে যাচ্ছে,—সেটা যেন নৈরাশ্যে, বেদনায়, যন্ত্রণায় আর চিত্তগ্লানিতে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে।

মামা একদিন এসে বললেন, বেঁচে আছে গো, বেঁচে আছে,—বলোগে তোমার মেয়েকে কপালে সিঁদুর পরতে! কই দাও দেখি কিছু আজ?

দিদিমা ভুরু কুঁচকে বললেন, সুখবরটা দিয়ে বুঝি তুই গাঁজার পয়সা চাইতে এলি?

মামা মুখ খিঁচিয়ে বললেন, গাঁজার দাম ত' পাঁচ পয়সা, খবরটা যে লাখো টাকার? শুনে এলুম তোমার ভাসুরপো ভোলা ভটচার্যির মুখে। জোড়াসাঁকোর আপিংয়ের দোকানের সামনে তোমার জামাই'কে সে দেখতে পেয়েছে!—আজ আমার দু'টাকা চাই।

দু'টাকা!—দিদিমা ফনা তুলে উঠলেন, মাগের ভাত-কাপড় আমি যোগাবো, আর তুই চাইবি হাতখরচ? দু'টাকা রোজগার করেছিস কখনো? কখনো দেখেছিস চোখে একসঙ্গে?

বারুদখানায় আগুন লাগলো! মামা চীৎকার ক'রে উঠলেন, তোর টাকা? ফল্না ভটচার্যির টাকায় তোর গুষ্টিকে খাওয়াসনে? রমেশ মিত্তিরকে দিয়ে জাল উইল ক'রে আমাকে পথে বসাসনি? ঘুঘু চরাবো ভিটেয় ব'লে দিচ্ছি। পেয়াদা ছোটোবো! বেড়াল কাঁদাবো! এই চললুম হাইকোর্টে!

হাইকোর্টে যাবার জন্য মামা ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। পরে জানা গেল, আনা চারেক পয়সা পেয়ে তিনি আপাতত মামলা-মোকদ্দমা স্থগিত রাখলেন। হাইকোর্ট অনেক দূর।

আমার ডাক পড়তো মামার ঘরে। গিয়ে দাঁড়াতুম দরজার এক কোণে ভয়ে ভয়ে। চণ্ডালের গল্প শুনেছিলুম মিত্তিরদের বরদা-ঝির কাছে। মামার মুখশ্রী দেখলে জুলু চণ্ডালকে মনে প'ড়ে যেতো। ঘড়ির কাজ করতে করতে একসময়ে মুখ তুলে মামা বললেন, মাগীকে ডেকে দে ত' ?

কোন্ মাগীকে ?

মামা মুখ বিকৃত ক'রে বললেন, গুয়োটা! বলে আবার কোন্ মাগী! বাড়ীতে একপাল মাগীর মধ্যে মামী তোর কোন্‌টা? ডাক্ শিগগির! ফের যদি আমার বেড়ালকে মারবি, কি ডালিমগাছের ফল ছিঁড়বি,—ত' বাপের নাম ভুলিয়ে দেবো!

মামীকে ডেকে আনলুম। মামা বললেন, এক পয়সার আজির করে রেখেছ আমাকে, মনে নেই? আমার জন্যে কি করেছ তুমি শুনি? একজোড়া ঢাকাই শাঁখা কিনে দিয়েছিলে, সরলা তখন পেটে! তোমার জন্যে আমার মাথা ধরার ব্যামো, চুলে তেল পড়ে না দু'বছর—যেমন খাই-পরি তেমনি গতরে খাটি,—হাত পা প'চে গেল হাজায়! কোন্ দিকে তোমার চোখ আছে বলো দিকি ?

আমি দাঁড়িয়ে। মামা তাঁর ফ্রেঞ্চ-কাট্ দাড়িতে হাত বুলিয়ে ক্রুর চক্ষে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হুঁ! পয়সা দিবিনে, কেমন? আমার পকেট মারে ওপাড়ার ছোট বৌ এসে—না? বলি ভোর রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে নীচের তলায় কোথায় যাস শুনি ?

আ মর, মুখে আগুন! পঞ্চাশ বছর হ'তে চললো, কথা শোনো—! বলতে বলতে মামী হন্ হন্ ক'রে চ'লে গেলেন।

মামা বললেন, ওরে গুয়োটা, বিনি পয়সায় তামাক আনতে পারবিনে ?

বললুম, পারবো!

তবে নিয়ে আয়, দেখি তুই কেমন বাপের বেটা ?

ছুটে চ'লে গেলুম তেতলার দিদিমার ঠাকুরঘরে। ঘরের একপাল্লা দরজায় তালা বন্ধ। একথা জানা ছিল মিত্তিরদের ঝি বরদা এসে সংক্রান্তির পুজো দিয়ে গেছে পাঁচ পয়সা। এই বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে ফেলে রেখে গেছে পয়সা ক'টা।

বাঁহাতে দরজার পাল্লাটা ঠেলে ধ'রে কচি ডান হাতখানা ভিতরে সেঁধিয়ে দিতেই হাতে উঠে এলো এক-আনিটা। সমস্ত শরীর কাঁপছে ঠকঠক ক'রে। সমস্ত অন্তরাত্মা কাঁপছে থরথরিয়ে।

তামাক আনলুম লালার দোকান থেকে। মামা উল্লসিত হয়ে বললেন, আমার ভাগ্নে তুই একথা ভুলবিনে কোনদিন। তোর নামে আমি সর্বস্ব উইল্ ক'রে যাবো! যা, তামাক সেজে আন্।

মামার ঘরে ছিল ময়লা বিছানার পুঁটুলি, কয়েকটা খালি শিশি-বোতল, গোটা দুই তামাকের নল ও ভাঙ্গা মাটির কল্‌কে, কব্জাভাঙ্গা একটা তোরঙ্গ, মা-মনসার ছবির পট, ছেঁড়া মাদুর, এবং ফল্গুনা ভটচার্যির আমলের একখানা ধুসর মলিদা, সেখানে দেখলে বেজি-রঙের পুষি বেড়ালকে মনে প'ড়ে যেত।

তামাক সেজে আনলুম হুঁকোয়। মামা সন্দিগ্ধ চক্ষে বললেন, এত তাড়াতাড়ি স্য ধরালি? টেনেছিস বুঝি?

কই, না?

দেখি মুখে গন্ধ?

মামা মুখের কাছে মুখ আনতেই চেঁচিয়ে উঠলুম,—উঁ—কী বিচ্ছিরি তামাকের গন্ধ আপনার মুখে! বমি আসে...ও-য়-য়-ক্!—বলতে বলতে স'রে পড়লুম।

কিন্তু চুরি ধরা প'ড়ে যায়। কে নিলে ঠাকুরের পয়সা? ভয়ে আমার গা কেমন করে! তামাক কিনেছি, কিনে এনেছি লাট্টু আর লেত্তি। সুতরাং এদিক ওদিক খোঁজ করতে লাগলুম। বেলতলার ছাদে ভিজে শাড়ীর আঁচলে কার যেন একটা পয়সা বাধা ছিল—সেটা সংগ্রহ করলুম সন্ধ্যায়। কিন্তু শাড়ীখানা হোলো মামীর; রেড়ির তেল আনবার সময় সেটার খোঁজ পড়লো। জানি বড়লোকের খরদৃষ্টি আমার ওপর। অতএব তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে দিদিমার কাঠের বাক্সয় আমার হাত পড়লো। সেখান থেকে দু'-পয়সা হাতড়ে নিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে আসছি,—মামী তখন চীৎকার করছেন কাপড় দেখিয়ে। মা ছুটে এলেন, এলেন ন' মাসিমা। আলো নেই কোথাও, অন্ধকারে হাত চালাবার সুযোগ মিললো। একটা পয়সা ছুঁড়ে দিলুম শাড়ীখানার মধ্যে। মায়ের কথায় মামী সেই শাড়ী ঝাড়া দিতেই ঠন্ ক'রে পড়লো তাঁর হারানো পয়সাটা।

দিদিমা চীৎকার করে উঠলেন, আবাগী, তোর বড় আস্পদ্দা, চুরির দায়ে বাছাদের সন্দেহ! দুটি চক্ষের মাথা খা।

মামা ওঘরে লাঠি ঠুকে বললেন, দাঁড়াও যাচ্ছি!

কিছুক্ষণ পরে একাদশীর বাতাসা কেনবার জন্যে দিদিমার বাক্স খুলে দেখা গেল, দুটি পয়সাই উধাও! ব্যাপারটা দেখতে দেখতে জটিল হয়ে উঠছে। আমি যেন প্রত্যেকটা ঘটনায় দ্রুত জড়িয়ে পড়ছিলুম। মনে প'ড়ে গেল ছোট বোনের বিস্কুটের বাক্সয় সে একআধটা পয়সা জমাতো। আপাতত সেটার থেকে অতি সঙ্গোপনে কিছু নিযে তেতলায় গিয়ে ঠাকুরের দেনা শোধ ক'রে এলুম। মামীর দেনা আগেই শোধ হয়েছে। বড়দাদা হাওয়াগাড়ী সিগারেট খেতে শিখেছিল—তার পকেট থেকে কিছু নিযে দিদিমার বাক্সয় রাখা গেল। এবার বাকি ছোট বোন।

কিন্তু বাড়ীতে তখন ভীষণ হৈচৈ উঠেছে। মা তেড়ে এলেন আমার দিকে, আমি আমি গিয়ে আশ্রয় নিলুম মামার ঘরে। মামা বীর্যবান লোক। তিনি লাঠি বাগিয়ে বললেন, তোকে বাঁচাবো আমি, নৈলে এ জান্ দেবো! আমার ভাগ্নে, একথা ওদের জানিয়ে যাবো। খবরদার!

সমগ্র ঘটনাবলী আমার নৈতিক সাধুতাকে কলঙ্কিত করতে উদ্যত ব'লেই আমি কাঁদছিলুম। মামা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ভয় কি তোর, আছি আমি। দেশলাইটা বার কর ত' পকেট থেকে, আলোটা আগে জ্বালি!

মামা ঘরে আলো জ্বাললেন। তারপর আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, যা, তোকে ঝোড়োর দোকানের সন্দেশ খাইয়ে দেবো। যা, কোনো ভয় নেই।

চারদিকেই যখন চুরি হচ্ছে তখন ছোট বোন তার বিস্কুটের বাক্সটা খুলে তহবিল মেলাতে গিয়ে দেখে সর্বনাশ! সে হাউ মাউ ক'রে উঠলো। এই গোপন তহবিলের সংবাদ একমাত্র আমিই জানতুম,—সুতরাং তৎক্ষণাৎ সবাই মিলে আমাকেই চেপে ধরলো।

আমার ভিতরকার দুঃসাহসী তখন জেগে উঠে বললে, কখ্খনো না মিথ্যে কথা! আমাকে জব্দ করার ফন্দি! খুলুক টিনের বাক্স সকলের সামনে, দেখুক সবাই।

বিস্কুটের বাক্স টেনে সকলের মাঝখানে আমিই ব'সে গেলুম। আমার হাতে যাদু ছিল। পুঁতির কৌটো খুলতেই বেরিয়ে পড়লো একটা আনি। তাই দেখে ছোট বোন ফস্ ক'রে বললে, আমার যে চারটে তামার পয়সা ছিল?

থাম পোড়ারমুখী, চুপ করে যা।—মা ধমক দিলেন।

রাত্রে বড়দাদা বললেন, আমার পকেটে পয়সা ছিল, কোথায় গেল রে!

বললুম, তোমার পকেটে ত' সিগ্রেট থাকে, পয়সা থাকে কোথায়?

মা বললেন, কী বল্লি? কি থাকে?

বড়দাদা বললেন, ও দিন দিন ভারি বেড়ে উঠছে, তা জানো মা? বলি পুরনো পড়া দিয়েছিলুম হয়েছে?

বললুম, হয়েছে।

তবে মুখস্থ বল্।

মা বললেন, আচ্ছা আজ থাক্, কাল সকালে বলবে!

রাত্রে পাশে শুয়ে মা চুপিচুপি বললেন, ছি, আর কখনো কারো পয়সায় হাত দিয়ো না, বুঝলে? সব আমি বুঝতে পেরেছি।

আমি তখন অঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলুম বৈকি!

মামী ধরা পড়লেন পরের দিন প্রাতে। মামার পকেটে ছিল একআনা, সেটা অন্তর্হিত হয়েছে কোন্ মন্ত্রে!

মামীমার চীৎকার—পকেট থেকে দেশলাই বা'র করেছিল কে? আমি?

ফের ছোবল মারছিস?—মামা হাঁক দিলেন।

মুখনাড়া দিয়ে মামী বললেন, মামা-ভাগ্নে গালাগালি হয়নি কাল সন্ধ্যাবেলা?

খবরদার! মুখ সামলে কথা বলিস। আমার ভাগ্নে মনে রাখিস।—মামা চীৎকার করলেন।

দিদিমা এদিক থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, আমার নাতির নামে যে লাগায়, সে চোখের মাথা খাক্।

কিন্তু মামীর অন্তর্দৃষ্টি চিরদিনই প্রখর ছিল!

সদর দরজায় মাঝে মাঝে ন'মাসিমার স্বামী এসে ডাক দিতেন। ভিতরে তিনি কোনোদিনই আসেননি। বাইরের রকে ব'সে ডাকাডাকি করতেন, কেউ কেউ তাঁর কাছে

গিয়ে দাঁড়াতো। হয়ত অনেক ডাকাডাকিতে বিরক্ত হয়ে একসময়ে ন'মাসিমা গিয়ে দূরত্ব বাঁচিয়ে দাঁড়াতেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে বক্তব্য থাকতো না। সেই নীরবতা যেন কণ্ঠরোধ করতো। ছেলেমেয়েদের মধ্যে নিজের সন্তানগুলির দিকে একবার প্রসন্ন স্নেহে তাকিয়ে একসময় তিনি উঠে প'ড়ে বলতেন যাই—

ছেঁড়া কোট গায়ে, কোটে বোতাম নেই। ছেঁড়া কাপড়ে কোথাও কোথাও গেরো বাঁধা ; পকেট থেকে উঁকি দিচ্ছে চটা-ওঠা কলায়ের একটি গেলাসের মাথা। পায়ের চটিজোড়াটা তথৈবচ! কোথায় তিনি যাবেন, কোথায় থাকেন, কেমন ক'রে তাঁর দিন গুজরান হয়,—এসব প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু কেন এই আসা-যাওয়া? কিসের টান? কোন্ প্রশ্ন তাঁর মনে জাগে? কোন্ কথাটা তাঁর আজো বলা হয়নি?

ন'মাসিমা আগেই ভিতরে চ'লে গিয়েছেন দৃষ্টির আড়ালে। তাঁর স্বামী অবসন্ন ক্লান্ত পা টেনে-টেনে চ'লে যাবার আগে একটি মেয়েকে অনুরোধ করলেন, বিশুকে একবার ডাকো ত' মা।

একটু পরে ভিতর থেকে মা এসে দাঁড়ালেন। দু'জনেই কিছুক্ষণের জন্য নির্বাক। একসময় ন'মাসিমার স্বামী বললেন, তোমার বোন কোনো কথা না ব'লে চ'লে গেল। তোমার চোখে জল কেন বিশু?

মা বললেন, আপনি মানুষ হ'লে আর চোখের জল পড়তো না!

ও, তুমিও বুঝি ওই দলে?—সহাস্যে তিনি বললেন, যাক্ গে।—এইটিই বুঝি তোমার সেই কোলের ছেলে? একেই ত' তিন মাসেরটি রেখে রাজেন মারা গেছে! শোনো বিশু, খড়দার গঙ্গার ধারে একটু থাকবার জায়গা পেয়েছি। তোমার বোনকে বুঝিয়ে বলো, ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেখানে চলুক আমার সঙ্গে।

মা বললেন, ওরা কি গঙ্গাজল খেয়ে থাকবে?

কেন, আমি ওখানে এক মসলার দোকানে কাজ পাবো, তাতেই যা হোক ক'রে চ'লে যাবে! গঙ্গার ধারে বেশ থাকবো।

ভিতর থেকে সহসা ন'মাসিমার গলার আওয়াজ এলো, বিশু ভেতরে চ'লে এসো, ওখানে তোমার থাকার দরকার নেই।

মা বললেন, আমার কথা শুনবে কেন, ওরা কেউ আপনাকে বিশ্বাস করে না,— যেতেও চায় না!

তবে আর কি করবো! যাই!—হ্যাঁ, আর এক কথা। তোমার মাসোহারার জন্যে আমি খুবই হাঁটাহাঁটি করছি। বোধ হয় হয়ে যাবে। মা বললেন, হ'লে বাঁচি, দিন আর চলে না!

ভিতর থেকে আবার ডাক এলো, বিশু!

মা তাড়াতাড়ি ভিতরে চ'লে গেলেন।—

হঠাৎ একদিন দু'জন পুলিশের লোক এসে সদর দরজায় দাঁড়ালো। তাদের গলার আওয়াজ কর্কশ। কিন্তু পুলিশের না'ম লোকে ভয় পায়, পাড়ায় আতঙ্ক দেখা দেয়, লোকের বাড়ীর জানালা দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ত্রাহি মধুসূদন!

এটা কি নোগেনবাবুর বাড়ী আছে? হামরা আসিয়েছি জোড়াবাগান পুলিশ থেকে।

ব্যাঘ্রের আবির্ভাবে হরিণের দল নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। তেতলার ছাদে গিয়ে ঠাকুরঘরের পাশে আশ্রয় নিয়েছি আমরা। কিন্তু ঘণ্টা দুই পরে জানা গেল, ন'-মাসিমার স্বামী পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ। খবরটা শোনামাত্র বাড়ীময় একটা ধিক্কার প'ড়ে গেল।

মামা বললেন, আমি পারবো না। আমার বিরুদ্ধে অনেক থানায় ডায়েরী লেখা আছে, আমাকে দেবে না জামিনে দাঁড়াতে,—আর কাউকে পাঠাও।

অবশেষে বড়দাদার জামিনে ন'মাসিমার স্বামী খালাস হলেন। কিন্তু তারপর? তারপর দিন তিনেকের মধ্যেই আসামী নিরুদ্দেশ! ফলে বড়দাদাকে নিয়ে পুলিশে টানাটানি। বাড়ীতে হাঁড়ি চড়া বন্ধ। কালীঘাটে জোড়া পাঁঠা মানত্। কাশীপুরের দিকে সর্বমঙ্গলার কাছে পুজো। সত্যপীরের সিন্নি। ঠাকুরঘরে শান্তিস্বস্ত্যয়ন, গ্রহপুজো। কিন্তু সকলের সম্মিলিত প্রার্থনার জোরে মাসখানেক পরে একদিন ন'মাসিমার স্বামী নিজের থেকে পুলিশে গিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন। চুরির অভিযোগ সত্য নয়,—তাঁর নাকি জীবনধারণের উপযুক্ত সুপ্রকট কোনো ব্যবস্থা নেই! আইনের চক্ষে সেটি দণ্ডনীয়।

তাঁর ছয়মাসের জেল হোলো! বড়দাদার বিপদ কাটলো। কিন্তু ন'মাসিমার শান্ত অবিচলিত চিত্তের কোনো বিকার আমরা দেখিনি। ন'মাসিমার গম্ভীর ব্যক্তিত্ব পাষাণ প্রতিমাকে স্মরণ করিয়ে দিত।

দিদিমা বলতেন, দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। খবরদার,—আমার বাড়ীর দরজায় যেন সে পা দেয় না। অমন জামাইয়ের মুখ দেখতে চাইনে। এমুখো হ'লে পাড়ার লোক ডাকবো।

মামা বলেন, তবে জামাইয়ের গুষ্টিকে বাড়াতে বেআইনী ধ'রে রেখেছ কেন?

তুই আমাকে আইন দেখাসনে খবরদার!—দিদিমা হেঁকে উঠলেন।

মামা বললেন, বেআইনী আটক রাখলে দু'বচ্ছর জেল। হাকিম অমনি এক কথায় খচাখচ! ঘুঘু দেখেছ, আর ফাঁদ দেখোনি! মায়ে-ঝিয়ে একদড়িতে বাঁধা পড়বে!

দূর হ, দূর হ, নিপাত যা……

তবে আমিও চললুম পুলিশে খবর দিতে। মনে রেখো হাতের ঢিল একবার ছুড়লে আর ফিরবে না!

মামা অবশ্য কোথাও যাননি, ঢিলও ছোড়েন নি। ভয় দেখিয়ে সেদিন তিনি আফিংয়ের পয়সা আদায় করেছিলেন।

সমগ্র ব্যাপারটা ভুলে যেতে প্রায় বছরখানেক সময় লেগেছিল। এমন সময় একদিন নীচের তলায় হৈ চৈ উঠলো, ন'মাসিমার স্বামী এসে দাঁড়িয়েছেন সদর দরজায়। ওঁর সঙ্গে পুলিশের ছোঁয়াচ আছে, সুতরাং আতঙ্কে সবাই থরহরি! বাড়ী নিশুতি, কেউ যেন নেই,—একেবারে শ্মশান!

সদর দরজায় গুমগুম শব্দ হচ্ছে অনেকক্ষণ থেকে। মেঝের উপর কান পেতে সেই মৃদু গম্ভীর আওয়াজ শুনছি। পুরুষ-হৃদয়ের সেই মর্মান্তিক ডাক কোনো পাষাণীর মনকে বিচলিত করছে না, কিন্তু এক নাবালকের সমগ্র প্রাণসত্তাকে মথিত ক'রে সেদিন অনর্গল অশ্রু এনেছিল। কেন সে অশ্রু? কী অর্থ তার? চিরকালের বিচ্ছেদ-বেদনা সেদিন কি তাকে অভিভূত করেছিল? মনুষ্যত্ব অপমানিত হচ্ছে—সেদিন কি অনুভব করেছিলুম?

দিদিমা শান্ত মৃদু কণ্ঠে মাকে ডাকলেন। বললেন, তুই না হয় একবার যা মা, কি বলে শুনে আয়। এ জ্বালা আর সইতে পারিনে। আমার মরণ হলেই মুক্তি পাই।

চোখের জল মুছে মা গেলেন। আমি গেলুম পিছনে পিছনে। মা গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়ালেন। জেলফেরত ব্যক্তিকে জীবনে প্রথম দেখলুম। চেহারাটা খর্বকায়, কিন্তু সৌম্যদর্শন! এমন কি সত্যকার সুপুরুষ বলা চলে। দৃষ্টি শান্ত, অমায়িক। মাথায় টাক, দাড়ি গোঁফ নেই। অত রোদে পথ হেঁটে এসে মুখখানা রাঙ্গা। দরজার সামনে কুলুঙ্গিতে ব'সে জোরে-জোরে নিঃশ্বাস টানছেন।

মুখ তুলে তিনি মিষ্টকণ্ঠে বললেন, তোমাদের দেখতে এলুম অনেকদিন পর, ছেলেমেয়েরা কই?

মা বললেন, তারা ত' নেই এখানে, কাশী গেছে।

কাশী!

হ্যাঁ, মেজদি এসে নিয়ে গেছেন সবাইকে। তারা সেখানেই থাকবে।

রাঙ্গা মুখে নৈরাশ্য ফোটে। মুখ তুলে তিনি তাকান মার দিকে। আশা, আশ্বাস, আনন্দ, বেদনা,—সেই চক্ষে কোনো কিছু কি দেখতে পেয়েছিলুম? কিছু কি ছিল কথা? কিছু ব্যাকুলতা?

কিন্তু তিনি আর বসতে চাইলেন না। হাঁপানির টান তাঁকে অস্থির ক'রে তুলছিল। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, দেখি যদি কাশী যেতে পারি, গেলে দেখা হবে।

হঠাৎ দিদিমা বেরিয়ে এলেন আড়াল থেকে। চাপা রুষ্টকণ্ঠে তিনি বললেন, তোমার আর সেখানে গিয়ে কাজ নেই, মহেন্দ্র—এবার থেকে ওদের তুমি মুক্তি দাও!

নতমুখে শান্তকণ্ঠে জবাব এলো, কিন্তু আমার ছেলেমেয়ে? আমার স্ত্রী?

দিদিমা এবার ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেন, ছেলেমেয়ের ভাবনা আর তোমাকে ভাবতে হবে না। আর যোগমায়ার কথা যদি বলো, সে তোমার মুখও দেখতে চায় না! বিশু, ভেতরে এসো।

মাকে নিয়ে দিদিমা ভিতরে গেলেন। রুদ্ধশ্বাস আর রুদ্ধকণ্ঠে এলুম মায়ের পিছনে পিছনে। উত্তাল প্রশ্নটা আমার অধীরকণ্ঠে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো,—মা? কোন্ মহেন্দ্র?

মা বললেন, হ্যাঁরে, সেই গল্পটা! ওই হোলো সেই আওয়াগড়ের কুমার মহেন্দ্র চক্কোত্তি! তোর ন'মাসির নাম যোগমায়া,—জানিসনে?

শ্রাবণের রাত্রে যে-রূপকথা শেষ হয়নি, এই চৈত্রের দুপুরে এই কি তার পরিণাম? সহসা সেখান থেকে ঠিক্‌রে বাইরে এলুম। ততক্ষণে যুবরাজ মহেন্দ্র চ'লে গেছে অনেক দূর। ক্ষিরী নাপতিনীর ঘর ছাড়িয়ে, চম্পটিদের বাড়ী পেরিয়ে অর্জুনের দোকান বাঁ-হাতি রেখে এগিয়ে গেছে সে। ছুটতে ছুটতে চললুম তাঁর পিছু পিছু। যোগাসনে ধ্যানস্থ তিনি দেবাদিদেব, ভিন্নরূপে তিনিই হলেন ভোলানাথ। তিনি সর্বহারা, নিরাশ্রয়। পরনে ছিন্নবাস, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি। তিনিচিরকালের পথিক, চির পরিব্রাজক। আমার স্বপ্নলোকের রাজভিখারীকে দেখতে চাই!

আমার আর্তকণ্ঠের আবেগ সামলাতে পারিনি সেদিন। ছুটতে ছুটতে গিয়ে পিছন থেকে ডাকলুম, মেসোমশাই! মেসোমশাই!

রৌদ্রদগ্ধ পথের উপরেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন। হাসিমুখে বললেন, কি রে? কেন এলি এত রোদে? কি বলছিস?

আপনিই কি যুবরাজ মহেন্দ্র? আওয়াগড়ের রাজা?

লোকে বলতো বটে। কিন্তু সে বেঁচে নেই!

আবার সেই প্রসন্ন সুন্দর হাসি! আমি পায়ের ধুলো নিলুম। তারপরে উঠে দাঁড়িয়ে হাতের মুঠোর থেকে একটি টাকা বা'র ক'রে বললুম, মা আপনাকে নিতে বললেন।

টাকাটা তিনি নিঃসঙ্কোচে হাত পেতে নিলেন। তারপর বললেন, তোর মাকে বলিস. আসছে মাস থেকেই তার পাঁচটাকা মাসোহারা ব্যবস্থা হয়েছে!—সবাইকে আশীর্বাদ ক'রে যাই! তোরা যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারিস।

বছর তিনেক পেরিয়ে গেছে তারপর। পুঁটিবাগানের প্রান্তে এক গলিতে দু'খানা ঘরে আমরা ভাড়া থাকি। সেদিন দশহরার যোগ। জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রে ক্লান্ত হয়ে মধ্যাহ্নকালে মা ফিরলেন গঙ্গার ঘাট থেকে। গঙ্গাজলের ফোঁটার মতো মায়ের চোখ বেয়ে জল নামছিল।

মহেন্দ্র মেসোমশাই মারা গেছেন। তাঁর অন্তিম ঘনিয়ে আসে কিছুদিন থেকে। কলকাতার এক চায়ের দোকানের বেঞ্চে ব'সেই তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর ছেঁড়া জামার পকেটে ছিল কাগজপত্র, তার থেকে জানা যায় তিনি রাজা উপাধি-ধারী এক মস্ত জমিদার। ভিন্ন পকেটে ছিল ন্যাকড়ায় বাঁধা একটি টাকা।

কলকাতার খোয়া-বাঁধানো রাস্তায় ঘড়ঘড় ক'রে লোহা-বাঁধানো চাকায় ঘোড়ার গাড়ী চ'লে যেতো। আমাদের গলি পেরিয়ে যেতো সেই গাড়ী সশব্দে—যেতো অনেক দূরে—মানিকতলার গির্জা পেরিয়ে, হেদোর মোড় ছাড়িয়ে। আমি চেয়ে থাকতুম

চারখানা ঘূর্ণ্যমান চাকার দিকে, ঘোড়ার পায়ের নীচে। সোনার বেনেরা চড়তো ল্যাণ্ডো, কিংবা ফীটন্,—তাদের ঘোড়াগুলি ভালো। তাদের পরনে ফরাসডাঙ্গা অথবা শিমলার কোঁচানো ধুতি, গিলেকরা, পাঞ্জাবি, পায়ে কালো রঙের পাম্-সু,—হাতের আঙুলে অনেকগুলি ঝলমলে পাথর-বাসানো আংটি। গায়ের রং তাদের ফর্সা, চোখগুলি একটু কটা। নিজেরা চালিয়ে যেতো গাড়ী—পিছনে থাকতো সহিস। কালো রঙের পাল্‌কি গাড়ীতে যেতো অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক, তাদের ছিল আবরু। পেতলের আংটা টানা গাড়ীর দরজা—ওরই মধ্যে ইঞ্চিখানেক ফাঁক থাকতো বায়ু চলাচলের জন্য। ওর মধ্যেই আমি দেখে নিতুম হীরের নাকছাবির হঠাৎ-ঝলকানি, কিংবা চুড়িপরা হাতের দোলা,—এবং তার পাশে হয়ত বা একজোড়া অসুরের মতো কালো গোঁফ। বড়রাস্তায় ট্রাম যায় ঘণ্টা বাজিয়ে—তাদের রং হোলো হলুদে আর খয়েরী মেলানো। একখানা ট্রামে অনেকগুলি দরজা, ভিতরে এধার থেকে ওধার অবধি ইস্কুলের মতন বেঞ্চিপাতা,—সকাল ন'টা দশটায় কিছু কিছু লোক চলাচল করে,—তারপর সারাদিন ট্রামগাড়ীতে তেমন আর লোক সমাগম নেই। ভাড়া তিন পয়সা আর পাঁচ পয়সা—ট্রান্সফার হোলো চার পয়সা আর ছ'পয়সা। এছাড়া যান-বাহনের মধ্যে ছিল পাল্‌কি,—তার আড্ডা ছিল গোয়াবাগানে।

নতুন বউরা আসতো পাল্‌কিতে। উড়ে বেহারারা হলুদে রঙের কাপড় আর নতুন গামছায় সাজগোজ ক'রে চারজনে নিয়ে যেতো পাল্‌কি কাঁধে তুলে। সুবিধা এই, অন্দরমহল থেকে সওয়ারী নিয়ে আবার অন্দরমহলে গিয়েই পৌঁছে দেওয়া। ভাড়া চার আনা, কিংবা চারজনে আট আনা। গিন্নীরা পাল্‌কি চ'ড়ে যেতেন এপাড়া থেকে ওপাড়ায়। বড়লোকের বাড়ীর মেয়েরা পাল্‌কি চ'ড়ে যেতেন গঙ্গাস্নানে,—একেবারে জলের উপরে গিয়ে পাল্‌কি নামাতো। সে আবরুর বিচিত্র দৃশ্য। জলের উপরে নামবে মেয়েরা,—চারধারে কাপড়ের পর্দা ধ'রে দাঁড়াতো চারজন। তারা নাকি অসূর্যম্পশ্যা, সূর্যের সঙ্গে তাদের দেখাশোনা নেই। সেকালের আবরু হোলো আভিজাত্যের চিহ্ন, একালের আবরু হোলো পরিহাসের বস্তু। পাল্‌কি কাঁধে নিয়ে বেহারারা চ'লে যেতো দূর থেকে দূরে। তাদের সম্মিলিত বোল্ শুনতে শুনতে মনটা তাদেরই সঙ্গে উধাও হয়ে যেতো। শরৎকালের আকাশ পূজার গন্ধে ভরো-ভরো, সোনা-ঝরানো রোদ পড়তো বাড়ীর উঠানে; কোথাও কোথাও আগমনী গান শোনা যাচ্ছে। পাল্‌কি চ'ড়ে বউ চলেছে বাপের বাড়ী। সঙ্গে তোরঙ্গ আর ক্যাশ-বাক্স,—ওতে থাকতো গহনা। বউদের চুলে ফুলের গন্ধের আভাস—চুলের ফিতে আর কাঁটায়, সিঁদুর কৌটায় আর আলতায় থাকতো শ্বশুরবাড়ীর গন্ধ,—থাকতো মৃদু মোহের আবেশ। বাপের বাড়ীতে মেয়েকে পৌঁছে দিয়ে পাল্‌কির বেহারারা পাত পেড়ে উঠানে ব'সে যেতো। শ্বশুরবাড়ীর ঝি-বউকে পৌঁছে দিয়ে পূজোর 'বিদায়' নিয়ে হাসিমুখে ফিরতো।

মোটরগাড়ী দেখা দিয়েছে কলকাতায় খানকয়েক। তখন ওর নাম ছিল হাওয়া-গাড়ী। রবারের ফানুস্টা টিপলেই বিকট আওয়াজ হয়,—সেই আওয়াজ পেয়ে ছুটে

আসে পাড়ার ছেলেমেয়েরা সদর দরজায়, আর সঙ্গে সঙ্গে দোতলার জানালাগুলো যায় খুলে। পাড়ার মধ্যে মোটরগাড়ী ঢুকলে লোকে লোকারণ্য,—বুড়ো গঙ্গার মা ভয় পেয়ে তার ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিত। কার্তিক স্যাকরার ঘরের ঠুকঠাক আওয়াজ থেমে যেতো। কাওরাদের বস্তিতে দীপু গুণ্ডার এক মেয়েছেলে থাকতো,—তার নাম লছমী। ছাপরা জেলায় নাকি তার বাড়ী। সেই স্বাস্থ্যবতী মেয়েটা একখানা ফিনফিনে বৃন্দাবনী শাড়ী কোনোমতে কোমরে জড়িয়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়াতো বস্তির মুখে হাওয়াগাড়ী দেখার জন্য। আমার চোখে পড়তো মেয়েটার কপালে আর হাতে সবুজ রঙের উল্‌কি,—হাতে দুগাছা কাচের চুড়ি, পান-জর্দায় টকটকে মুখ, হাত আর পায়ের আঙুলে মেহেদীপাতার রংলাগা। দীপু যখন কেরোসিন তেল বিক্রি করতে যেতো, লছমী তখন আলাপ জমাতো এপাশে ওপাশে। কোনো কোনোদিন সন্ধ্যার পর মার খেতো মেয়েটা আগাপাছতলা,—তার কোনো কারণ আমাদের জানা ছিল না। চেঁচামেচি আর কান্নাকাটির শব্দে দিদিমা একসময়ে বিরক্ত হয়ে বলতেন, কালকেই আমি থানায় খবর পাঠাবো। রোজ রোজ এই কেলেঙ্কার আর বরদাস্ত হয় না। ওরে, উত্তরদিকের জানালা দুটো বন্ধ ক'রে দে ত' ?

তবু কান্নার আওয়াজ আসতো অনেক রাত পর্যন্ত। সে-কান্না মেয়ের, নারীর, জননী ও ভগিনীর। সেই কান্না শুনে ঘুম আসতো না; সেই কান্না ঘুমের মধ্যেও আমার গলায় ফুঁপিয়ে উঠতো। স্বপ্নে দেখতুম, ভয়ানক মার খাচ্ছি মায়ের হাতে,—সর্বাঙ্গে দড়া দড়া আমার দাগ! স্বপ্নের কাতরোক্তিতে নিজেরই ঘুম একসময়ে ভেঙে যেতো! চেয়ে দেখতুম,—চোখ খুলে যেতো। নিঃসাড় ঘুমে অচেতন সবাই। ভগ্ন জরাজীর্ণ বাড়ীর আনাচে কানাচে বিড়াল কাঁদে। কান্না শুনতুম দেওয়ালের ফাটলে, বেলগাছের নীচে, ও-মহলের শূন্য ঘরগুলির আশে পাশে। কে যেন স'রে যেতো, যেন ছায়ামূর্তি ন'ড়ে যেতো, বাতাসের সরসরানি, জানালার খ'রে খুটখাট, ছাদের উপরে পায়ের শব্দ, বেলগাছের আগডালে বেম্মদত্যির আনাগোনা, শাঁকচুন্নির শাড়ীর হাওয়া,—আর নীচের তলায় কাটা ছাগলের রক্তাত মুণ্ডু নিয়ে পিশাচের দাঁতের কড়মড়ি।

শরীরের রক্ত চলাচল থেমে যেতো। চোখ বুজতুম অন্ধকারে।

সকালে উঠে দেখতুম সমস্তটা নির্ভুল বাস্তব,—ভ্রম, ভ্রান্তি কোথাও কিছু নেই। সেই প্রাচীন অনাবিষ্কৃত দিগন্ত, অগ্নিকোণ থেকে সূর্যের সেই আবির্ভাব,—তিনকড়িদের বাড়ীর ধার দিয়ে সেই দইওয়ালা হেঁকে চলেছে! অর্জুন মুদির দোকান পেরিয়ে সে চ'লে গেল কাঁসারিপাড়ার দিকে, কিংবা বাহির শিমলায়।

কলকাতাটা কত বড়—ভাবতুম মনে মনে। কোন্ দিকে ঠনঠনে আর বউবাজার? কোন্ দিকে বা ধর্মতলা? একা একা কি যাওয়া যায় জোড়াসাঁকো আর মুর্গিহাটা, কিংবা সেই পাথুরেঘাটা? শ্যামবাজার আর রাধাবাজার? উল্টোডিঙ্গি আর পায়রা-টুনি? বালীগঞ্জ আর বকুলবাগান? চুপ ক'রে থাকতুম। কে নিয়ে যাবে? কবে আবিষ্কার করতে পারবো এক একটি পথ? কবে হাঁটতে হাটতে চ'লে যাবো জানা

থেকে অজানায়? কিন্তু যাওয়া সহজ নয়। পথে নামলেই ধরবে সেই ডাইনী,—তার নাম কাগী। এই পথ দিয়ে যায় সে সকালে দুপুরে। বাঁকা চোখে সে তোমার দিকে তাকিয়ে গেলে তোমার মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ দেখা দেবে, রক্ত উঠবে মুখ দিয়ে! কাগী আসছে সামনের পথ দিয়ে,—অমনি সব বাড়ীর দরজা বন্ধ, ছেলেমেয়েরা গিয়ে লুকিয়েছে খাটের তলায়। কাগীর আকর্ষণ বড় ভয়ানক,—দিনের বেলায় সে ডাইনী; রাত্রে সে হয়ে ওঠে পিশাচী। শুকনো খড়ের মতন তার চুল, গরুড়ের মতন নাক, চোখদুটো আগুনের ডেলা, কাঠকয়লার মতো বর্ণ, হাত দুখানা লোহার বরগার মতন শক্ত আর সরু। কাগীকে চোখে দেখলে আর রক্ষা নেই। ছটফট ক'রে মরতে হবে মুখ দিয়ে রক্ত উঠে,—পাগল হয়ে কামড়াতে ইচ্ছে হবে সবাইকে। দিনের বেলায় এই হোলো সকলের বড় ভয়। সন্ধ্যায় আসে রাক্ষসী ছেলে-ভয়-দেখানো। সদর দরজায় এসে সে দাঁড়ায়। মুখের উপরে মস্ত বড় মুখোশ,—করাল তার চোখ, লকলকে রক্তাক্ত জিহ্বা, সর্বাঙ্গে কালো আচ্ছাদন, মস্ত মস্ত দুখানা টিনের হাত,—মাথায় দানবীয় পরচুলা। রেড়ির তেলের আলোটা তার দিকে তুলে ধ'রে সবাই দেখে,—আর বুকের মধ্যে গুরুগুরু কাঁপন লাগে। বিস্তৃত দুখানা হাত তুলে ছায়ান্ধকারে সেই রাক্ষসী যখন আলুথালু নাচে,—তখন সে প্রলয় তাণ্ডব,—রক্তে রক্তে ঝনঝনিয়ে ওঠে আতঙ্কময় অস্থিরতা, অন্ধকার নিশীথিনী যেন বিভীষিকার ছায়া ছড়িয়ে দেয় সর্বত্র। অবিশ্বাস্য হয়ে ওঠে অস্তিত্বের চারিধার।

হঠাৎ পাশ থেকে আমার পিঠে ধাক্কা পড়ে, আর অবাধ্য হবি কখনো? কেঁদে বলতুম, না।

না ব'লে কোথাও চ'লে যাবি?

না।

পাশ থেকে বড় বোন বলতো, আর পা-জামা নোংরা করবি?

কম্পিতকণ্ঠে জানাতুম—না।

তারপর আড়ালে আমাকে সরিয়ে এনে রাক্ষসীকে একটি অথবা দুটি পয়সা দেওয়া হোতো। উদ্দেশ্য—ও যে প্রকৃত রাক্ষসী নয়, এ যেন আমি জানতে না পারি। ও যে একটা পুরুষ, এটা যে ওর সন্ধ্যাবেলার পেশা,—এটা জানতে পারলে পাছে আমার ভয় ভেঙে যায়! অবশেষে লোকটা মাথার ওপর মুখোশটা তুলে দিয়ে টিনের হাত দুখানা খুলে নিয়ে একসময়ে চ'লে যেতো।

কোনো কোনো সন্ধ্যারাত্রে ভিন্ন আকর্ষণ ছিল। মেয়েদের মতো ক'রে কাপড়পরা, মুখে একমুখ লম্বা দাড়ি, হাতে তেলের প্রদীপের পাত্র,—দরজায় এসে আওয়াজ দিত দীর্ঘকণ্ঠে—ইয়া পীর, মুশকিল আসান!

লোকটা শান্ত, আত্মসমাহিত। চোখদুটো অচঞ্চল, ললাট মসৃণ রেখাহীন, মুখ প্রসন্ন গম্ভীর,—যীশুখৃষ্টের ছবিখানা মনে প'ড়ে যেতো। চাহনি যেন ক্ষমাসুন্দর, ভাষণ অতি মৃদু,—দাঁড়াবার ভঙ্গীটি যেন তপোবনের মুনির মতো। পীরের জন্য ভিক্ষা দাও—ভালো; না দাও—কোনো নালিশ নেই। পথে নেমে আবার সে

নারীসুলভ কণ্ঠে ডাক দিত—ইয়া পীর, মুশকিল আসান! বহুদূর থেকে যেন সেটা সঙ্গীতের মূর্ছনার মতো কানে এসে বাজতো অনেক রাত পর্যন্ত। প্রদীপের পাত্রের সেই আলো বহুদূরে গিয়ে মিলিয়ে যেতো। সেই বিলীয়মান আলো আমার মনকে কতবার টেনে গেছে তার পিছু পিছু। চাইতুম একটা মুক্তি। সে-মুক্তির চেহারাটা জানা ছিল না, তার কল্পনাটাতেও ছিল একটা দুর্ভাবনা,—তবু ছিল প্রবল একটা পিপাসা বাঁধন ডিঙিয়ে যাবার, সমস্তটাকে অস্বীকার ক'রে ছোটবার। বাইরেটা বোবা, মুখের ভাষা তখনও এসে পৌঁছয়নি, যুক্তি আর বিশ্লেষণের বুদ্ধি তখনও কাঁচা,—কিন্তু অন্তর্লোক কাজ ক'রে চলেছে। ভয় কুসংস্কার, প্রচলন, অন্ধতা, অনাচার,—সমস্তর বিরুদ্ধে অন্তর্দ্রোহ চলছে,—বাইরে তার অভিব্যক্তি নেই।

শ্বশুরবাড়ীর থেকে মেয়ে এলো বাপের বাড়ীতে,—ঘাড়ের কাছে তার বঁটির ক্ষত-চিহ্ন; সে নাকি আত্মনাশ করার চেষ্টা করেছিল। স্বামী, শাশুড়ী ও ননদদের কদাচারের সে সব কাহিনী শুনে যাওয়াটা ক্লান্তিকর। কোন্ মাসতুতো ভাই কবে এসে বয়স্থা কুমারী শিবরাণীকে ডেকে নিযে গেল ছাদের চিলেকোঠায়,—সেখানে কী যেন বলাবলি,—তারপর শিবরাণী নীচে নেমে এলো কাঁদতে কাঁদতে। পরনে শান্তি-পুরী কালোপাড় শাড়ী, দপদপ করছে গায়ের রং, নাকটা ঈষৎ খাঁদা,—বেশী বয়স হোলেও মেয়েটার তখনও বিয়ে হয়নি। গৃহস্থঘরের মেয়েমহলে তখনও জামার চলন হয়নি,—তখনও পেটিকোট ব্যবহার ছিল অভব্যতা, সকলের সামনে চুল খোলাটা ছিল অসভ্যতা; আয়নার আসনে এসে কেউ দাঁড়ালে তার চরিত্রের ওপর দাগ প'ড়ে যেতো। কুটুম্বর মেয়ে শিবরাণীর বেলা এ-সব শাসন কিন্তু চলতে পারতো না। আবার দেখি একদিন জামাই এলো কোন্ শনিবারে। রবিবারটা থাকবে,—যাবে সেই সোমবারে। ভরসন্ধ্যাবেলায় স্ত্রীর চোখে কান্না; জামাই তাকে কী যেন অপমান ক'রে চ'লে গেছে। ব'লে গেছে আর কোনোদিন অমন স্ত্রী মুখ দর্শন করবে না। বাড়ীতে শোকের ছায়া। দিদিমা কাঁদতে লাগলেন। একদিন যেন কবে বাড়ীর বধূকে দেখতে এলেন বধূর পিতা—তিনি কিছু শিক্ষিত, কিছু বা অবস্থাপন্ন। তাঁর সামনে বধূর আচরণ নিয়ে সমালোচনা উঠলো,—সঙ্গে সঙ্গে বেধে উঠলো কদর্য কচকচি আর বাক্‌বিতণ্ডা। বধূর পিতা একদিকে,—আর একদিকে পরস্পর-মার-মুখী জনতা। ভদ্রলোক নতমুখে সেই যে গেলেন, এ বাড়ীতে আর এলেন না কোনো-দিন। বধূনির্যাতনটাও প্রচলিত ব্যবস্থার একটা অঙ্গ ছিল।

বধূ নির্যাতন? হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল সেই আনন্দময়ীর কথা। প্রায় ত্রিশ বছর আগে সেই বধূটি প্রকাশ করতে গিয়েছিল স্বকীয়তা আর মৌলিক বিচারবুদ্ধি। স্বভাব-চরিত্রে তার ছিল আভিজাত্য—এই ছিল অপরাধ, তার চেয়ে বড় অপরাধ,—লেখাপড়ার

দিকে তার ঝোঁক ছিল। ফলে স্বামী, শাশুড়ী আর ননদ একদিকে,—অন্য দিকে সে একা। বলা হোলো, তুমি যদি মানিয়ে চলতে না পারো, বাপের বাড়ী চ'লে যাও। আনন্দময়ী বললে, যাবো না—এখানেই আমার অধিকার। আমার স্বামী, আমার ঘরকন্না, আমার শাস্ত্রসম্মত দাবী—

আনন্দময়ীকে অবরোধ ক'রে রাখা হোলো তেতলার ছাদের পায়রার খোপরে। সর্বাঙ্গে তার আঘাতের ক্ষতচিহ্ন। সেখানে পানীয় দেওয়া হোতো না। সেখানে সে ছিল চার মাস,—তার মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দিল। হঠাৎ এক প্রতিবেশী সন্দেহবশে খবর পাঠালো থানায়। এই সংবাদে সমগ্র বাংলাদেশের হৃদয় বেদনায় উত্তাল হয়ে উঠলো। স্বামী, শাশুড়ী ও ননদকে কারাগারে যেতে হোলো।

মনে পড়ছে সেই সেকেলের স্নেহলতাকে। দরিদ্র পিতার সুশ্রী কন্যা। কিন্তু কন্যাদায়ে অনেক টাকা লাগে যে; অত বড় মেয়ের বিয়ে হয় না,—আত্মীয়-কুটুম্ব-মহলে আর পাড়াপল্লীর আসরে ঢি ঢি নিন্দা! অবশেষে একদিন স্নেহলতা নিজের শরীরের উপর কেরোসিন ঢেলে তার ওপর একটি দেশলাইর কাঠি ধরালো। সে যখন পুড়ে ছাই হয়ে গেল, তখন সমস্ত দেশের লোক সেই ঘটনায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো অনেক দিন। স্নেহলতা, আর আনন্দময়ী,—ওরাই নাকি আধুনিক নারী-আন্দোলনের প্রথম সাড়া জাগিয়েছিল।

উর্মিলাদিদি এলেন ছেলেপুলের সঙ্গে স্বামীকে নিয়ে। তাঁরা নাকি পূবদেশের কোন্ জমিদার। উর্মিলাদির গায়ে একগা গয়না—দাঁড় আর কাঁড়ির হার, হাতের বাজুতে মোটা মোটা ফারফোরের তাগা, দুই হাতে একরাশি সোনার চুড়ির সঙ্গে বালা আর ব্রেসলেট, কানে মস্ত মাকড়ি, কোমরে চন্দ্রহার, মাথায় সোনার ফুল আর টায়রা, নাকে চেন্‌টানা নথ, আর পায়ের আঙুলে চুট্‌কী। বড়মানুষের আবির্ভাবে বাড়ীর সবাই তটস্থ। উর্মিলাদি ভয়ানক বদ্‌রাগী আর আত্মাভিমানী,—পান থেকে চুণ খসবার যো নেই। ছেলে দুটি বেপরোয়া। বড়টি জুতো প'রে যায় ঠাকুরঘরে, কিংবা ভাঁড়ারে, কিংবা রান্নাঘরে। স্বামী হলেন হরিশবাবু। তিনি আমাকে দেখে আঙুল দেখিয়ে কাকে যেন বললেন, এটা সেই বাপখেগো ছেলেটা না? যা, আমার জুতোটা বুরুশ কর্ দেখি?

তথাস্তু। ফরমাসের গন্ধ পেয়ে আনন্দে ডিগ্‌বাজী খেয়ে চললুম। কী আনন্দ বড়লোকের তাঁবেদারিতে, কী উল্লাস ধনীর আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ানোয়। যা খেতে পাইনে, যা চোখে দেখিনে—তারই ছিটেফোঁটা পেয়ে যাই কপালঠুকে। গন্ধতেলের ফোঁটাটা, বড় মাছের কাঁটাটা, দুধের তলানি, দইয়ের শেষদাগটুকু, পানতুয়ার ভাঙ্গা অবশেষ,—ওই পেয়েই মাঝে মাঝে ছাগলছানার মতো অহেতুক আনন্দে ঘুরপাক খেয়ে

আসি। সুপ্রসিদ্ধ জমিদার হরিশের জন্য বিড়ি কিনে আনা, পানের ডিবে এগিয়ে দেওয়া, গেঞ্জিতে সাবান মাখানো, কাপড়খানা শুকালে হাতের কাছে এনে গুছিয়ে দেওয়া। নাপতে পাওয়া যায় কিনা, জুতোশেলাইয়ের মুচি যাচ্ছে কিনা, স্নানের জন্য তেল সাবান গামছা, স্নানশেষে আয়না চিরুনী, খেতে যাবার আগে পায়ের কাছে চটিজোড়াটা। দেখেশুনে সেজমাসীমা বললেন, ধন্যি ছেলে! ওর চোখ আছে দ্যাখো সব দিকে। দিনরাত ফাইফরমাশ খাটছে,—মুখে রা নেই!

ঊর্মিলাদির যাবার দিন এলো। গতকাল ওর বড়ছেলেটা পাথরের টুকরো ছোড়াছুড়ি করতে গিয়ে আমার কপালে একটা পাথর এসে ঠাই ক'রে লাগে। চোখদুটো একেবারে অন্ধকার। কপাল ফুলে ওঠে নীল হয়ে,—হয়ত বা পাকবে। কিন্তু বহু চেষ্টায় আঘাতটাকে আমি লুকিয়ে রেখেছি, নচেৎ মারপিটের অভিযোগটা আমার বিরুদ্ধেই আসবে জানতুম।

ঊর্মিলাদিদিরা গাড়ীতে ওঠবার আগে আর একটা আহারাদির ঘটা লেগে গেল। আমি বিস্মিত! এই ত' একটু আগে ও'দের মধ্যাহ্ন-ভোজনপর্ব শেষ হয়েছে! ও'রা বড়লোক, জমিদার,—ক্ষুধা কি তাই এত বেশী?

গাওয়া-ঘিয়ের গরম গরম লুচি, গলদা চিংড়ীর কালিয়া, বড় বড় বেগুন ভাজা, লেবুর গন্ধ মাখানো উৎকৃষ্ট ছানার সন্দেশ,—তার পাশে টাট্‌কা রসে ফেলা একহাঁড়ি পানতুয়া।

আমার দিকে ফিরে কে যেন বললে, যা, চট্‌ ক'রে একখানা ঘোড়ার গাড়ী ডেকে নিয়ে আয়,—এখানে দাঁড়াসনে।

ঘোড়ার গাড়ী ডেকে আনতে লাগলো দশ মিনিট। কিন্তু ভিতরে এসে খবর দিতেই ঊর্মিলাদি বোধ করি হাত বাড়িয়ে আমার হাতে কিছু মিষ্টান্ন দিচ্ছেলেন। তৎক্ষণাৎ বাধা দিলেন সেজমাসিমা! —থাক্‌ থাক্‌, ওরা রয়েছে কল্‌কেতার সদরে... বাড়ীর দোরে ভালো ভালো মিষ্টির দোকান...ওদের ভাবনা কি? কত জুটে যাবে! তোর ছেলেদুটোকে বেশ ক'রে খাওয়া দিকি?—নে, খা বাবা!

আমার দিকে ফিরে সেজমাসিমা সহাস্যে বললেন, সেয়ানা ছেলে দ্যাখো...মুখ ফিরিয়ে নেছে। বলি, যা দিকি; সবাই মিলে তোরঙ্গ আর বাক্স এনে গাড়ীর ছাদে তোল্‌!...যা, আমি তোকে পয়সা দেবো, দই কিনে খাস!

কপালের কালশিরাটা অনেক দিন পর্যন্ত মেলোয়নি।

দিদিমার বাড়ীতেই আমরা থাকতুম, কিন্তু তাঁর ওমহলে ভাড়াটে জুটতো না অনেক সময়ে। লোকে দেখে যেতো, আসবো ব'লে চ'লে যেতো। শূন্য মহলে জঞ্জাল উড়ে বেড়াতো সারাদিন, দুপুরের রোদে বেলগাছের ঝরাপাতার সরসরানি শোনা

যেতো, গোলা পায়রা এসে হয়ত বাসা বাঁধতো, হয়ত বা বিড়ালে কেঁদে যেতো কোনো কোনো রাত্রে। দিনের বেলায় ওমহলটা ছিল আমাদের দুরন্তপনার অবারিত ক্ষেত্র। জঞ্জালের মধ্যে খুঁজে পেতুম ঝরা পালক, কিংবা পুরনো তারিখের চিঠি, কিংবা ভাঙ্গা কাঁচের চুড়ি। বড়জোর পেয়ে যেতুম সীস-ভাঙ্গা পেন্সিলের টুকরো। আমাদের আনন্দ, কিন্তু বাড়ীর লোকের দুর্ভাবনার শেষ নেই। কলকাতার মাঝখানে ভদ্র পল্লীতে এই দোতলা বাড়ী, ছ'খানা ঘর মস্ত উঠান, দুটো চালাঘর—ভাড়া মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা। ভাড়াটে না পেলে মালিকের অসুবিধে,—টেক্স খাজনা গুণতে হয়। সুতরাং দিদিমা বড়ই বিপন্নবোধ করতেন। ভাড়া বন্ধ হোলে হাঁড়িও যে বন্ধ হবে!

অবশেষে একদিন একটি লোক এসে জানালো, তাঁরা নীচের তলাকার একটি ঘর ভাড়া নিতে পারেন পাঁচ টাকায়। থাকবেন স্বামী-স্ত্রী আর একটি বছর আষ্টেকের মেয়ে।

মামা বললেন, পাঁচ টাকা! কলকাতায় গোয়ালঘর পাওয়া যায় না পাঁচ টাকায়। আট টাকার কম আমি রাজী নই। অতঃপর অনেক দর কষাকষির পর দিদিমা রাজী হলেন সাত টাকায়। ভাড়াটে-কর্তা মামার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। লোকটা বুঝি কালীঘাটের ওদিকে মাটির পুতুল আর টিনের খেলনা বিক্রি করতে যায়। এর আগে ওরা ছিল সাবেক কোন্ বাড়ীতে; সেখানে নাকি বাড়ীওয়ালার অনাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওরা চলে আসতে বাধ্য হয়। কথাটায় দুঃখের সুর ছিল, সুতরাং দিন তিনেকের মধ্যেই ওরা যেন আমাদের আপন হয়ে গেল। আমরা ছোট ছোট কয়েকজন ভাই বোন খেলার সঙ্গী পেয়ে গেলুম ওই ছোট মেয়েটাকে। মেয়েটার নাম নণ্টু। নণ্টু বড় সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী,—কিন্তু তার দোষ ছিল এই, সে সহজে জামা-কাপড় পরতে চাইতো না। এজন্য তার লাঞ্ছনা আর তিরস্কার হোতো অনেক সময়ে। কিন্তু নণ্টু ছিল অবাধ্য, তাকে বাগ মানানো কঠিন। সুতরাং আমাদের এ মহলে সে যখন ছিট্‌কে আসতো, তখন এদিক থেকেও তার উপর তাড়না হোতো। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা কোনোটাতেই তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

আমরা কয়েকজন নণ্টুর মার খুব প্রিয় ছিলুম। মহিলাটি আমাদের মা-মাসিমাদের চেয়ে অনেক ছোট, কিন্তু অত্যন্ত শান্ত। ঘোমটাটানা থাকতো সব সময়ে,—আমরা সেই ঘোমটার নিচে দিয়ে দেখলুম তাঁর বড় কালো চোখ আর পরিচ্ছন্ন দাঁতের মিষ্ট হাসি। কাছে গিয়ে দাঁড়ালে বলতেন, এসো বাবা এসো, তোমার জন্যে কমলালেবু রেখেছি—খাও গে।

আড়ষ্ট হয়ে বলতুম, নণ্টুকে দিন্ না লেবু।

নণ্টু? ও পোড়ারমুখীর কথা আর বলো না। ভাত ছাড়া কিচ্ছু খায় না, তাও আবার নুন দিয়ে। ভাতের সঙ্গে আর কিছু ছোঁয় না। পোড়ারমুখী ভাত খায় চার পাঁচ বার।

নণ্টুর মা পুনরায় বলতেন, গরীবের ঘরে নুন-ভাত খাওয়াই ত' সুবিধে বাবা।

সুমধুর সঙ্গীতের মতন তিনি কথা বলতেন, কিন্তু সেদিন তাঁর সব কথার মানে বুঝতুম না। শুধু মনে হোতো, এ মেয়ের জন্মানো উচিত ছিল কোনো বড় ঘরে, এ বাড়ীর এই আবহাওয়ায় ওঁকে যেন মানায় না।

ছোট ছেলেমেয়েরা নণ্টুর প্রতি আকৃষ্ট ছিল নানা কারণে। নণ্টু বেলগাছের ডালে উঠে কাকের বাসা ভেঙে দিত, নয়ত চড়াই পাখী ধ'রে তার পায়ে দড়ি বেঁধে ঘোরাতো। তার ভয়ে কুকুর বিড়াল পাড়া ছেড়েছিল। আবার কখনো বা নেংটি ইঁদুর ধ'রে কাক-চিলকে ডাকতো তারস্বরে। তার মা একসময়ে হয়ত পরিয়ে দিত কালো ফুল-তোলা এক টুকরো বৃন্দাবনী শাড়ী, আর সে সেখানা কোমর থেকে খুলে হাতে জড়ো ক'রে নিয়ে উঠোনে গান গেয়ে বেড়াতো। আশ্চর্য, গানের গলা তার অতি মিষ্টি ছিল,—কিন্তু বেহায়া মেয়ে ছাড়া কেউ গান গায়?—সুতরাং আমাদের ওপর নিষেধ ছিল আমরা যেন নণ্টুর সঙ্গে না মিশি। দিন দিন সে যেন হয়ে উঠলো মূর্তিমতী এক সমস্যা,—সে ভয় পায় না, ভয় করেও না কাউকে। মার খায়, কিন্তু মুখের হাসি কমে না। তার এই সব চালচলনে এবং এই প্রকার স্বেচ্ছাচারের চেহারা দেখে আমার ভিতরের অত্যুগ্র বিদ্রোহী বালক পরম কৌতুকবোধ করতো। সকলের চোখ এড়িয়ে আমি গিয়ে দাঁড়ালাম তার পাশে,—সে আমাকে শেখাতো কেমন ক'রে ভাঙ্গা পাঁচিলের উপর থেকে উঠোনে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হয়, কেমন ক'রে ভাঙ্গতে হয় বেলগাছে কাকের বাসা। মেয়েটার চুল ছিল ছোট ছোট। মুখে চোখে ও সর্ব্বাঙ্গে কেমন এক প্রকার সোঁদা বন্য গন্ধ! চাহনিটা যেন নেশা ধরানো, তার সঙ্গে অবাধ স্বাধীনতার হাওয়া। সে যদি ধ'রে টানতো কখনো, ঠিক যেন অকূলে ভেসে যাওয়ার ভয় হোতো। শাসনের ভয়ে যখন আমার বুকের ভিতরে কাঁপতো, তখন সে আমাকে বাইরের থেকে ডাক দিত ইশারায়,—বুকের ভিতর আবার কেঁপে উঠতো—পাছে তার দুর্বার আকর্ষণে শাসন-শৃঙ্খল ছিড়ে বেড়িয়ে পড়ি। তার জ্বালায় শিশুপাঠ্য কথামালায় আমার মন কিছুতেই বসতে চাইতো না।

দিনের বেলা নণ্টুর মায়ের রান্না চড়তো না, কেন না রান্নার উপকরণ জুটতো না দিনেমানে। দারিদ্র্য তার কারণ। তাঁর কাজ ছিল শান্ত মনে পুরনো কাপড় শেলাই করা, কিংবা রামায়ণখানা নিয়ে একমনে ব'সে থাকা,—কিংবা অমনি একটা কিছু। সন্ধ্যার সময় যখন রেড়ির তেলের আলো জ্বলতো তাঁর দরজায়, মধ্যে দেখতুম নণ্টুর বাবা আসতো পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে। তখন ভাত চড়াতো। সেই ভাতের গন্ধে জেগে উঠতো নণ্টু। একসময় হয়ত সেই লোকটি দীর্ঘ মিষ্টকণ্ঠে দেহতত্ত্বের গান ধরতো,—'মন যে আমার পথ হারালো মাগো—তোমার চরণ স্মরণ করি।'

লোকটার গলা ছিল মিষ্ট,—সেই গলায় সংসার-বৈরাগ্যের একটা করুণ আবেদন ছিল। এধার থেকে দিদিমা সেই গান শুনে সজল চক্ষে ব'লে উঠতেন, সবাইকে রেখে কবে যাবো মা? কাশী—কাশী—বিশ্বনাথ!

লোকটা কিন্তু সূর্যোদয়ের আগেই উঠে নিজের কাজে চ'লে যেতো। দিনের বেলায় কোনোদিন আমরা তাকে স্পষ্ট করে দেখিনি। পুতুল বেচে তার যা রোজগার হয়

তাতে দু'বেলা অন্ন জোটে না, তার ওপর আছে ঘরভাড়া, আছে কাপড়চোপড়,—কিন্তু সকাল-সন্ধ্যা তার অধ্যবসায় অসীম।

দিদিমা বলতেন, মুখে ভাত তুলবো কেমন ক'রে মা? মেয়েকে নিয়ে বউটি উপোস ক'রে রইলো—এতে যে ভিটের অমঙ্গল! দু'কুনকে চাল-ডাল তোরা দিয়ে আয় মা। এমন ভাড়াটের কাছে ঘরভাড়াই বা নেবো কেমন ক'রে?

নন্টুর মাকে ডাকা হোতো, কিন্তু তিনি কিছুতেই আমাদের দান গ্রহণ করতেন না। বরং হাসিমুখে বলতেন, আপনারা ব্যস্ত হবেন না, আমার হাঁড়িতে পান্তা ভাত আছে।

আমি দেখতুম সহাস্য মুখে তাঁর কী দৃঢ়তা। সেই শান্ত হাসির কাছে আমাদের দাক্ষিণ্য যেন ছোট হয়ে যেতো। সেজমাসিমা বলতেন, বউটার অংখার দেখছ? রক্তের তেজ আছে বৈকি, নৈলে উপোস করে কিসের জোরে?

দিদিমা চুপ ক'রে থাকতেন। আমরা লুকিয়ে গিয়ে নন্টুকে একবাটি ভাত খাইয়ে আসতুম। অত দারিদ্রের মধ্যেও মেয়েটাকে কোনে দিন মলিন কিংবা বিমর্ষ দেখা যেতো না। বড় কঠিন মেয়ে। আমাদের এ মহলে ছিল কলরব, কলহ আর কোলাহল। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত হৈচৈ লেগে থাকে। দারিদ্রের থেকে জন্ম চিত্তক্ষোভের, তার থেকে নিত্য অসন্তোষ আর অশান্তি। মামার বিকৃত চীৎকার, দিদিমার কটূক্তি, মামীর আচরণ নিয়ে কদর্য কোলাহল,—সমস্তটা মিলিয়ে আবহাওয়াটা থাকতো দূষিত। ও মহলটা কিন্তু সবসময়ে শান্ত—,সেখানে যেন তপোবনের তপস্বিনী ব'সে থাকতো আত্মসমাহিত হয়ে। আমি এক একবার আড়াল থেকে নন্টুর মাকে দেখে আসতুম। হয়ত ঘরে আলো জ্বালা। নন্টু ঘুমিয়ে। আর নন্টুর মা বসে রয়েছেন আলোটার দিকে চেয়ে,—তাঁর চক্ষের পলক পড়ছে না। হয়ত বা চোখের পাতায় থাকতো জলের আভাস, কিংবা স্তব্ধ হয়ে ব'সে থাকতেন কোনো জটিল ভাবনা নিয়ে। আমিও চেয়ে থাকতুম তাঁর দিকে একাগ্র চক্ষে, চেয়ে-চেয়ে আত্মবিস্মৃত হতুম, কিন্তু কি দেখতুম আজকে আর আমার মনে পড়ে না।

অত ঘনিষ্ঠতা, অতদিনের আনাগোনা আর ঘরোয়া বন্ধুত্ব,—কিন্তু সহসা একদিন যেন তার অবসান ঘটলো। ভিতরে ভিতরে একটা অসন্তোষ যেন রি রি ক'রে উঠলো। আমাদের 'পরে নির্দেশ এলো, ওমহলে যেন আর না যাই,—নন্টুর সঙ্গে যেন আর ব্যক্যালাপ না করি। চাপা চাপা কথাবার্তা আর কানাকানিতে ভ'রে উঠলো আমাদের এ মহল। এক জায়গায় এক এক দলের জটলা ব'সে গেল।

এ কথা চাপা রইলো না যে, ওরা মন্দ লোক। যে লোকটা সকালসন্ধ্যা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নির্বিরোধ পরিবার প্রতিপালন করে সে লোকটা নাকি শয়তান। যে নন্টু আমাদের সকলের নিত্য প্রিয় সঙ্গী—যার কলহাস্য আর আনন্দোচ্ছ্বাস এ বাড়ীর দূষিত অসাড় আবহাওয়াকে মুখর ক'রে রাখে সে নাকি মূর্তিমতী পাপ, আর তার মা নাকি বিষাক্ত সর্প অপেক্ষাও ভয়াবহ জীব। মামা বললেন, খবরদার,—ওদের মুখ দর্শন করো না।

দিদিমার সঙ্গে মামার কোনোকালেই মিল নেই, কিন্তু এখানে তাঁদের মধ্যে কোনো বিরোধই দেখা গেল না। দিদিমা বললেন, দুর্গা, দুর্গা, মুখ দেখাও পাপ।

সেজমাসিমা এসেছিলেন সেদিন চুঁচুঁড়া থেকে। তিনি শোনামাত্র বললেন, খ্যাংরা মেরে তাড়াও বাড়ী থেকে। ছোট মেয়েটা আসে এ দিকে, তোরা যেন ওকে ছুঁসনে বাবা। কালনাগিনীর বাচ্চা!

কানাকানি থেকে জানাজানি। তারপর এ-বাড়ী থেকে ও-বাড়ী,—এবং এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া। এই উপলক্ষ্যে যাদের মধ্যে বিবাদ ছিল, তাদের মধ্যে গলাগলি দেখা গেল। শ্বাশুড়ীর পাশে বউ এসে দাঁড়ালো, মামীর পাশে মামা, মামার পাশে দিদিমা। সবাই ভালো, সবাই পরম বৈষ্ণব, সকলেই সমাজনীতি রক্ষার জন্য ব্যস্ত, কল্যাণকামনায় সকলেই একমত।

সেজমাসিমা চেঁচিয়ে বললেন, ভালোয় ভালোয় ওরা যদি ঘর ছেড়ে না যায় তবে পুলিশে খবর দাও, দাদা।

মামা তাঁর ছিলিমে শেষ টান দিয়ে এসে বললেন, তা আর বলতে? কলকাতার সব থানার দারোগা আমার মুঠোর মধ্যে। সাত দিনের মধ্যে যদি ঘর ছেড়ে না দেয় ত' ঘুঘুর ফাঁদ দেখাবো। বুনো ওল দেখলে ভয় পাইনে, আমিও বাঘা তেঁতুল!

পাড়ার সমাজপতি চাটুয্যেমশাই একদিন এসে বললেন, ভট্চায, কি সব শুনছি? তোদের বাড়ীতে কেমন লোককে ভাড়াটে বসিয়েছিস?

মামা ভয়ে ভয়ে বললেন, এবারটা মাপ কর। দুষ্টু গরু গোয়ালে এসে ঢুকেছে। গলায় দড়ি বেঁধে শিগগিরই বিদেয় করছি।

পাড়ায় নাকি আর মুখ দেখানো যাচ্ছে না। সমগ্র পল্লী নাকি অশুচি হয়ে উঠেছে নন্টুদের অস্তিত্বে। সমাজবিধি, নৈতিক চেতনা, লৌকিক সংস্কার—সমস্তই তাদের জন্য নাকি বিপন্ন। সুতরাং সেদিনকার সেই অগণ্য নরনারীর সংঘবদ্ধ শাসন ও রক্তচক্ষুর সামনে দাঁড়িয়ে তিনটি নিরুপায় প্রাণী থর থর ক'রে কাঁপতে লাগলো।

একটা মর্মান্তিক ঘটনা থেকে একদিন আগুনটা জ্বলে উঠলো। গোপনে এক কাঁসি ভাত নিয়ে আমিই আড়ালে গিয়ে নন্টুর থালায় ঢেলে দিচ্ছিলুম,—কিন্তু মামীর সতর্ক চক্ষু সেটা লক্ষ্য করে। তিনি ছুটে গিয়ে একখানা খুন্তি এনে নন্টুর কপালে এক ঘা বসিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ মেয়েটার কপাল বেয়ে ঝর ঝরিয়ে নেমে এলো রক্তের ধারা। কিন্তু নন্টু ভ্রূক্ষেপ করলো না, রক্তটা বাঁ হাতে মুছে ভাতের থালা নিয়ে পালিয়ে গেল। নন্টুর মা অনেক সহ্য করেছিল, এবার কিন্তু আর বরদাস্ত করতে পারলো না। সেই শান্ত দেবীমূর্তি এবার চঞ্চল হয়ে উঠে কাঠের চ্যালা বার ক'রে নন্টুকে প্রহার আরম্ভ ক'রে দিলো। এমহলে আমার ওপর লাঞ্ছনা,—সে ত' আমার সয়ে গেছে। আমাকে নাকি বশীকরণ করেছে নন্টুর মা।

গলা বাড়িয়ে একসময় নন্টুর মা বললে, মেয়েটাকে এমন ক'রে মারলেন যে, একেবারে রক্তারক্তি? ভাত কি আমরা চেয়েছিলুম? ওকে আপনাদের ছেলেই ত' ডেকেছিল।

মামী জবাব দিলেন, গলার আওয়াজ করলে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিতে পারি তা জানো?

হোমাগ্নিশিখার মতো নণ্টুর মা কাঁপতে লাগলো। আপনারা না ভদ্রলোক?

মুখ সামলে কথা বলিস। জিব টেনে বার করবো। সতীপনা ধরা প'ড়ে গেছে তাই বুঝি এখন গলাবাজি? জানি জানি, সব জানি। শাক দিয়ে এতদিন মাছ ঢাকা ছিল!—মামীর মুখে আরো যে-সব অদ্ভুত ভাষা যোগাতে লাগলো, সে-সব সে-বয়সে আমি প্রথম শুনলুম।

এ নাটকের প্রধান নায়ক হলেন মামা। তিমি একদিন সন্ধ্যার পর নণ্টুর বাবাকে পাকড়াও করলেন। চোখ রাঙিয়ে বললেন, ঘর যদি না ছেড়ে দাও তবে গলায় দড়ি বেঁধে তুর্কি নাচন নাচাবো। মনে করেছ আমি শুধু গাঁজা-আফিংই খাই, আর কোনো গুণ নেই আমার? ইতিজাতের সঙ্গে আমি ঝগড়া করিনে, দাঙ্গা বাধাই—এ কথা মনে রেখো।

নণ্টুর বাবা সবিনয়ে বললে, অন্য জায়গা খুঁজে নেবার একটু সময় দিন।

তিন দিন!—মামা হাঁক দিলেন, তিন দিনের বেশী সময় দেবো না, তারপর গলাধাক্কা!

একপক্ষ মারমুখী, অন্যপক্ষ শান্ত। আমরা অনেক নীচে নামতে পারি এ তারা জেনেছে। আমরা বাড়ীওয়ালা। ভদ্রতার মুখোশ আমরা যে কোনো সময়ে খুলে ফেলতে পারি। লোকটা মামার মুখের দিকে তাকিয়ে ভিতরে চ'লে গেল।

পরম্পরায় কথাটা রটনা হতে লাগলো। কে যেন হলপ ক'রে বললে, নণ্টুর মা নাকি বাল বিধবা। নন্টুর বয়স যখন পাঁচ মাস, তখন তার স্বামীর মৃত্যু ঘটে। তার পর থেকে এই লোকটি ওদের প্রতিপালনের ভার নেয়। এই লোকটি নাকি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, —যেন কোথাকার জমিদার! কিন্তু সব ছেড়ে এসে এখন খেলনা ফিরি করে, সকাল-সন্ধ্যা ঘুরে টাকাটা-সিকেটা যোগাড় করে আনে। অনেক তুকতাক, অনেক মারণ-উচাটন জানে নাকি ওই নণ্টুর মা,—লোকটা তাই ওদেরকে ছেড়ে যেতে পারে না। ওই ডাইনী, ওই পিশাচীই হোলো যত নষ্টের গোড়া। ওই লোকটাকে নাকি পথের কাঙাল করেছে ওই শয়তানী।

তিন দিনের বদলে সাত দিন পেরিয়ে গেল, ওরা বাড়ী ছাড়লো না। লোকটা পালিয়ে বেড়াতে লাগলো। কখন আসে কখন যায়—কেউ জানতেও পারে না। সম্ভবত ঘর খুঁজে পায়নি। নণ্টুর মা পাথরের মতন দরজার ধারে ব'সে থাকে।

বেশ মনে পড়ছে সেটা বর্ষাকাল। আগের দিন সমস্ত রাত ধ'রে বৃষ্টি হয়েছে। পরদিন সকালেও জলকাদা দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তায়। এমন সময় পুলিশ পেয়াদা এসে হাজির হোলো বাড়ীর দরজায়। পাড়ার লোক এসে দাঁড়ালো ঘিরে। মামা বিজয়গর্বে বেরিয়ে এলেন। কারো মুখে ক্রূর হাসি, কারো মুখে ধিক্কার, কারো মুখে বা রসিকতা।

পুলিশের পেয়াদা নণ্টুর মার ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র টেনে রাস্তার জলকাদায় নামালো। হাঁড়ি, কলসী, কড়াই, ছেঁড়া মাদুর, ভাঙ্গা তোরঙ্গ আর থালা বাটি। মেয়ের হাত ধ'রে নণ্টুর মা পথে এসে নামতে বাধ্য হোলো। হঠাৎ সবাই চুপ।

নন্টুর মা-র মুখে চোখে এক প্রকার নিঃসঙ্কোচ প্রশান্তি—সেই প্রসন্ন মুখে যেন সকলের জন্য ক্ষমা। কুণ্ঠা নেই, অধোবদন নয়, নির্বিকার দৃষ্টি, আচরণে কোথাও নেই জড়তা আর আড়ষ্টতা,—তাঁর দিকে তাকিয়ে সবাই যেন থমকে গেল।

আমিও থমকে গেলুম একান্তে দাঁড়িয়ে। হৃৎপিণ্ড ঠেলে গলার কাছে কান্না উঠে আসছে, কিন্তু আমি শান্ত। হঠাৎ হোতো যদি সর্বনাশা ভূমিকম্প—খুশী হতুম। যদি হঠাৎ বজ্রাঘাতে আমার মৃত্যু ঘটতো, দুঃখিত হতুম না। মনে মনে ভাবছিলুম ওই অপমানিতা জননী সকলকে ক্ষমা ক'রে গেলেন, কিন্তু আমি রইলুম আমাদের পরিবারের সকলের বড় শত্রু, চিরদিনের শত্রু!

নন্টুর মা সকলকে প্রণাম করতে গেল, কিন্তু যাঁরা বয়স্ক তাঁরা সরে দাঁড়িয়ে বললেন, থাক্ আর ছুঁয়ে কাজ নেই মা—ওখান থেকেই কাজ সারো। আশীর্বাদ করি তোমার সুমতি হোক।

নন্টুর বাবা এলো অনেক বেলায়। চাষা-ধোপাপাড়ার কোন্ বস্তিতে নাকি একখানা ঘর পাওয়া গেছে। কিন্তু আকাশ ভেঙে নেমেছে তখন বৃষ্টি। ওরা সেই বৃষ্টিতে ভিজতে লাগলো সপরিবারে পথে দাঁড়িয়ে! কিন্তু তাতে আমাদের কি এসে যায়! আমাদের বাড়ীর দরজা-জানালা সব আগেই বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছিল। উত্তেজনার মধ্যে কেউ লক্ষ্য করেনি—পথের একান্তে দাঁড়িয়ে আমিও ভিজছিলুম বৃষ্টির জলে। শ্রাবণের ধারা বোধ হয় আমারও চোখে ছিল।

যারা সেদিন মারতে গিয়েছিল নন্টুদের, তারা সবাই কালক্রমে মহাকালের বিশাল অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। হয়ত নন্টুরাও হারিয়েছে! কিন্তু রেখে গেছে যা, তার দাম কম নয়। যে-শয়তানী পিশাচীকে পাড়াসুদ্ধ লোকে ধিক্কার দিয়ে গেছে, তার মুখখানাই ত' উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে ওই অন্ধকারে। পরনে রং-চটা শাড়ী নথর হাতে কাঁচের চুড়ি, নত মুখের সামনে খোলা রামায়ণ, পাশে অস্ফুট পদ্মের মতো নন্টু ঘুমিয়ে। মাটির পিলসুজের ওপর রেড়ির তেলের আলোটা জ্বলছে।

আলোটা আজও জ্বলছে! মুখখানা আজও হারায়নি!

বাড়ীর বিধবাদের একাদশীর আসরে একদিন বারাকপুর আর নৈহাটির গল্প জমে উঠলো।

বরাহনগর আর বনহুগলী ছাড়িয়ে সেই পথ নাকি আরো অনেক দূর। লাল রঙের ঘোড়ার গাড়ী যদি বার-শিমলে থেকে একবার ছাড়ে তবে সারাদিন লাগে সেখানে পৌঁছতে। হাতীবাগান পেরিয়ে যেতে হয়, সেই গণৎকারদের পাড়াটা ছাড়িয়ে। পূর্বদিকে নয়—উল্টোডিঙ্গির বন-জঙ্গলের দিকে গেলে তার কোনো পথ নেই; সেখানে গেলে

বেলগেছের জলাবিল পেরিয়ে ডাকাতরা হানা দেয়, ঘোড়ার গাড়ী আক্রমণ করে। সুতরাং হাতীবাগান পেরিয়ে সোজা উত্তরে পথ। শ্যামবাজারের মোড় ছাড়িয়ে গেলে ধূ-ধূ প্রান্তর—সেই পথে সন্ধ্যে হয়ে এলে গা ছমছম করে। কোথাও কোথাও টিম-টিমে তেলের আলো জ্বলে, কোথাও এক-আধটি মুড়ি-মুড়কির দোকান, কোথাও বা কাপড় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফেরিওয়ালা। তারপর এগিয়ে যাও, দেখবে শুধু গরু-মহিষের খাটাল, আহিরীদের পাড়া, আর পাইকপাড়ার রাজবাড়ীর পাশ দিয়ে ঊর্মিলা দিদির শ্বশুরবাড়ী যাবার পথ। কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে এলে সেই দুর্গম অঞ্চলের দিকে এগোবার মত বুকের পাটা আছে কজনের?

মামা ভয় দেখাতেন। ভাই-বোনদের পিছন দিকে ব'সে ভয়ে ভয়ে শুনতুম সেই কাহিনী। চারিদিকে দস্যু আর ডাকাত, চারিদিক থেকে ঘিরে আসতো আতঙ্ক নাবালকের চোখে। মামা বলতেন, যাও না সিঁথি আর বরানগর ছাড়িয়ে বনহুগলী, নপাড়া আর পালপাড়া পেরিয়ে পেনেটির দিকে, অমনি বেরিয়ে আসবে বেলঘরের মাঠ পেরিয়ে ডাকাতরা,—আগে খুন করবে গাড়োয়ানকে, ভয় পেয়ে ঘোড়া দুটো পালাবে যেদিকে খুশি,—জনমানব কেউ কোথাও নেই! তারপর পথের মাঝখানে একে একে সবংশে নিধন! তারা তরোয়াল দিয়ে কুচিয়ে কাটে, আর নয়ত' ভীমা ভয়ঙ্করী কালীর সামনে নিয়ে বলি দেয়। পেনেটি ছাড়িয়ে যাওয়া কি আর সোজা কথা? কিন্তু যদি যেতে পারো তবেই পাবে খড়দা,—তবেই দর্শন পাবে শ্যামসুন্দরের। সামনে গঙ্গা বইছে কুলুকুলু—চৈত্রমাসে সুখচর উঠেছে জেগে!

লাল রঙের ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া হোলো কম, আর তার ঘোড়া দুটো হোলো নিরীহ। তারা ক্লান্ত পায়ে দৌড়য়, খেতে পায় না পেট ভ'রে—চাবুক মারলেও তাদের গতিবেগ বাড়ে না। সেই গাড়ীতে যাওয়া সুবিধে। কিন্তু সেই গাড়ীতে পেনেটি যাবার দুঃসাহস কারো নেই। যদি যেতেই হয় তবে কালীঘাটে যাওয়াই নিরাপদ।

তীর্থে যাওয়ার গল্প এমনি ক'রেই জমে উঠতো। ত্রিবেণী, ষাঁড়েশ্বরতলা, বর্ধমানের পাগলা কালী, তারকেশ্বর, বেলগেছের ওলাইবিবি, রামরাজাতলা, নবদ্বীপ—কত দেশের কত রকমের কাহিনী।

তারপরে একদিন স্থির হোলো দিদিমারা যাবেন শ্রীক্ষেত্রে। সামনে নতুন বর্ষাকাল, শ্রীক্ষেত্রে রথের মেলা। সেখানে যেতে হোলে রেলগাড়ীতে সারারাত থাকতে হয়। পথে আছে ভদ্রক, ডাকাতেরা সেখানে নাকি লুঠপাট করে। ছোট ছেলেমেয়েরা সেখানে গেলে আর রক্ষে নেই, তাদেরকে জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে যায় মায়ের কোল থেকে,—নিয়ে যায় একেবারে কোন্ নিরুদ্দেশে। সেখান থেকে আর কেউ ফিরে আসে না। বড় দুর্গম সেই তীর্থ, বিপদভঞ্জন মধুসূদন ছাড়া সেই ভয়ানক পথে আর কেউ নেই।

চুপ ক'রে বসেছিলুম দিদিমার পিছনে আঁচল ধ'রে। কানাকানিতে শুনতে পেলুম দিদিমারা যাবেন সাত-আটজন মিলে,—মাও যাবেন সঙ্গে। চম্পটিদের গিন্নী যাবেন,

ঝকোর মা যাবেন, আর যাবেন সেজো মাসিমা। সবাই মিলে বেশ একটি দল। সবাই যাবে শ্রীক্ষেত্রে। ধীরে ধীরে যাবার দিন এগিয়ে এলো।

কিছুদিন আগে আমাদের নেড়ুদার সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে। কাছাকাছিই তারা থাকতো ভিন্ন বাড়ীতে। মা আর দিদিমা তাদের ওখানে আমাকে নিয়ে গিয়ে বললেন, নেড়ু, একে রাখতে পারবে ত'? ছেলে কিন্তু বড্ড দুরন্ত!

নেড়ু বললে, ভয় পাচ্ছ কেন, দিদিমা? ও ত' আমার এখানেই সারাদিন খেলা-ধুলো করে। তোমাদের দেরী হবে কদ্দিন?

ধরো না বেন, দিন পনেরো। ভদ্রকে যাবো, ভুবনেশ্বরে নামবো,—শ্রীক্ষেত্রেও ধরো পাঁচ ছয় দিন। তুমি ওকে সাবধানে রাখতে পারবে ত'?

বৌদিদি এসে আমাকে কাছে টেনে নিল। মা বললেন, ও কিন্তু বড্ড বেয়াড়া বৌমা। না ব'লে বেরিয়ে চ'লে যায়। ওকে চোখে চোখে রেখো।

বৌদিদি বললে, কোনো ভয় নেই, আমি ঠিক রাখতে পারবো, মাসিমা।

দিদিমা বললেন, ওকে রোজ এক পয়সার দই কিনে দিয়ো, আমি পয়সা দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু বড্ড দুরন্ত ভাই, কোথাও ওকে যেতে দিয়ো না। রাত্তিরে ত' মায়ের কাছে ওর শোওয়া অভ্যাস, ওকে তোমাদের কাছেই রেখো, নাতবৌ।

নেড়ুদা বললে, তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো, আমরা দু'জনে ঠিক ওকে রাখতে পারবো।

বহু নিষেধ, বহু উপদেশ এবং বহুতর নির্দেশ দিয়ে নেড়ুদার কাছে আমাকে রেখে ওরা একদিন সেই লাল রঙের গাড়ী চড়ে চললো হাওড়া স্টেশনের দিকে। বেলা অপরাহ্ণ, মেঘ করেছিল সেদিন, নেড়ুদার বাড়ীর নীচের তলাটা যেন বড় শূন্য মনে হচ্ছিল। অন্ধকার জমে আসছিল আনাচেকানাচে। ছ্যাকড়া গাড়ীখানার আওয়াজ অনেক দূর গিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে রইলুম আমি সদর দরজার পাশে। কিন্তু আমার আরেকটা আমি যেন ছুটে চললুম ওই গাড়ীখানার পিছনে পিছনে! মিত্তিরদের বাড়ীর পাশ কাটিয়ে, চাটুয্যেদের গা ঘেঁসে, অর্জুন মুদির দোকান ছাড়িয়ে, বাঁসারিপাড়ার ভিতর দিয়ে গাড়ীখানা দৌড়চ্ছে, আর আমিও ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছি যেন তার পিছনে পিছনে—তবু ধরতে পাচ্ছিনে! ধরবার জন্যেই ছুটি, ধরতে পারবো না জেনেও ছুটতে থাকি।

মা নেই সামনে, সুতরাং পৃথিবীও নেই। আছে শুধু চোখ আর কান, আছে শুধু চেতনা। মা বাছে নেই, তাই নোংরা নর্দমার পাশে আধমরা বিড়ালছানাটার কান্না কানে এসে বাজে, তাই বৌদিদি এসে পিঠের ওপর হাত রাখলে চোখে জল আসে। নিচের তলাটা বড় শূন্য, বড় শূন্য আমার দুটো চোখ। দই কিনে খাই, কিন্তু তার মধ্যে অমৃতের আস্বাদটা যেন মিলিয়ে গেছে। ঘন বর্ষা নেমেছে নীচের তলায়, কাগজের নৌকো ভাসিয়ে দিই নালার জলে, সেই নৌকো চ'লে যায় কত নদনদী পেরিয়ে, ভদ্রক ছাড়িয়ে ভুবনেশ্বরের পথ দিয়ে, শ্রীক্ষেত্রের সমুদ্রের তীরে তীরে। নালার পথ বেয়ে গেছে নৌকো, বৃষ্টির দিকে আমি চেয়ে থাকি।

নেড়ুদার বিয়ে হয়েছে মাত্র মাস দুই আগে। বৌদিদি এসে ফিটফাট ক'রে ঘরখানা সাজিয়েছে। ঘর ওই একখানি। তার বাইরে একটুখানি রান্নার জায়গা আর দেওয়ালের একটু আড়ালে তাদের ভাঁড়ার ঘর। সামনেই নালার ধারে কলতলা। জায়গাটুকু খুব সামান্যই, কিন্তু ওরই ভাড়া মাসে ছ'টাকা। নেড়ুদা চাকরি করে উকিলের বাড়ী। মাইনে বুঝি তিরিশ টাকা। সকালবেলায় উঠে নেড়ুদা বাজার ক'রে দেয়, বৌদিদি রাঁধতে বসে, আর আমি ফাইফরমাশ খাটি। নেড়ুদা বেরিয়ে গেলে বৌদিদি সেই যে দরজা বন্ধ করে, আবার খোলে সেই ভর-সন্ধ্যেবেলায়—যখন নেড়ুদা ফিরে আসে আপিস থেকে। দিদিমা যাবার সময় আমার জন্যে পাঁচটি টাকা বৌদিদির আঁচলে বেঁধে দিয়ে গেছেন। রাত্রে আমি শুয়ে থাকি বৌদিদির পাশে। মায়ের কাছে শোওয়া অভ্যাস—সুতরাং ঘুম আসে না।

সকালবেলায় গরম গরম মুড়ি আর জিলিপি, ভাতের পাতে ঘি, বিকালে জল-খাবার, রাত্রে পরোটা আর আলুর দম। বৌদিদির হাতে মাছের তরকারী চমৎকার রান্না হয়। তা'ছাড়া সারাদিন এটা-ওটা। তেঁতুলের আচার আছে ঘরে, হাঁড়ির মধ্যে থাকে তিলকুটো। আবার যদি বৌদিদির জন্যে তাম্বুলবাহার পান এনে দিতে পারি, তবে টক-মিষ্টি লজেন্স উপহার পাই। এত খাওয়া আর এত যত্ন—সত্যি বলতে কি—কোনোদিনই বাড়ীতে পাইনি। নেড়ুদা আমাকে ক্যাম্বিসের বল উপহার দিয়েছে। বৌদিদি বলেছে, এবার পুজোর সময় আমাকে সিল্কের জামা কিনে দেবে। ওরা দেখে অবাক হয়েছে, আমি অবাধ্য নই, বাইরে একবারও পা বাড়াইনে, শ্লেট পেনসিল নিয়ে একমনে আঁক কষি, ফার্স্টবুক আর কথামালা মুখস্থ করি এবং বৌদিদির সঙ্গে সমস্ত কাজে লেগে থাকি। ওরা বলে আমি নাকি বদলে গেছি।

নেড়ুদা হাসিমুখে শুধু বলে, বেশী রাত্তির পর্যন্ত জেগে থাকতে নেই কিন্তু। একবার নিশি ডাকলে দেখবি তখন মজা!

নিশি কি?

গাধা কোথাকার! নিশি জানিসনে? তারা আসে মাঝরাত্তিরে। জানলার পিছনে দাঁড়িয়ে নাকি আওয়াজ করে—ছোট ছেলের নাম ধরে ডাকে! ব্যস, জেগে আছিস জানতে পারলেই ডাবের মুখটি বন্ধ ক'রে দিল! আর যাবি কোথা? তার পিছু পিছু যেতে হবে রাত্তিরে উঠে।

বৌদিদির পাশে আমি ভয়ে ভয়ে সরে বসি। নেড়ুদা বলে আর রাত জাগবি?

না!

নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়বি ত' আজ থেকে?

হ্যাঁ!

বৌদিদি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, আমার লক্ষ্মী ঠাকুরপো! আর কোনোদিন জেগে থেকো না, কেমন?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাই। বৌদিদি হাসিমুখে উঠে গিয়ে নেড়ুদাকে আসন পেতে খেতে দেয়। দেখতে দেখতেই রাত ঘনিয়ে আসে।

মা-দিদিমার খুঁটি ছিল শক্ত, সেই জন্য আমার চুলের টিকি সারাদিনে দেখা যেতো না। জানতুম যেখানেই থাকি একসময় আমার ডাক পড়বেই। অনেক দূরে এগিয়ে যেতুম, কিন্তু বিশ্বাস অটুট থাকতো—পিছন থেকে টানবার মানুষ আছে। সেখানে নিশ্চিত জীবন, নিশ্চিত মন। সেখানে শাসনটা ছিল কঠিন বটে, কিন্তু বত্রিশ নাড়ীর দুচ্ছেদ্য বাঁধন ছিল। এখানে যত্নসমাদর প্রচুর, পান থেকে চূণ খসে না—কিন্তু এখানে কর্তব্য আর দায়িত্ব। এখানে অবাধ্য হোতে ভয় পাই, বাইরে যেতে ভরসা পাইনে। সেখানে বেপরোয়া বিপ্লব বাধিয়ে তুলতেও মায়ের বুকের মধ্যে আমার নিশ্চিন্ত বাসা ছিল—এখানে বসবাসের স্বাচ্ছন্দ্য প্রচুর পরিমাণে থাকলেও জননীর সর্বক্ষমতাশীল হৃদয়টা নেই। সেই কারণে কোনো একসময় একা প'ড়ে গেলেই আমার মন আপন মনে কাঁদতে বসে। দিনমানের সমস্ত সময়টায় বৌদিদির সাদর প্রীতির পাহারার মধ্যে বারবার আমার ঘুম এসে পড়তো, কোথাও ব'সে থাকলে চোখ ঢুলে আসতো—কিন্তু রাত্রে বিছানায় শুতে গেলে সমস্ত তন্দ্রা যেতো ছুটে, দাদা আর বৌদি পাশে থাকলেও আশ্রয় খুঁজে পেতুম না। চোখ বুজে পড়ে থাকতুম নিঃসাড়ে, ঘোলাটে তন্দ্রা দুই চোখের পাতার মধ্যে কিলবিল ক'রে ঘুরতো এবং মাঝে মাঝে আমার চাপা নিঃশ্বাসে কেমন যেন আন্তরিক উৎপীড়নের সংবাদ নিয়ে এক একটা অনিচ্ছুক আওয়াজ গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতো। বিছানাটার ওই বিস্তীর্ণ মরুভূমির বালু আর কাঁকরের মধ্যে শুয়ে সুদীর্ঘ রাত আমাকে কাটাতে হোতো অসহনীয় অস্বস্তিতে।

হঠাৎ একদিন রাত্রে—রাত তখন গভীর—নেড়ুদা আমার গায়ে সক্রোধে একটা চিমটি কাটলো। তিনটে আঙ্গুল দিয়ে আমার গায়ের চামড়াটা সে এমন মুচড়ে দিল যে, পরদিন সেখানে কালশিরার দাগ ফুটেছিল। অন্ধকারে সে মুখ বিকৃত ক'রে বললে, বদমায়েশ, শুয়োর কোথাকার। তোকে না রোজ রোজ ঘুমোতে বলি ? ঘুমো বলছি এখনও। কাল থেকে হাতের কাছে বেতগাছটা রেখে দেবো।

অনড় পাথরের মতো আমি প'ড়ে রইলুম—নিঃশ্বাসটা রুদ্ধ হয়ে রইলো যন্ত্রণায়, কিন্তু একটুও সাড়া না দিয়ে চুপ ক'রে শুয়ে রইলুম। অনুভব করতে পারি বৌদিদি জেগে রয়েছে। একটু আগে ওদের অতি মিহি আলাপও শুনেছি। বৌদিদি জেগে আছে, অথচ আমার যন্ত্রণায় তার কোনো সমবেদনা নেই, আমার লাঞ্ছনায় তার কোনো প্রতিরোধ নেই—এ আশ্চর্য। বুঝতে পারি ঘরের ভিতরকার বীভৎস অন্ধকারের কুণ্ডলীটা যেন বুকফাটা অবরোধে দম আটকে রয়েছে। কিন্তু উপায় নেই, রাত্রি বড় দীর্ঘ—দিনের আলো ফুটতে তখনও অনেক দেরি। বুঝতে পারছিলুম, আমি যতক্ষণ না ঘুমোই—ওরা দু'জনে ততক্ষণ অবধি উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে। আমার শরীর খারাপ হোলে ওদের পক্ষে লজ্জার কারণ আছে বৈকি।

সকালবেলায় সমস্তটা সহজ। মুখ ধুয়ে এসে পড়তে বসবার আগেই বৌদিদির হাতে গরম গরম চপ আর টাটকা মুড়ি। গত রাত্রে নেড়ুদা আমার জন্য এনেছিল

একভাড় পানতুয়া—একবাটি দুধের সঙ্গে দুটো পানতুয়া সেই বয়স অবধি কখনো পাইনি! আমার ন্যায় সুবোধ বালকের চিবুক নেড়ে দিয়ে মিষ্টি হেসে বৌদিদি বলে, এমন দেওর ক'জনের ভাগ্যে জোটে! আজ থেকে তোমাকে খুব ভালো গল্প বলবো—শুনতে শুনতে তোমার নাক ডেকে উঠবে—কেমন ভাই?

আমি খুশী হয়ে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাই। নেড়ুদার দরুন কালশিরার দাগটা আমি বৌদিদির দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখি। ওটা দেখলে স্বামীর আচরণে হয়ত সে দুঃখ পাবে।

বৌদিদি আমার রান্নার জায়গায় গিয়ে বসলো। বৃষ্টির জলের ছাটে থৈ থৈ করছে চারদিক। ঘরটি বাদ দিলে আর কোথাও শুকনো আশ্রয় নেই। সমস্ত রাত ধ'রে ঘরের বাইরে বড় বড় ইঁদুর আর ছুঁচোর উৎপাত চলে। ঘরের বিছানাটা ত্যাগ ক'রে রাত্রে অন্য কোথাও আশ্রয় নেওয়া একেবারেই অসম্ভব।

নেড়ুদা বাজার থেকে নিয়ে এলো তরিতরকারী আর ভালো মাছ, তার সঙ্গে বর্ষাকালের ফল-পাকড়। সঙ্গে নিয়ে এসেছে একখানি সুন্দর টিনের রথ, তালপাতার বাঁশি, আর রংচঙে মাটির জগন্নাথ। উৎসাহিত হয়ে এসে বললে, আজ রথযাত্রা রে! এই নে বাঁশি বাজা, রথের ওপর ঠাকুর চড়িয়ে টানগে যা,—কেমন? আজ আমার ছুটি, বিকেলবেলায় তোকে মেলা দেখিয়ে আনবো—যাবি ত' আমার সঙ্গে?

যাবো।

নেড়ুদা ঠাণ্ডা হয়ে বসলো এক জায়গায়। তারপর বললে, আজ এতক্ষণ শ্রীক্ষেত্রে দিদিমা আর মাসিমারা বেশ মজা ক'রে রথটানা দেখছে! ব্যস্, উল্টোরথের আগেই ওরা ফিরবে। হিসেব ক'রে দেখো আর বড় জোর পাঁচ সাত দিন।

শ্লেটের ওপর সাতদিনের অঙ্কটা লিখে চললুম পরম যত্নে। সোমবার থেকে রবিবার, শনিবার থেকে শুক্রবার, বুধবার থেকে মঙ্গলবার। যেদিন থেকেই ধরি, আগের তারিখে এসে সাতটা দিন মিলে যায়। প্রত্যেকটি দিনের সঙ্গে রয়েছে আমার অধীরতা, আমার প্রাণান্তকর পিপাসা,—আমি যেন শুকনো জিব দিয়ে চাটতে থাকি এক একটি তারিখ। আমার জিহ্বার ঘর্ষণে যেন এক একটি তারিখের গায়ে রক্ত ফুটে ওঠে।

রথ টানলুম প্রাণপণে সারাদিন, সেই রথটানার ঘর্ঘরধ্বনি কি পৌঁছবে শ্রীক্ষেত্রে? বাঁশি বাজালুম, কিন্তু তার সেই বিকৃত বেসুরো আওয়াজ আমার মর্মছেদনের আর্তনাদ নিয়ে কি পৌঁছবে ভদ্রকের পথ দিয়ে ভুবনেশ্বরে? আষাঢ়ের অবেলায় যে বর্ষাধারা নেমে এলো, তার মধ্যে মাতৃহারার বিশ্বব্যাপী বেদনা কি চোখের জল ফেলছে না? আজ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে যত লোক ভাঙ্গা গলায় কেঁদেছে, যত বিচ্ছেদের নিঃশ্বাস পড়েছে, যত সর্বহারা আর বৎসহারার বুক ভেঙ্গেছে—তারা যেন সবাই এসে ভিড় করেছে আমার তালপাতার এই বাঁশিতে।

বাঁশি থামলো। নেড়ুদার সঙ্গে রথের মেলায় গিয়ে কত খেলুনা কিনে আনলুম। নীচের তলায় তখন সন্ধ্যার আলোটা জ্বালিয়ে রান্নাবান্না সেরে বৌদিদি পোশাকী শাড়ী প'রে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। আজ নেড়ুদার ছুটি, তাই বৌদিদি পান খেয়েছে,

কপালে টিপ পরেছে, পাতা কেটে চুল বেঁধেছে। আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বৌদিদি বললে, দাদা কেমন তোমাকে ভালোবাসে, দেখলে ত'? ওমা, এত খেলনা নিয়ে কী করবে তুমি? দিদিমারা আর মাসিমারা এলে সব খেলা দেখিয়ো, কেমন? তোমাকে সব্বাই ভালোবাসে, না ঠাকুরপো?

ঘাড় নেড়ে বললুম, হ্যাঁ।

মা এলে দাদার ভালোবাসার কথা বলবে ত'?

বৌদির মুখের দিকে তাকালুম। বললুম, দাদা কিনে দিয়েছে টিনের গাড়ী, বুড়ো ঠাকুর্দা, কলের পুতুল,—এই দ্যাখোনা আরো কত!

বৌদিদি বললে, আমার কথা কী বলবে?

বা রে, তুমি যে দিনরাত আমাকে খাওয়াতে জোর ক'রে? অত কি খাওয়া যায়?

বৌদিদি আমার কথা শুনে হাসিখুশী মুখে নেড়ুদার সঙ্গে ঘরে ঢুকলো, তারপর কী যেন চুপিচুপি কথা বলতে লাগলো।

খেয়ে দেয়ে আমিই আগে গেলুম বিছানায়। ঘুমে আমার দুই চোখ জড়িয়ে এসেছে, পা দুটো টলে পড়েছে। কেউ যদি না ডাকে, কেউ যদি না থাকে—আমি সাতদিন ধ'রে ঘুমোতে পারি। কিন্তু বিছানায় ওঠার পর আবার নতুন ক'রে বৃষ্টি নেমে এলো। কতক্ষণ নেড়ুদা আর বৌদিদি ঘরের বাইরে হাসি-তামাশা আর গল্প-গুজব নিয়ে ছিল,—কিন্তু বৃষ্টির ছাটের জন্য তাদেরকে একসময়ে ঘরের মধ্যে উঠে আসতে হোলো। এই ছোট ঘরটি ছাড়া আর কোথাও পা বাড়াবার উপায় নেই। ঘরের মধ্যে কখন তারা খাওয়া-দাওয়া ক রেছে, কখন তারা সমস্ত কাজকর্ম সেরেছে এবং কখনই বা বিছানায় উঠেছে আমি টের পাইনি। তবু একসময় আমার হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। চুপ ক'রে প'ড়ে রইলুম অসাড় হয়ে। আমার নিঃশ্বাসের ছন্দটা নষ্ট হোতেই বোধ হয় ওদের সন্দেহ হোলো। এক সময় নেড়ুদা একবার মৃদুকণ্ঠে আমার নাম ধ'রে ডাকলো। সাড়া দিলুম না। আবার সে ডাকলো। তখনও আমার সাড়া নেই। কিন্তু তিন বারের বার ডাকতেই আমি উত্তর দিলুম, উঁ?

এখনও ঘুমোসনি?

চুপ ক'রে রইলুম। কিন্তু বুকের মধ্যে ধকধক করতে লাগলো।

নেড়ুদা রুদ্ধকণ্ঠে বললে, তোর মতলব কি? কী ভেবেছিস?

বৌদিদি স্থির হয়ে প'ড়ে রয়েছে। আমি জানতুম, সে ঘুমোয়নি। অন্ধকারে নিজের পায়ের ওপর সে পা ঘষছিল,—টের পাচ্ছিলুম। কিন্তু সে সাড়া দিল না। আমিও নেড়ুদার কথার কোনো জবাব দিতে পারলুম না।

নেড়ুদা আস্তে আস্তে উঠে মশারীর ভিতর থেকে বেরিয়ে নীচে নামলো, তারপর দেশলাই বার ক'রে পিদিমটা জ্বাললো। তখনও আমি কিছু বুঝতে পারিনি। কিন্তু সে যখন হাত বাড়িয়ে আমার একখানা হাত ধ'রে হিড় হিড় ক'রে তক্তা থেকে নামালো, আমি তার মুখ দেখে ভয় পেলুম। এ সেই দিনের বেলাকার নেড়ুদা নয়,—এ

ক্রোধোন্মত্ত, প্রতিশোধপরায়ণ পৈশাচিক নেড়ুদা! আমি যেন তার সকলের বড় শত্রু, যেন তার পথের কাঁটা, তার জীবনের সব চেয়ে বড় বাধা।

তক্তা থেকে নেমেই দেখি, দপ দপ করছে নেড়ুদার দুটো চোখ। সে দৃষ্টি বিলোল বিহ্বল, রস ও রক্তের আভায় সেই দৃষ্টি অন্ধকারে জন্তুর মতো জ্বলছে। কিন্তু আমাকে কিছু বলবার সময় না দিয়েই ঠাস ক'রে সে আমার গালে এক চড় মারলো। মার খেলে আমি সহ্য করতে পারতুম। এ গালে সে বসালো আর এক চড়—তারপর লাথি মেরে আমাকে ঘর থেকে বার ক'রে দিয়ে বললে, জুতিয়ে বাড়ী থেকে বার ক'রে দিয়ে আসবো, তা জানিস? পাজি, শুয়োর, উল্লুক—

প্রশ্ন করতে পারতুম, রোজ রোজ এমন ক'রে মারছ কেন? এত মারধোর সত্ত্বেও বৌদিদি তোমাকে বাধা দেয় না কেন?—কিন্তু একথা উপলব্ধি করতে পারতুম সেদিন—আমার প্রশ্নের জবাব দেওয়া ওদের পক্ষে কঠিন ছিল। একজনের কাছ থেকে সক্রিয় উৎপীড়ন, আর একজনের পক্ষ থেকে নিষ্ক্রিয় সমর্থন, সুতরাং কোনো রাত্রেই আমার স্নেহের আশ্রয় জুটতো না। কিন্তু আমি প্রশ্ন করিনি।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছি অন্ধকারে। জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি মশারীর মধ্যে বৌদিদির ছায়াটা নড়ছে। আমি শুনতে না পাই এমনভাবে ওরা ফিসফিস ক'রে কথা বলছে—এবার কাছাকাছি হয়েছে দু'জনে। কিন্তু মিনিট পাঁচেক পরে হঠাৎ নেড়ুদা আবার বেরিয়ে এলো। আমি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কাঁপছিলুম। কাছে এসে লালচক্ষে সে আমার চুলের মুঠি ধ'রে আবার ঘরে টেনে নিয়ে গেল, তারপর তক্তার ওপরে সজোরে আছড়ে ফেলে দাঁতে দাঁত ঘষে বললে, রাত বারোটা বাজে, ঘুম নেই এখনো? ইচ্ছে করে বঁটি দিয়ে কেটে ফেলি।

বৌদিদির পাশে আবার চুপ ক'রে প'ড়ে রইলুম অসাড় হয়ে। জানি বৌদিদিও জেগে আছে, কিন্তু সে সাড়া দিচ্ছে না। নেড়ুদা অত্যন্ত হয়রান হয়ে অসীম আক্রোশ আর বিরক্তির সঙ্গে কুলুঙ্গি থেকে একখানা বই টেনে পিদিমের আলোয় পড়তে ব'সে গেল। বইতে মনোযোগ দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কিন্তু সে অন্যমনস্ক হোতে চাইছিল। আমার ঘুম না আসা পর্যন্ত সে বই পড়তে চায়।

একসময় আলো নিবিয়ে সে আবার মশারীর মধ্যে উঠে এলো। হাঁসফাঁস ক'রে তার নিঃশ্বাস পড়ছিল। নির্মল সরকারদের বাড়ীর সেই মস্ত শিকারী কুকুরটা মাংস-ভাত খাবার আগে লালাসিক্ত জিব বার ক'রে এমনি ক'রে শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়।

আমি প'ড়ে রইলুম কাঠের পুতুলের মতো। সমস্ত রাত অবধি পিঠে ব্যথা ধরেছে, পাঁজরে বেদনার কনকনানি লেগেছে, আড়ষ্ট হয়ে এসেছে শরীরের একাঙ্গ,—কিন্তু নড়িনি। পা ছড়াইনি, হাত সরাইনি, গা ফেরাইনি, মাথা ঘোরাইনি,—অবিচল নিশ্চেতন দেহকে কঠিন কঠোর শাসনে সমস্ত রাত ধ'রে স্থির ক'রে রেখেছিলুম।

দু'জন মানুষই আবার বদলে যায় দিনের বেলা। তখন সহজ—তখন স্বাভাবিক। আগের রাতটা কারো মনে থাকে না, দিনের বেলায় তার স্মৃতি যেন একান্তই অলীক। কালশিরার দাগ পড়েছে আমার শরীরের অনেক জায়গায়, নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়েছে

বালিশের ওপর, হাতপাখার আঘাতে রক্ত ফুটেছে এখানে ওখানে। ঘরের হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে নেড়ুদা বুঝতে পারতো আমি ঘুমোচ্ছি কিনা, বুঝতে পারতো আমার ঘুমের গভীরতা কতখানি। চোখ বুজে আমিও বুঝতে পারতুম, ওরা ইশারায় কথা বলছে, ওরাও আমার নিঃশ্বাসের দিকে কান খাড়া ক'রে বুঝে নিত—চোখ বুজে থাকলেও চোখে আমার ঘুম নেই।

সমস্ত দিনমান ধরে নেড়ুদা ও বৌদিদির সেই অপরিসীম আন্তরিক স্নেহ, কোথাও তার ত্রুটি ছিল না। খেলনা স্তূপাকার হয়েছে, ছবির বই এনেছে, এসেছে আমার জন্যে নতুন চটি জুতো। বৌদিদি আমার মাথায় টেরি কেটে দেয়, নেড়ুদা এনে দেয় ঘুড়ি আর লাটাই। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে ওদের দু'জনকে কাছাকাছি দেখলেই আমি ভয় পাই,—যেমন ভয় পাই সন্ধ্যার আলো জ্বললে, শাঁখ বেজে উঠলে। দিনের বেলায় ওদেরকে চেনা সহজ, রাত্রে ওরা অচেনা,—তখন ওদের চোখ জ্বললে, ওদের ভঙ্গী দেখলে দুর্ভাবনা আসে, ইশারা-ইঙ্গিতে আতঙ্ক জাগে। বন্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে কোথাও পালাবার পথ নেই, মুক্তি পাবার উপায় নেই, এড়িয়ে যাবার সুবিধা নেই। সুতরাং প্রায় প্রত্যেক রাত্রেই আমাকে মার খেতে হোতো মুখ বুজে। চীৎকার ক'রে কোনো মধ্যরাত্রে আমি কাঁদতে পারতুম, কিন্তু আমার সেই ভাঙ্গাগলার আওয়াজ কি শ্রীক্ষেত্র পর্যন্ত পৌঁছবে। অতএব মুখ বুজে আমি প'ড়ে প'ড়ে মার খেতুম। মাঝখানে গিয়েছিল এক রবিবার। সেদিন দুপুরবেলায় ঘরে ঢুকে ওরা ভিতর থেকে জানালা-দরজা বন্ধ করেছিল। সেদিন আমি ছাড়া পেয়ে নিজের আনন্দে বাইরে ঘুরে বেড়িয়েছিলুম। মনে পড়েছে শুধু সেই রাত্রে আমি কেবল ধমক খেয়েছিলুম, কিন্তু মার খাইনি!

বৌদিদির জ্বর এলো সপ্তাহের শেষ দিকে। গায়ে মাথায় যন্ত্রণা, শীতের কাঁপুনি ধরেছে,—দেখতে দেখতে জ্বরও বেড়েছে। নেড়ুদা শশব্যস্ত। ডাক্তারের কাছে খবর দিয়ে ওষুধ আনলো, নিজের হাতে রান্না করলো, রোগীর সেবায় লেগে গেল,—তারপর কাপড় কাচলো, বাসন মাজলো। সেদিন আমাতে আর নেড়ুদাতে খুব ভাব। আমি তার দক্ষিণ হস্ত। আমি গিয়ে বৌদিদির মাথা টিপে দিলুম, সাগু খাওয়ালুম, পায়ের সেবা করতে ব'সে গেলুম। রাত্রের দিকে নেড়ুদা মেঝের উপর বিছানা পেতে শুয়ে পড়লো। আমি শুলুম বৌদিদির পাশে এবং সেদিন ঘুমিয়ে রইলুম অকাতরে। বৌদিদির বদলে যদি নেড়ুদা থাকতো একা বিছানায়—তা' হোলেও আমি এইভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারতুম।

তিনদিন বৌদিদির বেহুঁস জ্বর ছিল, ওই তিনদিন আমিও বেহুঁস হয়ে ঘুমিয়েছি। নতুন কালশিরের দাগ আর পড়েনি, নতুন ক'রে বেতের দাগ আর গায়ে ফোটেনি। জ্বর অবস্থায় বৌদিদি আমার ওপর খুশী ছিল না, আমাকে দেখলে সে খিট্ খিট্ ক'রে উঠতো। নেড়ুদা সেই দৃশ্য দেখে বরং একটু লজ্জিতই হোতো। কিন্তু আমি ছিলুম খুশী, পরম খুশী। নিশ্চিন্ত মনে আমি ঘুমিয়ে পড়তুম। ভাবতুম যতদিন মা-দিদিমা না আসে, ততদিন যেন বৌদিদির জ্বর না ছাড়ে। ততদিন যেন নেড়ুদা মেঝের বিছানায় শুতে বাধ্য হয়!

বৌদিদির জর যেদিন ছাড়লো, ঠিক তার পরের দিন সকালে ঘোড়ার গাড়ীর শব্দ পেয়ে ছুটে গেলুম সদর দরজায়। ভুল আমার হয়নি—গাড়ী এসে থামলো আমার সামনে। মা-দিদিমারা এসেছেন। সমস্ত লাঞ্ছনা আর উৎপীড়ন পলকের মধ্যে ভুলে গেল সেই সেদিনকার নাবালক। কোনো দাগ নেই দেহে, কোনো দাগ নেই মনে। দুইয়ের মধ্যে ফিরে এলো আবার অমৃতের আস্বাদ; আবার ফিরে এলো বিশ্বাস।

মা শুধু আমার দিকে স্থিরচক্ষে তাকিয়েছিলেন। নেড়ুদা বলতে লাগলো, মাসিমা, ছেলে তোমার একটুও দৌরাত্ম্যি করেনি, একটুও অবাধ্য হয়নি,—এমন শান্ত হয়েছিল যে, সবাই অবাক।

সমস্ত খেলনাগুলি প'ড়ে রইলো বিভীষিকার স্মৃতি নিয়ে। দিদিমা পরে আসছেন। মায়ের সঙ্গে আমি বেরিয়ে পড়লুম মামার বাড়ীর দিকে। আনন্দের কান্নাটা অধীর হয়ে উঠছিল দুই ঠোঁটের মধ্যে।

দিদিমার বাড়ীর উত্তরদিকে ছিল বহুদূর অবধি খোলার খাপরা আর বস্তিপল্লী। দক্ষিণ দিকে সম্ভ্রান্ত সমাজের পাড়া। ছোটবেলা ওইটুকুই ছিল চেনা জগৎ। ভুগোলে দেখতুম উত্তর দিকে হিমালয় পর্বত,—চিরদিন বরফে ঢাকা। কিন্তু খৃষ্টানদের গির্জা পেরিয়ে উত্তর দিকে আর আমার দৃষ্টি যেতো না—ওইটেই ছিল উত্তর মেরু। দক্ষিণ মেরুতে ছিল গলির প্রান্তে অর্জুন মুদির দোকান। এই দুইয়ের মাঝখানে আমার বাল্যকাল নিজের মনে জাল বুনে যেতো আমার অজ্ঞাতে। চেতনার মধ্যে পেতুম অনেক, কিন্তু বুদ্ধি আর যুক্তির দ্বারা বিচার ক'রে কিছু পাওয়া যেতো না। উত্তর-দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে খোলার খাপরার বস্তিতে দিনরাত্রির নিত্যকলরব লেগে থাকতো। সেখানে পাওয়া যেতো পালকির বেহারা, কেরোসিন তেলওয়ালা, নাপিত, লোহার কারখানার লোক, তেলকলের মজুর, ঝি-চাকরের বাসা, হাড়িমিস্ত্রী, চাঁচাড়িবোনা ডোম, কাওরাগোষ্ঠী, এবং আরো বহুজাতের মেয়ে পুরুষ। তখন ইতর-ভদ্রের পার্থক্য ছিল অনেক বেশী। শুনতুম ওই বিশাল পল্লীতে থাকতো অনেক গাঁটকাটা, সন্ধ্যার পরে অনেক অন্ধকারের মানুষ টলতে চলতে আনাচেকানাচে হানা দিত, অনেক সময়ে শোনা যেতো খুনখারাপির খবর, চুরিদারির সংবাদ। ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে আমি কাঁটা হয়ে থাকতুম।

কিন্তু ওই বস্তির জটিল গোলকধাঁধার মধ্যে আমাকে বাধ্য হয়ে যেতে হোতো কোনো কোনোদিন ভর সন্ধ্যায়। ওখানে কোন্ এক ঘরে থাকতো এক অন্ধ জরা-স্থবির বৃদ্ধ—সে জলপড়া জানতো, আবার ওঝার কাজও করতো।

শনিবার অমাবস্যার সন্ধ্যায় তেশুন্যে দাঁড়াতে গিয়ে কার ওপর ভর হয়েছে, কোন্

পোয়াতি বউ কোন্ তিথিতে না জেনে পানের বোঁটা ভেঙ্গে খেয়েছে, কোন্ শিশুর গায়ে লেগেছে 'হাওয়া', রাত গভীর হোলেই কোন্ মেয়েটা যেন ডরিয়ে ওঠে, নীচের তলায় অন্ধকারে নামতে গিয়ে কে যেন হাউমাউ ক'রে উঠেছে,—প্রাচীন বাড়ীর জরাজীর্ণ ইঁটকাঠের গন্ধের মধ্যে ব'সে আমি বিশ্বাস করতুম সমস্ত অবাস্তব ঘটনায়। আমাকে যেতে হোতো একঘটি জল আর একটি খড়কে কাঠি নিয়ে সেই অলিগলি বস্তির আঁকাবাঁকা গহ্বরে।

একটি খোলার চালার নীচে এসে দাঁড়াতুম। রেড়ির তেলের পিদিম হাতে নিয়ে একটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক টিপপরা পানখাওয়া মুখ নিয়ে এগিয়ে এসে আমার দিকে চেয়ে বলতো, সেই বাউনদের ছেলেটা। কি হয়েছে?

গলা পরিষ্কার ক'রে বলতুম, হাওয়া লেগেছে!

কার?

সেই পাঁচুঠাকুরের দোরধরা ছেলের।

স্ত্রীলোকটি বলে, ঘটিটা রাখো। পয়সা পাঁচটা এনেছ?

হাতের মুঠোর মধ্যে পাঁচটা পয়সা ততক্ষণে গরমে আর ঘামে ভিজে উঠেছে। পাঁচটি পয়সা দাওয়ার ওপর রেখে আমি কাঠ হয়ে দাঁড়ালুম।

ঘরের ভিতরে ইঁটের পায়া দেওয়া তক্তপোশ মটমট ক'রে উঠলো। ছিমছিমে রেড়ির আলোয় দেখতে পাই এক কৃশকায় অন্ধ বৃদ্ধ—নাকটা তার মস্ত, হাত দুখানা শুকনো কাঠের বরগার মতো লম্বা; দীর্ঘ দেহযষ্টি—দেওয়াল আর দরজা ধ'রে ধ'রে আন্দাজে এগিয়ে আসে। চোখ দুটোয় কালো তারা নেই, সবটাই হলুদে আর ঘোলাটে। লোকটা ধীরে ধীরে ব'সে পড়ে।

ঘটিটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে বুড়ো ধীরে ধীরে দু'একটি ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার পর বীজমন্ত্র আরম্ভ করে। সে মন্ত্রের শব্দ আছে, কিন্তু ভাষা দুর্বোধ্য। সেই মন্ত্রপাঠ চলে বহুক্ষণ,—বিজবিজ করে, ফিসফিস করে, ফুৎকার দেয়, হাত ঘোরায়, আবার এক পর্ব চলে। আমি চেয়ে থাকি শান্ত চক্ষে,—দেশ কাল জরা মৃত্যু ব্যাধি কুসংস্কার,—সমস্তর বাইরে আমার দুই মূঢ় অজ্ঞান আচ্ছন্ন চক্ষু ওর দিকে মেলে থাকি। লোকটি মন্ত্র পড়তে পড়তে একসময়ে ঘুমিয়ে নাসাধ্বনি ক'রে ওঠে, আবার ঘটিটা ধরে শক্ত হাতে। অবশেষে এক সময়ে খড়কে কাঠিটি নিয়ে আলোর দিকে হাত বাড়ায়। সময় বুঝে স্ত্রীলোকটি খড়কের মুখে আলোটা ধ'রে সেটি পুড়িয়ে দেয়, বৃদ্ধ সেই পোড়া জলের মধ্যে ডুবিয়ে ধরতেই ছ্যাঁক্ ক'রে ওঠে। এইরূপ তিনবার। তিনবারের পরে সেই অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায়। স্ত্রীলোকটি বলে, নিয়ে যাও দুঝিনুক খাইয়ে দাও গে।

জামার তলায় সেই ঘটি লুকিয়ে নিয়ে একসময়ে আমি বস্তি থেকে বেরিয়ে আসি। অন্ধকার পেরিয়ে আসি আলোর দিকে, মৃত্যুর থেকে জীবনের প্রান্তে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

সেই জলপড়া শিশুকে খাওয়াবামাত্র অসুখ সারে। শিশু ঘুমিয়ে পড়ে মায়ের

কোলের কাছে—আর একটুও কাঁদে না। দুই ঝিনুক খেতে না খেতেই একেবারে ধন্বন্তরী।

দিদিমা নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, বুড়ো আছে ব'লেই সব দিক রক্ষে। নৈলে কি দশাই হোতো ছেলেপুলের।

মামা ছিলেন পাশের ঘরে ঘড়ি সারাবার কাজে ব্যস্ত। চোখ থেকে পরকলার ঠুলিটা নামিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে ব'লে ওঠেন, গুষ্টির মাথা! তিনবার জলে ফুঁ দিলেই অমনি পেঁচোয় ছাড়ে! কবচ না ধরালে বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না।

দিদিমা চেঁচিয়ে ওঠেন, থাম্ তুই থাম্…ক্ষণে অক্ষণে তুই কথা বলিসনে। নির্বংশ হ'লে তুই থাকবি, তোকে যেতে হবে না নিমতলায়?

আমি গেলে রেখে যাবো তোমাদের? ফলনা ভট্টাচার্যির বাড়ীতে ঘুঘু চরাবো, দারোয়ান ছোটাবো—তবে!

খবরদার—দিদিমার গলা ঝনঝনিয়ে ওঠে,—মুখ সামলে কথা বলিস। এ বাড়ী তোর নয়, তুই-এর মালিক নস,—এ বাড়ী স্ত্রীধনে কেনা সম্পত্তি…খবরদার!

মামা গর্জন ক'রে উঠেন, স্ত্রীধনে কেনা? এলো কোত্থেকে স্ত্রীধন? রমেশ মিত্তিরকে ঘুষ খাইয়ে জাল উইল রেজেস্টারি হয়নি? হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গবো তবে?

দিদিমা বলেন, ভাঙ্, যত হাঁড়ি তোর আছে এনে ভাঙ্! বড্ড বাড়িয়েছিস তুই! তোর রোজগারে বাড়ী কেনা? তুই টাকা দিয়েছিলি?

মামা বলেন, আর দেরি নেই। সব কাগজ বার করেছি। এবার নালিশ ঠুকবো হাইকোর্টে। গরু বাছুরের দল তাড়াবো সব বাড়ী থেকে।

দিদিমা বলেন, তাই করিস। তোর যা ক্ষমতা তাই দেখাস। বাড়ীভাড়ার সাতটাকা ক'রে তোকে মাসে মাসে দিই তাও বন্ধ করবো চোতমাস থেকে। তোকে আমি পথের 'বেগার' ক'রে তবে ছাড়বো। আ মর, এক তরকারী তাও নুনে পোড়া!

মামা জামা-কাপড় প'রে দুম দুম ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। যাবার সময় শাসিয়ে বলেন, রাতটা পোয়াক, দেখবো কাল সকালে! ছুরিখানা ততক্ষণে শান দিয়ে আনি।

মামা চ'লে যেতেন সদর দরজার দিকে। মামী সেই সময়ে চক্ষের নিমেষে এসে দাঁড়াতেন দিদিমার সামনে। বলতেন, দু'আনা পয়সা দিলেই ত' ঝগড়া মিটে যায়।

দিদিমা চোখ পাকিয়ে ওঠেন, কিসের পয়সা? আমার কি কুবেরের ভাঁড়ার আছে?

মামী বলেন, আপিঙের পয়সা নেই, তাই নিত্যি কেলেঙ্কার। আমারও আর সয় না। দু'আনা দিলেই ডাকাত শান্ত হয়।

গালমন্দ কটুকাটব্য ক'রে দিদিমা দু'আনা পয়সা বার ক'রে দেন। মামী সেই পয়সা নিয়ে সদর দরজার দিকে অগ্রসর হন। মামা সেখানে ভূতের মতন দাঁড়িয়ে।

ওই দু'আনার পর শানানো ছুরি আবার ভোঁতা হয়ে আসে, জাল উইল প্রমাণিত হয় না, হাইকোর্টে নালিশ ঠোকার প্রয়োজন ম'রে আসে, —এবং তারপর দেখতে দেখতে আবার সাময়িকভাবে নিরস্ত হয়। খানিক রাত্রে নিমীলিত নেত্রে অত্যন্ত মিষ্টভদ্র

মেজাজে মামা ভিন্ন মানুষ হয়ে ফিরে আসেন। সিঁড়ির কাছে আমি আলো দেখাই। তিনি উঠে এসে সস্নেহে বলেন, গুয়োটা, এখনও জেগে আছিস? নে তবে—এই ব'লে চাদরের ভিতর থেকে শালপাতা মোড়া ছোট একটি আম-সন্দেশ বার ক'রে দেন।

লুকিয়ে লুকিয়ে সেই ঝোড়ো ময়রার সন্দেশ অনেকবার খেয়েছি, বাড়ীর লোকেরা কেউ জানেনি।

ঘুঘু চরানোর কথায় ঘুঘুর ডাক আমার মনে প'ড়ে যেতো। ঘুঘুর ডাকের মধ্যে হয়ত করুণ স্বর আছে তাই লোকে ভয় পায়। চৈত্রের দুপুরে বেলগাছের ঝিলিমিলি ছায়ায় ক্লান্ত কাকের কণ্ঠে একপ্রকার বিকৃত স্বর শোনা যায়,—সেটাও নাকি অলুক্ষণে। কিন্তু আমি থাকতুম কান পেতে, আমি শুনতুম ওদের মধ্যে বুকফাটা সঙ্গীত, দুপুরের উদাসী হাওয়া আমার হৃৎপিণ্ডকে ছিঁড়ে নিয়ে কোথায় যেন উধাও হয়ে যেতো।

হঠাৎ নীচের তলায় শোনা যেতো চীৎকার। বেঁকি তার কোলের মেয়েটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে কলতলায়।—মর, ম'রে যা—ওলাউঠোয় শেষ হয়ে যা। কেঁদে কেঁদে সেই থেকে—বলো দিকি তোমরা—আমার হাড়মাস খেলে। ম'রে যা না? মরতে পারিসনে?—এই ব'লে সে নিজেই নিজের মাথা ঠোকে।

বেঁকির ভালো নাম সরলা। পায়রাটুনিতে তার শ্বশুরবাড়ী। সে চার পাঁচটি ছেলেপুলের মা! সবাই মিলে তাকে ক্ষ্যাপাতো। এ বাড়ীতে বেঁকি এসে প্রায়ই দেওয়ালে মাথা ঠোকে। করোগেটের বালতি শানের ওপর আছড়ে ভাঙে; আগুনে জ্বালিয়ে দেয় ঘরকন্নায়। তার উচ্চকণ্ঠের কান্না শুনে প্রতিবেশীরা এসে জড়ো হয়। পরে দেখা যায় কিছু খেতে পেলেই বেঁকি শান্ত। দিদিমা তাকে ডেকে আড়ালে দুখানা রুটি দিলে সে ভারী খুশী হয়ে খেতো। ছেলেপুলে হোলেও স্বাস্থ্য তার তখনও ঝরেনি।

বাড়ীতে আসতো এক জামাই, নাম সত্যনারায়ণ। সে গেরুয়াপরা সন্ন্যাসী, মাথায় পাগড়ী। একখানা পা তার খোঁড়া, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে কোথা থেকে যে আসতো আর কোথায় বা চ'লে যেতো,—আমরা তার হদিস পেতুম না। ওই সন্ন্যাসী একদিন যাচ্ছিল নাকি রাস্তা দিয়ে দুপুরবেলায়। গরাণহাটার কোন্ বাড়ীতে তাকে ডেকে খাইয়ে দাইয়ে খোকনের সঙ্গে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তার বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের পরে বউ আর স্ত্রী নয়,—বরেরও আর প্রয়োজন নেই। জামাইয়ের হাতে পাঁচটি টাকা দিয়ে বলা হয়েছিল, তোমার মহন্ত বাবাজির হাতে এই চাঁদা দিয়ে দিয়ো। তুমি যে মেয়েটার আইবুড়ো নাম ঘুচিয়ে দিয়ে গেলে এজন্য তোমাকে আশীর্বাদ করি।

সত্যনারায়ণ বললে, কিন্তু আমার বউ?

তোমার বউ তোমারই রইলো। মাঝে মাঝে এসে দেখে যেয়ো।

সেই থেকে সত্যনারায়ণ আসে বছরে হয়ত বার দুই। তার বউকে সে খুঁজে বেড়ায় এখানে ওখানে। বড় বউ বেরিয়ে এসে বলে, ভালো আছো সত্যনারায়ণ? অনেকদিন পরে দেখা।

খোঁড়া সত্যনারায়ণ বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ—

খাওয়া হয়েছে আজ ?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

তোমার কি শরীর ভালো নেই ?

আজ্ঞে না—

বড়বউ বলেন, কিছু বলতে এসেছিলে বুঝি ?

সত্যনারায়ণ মুখের দিকে তাকায়। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসতো কিনা, আমার ঠিক মনে পড়ে না। তারপর সে মুখ ফিরিয়ে বলতো, আজ্ঞে না।

দিদিমা ভিতর থেকে সাড়া দিয়ে বলতেন, বাইরে কে এসেছে নাত্‌বউ ?

বড়বউ চট ক'রে ভিতরে এসে বলতো, না, কেউ নয়। চুড়িওলা !

আমি দাঁড়িয়ে থাকতুম সদর দরজায়। খোঁড়া সত্যনারায়ণ চ'লে যেতো গলি পেরিয়ে,—আমার মন ছুটতো তার পিছু পিছু তারই সঙ্গে কোন্ অজানা পথে।

খোকনের একঘণ্টার বিয়ের সজ্জা দেখিনি বটে, কিন্তু দেখেছি মামাতো-মাসতুতো ভাইবোনদের বিয়ে। যে ব্যক্তির সঙ্গে দিবারাত্রির জীবনযাত্রা মিলেমিশে থাকতো—সেই ব্যক্তি বরাভরণ প'রে যখন চতুর্দোলায় চ'ড়ে বিয়ে করতে চললো, সেই দৃশ্য আশ্চর্য। ইংরেজী বাজনা চলেছে আগে আগে, আগে আগে চলেছে মাদ্রাজী ফ্লুট। দু'ধার দিয়ে চলেছে পদাতিক গ্যাসলাইটের সারি নিয়ে। যাকে দেখেছি অতি পরিচিত ঘরকন্নার অত্যন্ত আপন মানুষের জায়গায়,—সে আজ সরে দাঁড়ালো সকল সম্পর্কের বাইরে জনসাধারণের মাঝখানে। আলোয়, আমোদে, আনন্দে, কোলাহলে যখন সমস্ত বাড়ীটা মুখর,—আমাকে কে যেন নিয়ে যেতো লোকচক্ষুর অন্তরালে একান্ত নিভৃতে,—যেখানে আলো পৌঁছয় না, যেখান থেকে কলরব কোলাহলের রেশ শোনা যায় মাত্র। আমি কিছু একটা ভাবতুম,—সে ভাবনাটা বিচ্ছেদের কি বেদনার, ঠিক মনে পড়ে না। কিন্তু অনেকক্ষণ পরে ক্লান্ত শরীরে সেইখানেই ঘুম আসতো। তারুদিদি যেদিন কপালে সিঁদুর মেখে প্রবাসী বরের সঙ্গে গিয়ে গাড়ীতে উঠলো, সেদিন মামা বললেন, যাক্, ঘরের বেড়াল বিদেয় হোলো। বাড়ীটা ঠাণ্ডা।

দিদিমা হেঁকে উঠলেন, কি বললি তুই ?

মামা বললেন, বলবো আবার কি ! ডালিমগাছের ফুল কাকে নিয়ে গেল। ঢাকি-সুদ্ধ বিসর্জন।

আ মর, হেঁয়ালী করতে এলো ! যা গাঁজায় দম দিগে যা।

মামা মুখ বিকৃত ক'রে বললেন, নাতি-নাতনীদের যে শাঁসশুদ্ধ চেটে খাওয়ালে। দুটো টাকা চাইছি বিয়ের আগের থেকে। সাতশো রাক্কুসীর ঘর পেরিয়ে আমার হাতে আর পৌঁছয় না।

সাতশো রাক্কুসী তুই কাকে বললি, ড্যাকরা ?

বলছি তোমার গুষ্টিকে।

আমার গুষ্টি? ধোয়া ছাতারে ধুয়ে যাক্ তোর সব। এক কুন্‌কে চালের ভাত ছ'মাস খা। দুটি চক্ষের মাথা খা।

মামা গর্জন ক'রে বললেন, আমি কিন্তু আবার ছুরিতে শান্ দেবো! ফলনা ভট্‌চার্যির টাকায় নাতনীর বে' হোলো, আমি কি জানিনে কিছু! টাকা আমার চাই,— নইলে হাইকোর্ট।

ঘুমের মধ্যে তারুদিদি আসে আমার পাশে। আর আসে সত্যনারাণ চতুর্দোলায় চ'ড়ে। মাথায় টোপর, লাল মখমলের সজ্জা, গলায় গ'ড়ের মালা, কপালে বরচন্দন। তারুদিদিকে সে বিয়ে ক'রে নিয়ে যায় আমার ঘুমের মধ্যে। নিয়ে যায় দূরে,—অনেক দূরে—সকল কোলাহলের বাইরে তারা ছুটে যায় ধুলো উড়িয়ে। সামনের পথটা ধুলোয় ধুলোয় অন্ধকার। ঘুমের দেশের দিগন্তে আমার দৃষ্টি আর পেঁছিয় না।

ভোরে ঘুম ভাঙলে উঠে যেতুম ছাদে একা একা। কচিদের বাড়ীর ওপারে তখনও সূর্যের আভা দেখা দেয়নি। তখনও কেউ ওঠেনি, এই ছিল কৌতুক। চেয়ে দেখতুম ঠাণ্ডা আকাশে—সেখানে উর্মিশ্রেণীর মতো মেঘ,—সেই মেঘ রঙীন হোতো আমার চোখের ওপরে। সূর্য ওঠার আগে নেমে আসতুম।

আগুনের ফিন্‌কি ফুটতো মামার দৈনন্দিন ব্যবহারে। কিন্তু এক একবার জ্বলে উঠতো দাবানল। তাঁর দানবীয় দাপাদাপিতে সপরিবারে গিয়ে প্রতিবেশীর বাড়ীতে আমাদের আশ্রম নিতে হোতো। সেদিন একবেলা হাঁড়িচড়া বন্ধ। খবর দেওয়া হোতো অক্রুর চাটুয্যেকে।

অক্রুর চাটুয্যের ছিল পিছন দিকে লম্বা শাদা চুলের রাশি, সামনের দিকে পাকা দাড়ি। কপালে লাল সিঁদুরের ফোঁটা, চোখে চশমা,—স্বাস্থ্যবান দীর্ঘকায় দেহ। চোখ দুটো ভয়াবহ। তিনি এসে হাক দিতেন—ভট্‌চায?

মামা অমনি শান্তকণ্ঠে জবাব দিতেন, হুজুরে হাজির।

চাটুয্যে বললেন, তুই নাকি সেজখুড়ীকে আবার জ্বালাচ্ছিস?

মামা বললেন, আর আমি যে জ্বলে পুড়ে গেলুম?

চাটুয্যে হেসে বললেন, কল্‌কের আগুনে পুড়ছিস নাকি? বুড়ো হোতে চললি, এখনও টাকার জন্যে মা'র সঙ্গে ঝগড়া? হতভাগা, যা আর অশান্তি বাধাসনে। টাকা পাবি।

অক্রুর চাটুয্যের পর আসে গোসাঁইকলু। গোসাঁইকলু আসছে শুনলেই আমরা সবাই লুকিয়ে পড়তুম। তার শরীরের ওজন নাকি সাড়ে চার মণ। বয়স কত তার আমরা কেউ জানতুম না। একটা পাঁঠা নাকি সে খায় একা,—আটটা মুগরী তার জলযোগ। পাঁচসের খাঁটি দুধ। সেই অনুপাতে আর সব খাদ্য। তার মাথায় চুল গজায় না, কিন্তু সর্বাঙ্গে তামাটে রঙের লোম। তার গায়ের বর্ণ আর চোয়াল দেখলেই মনে পড়ে জলহস্তীর কথা। এককালে সে নাকি কুস্তির পালোয়ান ছিল। তাকে আসতে দেখলেই পাড়ার কুকুরগুলো ভয়ানক ডাকাডাকি করতো,—যেমন ডাকাডাকি করতো কাবুলীওয়ালাকে দেখে। গুণ্ডা-সর্দার গোসাঁইকলুকে সবাই চিনতো।

তার গলার আওয়াজে একপ্রকার ভগ্নস্বর শোনা যেতো। দরজার কাছে এসে গোসাঁইকল্‌ডু ডাকতো, সেজখুড়ি ?

দিদিমা বেরিয়ে আসতেন। অভ্যর্থনা ক'রে বলতেন, এসো বাবা এসো। শরীর ভালো ত' ?

দিদিমার পিছন দিকে একটি নেংটি ইঁদুর—সে আমি। আমি গোসাঁইকলুর শরীরের দিকে তাকালুম,—সে দেহের আদি অন্ত নেই। কোথাও কিছু ঘা, কোথাও হাজা, কোথাও বা কোনো আঁচড়ের দাগ। গালের উপর একটা দীর্ঘ ক্ষতচিহ্ন। কবে নাকি কার ছুরির ফলা ঢুকেছিল ওই গালে। বাঁ-পায়ে ছেঁড়াচুলের সঙ্গে কড়ি বাঁধা। সর্বাঙ্গ তেলা—তেলা !

গোসাঁইকলু বললে, শরীর ভালো থাকবে কেমন ক'রে বলো, সেজখুড়ী ? খাবার জিনিস কী আক্‌রা। মানুষ বাঁচবে কী খেয়ে ? তিন টাকা মণ চাল, সাড়ে তিন টাকা মণ ডাল। মাংস সাত আনা, দশ পয়সা দুধ, চোদ্দ পয়সা সরষের তেল ! একসের ঘি কিনতে গেলে বারো গণ্ডা পয়সা লাগে—খাবো কি ?

তোমার শরীর এবার একটু কাহিল দেখছি বাবা।

ডেকেছ কেন, সেজখুড়ী ?

দিদিমা কেঁদে বললেন, দস্যিকে নিয়ে আর ত' পারিনে বাবা। প্রাণে মরতে বসেছি।

গোসাঁইকলুর চোখ লাল হয়ে উঠলো। বললে, তুমি দস্যির ভয়ে প্রাণে মরবে, আর আমি বেঁচে থাকবো, সেজখুড়ী ? তোমার কর্তার অন্নজল এখনও আমার পেটে আছে তা জানো ? কই ডাকো দেখি তোমার সুপুত্তুরকে। ভাবলুম খাঁদাকে পাঠাই, কিন্তু তুমি ডেকেছ,—আমি নিজে না এলে চলবে কেন ?

মামা এসে দাঁড়ালেন অন্যদিক থেকে। গোসাঁইকলু বললেন, তুমি ভেতরে যাও, সেজখুড়ী—রান্নবান্না করগে। আজ দুটি পেসাদ খেয়ে যাবো।

দিদিমা চ'লে গেলেন আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে। আমি তখনও উঁকি মারছি দেখে জলহস্তী করাল চক্ষে একবার আমার দিকে কটাক্ষ করলো। নেংটি ইঁদুর অমনি পালালেন ফুড়ুৎ ক'রে।

মাঝের দরজার ফুটো দিয়ে চেয়ে আছি ওদের দু'জনের দিকে। আমাদের নিঃশ্বাসরুদ্ধ দৃষ্টি। দেখতে পাচ্ছি মামা গম্ভীর মুখে ভক্ত শিষ্যের মতো ব'সে রয়েছেন গোসাঁইকলুর পায়ের কাছে। একসময়ে গোসাঁইকলু একটি কাগজের মোড়ক বার ক'রে দিয়ে বললে, সাজ একহাত, ছিলিম আছে।

কোটের পকেট থেকে মামা একটি সরু কল্‌কে বার করেন। কাগজের মোড়কে শিকড়সুদ্ধ শুকনো একটা জট। তাই ছিঁড়ে-ছিঁড়ে কল্‌কেয় ভ'রে আগুন ধরান। ময়লা একটুকরো ন্যাকড়া কল্‌কের তলায় জড়িয়ে নিয়ে আগে গোসাঁইকলু সুদীর্ঘ টান দিল। সেই ধোঁয়া আর সহজে বেরোয় না। সে-ধোঁয়া যেন সেই বিশাল দেহের রন্ধ্রে ঢুকে কিছুক্ষণের জন্য পথ হারালো,—তারপর ঘুরে বেরিয়ে এলো নাকের ভিতর দিয়ে।

মামা টানলেন তারপর। তাঁরও সেই একই ইতিবৃত্ত। এক সময় দপ্ ক'রে কল্কের মাথাটা জ্বলে উঠলো।

গোসাঁইকলু বললে, ভটচায্, তোমার দাড়ি পাকলো, এখনও আক্কেল হোলো না?

মামা বললেন, তোমার দিব্যি, মাইরি—আমার কোনো দোষ নেই।

তবে সেজখুড়ী কাঁদেন কেন?

মামা বললেন, জামাই মরেছে তাই কাঁদে।

তুই ঝগড়া করিস?

রাম বলো!—মামা আবার কল্কেয় টান দেন। তাঁর কণ্ঠে যেন মাধুর্য ফুটে ওঠে।

গোসাঁইকলু বলে, ঘড়ির কাজ করিস। কত পাস?

আট দশ টাকা হয়।

তবে আবার ঝগড়া কিসের? বেশ ত' চলে?

মামা বললেন, দশ টাকায় কী হয় আজকাল?

না হয় আমাদের কাছে নিবি। মাকে জ্বালাস কেন?

মামা যেন এবার একটু সহাস্য মুখে বলেন, অল্পে সুখ নেই, ভাইরে!

গোসাঁইকলু বললে, বেশী পেলেও সুখ নেই। তুই ত' বড়লোকের ছেলে ছিলি। পাঁচটা মেয়েছেলে রেখে সুখে সচ্ছন্দে কাটাতে পারতিস। লেখাপড়া শিখতে গিয়েই ত' মাটি করলি,—যত কুবুদ্ধি ঢুকলো মাথায়—এই নে, টাকা পাঁচটা রেখে দে। আপিঙের চেয়ে গাঁজা ভালো, মনে রাখিস। আর ঝগড়া করবি?

মামা বললেন, না।

আর আমাকে আসতে হবে না ত'?

না।

নে, হাতখানা ধর—উঠে দাঁড়াই।

মামার সাহায্যে গোঁসাইকলু সেদিনকার মতো উঠে দাঁড়ালো। আমরা বুঝে নিলুম, আগামী মাসখানেকের জন্য এ বাড়ীতে শান্তি বিরাজ করবে।

পথে নেমে গোঁসাইকলু বললে, সেজখুড়ীর পাতের চারটি পেসাদ আমাকে পেঁছে দিবি। জগৎজননী মা আমার! খবরদার ভট্চায, এবার বাঁদরামি করলে তোকে আর আস্ত রাখবো না।

মামা আপাতত বললেন, যে আজ্ঞে।

সরলার কাহিনীটুকু কিন্তু ওখানেই শেষ হয়নি।—

পায়রাটুনি নামক পল্লীটি নাকি কলকাতার কোন্ পূর্ব প্রান্তে। বাগমারী আর কাঁকুড়গাছি ছাড়িয়ে নাকি সেই বস্তি। আমরা সেখানে কখনো যাইনি, কিন্তু সেখানে সেই বস্তির ধারে কোন্ সরকারী জলের কলের পাশ দিয়ে আর নর্দমার ধার দিয়ে গেলে পাওয়া যেতো সরলার শ্বশুরবাড়ী। দুখানা করোগেটের ঘরে নাকি থাকতো লক্ষ্মীবাবু

আর কাজ করতো উল্টোডিঙ্গির তেলের কলে। মাইনে ছিল পঁচিশ টাকা। দু'টাকা যেতো ঘরভাড়া আর একটাকা লক্ষ্মীবাবুর পকেট খরচা। বাকী বাইশ টাকায় পাঁচটা ছেলেমেয়ে সুদ্ধ পরিবার নিয়ে দিব্যি সংসার চ'লে যেতো। ধার-দেনা ছিল না।

সেই সরলা হঠাৎ আবার একদিন বিধবা হয়ে দিদিমার সামনে এসে দাঁড়ালো। কোলের সেই দেড় বছরের মেয়েটাকে সে সঙ্গে এনেছে, ওপরের ছেলেমেয়েগুলোকে রেখে এসেছে দেওরের কাছে। দেওর নাকি নিঃসন্তান। সরলার মস্ত বড় দাঁতের পাটিটা প্রায়ই থাকে মুখের বাইরে, এবং জিবটা একটু বেশী রকম লম্বা ব'লে বাইরে আসে। তাকে দেখলে কালীঘাটের করালবদনী কালীকে মনে প'ড়ে যেতো।

এ বাড়ীর সরলার পূর্বপরিচয়টা খুব গৌরবের ছিল না, সেই জন্য সে যখন সদ্য-বিধবা হয়ে দাঁড়ালো, তখন অল্পস্বল্প চোখের জল ফেললো এ বাড়ীর বিধবারা। আর সবাই এদিক ওদিক মুখ চাওয়াচাওয়ি করে আড়ালে আবডালে স'রে গেল। দিদিমা মিনিট খানেকের জন্য কান্নাকাটি করলেন। কিন্তু কান্নার চেয়ে তাঁর গলার আওয়াজটা ছিল বড়, এবং আন্তরিকতার চেয়ে লৌকিকতা ছিল বেশী। তিনি ক্ষেদোক্তি ক'রে একবার বললেন, আবাগী, নাতজামাইটাকে খেয়ে এলি, শাঁখা সিঁদুর নিয়ে নিজে তুই যেতে পারলিনে?

সরলার সেই পূর্বপরিচিত ঝঙ্কার শোনা গেল,—তোমরা বাপু সবাই মিলে বড্ড আমার মরণ ডাকো! মরেছে, তা আমি কী করবো? আমি মেরেছি? দুটো পয়সা মুড়োকি খেতে চাইলে হাতে তুলে দেয়নি কখনো! অমন মানুষ থাকলেই বা কি, গেলেই বা কি?

মামা চীৎকার ক'রে বললেন, আমি পারবো না! পাঁচ ছ'টাকা যা আমার রোজগার তাতে আমারই চলে না। আমি পারবো না বিধবা পুষতে!

দিদিমা হুঙ্কার দিলেন, গরুবাছুর তবে কি আমার গোয়ালে ঢুকলো। তোদের মতলবটা কি শুনি?

আর সবাই চুপ। সরলা ঢুকলো দিদিমার হেঁসেলে। কোলের মেয়েটার নাম বুনি। সে খায় যত, কাঁদে তার চেয়ে অনেক বেশী। মাথায় তখনও চুল হয়নি, দেড় বছরের জীবনে আজও জামা ওঠেনি গায়ে। চেহারাটা কদাকার, চোখ দুটো ছোট ছোট।

সরলার দাদা বললে, চোদ্দটি টাকা আমার মাইনে। আমি এর থেকে দেবো কেমন ক'রে? একখানা থান কাপড়ের দাম দশ বারো আনা—দেবো কোত্থেকে?

দিদিমা বললেন, কেউ কিছু না দিলে ওকি ভিক্ষে করতে বেরোবে?

দাদা বললে চাষাভুষোরা ভিক্ষে করে না, বামুন-কায়েতের বিধবারাই হাত পাতে! যাক্ না কেন আনন্দময়ীতলায়, সেখানে আঁচল পেতে বসুকগে।

পিছন থেকে সরলা চেঁচিয়ে ওঠে, মুখ সামলে কথা বলিস। তোর খাই না পরি? বোন ব'লে মিষ্টি হাতে দিয়েছিস কখনো? বিধবা হয়ে এলুম, একবেলা হবিষ্যি করতে ডেকেছিস?

দাদা পা চাকা দেয়।

দিদিমাই অবশেষে সরলার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। বললেন, ঘরকন্নায় এসে ঢুকেছে, বেশ—খেটে খাও। কুটনো, বাটনা, বাসন মাজা, ঘর ধোয়া, কাপড় কাচা—আজ থেকে সব করবি। একবেলা দুটি ক'রে খাবি আর ওই বারান্দায় প'ড়ে থাকবি। বছরে চার খানা কাপড় আর একখানা গামছা।

মামা বললেন, কোলের মেয়েটার কি দশা হবে?

দিদিমা বললেন, পাত কুড়িয়ে এঁটোকাঁটা খেয়ে মানুষ হবে! আর আমি কী করবো?

নীচের তলায় হঠাৎ দুমদুম ক'রে শব্দ আরম্ভ হোলো। ঠিক তারই সঙ্গে সরলার চীৎকার। মর্ না মর্ না তুই, তোর জন্যেই ত' হাড়ে-নড়ে জ্ব'লে পু'ড়ে যাচ্ছি! মর্, ওলাউঠোয় মর্!

শিশুসন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহের শাসন সেটা নয়—সে যেন ভিন্ন চেহারা। প্রহারের শব্দে আতঙ্কিত হয়ে কেউ কেউ নীচে কলতলায় এসে উঁকি মারতো। কলতলায় থৈ থৈকার এঁটোকাঁটা আর নোংরা বাসনের মাঝখানে বুনি ব'সে ব'সে কী যেন মুখে তুলছে, এবং সরলা বিনা নোটিশে মেয়েটার বিনা অপরাধে হঠাৎ তার ওপর হিংস্র প্রহার আরম্ভ করেছে। আঘাত খেতো সে বাইরের থেকে, বিক্ষোভ দাহন জমে উঠতো তার মনে—আর সুবিধামতো তারই প্রতিশোধ তোলে মেয়েটার ওপর। মেয়েটাও তেমনি। মার খেয়ে সহজে আর কাঁদে না, মুখে একপ্রকার শব্দ করে। কেন্নোর গায়ে টোকা মারলে সেটা যেমন কুঁকড়ে ছোট হয়ে যায়, মেয়েটাও ঠিক সেই ভঙ্গীতে গুটিয়ে থাকে। যত মারো লাগে না তার। মাঝে মাঝে আমরা ওই মেয়েটার ছোট ছোট চোখ দুটোর ভিতর চেয়ে দেখতুম। শিশু মেয়ে বটে, কিন্তু চোখ দুটোর বয়স যেন অনেক বেশী। ও যেন সব জানে, শুধু কথা বলে না। ও যেন মানুষের নোংরামি, ধূর্ততা, অসাধুতা—সব বোঝে। কিন্তু কথা বললে পাছে সবাই ভয় পায়, তাই চোখ দিয়ে কথা বলে। সবাই বলতো পেঁচোয় পাওয়া মেয়ে—ওর কাছে কেউ একলা থাকে না যেন। কেউ কেউ বলে, মেয়েটা একলা থাকলে নিজের মনে ফিস ফিস ক'রে কার সঙ্গে যেন কথা কয়, ও নাকি অন্ধকারের মাঝে সিঁড়িতে নেমে ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে ও-বাড়ীর জনশূন্য কলতলাটার দিকে চেয়ে থাকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে হঠাৎ ওর দিকে চোখ পড়লে গা ছমছমিয়ে আসে। বাড়ীর সমস্ত ছেলেমেয়েরা ওকে দেখলেই পালায়।

একাদশীর কাছাকাছি তিথি এলেই বাড়ীতে কোনো একপ্রকার আড়ষ্টতা দেখা দিত। একাদশীর দিন সরলা কোনো কাজ করতে চাইতো না, এবং তাই নিয়ে দেখা দিত অশান্তি। বেলতলার ছাদের এক কোণে গিয়ে সরলা বুনিকে সামনে বসিয়ে নিজে ব'সে থাকতো গুম হয়ে। কারো কথা বলবার সাহস হোতো না। আশ্চর্য করতো ওই বুনি—ওই দেড় বছরের মেয়েটা। ওই মেয়েটাও একাদশী করতে বাধ্য হোতো মায়ের সঙ্গে। সরলা অপেক্ষা করতো মেয়েটা কাঁদবে কতক্ষণে। মেয়েটা সহজে কাঁদতো না, কেননা সে জানে কাঁদলেই তার ওপর মায়ের অবশ্যম্ভাবী আক্রমণ। সে-

আক্রমণ বাৎসল্য অথবা স্নেহের কোনো তোয়াক্কা রাখতো না, সেই আক্রমণে সন্তানের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্যের লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া যেতো না। বাইশ-চব্বিশ বছরের নারীর বলিষ্ঠ বাহুর দিকে তাকিয়ে মেয়েটা কাঁদতো না, ঠকঠক ক'রে কাঁপতো। মেয়েটার মুখে ভাষা নেই, চোখে কান্না নেই—কিন্তু তার আচরণে থাকতো কেমন একটা আবেদন, সে-আবেদন ক্ষুধার আর তৃষ্ণার। মধ্যাহ্নকাল উত্তীর্ণ হয়ে যেতো—বুনি ব'সে আছে সরলার পায়ের কাছে। কখনো ঘুমিয়ে পড়েছে, কখনো বা জেগে নেড়ি কুকুরের মতো মাথা ঘষছে ধুলোয়। ক্ষুধাটাকে জানানো চাই, জানানো চাই মনুষ্যত্বের দরবারে মৃদু অভিযোগ।

অভিযোগ! দড়াম ক'রে এক চাপড় বুনির পিঠের ওপর। লুকিয়ে দেখে আসতুম, কচি পিঠের ওপর পাঁচটি আঙ্গুলের দাগ। সরলা সবাইকে শুনিয়ে গলা উঁচিয়ে বলতো, মলো যা—রাত-দিন ক্ষিধে। কে আছে তোর যে, পেটপুরে খাওয়াবে? মর্, পা চাটছে দেখো তখন থেকে!

মেয়েটা কুঁকড়ে প'ড়ে থাকতো পায়ের তলায়।

অপরাহ্নের দিকটায় অসহ্য হোতো সকলের। দিদিমা বেরিয়ে এসে বলতেন, একবাড়ী লোক থাকতে তুই কি স্ত্রীহত্যে করবি, আবাগী?

এই সুযোগটাই সরলার দরকার ছিল। নিস্তব্ধ বাড়ীটা তার কণ্ঠস্বরের ঝনঝনানিতে কেঁপে উঠতো। বলতো, ওই ওর জাতের স্বভাব, কেবল খাবো! হাড় খাবো, মাস খাবো! কে খাওয়াবে শুনি? তার চেয়ে ম'রে যাক্ না!

তাই ব'লে তুই ওকে খেতে দিবিনে, হতভাগী?

কথায় কথায় বিবাদটা প্রচণ্ড চেহারা নিয়ে দেখা দেয়। মেয়ে-পুরুষ ছুটে আসে। কেউ আনে লাঠিঠেঙ্গা, তামাকের টিকে ধরাবার চিম্‌টে হাতে নিয়ে মামা আসরে ঝাঁপিয়ে পড়েন, আর সরলা ছুটে গিয়ে মাছ কোটার বঁটিখানা তুলে নিয়ে আসে। বাড়ী কম্পমান, পাড়াঘরের দরজা জানালা খুলে যায়। আকাশের দেবতারা ভয়াকুল, রণরঙ্গিনীর নাচনের দাপাদাপিতে সৃষ্টি বুঝি রসাতলে যাবে। এই অবসরে কে যেন হঠাৎ পিছন থেকে এসে বুনিটাকে ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে পালায়। মেয়েটার সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা, তেলাতেলা, অথচ কালোর ওপরে কেমন চিক্কণ, পিচ্ছিল। গায়ে হাত দিলে হাতখানা ধুয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। মেয়েটা কথা বলতে শেখেনি, হাসতেও শেখেনি। কেবল আছে তার চাহনি, সে চাহনি অর্থপূর্ণ।

কিন্তু মায়ের হাত থেকে নিয়ে কত দূরে পালানো যায়? আঁসবঁটি হাতে নিয়ে সরলা তখনই ঘুরে দাঁড়ালো। বললে, আমার মেয়ে কই? কোথায় আমার মেয়ে? শিগগির ফিরিয়ে দাও বলছি—নৈলে—

অস্ত্র হাতে নিয়ে রক্তচক্ষে সরলা এদিক ওদিক তাকায়। অবশেষে দাদা এসে পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে বঁটিখানা ওর হাত থেকে কেড়ে নেয়। মামী এসে দিয়ে যায় বুনিকে ওর পায়ের কাছে। তার পরের দৃশ্যটা বীভৎস। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে বুনির ওপর। বুনি মুখে শব্দ ক'রে আর কাঁপে। সরলা তাকে ওপরের সিঁড়ি থেকে

নীচের দিকে লাথি মেরে গড়িয়ে দেয়। একতাল জীবন্ত মাংসপিণ্ড সিঁড়ির ধাপে ধাপে চোট খেয়ে খেয়ে মাঝের বড় সিঁড়িতে গিয়ে পরে। বড় সিঁড়িতে প'ড়ে বুনি কাঁদে না, উপর দিকে তাকায়। মাথাটা বারবার ঠুকছে বটে, কিন্তু এটুকুতে তার কিছু হয় না!

দিদিমা সমস্তটা লক্ষ্য ক'রে বললেন, হুঁ। বুঝতে পেরেছি সব। পাপপুণ্যি যা হয় ওর হবে, আমার কি? সরলাকে এখন থেকে আর একাদশীর উপবাস করতে হবে না!

সেই দিনই সন্ধ্যার পর দেখা গেল, বেলতলার ছাদের অন্ধকারে এক কাঁসি ভাত নিয়ে বসেছে সরলা এবং মায়ের পাশে ব'সে বুনিও টাউ টাউ ক'রে পান্তাভাত আর নুন গিলছে।

শ্রাবণের বৃষ্টি নেমেছে আকাশ ঘিরে। বেলাবেলি কাজ সেরে সবাই উঠেছে ঘরে। কিন্তু সরলা কোথায়? তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কেন? অবশেষে কে যেন তেতলার ছাদে গিয়ে আড়াল থেকে দেখলো, সরলা নুন দিয়ে পাকা তেঁতুলের গাঁট চুষছে অসীম তৃপ্তিতে আর ছোট মেয়েটা ছাদের ঠিক মাঝখানটিতে ব'সে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ধারায় হাবুডুবু খাচ্ছে। মেয়েটার আপত্তি নেই, প্রতিবাদ নেই, কোনো কাতরোক্তি নেই,—সে জানে, এমনি ক'রে জলে ভেজাটাই হোলো তারও হাতের মুঠোর মধ্যে তেঁতুলের একটা গাঁট। তবু ত' এটা তার মায়ের বদান্যতা! মেয়েটা বোধহয় ওতেই খুশী!

সেজমাসিমা বলেন, ডাইনী আবার তাকায় কেমন ক'রে দ্যাখো মা। শ্যাওড়াগাছের তলায় বসিয়ে দিয়ে এলেই হয়। মেয়েটা জাত স্যায়না!

শ্যাওড়াগাছ পাড়ায় কোথায় ছিল না। কিন্তু সরলা ওকে নিয়ে গিয়ে বসায় তেশুন্যে—যেখানে খোলা আকাশ। কার্তিক মাসের রাত্রি হিম পড়ছে—সেই ঠাণ্ডায় সরলা ওকে খোলা জায়গায় ঘুম পাড়ায়। প্রহারের আতঙ্কে বুনি সেই অন্ধকার ছাদের মেঝের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়ে। নিজে গায়ে মাথায় মুড়ি দিয়ে সরলা সেখান থেকে উঠে আসে। খানিক রাতে যদি কখনো মেয়েটার খোঁজ পড়ে, অমনি ফোঁস ক'রে ওঠে সরলা,—তোমাদের অত মাথাব্যাথা কেন বলো দিকি? আমাকে না খোঁটা দিলে তোমাদের চলে না, কেমন?

কেউ হয়ত বললে, এই ঠাণ্ডায় মেয়েটাকে কোথায় শোয়ালি বল্ না কেন?

সরলা পাড়া মাথায় ক'রে বলে, ভারি দরদ! মা-র পোড়ে না, পোড়ে মাসির,—তোমাদের ঘাড়ে ত' আর চাপাইনি? আমার ছাগল আমি ল্যাজে কাটবো।

আর কেউ কথা বলতে সাহস করে না। কিন্তু মাঝ-রাত্তিরে সরলা নিজেই উঠে পা টিপে টিপে গিয়ে পূবদিকের ছাদে উঁকি মারে। রাত জেগে আমরা দেখতুম সরলার গতিবিধি। মেয়েটা ঠাণ্ডায় জমে চর্বির ডেলার মতো হয়ে উঠে অন্ধকারে ব'সে ঢুকছে। সেই দৃশ্য দেখে সরলা হঠাৎ আগুন হয়ে উঠতো। কাছে গিয়ে সে কি করতো দেখতে পেতুম না, কিন্তু বুনি ডুকরে কেঁদে উঠে ছটফট্ করতো। তখন চীৎকার পাড়তো

সরলা,—একফোঁটা ঘুমোতে দেব না এমন হারামজাদী মেয়ে। সেই থেকে শুধু ঘ্যানর ঘ্যানর! কোত্থেকে ওকে সারারাত খেতে দিই বলো দিকি তোমরা? মর মর—নিপাত যা—

বেদম প্রহারে মেয়েটার বোধহয় ভালোই হোতো। গরম হয়ে উঠতো তাঁর ছোট্ট দেহটুকু। ঢুলতে ঢুলতেই মেয়েটা মুখের শব্দ করে। দিদিমা আর থাকতে না পেরে একসময়ে বলেন, দুখানা রুটি আছে কুলুঙ্গিতে, মেয়েটাকে খাওয়াবি না? এই নে দেশালাই, পিদিমটা আগে জ্বাল!

সরলা তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে বলে, আলো আর দরকার নেই, দেখে নিতে পারবো।—এই ব'লে মেয়েটাকে নিয়ে সে ছোট ঘরের দিকে চ'লে যায়। কুলুঙ্গি থেকে রুটি বার করতে তার একমুহূর্তও দেরি লাগে না। ওটা যেন তার জানা জায়গা।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সে মেয়েটাকে নিয়ে আবার ফিরে আসে। সবাই তখন নিদ্রিত। দিদিমা প্রশ্ন করেন, খাওয়ালি?

অসীম তৃপ্তির সঙ্গে সরলা বলে, সে আর বলতে? রুটি ছিঁড়তে তর সয় না—বলবো কি, একেবারে টাউ টাউ ক'রে খেলো! সাতজন্মে যেন খায়নি কিছু! একটু তরকারী থাকলে চেটে খেতো!

বুনি তখনো মুখের শব্দ করছে। দিদিমা বললেন, পেট ভ'রে খেয়ে আবার কাঁদে কেন তবে?

সরলা ঠনাৎ ক'রে মেয়েটার কপালে এক ঘা মারলো। তারপর বললে, শুয়োরের পেট যে, ওতে কি আর ভরে? বলে, জাতস্বভাবে কাড়ে রা!

মেয়েটা কথা বলতে শেখেনি, তাই মুখের শব্দ করে মাত্র। তার সেই অন্তর্ভেদী আর্তকণ্ঠ অন্ধকারে আমাদের কানে যেতো। আমরা নিশ্চেতন পাথরের মতো প'ড়ে থাকতুম।

মামীর ঘর ছিল এক কোণে। কিন্তু তাঁর চোখ কান ছিল অত্যন্ত প্রখর। রাত্রে ইঁদুরের পায়ের শব্দও তিনি টের পেতেন। হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে তিনি ধড়মড় ক'রে উঠে এলেন। পৌষ মাসের প্রচণ্ড শীতে সবাই লেপের মধ্যে কুঁকড়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। মামী হাউমাউ ক'রে উঠলেন, তোমরা সবাই ওঠো, সবাই শোনো—সরলার মতলব কিন্তু ভালো নয়!

ভীত ত্রস্ত হয়ে সবাই উঠে পড়লো। রাত তখনও ভোর হয়নি। মামী কাঁপতে কাঁপতে বললেন, নীচে গিয়ে দ্যাখোগে, মেয়েটাকে গলা অবধি চৌবাচ্ছার জলে ডুবিয়ে রেখেছে—তোমরা পুলিশ ডেকে আনো! পেটের মেয়েকে এমনি ক'রে মারবে, আর কেউ কিছু বলবে না? শেষকালে সকলের হাতে দড়ি পড়বে যে!

রাত শেষ হবার আগেই সেদিন বাড়ীতে আগুন জ্ব'লে উঠলো।

সেই আগুনের লেলিহান শিখা অনেকদিন পর্যন্ত দাউ দাউ ক'রে জ্বলেছিল। সেই আগুনে পুড়েছে নারীধর্ম, পুড়েছে বৈধব্যের বিধিনিষেধ, পড়েছে নিষ্ঠা ও সংস্কার। অবশেষে সেই আগুন থেকে যে চিতা রচনা হয়েছিল সেই চিতায় পুড়েছিল সরলা। মারা গিয়ে ছিল ওলাউঠায়।

আর বুনি? মায়ের মৃত্যুর পরেও সে বেঁচেছিল কিছুকাল। তাকে পায়রাটুনির বাড়ীতে রেখে আসা হয়েছিল। তার ভাষা ছিল না, ছিল মুখের শব্দ। সে নাকি ব'সে থাকতো কলতলায়, শুধু জল খেতো। কতদিন ধ'রে জল খেয়েও তার তৃষ্ণা মেটেনি, বলা কঠিন। কেউ বলে, তাকে নাকি শেয়ালে টেনে নিয়ে গেছে। হয়ত খবরটা সত্য, কেন না হত্যা ছাড়া আর কোনো উপায়ে তার মৃত্যু ছিল না।

ভটচার্যি বাগানের ওই পাড়ার চাটুয্যে গিন্নি যেদিন কপালে সিঁদুর এবং হাতের নোয়া নিয়ে মারা গেলেন, কেবলমাত্র সেইদিনই জানতে পারলুম তিনি পুণ্যবতী, দানশীলা এবং ধর্মপরায়ণ মহিলা ছিলেন।

আমি তখন নিতান্তই নাবালক। চাটুযোদের বাড়ীতে একটি সমবয়সী বালক ছিল আমার খেলার সাথী। কিন্তু ও-বাড়ীর গিন্নীর হাঁকডাক, কর্কশ চেহারা এবং অতিশয় কলহ-কোলাহলের জন্য চাটুয্যেবাড়ীর জানালা দিয়ে ভিতর দি:ক উঁকি মারারও সাহস হোতো না। তাঁর মুখের ভাষা ছিল নোংরা, এবং তার চেয়েও নোংরা ছিল বাড়ীর ঝি-চাকরের প্রতি তাঁর আচরণ। সুতরাং তাঁর বাড়ীতে আমাকে অনেক সময়ে অতি সন্তর্পণে এবং অতি দ্রুত আনাগোনা করতে হোতো।

চাটুয্যে গিন্নীর মারা যাবার দিন পাড়ায় পাড়ায় অশ্রুর বন্যা বইতে লাগলো। তিনি পুণ্যবতী—কেননা নিরীহ স্বামীটি তাঁর আঁচলে বাঁধা ছিল; অর্থাৎ সাতচড়েও স্বামীর রা ছিল না মুখে। তিনি দানশীলা—যেহেতু উচ্চকণ্ঠে ভিখারীদের বাপান্ত না ক'রে একমুঠো ভিক্ষা দিতেন না। তাঁর দরজায় ভিখারী এলেই হাঁকডাকে পাড়ার লোক হোতো তটস্থ। এ ছাড়াও নাকি তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ। তার মানে কপালে চওড়া সিঁদুর মেখে কস্তাপেড়ে শাড়ী প'রে কমণ্ডলু হাতে ক'রে পাড়ার ঠানদি আর রাঙ্গাদিকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাস্নানে যেতেন নিমতলার ঘাটে। পথে আনন্দময়ীর মন্দিরে দাঁড়িয়ে ঠন্ ক'রে সকলের মাঝখান দিয়ে আনি-দু'আনি ফেলে দিতেন শ্বেতপাথরের মেঝের উপর, সেটা অহঙ্কারের টুকরোর মতো গড়িয়ে যেতো মা আনন্দময়ীর পায়ের কাছে। সবাই মুখ চাওয়াচায়ি ক'রে বলতো, আহা, তা হবে না? বড় ঘরের বউ যে!

এ হেন চাটুয্যে গিন্নীর গঙ্গাযাত্রা দেখে আমি পর্যন্ত কেঁদে ভাসালুম। কান্না হোলো ছোঁয়াচে। সেকালের মাতৃভক্ত ছেলে অথবা পত্নীভক্ত স্বামীরা মৃতদেহকে শ্মশানে

শুইয়ে এত ফটোও তুলতো না, অথবা জনালানি কাঠ কেনা মুলতবী রেখে খবরের কাগজে খবরটি ছাপাতেও ছুটতো না। মৃতব্যক্তির সুখ্যাতিটা পাড়ার সমাজের মধ্যে কিছুকাল চালু থাকলেই সবাই সুখী হোতো।

যাই হোক, মৃত্যুর পরে দানসাগর শ্রাদ্ধের আয়োজন চললো। বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ। ব্রাহ্মণ বোষ্টমকে দু'হাতে দান, অতিথি অভ্যাগত নিমন্ত্রিতদের সেবা,—অতএব পাড়ায় পাড়ায় লুব্ধ ব্যক্তিরা ওৎ পেতে ব'সে রইলো। সকালে সভারোহণ, কীর্তন, পাঁচালী আর কথকতার আসর। সুন্দরী সালঙ্কারা বেদানাবালা দাসী এলেন মহাসমারোহে। চিক-আড়ালে সব পাড়ার বৌঝিরা ব'সে গেল। ও পাড়ার অথর্ব বিহারী ভটচার্যি এলেন পাল্কীতে চ'ড়ে। মস্ত ঘটা চাটুয্যেবাড়ীতে। পাড়ায় পাড়ায় ধন্য ধন্য রব।

সকল পর্ব শেষ হবার পর বাকি রইলো কাঙ্গালী-ভোজন। কাঙ্গালী ভোজন সেই প্রথম দেখলুম। চাটুয্যেরা নাকি বেশী পারবে না—মাত্র দু'হাজার কাঙ্গালী-ভোজন করাবে। দুই হাজার সংখ্যাটা কত, সেদিন অতটা বুঝিনি। কিন্তু মনে হয়েছিল অনেক। শোনা গেল কাঙ্গালীদের সর্দার যেন কোথায় থাকে, তাকে খবর দিলেই অমুক তারিখে অত সংখ্যক কাঙ্গালী পাওয়া যাবে। কলকাতায় দেখতুম ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজ,—কেউ তারা মধ্যবিত্ত, কেউ স্বল্পবিত্ত,—কেউ বা ধনী। কিন্তু কাঙ্গালীরা থাকে কোথায় জানতুম না; এও জানতুম না খবর পাবামাত্রই তারা কোন্ গহ্বর থেকে পিল পিল ক'রে পিপীলিকার মতো বেরিয়ে আসে! তারা কে, কোন্ জাতি, কোন্ সমাজের লোক, কী ভাষা তাদের, কেমন তাদের জীবনযাত্রা,—সব মিলিয়ে আমার ছিল অসীম কৌতূহল। প্রথম তাদের দেখলুম ওই চাটুয্যে গিন্নীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে। যে-পথ দিয়ে তারা আসছে সেই পথের দু'ধারের দরজা-জানালা বন্ধ হয়ে যেতে লাগলো। তারা নাকি নোংরা, তারা নাকি ঘৃণ্য। চেয়ে দেখলুম প্রথম শত শত কাঙ্গালীকে। অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত, কদাকার মেয়ে পুরুষের এবং বালক-বালিকার দল—সকল বয়সের। কারো পরনে লেংটি, কারো ছিন্ন-ভিন্ন নোংরা কাপড়ের টুকরো, কারো কম্বলের চিলতে, কেউ বা কোমরে জড়িয়ে রয়েছে ছেঁড়া ময়লা জামা। কারো চোখ নেশায় লাল, কারো মাথায় বন্যচুলের রাশ, কেউ বা সর্বহারা। আর মেয়ে-ছেলেরা? ওরা কি লজ্জা পাচ্ছে না নিরাবরণ দেহ নিয়ে? ওদের কোলে কাঁকালে উলঙ্গ শিশুর পাল। কুরূপা, বীভৎসা, নীতিভ্রষ্টা শত শত মেয়েছেলে। এরা নাকি সবাই কাঙ্গালী। সেদিনের কাঙ্গালী ভোজন আজও আছে, তবে ভিন্ন নামে,—আজ এর নাম হয়েছে দরিদ্রনারায়ণ সেবা!

কাঙ্গালীদের মধ্যে শালপাতা আর মাটির গেলাস বিতরণ আরম্ভ হোলো। তখন কলকাতার পথঘাট খোয়া-পাথরের, ধুলো-বালির। তারই ওপর এক এক সারে শতশত শালপাতা আর গেলাস প'ড়ে গেল। ভাত দিলেই ডাল দিতে হয়, এবং ডালের সঙ্গে তরকারী। তার খরচ বেশী। ফ্যান্ গালতে গেলে চালের পরিমাণও বেশী লাগে। সুতরাং খিচুড়িই সব দিক থেকে সুবিধাজনক। তার সঙ্গে শাকসব্জির কিছু একটা ঘাট। কুটনোর খোসা, শাকের গোড়া, পচা আলুর টুকরো, বেগুন কাঁচকলার বোঁটা,

তার মধ্যে দু' চার তাল হলুদ আর লঙ্কাবাটা,—এই সব নিয়ে সেই ঘাট। খিচুড়ির মধ্যে খুদ আছে, ধান আছে, বুকুড়ি চাল আছে, ভুসিসুদ্ধ ডাল আছে,—সব মিলিয়ে গরু-মহিষের খাদ্য। কিন্তু ওই খাদ্য খাবার জন্য কাঙ্গালী সমাজের কী লালায়িত লালসার আকুলি বিকুলি! আমি স্তব্ধ কৌতূহল নিয়ে পথের একান্তে দাঁড়িয়ে রইলুম।

খিচুড়ির সেই বিরাট সমারোহের পর এক একটি পাই পয়সা অথবা আধলা ছিল বকশিশ,—অবশ্য এটা ছিল বিশেষ ধনীসমাজের রেওয়াজ। তাই পাবার জন্য কাঙ্গালীদের কী কাড়াকাড়ি আর মারামারি!

অন্ধকার রাত্রে নাবালকের তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখের সামনে দিয়ে ছবির মতো ভেসে যেতো ওই ক্ষুদিত বঞ্চিত নরপালের দৃশ্য। বুকের ভিতরে কোথায় কন্‌কন্ করতো,—কেন করতো বুঝতে পারতুম না। ওরা কোন্ দেশের, কোন্ কালের? ওরা কি চিরকালের? যখন শ্রাদ্ধ কিংবা বিবাহ থাকে না,—ওরা খায় কী? যায় কোথা?—দেখেছি নিজের চোখে,—ভিখারীরাও ওদের ঘৃণা করে, কেননা ওরা কাঙ্গালী। ওদের ঘর নেই,—ওরা ভেসে বেড়ায়, খেয়ে বেড়ায়,—ওদের জন্মমৃত্যু হোলো পথে পথে।

সহসা নিজের মনেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতুম। ইচ্ছা হোতো সেই রাত্রে বাড়ীর দরজা খুলে পথে বেরিয়ে একাই চীৎকার ক'রে বলি, না, মিথ্যে, চাটুয্যে-গিন্নীর স্বর্গলাভ হয়নি! এটা স্বর্গলাভের পথ নয়! ধানের সঙ্গে বুকুড়ি চাল আর ভুসিডাল সিদ্ধ—ওটাকে কিছুতেই খিচুড়ি বলতে পারবো না, কুটনোর খোসায় আর বেগুনের বোঁটায় আর শাকের গোড়ায় যা সিদ্ধ হয়েছে তাকে বলতে পারবো না তরকারী! ওটা মিথ্যে, ওটা ফাঁকি, ওটা চাটুয্যে-গিন্নী নিজেও খেতে পারতো না!

উঁচু থেকে হাত বাড়িয়ে নীচের দিকে জঞ্জালে ফেলে দেওয়া—এটাকে কি দানপুণ্য বলবে? এ যে ভয়ানক প্রবঞ্চনা! বিষম ফাঁকি! ক্ষুধাতুর কাঙ্গালীদের ক্ষুধার দিকে তোমার চোখ ছিল না, শ্রদ্ধা ছিল তাদের মানবত্বের প্রতি,—তুমি শুধু প্রকাশ করেছ তোমার সম্পদের আত্মাভিমানকে। কেন খাওয়ালে ওদের? কেন ওই অখাদ্য বিতরণ ক'রে ওদের সবাইকে অমন অপমান করলে? তোমার ওই নির্লজ্জ অন্ন খুঁটে খুঁটে খাবার আগে ওদের মৃত্যু হোলো না কেন? মিথ্যে কথা, চাটুয্যে-গিন্নীর কিছুতেই স্বর্গলাভ হয়নি!

বালকের চক্ষু জ্বালা ক'রে জল এসে পড়তো। কাঙ্গালীরা সেদিন যদি চাটুয্যেবাড়ী লুটতরাজ ক'রে সব কেড়েকুড়ে নিয়ে যেতো তবে বোধ হয় আমি একটু খুশীই হতুম।—

ভিতরে বিদ্রোহ ছিল, কিন্তু বাইরেটায় শান্ত হয়ে লেখাপড়ায় মন দিতে হোতো। "সত্য বটে, রাজা রামচন্দ্র এবং যুধিষ্ঠিরাদি বড় বড় রাজা ভারতবর্ষে রাজত্ব ক'রে

গিয়েছিলেন! তাঁরা ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং সত্যপালনের জন্য বনে জঙ্গলে ঘুরেছিলেন। তাঁদের আমলে চোর ডাকাত জন্মায়নি, সেজন্য প্রজারা সুখে স্বচ্ছন্দে ছিল। ইতিহাসে দেখা যায় সেই সব রাজাদের রাজত্বকালে এ দেশের লোকেরা কতকটা ধার্মিক ছিল বটে, কিন্তু সভ্য ছিল না। একথা সকলেই স্বীকার করবেন, এ দেশে প্রথম সভ্যতা আনলো ইংরেজ। আগে ছিল শুধু ধর্ম, কিন্তু ইংরেজ শাসন-কর্তারাই এ দেশে প্রথম আনলেন ন্যায়ধর্ম!"

স্কুলপাঠ্য এই বইখানার দাম তখন ছিল তিন আনা। বইখানার লেখক ছিলেন স্বয়ং আমাদের খ্রীস্টান হেডমাস্টার। এই অবশ্যপাঠ্য বইখানি অনেককে বিনামূল্যেও দেওয়া হোতো। এখানা মুখস্থ না থাকলে সেদিন ইহকাল ঝরঝরে হয়ে যেতো। কান-মলা খেয়ে বেঞ্চের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হোতো।

রাজা রামচন্দ্রের আমলে রেলগাড়ী ছিল কি? রাজা যুধিষ্ঠিরের আমলে টরে-টক্কা টরে-টক্কা টেলিগ্রামে খবর আসতো কি? আগে না হয় জলে ভেলা আসতো, কিন্তু কলের জাহাজে চ'ড়ে বিলেতে যাওয়া যেতো কি? চোর ডাকাতে দেশ ভরা ছিল, গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঠগরা যথাসর্বস্ব কেড়ে নিত—নিশ্চিন্ত শান্তিতে লোকের বসবাস করবার উপায় ছিল না—এমন সময়ে এলো ইংরেজ। সত্যি বলতে কি, রাম-রাজত্বের পরেই বৃটিশ-রাজত্ব। মাঝখানের ইতিহাসে অনেক ভুল আছে কে না জানে! ভারতবাসীর জন্যেই ইংরেজ অন্ধকূপে দম আটকে মরেছে!

মিশনারী ইস্কুলের নীচের ক্লাসে ব'সে আমরা মুগ্ধ হয়ে বক্তৃতা শুনতুম, আর বাই-বেল মুখস্থ ক'রে সমস্বরে গান ধরতুম—'প্রভু যীশু নাম, অশেষ গুণধাম, প্রণিপাত করি তব চরণে!'

ম্যাকলীন সাহেবের বাবুর্চির ছেলে আলতাবুদ্দিন আমাদের সঙ্গে পড়তো, সে মুখে হাত চাপা দিয়ে বলতো "যীশু পরম দয়ালু শীতকালে খায় শাঁকালু—"

ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ অবতার এবং প্রিয়তম পুত্র যীশুখ্রীস্ট শীতকালে শাঁকালু খেতেন কিনা, একথা বাইবেলে সেদিন ছিল না, কিন্তু হঠাৎ আচমকা আমার গালে এক থাপ্পড় দিতেন বাইবেলের মাস্টার। আমি নাকি আলতাবুদ্দিনকে ওই কবিতাটি শিখিয়েছি।

মার খেয়ে কাঁদবার হুকুম ছিল না। ওতে নাকি স্কুলের নিয়মানুগত্য নষ্ট হয়। যীশুখ্রীস্ট মার খেয়েছেন, কিন্তু কাঁদেননি। বরং যারা অপরাধ করেছেন, তাদের জন্য তিনি পরম-পিতার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলতেন, হে ঈশ্বর, তুমি ওদের ক্ষমা করো। ওরা জানেনা ওরা কি করলো।

বাড়ী ফিরে গালের ওপর থাপ্পড়ের দাগটা দেখে ছোট বোন পরম পুলকে চীৎকার ক'রে সবাইকে জানিয়ে দিত। বুঝতে পারতুম রাস্তার কলের জল অনেকবার গালে বুলিয়েও দাগটা মিলোয়নি। হে পরমপিতা, পরের দুঃখে ছোট বোন মজা পেয়েছে, তুমি ওকে ক্ষমা করো, প্রভু!

বাইবেলের কথাগুলি দিনরাত আমার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াতো।

তেলে ভাজা বেগুনি আর এক ঘটি জল খেয়ে যেদিন পেট গরম হোতো, সেদিন

রাত্রে স্বপ্ন দেখতুম, জ্যোতির্ময় পুরুষ দশ আজ্ঞা বিতরণ ক'রে বলছেন, লোভ করিয়ো না, চুরি করিয়ো না!—কিন্তু পরদিন চুরিকরা মার্বেলের গুলি ক'টা মালিকের কাছে ফেরত দিতে হাত কাঁপতো। কেননা, সে ব্যক্তির বাইবেল পড়া ছিল না। ক্ষমা যদি সে না করে? ইংরেজের মতো ন্যায়বিচার করতে গিয়ে সে যদি অপরাধীকে শাস্তি দেয়? থাক, অত সাধু সেজে কাজ নেই!

তামাকের গড়গড়ার থেকে মুখ সরিয়ে মামা মুখ খিঁচিয়ে বলতেন, লেখাপড়া না গুষ্টির মাথা! ঘর জামায়ের গুষ্টি—ওদের সাতপুরুষে প্রথমভাগ ধরেনি! তালুক-দারের-ঘরে বে থা' করবি—খাবিদাবি—বগল বাজিয়ে ঘুরে বেড়াবি! লেখপড়া কিসের। কিছু না পারিস, আমার মতন শিষ্য জোটাবি! বছরে মাথাপিছু এক টাকা—দশ হাজার শিষ্য! পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে খাবি।

দিদিমা বলতেন, আ মর, কু-মন্তরণা দিচ্ছে দ্যাখো! যমের অরুচি!—

কথাগুলো দিদিমা নিজের দাঁতে দাঁতে ঘষতেন, তাই মামা সঠিক শুনতে পেতেন না।

এবাড়ীর দক্ষিণ দিক থেকে এসে উত্তর দিকে চ'লে গিয়েছে সরু গলি পথ। লালার দোকান পেরিয়ে শেতলদের বস্তি ছাড়িয়ে শীলেদের বাড়ী বাঁ দিকে রেখে সোজা গেলেই বড় রাস্তা। নদী গিয়ে পড়ে যেমন সমুদ্রে—যেমন ভুগোলের মাস্টার শেখাতেন—তেমনি বাল্যকালের ওই গলি গিয়ে মিশে যেতো মস্ত চওড়া পথে—যেখানে অবারিত মুক্তির আস্বাদ। হাতে একরাশ বই, পায়ে ফিতে বাঁধা জুতো—জামাকাপড় অনেক জায়গায় ভিন্ন রঙের সুতোয় সেলাই করা। ফিতে বাঁধা জুতো—মানে, চটিজুতো পরার জো ছিল না। পথে বার হোতে গিয়ে চটিজুতো ছট্‌কে যায়? যদি সেই মুহূর্তে গাড়ী এসে পড়ে? সুতরাং চটিজুতো প'রে ইস্কুলে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল না সেদিন! বর্ষায় ভিজে যেতে হবে—ছাতা নেওয়া চলবে না। শ্রাবণের মুষলধারা, চৈত্র আর বৈশাখের টা টা রোদ—মাথা বেয়ে জল পড়ুক, কপাল বেয়ে ঘাম ঝরুক,—ওতে বরং ছেলে বাঁচবে, কিন্তু ছাতার আড়াল দিয়ে ত' আর গাড়ী এসে চাপা দেবে না!

দুর্গা দুর্গা,—ওরে গাড়ী ঘোড়া দেখে যাস—ফুটপাথের ওপর দিয়ে চলিস। এদিক ওদিক দেখে তবে রাস্তা পার হোস।

প্রতিদিনকার এই উপদেশ যেন যেতো আমার পিছনে পিছনে। পিছনের শাসনের চক্ষু আমার সামনের পথ বেঁধে দিত। যতক্ষণ না বড় রাস্তায় প'ড়ে একটু বাঁ দিকে বেঁকতুম ততক্ষণ অবধি সাহস হোতো না পিছন দিকে ফিরবার। হয়ত ছোট বোনের গোয়েন্দাচক্ষু, আর নয়ত ছোড়দা আসছে পিছনে পিছনে। গ্রেপ্তারের আগে পুলিশ যেমন কতকটা পথ পলাতক অপরাধীকে অনুসরণ ক'রে আসে,—ওদের লক্ষ্য ছিল ঠিক তেমনি। ওরা ওৎ পেতে থাকতো কতক্ষণে আমি একটা অপরাধ করবো; ওরা কান পেতে থাকতো পড়তে ব'সে ঠিক কখন আমি একটা ভুল উচ্চারণ করবো, কখন্ বা পড়তে পড়তে ক্লান্তিতে আমার চোখ ঢুলে আসবে। ওদের সতর্ক চোখ-কান সর্বদা পাহারায় থাকতো।

কিন্তু ইস্কুল যাবার ওই পথটাই ছিল আমার মুক্তির নিঃশ্বাস। রায় বাগানের গলি দিয়ে মিশনারী ইস্কুলে গিয়ে পৌঁছবার নির্দেশ থাকতো আমার ওপর। গলিতে-গলিতে যাওয়া—যে পথে ভয় কম। মিনিট দুই সময় যদি বেশী লাগে লাগুক—কিন্তু গরীবের অনাথ ছেলের দাম অনেক বেশী। কোনোমতে একটা পাস করলে তবে এনে খাওয়াতে পারবে। আর যদি সদাগরী অপিসে একটুখানি বসবার জায়গা পায় তবে ত' পাথরে পাঁচ কিল। দুর্গা—দুর্গা—ওরে, ফুটপাথ ধ'রে যাবি। এদিক ওদিক দেখে তবে রাস্তা পার হবি। দুর্গা—দুর্গা—

দুর্গা নাম করতে গিয়ে মায়ের গলার আওয়াজ কেমন কাঁপতো। সেই কাঁপন ছুঁয়ে থাকতো আমারও গলার মধ্যে। সাবধানে পথ চেয়ে চলতুম। কোনোমতে একটা পাস করা, তার পরেই একটা যেমন-তেমন চাকরি!

কিন্তু গলি পেরিয়ে হঠাৎ যেন এসে পড়তুম সমুদ্রের ধারে। হেদুয়ার ফুটপাথে উঠে দেখতুম, পৃথিবী অনেক বড়। বিশাল জলাশয়, তার যেন এপার-ওপার নেই ওপারে দেবদারু গাছের সারি—তার নীচে দিয়ে চ'লে গেছে ট্রাম রাস্তা। সে-রাস্তা গেছে কতদূর—আমি তার খোঁজ জানিনে। কতক্ষণ পরে পিছন ফিরে দেখতুম। না, শাসন কোথাও নেই, কোনও সতর্ক চক্ষু আমাকে অনুসরণ করছে না। তখন থমকে দাঁড়িয়ে দেখতুম চারিদিকে। আমি একা। আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার মতো ডাইনে-বাঁয়ে কেউ নেই। এদিক ওদিক তাকিয়ে পথ থেকে ঢিল তুলে নিয়ে ছুঁড়তুম পশ্চিম দিকে—সেটা হেদুয়ার জলের মধ্যে গিয়ে পড়তো। লোহার রেলিংয়ের ধার ঘেঁষে যাবার সময় মালীকে লুকিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা জবাফুল তুলে নিয়ে যেতুম। শাসনের চাপে দুরন্তপনাটা থাকতো শেকলে বাঁধা, সুযোগ পাবামাত্র সেটা উচ্ছৃংখল হয়ে উঠতো।

মিশনারী ইস্কুলে সাড়ে দশটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে ফটক বন্ধ হয়ে যেতো। তারপর যদি কোনো বালক ছুটতে ছুটতে গিয়ে হাজির হোতো, তার কপালে কী লাঞ্ছনা সেদিন! বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হোতো কতক্ষণ, কিংবা তা'রো চেয়ে সাংঘাতিক, —দশ মিনিট ধ'রে পুরনো পড়া মুখস্থ ব'লে যাও। যদি একটি ভুল যায়, তবে তৎক্ষণাৎ ব্ল্যাক্-বুকে নাম উঠবে—সাবধান!

প্রহারের ভয় অপেক্ষা পুরনো পড়ার ভয় ছিল বেশী। চুরির দায়ে ধরা পড়লে সব চেয়ে কঠিন শাস্তি ছিল পুরোনো পড়া মুখস্ত বলা। এবং সেই মুখস্থটা ফার্স্ট বুক থেকে হওয়া চাই। ছোট বেলাকার সব চেয়ে বড় শত্রু ছিল ওই তিন আনা দামের সাংঘাতিক ইংরাজি বইখানা। চোখের জলে, তাড়নায়, অপমানে, অনাচারে—ওই বইখানা ধরতে হোতো। ওর মধ্যে উদ্ভট উচ্চারণ, জটিল বানানের কায়দা, একই শব্দের বিভিন্ন অলিগলি। মুখস্থ বলতে গেলেই মন আর বুদ্ধি পথ হারায়। তখন আর রক্ষা নেই,—ঝড়, ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, তারপর মুসলধারে বর্ষণ।

ঘরের ভিতর থেকে হাঁক দিয়ে মামা বলেন, গুষ্টির মাথা শিখছে! বাপ-দাদা কত

ইংরেজি শিখেছিল? গুয়োটা, প্রথম দুপাতা প'ড়ে রাখ্‌—আমি মন্মথ মাস্টারকে ব'লে তোকে ক্লাসে উঠিয়ে দেবো। সে আমার এক কেলাসের ইয়ার।

দিদিমা এক পাশ থেকে ফোঁস করে উঠতেন, থাম, ভারি মুরোদ তোর! বলে, ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তা'র মাইনে চোদ্দ সিকে! লেখাপড়া না শিখলে খেতে দেবে কে? তুই দিবি?

মুখখানা বিকৃত ক'রে মামা আগুন হয়ে বলেন, আমি না দিলে দিচ্ছে কে? মাতামহ গুষ্টির খেয়ে ওরা মানুষ হচ্ছে না?

দিদিমা দপ ক'রে জ্বলে ওঠেন, তোর পয়সায় মানুষ হচ্ছে?

আমার বাপ ফল্‌না ভট্‌চার্যির পয়সায়!

কি দিয়ে প্রমাণ করবি?

মামা লাফিয়ে উঠে চীৎকার করেন, প্রমাণ? প্রমাণ হাইকোর্ট, প্রমাণ তোমার ওই জাল-উইলের ধাপ্পাবাজি। ওই স্ত্রীধনে কেনা সম্পত্তির ফাক্কিকারি!

দিদিমাও হাঁক দেন্‌—হাইকোর্টে যাবার খরচ নেই? কোন 'তেরোজরির' ঘর থেকে টাকা পাবি?

দিদিমার মুখ থেকে এই ইংরেজী শব্দটা শুনলেই মামা ক্ষেপে ওঠেন, এবং সেই ক্ষিপ্তোম্মত্ত অবস্থায় একটা সুবিধা হয় এই যে, ফার্স্ট বুকখানা বন্ধ ক'রে সকলের অলক্ষ্যে গা ঢাকা দিতে পারি। মনে মনে মামার প্রতি শ্রদ্ধা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

হঠাৎ একদিন মামা ডাকেন, ওরে ওই গুয়োটা, এদিকে আয়।

ভয়ে ভয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াই। প্রহ্লাদ যেমন গিয়ে দাঁড়িয়েছিল হিরণ্যকশিপুর সামনে। মামার ভয়ানক মুখখানার ওপর যেন দুটো রক্তচোখ বসানো। করাল সেই চক্ষে একটু আদরের আভাস এনে মামা বলেন, লেখাপড়া শিখবি, না দোকান ক'রে খাবি? দোকানে কিন্তু কাঁচা পয়সা!

দোকানের ওপর আমার চিরদিনের শখ। মনের মধ্যে খুশী চেপে রেখে বললুম, দোকান করতে টাকা লাগে যে?

টাকা লাগে!—মামা মুখ খিঁচিয়ে বললেন, আমি জানিনে সে কথা? টাকার ভাবনা আমার, তুই শুধু দোকানে বসবি! বেনে মসলার দোকান। দু হাতে লুটবি! রাজি আছিস? ওরে গুয়োটা, মুখের দিকে তাকাস কি? কাবলীওলা থাকতে আবার টাকার ভাবনা? কত টাকা চাস?

ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলুম, দেবে?

মামা এক প্রকার হাসলেন। কথামালার খেঁকশিয়ালের একখানা ছবি মনে প'ড়ে গেল! তারপর বললেন, এই যে দাড়ি রেখেছি মুখে, কেন বল্‌ দিকি, আবাগের বেটা? তবে শোন্‌। হাওড়ায় গাঁজা আফিংয়ের দোকান দেবো ব'লে তিনশো টাকা নিয়েছিলুম কাবলীঅলার কাছ থেকে। হাওড়ায় না গিয়ে সোজা গেলুম দার্জিলিংয়ে! দুবচ্ছর গায়েব! তারপর সেই কাবলী এসে একদিন আমাকেই জিজ্ঞেস করে, লোগিন

বাবু কোথায়! যেটাকে সেদিন নিমতলার শ্মশান দেখিয়ে দিয়েছিলুম! এসব কাজ যদি পারিস তবেই আমার মতন লেখাপড়া শেখ।

ক্ষণজন্মা মাতুলের এই আত্মগৌরবে আমার বুকের ছাতি যেন চওড়া হয়ে উঠতো। জীবনের একটিমাত্র কামনা নিজের অন্তরেই উপলব্ধি করতুম, মাতুলের আদর্শেই যেন আমার ভবিষ্যৎ গ'ড়ে ওঠে। টাকা ধার ক'রে দোকান দেওয়া ছাড়া আমি আর কিছু ভাবতে পারতুম না।

এক বেঞ্চিতে বসতুম বীরেন আর আমি। বীরেন বড়লোক, কোন্ এক ব্যারিস্টারের ছেলে। দুজনে ভাব ছিল ব'লেই তর্ক ছিল। ছবির লড়াই করছিলুম গোপনে, প্রিয়নাথ বাবু তখন ইংরেজি সেকেণ্ড রীডার পড়াচ্ছিলেন। বড়লোকেরা লড়াইতে হেরে গেলে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। বীরেন তাঁর ছুঁচলো পেন্সিল দিয়ে আমার নাকের ওপর আঘাত করলো। আঘাত অতটা গুরুতর হবে, সেও জানতো না,—দরদরিয়ে রক্ত গড়াতে লাগলো। আশেপাশে চাপা হৈ চৈ। ছুটে এলেন প্রিয় মাস্টার। অপরাধটা আমার—এই বিচার করলেন তিনি। বীরেনের পেন্সিলের শিষটা ভেঙে গিয়েছিল, প্রিয়বাবু নিজের হাতে সেই পেন্সিল ছুলে দিলেন। কান ধ'রে তিনি আমাকে পাঠালেন কলতলায়। বাড়ীতে এসে সেই ক্ষত গোপন করতে গিয়ে অনেক লাঞ্ছনা পিঠের ওপর দিয়ে গিয়েছিল।

সুধীরের মতন ভালো ছাত্র ছিলুম না, কেন না ইংরেজি সে জানে ভালো। ইংরেজি ব্যাকরণ তার চেয়েও ভালো বোঝে। সুনীলের মতন ছিলুম না, কেন না অঙ্কে সে প্রখর। বাইবেলে অমৃত, ইতিহাসে নবকৃষ্ণ। ছিল আর একটা বিষয়—যেটার নাম ভূগোল। ভূগোলে ছিল কল্পনা। চোখ বুজে দেখতুম ভল্‌গা নদী নেমে গেছে ভীম গর্জনে উরল্ পর্বতের থেকে—দেখতুম গঙ্গাকে গোমুখী থেকে গঙ্গাসাগরে। মধ্য এশিয়ার মরুলোকে জলের জন্যে হাহাকার ক'রে বেড়াতুম; আর যেতুম ঘুমের ঘোরে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে, যেখানে আজও নরখাদকের দেখা মেলে। কোন্ দেশে আছে হিংস্র জানোয়ার আর গহন অরণ্য—খুঁজে বেড়াতুম। হিমালয়ের দুর্গম কোন গহ্বরে থাকে জটাজুটধারী সন্ন্যাসী, দক্ষিণ শাখালীনে মাছ ধরে জাপানীরা, এস্কিমোরা বরফের ঘরে থাকে, আর লিভিংস্টোন্ সিংহের জঙ্গল পেরিয়ে ভিক্‌টোরিয়া জলপ্রপাতের দিকে যান্,—আমি যাই তাঁর পিছু পিছু। আমি থাকি চেরাপুঞ্জীর বৃষ্টিতে, উত্তমাশা অন্তরীপে, মরু সাগরের জলে, স্ক্যান্‌ডিনেভিয়ার শীর্ষে উত্তর মেরুতে—যেখানে ছ'মাস দিন আর ছ'মাস রাত্রি—যেখানে মাঝ রাত্রে সূর্য ওঠে। আবীরের রং গলে-গলে পড়ে যেখানকার আকাশ-কোণে!

আবীরের রং? হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল দোল পূর্ণিমার পরের দিন ইস্কুলে রং খেলা। আগের দিন রং লাগা জামা কাপড় কেচে প'রে গেছি ইস্কুলে, কিন্তু দাগ রয়েছে তখনো। কারা যেন রং নিয়ে ছোটাছুটি করছে উঁচু ক্লাসে। আমি ভিন্ন ক্লাসের ছাত্র। কিন্তু চেঁচামেচি শুনে টিফিনের এক ফাঁকে গিয়েছিলুম সেখানে উঁকি মারতে। হয়ত আমার মাথাতেও আগের দিনের আবীরের চিহ্ন কিছু ছিল। চোখ

পড়লো হেড মাস্টারের। বেত হাতে নিয়ে তিনি উন্মত্ত হয়ে আমার উপর চড়াও হলেন। সেই সুদীর্ঘ বিশেষ বেত্রদণ্ডটি তাঁর আপিসেই সংরক্ষিত থাকতো। সেই বেত সশব্দে পড়েছিল আমার সর্বাঙ্গে একুশ বার। তাঁর স্নেহ ছিল চাপা, শাসন ছিল প্রকট। কিন্তু আমার দিকে আঙ্গুল দিয়ে সেদিন বন্ধুরা যে আত্মরক্ষা করেছিল এটুকু হেড মাস্টার মশায় উত্তেজনার মধ্যে বিচার ক'রে দেখেন নি। পরবর্তীকালে সেই খ্রীস্টান হেডমাস্টার 'রায়সাহেব' উপাধি পাওয়ায় আমাদের ইস্কুলে উৎসব হয়েছিল। ফিরে এসে বাইবেলের ক্লাসে ব'সে ব'সে কাঁপছিলুম। পিঠের দিকে আর জামার হাতায় রক্তের দাগ ফুটে উঠেছিল। বাইবেলের শিক্ষক তখন আবেগ ভরে খ্রীস্টান ধর্মগ্রন্থের মূল কথাটি বোঝাচ্ছিলেন,—জগতের সকল ধর্মে আছে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত, একমাত্র বাইবেলে আছে সকল অপরাধের মার্জনা। প্রভু ক্ষমা করেন, তাই তাঁর স্নেহের আশ্রয় এমন বিরাট। তাই তাঁকে আমরা পিতা বলি!

কিন্তু মাতা কি পিতার চেয়েও বড় নয়? বাৎসরিক পরীক্ষার কালে রাত্রে মা ঘুমোতেন না। শেষরাত্রে উঠে কনকনে শীতের মধ্যে রেড়ির তেলের আলো জ্বালিয়ে পড়তে বসতুম। ছেঁড়া লেপের একটা অংশ মা আমার গায়ে তুলে দিতেন। পিদিমে তেল ফুরতো, আর মুখ তুলে উত্তর দিকের নিমগাছের ফাঁক দিয়ে দেখতুম, ভোর হয়েছে —কিন্তু কুয়াশায় আচ্ছন্ন। কাক ডেকে উঠেছে সেই নতুন পৃথিবীতে। এই বুক-চাপা অবরোধের থেকে বাইরে, এই অঙ্ক-ব্যাকরণ জ্যামিতির থেকে অনেক দূরে—একটা স্নিগ্ধ শীতল মুক্তির ইশারা। হিমালয়ের হিমেল হাওয়া যেন এসে লাগতো মুখে চোখে। পিদিমের শুকনো শলতেটা নিভে আসতো ধীরে ধীরে। রাঙ্গা রোদ এসে ছুঁতো নিমগাছের আগডালে। প্রভাতের পাখীরা ডেকে যেতো।

পরীক্ষার ফল বার হবার পর আবার সেই নতুন বইয়ের সমস্যা। সেই পুরনো বইয়ের দোকানে ঘুরে বেড়ানো, সেই ধনী আত্মীয়র দরবারে আবেদন জানানো। আছে কি কোনো শিক্ষা বইয়ের বাইরে? এমন কোনো বিদ্যে, যা বইতে নেই? বন্ধুসমাজের মধ্যে বলাবলি হয়, কেউ যাবে বিলেত, কেউ আমেরিকা,—কেউ বা হবে ইঞ্জিনীয়র। কারো মামা পড়াবে ডাক্তারি, কারো বাবা ওকালতি। কারো কাকা অমুক সাহেবের বন্ধু, কারো দাদামশাই হাইকোর্টের এটর্নী। তুই কি করবি?

ঢোক গিলে বলতুম, আমি? আমার মামা মস্ত ব্যবসায়ী। আমি জাহাজ কিনে আদা চালান দেবো বিলেতে। নয়ত হনলুলুতে।

ছেঁড়া জামার দিকে তাকিয়ে আমাদের ধনী প্রতিবেশীর ছেলে সুবোধ বলতো, তোর মামাকে ত' চিনি। জাহাজ কেনার আগে একটা জামা কিনিস।

আমার অকিঞ্চন মুখখানার দিকে চেয়ে বন্ধুমহলে হাসাহাসি প'ড়ে যেতো।

কেউ বা অপরকে প্রশ্ন ক তো, তুই পাস ক'রে বেরিয়ে কি করবি?

খ্রীস্টান বন্ধু যতীন জবাব দিত, আমি পালাবো।

কোথায়?

জাহাজের কুলি সেজে পালাবো দেশ ছেড়ে। যে দেশে খুশি!

সবাই সাগ্রহে শুনতো ওর কল্পনার দৌড়টা। যতীন বলতো, মুসলমান সেজে যাবো। আগে হবো কুলি, তারপর খালাসী। নতুন দেশে নেমে হবো ফেরার। হোটেলে চাকরি নেবো, নয়ত বেচবো খবরের কাগজ। কিছু না করতে পারি, হাত দেখে ভাগ্য ব'লে দেবো—কত খদ্দের জুটবে। এমনি ক'রে টাকা জমিয়ে যাবো বিলেত থেকে ক্যালিফর্ণিয়া।

তারপর ?

তারপর সেখান থেকে প্যাসিফিক্ পেরিয়ে জাপান। জাপান থেকে সাইবেরিয়া। তারপর বেরিং পেরিয়ে আলাস্কা। প্যাসিফিক্ পেরিয়ে অস্ট্রেলিয়া !

তারপর কিন্তু সে আর জবাব দিত না। বন্ধুরা সবাই অনেকটা পরাজয় স্বীকার ক'রে যে যার পথে চ'লে যেতো। হেদুয়ার উপর নেমে আসতো সন্ধ্যা। যতীনের ওই হাতখানা ধ'রে চলবার জন্য আমি মনে মনে ব্যাকুল হয়ে উঠতুম।

গোলা পায়রারা বাসা বেঁধেছিল ওদিকের শূন্য মহলে। ছাদের নীচে কার্নিস—তারই তলায় তলায়। সন্ধ্যের পর ওদের চোখ কানা হয়, সেই সময়ে মই রেখে উঠতে পারলে ঠিক ধরে আনা যায়। অনেকদিন ধরে এই মতলব এঁটেছিলুম মনে মনে। পায়রারা উড়ে যায় যখন আকাশ নীল থাকে, আর থাকে রোদ্দুর, আর থাকে সুন্দর মিষ্টি হাওয়া,—উধাও শূন্যে ওরা উড়ে যায়,—আর ডোমটার নীচে দাঁড়িয়ে কাঁচদের বাড়ীর থেকে নীচের ঠোঁট টিপে "সিটি" দেয়। ছোট বোন বলে, ওরা যে সুখের পায়রা—জানিসনে বুঝি ? বিষ্টিবাদল দেখলেই ওরা কোটরে ঢুকে বক্‌বকম্ করে !

কথাটা সত্যি ! কিন্তু জিজ্ঞেস করতুম, কেন রে ?

প্রশ্ন শুনে মুখ বেঁকিয়ে ঠুক্‌রে যেতো ভাইবোনেরা—কেন কেন করিসনে। হ্যাংলা কোথাকার ! ওরা যে মটরের দানা গিলে খায়, তাই ওরা ডিম পাড়ে।

প্রশ্নের জবাব পেতুম না। জিজ্ঞাসা জমতো মনে মনে, উত্তর পাইনি কোনোদিন। শরৎকালে পুজো আসে কেন, পুজোর সময় বৃষ্টি থামে কেন, টিকটিকিরা দিনেরবেলা ঘুমোয় কেন, আর বর কেন আসে বিয়ে করতে, আর কাবুলীওলার হাতে লাঠি থাকে কেন—এসব কথার জবার ছিল না।

বর আসছে বামুন পাড়ায়,—অমনি বাড়ীময় শোরগোল, আর শাঁখ বেজে ওঠা। মামীমার মুখে উলুধ্বনি শুনতে বেশ লাগে। অমনি সকলের ছুটোছুটি, দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ে গেল বাড়ীসুদ্ধ সবাই সদর দরজার দিকে। হঠাৎ এদিকটা জনশূন্য মনে হচ্ছে। সমস্তটাই যেন সর্বস্বান্ত, এমহল-ওমহল তিনতলা—যেখানে

চেয়ে দেখি মায়া নেই, মোহ নেই। একজন আসছে বামুন পাড়ার পথ দিয়ে, তার হাতে সর্বস্ব তুলে দেবার জন্য ছুটে গেছে সবাই—পিছনে কিছু রেখে যায়নি।

পায়রারা অন্ধকারে বক্‌বকম্‌ করে উঠছে ওমহলের কার্নিসের নীচে, এখান থেকে উজ্জ্বল য়্যাসিটিলিন্‌ আলোতেও ওদের দেখা যাচ্ছে না। ওদের সুখের মধ্যেও স্বস্তি নেই, মায়ের বুকের পাশে শুয়েও ওদের তৃপ্তি নেই। চারিদিকে এত মানুষের এত কোলাহল, আর ওরা ভাবছে ওদের কেউ আদর করলে না। আর সুখের পায়রাই যদি হবে তবে উড়ে যায় কেন অত দূরে শূন্যে? কী আছে সেখানে? বাসা নেই, সীমা নেই, সান্ত্বনা নেই, সঙ্গ নেই,—আকাশের টানে ছুটে গেলে কোথা সুখ?

ভালোবাসা শব্দটা আমাদের বাড়ীর ভিতরে কোথাও শোনা যেতো না। ওকথাটা নাকি শুনতে ভালো নয়। ভালো যে নয় তার প্রমাণ ছিল আমার চারিদিকে। মামার চোখ ছিল রক্তরাঙ্গা, ইস্কুলে হেড মাস্টারের চোখ ছিল লাল, মামার কথায় দিদিমার চোখ হোতো রাঙ্গা, পাশের বস্তির দীপু—নেশা করলেই তার চোখ দুটো হোতো লাল, গোঁসাই কলু এসে দাঁড়াতো রাঙ্গা চোখে, আর ওই দীপুর বস্তিতে থাকতো ক্যাওরা বুড়ী আর হরার মা,—ওরা পাড়ার লোকের বিরুদ্ধে দিদিমার কাছে নালিশ জানাতো লাল চোখ নিয়ে। রক্ত ফেটে পড়তো ওদের চোখে।

ছোটবোন বলতো, ভালবাসার তুই কি বুঝিস? তোর না দশ বছর বয়েস? এঁচোড়ে পেকেছিস, না? বাসর ঘরে যেতে তোর লজ্জা করে না? মেনিমুখো!

বাসরঘরের ভিতরটায় উজ্জ্বল আলো, বাইরেটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে সবাই ভিতর দিকে জানালার ফাঁক দিয়ে। বাড়ীর মেয়েরা ছাড়া জুটেছে মেয়েমহল। ওরা জানে ওরা কী দেখছে! ওদের চোখের পাতা পড়ছে না—যেন না যা দেখলে খুশী হয় তা দেখতে পাচ্ছে না কিছুতেই। শ্রাবণ মাসের বিয়ে। বৃষ্টির ছাট লাগছে, মশা কামড়াচ্ছে, ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ, ক্লান্তিতে ভেঙ্গে আসছে পা, —তবু ওদের দেখা চাই ভিতরে। বিধবারা যাবে না ওদিকে, কেন না অলক্ষণ! গিন্নীরা যাবে না ওখানে, কারণ ওটা ছেলেমানুষি। ছেলেরা যাবে না, কারণ অসভ্যতা। কর্তারা যাবে না কেন না যেতে নেই ওখানে!

তবে ওখানে কী?

তারুদিদি বললে, বুঝলিনে, ওদের যে প্রথম ভালবাসার দিন! ছি, ওখানে গিয়ে উঁকি মারতে নেই। যা তুই ঘুমোগে যা।

বিছানায় গিয়ে ঢুকলুম একা একা। ঠাণ্ডা দরিদ্র বিছানা শুধু নয়, বিয়ে-বাড়ীর হট্টগোলে ওটার কোনো প্রাধান্য নেই। অনাদরে একধারে কুণ্ডলী পাকানো ছিল, তাতে লেগেছে বৃষ্টির ছাট। অন্ধকারে ওটাই আশ্রয়, ওটার মধ্যেই সমস্ত জিজ্ঞাসা-গুলো ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে পাঁজরের কোণটা একটু গরম হয়ে ওঠে - তবু সুখের পায়রা মাঝরাত্তিরেও কেঁদে ওঠে বক্‌বকম্‌ করে। সুখে ওদের স্বস্তি নেই, যেমন আমার চোখে ঘুম নেই। ভালোবাসা! আমার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে জেগে ওঠে সারাদিনের সমস্ত ক্লান্তি ছাড়িয়ে। সেই যে সেই হানাবাড়ীর গল্পটা শুনেছিলুম!

সেখানে এক সাহেব পুষেছিল একটা বাঘের ছানা,—সেই ছানাটা তার ধারালো জিব দিয়ে একদিন রাত্তিরে সেই সাহেবটার পা চাটছিল। পায়ের ওপর রক্ত ফুটে উঠলো, আর সেই ছানাটা রক্ত চাটতে চাটতে এক সময়ে লাল চোখে সাহেবের দিকে জ্বলজ্বল করে তাকালো। সাহেব বুঝতে পারলো, বাঘের বাচ্চাটা রক্তের স্বাদ পেয়েছে!

ভালোবাসা,—ওই শব্দটা আমি সারারাত ধরে সেই বাঘের বাচ্চাটার মতন চাটতে লাগলুম। ওটার স্বাদ হয়ত ওই প্রথম জানলুম। বাড়ীর মধ্যে ওটা কোথাও খুঁজে পাওয়া যেতো না বলেই ওটা যেন হঠাৎ নতুন খবর নিয়ে এলো। খবরটা মনে মনে চেপে রাখতুম—যেমন চেপে রাখতে হোতো পৃথিবীর সব জিজ্ঞাসাগুলো।

বাড়ী থেকে ইস্কুলের সমস্ত পথটাই প্রায় একা একা। বৃষ্টি থেমেছে, কিন্তু আশ্চর্য ওই জলদাঁড়ানো আঁকাবাঁকা গলিপথটা। শুধু-পায়ে কেবল যে জল ঠেলে যাই তাই নয়—কোঁচার খুঁটের নীচে বইখাতা সযত্নে নিয়ে দারিদ্র্যটাকেও ঠেলে ঠেলে যাই। খাওয়া হয়নি কিছু সকাল থেকে। আশা আছে ভিজে কাপড়জামা দেখালে ছুটি পাওয়া যেতে পারে। পথটা নির্জন। নীচের দিকে থৈ থৈ জল আর উপর দিকে বিষণ্ণ মেঘ—বড় দরিদ্র পৃথিবী, বড় দরিদ্র জীবন। পাখীরা ওড়ে না—গির্জার বাগানে গাছের ডালে ওরা ভিজে ডানায় চুপ করে বসে থাকে, আর ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ে। আর ওই গাছের ছায়ার মধ্যে কেমন যেন কান্না জড়ানো, হেদুয়ার অথৈ জলেও যেন আকাশ জোড়া বিষাদের ছায়া নেমেছে। ইস্কুল যাবার পথে একা একা আমার কান্না পেয়ে যেতো। সামনে কেউ নেই, পিছনে কেউ নেই—শ্রাবণের এই শোকাচ্ছন্ন দিনে কেউ কোথাও নেই আমার!

আবার হঠাৎ একদিন সূর্যের আলো হেসে ওঠে। মেঘেরা সরে যায়, আকাশ থেকে নেমে আসে রোদ। ডানা ঝাড়া দিয়ে পায়রারা বেরিয়ে পড়ে ছাদের পাঁচিলে, আজ ওরা আবার সুখের খবর পেয়েছে আকাশ থেকে। আমিও আমার পোষা বাচ্চা কুকুরটিকে নিয়ে ছাদে যাই রোদের আলোয়। শাদার সঙ্গে বেগনী আভা কুকুরটার গায়ে। মারলে মুখ বুজে মার খায়, তাই ওর নাম রেখেছিলুম গাধা! গাধাকে চোখ রাঙিয়ে ধমক দিলে ভয়ে ল্যাজ নাড়তো, এবং একটু আস্কারা দিলে হাত পায়ের তলায় ঢুকে আদর জানাতো। আর যদি কিছু না বলতুম তবে এক সময়ে গায়ে গা ছুঁয়ে শুয়ে থাকতো শান্ত হয়ে, খেলা করতো আঙুলগুলো নিয়ে। হঠাৎ মনে হোতো, এটা কী? গাধার কি প্রাণ আছে? আছে কি মন? আত্মা আছে?

ওকে খেতে দেয় ছোটবোন! বেড়াতে নিয়ে যায় ভাগে! রাত্রে শুয়ে থাকে এক কোণে। অনাদরে ও সরে থাকে, অবহেলা নিয়ে থাকে একপাশে। কিন্তু তার চেয়ে বেশি পথের নেড়ি-কুকুরের আর প্রাপ্য কিছু নেই। ও যেদিন থাকবে না, জানবে না কেউ—শুনবে না কেউ কান পেতে। কিন্তু তার আগে আমার পাঁজরের কোণ ছুঁয়ে একটুখানি দাগ রেখে যেতে চায়। আমার মন যে একা একা ও জানে। সমস্ত বাড়ীর ঝগড়াঝাঁটি, গণ্ডগোল, গালমন্দ আর বিষবাষ্পের বাইরে এসে ও আমাকে ছুঁয়ে বোধহয়

জানাতে চায়, আমি আছি তোমার পাশে। তুমি না ডাকলেও আছি, তুমি মারলেও আছি, তাড়ালেও আছি।

গাধাকে একদিন কে যেন কোথায় ছেড়ে দিয়ে এলো। অনেক খুঁজেছিলুম, কিন্তু আর তাকে দেখতে পাইনি। ওর জন্যে নাকি আমার পড়ায় মন বসছিল না। মন বসবে কেমন করে? অনেক রাত পর্যন্ত রেড়ির তেলের পিদিমের সামনে বসে পড়া করতে হোতো, আর বাইরের অন্ধকারে নামতো বর্ষা—আর কান পেতে শুনতুম বাড়ীর আনাচে-কানাচে কেঁদে বেড়াচ্ছে নেড়িকুকুর,—চারিদিককার জলের মধ্যে ওর আশ্রয় কোথাও জুটছে না! আমাদের সেই গাধা নাকি? কিন্তু উঠে গিয়ে খোঁজ নেবার সাহস নেই। নেড়ি-কুকুর কেঁদে বেড়াচ্ছে অবিরাম। হঠাৎ সেই কান্নাটা মিলে যেতো আমার মনের সঙ্গে। আমি চেঁচিয়ে পড়ছি, না নেড়িকুকুরটা আমার বুকের অতল তল থেকে কেঁদে কেঁদে উঠছে? ওকে যত শান্ত করো, যত সান্ত্বনা দাও, যত সুখের সন্ধান বলো—ওর একঘেয়ে কাতর কান্না কিছুতেই থামবে না!

ওই যেখানে মেসবাড়ী উঠেছে আজকাল, ওখানে ছিল বস্তি। ওই বস্তির মেটেগলির মধ্যে ঢুকে যেতো আমার নতুন বেড়ালটা। বেড়ালটাকে খুঁজে না পেয়ে ফিরে আসতুম, আর চিরঞ্জীলাল মুদি আমার হায়রানি দেখে আমোদ পেতো। হেসে বলতো, পেলিনে খুঁজে?

না—বলে দাঁড়াতুম ডানহাত পেতে। বলতুম, দাও?

চিরঞ্জী লোহার হাতা নিয়ে আমাকে তাড়া করতো, কিন্তু আমি নড়তুম না। মার খাওয়া সইবে, কিন্তু একখানা বাতাসা আমার পাওয়া চাই। চিরঞ্জী হার মানতো, এবং শেষকালে ওই লোহার হাতার মধ্যে একখানা বাতাসা দিয়ে বাড়িয়ে ধরতো আমার দিকে। আমি ওই বাতাসার সঙ্গে উপরি পেতুম একটি পয়সা। প্রথমটি হোলো বকশিস আর দ্বিতীয়টি হোলো স্নেহের দান। সবাই বলতো, লালারা ওজনে ঠকায়, দাম বেশি নেয়, আধপয়সায় মরে বাঁচে; আর আমি দেখতুম চিরঞ্জীর মুখে চোখে স্নেহের আভা, হাসির মধ্যে মাধুর্য,—আমি দেখতুম ওর চেয়ে বন্ধু কেউ নেই। ওই দাগটুকু রেখে দিয়ে চিরঞ্জীলাল একদিন মরে গেল।

কিন্তু ওই নতুন বিড়ালটা রইলো আমার সামনে। একরাশি শাদা লোম ওর গায়ে, মাঝে মাঝে কালো ছাপ। কাছে এসে দুধ খেয়ে যায়, মাছের ছিবড়ে নিয়ে পালায়—অথচ ওর ধরাছোঁওয়া পাইনে। আমাকে ছোটায় পিছু পিছু, ওতেই ওর আনন্দ। ডাকলে কাছে আসে না, নিজের খুশিতে নিজের থেকেই আসে! যতক্ষণ খেতে পাবে যতক্ষণ আদর পাবে—ঠিক ততক্ষণই সে বাধ্য,—তারপর সে উদাসীন, চিনবেও না তোমাকে। অনেক বাড়ীতে তার অনেক কাজ—তোমাকে নিয়ে শুধু থাকলে তার চলবে না। ওর মন পাইনি কোনোদিন, যেমন অনেকেরই পাইনি! ওর জন্যে সারাদিন ঘুরেছি আনাচে-কানাচে, ওকে ডাকতে ডাকতে বুক চিরে কান্না বেরিয়ে এসেছে, দু'হাত বাড়িয়ে কাছে গেছি কোলে নেবার জন্যে, কিন্তু একটিবারও গ্রাহ্য

করেনি, মুখ ফিরিয়ে চলে গেছে পাঁচিলের ধার দিয়ে পগার পেরিয়ে গলিঘুঁজি ছাড়িয়ে। আমার মন ছুটেছে ওর পিছু পিছু, আমার চোখ ছুটেছে ওর পায়ে পায়ে।

ভালোবাসা! ভালোবাসা কি কাঁদায়? ভালোবাসা কি কেবল আঘাত সয়? আমাদের ইস্কুলে ছিল চন্দর মাস্টার। লোকটা পান খায় যখন তখন, কিন্তু মেজাজ তাঁর অত্যন্ত কড়া। হাতে তার বেত থাকে, যতক্ষণ থাকে ইস্কুলে। পড়া না বলতে পারলে অনেকেই মারে, কিন্তু ওই লোকটা পিঠের ওপর বেত মেরে জিজ্ঞেস করতো, পড়া হয়েছে কিনা। আমার কাছে এসে হঠাৎ ওই বেতগাছটা থেমে যেতো। হয়ত সে ভাবতো মরা মানুষের পিঠে বেত মারলে সবাই হেসে উঠবে। বোধ হয় আমার চোখ দুটোয় মৃত্যুর ছায়া ছিল; মারলে হয়ত আঘাত পাবো না, নালিশ জানাবো না! কিম্বা যত মারই খাই, আমার শোধরাবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আমি দেখতুম চন্দর মাস্টারের চোখের মধ্যে সন্তানের পিতাকে। লোকটা মাইনে পায় আঠারো টাকা, চার-পাঁচটি ছেলেপুলে—ভগ্নিপতির বাড়ীর নীচের তলায় থাকে। সমস্ত বছর ধরে ছাইরংয়ের একটা কোট গায়ে দেয়—তার এত নীচে ঝুল যে, ছেঁড়া কাপড়খানা ঢেকে রাখা যায়। বেতগাছটা নিয়ে আমাকে মারতে এসে থেমে যেতো। বলতো, মুখে মুখে বলে যাচ্ছি, পড়া টুকে নে তুই!

ভালোবাসা! চন্দর মাস্টারের ওই ছাইরঙা কোটের নীচে কোথাও একবিন্দু স্নেহ ধুকধুক করছে, একথা আমি ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। কিন্তু আমি আবিষ্কার করতুম, ওর ওই ছোট ছোট চোখ দুটোয় এক রকমের কোমল ছায়া পড়তো—যে-আভাটুকু আমি একদিন শরৎকালের রৌদ্রে আমার সেই পোষা কুকুরটির চোখে দেখতে পেয়েছিলুম—সমস্ত অপমান আর উৎপীড়নের মধ্যেও যে আমার বুকের কোণটি পরমাত্মীয়র মতন ছুঁয়ে থাকতো।

কিছু একটা চাইতুম বৈকি, কিন্তু তার নাম জানতুম না—অথচ না পেলেই মনটা যেন আবদার ধরে থাকতো। নিজের মনে কান্না নিলে আসবে কি কেউ কাছে? কিন্তু ভর্তু এসে দাঁড়াতো সামনে। ভর্তু ছিল দিদিমার বাড়ীর মিতুয়া, নর্দমায় সে ঝাড়ু দিয়ে যেতো। সে ছিল সাঁওতাল দেশের লোক। এই পাট্টা কালো চেহারা, এই এতখানি বুকের ছাতি, মাথার মিশ কালো বাবরি চুল পিছনে ওলটানো, কানে বালা আর লাল ফুল, আর মুখে মহিষাসুরের মতন গোঁফ। ভর্তুর গলার আওয়াজ শুনলে সবাই যেতো পালিয়ে। কেউ বলতো ডাকাত, কেউ বলতো পিশাচ। কোথা থেকে স্নান করে এসে সে হাঁক দিয়ে ডাকতো, ভাত দিয়ে যাও, বুড়ীমা।

দিদিমা ভাত দিয়ে যেতেন, আমি আসতুম আঁচলের পিছনে পিছনে। হঠাৎ সে তুলে নিত আমাকে। ঈগল পাখী যেমন ছোঁ মেরে নিয়ে যায় নেংটি ইঁদুরকে—আমার বইতে সেই ছবি ছিল। ওর ছোঁওয়ার মধ্যে খুঁজে পেতুম, যা কোথাও খুঁজে পেতুম না। ওর সঙ্গে যেন চলে যেতুম বন্য সাঁওতালির জগতে—সেখানে অরণ্য, সেখানে স্বাধীনতা দুর্বার, সেখানকার মাঠে মাঠে মুক্তি, সেখানে জন্তু-জানোয়ার আর মানুষ থাকে পাশাপাশি। ভর্তু কত গল্পই না বলে যেতো যাবার আগে।

আর দিদিমার বাড়ীর থেকে যাবার আগে আমারও একটা সাধ মিটেছিল। ছাদের কার্নিসের নীচে মই বেয়ে উঠে গোলা পায়রা আমাকে ধরতে হয়নি। অনেকদিন ধরে ওদেরকে ডেকেছিলুম বুকফাটা চীৎকার করে। একজোড়া পায়রা একদিন নেমে এলো। পায়রা-মটর জোগাড় করেছিলুম ওদের জন্যে। ওরা কাছে আসে না, দূরের থেকে খেয়ে পালায়। কিন্তু কাছে এলো একদিন—অনেক দিনের পর। তখন থেকে হাতের তালু থেকে খুঁটে খেতে লাগলো মটরের দানা। সেদিন আমি পেয়ে গেলুম, যা খুঁজছিলুম তার চেয়ে অনেক বেশী পেয়ে গেলুম।

সে কি ভালোবাসা! জিজ্ঞাসা করেছি নিজেকে অনেকবার। পাখী কি ভালোবাসে? ভালোবাসে কি ভর্তু আর চন্দর মাস্টার? ভালোবাসতো কি চিরঞ্জীলাল আর সেই নেড়িকুকুরটা? আমি কি ভালোবাসি ওই কাবুলী বিড়ালটাকে—কিছুতেই যার মন পেলুম না? কিন্তু এসব কথার জবাব চাইতে যাবো কার কাছে? চাইতে গেলে কপালে যে অনেক লাঞ্ছনা জুটবে!

গলি পেরিয়ে চলে যেতুম বড় রাস্তায়! রাস্তায় কি এর জবাব আছে? যদি এই পথ ধরে চলে যাই—যদি পিছন থেকে আর কেউ না ডাকে, যদি পিছনে আর চেয়ে না দেখি—সোজা চলে যাই যেদিকে কখনও যাইনি, যে-জগৎটাকে কখনো দেখিনি,—সেখানে গেলে কেউ বলতে পারে?

কিন্তু ফিরে আসতুম ঠিক সন্ধ্যাবেলা। বাড়ীতে বিকালের পাট হয়ে গেছে। ভাইবোনেরা ঘরে উঠেছে। আর সেদিন হোলো একাদশীর উপবাস। মা বসেছেন মাঝখানে রামায়ণ হাতে নিয়ে। সরযূর তীরে সীতাকে রেখে লক্ষ্মণ বিদায় নিচ্ছেন। সীতার অশ্রুজলে সরযূর প্রবাহ ফুলে উঠেছে। সেই বর্ণনা শুনতে শুনতে আমার ক্লান্ত চোখে ঘুম এসেছে। পুঁটে ময়রা আমার হাতে দিয়েছিল ছোট একটি আমসন্দেশ, কিন্তু সেটি আর খাওয়া হয়নি। হাতের মুঠোর মধ্যে সেটি নরম হয়ে গলে পড়েছে। যেখানে কারো কোনো প্রত্যাশা নেই সেখান থেকে বুকভরা কিছু পেলে কেউ বিশ্বাস করে না, এও জেনেছি।

পরদিন মা-দিদিমার দ্বাদশী। সকলের ছোট আমি, আমি সামনে এসে না দাঁড়ালে নির্জলা একাদশীর উপবাস ভঙ্গ হয় না। মায়ের কাছে এসে দাঁড়াতুম। পেয়ে যেতুম শরবতের অবশেষটুকু। শালপাতার ঠোঙ্গায় থাকতো দুটি গুঁজিয়া, তার থেকে একটি মা তুলে দিতেন আমার হাতে! হ্যাঁ, ওটার মধ্যেই ভালোবাসার পরম অভিব্যক্তি খুঁজে পেতুম। ওই গুঁজিয়াটির মধ্যে সকল জিজ্ঞাসার শেষ জবাব। নেড়িকুকুরের চিরদিনের কান্না ওখানে এসে শান্ত হোতো; সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় ওখানে সে পেয়ে যেতো!

বেলতলার ছাদের আলসের উপর ছিল মামার দরুণ টিনের কানেস্তারায় একটি শিশু ডালিম গাছ, তা'র ডালে ডালে ধরেছে লাল রংয়ের ফুল—আর ফুলের নীচে ছোট ছোট ফলের গুটি। ফল কোনোদিন বড় হয় না—ফুলের সঙ্গেই প্রায় কোনো একদিন অলক্ষ্যে ঝ'রে পড়ে। টিনের কানেস্তারায় মাটি যেটুকু ধরে; এবং ওইটুকু মাটির রসে ওই গাছটির যতটুকু বাড়-বাড়ন্ত হওয়া সম্ভব,—কিন্তু ওর বেশী গাছও এগোয় না, ফলেও পাক ধরে না। বেলতলার ছাদের ঠিক মাঝখানে,—বেলগাছের একটা ডাল যেখানে ঝুঁকে পড়েছে—সেই পাঁচিলের একটি পিলপের ওপর বসানো রয়েছে ওই ডালিম গাছের কানেস্তারা। ওটা দূরের থেকে দেখতে পারো, কিন্তু কাছে যাবার হুকুম নেই। কোথা থেকে যমদূতের মতন মামা আসবেন তেড়ে। দূরের থেকে গাছটার দিকে যদি কেউ তাকিয়ে থাকে, মামা আসবেন হুমকিয়ে,—কাছে গিয়েছিলি কেন? কাছাকাছি কেউ যদি যায় তবে দাঁত খিঁচিয়ে তিনি বলবেন, তোর বাবার গাছ? গাছে যে হাত দিলি? আর যদি ডালিম গাছের গোণাগুণতি ফুলের থেকে একটি কখনো অদৃশ্য হয়, তাহ'লেই সর্বনাশ! বাড়ীতে লাগলো আগুন, পাড়াময় হৈ চৈ, মাথার উপরে কাক-চিল ওড়ে, বাড়ীসুদ্ধ মেয়ে-পুরুষের হৃৎকম্প, সৃষ্টি যায় রসাতলে,—ত্রাহি মধুসূদন!

সুতরাং অশান্তির থেকে বাঁচবার জন্য সবাই মিলে ওই ডালিম গাছটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছিল। ওই গাছের ডালে মধ্যে মাঝে পাখী এসে বসে, কাক-কোকিল এসে গুটিফল ঠুকরে যায়, ভিজে কাপড় শুকোতে গিয়ে হয়ত কোনো ডালে আঘাত লাগে,—আর সবাই ঠকঠক ক'রে কাঁপতে থাকে। মামা বুঝি এইবার তাঁর ছুরিতে শান দেবেন।

ইহলোকে মামার দ্বিতীয় আকর্ষণ হোলো, একটি ধূসর বর্ণের বিড়াল। যতক্ষণ মামা বাড়ীতে থাকেন ততক্ষণ সেই জন্তুটি তাঁর আশেপাশে ঘোরে। চোখ দুটো তা'র কটা আর শান্ত। মামা বাড়ীতে আছেন, আর বিড়ালটাকে তুমি লোভ দেখাও,—সে ফিরে তাকাবে না। মাছের কাঁটা দেখাও, দুধের বাটি দাও, থালার উচ্ছিষ্ট বাড়াও,—গ্রাহ্যও করবে না। হয়ত একবার ফিরে তাকাবে,—কিন্তু তার তপস্বীর মতো দুই চোখ। সেই চোখ জরা, হিংসা, লোভ, মোহ—সমস্তর অতীত। বুঝতে পারা যায়,- মনিব ছাড়া আর কোনো ব্যক্তির মায়ামমতায় তার বিশ্বাস নেই। বিড়ালটার নাম হোলো পুষি!

আয় পুষি, আয়।—মামার ডাকে পুষি কোথা থেকে ছুটে এলো পায়ের কাছে। মামা তাঁর কোঁচার খুট দিয়ে পুষির মুখখানা মুছিয়ে দিয়ে বললেন, নাকে দাগ কেন রে? ওই গুয়োটারা কেউ তোকে বুঝি মেরেছে? যা, এক ছিলিম তামাকে সেজে নিয়ে আয়!

বিড়ালটা মামার মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন করুণ কণ্ঠে ডাকে। উভয়ের চারটি চোখ, চারটিই কপিশবর্ণ। মামা বলেন, পারবিনে, কেমন? তবে যা, মাগিকে ডেকে দে'। বলি, কোথায়?

মামীকে তিনি 'কোথায়' ব'লে ডাকেন। 'কোথায়' শব্দটা শোনামাত্র পুষি যায় ঘর থেকে বেরিয়ে। কিন্তু আমাদের এ তল্লাটে আসে না, কেননা জন্তুটা হোলো অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক। জানলা পেরিয়ে সে নামে বারান্দায়, সেখান থেকে খোলার বস্তির চালে, সেখান থেকে আঁস্তাকুড়ের ধারে,—আবার সেখান থেকে লাফিয়ে ওঠে মামীর রান্নাঘরের জানলার গরাদে। সেখান থেকেই ডাকে,—ম্যা···ও।

মরণ আর কি! দেবো অমনি খুন্তির বাড়ি দু'খানা ক'রে!—মামী অমনি খুন্তি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ান্। কিন্তু পুষি জানে, খুঁটিটা তা'র শক্ত। সুতরাং মামীর শাসনে সে কেবল চোখ বুজে থাকে। যেন মামীর কণ্ঠসঙ্গীতে সে একেবারে মুগ্ধ।

কোথায়?—উপর থেকে হাঁক আসে।

মামী ছুটে বেরিয়ে চ'লে যান। ততক্ষণে উপরতলা থেকে পুনরায় ডাক আসে, তামাক দিয়ে যাও!

তাড়াতাড়ি তামাক ধরিয়ে কল্‌কেটা হাতে নিয়ে মামী যখন ঘরে গিয়ে দাঁড়ান্—মামা রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করেন, পুষির নাকে দাগ দেন?

মামী বিরক্তকণ্ঠে বলেন, ওকেই জিজ্ঞেস করো না?

হ্যাঁ করবো, তার আগে বাড়ীসুদ্ধ নির্বংশ করবো! দাঁড়াও, ছুড়িখানা আগে শানিয়ে নিই।

এমন সময় বিড়ালটা আসে জান্‌লা টপকিয়ে। মামা তাকে কাছে নিয়ে বলেন, কে মেরেছে তোকে?

ম্যাও!

আচ্ছা, বুঝলুম। কি করেছিলি তুই?

ম্যা...ও!

কিচ্ছু করিসনি, তবু মারলো? কে কে মেরেছিল?

মামা রাগে ফুলছিলেন, আর পুষি তার কোলে নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে চোখ বুজে খরখর ক'রে নাক ডাকছিল! মামী বললেন,লোকে মারবে না কেন? একটা পোষা পায়রাকে খুন ক'রে এলো, তিনটে চড়াই পাখী খেলে সারাদিনে! ওদের ঘরে দুধের বাটি রাখার জো নেই, রান্নাঘরে একখানি মাছ খুঁজে পায় না ওরা—মার খাবে না?

থাম্—মামা ধমক দিলেন,—তোর মতন ছিঁচকে চোর? পোষা বেড়াল চুরি ক'রে খায়? মায়ের কথা মাসিকে শেখাচ্ছিস? ওর কি জন্মের দোষ আছে?

ম্যাও!—কোলের ভিতর থেকে বিড়ালটা মামার অভিমতকে সমর্থন ক'রে উঠলো।

মুখে আগুন কথার!—ব'লে মামী সেখান থেকে চ'লে গেলেন হনহনিয়ে। মামা তামাক টানতে টানতে এক সময় চেঁচিয়ে বললেন, পাঁচ জনকে যদি খুন করি, তবে একবারের বেশী ফাঁসী হয় না। একথা হাইকোর্টের জজও জানে!

হঠাৎ এধার থেকে দিদিমা হাঁক দিয়ে ওঠেন, তুই কা'কে খুন করার ভয় দেখাস র‍্যা?

মামা অধিকতরো উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করেন, তোমার গুষ্টিকে!

আমার গুষ্টি তুই ন'স ? নিজের গলা কাট্ তুই আগে ! নৈলে এখনই তোকে গো-টে-হেল্ করবো !

তামাক ফেলে মামা এগিয়ে আসেন। বলেন, ভোঁতা ছুরি দিয়ে আগে সবাইকে কাটবো কুচিয়ে, তারপর ফাঁসী যাবো !

ওঃ, লম্বা লম্বা কথা !—দিদিমা হে'কে ওঠেন, আ'টনী সাহেবের দপদপা ! দেশে থানা-পুলিশ নেই, উকীল-মোক্তার নেই—?

আছে, সাক্ষীও আছে ! একজোড়া ক'রে চটিজুতো কিনে দিলে দশজন সাক্ষী পাবো ! বলবো, হুজুর ধর্মবিতার—আমার বাপের নাম ফলনা ভটচার্যি ! ধুতরো বিচি খাইয়ে এই মাগি তাকে পাগল ক'রে জাল-উইল সই করিয়ে নেয়। হুজুর, এ মাগি আমার কেউ নয় !

দিদিমা চীৎকার করলেন, মুখ সামলে কথা ক'স ! এ আমার স্ত্রীধনে কেনা সম্পত্তি,—এক কড়া দাবি-দাওয়া নেই তোর ! যদি বেশী কিছু করিস তবে তোকে পথের 'বেগার' ক'রে ছাড়বো !

হাইকোর্ট, হাইকোর্ট,—মামা বিদীর্ণ কণ্ঠে ঘোষণা করেন, হাইকোর্টে সব নিয়ে ফেলবো ! এক দড়িতে বে'ধে নিয়ে যাবে সব ! ঘুঘুর ফাঁদ দেখাবো ! ওই তোমার এটর্নী যারা সই করেছে জাল উইলের সাক্ষী হয়ে—ওদের বাপের নাম ভোলাবো।

যা, যা তুই—যা খুশি করগে ! তোর ভারি খ্যামোতা ! টিকে ধরাতে জামিন লাগে, তুই যাবি হাইকোর্টে ! মরগে যা—

যাবো, তার আগে তোর গুষ্টিকে হাঁসপাতালসই ক'রে যাবো ! বলে, যার ধন তা'র ধন নয়, নেপোয় মারে দই !

মামা ঘরে গিয়ে ঢোকেন, দিদিমা যান আহ্নিকের ঘরে।

ডালিম গাছ, বিড়াল, জাল-উইল আর হাইকোর্ট,—এ ছাড়া মামার প্রাত্যহিক জীবনে আর একটা বিতর্ক ছিল। সে হোলো মামীর চরিত্র রক্ষার জন্য সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা !

কোথায় ?—উচ্চকণ্ঠে মামা হাঁক্ দেন্।

মামীর কোনো সাড়া নেই। মামা তৎক্ষণাৎ গড়গড়ার লম্বা চিমটেটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসেন। আবার হে'কে ওঠেন, খুন করবো ! বলি, কোথায় ?

পড়ি ত' মরি ক'রে মামী ভিজে কাপড়ে ছুটতে ছুটতে আসেন। মুখ বিকৃত ক'রে মামা বলেন, কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

চুলোয় ! দেখতে পাচ্ছ না কাপড় কাচতে গিয়েছিলুম ? চোখের মাথা খেয়েছ ?

হুঁ, কাপড় কাচতে ! কলতলার ঘুলঘুলি দিয়ে ভাড়াটে বাড়ীর দিকে তাকিয়ে ছিলিনে ? ও-বাড়ীতে কে আছে তোর ?

মামী হাত নাড়া দিয়ে বলেন, যম আছে !

যম নয় ! সে তোর—

মামা একটি প্রাদেশিক শব্দ প্রয়োগ করেন—যেটি বাড়ীর পাশের খোলার বস্তিতে প্রচলিত। পুনরায় বললেন, জানি, সব জানি—হাতে নাতে যেদিন ধরবো, সেদিন একেবারে কচুকাটা! ভোরবেলা অন্ধকার থাকতে কোথায় যাস, বল্ দেখি তামাকের আগুন ছুঁয়ে?

আ মর,—মামী মুখখানা ঝট্‌কা দিয়ে সরিয়ে নেন। বলেন, বুড়ো হয়ে মরতে চললো, কথা দেখো! নিত্যি অপমান, নিত্যি নিত্যি সন্দ'! বিষ নেই, কুলোপানা চক্কর! দুবছর হতে চললো একখানা কাপড় দেয় না, এক পয়সার সাবান কিনে কাপড় কাচবার মুরোদ নেই!

মামা আবার চীৎকার করেন, পকেট মেরে পয়সা নিসনে? কা'র হাত দিয়ে পয়সা পাচার করিস? দুপুর বেলা কোথায় গিয়ে দেখা হয় তোদের। আমি কি জানিনে কিছু?

মামী কাপড় ছাড়তে ছাড়তে একেবারে জ্বলে ওঠেন,—মুখ প'চে যাবে, ধোয়া ছাতারে ধুয়ে যাবে! দশ বছরের মেয়ে এসেছি তোমাদের ঘরে, ভদ্দর নোকের ঘর দেখে বাপে বে' দিয়েছিল,—তারপর থেকে নিত্যি কেলেঙ্কার!

তামাক টানতে টানতে মামা বলেন, দোষ ক'রে ফের গজর গজর কচ্ছিস?

কিসের দোষ আমার? বলো. আজ বলতে হবে—নৈলে এখানে স্ত্রীহত্যে হবো! আজ এসপার-ওসপার হোক।

এঃ এসপার-ওসপার!—মামা মুখ খিঁচিয়ে বলেন, সতীপনা বাজিয়ে বেড়াস সবার সামনে! আমি জানিনে ইঁদুর-বেড়ালের লুকোচুরি খেলা? চুল এলিয়ে ছাদে কাপড় শুকোতে যাস,—রাস্তা থেকে দেখিনে?

মুখে আগুন তোমার!—মামী তীরবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যান্।

অন্ধকারে মামীকে ব'সে থাকতে দেখলে মামা একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন; আর যদি দেখা যায় মামী আপন মনে কাঁথা সেলাই করছেন—তবে ত' সোনায় সোহাগা। অমনি মামা বলতে থাকেন, হুঁ। মতলব আঁটা হচ্ছে মনে মনে, কেমন? নীচের তলায় একা গিয়েছিলি কি করতে? আজ বুঝি দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি?

দেখা-সাক্ষাৎ—! মামী অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকান্। বলেন, কার সঙ্গে?

মামা আগুন হয়ে বলেন, কা'র সঙ্গে! আমার মুখ দিয়ে না শুনলে বুঝি মিষ্টি লাগে না? ঘরের দেয়ালের কান আছে তা জানিস? সেদিন কলতলায় কা'র পায়ের দাগ পড়েছিল? মাঝ রাত্তিরে জানলায় টোকা দিয়েছিল কে? আমার মাথার পাশের জানলা আধখানা ভেজানো ছিল কেন?

মামী হতাশ হয়ে বলেন, নাঃ এ একেবারে ভিমরতি! আজ একটা কেলেঙ্কার বাধিয়ে তবে ছাড়বে!

মামা তাঁর কাঁপিশ চোখ দুটো ঘুরিয়ে বলেন, বলবো তবে? হাটে হাঁড়ি ভাঙবো দেখবি? সেদিন ভোরবেলা চান্ ক'রে এলি কেন? মনে করেছিস বুঝি আফিঙ খাই তাই ভোরবেলা ঝিমোই?

মামী আর রাগ সামলাতে পারেন না। ব'লে ওঠেন, ভোরবেলা গিয়ে চান্ করতে হয় কেন জানো না? কচি খোকা? বুড়ো হয়ে মরতে চললুম, এখন ধম্ম তুলে খোঁটা দাও?

দেবো না? তোর আবার ধম্ম কি? আমার পঞ্চান্ন, আর তোর পঁয়তাল্লিশ,—এই ত' তোর খারাপ হবার সময়! তুই নাতি কোলে করলেও তোকে বিশ্বাস করবো না তা জানিস? 'মরবে নারী উড়বে ছাই, তবেই নারীর গুণ গাই!'

মামী ব'সে ব'সে মেঝের উপর আঙ্গুল দিয়ে দাগ টেনে বললেন, আমিও ব'লে রাখলুম একবার যদি কেষ্টনগরে যেতে পারি, তবে আর কোনো জম্মে পা দেবো না এই ভট্চায্যি বাগানে! সৎমা আমার আজও বেঁচে আছে, আজও ভাই আছে দেশে!

মামা চেঁচিয়ে বলেন, বল্ কবে যাবি তুই, সেদিন গোবর জল ছড়া দেবো।

মামী বলেন, যাবার সময় হলেই যাবো? কা'রো তক্কা রাখবো না। পায়ের দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়বো।

পঁয়ত্রিশ বছর আগে মামী শ্বশুরবাড়ী এসেছিলেন বিয়ের কনে। তারপর থেকে বাপের বাড়ী আর তাঁর যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

হঠাৎ সন্ধ্যার পর মামা একদিন ফিরে এসে ডাকেন, কোথায়?

মামী তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তামাক সেজে দেবার আয়োজন করতে থাকেন। মামা বলেন, কোথা ছিলি গা ঢাকা দিযে।

টিকে ধরিয়ে পাখার বাতাস দিয়ে মামী বলেন, বেলতলার ছাদে।

বেলতলার ছাদে? দখ্নে হাওয়া গায়ে লাগানো হচ্ছিল বুঝি? কা'র জন্যে পথ চেয়ে ছিলি?

মামী বলেন, আ মর, কথার ছিরি দেখো! একাদশীর দিনে একটু মহাভারত শুনছিলুম তা'তেও সন্দ'!

মামা ঘাড় বেঁকিয়ে বলেন, মহাভারত শোনা হচ্ছিল, না দ্রৌপদীর সতীপনায় মজা পাচ্ছিলি? তুই ঘুরিস ডালে ডালে, আমি বেড়াই পাতায় পাতায়, তা জানিস? ঘরে এত পুরুষ্টু গন্ধ কেন? কে এসেছিল ঘরে?

মামী দপ ক'রে জ্বলে ওঠেন। বলেন, মুখখানা আঁস্তাকুড়েতে গিয়ে ঘ'ষে এসো,—যদি পরিষ্কার হয়! বলে, দরবারে মুখ না পায়, ঘরে এসে মাগ ঠ্যাঙ্গায়! গাঁজায় দম দিয়ে এলে বুঝি?

কল্কেটা ফুঁ দিয়ে ধরিয়ে মামী গড়গড়ার মাথার উপর বসিয়ে দেন্। মামা এবার একটু গুছিয়ে ব'সে তামাক টানেন। দেখতে দেখতে পুষি বিড়ালটা এসে তাঁর কাছ ঘেঁসে বসে।

মামা এক সময় বলেন, ঘরে কেউ আসেনি বলতে চাস? তাহলে ওই গেলাসটা চিৎ করা কেন? কে জল খেয়েছিল? ঘরে মাদুর পাতলে কে? দেশালাইয়ের কাঠি প'ড়ে রয়েছে কেন? বল্ দেখি পুষির মাথায় হাত দিয়ে তোর ক্যারেক্টার ঠিক আছে কি না?

মামী ঘৃণায় পিছন ফিরে ব'সে থাকেন, কোনো কথার জবাব দেন না। স্বামীর দিকে মুখ তুলে কথা কইতে তাঁকে কখনই দেখা যায়নি ; এর উত্তরে, ওর মুখ দক্ষিণে। এক সময় মামী উঠে আবার বেলতলার ছাদের দিকে চ'লে যান্। মামা মুখ ফিরিয়ে বলেন, হুঁ, আর দেরি নেই! থলের মধ্যে পুরে মুখ বেঁধে বেড়াল বিদেয় করবো। রাত্তিরে ঘরে ঢুকলে হয়,—সতীপনা ঘোচাবো।

ম্যা···ও!—বিড়ালটা হঠাৎ একবার ডেকে ওঠে।

পুষির দিকে তাকিয়ে মামা বলেন, কি বললি?

পুষি আর কোনো জবাব দেয় না। মামার মন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। তিনি তৎক্ষণাৎ ডাকেন কোথায়?

কণ্ঠস্বরের কঠোরতায় বাড়ীসুদ্ধ লোক চমকে ওঠে। সুতরাং মামী হন্তদন্ত হয়ে আবার এসে দাঁড়ান। বলেন, আবার কোন ছান্দের জন্যে ডাক পড়লো?

কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে মামা বলেন, ডালিমগাছের ফুল তিনটে আছে কিনা দেখে আয়।

তিনটে আবার কোথায়? দুটো ফুল দেখলুম ত' বিকেলে!

দুটো! বেরোবার সময় তিন-তিনটে দেখে গেলুম, আর তুই বলিস দুটো? চোখে ধুতরো ফুল ফোটাবো! শিগগির দেখে আয়। —আচ্ছা চল্, আমিই যাচ্ছি—আলো ধর—

কেরোসিনের ডিবেটা হাতে নিয়ে মামী চললেন আগে আগে। বেলতলার ছাদে মহাভারতের আসর তখন ভেঙ্গে গেছে। বিধবারা এতক্ষণে শুয়ে পড়েছে সারাদিন ধ'রে শুকিয়ে। আলোটা উঁচুতে ধ'রে দেখা গেল, একটামাত্র ফুল আছে ডালিমগাছে, আর নীচের দিকে প'ড়ে আছে দুটো। মামা বললেন, কে ফেলেছে ফুল ছিঁড়ে? কা'র বাবার গাছ?

আসন্ন ঝড়ের আভাস পেয়ে এদিকে দিদিমা উঠে বসলেন। সারাদিনের নির্জলা উপবাস সত্ত্বেও তিনি প্রস্তুত। আমরা সবাই যেযার গর্তে গিয়ে ঢুকে মুখ বাড়িয়ে রইলুম। সকলের বুকের মধ্যে দুরু দুরু কাঁপন। আগুনের ফিন্‌কি কখন্ আসে ছুটে! অগ্নিকাণ্ডের আর দেরি নেই।

কিন্তু সন্ধ্যার পরে মামার চোখ দুটো থাকে মাদকের রসে নিমীলিত, চেঁচামেচিতে হয়ত বা মৌজটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সুতরাং তিনি এবার দাঁত কিটিয়ে বললেন, আচ্ছা, আজ যেমন আছে থাক্। কাল সকালে উঠে পাখীর বাসা ভাঙ্গবো!

তিনি তাঁর ডালিমগাছের দুরবস্থার চিন্তা আজকের মত স্থগিত রেখে সেখান থেকে স'রে আসেন। কিন্তু ওই কেরোসিনের ডিবের আলোয় মুখ ফিরিয়ে দেখতে পান, দিদিমা ব'সে আছেন স্তব্ধ আগ্নেয়গিরির মতন। তাঁকে দেখেই মামার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। কাছে দাঁড়িয়ে বলেন, এই হোলো তোমার গুষ্টির বদমায়েসী। কাল সকালে একেবারে গাছ সুদ্ধ বিসর্জন দেবো!

দিদিমা প্রশ্ন করেন, তুই দেবার কে?

মামা বলেন, ফলনা ভট্‌চার্যির বাড়ী—আমি তা'র ওয়ারিশ—

বটে! আর আমি যদি গোঁসাইকল্‌কে ডেকে কাল তোকে গলাধাক্কা দিয়ে বা'র ক'রে দিই?

বেশ, দিয়ো। কিন্তু যাবার আগে তোমার গুষ্টিকে সাবাড় ক'রে তবে বাড়ী থেকে বেরোবো। লাঠিতে তেল মাখানো আছে, ছুরিতেও শান দিয়ে রেখেছি!

মামী কোনোমতে মামাকে টেনে-টুনে ঘরের দিকে নিয়ে চ'লে যান। দিদিমা সেইখানে ব'সে রুদ্ধ আক্রোশে ঠকঠক ক'রে কাঁপতে থাকেন। আজ রাত্রের মতো ঝড়ের আশঙ্কাটা কমলো, কিন্তু মেঘের ঘনঘটা রয়ে গেল। কাল সকালে কি-হয় কি-হয়।

সেদিন রাত্রে কে যেন জানলার ধারে ওৎ পেতে শুনে এলো, মামী ফিস ফিস ক'রে অনেক কথা মামাকে শুনিয়ে চলেছেন।

হঠাৎ একদিন সকাল বেলায় মামী চীৎকার ক'রে উঠলেন,—দেখো, দেখো তোমরা সবাই মিলে দেখো,—আমাকে মেরে ফেললে, রক্তগঙ্গা করলে। দেখো তোমরা সবাই।

বাড়ীময় হুলস্থুল প'ড়ে গেল। যেখানে যে ছিল, চারিদিক থেকে ছুটে এলো। মামী হাউমাউ ক'রে কাঁদছেন,—বিনাদোষে মারলো! সকালবেলা বাসি মুখে উঠে কাজ করতে নেমেছি, মুখে একটা রা কাড়িনি! খুন করলে আমাকে, রক্তগঙ্গা করলে! তোমরা পুলিস ডাকো, থানায় খবর দাও,—ডাকাতকে ধ'রে গারদে নিয়ে যাক। ওগো আমার মা গো, ওগো কে কোথায় আছো গো! ওগো আমাকে একেবারে মেরে ফেলেছে গো—

ব্যাপারটা জানাজানি হ'তে আর বাকি রইলো না। মামার নাকি হুকুম ছিল ভোরবেলা তাঁকে না জানিয়ে মামী যেন শয্যাত্যাগ না করেন। তবুও মামীর অবাধ্যতার জন্য মামা নিজের পৈতার গোছায় মামীর আঁচলের খুঁট বেঁধে রাখেন। কিন্তু মামার মাদবজনিত নিদ্রা ভাঙতে একটু দেরী থাকার দরুণ মামী অতি সন্তর্পণে আঁচলের গেরোটি খুলে বাইরে চ'লে যান্‌। কতক্ষণ পরে ছাঁৎ ক'রে মামার ঘুম ভেঙ্গে যায়, এবং পাশে শূন্য শয্যা দেখে তিনি চিমটেটা হাতে নিয়ে ধাওয়া করেন।

কী কান্না মামীর! ডুকরে-ডুকরে কান্না, পঁয়ত্রিশ বছর ধ'রে জীবনের ব্যর্থতার কান্না!—ওগো তোমরা এর হেস্তনেস্ত করো, নৈলে আমি নিজে থানায় যাবো পুলিস ডাকো, বাড়ী ঘেরাও করো, খানাতল্লাসী হোক, আসামীকে বাঁধুক...

মাসিমারা এলেন, দীপু এলো ছুটে, ভাড়াটে বাড়ীর রাঙ্গাবৌ এলো, মিত্তিরদের বরদা ঝি এলো, কার্তিক স্যাকরা আর বেহারী-বুড়োর ছেলেরা, এলো নলিতাবাবুর বউ। আমাদের হাঁড়িচড়া বন্ধ। দিদিমা এলেন, মা এলেন, এলো সবাই। বাড়ীর বাইরে লোক দাঁড়িয়ে গেল। পাড়ায় পাড়ায় খবর রটারটি।

লোহার চিমটে দিয়ে মামীর মাথার ওপর এক ঘা মেরেছেন মামা। সেজমাসিমা সকলের আগে মামীর মাথায় জল ঢাললেন। বললেন, রক্ত কই, বউ?

মামী ফুঁপিয়ে বললেন, রক্ত কি আর আছে মিলির মা—পঁয়ত্রিশ বছরে সব রক্ত চুষে খেয়েছে ওই ডাকাত—

চুলের রাশির মধ্যে অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রে সত্যই পাওয়া গেল একটুখানি ক্ষত, এবং এও সত্য—সেই ক্ষতে রক্তের আভাস রয়েছে। তবে কিনা চীৎকারের পরিমাণ একটু বেশী হয়ে গিয়েছে বটে! আর এত যে লোক জড়ো হয়েছে চারিদিকে, তাদের চোখে মুখে যেন কতকটা কৌতুকের ছায়া। মামী একটু যেন বাড়াবাড়িই ক'রে ফেলেছেন। রক্তগঙ্গা অথবা খুনজখম—কোনোটাই নয়। ওটা চিমটের একটা খোঁচামাত্র। থানা পুলিস, খানাতল্লাসী, আসামীকে গ্রেপ্তার—এসব কথা ওঠে কি?

পাড়ার লোকেরা একে একে বিদায় নিয়ে চ'লে গেল। মামী তখন বলতে আরম্ভ করলেন, মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুললে কোম্পানীর রাজত্বে পাঁচ বছর জেল। আমি ওকে জেলে পাঠাবো।

দিদিমা এবার বললেন, আচ্ছা, থাম্ এখন, অনেক কেলেঙ্কারী হয়েছে। তিলকে আর তাল করিসনে!

মামী হৈ চৈ ক'রে উঠলেন, কেন করবো না? স্ত্রীহত্যে দেখলে কি তোমাদের মন খুশী হোতো? আমি কিছুতেই অল্পে ছাড়বো না!

কি করতে চাস?

সবলের সামনে তোমার ছেলে ঘাট মানুক। তারপর একজোড়া শাড়ী এনে দিক্, একপো নারকেল তেল, একখানা গামছা, দুখানা সাবান! নৈলে এই ঘা আমি শুকোতে দেবো না,—খোঁচা দিয়ে জিইয়ে রাখবো। পাড়াসুদ্ধ লোককে দেখাবো!

এইবার মামা ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসেন। তিনি বিগত রাত্রির ঘটনার সূত্র ধ'রে বলেন, মাঝরাত্তিরে কে তোকে ডাকছিল ইশারায়, সত্যি কথা বল্।

সেজমাসিমা বললেন, দুর্গা·· যত সব নোংরা কথা! যাও, ঘরে যাও!

মামী বলেন, ডাকছিল তোমার যম!

মামা পুনরায় বলেন, আমি সাড়া দিয়ে বললুম, কে রে? কোন্ আবাগের বেটা? মাগি আমাকে বোঝায়, ও হোলো টিকটিকি! টিকটিকি কি রে মাগি? একান্নটা টিকটিকি ম'রে তবে আমার মতন একটা তক্ষক হয়, তা জানিস? আমি তখন বললুম, দাঁড়া গুয়োটা,—ছুরিখানা আগে ধরি বাগিয়ে! অমনি ব্যস—তক্ষকের ভয়ে টিকটিকি একেবারে গাঁ ছাড়া! ধরেছিলুম প্রায় একেবারে হাতে নাতে! সতীপনা দেখে নিত পাড়ার লোকে!

অতঃপর স্ত্রীর চরিত্ররক্ষার চেষ্টায় মামা একটা স্থির করলেন, এ পাড়া ছেড়ে তিনি এমন এক স্থানে যাবেন, যেখানে গেলে দুষ্ট ব্যক্তিরা মামীর কোনো খোঁজ পাবে না। তাছাড়া মামীর পক্ষের ধর্মে মতি থাকা এ বয়সে দরকার বৈ কি।

খড়দায় আছেন শ্যামসুন্দর, তাঁর মন্দিরের চারিদিকে পাড়া পল্লী। কাছাকাছি গঙ্গা, শ্যামসুন্দরের ঘাট। সামনেই সুখচর। মামা গিয়ে শ্যামসুন্দরের পল্লীর কাছে কোথাও একখানা ঘর ভাড়া ক'রে এলেন। ভাড়া নাকি তিন টাকা। তিনি নেশাপত্র

ছাড়বেন, এবং বাকি জীবন গঙ্গাস্নান ক'রে কাটাবেন। শ্যামসুন্দরের নাটমন্দিরে ব'সে সকাল-সন্ধ্যা তপশ্চর্যা করবেন।

একখানা গরুর গাড়ী ডেকে এনে মামা তাঁর লটবহর তুললেন, এবং বিদায় নেবার আগে সকলকে একচোট গালমন্দ করলেন। গরুর গাড়ীর আগায় গাড়োয়ানের পাশে বসলেন মামা, মাঝখানে পুষি বিড়াল, এবং গাড়ীর ল্যাজের দিকে বসলেন মামী। জোড়াতালি দেওয়া পুরনো ছাতিটা খুলে মামা ধরলেন নিজের মাথার ওপর। গাড়ী ছেড়ে দেবার পর তিনি বললেন, হাইকোর্টে নালিশ করবো, জাল-উইল ধরিয়ে-দেবো, তারপর গুষ্টিসুদ্ধকে পথে বসিয়ে একদিন এসে ফলনা ভট্চার্যির সম্পত্তি দখল করবো।

কিন্তু আরেকটা কারণ ছিল, সেটা মামা আর চেঁচিয়ে বলতে সাহস করেননি। ভাগ্নেরা নাকি সাবালক হয়েছে, তাদের কারো কারো আঠারো বছর পেরিয়ে গেছে,—সুতরাং এ বাড়ীতে মামীকে নিরাপদে রাখা আর সম্ভব নয়। লাঠি এবং ছুরির দ্বারা হয়তো সম্পত্তি রক্ষা করা যায়, কিন্তু মামীর চরিত্ররক্ষা করা একেবারেই অসম্ভব। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—কোনো যুগের মামীরা নাকি বিশ্বাসযোগ্য নয়—এই হোলো মামার ধারণা! দেখতে দেখতে গরুর গাড়ীটি অলিগলি পেরিয়ে চোখের আড়ালে চ'লে গেল। গাড়ীর মাঝখানটিতে শান্তভাবে বসে ছিল পুষি—সেও কলকাতার শোভা দেখতে দেখতে তীর্থযাত্রা করলো।

বর্ষাকালের পর আশ্বিনের দুর্গাপুজো। কার্তিক মাসের হিম পড়লো খড়দায়। বাবা শ্যামসুন্দর ছাড়া আর সকলেই প্রায় ম্যালেরিয়া জ্বরে বিছানা নিল। মামা প্রচুর আফিঙ সেবন করেন। তাঁকে যদি সাপে কামড়ায়, তবে সাপই মরবে—তাঁর কিছু হবে না! কিন্তু ম্যালেরিয়া সাপ অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর—সুতরাং মামারও জ্বর হ'তে লাগলো। মামা বলতেন, মামী নাকি সাপের চেয়েও সাংঘাতিক, তাই ওর জ্বর হয়নি একটিবারও।

সে যাই হোক, মাস চারেক পরে অগ্রহায়ণের গোড়ার দিকে মলিদাখানা গায়ে জড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে মামা আবার একদিন এসে এ বাড়ীতে নামলেন গরুর গাড়ী থেকে। মালপত্রগুলো সবাই মিলে হাতাহাতি ক'রে ভিতরে নিয়ে এলো। মামার তখন জ্বর এসেছে, উবু হয়ে তিনি বসলেন দরজার পাশে। হাইকোর্টে নালিশটা আপাতত স্থগিত থাক্, কিন্তু গরুর গাড়ীর ভাড়াটা এখন না পেলেই চলবে না। দিদিমা গালমন্দ দিতে দিতে টাকা বা'র ক'রে দিলেন। কথা রইলো এই, ফলনা ভট্চার্যির সম্পত্তিটা ফেরৎ পেলে এটাকা মামা শোধ ক'রে দেবেন!

মামা শয্যাগ্রহণ করলেন, এবং মামী হলেন তাঁর সেবাদাসী। কিন্তু যে-ব্যক্তির কখনো অসুখ করে না, সে-ব্যক্তি অসুস্থ হ'লে বড়ই উতলা হয়। সুতরাং মামা ধরে নিলেন, এ যাত্রা তিনি আর বাঁচবেন না। মামী সকলকে ডেকে বোঝাতে চাইলেন, ও ঠিক বাঁচবে, ও দস্যির কিছুতেই মরণ নেই!

মামা মুখ খিঁচিয়ে বললেন, বাঁচলে তোর ভারি সুবিধে, না? মাথার সিঁদুরটাও থাকে, সতীপনাও থাকে—কেমন?

সাগুর বাটি মুখের সামনে ধ'রে মামী বলেন, তুমি মরলে সব পুড়বে, মুখখানা শুধু পুড়বে না—এই ব'লে রাখলুম।

মামা বলেন, তোর জন্যে মুখ পুড়েছে চিরকাল, পোড়া মুখ আবার পুড়বে কেমন ক'রে?

মামী তাঁকে ওষুধ খাইয়ে গা মুছিয়ে গায়ে ঢাকা দেন। তারপর একসময় বেরিয়ে যান্ নিজের কাজে।

সেজমাসিমা কাছে গিয়ে বসলে মামা তাঁর স্ত্রীর সতীত্ব সম্পর্কে কথা তোলেন। সেজমাসিমা ব্যস্ত হয়ে বলেন, ছি ছি, ও সব কথা বলতে নেই···চুপ করো তুমি!

আরে শোনোই না,—ভারি মজার কথা,—মামা বলতে লাগলেন, কথা বলছি! রোজ মাঝরাত্তিরে কেউ-না কেউ এক বেটা ঠিক আসতো! টোকা দিয়ে ডাকতো মাগিকে দরজার বাইরে থেকে। আমার জ্বর, উঠতে পারতুম না। কিন্তু ছুরিখানা ঠিক বাগিয়ে রাখতুম।

সেজমাসিমা মামার দিকে তাকালেন।—

মামা বললেন, বোঝো কাণ্ড! এপারে খড়দা, ওপারে হোলো এঁড়েদা—আর মধ্যিখানে আগড়পাড়া! এঁড়েদা শালা আগড় পেরিয়ে এসে খড়ের আঁটিতে টান্ মারবে,—আর আমি বরদাস্ত করবো! ধরতে পারলে বাপের বিয়ে দেখিয়ে ছাড়তুম!

জ্বরের ঘোরে মামার চোখে তন্দ্রা আসে; সেজমাসিমা উঠে চ'লে যান্।

বলা বাহুল্য, গাঁজা-আফিঙের গুণে সেবার মামার ম্যালেরিয়া পালিয়ে ছিল।

কিন্তু সংসারে অভাব অনটন কিছুতেই আর ঘোচে না। বাড়ী ভাড়া যা পাওয়া যায়, তা'তে দিন পনেরো কোনমতে আধ পেটা খেয়ে চলে, বাকি পনেরো দিন হরিমটর! চাল-ডাল যদি বা জোটে, কয়লার অভাবে রান্না চড়ে না; আর তেল-নুন যদি বা জোটে, পোস্ত কেনার পয়সা নেই। সুতরাং দিদিমা স্থির করিলেন, এ বাড়ী বেশী টাকায় সম্পূর্ণ ভাড়া দিয়ে অন্য কোথাও সস্তায় ঘর ভাড়া নিয়ে থাকা! নাবালকরা মানুষ না হ'লে সমস্যার আর কোনো প্রতিকার হবে না।

সস্তায় ঘর ভাড়া কোথা? তিন চারখানা ঘর নিতে গেলে পনেরো টাকার কম কোথাও হবে না। তা ছাড়া এ বাড়ীর টেক্স-খাজনা আছে, ধারদেনা আছে, অসুখ-বিসুখে ডাক্তার-বদ্যিও আছে। বাঁসারীপাড়ার রায়েরা এবাড়ী ভাড়া নিতে চায় সত্তর টাকায়। সামনের মাসের দোসরা তারিখে তারা এবাড়ীতে আসতে প্রস্তুত,—এই কথা শুনে দিদিমা রাজি হলেন। কিন্তু আমাদের নিজের জন্য ঘর ভাড়া পাওয়া যাবে কোথায়?

সবাই মিলে অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে মামা এসে খবর দিলেন, বাঘমারীতে একখানা একতলা বাড়ী আছে, খানচারেক ঘর, ভাড়া দশ টাকা। তবে কিনা বাড়ীটি একটু পুরনো, আর কলের জল নিতে হবে রাস্তার থেকে।

অনেক প্রকার বিচার-বিবেচনার পর বাড়ীটি ভাড়া নিতে দিদিমা রাজি হলেন। সেকালে মানিকতলার খাল পেরিয়ে কোন্ দিকে গেলে যেন পাওয়া যেতো বাঘমারীর জঙ্গল। যতদূর যাওয়া যেতো তাল তেঁতুল আর নারকেলের বনবাগান, আসশেওড়া আর গাব গাছের ঝোপ, চারিদিকে জলা বিল। সেখানে দিনমানে ঘুরে বেড়াতো মাছরাঙ্গা আর শঙ্খচিল। ওই জলাবিলের মাঝপথ দিয়ে চলে গেছে রেলপথ, তার বাঁশী বেজে যেতো চৈত্র-বৈশাখের নির্জন দুপুরে,—ঘূর্ণীধুলোর হাওয়ার হাহাকারে সেই বাঁশীর সুর বহুদূর পর্যন্ত ভেসে চ'লে যেতো,—যেদিকে বিদ্যাধরী নদী জলের অভাবে বুকফাটা তৃষ্ণায় মুখ থুবড়ে প'ড়ে রয়েছে। এখনকার অনেকেই জানে চল্লিশ বছর আগে বাঘ আসতো ওই বাঘমারীতে। ওখানকার বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতো নাকি রঘু ডাকাত তার দলবল নিয়ে। তাদের চেহারা নাকি এই পাট্টা-পালোয়ান, গোঁফে চাড়া দিত, আর তেল মাখা লাঠির ওপর চাড়া দিয়ে লাফিয়ে উঠতো দোতলায়,—যেখানে জমিদারের ঘর। পাইক-পেয়াদাদের সঙ্গে লেগে যেতো তাদের মল্লযুদ্ধ। কিন্তু শেষকালে জয় হোতো রঘু ডাকাতের। ধনরত্ন লুণ্ঠন ক'রে তারা বীরদর্পে হৈ হৈ রৈ রৈ ক'রে চ'লে যেতো। সুতরাং বাঘের ভয় আর ডাকাতের ভয়ে বাঘমারীর দিকে যাবার কারো সাহস হোতো না। সেদিকে ডাঙ্গায় আছে অজগর সাপ, আর বিলের মধ্যে কুমীর।

এই সমস্ত ভয়-ভাবনা থাকা সত্ত্বেও একদিন কোমর বেঁধে উঠে দাঁড়াতে হোলো। মামা দিন দুই আগে দু টাকা দিয়ে সেই বাড়ী বায়না ক'রে এলেন। আমরা এবাড়ী ছেড়ে দেবার পরের দিনই কাঁসারীপাড়ার রায়েরা এসে এই বাড়ী দখল করবে এইরূপ স্থির ছিল। সুতরাং একাদশীর দিন সবাই যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা ক'রে নিল।

ঘাঘমারী! নামটা শুনে ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানরা বললে, পাঁচ টাকার কম যাবো না। গোয়াবাগানের পাল্কীর বেহারারাও বললে খালের ওপারে যেতে তা'রা অপারগ। অতএব সবাই মিলে হেঁটে যাওয়া ছাড়া আর কোনো গতি নেই। কেবল মালপত্র বহন ক'রে নিয়ে যাবার জন্য এলো তিন চারখানা গরু-মহিষের গাড়ী। গরুর গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গেই গৃহস্থকে পায়ে হাঁটা পথেই যেতে হবে। যাচ্ছি সেই কোন্ ডাকাতের দেশে। কা'র ভাগ্যে কি আছে বলা কঠিন। অনেকেই বলে, বাঘমারীর দিকে গেলে আর কেউ ফেরে না। সেখানে পিছন থেকে গলায় ফাঁস টেনে দেয়; দিনদুপুরে নিরীহ পথচারীর কাটা মুণ্ডু পথের ধারে গড়াগড়ি যায় ডাকাতেকালীর মন্দিরে তান্ত্রিকরা সেখানে নরবলি দেয় এবং শাঁকচুন্নিরা রাঙ্গা পাড় শাড়ী প'রে তেঁতুলতলায় আর শেওড়ার ঝোপে-ঝাড়ে অবাধে বিচরণ ক'রে বেড়ায়। ঘোড়ার গাড়ী আর পাল্কি যে সে-তল্লাটে যাবে না, এত' জানা কথা।

একাদশীর দিন ভোর হ'তেই আমাদের বুকের মধ্যে কাঁপতে আরম্ভ করেছিল। নিশ্চিত মৃত্যুর সময়টা জানতে পারলে মানুষের মনের অবস্থা কেমন হয়? পিছনে প'ড়ে রইলো আমাদের যা কিছু। বেলতলার ছাদটার ওই কোণে পুতুল খেলার ঘর, এই চিরপরিচিত ভিটের ছোট ছোট আঁকবাঁক,—যেখানে আমাদের প্রাণের লীলাক্ষেত্র, রইলো উত্তর-পূবের ওই নিম গাছটা—যার দিকে চেয়ে-চেয়ে কত অন্যমনস্ক দিন কেটেছে; রইলো তেতলার ছাদ—যেখান থেকে শিশুর চক্ষু আপন জগতের বাইরে গিয়ে বিশ্বের দিগ্‌দিগন্তকে কতবার দেখে এসেছে। ওই আকাশ পথে আসতো ঝুলন-পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, আসতো বিজয়া দশমীর বিচ্ছেদের সুর, আসতো হেমন্তের প্রথম স্নিগ্ধ হাওয়া, আর শোনা যেতো দোলের রাত্রির ফাগুয়ার গান। এবার আমাদের ছেড়ে যেতে হচ্ছে সব—নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে না গিয়ে আমাদের আর কোনো উপায় নেই।

যাবার আগে বাড়ীময় কেঁদে বেড়ালো প্রায় সবাই।

পায়ে হেঁটে সবাই চলেছি ঈশান কোণের দিকে। ঈশানীর ভ্রূকুটি-কুটিলতা আমাদের ভাগ্যকে যেন অবশ্যম্ভাবী বিনাশের দিকে আবর্ষণ ক'রে নিয়ে চলেছে। পথে যেতে যেতেও অনেকের চোখে জল গড়াচ্ছিল।

পাঁচবাগান পেরিয়ে চারখানা সারিবন্দী গরু মহিষের গাড়ী চলেছে মানিকতলার রাস্তার দিকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের রোদ্দুর পথও অনেক দূর। কারো হাতে বালতি, কারো হাতে ডাল আর মসলার পুঁটলী, কেউ নিয়েছে ভিজে কাপড়ের বোঝা। গাড়ী-গুলির সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে হন্ হন্ ক'রে যেতে হচ্ছে। রঘু ডাকাতকে আজো আমরা দেখিনি, কিন্তু গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানগুলোকে দেখে আমরা রঘু ডাকাতের খানিকটা আঁচ পাচ্ছি। ওরা গাড়ীগুলোকে ছুটিয়ে যদি এই দুপুর রোদ্দুরে পালায়, তবে আমরা দাঁড়াই কোথায়? ওদেরকে চোখে-চোখে রেখেছি বটে, কিন্তু ওরা যদি বাঘমারীতে গিয়ে সেই নির্জন জঙ্গলের প্রান্তে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে রঘু ডাকাতের দলের সঙ্গে যোগ দেয়, তবে আমাদের চালের টিকি ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে?

জলের ঘটি তুলে সবাই জল খেয়ে নিল।

বড়দাদা নিয়েছে হাতে এক গাছা লাঠি। অজগর সাপ আর বাঘের পক্ষে এই লাঠিই যথেষ্ট। মামার কাছে মস্ত এক ছোরা, সেটি তিনি গোপন রেখেছেন,—কেননা রঘু ডাকাত নাকি ছুরি ছোরাকে ভীষণ ভয় করে। আমাদের মালপত্রাদি এবং চেহারা-চরিত্র লক্ষ্য করলে সেদিন পৃথিবীর কোনো ডাকাত যে লুট-তরাজে উদ্বুদ্ধ হতে পারতো না, একথা আমাদের কারো মনে হয়নি। কিন্তু বাইরে কোথাও ভয় না থাক্, ভয় আছে মনে। দিদিমার বাক্সে আছে লক্ষ্মীর ঝাঁপি,—তাতে আছে সিঁদুর মাখানো পাঁচটি টাকা আর শালগ্রামের সোনার পৈতে। এ ছাড়া মেয়েদের নাক-কানের নোলক আর মার্কাড়ি; বাবা তারকনাথের দরুণ সোনা বাঁধানো কবচ,—এ ছাড়া আছে বৈকি সব টুমটাম। বাড়ীর পাট্টা আছে, ঠিকুজি-কোষ্ঠি আছে, কুলজি আছে,—আরো সব কি কি। ডাকাত পড়লে আগে কাটবে গলা, তারপরে লুটপাট।

বাঘমারী অনেক দূর। ধূলোয় রোদ্দুরে আর ঘামে সবাই শ্রান্ত। মানিকতলার খাল পেরোতেই কলকাতার শহর শেষ হয়ে গেল। বনবাগান আর একটু-আধটু খোলার বস্তি। গরু চরছে কোথাও, কোথাও বা ভেড়া ছাগলের পাল চলেছে। পথ এবার নিরিবিলি। সকলের মুখে চোখে আসন্ন আতঙ্কের ছায়া। ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট। গরুর গাড়ীরা চললো ঢালু খোয়ার রাস্তায় গড়গড়িয়ে।

মামা ছিলেন আমাদের প্রধান দলপতি। কবে যেন তাঁর একটি পুরনো ছাতা ছিল, এখন ছাতা নেই, আছে ছাতার বাঁট। সেই বাঁট এখন তাঁর লাঠির কাজ করে। বাঘমারীর পথে ঢুকে ভাড়াটে বাড়ীর কাছাকাছি এসে মামা হাঁক দিলেন, খবরদার। সকলের আগে আমি, মনে রাখিস।

সবাই উৎসুক হয়ে তাঁর দিকে তাকালো। মামা সেই বাঁট তুলে বললেন, যদি আসে তা'রা, আমি এগিয়ে যাবো সকলের আগে। এই লাঠি—অন্ততঃ তিনটেকে নিকেশ করবো ব'লে রাখছি।

অনেকে ডরিয়ে উঠলো মামার নির্ভীক চেহারার দিকে তাকিয়ে। মামা তাঁর করাল দৃষ্টি ফিরিয়ে পুনরায় বললেন, রঘু আমাকে চেনে, তা'র গাঁজার কল্‌কে অনেকবার এই হাতেই সেজে দিয়েছি! আর তা'র দলবল? আসুক না তারা একে একে? বাপের বেটা যদি হয়, তবে একে একে ল'ড়ে যাক্ দেখি? কিন্তু খবরদার, আমি সকলের আগে।

দিদিমা তাঁর একমাত্র পুত্রকে চিনতেন। ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, একলা পারবি? ভয় নেই তোর?

মামা মুখ খিঁচিয়ে বললেন, ভয়! আমি কি মেনিমুখো যে, ভয় পেয়ে আঁচলের আড়ালে ঢুকবো? পিঠের দিকে কাছা গুঁজলেই আর পুরুষ মানুষ হয় না, মনে রেখো।

মামা ছাড়া আরো পাঁচটি পুরুষ আমাদের দলে আছে। কিন্তু রঘু ডাকাতের দল অতর্কিতে আক্রমণ করলে এই পাঁচজনের কয়জন সক্রিয় থাকবে, এইটি ছিল প্রশ্ন। পাঁচটির মধ্যে তিনটি একেবারেই নাবালক। চতুর্থটির বয়স ষোল। যিনি পঞ্চম, তিনি ডাকাত পড়ার সংবাদ শোনামাত্র কোথায় থাকবেন, পূর্বাহ্নে বলা কঠিন। অতএব মামাই হলেন আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল। খুঁটি হিসাবে তিনি বেশ মজবুদ, তবে কিনা সেই খুঁটি শক্ত ক'রে ধ'রে রাখা চাই।

বড়দাদা তা'র লাঠি নিয়ে এগিয়ে এলো। বললে, ভয় কি! মামার পড়ে আমি!

তুমি?—দিদিমা বললেন, তুমি না সেদিন কাবলীঅলাকে রাস্তায় দেখে পেছন দিকে লাঠি লুকিয়েছিলে? তোমাকে আমি চিনি।

বড়দাদা একটু বিমর্ষভাবে অন্যত্র স'রে গেল।

জরাজীর্ণ একখানা একতলা বাড়ীর ধারে এসে গরুর গাড়ীটা থামলো। বেলা তখন প'ড়ে এসেছে। বাড়ীর সামনে কোনো আব্রু নেই, পাঁচিলগুলো ভেঙ্গে পড়েছে, উঠোনের উপরে প্রাচীন ভিটের স্তূপাকার ভগ্নাবশেষ। আশপাশের নিরিবিলি অঞ্চল

ঝোপ আর জঙ্গলে আকীর্ণ। কাছাকাছি পাড়া পল্লী বিশেষ নেই। পরম্পরায় শোনা গেল এদিকে সাপখোপের ভয়ে সন্ধ্যার আগেই লোক চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানরা হাসাহাসি করছিল, দিদিমা সেটি লক্ষ্য করেছেন। এক সময় বললেন, অ-ছেনু, জিনিসপত্তর নামাবার আগে তোমাদের আঁসবঁটিখানা আমার কাছে রেখে যেয়ো ত' মা?

কিন্তু রাশি রাশি ঘর-বসতি জিনিসপত্র নামতে লাগলো সেই ভগ্নস্তূপের জটলার আশেপাশে। ঘরগুলি দেখে সবাই আঁৎকে উঠলো। অন্ততঃ দশ বছর এই ঘরে মানুষের বসবাস নেই। মেঝের উপর গাছ উঠেছে, কড়িকাঠের ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা যায়, সমস্ত দেওয়ালে উইপোকার দড়ি নেমেছে। ঘরের কোণে-দোণে মস্ত-মস্ত গভীর গর্ত। সেখানে সাপ অথবা শিয়ালের বাসা থাকা বিচিত্র নয়। কোনো ঘরে জানালার কপাট নেই, কোনো ঘরের দরজা খুলে নিয়ে গেছে। একখানা ঘরে কোনো এক জলন্ত একটি ক্ষুদ্র কঙ্কাল দেখা গেল,—বোধ করি কুকুরে টেনে এনেছে। বড় বড় বাদুড় আছে সব ঘরে। যেটার নাম রান্নাঘর, সেটার কাছাকাছি গিয়ে উঁকি মেরে সবাই ভয়ে পালিয়ে এলো। কি যেন একটা নড়ছে সেই ঘরের বুকচাপা অন্ধকারে। তা'র পাশে কুয়ো, তা'র ভিতর দিকে তাকালে গা ছমছম করে। এই বাড়ীটি বাসের উপযোগী ক'রে তুলতে অন্তত পনেরো দিন লাগবে। কিন্তু অপরাহ্নের কুটিল আলোয় ভিতরে এসে দাঁড়াবার মতো বুকের পাটা কা'রো ছিল না। সমস্ত বাড়ীখানার মধ্যে কেমন একটা অতি প্রাচীন জীর্ণতার বন্য ভৌতিক সোঁদা গন্ধ।

কে একজন মেয়েছেলে যাচ্ছিল পথ পেরিয়ে। সে থমকে দাঁড়িয়ে বললে, এ ভিটেতে তোমরা কেন এলে, মা?

আমরা এ বাড়ী ভাড়া নিয়েছি বাছা।

ভাড়া নিয়েছ? এ যে হানাবাড়ী মা? বিশ বছর হতে চললো এ বাড়ীতে মানুষ ঢোকেনি! মালিকরা সবাই মরেছে ওলাউঠোয়। এ বাড়ী কা'র কাছে ভাড়া নিলে?

মামা চেঁচিয়ে উঠলেন—তুমি যাও বাছা, পথ দেখো। আমাদের ঘর আমরাই গুছবো!

স্ত্রীলোকটি চ'লে গেল। মামা গলা নামিয়ে বললেন, বুঝতে পারলে কিছু? এরা হোলো রঘু ডাকাতের চর! খবর নিতে এসেছে।

দিদিমা মামাকে চিনতেন। এবার একটু সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, দু' টাকা দিয়ে তুই ক'ার কাছে এবাড়ীর বায়না করেছিলি?

ওই নাও! সাপের খোলস এবার ছাড়ালো!—মামা হেঁকে উঠলেন, কারো ভালো করতে নেই! বায়নার টাকা না দিলে সস্তায় বাড়ী ভাড়া পেতে কোথায়?

দিদিমার কণ্ঠ মামা অপেক্ষা দুর্বল নয়। তিনি চীৎকার করলেন, টাকা তুই কা'র হাতে দিয়েছিস, তাই বল্? টাকার রসিদ কই, বা'র করে দে।

রসিদ! দেবো কাল সকালে! রসিদ দিলেই ত' তুমি বলবে জাল রসিদ! ওই মাগির কথা শুনে তুমি আমাকে চোর ব'লে ঠাওরাতে চাও কেমন?

দিদিমা চোখ পাকিয়ে বললেন, কাল তোর আপিঙের পয়সা ছিল না বলছিলি, আজ আপিঙ পেলি কোত্থেকে ?

জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড হয়ে চারিদিকে ছাড়ানো। রাত্রে ঘরে ওঠবার কোনো উপায় নেই। আহারাদির কোনো রকম আয়োজন করা সম্ভব নয়। সন্ধ্যা আসন্ন হয়ে এসেছে। পথে আর বিশেষ লোক চলাচল দেখা যাচ্ছে না। আমরা সবাই কুণ্ডলী পাকিয়ে এক জায়গায় ব'সে রইলুম। আকাশে মেঘ করেছে।

এটা বাড়ীর উঠোন বটে। কিন্তু পাঁচিল এবং সীমানা না থাকার জন্য সামনের মাঠ আর গলিপথের সঙ্গে এই উঠোন একাকার। আমরা পথে ব'সে আছি ভুল বললে হবে না। এমন সময় মামা গলা তুলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেলেন, চুপ। বলি, শুনতে পাচ্ছ কি ?

কি ?

জঙ্গলের ভেতরে ফিসফাস কানাকানি ? গাড়োয়ানগুলো মাল খালাস করতে করতে হাসছে কেন, বুঝলে কিছু ?

একটু আগে মামার প্রতি চৌর্যবৃত্তির বদনাম দেওয়া হচ্ছিল, কিন্তু এই নিদারুণ দুর্দিনে তিনি ছাড়া আর কে আমাদের ভরসা ? আমরা কান পেতে শুনলুম, জঙ্গলের মধ্যে কানাকানিই ত' বটে। গাড়োয়ানদের সঙ্গে যে ওই জঙ্গলের অলক্ষ্য সম্প্রদায়ের যোগসাজস আছে, এতে আর সন্দেহ কি ?

জন দুই গাড়োয়ান যমদূতের মতো গুটিগুটি কাছে এগিয়ে এলো। মুখে তাদের হাসি। হাসি দেখে সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে আমাদের গা ডোল হয়ে এলো। মামা তাদের সেই ভয়ানক স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে ফস ক'রে বললেন, আমি ওই জঙ্গলের দিকে পাহারা দিইগে, তোমরা এদের সামলাও।

মামা তাঁর ছাতার বাঁট নিয়ে ভগ্নস্তূপের দিকে এগিয়ে গেলেন। বাকি রইলুম আমরা। গাড়োয়ানরা বললে, ডর লাগা বুড়িমা ?

খবরদার ! দিদিমা হাঁক দিলেন, আর এক পা মৎ আগাও। ওরে, আঁসবঁটিখানা নিয়ে আয় ত' ?

গাড়োয়ানরা হাসছিল। বললে, রাগ করিয়েছে বুড়িমা। আচ্ছা, আচ্ছা, হাম লোককো ভাড়া দেও, হামু চলু যায়গা।

কত ভাড়া তোদের ?

চার গাড়ী কো ছয় রুপিয়া।

দিদিমা প্রতিবাদ জানালেন। পাঁচসিকা ক'রে চারখানা গাড়ীর ভাড়া হোলো পাঁচ টাকা। ওরা এখন চাইছে ছয় টাকা। ওদের মতলব ভালো নয়। কিন্তু এই নিয়ে বচসা দেখা দিল। গাড়ী ভাড়া ছাড়াও ওরা চায় জলপানি আর মালখালাসীর মজুরি। পাঁচ টাকার উপর আরো অন্তত দুটো টাকা।

মস্ত সমস্যা দেখা দিল। এ বাড়ীতে কোনোমতেই থাকা সম্ভব নয়। আজ রাত্রি নিরাপদে কাটবে কিনা বলা কঠিন, কিন্তু আসছে কাল ভোরে এ বাড়ী ছেড়ে যেতে

হবে। আমরা সবাই ব'সে আছি খোলা আকাশের তলায়, সকলের হাত-পা ভয়ে জড়ো-সড়ো। আসছে কাল কোথায় যাওয়া হবে কেউ জানে না। কাঁসারীপাড়ার রায়েরা কাল সকালে এসে দিদিমার বাড়ী দখল করবে, স্তুতরাং সেখানে আর ঠাঁই হবে না।

ময়লা হারিকেনটা জ্বালা হোলো। কিন্তু আলোটা যেন চারিদিকের আতঙ্কটাকে আরো বেশী বাড়িয়ে তুললো। আমরা বরং অন্ধকারেই ছিলুম ভালো। চারখানা গরুর গাড়ী বোঝাই মালপত্র—কোন্‌টা কোনোদিকে প'ড়ে রয়েছে এখন আর ঠাহর করা যাচ্ছে না।

হারিকেনের কালিপড়া আলোটায় গাড়োয়ানের দলটাকে দেখলে মনে দুর্ভাবনা আসে। যতশীঘ্র সম্ভব ওদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার। স্তুতরাং ওদের সঙ্গে আর বচসা না বাড়িয়ে দিদিমা তাঁর কোমরের ঘুনসীর থেকে বাক্সের চাবিটা খুলে কা'র হাতে যেন দিলেন। সাতটি টাকা নিয়ে ওরা এখনই দূর হয়ে যাক্‌।

আমরা যে ভয় পেয়েছি এবং এই হানাবাড়ীতে এসে যে ভুল করেছি, একথাটা গাড়োয়ানরাও বুঝতে পেরেছিল। ওরা টাকা নিয়ে যখন একটু দূরে স'রে গেল, মামা তখন ওধার দিয়ে ঘুরে সকলের চোখ এড়িয়ে ওদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। উদ্দেশ্যটা কি, আমাদের পক্ষে জানা শক্ত। কারো দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর হ'লে সে বুঝতে পারতো গাড়োয়ানরা মামার চেনা লোক,—ওরা থাকে পটিবাগানের লোহাপটিতে।

কিন্তু সে অতি অল্পক্ষণের জন্য। তারপরেই মামা আবার সেখান থেকে স'রে গেলেন। পাঁচ টাকার বদলে গাড়োয়ানরা সাত টাকা কেন আদায় ক'রে নিল মামার সঙ্গে তাদের কোনো গোপন চুক্তি ছিল কিনা,—এ নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামাতে চাইলো না। সারাদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর সকলেই তখন অবসাদে আর হতাশায় আচ্ছন্ন।

আকাশে মেঘের ডাক শোনা যাচ্ছে! মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ। অজানা অঞ্চল, মাঝে মাঝে শৃগালের ডাক, আশপাশে বনভূমি, ক্বচিৎ শকুনের ডানা ঝটাপটি, কখনো দূরের কুকুরের ডাক, হানাবাড়ীর ভিতর থেকে মধ্যে মাঝে অলৌকিক শব্দ সাড়া—সমস্তটা মিলিয়ে রাতটা যেন বড় দুর্যোগের মনে হচ্ছে। চারিদিকে রাশি-রাশি অনাবশ্যক জিনিস পত্রের জঞ্জাল, নিষ্প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অতিবাহুল্য—যেন সমস্তটা আমাদের মোহবন্ধন দশার একটা ছবি। বুঝতে পারা যায়, আমাদের দলের মধ্যে কেউ কেউ অন্ধকারে ব'সে কাঁদছে। হয়ত ভগ্নী, হয়ত মা, হয়ত বা মাসী। কেউ কাঁদছে আসন্ন গভীর রাত্রির ভয়ে। কেউ বা কাঁদছে আগামীকালের দুশ্চিন্তায়। এমন দুরবস্থার জন্য দায়ী হলেন মামা, কিন্তু এই দুর্যোগের রাত্রে তাঁর সঙ্গে কেউ বিবাদ করতে প্রস্তুত নয়। আরও এক বিপদের কথা, গাড়োয়ানরা অদূরে গিয়ে এক গাছতলায় গাড়ীগুলোকে রেখে গরু-মহিষগুলোকে বেঁধে ব'সে রয়েছে। জন্তুগুলোকে ঘাস আর জল সংগ্রহ ক'রে দিয়েছে।

ওদের মতলব কিছু একটা আছে নিশ্চয়, এই মনে ক'রে আমাদের মনে দুরু দুরু কাঁপন লাগছিল। দিদিমা শান্ত স্তব্ধভাবে এক পাশে ব'সেছিলেন। রাতটা নিরাপদে

কাটবে ব'লে মনে হচ্ছে না। যদি বা নিরাপদে কেটে যায়, কাল সকালে জিনিসপত্র নিয়ে কোন্ দিকে যে যাওয়া হবে তারও কোনো ঠিক নেই।

দেখতে দেখতে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে কালিঝুলি পড়া হারিকেনটা তেলের অভাবে নিবে গেল। মাথার উপরে শুধু রইলো মেঘময় অন্ধকার আকাশ, আর তা'র নীচে বনময় ঝিল্লিঝঙ্কারভরা হানাবাড়ীর অঙ্গন। এদিকে ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় অবসাদে সকলেই জিনিসপত্রগুলোর আশেপাশে ধুলোয় আর অনাদরে নেতিয়ে পড়েছে। কত রাত কেউ জানে না। চারিদিকে নিঃঝুম অন্ধকার। প্রাণিজগতের কোনা সাড়াশব্দ কোনো দিক থেকেই পাওয়া যাচ্ছে না। সেই অখণ্ড স্তব্ধতার মধ্যে নিজের গলার আওয়াজ শুনলেও নিজেদের ভয় করে। অনেকেই হয়ত জেগে আছে, কিন্তু তা'রা নিশ্চল পাথর। ভয়ে ভয়ে চোখ বুজে রয়েছে সবাই।

থেলো হুঁকোয় মামার তামাক টানার শব্দটাও শেষ হয়ে এলো। ওদিকে গাড়োয়ানরা ভূতের মতো সেই গাছতলায় পড়ে রয়েছে। সমস্ত রাতই তারা থাকবে এখানে, কিন্তু কেন যে থাকবে—একথা শুনতে ভাবতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হচ্ছে।

হঠাৎ চাপাগলায় মামা পুনরায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন, শুনতে পাচ্ছ? কানের মাথা খেয়েছ নাকি?

সাড়া দেবার সাহস কা'রো হোলো না। সেজমাসিমা কেবল চুপিসাড়ে প্রশ্ন করলেন, কি?

ফেউ ডাকছে, শুনতে পাচ্ছ না? ওদিকে এসে পড়লো যে!

সমস্ত শরীর হিম হয়ে এলো। শিরাউপশিরায় রক্ত চলাচল বন্ধ। চোখ বুজে কেবল কম্পিত-কান্নার আওয়াজ শোনা গেল,-বিপদতারণ মধুসূদন! দুর্গা মে রক্ষা করো!

মামা যেন আরো চাপা গলায় বললেন, উঁঃ, আঁসটে গন্ধ। তোমরা যেন সাড়া দিয়ো না। বাঘমারীর বাঘ! গা শুঁকে আবার চ'লে যাবে।—রঘু ডাকাতের দল আসবে শেষরাত্রে! ওই শোনো, জঙ্গলে ছাগলের লটাপটি, বোধ হয় কামড় বসিয়েছে! এবার লাফ দিয়ে এসে পড়বে এদিকে—মানুষের গন্ধ ওরা অনেক দূর থেকে টের পায়।

অন্ধকারে আঁসবটিখানা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বড়দাদার হাতে ছিল লাঠি,—কিন্তু সে নিদ্রিত কি জাগ্রত বলা কঠিন। কেউ ঢুকেছে মালপত্রের নীচে, কেউ মুণ্ডটা লুকিয়ে রয়েছে বিছানার পুঁটুলী পাকিয়ে মড়ার মতো পড়ে রয়েছে, কেউ বা নিজের উপরে বাক্স-প্যাঁটরা চাপা দিয়েছে!

আবার নিঃঝুম নীরবতা। কতক্ষণ বলা কঠিন,—ভয়ার্ত ত্রস্ত কয়েকটি অবসাদগ্রস্ত নরনারী মৃত্যুর মতো নিশ্চল ও হিমাঙ্গ। মামা ফিসফিস ক'রে এক সময়ে ব'লে দিলেন' যাই ঘটুক না কেন, সাড়া দিয়ো না—দিলেই মৃত্যু। তবে হ্যাঁ, যদি রঘুর দল আসে—তবে সকলের আগে আমি!

মামার নির্দেশ বর্ণে বর্ণে পালন করার জন্য আমরা সবাই নিঃসাড় হয়ে রইলুম। কারো বা এর মধ্যে নাকও ডেকে উঠলো। অনেকে গাঢ় ঘুমে এলিয়ে পড়ছিল।

বোধ হয় ঘণ্টাখানেক পেরিয়ে গেল। এমন সময় হঠাৎ কড়াং ক'রে একটা আওয়াজ। আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে শব্দটা ভালো ক'রে কানে না যেতেই আবার ঠিক ওই রকম আর একটা শব্দ। ঠিক যেন বাক্স-প্যাঁটরার কলকব্জা ভাঙ্গার হঠাৎ আওয়াজ। কিন্তু কেউ কিছু মাত্র সাড়া দিল না। এমন কি দিদিমার মতো চিরনির্ভীক বৃদ্ধাও তাঁর সাহস হারিয়ে এতক্ষণ পাথরের মতো পড়েছিলেন। কিন্তু এবার তিনিও চাপাস্বরে সাড়া দিলেন, কে?

অন্ধকার নিরুত্তর!

কোনো একটা দেহ—সম্ভবত সে-দেহ সেজমাসিমার—সরীসৃপের মতো দিদিমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এগিয়ে গেল। তারপর ইষ্টমন্ত্রের মতো ফিসফিস ক'রে বললে, দাঁত দিয়ে মাথার খুলি ভাঙলো! হাড় চিবোচ্ছে, শুনতে পাচ্ছ?

দিদিমা আবার স্তব্ধ হয়ে গেলেন। চোখ মেলে তাকাবার সাহস কা'রো ছিল না। কিন্তু কান খাড়া থাকলে শোনা যেতো আশেপাশে একটু আধটু পায়ের শব্দ; ছায়া-মূর্তির মতো একটু আধটু নড়াচড়া,—কাছাকাছি মানুষের সমাগম হ'লে গায়ের বাতাস যেমন ভারী হয়ে ওঠে। আমাদের সকলের ভয়ব্যাকুল স্তব্ধতার চারিপাশে অতি সন্তর্পণে যেন কিছু একটা ঘ'টে যাচ্ছিল। কিন্তু সোজা হয়ে উঠে ব'সে হাঁক-ডাক করবার মতো প্রাণশক্তি কা'রো ছিল না।

মাঝখানে অল্পক্ষণের জন্যে হাল্কা এক পশলা বৃষ্টি আমাদের মাথার উপরে হয়ে গেল, সমস্ত মালপত্রকে ভিজিয়ে গেল। কিন্তু তবু আমরা সাড়া দিইনি, কেন না শেষরাত্রে রঘু ডাকাতের দলবল এসে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। বৃষ্টির পরে আমরা সবাই ভোরের প্রতীক্ষা ক'রে রইলুম।

দারিদ্র্যের থেকে জন্ম কুসংস্কার আর নীতিবিনষ্টির; ভয়ের জন্ম অপৌরুষ এবং অশিক্ষার থেকে। চল্লিশ বছর আগে একথাটা বুঝতে পারেনি কেউ। ফলে, একটি সমগ্র ভয়ার্ত রাত আমরা অন্ধকারে জন্তুর মতো লুকিয়েছিলুম।

এমন সময় ভোর হোলো। কাক-কোকিল ডেকে উঠলো। ঊষার কণকচ্ছটার স্পর্শে আমরা প্রাণলাভ ক'রে চোখ মেলে তাকালুম। ভয় আর দুর্যোগের রাত অতি দীর্ঘ মনে হচ্ছিল।

ওই মানিকতলাতেই বলদে-পাড়ায় বাড়ীভাড়া খুঁজে পাওয়া গেল। নতুন বাড়ীতে এসে পৌঁছতে হোলো গত রাত্রির ওই গাড়োয়ানদেরই সাহায্য। এবারেও তা'রা নিল সাত টাকা, এবারেও মামা গিয়ে তাদের আড়ালে ডেকে নিয়ে মিটমাট করলেন।

দ্বাদশীর উপবাস-ভঙ্গের দিন ছিল। কিন্তু জল-গ্রহণ করার আগেই দিদিমা মামার উদ্দেশে চীৎকার ক'রে উঠলেন, বাঘের ভয় দেখিয়ে কাল রাত্তিরে তুই বাক্স-প্যাঁটরা ভেঙ্গেছিলি? তোকে আমি পুলিসে দেবো!

মামা হাঁক দিলেন, বিপদ কাটিয়ে এবার বুঝি আমার ওপর ফণা তুলতে চাও?

মুখ সামলে তুই কথা বলিস—দিদিমা তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—তুই চিরকেলে চোর-ডাকাত, তোর কোনো ধর্ম নেই! তুই ঠগ, তুই জোচ্চোর,—রঘু

ডাকাতের ভয় দেখিয়ে তুই গাড়োয়ানদের কাছে দালালি খেয়েছিস! আমি তোকে জেলে দেবো!

মামা দর্পভরে বললেন, আমিও তবে এই চললুম। কামার বাড়ী থেকে আগে ছুরিখানা শানিয়ে নিয়ে আসি! ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখোনি?

দিদিমা হাঁকিলেন, শিগগির তুই সোনাদানা টাকাকড়ি ফেরৎ দে,—নৈলে এখনই থানায় যাবো!

মামা জবাব দিলেন, যাওগে তুমি থানায়,—আমিও এই চললুম হাইকোর্টে।

বলদে-পাড়ার বাড়ী থেকে মামা আর মামী পুরনো তোরঙ্গ আর ময়লা বিছানার পুঁটলি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। দিদিমা সর্বস্বান্ত হয়ে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন।

পরে জানা গেল, মামা কাঁসারীপাড়ার রায়েদের সঙ্গে ভাব ক'রে নিজের বাড়ীতেই উঠেছেন। তিনিও হাইকোর্টে যাননি, দিদিমাও থানা-পুলিশ আর করেন নি।

বাড়ী বদলের ব্যাপারে মামা কিঞ্চিৎ লাভবানই হয়েছিলেন।

বলদে পাড়ায় আমরা ছিলুম মাস তিনেক, কিন্তু সেখানে প্লেগের হিড়িক দেখা দেয়। সুতরাং সেখান থেকে পালিয়ে এখানে ওখানে কিছুকাল ঘুরে আবার আমরা এলুম মানিকতলার গা ঘেঁসে পুঁটিবাগানের দিকে। পুঁটিবাগানের প্রান্তে সরু গলিটা ছিল চালতাবাগানের গায়ে গায়ে। লোহাপটি পেরিয়ে যেতে হোতো পূর্বদিকে। দক্ষিণ অংশটার দুইদিকে কালোয়ারদের বস্তি। সেই বস্তির থেকে শোনা যেতো অবিরাম লোহাকাটার শব্দ। লোহার কড়ির উপরে চিমটে দিয়ে একজন ধরতো ছেনি, অপরজন হাতুড়ি পিটতো সেই ছেনির উপর। বহুক্ষণ ধ'রে এই কাজ চলতো। অবশেষে সেই লোহা কেটে দুখান হোতো।

ওই প্রবল আওয়াজের রূঢ়তাটা বায়ুতরঙ্গে ভেসে-ভেসে যখন এসে কানে বাজতো, তখন সেটা কোমল। সেই ধ্বনিতে থাকতো কেমন একটি সঙ্গীতের ঝণৎকার,—চৈত্রের দুপুরে সেই সুর যেন বৈরাগ্যে উদাসীন, বর্ষার জলে সেটা যেন কেঁদে উঠতো, আর শরতের সোনার রৌদ্রে ওর মধ্যেই পাওয়া যেতো আগমনী গান,—জগজ্জননীর শূন্য কোলে ফিরে আসার জন্য চিরকালের মা-হারানো মেয়ে যেন ওই ধ্বনির মধ্যে ফুঁপিয়ে উঠতো।

চালতা বাগানের ওই গলির ভিতর ঢুকে ঠিক মাঝামাঝি যে বাড়ীটির নীচের তলায় আমরা ভাড়া ছিলুম, সে-বাড়ীটি পুরনো আমলের। ছিল বাহির-বাড়ী আর ভিতর-বাড়ী—এবং দুইয়ের মাঝখানে গলিপথ। কঙ্কালের খুলির থেকে যেমন দাঁতের পাটি বেরোয় তেমনি এই প্রাচীন ইমারতের বালুখসা ভগ্নতার থেকে পাতলা ইঁটের স্তরগুলো

যেন আমাদের দিকে কুটিল কটাক্ষে চেয়ে থাকতো,—আমরা তা'র তলা দিয়ে ঝাপসা ছায়ান্ধকারে আনাগোনা করতুম। ঠিক-দুপুরে একা বেরতুম না আমরা ঘরের বাইরে, কেন না বিনা নোটিসে কোন্ সময় হঠাৎ দেওয়াল থেকে নোনাধরা বালুর চাপড়া পড়তো যেখানে সেখানে। একটা ভৌতিক এবং অশরীরি হাতের এই কারসাজি মনে ক'রে আমরা সবাই আঁৎকে উঠে পালাতুম দিক্‌বিদিকে। শ্যাওলা ধরা কলতলার বন্যগন্ধের পাশে আবছায়ায় ছিল চৌবাচ্ছাটা—ওর কানায় কানায় ভরা ছলছলে জলের মধ্যে আমরা দেখতে পেতুম প্রেতের কটাক্ষ,—আর ওর পাশ দিয়ে পেরিয়ে যাবার সময় কেরোসিনের কুপিটা যদি দমকা হাওয়ায় নিবে যেতো—তবে সেখানেই কোনো বোনের দাঁতি লেগে যেতো আতংকে। আর রান্না ঘরের দিকটাতেও সেই দশা। আকাশ থাকতো দোতলার অনেক উপরে,—নীচের দিকে আলোবায়ু রোধ-করা বুকচাপা অন্ধকার। দিনের বেলাতেও আলো জ্বালতে হোতো কোনো কোনো ঘরে। সেই ঘরে গলার আওয়াজ করলে যেন ভাঙ্গা হাঁড়ির ভিতর থেকে শব্দ উঠতো। দুরন্ত ছেলে সেদিকে একলা প'ড়ে গেলে তা'র গা আসতো ছমছমিয়ে।

উপরতলায় থাকতো বাড়ীওয়ালারা। তা'রা নাকি জেলেটোলার কোন বাড়ুয্যে বংশ—বনেদী ঘর। তাঁদের কর্তার চেহারাটা ছিল সুগৌরবর্ণ, শিশুপাঠ্য বইয়ের রাজা শিবাজীর মতো কাঁচাপাকা দাড়ি আর টানা-টানা চোখ; দশাসই চেহারা। ব্যবহার তাঁর অতি অমায়িক, এবং স্বভাবটি নির্বিকার। অপরাহ্নের দিকে তিনি এক সময়ে বেরিয়ে যেতেন, এবং ফিরতেন অনেক রাত্রে। নিশুতি পল্লী,—তখনও সেই পল্লীতে ইলেক্‌ট্রিকের আলোর রেওয়াজ হয়নি। গলির মুখে অনেক দূরে জ্বলতো গ্যাসের আলো,—অন্ধকারে সেই আলোটার কেমন যেন করুণ শুভ্রতা চোখে পড়তো। আর সেই বাড়ীর দরজায় হাত রেখে কর্তা ডাকতেন কোমলকণ্ঠে, বানু, মা আমার, দরজাটা খোলো ত' মা?

বানুর বয়স চার বছর, সে থাকতো উপরতলায়—অঘোরে ঘুমিয়ে। সম্ভবত আসতো তা'র মা আলো হাতে নিয়ে। তারপরে কতক্ষণ চুপ। তারপর সেই রাজা শিবাজী গুনগুনিয়ে একটি গান ধ'রে ভিতরকার আঁক-বাঁকা পথ ধরে উপরে উঠে যেতেন। হয়তো কোনো রাত্রে ছাঁৎ ক'রে ঘুম ভেঙ্গে যেতো তাঁর গান শুনে। সেদিন ওই স্যাঁত-সেঁতে মেঝের উপর দরিদ্র বিছানাটা আর যেন ভালো লাগতো না। সর্বশরীরে মশার মতো কামড়াতো একটা অস্বস্তি; মন ছুটে যেতো তাঁর গান ধ'রে বাড়ীর বাইরে—চাল্‌তা-বাগান পেরিয়ে রাজা রামমোহনের মস্ত বাগান বাড়ী ছাড়িয়ে—যেদিকে কোনদিন যাইনি সেইদিকে। সেইদিকে হয়ত কোথাও আছে অবারিত মুক্তি; দুর্বার দুরন্ত কোনো গতি,—শাসন-বাঁধন-কাঁদনের বাইরে যদি কোথাও কিছু থাকে একটা আস্বাদ, একটা আশ্বাস। এপাশ ওপাশ ফিরে কেবলই ঘুমোবার চেষ্টা করতুম, নিজের অবাধ্যতাকে শান্ত করবার জন্য নিজেকে ভোলাতুম।

বনেদীবংশের লোকেরা অনেক বেলা অবধি ঘুমোয়। কর্তা উঠতেন তখন বেলা দশটা। উপর-তলায় যেতে বাধা ছিল না। গিয়ে পড়তুম ওদের সকলের মাঝখানে।

ছেলেমেয়েদের অতি সুশ্রী রূপ দেখে কুণ্ঠা ও লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে থাকতুম এক পাশে। যে মেয়েটি বড়, সে আমাদের সমবয়সী—তা'র নাম সুলতা। কর্তার চোখে মুখে নির্মল প্রসন্নতা। চৌকীর উপরে ব'সে তিনি স্নান করেন, সুগন্ধ সাবান আর তেল, নধর একখানা মোটা তোয়ালে। এদিকে কোঁচানো মিহি ধুতি আর গেঞ্জি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ঘাঘ্‌রা পরা হাস্যমুখী সুলতা। লোকটার গায়ের রং থেকে যেন গোলাপের আভা ফুটে ওঠে।

হঠাৎ একদিন আমাদের মাঝখানে গল্পের আসরে ব'সে সুলতা বললে, তোরা এত কালো কেন, ভাই?

আমরা কালো? অবাক কাণ্ড! মামার বাড়ীর পাড়ায় সবাই যে বলে, আমরা নাকি ফুটফুটে? আর দেখোনি বুঝি আমাদের বড়দিদির ছেলেমেয়েকে? কী রং বড় জামাইবাবুর! আর সেই আমাদের টেঁপিকে দেখলে তোদের চোখ ঠিক্‌রে যাবে! দেখতে চাস আমাদের ভাগলপুরের পিসিমাকে? দেখেছিস শিশিরকাকাদের? আমাদের কালো ব'লে বুঝি তোরা ঘেন্না করিস?

অভিমানে বোনেরা একেবারে ফুলে-ফেঁপে উঠতো। সুলতা হাসিমুখে বলতো, আচ্ছা বেশ, তোরা না হয় ফর্সা! কিন্তু আমার মতন গানের খাতা আছে তোদের? পাতায় পাতায় কেমন সুন্দর জলছবি লাগিয়েছি! দেখবি?

অনুরোধের অপেক্ষা না রেখেই সুলতা ছুটে গিয়ে তা'র গানের খাতা নিয়ে আসে। কত গান লেখা সেই খাতায়। কোনো গানের সত্য অর্থ পাইনে, কোনোটার অর্থ বা ঝাপসা। কিন্তু সকলের মাঝখানে ব'সে হঠাৎ এক সময় মুখ তু'লে বলতুম, তুই বুঝি ফুলেল তেল মেখেছিস?

ফুলেল তেল!—সুলতা হেসে উঠতো, দূর, আমরা কলু না বেনে যে, তেল মাখবো?

বোনেরা আবার ফুঁসিয়ে উঠতো। বলতো, আমরা তেল মেখে নাইতে যাই, আমরা বুঝি কলু? তুই ভাই বড্ড ঝগড়া বাধাস! বাঁকা বাঁকা কথা তোর!

ওর কোথায় বাঁকা কথা রে? তোরাই ত' ঝগড়া বাধাস,—বলতে বলতে আমি নিতুম সুলতার পক্ষ।

এক বোন চেঁচিয়ে উঠতো, তুই ফের এসেছিস মেয়েদের মধ্যে কথা কইতে? ব'লে দেবো মা'কে?

গা ঢাকা দিয়ে তখনকার মতন স'রে যেতুম বটে, কিন্তু ওই ফুলেল তেলের মতন গন্ধটা যেতো আমার সঙ্গে সঙ্গে। ও গন্ধটা নতুন, ওটার মধ্যে দারিদ্র্যের স্যাঁতাপড়া বিকার নেই,—ওটায় যেন অভিজাত বনেদীর একটা আমেজ থাকতো; থাকতো যেন কেমন দুরাশার নিঃশ্বাস। কিন্তু সেই দুরাশা কি—অনেক সময়ে ভাবতুম নিজের মনে। হঠাৎ মনে প'ড়ে যেত গল্প। হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া,—রাজপুত্র যেন চলেছে কোন্ বনে মৃগয়ার অন্বেষণে, আর কোন্ সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারের দেশে রাজকন্যা থাকতো সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে। সোনার কাঠির ছোঁয়া না

পেলে কিছুতেই সে জাগবে না। এমনি ক'রে কল্পনাটি ছুটিয়ে নিয়ে যেতো যেন কোন্ দিকে ওর ওই গায়ের গন্ধ,—কোন হদিস পেতুম না তার। এই নীচের তলাকার আবছা অন্ধকারের থেকে ছোঁ দিয়ে নিয়ে যেতো আমাকে নিরুদ্দেশ পথের দিকে। মুক্তি পেতুম কণ্টকিত জীবনের থেকে।

মনে প'ড়ে যেতো সেই নন্টুকে। সেও কাছে এলে এমনি গন্ধ পেতুম। সে-মেয়েটা ছিল খাদ্যলোভী, স্বভাব নিষ্ঠুর—কিন্তু উদ্দাম! প্রবল অটুট স্বাস্থ্য তা'র—কিন্তু গায়ে ছিল তার বন্য মাংসের গন্ধ। নন্টু কাছে এলে আড়ষ্ট হতুম, সুলতা এসে দাঁড়ালে আনন্দ পেতুম। কিসের আনন্দ—কে জানে! সুলতার চোখ দুটো বিড়ালের মতো কটা—যেন দুই বিন্দু আকাশের আভা। ওর দুই চোখে দুর্লভ ঐশ্বর্যের সন্ধান পেতুম।

হঠাৎ নীচে এসে দাঁড়ালো সুলতা। হাতে তা'র একগোছা বই। ডাকলো, মাসিমা?

মা বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, কেন মা?

আপনার ছোট ছেলে নতুন ক্লাসে উঠেছে, তাই বাবা ওকে এই বই ক'খানা কিনে দিলেন!

দোলাই গায়ে জড়িয়ে আমি পাশে দাঁড়িয়ে। মা কতক্ষণ শান্ত অপলক চক্ষে সুলতার দিকে চেয়ে রইলেন। পরে বললেন, ওর হাতেই দাও, মা!

গঙ্গার ঘাট থেকে মা এনে দিলেন নানুর জন্য 'আহ্লাদী' পুতুল। দুটি পরিবার দেখতে দেখতে একাকার হয়ে গিয়েছিল। নীচের তলাকার ভাড়া হোলো নয় টাকা। কিন্তু মাস তিনেক পরে সুলতার মা বললেন, ছেলে যখন চাকরি করবে তখন বাড়ী-ভাড়ার টাকা দিয়ো—এখন থাক্।

মা বললেন, সে কি কথা? তোমার টাকার দরকার নেই?

মাসিমা বললেন, থাকলেই বা, চ'লে ত' যাচ্ছে? তোমাকে আজ বাদে কাল মেয়ের বে' দিতে হবে, মনে নেই?

মা চুপ ক'রে যান্। আমি তাকিয়ে দেখি, তাঁর চোখে যেন কান্না আসে। দরিদ্র ভাই বোন আমরা, কষ্টের সংসার, দুঃখের দিনযাত্রা। কিন্তু ওর মধ্যেই দেখি, নীচেকার রান্না-তরকারী উপরতলায় যায়, আর দ্বাদশী কি পূর্ণিমায় মিষ্টান্ন ইত্যাদি আসে উপর থেকে নীচে। চেয়ে দেখতুম একটা মস্ত বনেদী বংশের শাখা ক্ষয় হতে-হতে এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে নীচের তলায়। কিন্তু চরিত্রের আভিজাত্যের গুণে আত্মাভিমান কোথাও জায়গা পায়নি। সুতরাং আমাদের সঙ্গে ওরা মিলে গিয়েছিল অতি সহজে।

রাত সেদিন অনেক। শীতের সেই রাতে বৃষ্টি হচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকে। হু হু ক'রে বইছে উত্তরের বাতাস। আর সেই বাতাসের ধাক্কায় কোথায় একখানা করোগেটের টিন মাঝে মাঝে ঝনঝন ক'রে আওয়াজ করছিল। ওই আওয়াজে ছিল একটা ভয়—ওটা কেবলই যেন ঘুম ভাঙিয়ে দিচ্ছে। নিশুতি রাত্রের দুর্যোগের মধ্যে কে যেন

কঠিন হাতে ওই করোগেটের ঝাঁটি ধ'রে নাড়া দিচ্ছিল। পাড়াপল্লীতে কোথাও কোন সাড়া নেই।

এমন সময়ে বাইরের দরজায় ধাক্কা পড়লো। মেসোমশাই অতি মিষ্ট মিহি কণ্ঠে ডাকলেন, বানু, মা আমার, দরজাটা খোলো ত' মা?

বাতাস বইছে দুরন্ত বেগে। লেপ আর কাঁথার মধ্যে সবাই জড়োসড়ো। কেউ জেগে আছে এমন কোনো প্রমাণ ছিলনা। তবু উপর থেকে সাড়া এলো—যাই।

বানু ওঠে না কোনোদিন, তবু বানুকে ডাকতে ও'র ভালো লাগে। ওই নামটির মধ্যে আছে তাঁর হৃদয়ের সুর, বাৎসল্যের সঙ্গীত। দেখতে দেখতে এক সময় আলো হাতে নেমে এলেন মাসিমা।

বৃষ্টি হচ্ছে। তবু ওর মধ্যেই গুনগুনিয়ে গান ধরেছেন মেসোমশাই। কী মধু কণ্ঠে তাঁর, কী যেন কান্না ফুঁপিয়ে উঠছে তাঁর বুকের ভিতর থেকে! জলধারার সঙ্গে যেন চোখের জলেও বুক ভিজে যাচ্ছে সেই গানের।—"ওগো কাঙ্গাল, আমারে কাঙ্গাল করেছ, আরো কি তোমার চাই"—

এ মেসোমশাইকে আমাদের জানা নেই। দিনের বেলা তাঁকে কখনো কেউ গান গাইতে শোনেনি। তিনি গম্ভীর, তিনি প্রসন্ন, তিনি স্বল্পবাক্। উপরতলায় তাঁর অস্তিত্ব সারাদিনে টের পাওয়া যায় না! সারাদিন পড়াশুনো নিয়েই থাকেন। মোটা মোটা বই—যা সচরাচর চোখে পড়ে না। সংস্কৃত, ইংরেজি, বাঙ্গলা,—তাঁর সমস্ত বিছানাটার ওপর বই ছড়ানো থাকে। চশমা চোখে দিয়ে তিনি যেন ডুবে যান বিদ্যার সমুদ্রে। দিবানিদ্রার অভ্যাস তাঁর নেই। পান, তামাক, চুরুট,—কোনোটাই তিনি স্পর্শ করেন না। সুতরাং, যাঁর গলার আওয়াজ কোন সময়ে শোনা যায় না,—অথচ নিশুতি রাত্রে তাঁর গান শোনা যায় এ আমাদের কাছে বিস্ময়।

গানের মধ্যে যেন তাঁর মর্মচ্ছেদী বেদনা প্রকাশ পায়, যেটা দিনমানে নিস্তব্ধ। হৃৎপিণ্ডের থেকে রক্তাক্ত ব্যাকুলতা বেরিয়ে আসে যখন সমস্ত পৃথিবী ঘুমে অচেতন। বিগলিত মাধুর্যের কান্নায় কেঁদে ওঠেন তিনি—সে কান্না যখন কারো কানে পেঁছিবে না! তাই বড় লোভ ও'র মুখের চেহারাটা দেখবো ও'র গানের সময়।

বিছানাটা ছেড়ে পা টিপে টিপে এলুম জানালার ধারে। সামনের উঠোন দিয়ে ও'কে পেরিয়ে যেতে হবে। কেরোসিনের ডিবে হাতে নিয়ে সর্বাঙ্গে মুড়ি দিয়ে মাসিমা পা টিপে টিপে দরজা খুলতে গেলেন। আমাদের ঘরের দিকে একবারটি তাকিয়ে যেন মাসিমার চোখে মুখে আড়ষ্টতা আর সংকোচ দেখা গেল। অতি সন্তর্পণে গিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে খুট ক'রে দরজাটা তিনি খুললেন।

কয়েকটি মুহূর্ত। তারপরেই দেখি মাসিমার বাঁ হাতে আলো আর ডান হাতখানা মেসোমশাইয়ের হাত ধরা। মেসোমশাই তখনো গাইছেন—"ওগো কাঙ্গাল, আমারে—"

'আঃ থামো—হয়েছে! শুনবে যে ওরা! লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে বসেছ?'—মাসিমা চাপা গলায় ধমক দিলেন।

মেসোমশাইয়ের পা টলছিল। এলিয়ে পড়ছিলেন তিনি এপাশে ওপাশে। আলোটায় দেখলুম তাঁর দুই নিমীলিত টানা টানা চোখ। সেই চোখে নিবিড় স্নেহ উচ্ছলিত। বিগলিত দেহতত্ত্বের রসবিহ্বলতা যেন সেই সুন্দর মুখখানাকে অপরূপ ক'রে তুলেছে। চিরকালের ভিখারী ভোলানাথ যেন চলেছেন সর্বস্বান্তের আনন্দ নিয়ে। এ গান সত্য হয়ে উঠেছে ওঁর ওই চেহারায়। মুগ্ধ চক্ষে আমি চেয়ে রইলুম। দূরের থেকে কেবল মাসিমার চাপা কণ্ঠস্বর কানে আসতে লাগলো, শীতের ঠাণ্ডা পেয়ে বুঝি আজ বেশী মাত্রায় চড়ানো হয়েছে? মরণ আর কি!

সঙ্গীতের সুরে তার জবাব পাওয়া গেল—"আরো কি তোমার চাই!"

মেজবোনের বিয়ে হয়ে গেল ওই নীচের তলাটায়। নদীয়া জেলার এক বন্য গ্রাম থেকে এসেছে পাত্র। চেহারাটা গ্রামের সঙ্গে মেলানো, তার ওপর আছে কলকাতার বউবাজারের ছাপ। তেল না মাখলে টেরি কাটা যায় না। সাগর-ছেঁচা মাণিক এলো ঘরে।

আসরের পাশে এসে দাঁড়ালো সুলতা। সেই সুলতা এ নয়। পরণে তা'র শাড়ী, গায়ে জামা। বেণী দোলানো সুলতা নয়; এলোখোঁপা পিছন দিকে। গতকাল পর্যন্ত যার দুরন্তপণা দেখেছি, আজ তা'কে দেখে সম্ভ্রম বোধ জাগে। বালিকারা চক্ষের পলকে বড় হয়ে যায়—আর হাফপ্যাণ্ট পরা সমবয়স্ক বালক নির্বোধ চক্ষু মেলে তাদের দিকে চেয়ে থাকে। সুলতার কাছে যেন ছোট হয়ে গেলুম। প্রসন্ন হাস্যে মহীয়সীর চেহারা নিয়ে সে দাঁড়ালো আমার সামনে।

চোখে তার চঞ্চলতা নেই,—চলনটা শান্ত। বিয়ের ব্যাপারটা চুকে গেল দুদিনে, কিন্তু বদলে দিয়ে গেল সুলতাকে। সহাস্য শাসন ছিল সুলতার দুই চক্ষে, এখন এলো শান্ত স্নেহ। আগে সে আগেভাগে এসে নাবালকদের আসরে জায়গা জুড়ে বসতো, এখন সে জায়গা নিয়েছে বড়দের মহলে। স্নানের সময় সবাই মিলে আমরা জল ছোড়াছুড়ি করতুম, এখন সুলতা স্নান করতে যায় মেয়েদের দলে। মনের ভুলে যদি বা কখনো হঠাৎ ছিটকে আসে সামনে—কিছুক্ষণের পর হঠাৎ উঠে আবার চ'লে যায়। দূরে যাচ্ছে সে দিনে দিনে! কিন্তু কেন সে দূরে যাচ্ছে, কেনই বা দিনে দিনে এত ব্যবধান বেড়ে উঠেছে, একথা কোন দিন জানতে পারতুম না। আমার সংশয়াচ্ছন্ন মন একাগ্রভাবে উৎকর্ণ হয়ে থাকতো। মন কেঁদে উঠতো জিজ্ঞাসায়।

কালোয়ারি বস্তির আনাচে-কানাচে আছে কি আমার প্রশ্নের উত্তর? লোহার ছেনির সাহায্যে লোহার হাতুড়ি মেরে লোহার কড়ি কাটা হচ্ছে—যে আঘাতে শোনা যাচ্ছে কঠিন যন্ত্রণার আর্তস্বর,—ওই সঙ্গীতের মধ্যে পাওয়া যাবে কি প্রশ্নের জবাব? কাঁসারিরা যায় ভরা দুপুরে ঠন্‌ঠন্ ক'রে কাঁসি বাজিয়ে,—সেই বাদ্যের শেষ ধুয়াটায় পাওয়া যায করুণ একটা কাতরতা। মধ্যাহ্ন কাকের ক্লান্ত কণ্ঠে; চুড়িওয়ালীর কাঁচের চুড়ির ঝনৎকারে, দূরের রেলের বাঁশীতে, সন্ধ্যারতির মঙ্গল ঘণ্টায়—ওদের মধ্যে পাওয়া যাবে কি আমার ক্ষুধার্ত প্রশ্নের সদুত্তর?

সদ্য বিবাহিত মেজবোন গেছে শ্বশুরবাড়ি, আর ছোটবোন থাকতো ঘরকন্নার কাজ

নিয়ে। সুলতার ছোট ভাইটি চাটুয্যেদের গলিতে সারাদিন গুলিখেলা নিয়ে থাকে আমার গতিবিধি ছিল আনাচে-কানাচে।

সুলতা বলে, আমাকে মাথার কাঁটা এনে দিবি—? ওই যে ডাক্তারবাড়ীর গায়ে মনোহারির দোকান, ওখানেই পাবি। কাঁটা এনে দিলে তোকে দইয়ের পয়সা দেবো।

লোভটা সামান্য নয়। বললুম, তুই ত' দোকান চিনিস, আন না কেন ?

আমার যে বাড়ী থেকে বেরোনো বন্ধ হয়ে গেছে রে !

কেন ?

কী বোকা তুই !—এই বলে সুলতা তিনটি পয়সা আমার হাতে দেয়। ওর মধ্যেই এক পয়সা দই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পছন্দসই চুলের কাঁটা হাতে পেয়ে সে খুশী হয়ে বলে, জল-ছবিগুলো নিবি ?

কই, দে ?

সুলতা তার কাগজের বাক্সের থেকে একে একে সমস্ত জলছবিগুলো আমাকে বের ক'রে দেয়। এই মহামূল্য রত্নরাজি নিয়ে কতবার যে সাংঘাতিক মনোমালিন্য হয়ে গেছে তার ঠিক নেই। কিন্তু আজ তার এই অকৃপণ দাক্ষিণ্য দেখে আমি যেন হতবুদ্ধি। এই দান মনে আনে দুর্ভাবনা, কিছু বা বেদনাবোধ। চেয়ে দেখছি, মন তার নির্বিকার, —সব যেন সে দিয়ে দিচ্ছে। এমন দুর্লভ কিছু তার পাওয়া হয়েছে, যার জন্য আজ সম্পূর্ণ রিক্ত হবার তার ভয় নেই। যে জলছবি পাবার জন্য আমার উগ্র বাসনার অন্ত ছিল না, অপ্রত্যাশিত সেই বস্তু হাতে পেয়ে যেন নেবার উৎসাহও আর রইলো না। তবু নিলাম। কিন্তু নেবার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমগ্র সত্তা যেন অস্বস্তিতে রি রি করতে লাগলো। কান্না এলো চোখে।

সুলতা হঠাৎ ভুলে গেল পুতুল খেলা। পড়ে রইলো তার 'নেত্য' আর 'কালাচাঁদ', পড়ে রইলো পুঁথির মালা আর বর-কনে—সমস্ত ফেলে সে চ'লে গেল। তিন চারজন মিলে পাথরের ঘুঁটি খেলার যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা,—সেদিকেও সুলতার আকর্ষণ গেল ক'মে,—সবচেয়ে আশ্চর্য এই। এই খেলায় সে এমন ক্ষিপ্রহস্ত ছিল যে, তার জুড়ি মিলতো না। ক্যারম্ বোর্ডে সে আমার সঙ্গে বসতো, কিন্তু সেই শূন্য বোর্ডটা আজ যেন মরুভূমির মতো মনে হলো—তার যেন এপার ওপার নেই।

দিদির বাড়ীতে গিয়েছিলুম ম্যালেরিয়ার দেশে। সপ্তাহ খানেক বাদে যখন ফিরে এলুম, শুনলুম—সামনের বুধবার সুলতার বিয়ে। সন্ধ্যালগ্নে কাজ।

ময়ূরের পেখম মেলে নেচে উঠলুম আমরা আনন্দে। শুধু আমরা নই। প্রতিবেশী মহলে সুলতা ছিল সকলের অতি প্রিয়, তারাও উল্লসিত। এত অল্প বয়সে বিয়ে শুনে সবাই আশ্চর্য। কিন্তু মেয়ের বাড় নাকি কলাগাছের মত—বিয়ে না দিলেই নয়। কাপড় প'রে এসে দাঁড়ালে সুলতা নাকি মস্ত ডাগর মেয়ে। পাত্রপক্ষ গিনি দিয়ে মেয়েকে আশীর্বাদ ক'রে গেল সোমবারে! কপালে চন্দন-চিত্রাঙ্কন নিয়ে সুলতা

সকলের মাঝখানে সলজ্জ হাস্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। পাকা দেখার বল্যাণে আমার ভাগ্যে জুটে গেল একখুরি দই!

দৈবক্রমে নীচের তলায় আমরা পড়ে গিয়েছিলুম। সেই নীচেটায় নিম্নস্তরের গভীরতা, সেখানে অন্ধকারে আলো জ্বালবার কেউ ছিল না, সেখানে দরিদ্রের গুহা, বিদুরের খুদ। সেই অনেক নীচের থেকে তাকাতুম উপরদিকে—সেখানে আলোকের উৎসব এক ফালি আকাশের যেখানে আশ্বাস, যেখানে দৈন্যের থেকে অসীম মুক্তি। যদি উঠতে পারতুম সেই গভীর অন্ধকারের থেকে উপরের দিকে তবেই সুলতার ধরা-ছোঁয়া পেতুম। কেননা অর্থহীন দুরাশায় মনটা কাঙ্গাল হয়ে উঁচুর দিকে হাত বাড়াতো।

শোনা গেল, বিয়ে ত' এবাড়ীতে নয়—জেলেটোলায় ওদের আদি বাড়ীতে। সেখানে বনেদী ব্যবস্থা, মস্ত পুজোর দালান আর নাটমণ্ড। অনেক লোকের ভীড় হবে সেখানে; অনেক আত্মীয় কুটুম্ব মিলে সেখানে শুভ বিবাহের উৎসব। অতএব সবাই মিলে চলে যাবে জেলেটোলার বাড়িতে। সেখানেই যা কিছু।

মাঘের শীত তখনো বেশ। কয়েকদিন আগে হয়ে গেছে সরস্বতী পুজো। হঠাৎ মনে পড়ে যায় সরস্বতীর সঙ্গে সুলতার কোথায় যেন মিল আছে। ওর হাতে যদি থাকতো বীণা, আর পায়ের কাছে থাকতো রাজহাঁস—আর যদি থাকতো ওর খোলা এলো চুল—তবে ওকে ফুলের গয়না পরিয়ে মঙ্গল ঘণ্টা বাঁ হাতে নিয়ে আর ডান হাতে পঞ্চপ্রদীপ ধরে আরতি করা চলতো।

অতিশয় আনন্দে মাতামাতির ফলে আমার জ্বর এলো ঠিক গায়ে-হলুদের দিনে। ম্যালেরিয়া জ্বর এলো কাঁপতে কাঁপতে; কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুতে হলো অন্ধকার নীচের তলাকার মাঝের ঘরের এক কোণে! জ্বরে আমি বেহুঁশ। জ্বর তার নিজেরই নিয়মে ছাড়বে, সুতরাং চিকিৎসাদির কথা আপাতত ওঠে না। গায়ে-হলুদটা হয়ে গেছে বেলায়, কিন্তু হলুদে রংটা রেখে গেছে আমার দুই চোখে। ঘোলাটে চোখ দুটো মাঝে মাঝে খুলে আবিল অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছি, হলুদে ছায়া। সরস্বতী পুজোর দিনে ওর রংটায় কাপড় ছুঁপিয়ে পরেছিল মেয়েরা—ওটা নাকি বাসন্তী রং। সুতরাং জ্বরে অচেতন থেকেও অর্থহীন দুই চোখ মেলে যেদিকে তাকাই, সেদিকেই দেখি বাসন্তী রংয়ের বন্যায় ছেয়ে গেছে সব।

পরদিন অপরাহ্ণে বিয়ে বাড়ীর উদ্দেশে বাড়ীসুদ্ধ সবাই চ'লে গেল। কেবল রইলো পাশের ঘরে ছোড়দাদা—কেননা তার পাসের পড়া। আমি পড়ে রইলুম ছেঁড়া তোশক আর কাঁথা জড়িয়ে! জ্বরে অচেতন। কিন্তু ঠিক মনে নেই, সকাল থেকে বিকারের ঘোর ছিল না। সেই বিকারের মধ্যে হয়ত যাবার আগে সকালের দিকে কোন্ এক সময় মাথার কাছে এসে সুলতা হেঁট হয়েছিল। পিছনে পিছনে রাজহাঁসটা এসেছিল, বীণার বিলাপ বেজেছিল আমার কানে। বাসন্তী রংয়ের দুই দৃষ্টি মেলে হয়ত দেখে ছিলুম সুলতার সর্বাঙ্গে ফুলের গয়না, মাথায় মরকত মুকুট, চক্ষে বরাভয়, অঙ্গে অঙ্গে ভূষণের শোভা। সে হয়ত বলে থাকবে, বিয়ে বাড়ীতে তুই যেতে পারলিনে, তোর জন্যে ঠিক আমি দই পাঠিয়ে দেবো, দেখে নিস।

নীচের তলাটায় অন্ধকার হয়ে এসেছে ভর সন্ধ্যায়। ছোড়দাদা আলো জ্বালালো পাশের ঘরে। মাঝখানে একবার উঁকি দিয়ে দেখে গেল, আমি নিঃশব্দে পড়ে আছি।

হঠাৎ উঠে বসলুম এক সময়ে। লগ্ন বোধ হয় আসন্ন। হয়ত সানাই বেজে উঠেছে, বর আসছে চতুর্দোলায়—ইংরেজী বাজনা বাজছে তার আগে আগে! দোলাই-খানা মুড়ি দিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে পড়লুম বাড়ীর থেকে। পা দুটো যেন আজ ঠিক নেই। এলোমেলো পা—যেন মেসোমশাই। ওই গানটা আজ আমারও মুখে আসছে গুনগুনিয়ে—'ওগো কাঙ্গাল, আমারে কাঙ্গাল করেছ, আরো কি তোমার চাই?'

জেলেটোলার বাড়ী আমি চিনতুম। ইস্কুল যাবার পথে ওই পথটা থাকতো বাঁ হাতি—যেদিক দিয়ে মা যেতেন নিমতলার ঘাটে। আমি যেতুম সঙ্গে। কেউ না দেখতে পায়—এমনি করে দোলাই মুড়ি দিয়ে খালি পায়ে এসে ঢুকলুম বাড়ীতে। সামনেই মস্ত উঠোন, আর দুর্গাদালানে কারবাইডের আলোয় বসেছে বিয়ের আসর। ঘন সবুজ বেনারসী পরা সুলতা—বড় বড় সোনালী ফুল সেই বেনারসীতে। পিঁড়ির উপর সে বসেছে অল্প ঘোমটা টেনে। সামনের পিঁড়িতে বসেছে বর। বহু মেয়ে পুরুষ বালক বালিকায় আসর ভরে উঠেছে।

দোলাই ঢাকা ছিল সর্বাঙ্গে, পাছে বাড়ীর লোক দেখতে পায়। শুধু চোখ দুটো ছিল খোলা—সেই চোখ জ্বরে কাঁপছে। উৎসাহ ছিল না-দেখা পর্যন্ত। দেখার পর কী ক্লান্ত অবসাদ। কিন্তু কী দেখতে এসেছিলুম, মনে আছে কী? মনে আছে কি, জন্মজন্মান্তরের কোনো ধারাবাহিকতা? আমার চোখ বন্ধ হয়ে এসেছিল আবিল নিদ্রায়। ঘামের ফোঁটা নেমেছে কপাল বেয়ে, দুই চোখ বেয়ে নেমে এসেছে লোনা জলের ফোঁটা ঠোঁটের দুই কোণে!

চাকর-বাকর দলের আড়ালে একপাশে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেখলুম শুধু নিজেকে! কিন্তু আর নয়। এ দৈন্য নিয়ে এখানে আর দাঁড়ানো চলে না। কেউ যেন না জানে, লুকিয়ে এখানে এসেছিলুম কাঁদতে। না জানে কেউ, ম্যালেরিয়া জ্বরে খাদ্যের দিকে আমার টান ছিল! আমার খাবার লোভ—সবাই জানে।

জ্বর ছেড়েছিল প্রায় সপ্তাহ খানেক পরে। বিয়ে হয়ে যাবার পরেও বিয়ের আলোচনা চলে অনেক কাল পর্যন্ত। কিন্তু ওর মধ্যেই এক সময়ে শুনতে পেয়েছিলুম, বিয়ের পরদিন শ্বশুর বাড়ী যাবার আগে সুলতা সত্য সত্যই আমার জন্য খানিকটা দই পাঠিয়ে দিয়েছিল। ঋণ পরিশোধ সে ক'রে গেছে বৈ কি।

দইয়ের আর এক নাম হোলো অমৃত! ওর স্বাদ নাকি মৃত্যুহীন।

বছর খানেকের ওপর কেটেছিল পুঁটিবাগানে। কিন্তু খরচ কুলিয়ে উঠছে না। ঘরভাড়া আরো কমাতে না পারলে ঘর চলছে না। অতএব আমরা একদিন ট্রামরাস্তা ছাড়িয়ে বাহির শিমলা পেরিয়ে এসে উঠলুম এক বোষ্টমের একতলা একখানা বাড়ীতে। বাড়ীর কর্তার নাম হোলো নিবারণ বোরেগী।

ছোট্ট একতলা। পূর্ব-পশ্চিম দুটি অংশ। মাঝখানে পরিষ্কার সিমেণ্টের ঝরঝরে উঠোন। বাড়ীটির থেকে ট্রামরাস্তা অনেকটা দূরে। ডানহাতি পোস্টঅপিসের বাড়ী ছাড়িয়ে বাঁ হাতি গলি। সেই গলি এসেছে এঁকে-বেঁকে পশ্চিমে। পথেই পড়তো খেলার মাঠ, আর সেই মাঠের কোণে ছিল আমাদের বাঙ্গলা-মাস্টার হেমবাবুর বাড়ী। নিবারণ বোরেগীর বাড়ীটির দক্ষিণেও ছিল খোলা অনেকটা জায়গা, আর তারই দক্ষিণ প্রান্তের পথের ধারেই ছিল জীবন দাসেদের মস্ত বাড়ী।

জীবন দাস! তা হ'লে বলি। ওই যে বিস্তৃত খোলা জায়গাটা,—ওটা হোলো পুকুর ভরাট করা মাঠ। ওই মাঠে আশেপাশের বাড়ীর সমস্ত ঝাঁটানো জঞ্জাল জমা হোতো। ওখানে সমবয়স্ক সঙ্গী জুটে গেল কয়েকজন, এবং আমাদের কিশোবদলেব খেলাধুলোর জায়গা হোলো ওই নোংরা মাঠে ওই জঞ্জালের স্তূপের আশে পাশে,— এবং সেজন্য আমরা ছিলুম অস্পৃশ্য। এমনই অস্পৃশ্য যে, রাস্তা পেরিয়ে সামনে ওই বড় বাড়ীর পাথর বাঁধানো রোয়াকে কখনো যদি বসতে যেতুম,—কোথা থেকে যমদূতের মতন তেড়ে আসতো জীবন দাস!

—হারামজাদা, পাজি,—দূর হ আমার রক থেকে!

ভয়ে ভয়ে উঠে আসতুম। জীবন দাসের রাগের কারণ ছিল। তার একটিমাত্র ছেলে নীলু নাকি আমারই জন্য নষ্ট হ'তে বসেছে। নীলুরা বড়লোক, তাদের ওই পাথুরে বড় বাড়ীর নীচের তলায় রাসপূর্ণিমায় পুতুলের মেলা বসে, কীর্তন কথকতা হয় তাদের ঠাকুরদালানে, সময় অসময়ে জুড়িগাড়ী এসে তাদের দরজায় দাঁড়ায়; মোটা মোটা ঝলমলে মেয়েছেলে তাগা-তাবিজ প'রে গাড়ী থেকে নামে। ওরা নাকি তাঁতি। ওদের বাড়ীতে সেদিন বিয়ে উপলক্ষ্যে চার রকম মিষ্টি নাকি পরিবেশন করা হয়েছিল। আমি দাঁড়িয়েছিলুম ওদের দরজায় বিয়ের দিনে বিকালবেলায় বর আসবার আগে। নীলু পরেছিল জরির বুটিদার রেশমী পাঞ্জাবী, হাতে রেশমী রুমাল, মুখে সুগন্ধী পান,—পায়ে নতুন কালো পাম-সু। এ নীলু সে নয়। আজ সকাল পর্যন্ত আমার জীবনে যে এত অন্তরঙ্গ এত মধুর ছিল, সর্বপ্রকার দুরন্তপনায় যার অবাধ সহচর্য পেতাম,—আজ সন্ধ্যার এই নীলু সে নয়,—আজ রাজবেশে দাঁড়িয়ে পথের বাঙ্গালকে সে যেন চিনতে পারে না!

কখন্‌ যে পিছন থেকে এসে পড়েছিলেন জীবন দাস বুঝতে পারিনি। হঠাৎ কঠিন আঙুলে আমার একটা কান ধ'রে তিনি দাঁত কিটিয়ে বললেন, ফের ?

আমি হকচকিয়ে গেলুম। তিনি কান ধ'রে কিছুদূরে টেনে নিয়ে গিয়ে আমাকে বললেন, মানা করেছি না ? ভাগ্‌... !

কান ধ'রেই তিনি আমাকে জঞ্জালের বালতির দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, শুয়োর, হ্যাংলার মতন দাঁড়িয়েছিস দরজায় গিয়ে,—এঁটো কাঁটা যা পাবি চাট্‌বি—কেমন ?

আমি ভাবছিলুম আমার একপাশের একটি কান তখনও তাঁর হাতের মধ্যে আছে কিনা। তাঁরও সময় ছিল কম। বর আসার উলুধ্বনি শোনা যেতেই তিনি তাড়াতাড়ি চ'লে যাবার জন্য পা বাড়ালেন। একবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, ফের যদি কথা কইবি নীলুর সঙ্গে, তবে কুকুর লেলিয়ে দেবো।

নোংরা মাঠের প্রান্তে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। বর এসে পৌঁছলো জীবন দাসের দেউড়ীতে। দেউড়ীর দুপাশে দুটো গ্যাসের আলো দেওয়া হয়েছে। দূরের থেকে সেই আলোর আভা পড়েছিল আমার দুই চোখে। সেই চোখে ছিল কিছু সজলতা, কিছু বা বন্যতা।

একজন ধনী ব্যক্তির বিষদৃষ্টি আমাকে সমস্তদিন ধ'রে সহ্য করতে হোতো। অনেক সময় কারণ থাকতো না, অনেক সময় কৈফিয়তও খুঁজে পেতুম না। হয়ত নিজের ছেলের সঙ্গে দরিদ্র বালকের অসমান বন্ধুত্ব তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না, হয়ত বা তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত করতো।

কিন্তু নেংটি ইঁদুর সকলের অলক্ষ্যে ঢুকে পড়তো দেউড়ীর কোন্‌ ফাঁকে! বাড়ীখানা ছিল মস্ত, মহলের পর মহল, ঘরের পর ঘর। অন্দর মহল কোন্‌ দিকে আমার জানার দরকার ছিল না। কিন্তু বাইরের মহলের নীচের তলার অন্ধকার ঘরগুলিতে থাকতো ঝুলপড়া রাসের পুতুল,—নানা ঠাকুর দেবতা। তাদের গায়ে জরির সাজসজ্জা, নারকেলের আঁশ দিয়ে তৈরী ঘন কালো চুল, আড়ং-ধোয়া কাপড়-চোপড়। নীলু আমাকে বোঝাতো সব, বর্ণনা করতো কত কিছু। সেই সব ঘরে কত বিচিত্র বস্তু-সম্ভার, কত আশ্চর্য রূপকথার উপকরণ। লোভের মোহের আনন্দের অসংখ্য সামগ্রী—ওরা যেন আমার রসকল্পনার এক একটি প্রতীক্‌। সমস্ত নীচের মহল এবং কক্ষের পর কক্ষ ঘুরে বেড়িয়ে এক সময় গা ঢাকা দিয়ে চ'লে আসতুম। কিন্তু রাত্রে বিনিদ্র চোখের সম্মুখে দেখতুম সেই সব ছবি। দেখতুম বৃন্দাবনের সেই অশ্বত্থ ছায়াতলের সেই কালীয়-দমনের ঘাটের সোপানশ্রেণী, দেখতুম কংসরাজার দেশ, দেখতুম কলঙ্কিনী রাধার লাঞ্ছনা কিন্তু জীবন দাস। দাসবংশের সর্বশেষ উত্তরাধিকারী নীলু! ওদের ভালোবাসতুম মনে মনে। ওদের ঘর, ওদের দালান, ওদের রাসমঞ্চ—ওরা নৈলে আমার এ দেখা সম্ভব হোতো না। জীবন দাসের ঘৃণা বহন করতুম নির্বিকার মনে কিন্তু সে ছিল আমার পরমাত্মীয়, তার ওই প্রাসাদের প্রতি মহলের ধূলিকণা ছিল আমার কিশোর মনের তীর্থক্ষেত্র!

বড় বড় চুল জীবন দাসের, দাঁড়ি ছিল গালভরা, চোখ দুটি ছিল ভাঁটার মতো। কী ঘৃণা ফুটতো ওর মুখে। কি বিজাতীয় হিংস্রতা ওর দুই চোখে। দূরের থেকে যদি দেখতে পেতুম, শরীর রোমাঞ্চ হোতো। মুখের সেই স্নেহলেশহীন কাঠিন্য—সে মুখে কোথায় নীলুর প্রতি বাৎসল্য? সে মুখের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে থাকে গুপ্ত ক্ষীরধারা,—যে ধারা সন্তানের প্রতি উপচিয়ে পড়ে? আমি যেন সেই আবিষ্কারের আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতুম। কিন্তু আমার সেই আশা অতৃপ্ত থেকে যেতো। চেয়ে দেখতুম হিংসাকে। সেই হিংসা শাসনের নয়, শমনের। সে হিংসা মানুষের চেয়েও যারা নিষ্ঠুর—তাদের।

পাড়ায় কখনো যদি কোনো গোলমাল দেখা যেতো, ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতো জীবন দাস। চোখে তার আগুন, মুখে বীভৎস কটূক্তি। ছেলের দলে মারামারি বেধেছে, কারো বাড়ী ছিঁচকে চুরি হয়েছে, পাড়ার কোনো বুড়িকে কেউ ক্ষেপিয়েছে, কেউ ঢিল ছুঁড়েছে কারো বাড়ীতে,—জীবন দাস আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত আমাকে। বলা বাহুল্য, এর ফলে পারিবারিক ও সামাজিক লাঞ্ছনার ঝড় বয়ে যেতো আমার পিঠের উপর দিয়ে। অনেক সময় আমার অপরাধ থাকতো না, অনেক সময় নীলুকে অপরাধী করা চলতো, কিন্তু সে হোলো জীবন দাসের একটিমাত্র সন্তান,—সে হোলো দাস বংশের উত্তরাধিকারী,—তার কোন অপরাধ হয় না।

নিবারণ বোরেগীর ওই একতলার উঠোনে জল দাঁড়াতো বর্ষার দিনে, আর আমাদের সাঁতার শেখার স্থবিধা হোতো। সেই উঠোনে সকালবেলা আহ্নিক সেরে নিবারণ বোরেগী সূর্য প্রণাম করবার জন্যে এসে দাঁড়াতেন, আর আমরা দেখতুম তাঁর চোখ ওলটানো কর্কশ মুখখানা, আর গলায় তাঁর বৈষ্ণবের কণ্ঠী—পাঁচনরী। তিনি নিজে ছিলেন পরম ভক্ত বৈষ্ণব, কিন্তু তাঁর মুখের চেহারা দেখলে কারো ভক্তি হোত না। গায়ে শাদা উড়ুনী, পায়ে খড়ম, মাথায় টিকি,—সকল সময় শুচি-শুদ্ধ, কিন্তু তিনি সকলের ভয়ের পাত্র ছিলেন, প্রীতির পাত্র ছিলেন না! তাঁর শাদারঙের একটা কুকুর থাকতো দরজার কাছে বাঁধা—আর ছিল একটা পোষা বেজী, সেটা থাকতো বারান্দা থেকে নামতে গেলে যে-সিঁড়ির ধাপ—সে ধাপের নীচে একটি গর্তে। কুকুরের ভয়ে চোর আসতোনা বাড়ীতে, আর ঘরের মধ্যে সাপ ঢুকতো না ওই বেজীর ভয়ে। দুটি জন্তু এমনি ক'রে সদাসর্বদা পাহারা দিত তাদের প্রভুকে!

প্রভু কে?—নিবারণ তাঁর সুন্দরী স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে অভিভূত কণ্ঠে বলতেন, প্রভু কে বলো ত'? প্রভু হলেন সেই বৃন্দাবনের গোপাল, সেই রসিকশেখর শ্যামমনোহর। গৌর গৌর!

স্বামী আর স্ত্রী দুজনকে পাশাপাশি দেখে আমরা অনেক সময়ে অবাক হতুম। স্বামীর গায়ের বর্ণ অবশ্য বৃন্দাবনের গোপালেরই মতন, এবং স্ত্রীর চেহারাটা রাধাভাবে বিভোর। রং খুব ফর্সা, বয়স প্রায় কুড়ি। আমার দিদিদের সঙ্গে খুব ভাব। বড়দিদি ওকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করতো, আচ্ছা কেষ্টদাসী, তুমি বুঝি ওঁর দ্বিতীয়পক্ষের বউ?

কেষ্টদাসী হাসতো। বলতো, সবাই তাই বলে, কিন্তু সত্যি নয়। সংসারে ও'র মন ছিল না, তাই প'য়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত বৃন্দাবন আর নবদ্বীপ ছুটোছুটি করেছেন। মন ত' এখনো বসেনি!

কতদিন বিয়ে হয়েছে তোমাদের ?

কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথিতে সিঁদুর, সুন্দর নাকের ওপর গঙ্গামাটির তিলক, গালে গলায় আর হাতে শাদা চন্দনের লেপন,—কেষ্টদাসী কপালে একটু ঘোমটা টেনে জবাব দিত, এই ছ' বছর হোলো। যাই ভাই, ও'র পুজোর যোগাড় ক'রে দিইগে।

মা বলতেন, বউটার রূপ একেবারে ফেটে পড়ছে। অমন অনামুখোর হাতে পড়েছে, মেয়েটার দশা কি হবে জানিনে।

সকাল থেকে পাঁচ সাতবার নিবারণের ঘর থেকে স্বামী স্ত্রীর মিলিত কণ্ঠের কীর্তন শোনা যেতো। ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম, জপ হরেকৃষ্ণ হরেরাম! হরেকৃষ্ণ হরেরাম রাধে গোবিন্দ! জয় গৌর জয় গৌর!

এইটুকু বলতে লাগতো অনেকক্ষণ, দীর্ঘক্ষণ—আর আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটতো। কতক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে কৃষ্ণদাসী, আর আমি রান্নাঘরের আড়ালে গিয়ে ওর হাত থেকে পাবো শশা-কলা আর আম সন্দেশ। কিন্তু বেরিয়ে আসেনা, সময় চ'লে যায়—ঘরের মধ্যে স্বামী স্ত্রী একেবারে নীরব। সুতরাং আমি যাই পা টিপে টিপে বারান্দার ওপর, পায়ের শব্দ না পান্ নিবারণ। ঘরের দরজার ফাঁকটুকুতে দেখা যায় দুজনে চোখ বুজে ব'সে আছে সেই কখন্ থেকে। কেষ্টদাসীর চোখ দিয়ে নেমে এসেছে জল, আর নিবারণের চোখ দুটো জোর ক'রে বন্ধ করা। সামনে দুখানা বাঁধানো ছবি। শ্রীগৌরাঙ্গ দু'হাত তুলে উপর দিকে তাকিয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছেন, মহাপ্রভুর গলায় পৈতা, কাঁধের উড়ুনি হাওয়ায় ভেসে-যাওয়া,—আর তাঁর মাথার পিছনে জ্যোতির্ময় সূর্যগোলক। দ্বিতীয় ছবি হোলো, ওঁকারের মধ্যে কৃষ্ণরাধা একত্র বিজড়িত। পায়ের কাছে ময়ূর আর হরিণ পিছনে বসন্তপ্রকৃতি বৃন্দাবনের। ছবির ও'পর চন্দনের ছিটে দেওয়া। কুমারটুলির ঘাটে এ ছবি অনেক দোকানে বিক্রি হয় আমি জানতুম। ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ দেখতে পেতুম বেজীটাও মুখ বাড়িয়ে আছে দরজার ফাঁকে। নৈবেদ্যর একটা অংশ সেও পায়। কিন্তু আমি একটু হাত নাড়তেই ফুড়ুক ক'রে সেটা পালায়। আমাকে সে বন্ধু মনে করে না। অনেকক্ষণ পরে কৃষ্ণদাসী থমথমে গম্ভীর মুখ নিয়ে বেরিয়ে আসে। এই সময়টায় নাকি বিশেষ কারো সঙ্গে কথা বলা নিষেধ। হাতে তার নৈবেদ্যর থালা। পায়ের কাছে বেজীটা ঘোরে। আমি তখন রান্নাঘরের পাশে এসে দাঁড়িয়ে আছি। ফল আর মিষ্টি আমার হাতে দেবার সময় প্রশ্ন করলুম, এত দেরী হোলো কেন ?

কৃষ্ণদাসী বললে, আমি কি এখানে ছিলুম ?

মুখ তুলে তাকাতেই সে আবার বললে, গিয়েছিলুম বৃন্দাবনে ব্রজের রাখালের সঙ্গে!—কৃষ্ণদাসীর দুইচক্ষে তখনও বৃন্দাবনী বিহ্বলতা!

সন্দেশ আর কলা নিয়ে তাড়াতাড়ি গা ঢাকা দেবার সময় একবার থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলুম, কাঁদছিলে কেন, তখন ?

স্নিগ্ধ নিমীলিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে কৃষ্ণদাসী বললে, ও কি কান্না রে, ও হ'ল প্রেমাশ্রু !

আমার মেজদি হাসতে জানতো, এবং বড়বৌদি হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়তে জানতো। পাশের ঘর থেকে মা বলতেন, তোমাদের অত হাসাহাসি কিসের ? ছি, অত হাসতে নেই।

ওরা দুজনে এঘরে ঢুকে আস্তে আস্তে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দিত, তারপর বিজয়া দশমীর দিনে যেমন সিদ্ধি খেয়ে মানুষ অকারণে হেসে গড়াগড়ি দেয়,—তেমনি ওরা দুজনে মেঝেতে আঁচল লুটিয়ে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরিয়ে দিত। একবার ক'রে বলতো, প্রেমাশ্রু,—আবার হাসতে হাসতে লুটোপুটি।

দশ গজের মধ্যেই কৃষ্ণদাসীদের মহল, মাঝখানে কোনো আড়াল আবডাল নেই,—কৃষ্ণদাসীরা কোনো কথা কি মন্তব্য শুনতে পেলে আঘাত পাবে, মায়ের মনে এই ছিল ভয়! আমি গিয়ে একপাশে ব'সে নৈবেদ্যর ফল মিষ্টি খেতুম, আর কৃষ্ণদাসীর বিষণ্ণ মুখখানার রহস্য ভাববার চেষ্টা ক'রে কূলকিনারা পেতুম না।

স্ত্রীকে অনেকে অনেক রকম ক'রে ডাকে। কেউ নাম ধরে, কেউ বলে ওগো ; কেউ ডাকে, শুনতে পাচ্ছ ? নিবারণ স্ত্রীকে ডাকেন, কোথা গেলে ? কোথা গেলে বললেই কৃষ্ণদাসী ছুটে যায় ঘরে। নিবারণ বলেন, কে যে কোথায় যায় ! কেউ যায় শ্রীক্ষেত্রে, আবার কেউ বা যায় শ্রীধামে ! শ্রীবাসের অঙ্গন আজ যে শূন্য !—বলতে বলতে তিনি গুন গুনিয়ে ওঠেন,—জয় রাধে কৃষ্ণ, শ্রীরাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ রাধে।

এটি নিবারণের সান্ধ্য আরাধনার ভূমিকা। কৃষ্ণদাসী গিয়ে হাত যোড় ক'রে স্বামীর কাছাকাছি ব'সে পড়ে। সামনে তেলের প্রদীপ জ্বলে। আমি গিয়ে পশ্চিমের জানলাটার নীচে দাঁড়াই। কথায় কথায় সাধনার কথাটা শুনতুম। সাধনাটা কি বস্তু সেটি আমার জানা চাই বৈ কি।

নিবারণ তাকিয়ে আছেন সেই মহাপ্রভুর দু'হাত তোলা ছবিখানার দিকে, কৃষ্ণদাসী কোলের উপর হাত যোড় ক'রে চুপ ক'রে ব'সে আছে। পুষ্পপাত্র আর নৈবেদ্যর রেকাব সামনে। দু'গাছা ফুলের মালা, ধূপ থেকে ধোঁয়া ওঠে, আর ওপাশে টাইমপিশ ঘড়িটার থেকে টিকটিক শব্দ হয়। এমন সময় আসে ওই বেজীটা, মুখ তুলে তাকায় নিবারণের দিকে—একটু অপেক্ষা করে, তারপর কি যেন মুখে নিয়ে নিবারণকে প্রদক্ষিণ ক'রে চ'লে যায়।

আমি বাইরের আবছা অন্ধকারে জানলার পাশে—উইপোকায় খাওয়া ফুটো—সেই ফুটোর ভিতর দিয়ে দেখতুম, ওরা আলোর সামনে ব'সে। চোখ বুজতেন নিবারণ, তারপর হাসতেন। কালো কালো লম্বা দাঁত, একটার থেকে একটা দূরে। হাসির আগেই সেগুলি বেরিয়ে আসতো। কিন্তু সে-হাসি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে নয়, সে-হাসি

নিজের মনের, সে-হাসি আত্মদর্শনের। যেন কিছু দেখছেন চোখ বুজে, কিছু আমোদ পাচ্ছেন। এক সময় চোখ বুজেই হেসে বলেন, এই ত' ধরেছি। বল্ দেখি তুই ননীচোর, না মনোচোর ?

নিবারণের প্রশ্নের জবাব ঘরের কোন্ দেওয়াল থেকে আসে শোনবার জন্য আমি উৎকর্ণ হয়ে থাকতুম। কিন্তু এক সময় নিজেই নিবারণ গুনগুনিয়ে উঠতেন, তুমি নদীয়ার গোরা, ছিলে মনোচোরা...কোথা গেলে ?—হঠাৎ তিনি চোখ খোলেন।

এই যে !—কৃষ্ণদাসী জবাব দেয়।

নিবারণ তৎক্ষণাৎ দুই চোখ বুজে আবার গুনগুনিয়ে ধরেন, তুমি রাধিকার পারা, কোটি শশীতারা...

এতক্ষণ পরে ভাবে বিভোর হয়েছেন নিবারণ। কৃষ্ণদাসী আস্তে আস্তে ঘর থেকে উঠে আসে। আমি ততক্ষণে বাইরের দরজার কাছে সরে গেছি। কৃষ্ণদাসী বারান্দার থেকে নেমে এসে আঁচল থেকে দুটো পয়সা খুলে আমার হাতে দিয়ে বলে, যা নিয়ে আয়। ছাদে যাবি ভাই লুকিয়ে।

মাঠ পেরিয়ে আমি ছুটে যেতুম হরিসাধনের দোকানে। এক ঠোঙ্গা তেলে ভাজা পেঁয়াজের বড়া কিনে সবাইকে লুকিয়ে চ'লে যেতুম ছাদে। নিবারণ তখন পুরোপুরি সাধনায় বসেছেন। আমাদের দিকে রান্নাবান্না চড়েছে। মেয়েরা আজ ঘরকন্নার কাজে। বড়দা আপিস থেকে ফেরেনি।

কৃষ্ণদাসী এলো ছাদে ছায়ার মতন! তারপর বড়াগুলি দুজনে খাওয়া চললো অনেকক্ষণ। কৃষ্ণদাসী বললে, কারোকে যেন বলিসনে ভাই,—আমাদের এসব খেতে নেই কিন্তু।

বললুম, তুমি ত' সধবা, মাছ খাওনা কেন ?

মাছ !—তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণদাসীর চোখ উলটে গেল। সে বললে, মাছ! জীবের মধ্যে যে প্রেমময়! সর্বজীবে তাঁর লীলা।—চুপ।

সিঁড়িতে যেন কার পায়ের শব্দ হোলো। কৃষ্ণদাসী অমনি তিনটে বড়া একসঙ্গে মুখে পুরে দিল। গরম গরম বড়াগুলি অতি সুস্বাদু।

প্রশ্ন করলুম, আমাকে কের্তন শিখিয়ে দেবে ?

কৃষ্ণদাসী বললে, তোর কি সময় হয়েছে ?

কিসের সময় ?

গৌর গৌর গৌর !—কৃষ্ণদাসী নিশ্বাস ফেলে বললে, নাম জপ চাই যে! নাম জপ, নাম ভজো, নাম করো সার রে। প্রভু যখন নাম করেন, দেখিসনি ওঁর মুখ কেমন ঢলঢল করে ? দেখিসনি আমার জ্যোতির্ময় শ্রীগুরুকে ?

বললুম, গুরু, কই গুরু ?

নিবারণের ঘরের দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণদাসী বললে, ওই-যে আমার পরম গুরু! আমার বাসুদেব।

উনি ত' তোমার স্বামী।

পেঁয়াজের বড়া মুখে, কিন্তু কৃষ্ণদাসীর চোখে যেন বিভোর মনের ঘন ছায়া পড়েছে। কেমন যেন স্বর্গীয় হাসি হেসে বলে, যেই গুরু সেই স্বামী, আবার সেই ত' আমার বাসুদেব!—এবার যাই।

কৃষ্ণদাসী তা'র একরাশ এলোচুলের ওপর এবার ঘোমটা টেনে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে যায়। আমি ভাবতুম, ও মেয়ে পৃথিবীর মানুষ নয়। ওর মিষ্ট হাসি, মিষ্ট চোখ, মধুর স্নেহ,—আমার ধারণা সেগুলো এ পৃথিবীর বাইরের জিনিস। আমাকে কোনো কাজে কৃষ্ণদাসী ফরমাশ করলে নিজেকে ধন্য মনে করতুম।

কীর্তন শেখবার চেষ্টা করতে লাগলুম। ছাদের আড়ালে, মাঠের কোণায়, হেদুয়ার নিরিবিলি বেঞ্চে, শেষ পর্যন্ত কুমারটুলির গঙ্গার ঘাটে গিয়ে—কীর্তনের চরণ আওড়াতুম। অমনি ক'রে গুণগুনিয়ে ওঠে যেন আমার ওষ্ঠাধর, অমনি ছায়া যেন আমার চোখে নামে, শ্রীরাধাভাবে অমনি ক'রে রাঙ্গা হয়ে ওঠে যেন আমার ঘামের ফোঁটানামা মুখ—আমি যেন দেখতে দেখতে কৃষ্ণদাসী হয়ে উঠি!

জগন্নাথ প্রামাণিকের বাড়ী কীর্তন হচ্ছে, আমি গিয়ে বসলুম আসরের মাঝখানে। মাণিকতলায় প্রতাপবাবুর বাড়ীতে আসর বসেছে নিত্যানন্দ গোস্বামীর,—সেখানে আমি নিত্য শ্রোতা। সুর আর সঙ্গীতের একটা প্রবল মোহ, সে-মোহ কাটানো কঠিন ছিল।

ওদের মহলে মাছ মাংস আসতো না,—কুকুরটা খেতো দুধ ভাত, আর বেজীটা খেতো দুধকলা। নিবারণ খড়ম পায়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেই এক পাশ দিয়ে আসতো শাদা কুকুর, আর বেজীটা এসে ঘুরতো পায়ের তলায়। শিক্ষার গুণে দুটো জন্তুই ছিল সাম্প্রদায়িক। উঠোন পেরিয়ে আমাদেব মহলে কখনো ওরা পা বাড়াতো না। কৃষ্ণদাসীর সৎমা ছিল সংসারে, আর ছিল নিবারণের ভাগ্নে আর ভাগ্নেবৌ। ভাগ্নেবৌ শ্যামবর্ণ আর হাঁসিখুশী, আর স্বামীর জন্য একপাশে গিয়ে সে মাছ রাঁধে। স্বামীর আছে এক ব্লক-ছবির কারখানা। পাঁজিপুঁথিতে সেই ব্লক-ছবি ছাপা হয়। উপার্জন মন্দ নয়। এপাশে কৃষ্ণদাসীরা খায় নিরামিষ, নিবারণের জন্য দুধের মালাই পায়েস পিঠে। মাছ রান্নার গন্ধ পেলেই নিবারণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ওঠেন, গৌর গৌর—কোথা গেলে?

কৃষ্ণদাসী সব ফেলে ছুটে আসে। নিবারণ সেই গতিভঙ্গীব দিকে তাকিয়ে বলেন, উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী, কিশোরী আমার প্রাণ রে!—এবার যে তেল সেবা হবে! তুমি বুঝি বৌমার রান্নার জায়গায় বসে 'নাম' করছিলে?

আমরা এ মহলে আড়ষ্ট হয়ে উঠতুম। কেন আড়ষ্ট হতুম, তা'র রহস্য প্রকাশ পেতো অনেক রাত্রে। ভাগ্নেবৌদের ঘর নিশুতি হয়ে যেতো। সৎমা ঘুমিয়ে থাকতো উত্তর পূবের কোণের ভাঁড়ার ঘরে। আমাদের এ মহলে আর কা'রো সাড়াশব্দ পাওয়া যেতো না। কিন্তু ছাঁৎ ক'রে আমার ঘুম ভেঙ্গে যেতো মায়ের কাছাকাছি শুয়ে। মা ততক্ষণে উঠে বসেছেন। ও মহল থেকে আসতো দাঁতে দাঁত ঘষা রুদ্ধ আক্রোশের

আওয়াজ, শুনতে পেতুম নিরুদ্ধ আর্তকণ্ঠ। বুঝতে পারতুম নিবারণ আর কৃষ্ণদাসীর ঘরখানা ঝড়ের তাড়নায় আলোড়িত। বাইরে কেবল সেই শাদা কুকুরটা অন্ধকারে ঘরে ঢুকতে না পেরে গোঁ গোঁ করছে রাগে। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়তুম। ঘুমের ঘোরে শুনতুম মায়ের চাপা কণ্ঠস্বর, দুর্গা দুর্গা!

সকালবেলায় দেখতুম কৃষ্ণদাসীর সেই মূর্তি। স্নান করা খোলা চুলের উপর অল্প ঘোমটা টানা, কপালে মস্ত সিঁদুরের ফোঁটা, পরণে রাঙ্গাপাড় শাড়ী, নাকে তিলকমাটির দাগ। কীর্তনের আসরে শুনেছিলুম, শ্রীরাধা নাকি একশো বছর ধ'রে কেঁদেছিলেন। কৃষ্ণদাসীর মুখে দেখতুম, একশো বছরের কান্নার পরের বিষণ্ণতা। ওদিকে কিন্তু নিবারণের নামকীর্তন সেই কোন্ সকালে আরম্ভ হয়ে গেছে।

হঠাৎ ওই নামকীর্তনের ভিতর থেকেই আওয়াজ আসতো কর্কশ কণ্ঠে, কোথা গেলে?

ভাগ্নেবৌয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে কৃষ্ণদাসী ছুটে যেতো পুজোর ঘরে। ফুলের রাশি এনেছেন সৎমা গঙ্গার ঘাট থেকে। সেই ফুলের একটি মালা মহাপ্রভুর জন্যে, আর একটি নিত্যানন্দের। সেই মালা গাঁথতে ব'সে যেতো কৃষ্ণদাসী। মালা দুজনের, কিন্তু দুইয়ে মিলে এক। ভাবো মনে মনে। ওযে শ্রীধাম নবদ্বীপ। নয় দ্বারবিশিষ্ট দ্বীপ, তারই মাঝখানে চৈতন্যের উদয়! গৌর গৌর। 'ওযে প্রেমে ঢল ঢল ঢল গল গল গল ছল ছল ছল অরুণ নয়ানে দুটি ভাই! ও তার একটির নাম গৌরহরি আরেকটির নাম হয় নিতাই! ও যে পথে পথে ধায়, হরি হরি গায়···জয় গৌর জয় গৌর!

সুর যেখানে পঞ্চমে ওঠে সেখানেই নিবারণ থেমে যান, কেননা তারপর গলা চিরে যেতে থাকে। কৃষ্ণদাসী মালা গেঁথে চলে যান আপন মনে। আর আমি মনে মনে নিবারণের ওই কীর্তনের চরণগুলি গুনগুনিয়ে মুখস্ত করে রাখি।

কাঁদছো কেন গো অমন ক'রে?

হঠাৎ নিবারণের গলার আওয়াজে রান্নাঘরে মায়ের হাতের খুন্তি থেমে যায়। মা উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন। বুঝতে পারি তাঁর চাহনির মধ্যে আছে নিরতিশয় উদ্বেগ, তাও বুঝতে দেরি হয় না। কিন্তু তারপরেই নিবারণের কণ্ঠস্বর যায় বদলে—ও, নয়নসলিলে বসন তিতাওল! চোখের জলে মুখ ভেসে যায়, বুক ভেসে যায়! আহা, ব্রজের শুষ্ক রজ ওতে কি সিক্ত হবে?—আহা, প্রেমজলে ডুবুডুবু লোচনতারা!

নিবারণ নিজের কণ্ঠে কাঁপন মিলিয়ে কীর্তন গেয়ে ওঠেন। পুজার আয়োজন আছে, কিন্তু ঠিক পুজা নেই। পাট আছে, মন্ত্র নেই। সুতরাং আয়োজনটা সম্পূর্ণ হলেই অনুষ্ঠানের শেষ হয়। সন্ধ্যাবেলা শুধু আরতি, আর মঙ্গলঘণ্টা। নিবারণ ভাবে বিভোর থাকেন। কিন্তু কেউ কি জানে, এই ফাঁকে ছাদের সিঁড়িতে ব'সে দুদিক পাহারা দিয়ে আমি আর কৃষ্ণদাসী গরম গরম মাছের চপ আর মটন্ কাট্‌লেট খেয়ে নিই? কেউ কি জানে, সমস্ত পুজার আয়োজনের আড়ালে আমি আমিষ খাদ্য সংগ্রহ ক'রে উদ্‌গ্রীব হয়ে ব'সে থাকি ছাদের সিঁড়িতে, কতক্ষণে কাপড় তুলে আনার অজুহাতে আসবে কৃষ্ণদাসী? মা থাকেন সন্ধ্যাহ্নিক নিয়ে, ওদের সৎমা সারাদিনের পর ঘুমে

কাতর, ভাগেবৌ তা'র শিশুকে নিয়ে ঘুম পাড়ায়, আর নিবারণ সুর ক'রে পড়েন চৈতন্যচরিতামৃত। বড়বৌদি আছে রান্নাঘরে। আমার দৃষ্টির পাহারায়। রয়েছে সবাই।

একতলার ছাদ। পশ্চিমের বাড়ীটার দেয়াল উঠেছে অনেক উ'চুতে। চাঁদের আলো আড়াল করেছে ওই মস্ত দেওয়াল, সুতরাং তা'র নীচে একতলার ছাদটা অন্ধকার। হঠাৎ যদি কেউ ছাদে উঠে আসে? আসুক—তা'রা দেখবে কৃষ্ণদাসীকে, আমি চক্ষের পলকে উত্তর দিকের গলির নীচে নেমে যেতে পারবো, কেউ জানবে না।

হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসলুম, রাত্তিরে তোমাদের ঘরে অত শব্দ হয় কেন?

আমার কাঁধের ওপর থেকে হাতখানা সরিয়ে কৃষ্ণদাসী বললে, গুরুর যে ভর হয়!

ভর কি?

হর্ষ কম্প স্বেদ পুলক! হাসিতে কান্না, কান্নায় হাসি! তাকে বলে ভর!

তাহলে অত দাপাদাপি কেন?

কৃষ্ণদাসীর দুই চক্ষু ভক্তি বিহ্বলতায় যেন ঝলমল করে। জ্যোতির আভা যেন তা'র সর্বাঙ্গে। বহুদূরের থেকে সে যেন মিষ্ট কণ্ঠে বলে, তিনি যে নাচান, তিনি কাঁদান, তিনি ভেঙ্গে খান্ খান্ ক'রে দেন, তিনিই আবার গ'ড়ে তোলেন! কান্নায় তিনি গলেন না, যন্ত্রণায় তিনি টলেন না।

আমি বললুম, কই আমি ত' ভর হওয়া একবারও দেখিনি?

কৃষ্ণদাসী বললে, দেখো সোমবারে।

সোমবারে কি?

সোমবারে যে মহাপ্রভুর জন্মতিথি এবার। সেদিন আমাদের সকাল সন্ধ্যে আসর! রঘুনাথ গোস্বামী আসবেন। ঘটা হবে খুব।

সারাদিন ভয়ানক গরমের পর এবার বাতাস বইছে ছাদের ওপর। ছাদের মেঝে তখনও গরম। সেই হাওয়ায় কৃষ্ণদাসীর চুল উড়ছিল, আর সেই চুলের গন্ধ পেয়ে আমি মনে মনে ভাবছিলুম, কৃষ্ণদাসী কোন্ তেলটা মাথায় মাখে! সেই তেল পাওয়া যায় কোন্ দোকানে! বোধ হয় দিনরাত চন্দন গায়ে মাখলে তবেই কৃষ্ণদাসীর মতন স্বভাব পাওয়া যায়। ও এসে পৌঁছবার আগেই সুগন্ধ তেল আর চন্দনের সুবাস আসতো আমার নাকে। আমার কাঁধে হাত রেখে কৃষ্ণদাসী যখন সচকিতভাবে গলগলিয়ে তা'র বক্তব্য ব'লে যেতো, আমার বন্য প্রকৃতি তৎক্ষণের জন্য যেন শান্ত নম্র হয়ে থাকতো। ওর ছোঁয়ায় আমার কান্না পেতো।

উঠোনটা দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। আমাদেক যাতায়াতের পথটুকু রেখে বাকি অংশটায় আটচালা বাঁধা হয়েছিল। উপরটা তেরপল দিয়ে ঢাকা। আমাদের এদিক থেকে ওদের আর কিছু দেখা যায় না। খোলের উপর চাটি পড়েছে। আজ সোমবার, মহাপ্রভুর জন্মতিথি। ওদের মহলে গিয়ে ফাই ফরমাশ খাটতে পেয়ে আমি ধন্য হয়ে গেছি। কীর্তনের আসর বসেছে উত্তর দিককার বড় ঘরখানায়। রঘুনাথ গোস্বামী

এসেছেন দলবল নিয়ে। অন্যান্য আখড়া থেকে আরো এসেছেন অনেকে। আহারাদির পালাটা বিয়ে বাড়ীর মতন। আয়োজন প্রচুর। আমি এ মহলে এসে চন্দন পরেছি, কিন্তু নাকে তিলক কাটতে সাহস পাইনি। কণ্ঠী গলায় দেবার ইচ্ছাটা অনেকদিনের, কিন্তু জীবনের অনেক ভালো ভালো ইচ্ছাই অপূর্ণ থেকে গেছে।

খোলা আর করতালের আওয়াজে সমগ্র পল্লীটা মুখর হয়ে উঠেছে। সকল কীর্তন-কথার আগে গোরাচাঁদের বন্দনা ক'রে নিতে হয়। তাই ওর নাম গৌরচন্দ্রিকা। ব্রজ-বিহার, তরণী-যাত্রা, বন-ভ্রমণ, মাথুর—একটির পর একটি পালা। আমার ওসব জানা নেই, তাই মাঝে মাঝে কৃষ্ণদাসী এসে কীর্তনের এক একটি বিষয় আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে। নিবারণ আছেন সকলের মধ্যমণি হয়ে। আজ তাঁর পরণে গরদের ধুতি, কাঁধে বৃন্দাবনী চাদর, সর্বাঙ্গে তিলকসেবা।

প্রভাতে যে খোল করতালের প্রচণ্ড ঝনৎকার আরম্ভ হয়েছিল, তার সাময়িক বিরতি হোলো মধ্যাহ্নের পর। কেউ আছেন রাধাভাবে, কেউ শ্রীকৃষ্ণে, কেউ গোপাল-গোবিন্দে, আবার কেউ বা সুবল সখায়। রঘুনাথ গোস্বামী ছিলেন শ্রীমতীভাবে। তিনি এক সময় উঠলেন নেচে নেচে। রং কালো, কদম ফুলের মতন মাথাটা ছাঁটা, গোঁফ দাড়ি কামানো নেই, গলায় আছে পৈতা, কোমরে গামছা বাঁধা—শ্রীমতীর ভাবে তিনি ভাব-বিহ্বল! এই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা, সুতরাং দৃষ্টি আমার সজাগ ছিল, এবং আমিও ভক্তিতে আপ্লুত ছিলাম।

শ্রীমতী উঠলেন চোখ বুজে হেসে-কেঁদে। কোথায় তিনি যাবেন, এবং কোথায় গিয়ে থামবেন, তা কা'রো জানা নেই। কিন্তু নেচে নেচে তিনি এগোচ্ছেন। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে তিনি অগ্রসর হচ্ছেন। বুঝতে পারা গেল, গোস্বামীজির ওপর 'ভর' হয়েছে। এখন তিনি কৃষ্ণভাবিনী, কৃষ্ণকামিনী।

আটচালাটা ছোট। ওপাশে কলতলা, পূবদিকে বারান্দা, এদিকে আনাগোনার পথ। আবার এইটুকুর মধ্যে কাজের বাড়ীর নানাবিধ সামগ্রী থৈ থৈ করছে। কিন্তু শ্রীমতীকে ত' যেতে হবে। বৃন্দাবন থেকে মথুরা,—সে যে অনেক পথ! তিনি যাবেন কেমন ক'রে? মাটির খুরি, গেলাস, কলাপাতা এক পাশে, অন্য পাশে জলের জালা, দই মিষ্টির হাঁড়িগুলো এধারে, এক পাশে গামলায় রয়েছে আলু-কুমড়োর ছোক্কা, এপাশে গরম গরম লুচির চেঙ্গারী,—কিন্তু শ্রীমতীকে ত' যেতে হবে। কত অরণ্য, কত হিংস্র শ্বাপদ আর সরীসৃপ, কত বা দুর্জন আর গুরুজনের ভয়! পথ অন্ধকার, মেঘমেদুর আকাশে শ্রাবণের বজ্রগর্জন, অশ্রুজলে তিনি দিশাহারা, বিবশা, বিলোলবসনা! হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ ব'লে তিনি যাবেন, মথুরা নগরের প্রতি ঘরে ঘরে। ও বিশাখা, ওরে ও ললিতে! আমি যোগিনী হইয়ে যাবো সেই দেশে যেথায়……!

বিশাখা আর ললিতা ধরলো রঘুনাথকে। রঘুনাথের জ্ঞান নেই। মথুরা তখনো অনেক দূরে। তাঁকে ধ'রে বারান্দায় তোলা হোলো। হাসছেন তিনি যেন কার সঙ্গে! কাঁদছেন যেন কা'র জন্যে। তাঁর চোখ উলটিয়ে গিয়েছে কা'র স্বপ্নে! সচেতন অঙ্গ তাঁর!

উঠোন থেকে খোলের ওপর চাঁটি পড়লো—হরি হরি বল্‌, হরি হরি বল্‌! বিশাখা আর ললিতা—মানে, মদনমোহন দাস এবং আরেকজন ছোকড়া বোষ্টম,—রঘুনাথের টাল সামলাচ্ছে অতিশয় সন্তর্পণে! আশপাশে তোরঙ্গ বাক্স, হাঁড়ি কড়াই, বিছানা বাসন,—একেবারে একাকার। ওর মাঝখান দিয়েই শ্রীমতীকে যেতে হবে অভিসারে! কিন্তু রঘুনাথ বাধা মানবেন না আজ! ভক্তিরসে বিহ্বল হয়ে নিবারণ শিবনেত্রে চেয়ে রয়েছেন সেইদিকে। সবাই তটস্থ, স্তব্ধ, আকুলিত। মাঝে মাঝে ডুকরে কেঁদে উঠছে অনেক।

আমি ভাবলুম শ্রীমতী থামবে কোথায়! কোথায় পথের শেষ?

অবশেষে থামলেন তিনি ঘরে গিয়ে। ললিতা আর বিশাখা তাঁকে ধরাধরি ক'রে কোনোমতে দাঁড় করালো কুশাসনের উপর—যেখানে মধ্যাহ্ন ভোজনের পাতা পড়েছে! তিনি লুটিয়ে পড়ছিলেন প্রায় দুজনের হাতের মধ্যে, কিন্তু তা'রা রঘুনাথকে বসিয়ে দিল আসনে। শ্রীমতীর সামনের পাতে লুচি-তরকারি পড়েছে।

আমি মুখ ফিরিয়ে তাকালুম কৃষ্ণদাসীর দিকে। বুঝতে পারিনি, এতক্ষণ সে আমারই পিছনে দাঁড়িয়ে হাই হাই ক'রে কাঁদছিল। তা'র কান্না দেখলে পাষাণ গ'লে যায়।

ব্যাকুল হয়ে বললুম, কাঁদছো কেন অমন ক'রে?

হঠাৎ হুঁস হোলো কৃষ্ণদাসীর। বললে, অ্যাঁ?

বললুম, এত চোখের জল কোথায় থাকে তোমার?

চোখ মুখ তা'র যেমন ফোলা, তেমন রাঙ্গা। আঁচলে মুখ মুছে কৃষ্ণদাসী শুধু বললে, এ যে প্রেমাশ্রু! এর কি শেষ আছে?

প্রহার এবং উৎপীড়ন ছাড়া মানুষ কাঁদে কেমন ক'রে—একথা সেদিন আমার জানা ছিল না। অহেতুক যন্ত্রণা বোধও যে মানুষকে অনেক সময় কাঁদায়, একথা কি জানতুম সেই বয়সে? সুতরাং সংশয়াচ্ছন্ন মন নিয়ে আমি কৃষ্ণদাসীর কাছ থেকে স'রে গেলুম। মাঠের সামনে ওই রাসবাড়ীর জীবন দাস আমাকে আড়ালে পেয়ে কান ম'লে থাপ্পড় দিত —কেননা ওর ছেলে নীলুর সঙ্গে আমি খেলে বেড়াতুম, এবং তাতে নীলুর স্বভাবচরিত্র নাকি নষ্ট হোতো। জীবন দাসের প্রহারটা সয়ে যেতো, কিন্তু নীলুর সঙ্গে বিচ্ছেদের কল্পনাটা আমার সইতো না। আড়ালে গিয়ে একটা কানের জ্বালার সঙ্গে আমার ভিতরের যন্ত্রণাটা মিলে যেতো, এবং হু হু ক'রে জল এসে পড়তো দুই চোখে। সে জল নীলুর জন্যে! ওরই নাম কি প্রেমাশ্রু?

অমন জল অনেকের জন্যেই পড়েছেন আগে আর পরে। দীপু গুণ্ডা যেদিন মার খেল পুলিশের হাতে, বাঁদ্যদের বাড়ীর হীরেন এম-এ পড়তে পড়তে যেদিন হেদোয় ডুবে আত্মহত্যা করলো, নণ্টুর মাকে যেদিন কপালে কলঙ্ক মাখিয়ে বাড়ী থেকে তাড়ানো হোলো, খাঁদি যেদিন প্রথম শ্বশুরবাড়ী গেল, বুড়ো পূর্ণ পণ্ডিতকে নিয়ে যেদিন গঙ্গা-যাত্রা করলো,—জল পড়েছে বৈ কি চোখ দিয়ে। কিন্তু সে-জল তা'রা কেউ দেখে যায়নি, আমার চোখে জল আসতে পারে একথা কেউ স্বীকার করতো না।

এই যেমন আজকে। কৃষ্ণদাসীর মনে বোধ হয় এই আশা ছিল যে, আমার চোখেও নামবে ওদের ওই প্রেমাশ্রু। কিন্তু আমি চ'লে গেলুম বাইরে, ওদের লুচির চেঙ্গারীর প্রতি যেন আজ আমার লোভ ছিল না। মনে বিক্ষোভ জ'মে উঠেছিল কেন, আজও বেশ মনে পড়ে। বৈশাখের রোদে কৃষ্ণদাসীর টকটকে মুখখানা, তা'র ওপরে দরদরে ঘাম। সকাল থেকে জল পড়েনি ওর মুখে। এতগুলো বোষ্টমের সেবা, এতটুকু বিশ্রাম নেই। কথায় কথায় আবার ওর ওপর নিবারণের চাপা তাড়না, তা'র ফলে মুখে ওর বিষণ্ণতা! এর ওপর আবার যদি দেখা যায় ঝরো ঝরো প্রেমাশ্রু, তবে অসহ্য। সুতরাং বিক্ষোভ আর তিক্ততা নিয়ে সেই দুপুরে আমি চ'লে গেলুম কোন্ গলি থেকে কোন্ গ'ল পেরিয়ে, আমার আজ আর মনে নেই। যদি সেদিন রাস্তার যে কোনো লোকের গালে চড় মারতে পারতুম তবে খুশী হতুম।

দিদিমা এলেন অনেক দিনের পরে। দিদিমা যেন আমার মুক্তি, আমার উদ্দাম, স্বাধীনতার প্রতীক্। চঞ্চল অধীর বালক ছুটে গিয়ে বসল তাঁর পাশে। পরিশ্রান্ত পথিক এসে বসলো যেন গঙ্গার উদার স্নিগ্ধ হাওয়ায়। এখানে তাপ শীতল হবে, তৃষ্ণা মিটাবে।

দিদিমা বললেন, কই রে, তোরা কোথায়? কেমন আছিস সব? অনেক দিন আসতে পারিনি! সত্তর বছর বয়েস হ'তে চললো, আর কি অত হাঁটতে পারি? কেমন আছিস বাপি?

সেদিন দিদিমার নানাবিধ প্রশ্নের জবাব দিতে পারিনি, কেননা ওই প্রেমাশ্রুটায় হয়ত আমার গলা বন্ধ হয়ে যেতে পারতো। কেউ কোনো প্রশ্ন না ক'রে আমাকে উপলব্ধি করলে তৃপ্তি পেতুম। লাঞ্ছনা আর উৎপীড়নের দাগ আমার সর্বদেহে মনে। ব্যথা আমার নিবিড়—যেন একশো বছরের ব্যথা! কত কাল ধ'রে যেন মার খাচ্ছি—কত যুগ যুগান্তর। ব্যথা আমার ছড়িয়ে আছে এখানে, ওখানে—সমস্ত কলকাতায়!

মা এসে দাঁড়ালেন। দিদিমা বললেন, এসো মা এসো। পোড়া চোখে কাল থেকে ঘুম নেই। শেষ রাত্তিরে স্বপন দেখলুম, তোদের এখানে যেন অসুখ। তাই আর থাকতে পারলুম না। একটা চোখে দেখতে পাইনে, তবু ভাতে-ভাত দুটো মুখে দিয়ে এলুম ছুটতে ছুটতে। হ্যাঁ গা, ছেলেটা কাঁদে কেন, বল্ দিকি?

আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে মা বললেন, ও তোমার কাছে থেকে ইস্কুলে যাবে তাই দু'দিন বায়না ধরেছে।

দিদিমা হাসলেন। বললেন, ওমা, তার জন্যেই ত' এলুম! তোদের আর এখানে ভাড়া দিয়ে এখানে থেকে কাজ নেই মা। মাসে মাসে এগারো টাকা ভাড়া গুনবি কোত্থেকে? আমি তোদের নিতে এলুম। চল্, বাড়ী মেরামত আমার হয়ে গেছে!

মা রাজী হলেন। আমাদের যাবার দিন স্থির হয়ে গেল। আমি নেচে উঠলুম এবং মেতে উঠলুম। আবার যাবো দিদিমার বাড়ী, আবার ফিরে পাবো সেই পল্লী,—

যার সঙ্গে আমাদের দেড় বছরের বিচ্ছেদ। যেখানে আমার অসংখ্য পায়ের দাগ আজও ছড়ানো।

আমাদের যাবার কথা শুনে নিবারণ দুঃখিত হননি। কেননা তাঁর ধারণা, এমহলটা ভাড়া দিলে তিনি পনেরো টাকা নিশ্চয় পেতে পারেন। আমাদের জন্য তিনি এতদিন ক্ষতিগ্রস্তই হয়েছেন।

যাবার আগের দিনও হরিসাধনের দোকান থেকে খাবার এনেছিলুম। লোকচক্ষের আড়ালে ভাগ্নেবৌ আর কৃষ্ণদাসী দুজনেই এসে চোরা ভোজনের আসরে যোগ দিল। কিন্তু কাপড় চোপড় প'রে নেমন্তন্নে বেরোবার আগে নিবারণ যে কলতলাটার দিকে হঠাৎ আসতে পারেন, এ আমাদের কল্পনার বাইরে ছিল। একেবারে সামনা-সামনি হাতে নাতে ধরা পড়া। সুস্বাদু কাটলেটের উপরে কৃষ্ণদাসী সবেমাত্র কামড় দিয়েছে, সে-মুহূর্তে নিবারণের আবির্ভাব। কাটলেটের সুগন্ধ তাঁর জানা ছিল।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে নাকি এ সব একেবারেই নিষেধ। তার ওপর আবার এসব বাইরের দোকানের জিনিস, যা ছুঁলে গঙ্গাস্নানে যেতে হয়। তাঁরা স্বামী স্ত্রী মিলে অত্যন্ত কঠোর ব্রত পালন ক'রে থাকেন। আজ সমস্তটাই অশুচিতে ভ'রে উঠলো। কিন্তু প্রচণ্ড আক্রোশ আর উত্তেজনা সত্ত্বেও নিবারণ কিছু বললেন না,—সামনে ভাগ্নেবৌ! তিনি একবার তাকালেন আমার দিকে,—আমার হাতে ঠোঙ্গাটা ; পরে তাকালেন কৃষ্ণদাসীর দিকে। তারপর যেমন এসেছিলেন তেমনিই চ'লে গেলেন।

ভাগ্নেবৌ স্তব্ধ, কৃষ্ণদাসী আড়ষ্ট, আমি হতবাক। নিষিদ্ধ ভোজনের ফলে যে-ধর্মচ্যুতি ঘটলো, তা'র প্রায়শ্চিত্ত হবে কিসে? সে যে ভয়াবহ পরিণাম!

পরদিন সকাল থেকে কৃষ্ণদাসীকে আর দেখা যাচ্ছিল না। ভাগ্নে, ভাগ্নেবৌ, সৎমা এবং পরিশেষে নিবারণ নিজে এসে আমাদের কাছে বিদায় নিলেন। আমাদের মালপত্র গরুর গাড়ী বোঝাই হয়ে চলেছে। আমার চোখ ছিল এখানে ওখানে। বুঝতে পাচ্ছি কৃষ্ণদাসী আজ শোবার ঘর থেকেই বেরোয়নি।

কেন বেরোয়নি সে জবাব এক ফাঁকে নিজেই এসে দিল কৃষ্ণদাসী। আমাদের বিদায় ক'রে দিয়ে নিবারণ তেল সেবা করতে গিয়েছেন কলতলায়, সেই দুর্লভক্ষণে আমার ভিতরের সাপটা আবার এলো ঘুরে ফিরে মাথার মণি খুঁজতে। ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো কৃষ্ণদাসী, এবং পাছে গলার আওয়াজ করলে নিবারণ শুনতে পান, এজন্য হঠাৎ গায়ের কাপড় সরিয়ে দিয়ে সে বললে, দেখে যাও! এ শাস্তি পেয়েছি মহাপ্রভুর হাত থেকে। এ তাঁর প্রেমের চিহ্ন!

ব্যাধের বান বিদ্ধ হয়েছে একটির পর একটি রক্তিম শ্বেতবর্ণ রাজহংসীর সর্বাঙ্গে। গলায় পিঠে হাতে বুকে কালশিরার দাগ। আমি শিউরে উঠলুম। ইশারায় প্রশ্ন ক'রে জানতে চাইলুম কি জন্য তা'র এত বড় শাস্তি!

শূন্য মহলের দিকে চেয়ে কৃষ্ণদাসী সরে এসে আমার কানে কানে বললে, চলে যাও! গুরুর আদেশ, কিছু বলতে নেই!

জল ঝরছিল তা'র চোখে। তাকালুম তার ভিজা মুখখানার দিকে। কিন্তু সেই

অনর্গল অশ্রুটা কিসের, আজকে তার কৃষ্ণদাসী সে কথা বলতে পারলো না। সে-অশ্রুর ভাষা অশ্রুত থেকে গেছে।

রুদ্ধ বিষশ্বাস নিয়ে সাপটা বেরিয়ে চলে গেল মাঠের দিকে। পিছন ফিরে আর আমি দেখিনি সেই দুটো প্রেমাশ্রুভরা চোখ।

ইতিহাসটুকু মাত্র দেড় বছরের, তবু ওতেই যেন অনন্তকালের পায়ের চিহ্ন থেকে গেছে। সে যাই হোক, ঠিক পঁচিশ বছর পরে আবার সেই পল্লীতে একবার পদার্পণ করেছিলুম! তার কথাই বলি।

নিবারণ বোরেগীর বাড়ী ছেড়েছিলুম,—বেশ মনে পড়ছে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম মহাযুদ্ধের সেই আমি,—এবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালে উত্তীর্ণ হয়ে এসে পড়েছিলুম ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে। সেদিন সরস্বতী পুজো। হঠাৎ ডাক এলো কলিকাতার সেই আমার প্রাচীন পল্লীর কোনো একটি নবপ্রতিষ্ঠাতা বিদ্যালয়ের থেকে। স্কুলে নাকি সারস্বত সম্মেলন,—সেখানে যদি আমি যোগদান করি তবে স্কুল প্রতিষ্ঠিত প্রধান শিক্ষক মহাশয় অতীব প্রীত হন্। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নাকি উপস্থিত থাকবেন, এবং আমার আদর অভ্যর্থনার কোনোরূপ ত্রুটি হবে না,—একথা প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন। আমার অনুমতি পাবামাত্রই মোটর এসে আমার বাড়ীর দরজায় দাঁড়াবে। শুধু আমার অনুমতির অপেক্ষামাত্র।

মোটর আমাকে নিয়ে গিয়ে পেঁছিলো সেই বিদ্যালয়ের দরজায়। ফুল লতা পাতায় গেট্ তৈরী, শালুর উপর তুলোর অক্ষরে সারস্বত সম্মেলনের ঘোষণা। মোটর থেকে নেমে আসতেই আশেপাশে শঙ্খধ্বনি। প্রধান শিক্ষক মহাশয় মস্ত এক মালা এনে আমার গলায় পরালেন। ছেলেমেয়েরা এসে ঘিরে দাঁড়ালো চারিপাশে। আমার কপালে দিল শাদা চন্দনের ফোঁটা। আসর বসছে মস্ত বড়।

সভাপতি বরণের পর যথারীতি কার্যারম্ভ। এরপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ। সে-অভিভাষণের প্রথমারম্ভেই আমার প্রতি স্তুতিবাদ। আমি তাঁর দিকে মুখ তুলে তাকালুম এতক্ষণে। আমার সর্বাঙ্গ যেন পলকের মধ্যে হিম হয়ে এলো। কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে দেখি, ছোটবেলাকার সেই নীলুর বাবা,—সেই জীবন দাস! সেই দাড়ি, সেই ঝাঁকড়া মাথার চুল,—তবে চুলদাড়ি পেকেছে, চোখে চশমা উঠেছে, দুটি দাঁত পড়েছে। চোখে মুখে সেই হিংস্রতা নেই, আছে শান্তি, শ্রদ্ধা-অনুরাগ, আছে অপ্রত্যাশিত উদারতা।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বলে চললেন, "তোমার শুভাগমনে আমাদের এই বিদ্যালয় আজ পূতপবিত্র, তোমার সান্নিধ্য আমাদের জীবনে পরম গৌরবের বস্তু,—হে সৌম্য, তুমি আমাদের সকলের সকৃতজ্ঞ নমস্কার গ্রহন করো!"

মনে পড়ছে সেই সেকালের পুকুর ভরাট করা ছোট্ট মাঠ, সেই মাঠের আশেপাশে ঝাঁটানো জঙ্গাল,—সেইখানে যমদূতের মতো তেড়ে আসতো জীবন দাস। সে-জীবনটা কি সত্যি নয়? এ জীবনটা কি মিথ্যে নয়?

আমি মুখ তুলে তাকালুম অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির প্রতি। তিনি বলে চললেন "হে নিরভিমান, তুমি খ্যাতির মোহকে জয় করিয়াছ, তুমি প্রতিষ্ঠার লোভকে দূরে ঠেলিয়াছ,—"

কে বললে? তাকালুম জীবন দাসের দিকে। রাসযাত্রার সেই পুতুলগুলি,—কী মোহ রেখে গেছে তারা আমার মানসলোকে! বৃন্দাবনের সেই কালীয়দমনের দৃশ্য, কংসরাজার সেই হিংসার ছবি, শ্রীরাধার সেই লাঞ্ছিত মুখ! লোভকে জয় করেছি? মিথ্যা কথা! এখনো লোভ আছে যদি সেই বাল্যকাল আর একবার ফিরে পাই,— যদি ফিরে পাই সেই জীবন দাসের একটুকু স্নেহ, যদি ফিরে পাই নীলুর সেই বন্ধুত্ব! এ জীবন দাস সে নয়, কিন্তু এ আমি সেই আমি! সেই আমি বিবর্তিত এই আমির মধ্যে। আমি সেই মোহাতুর, লোভাতুর, ক্ষুধাতুর। সে ছিল নালা, এ হোলো নদী,— সে জল মিলেছে এই জলে!

জীবন দাস অভিভাষণ শেষ ক'রে বসলেন আমার গায়ে গায়ে। আমার সঙ্গে একটু ছোঁয়া, একটু অন্তরঙ্গতার লোভে। আমার সান্নিধ্যে তাঁর নাকি গৌরব, তাঁর আনন্দ। কেমন লাগলো অভিভাষণটি,—তিনি অতিশয় আড়ষ্টভাবে উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলেন।

জবাব দিতে পারলুম না, কেননা কণ্ঠ ছিল বাষ্পাচ্ছন্ন। অভিমানকে কি জয় করেছি, আক্রোশকে কি পেরেছি ভুলতে? একথা কি উপলব্ধি করেছি, কোনো মানুষই ছোট নয়!

মোটরে উঠবার সময় জীবন দাস একটি ফুলের তোড়া আমার হাতে দিয়ে আনত হয়ে করজোরে নমস্কার জানালেন। আমি যেন তাঁদের এই ক্ষুদ্র বিদালয়টিকে ভুলে না যাই।—

দিদিমার বাড়ীতে ফিরে এসে আবার পেয়েছিলুম সেই প্রাচীন পরিচিত মধুর জীবন। ছোটবেলাকার বোধশক্তিহীন প্রাণের সমস্ত চিহ্ন এখানে জেগে রয়েছে। সেই বৈশাখের দুপুরে ফেরিওয়ালা হেঁকে চলে যায় আমাদের পুরোনো পাড়ার সরু পথ দিয়ে। শিশুকালের চক্ষে ওই পথটাবেই মনে হোতো কত দীর্ঘ,—যেন ও-পথটা হারিয়ে গেছে কোনো তেপান্তরে গিয়ে। পথটা নির্জন—সেই ছায়াচ্ছন্ন নির্জন পথে বয়ে যেতো যেন তন্দ্রাজড়ানো স্নিগ্ধ হাওয়া। সেই হাওয়ায় ভেসে আসতো দূর আকাশ থেকে চিলের ডাক, ভেসে আসতো বহুদূর থেকে ইঞ্জিনের বাঁশীর সুর। ঘর থেকে বাইরে চলে যাওয়ার জন্য কে যেন আমাকে স্থির থাকতে দিত না।

কিন্তু কোথায় যাবো? আছে কি কোনো জানা পথ? আছে কি সে-পথের কোনো নির্দেশ। ওই দীর্ঘ গলি-পথ উত্তর দিকে বেরিয়ে খ্রীষ্টানদের গির্জা পেরিয়ে চলে গেছে গোয়াবাগানের দিকে, আর দক্ষিণের দিকে গিয়েছে কাঁসারিপাড়া আর ঠনঠনে

ছাড়িয়ে পটলডাঙ্গার দিকে। তারপর—তারপর আর আমার কল্পনা ছোটেনা। আমার পথ-হারানো মন ঘরের খুঁটিটা আঁকড়ে ধ'রে যেন থরথর ক'রে কাঁপতো।

এমন সময় একদিন ডাকপিওন এসে আমার নামে একখানা পোস্টকার্ড হাতে দিয়ে গেল। চিঠি? আমার নামে? সমস্ত শরীরের ভিতরে বিদ্যুতের একটা ঝলক যেন প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে গেল। আমার জীবনে সেই প্রথম চিঠি পাওয়া। মহাশূন্যোলোকের অস্থির এক পাখী যেন বিশাল সুদূরের সংবাদ নিয়ে আমার হাতে এসে উড়ে বসলো। আনন্দে অথবা কান্নায় আমার গলা বুজে এসেছিল।

চিঠি লিখেছে বলাই শিবপুর থেকে! গরমের ছুটিতে স্কুল বন্ধ, তাই সে গিয়েছে মামারবাড়ী। আমি নাকি তার একমাত্র বন্ধু, আমাকে না দেখে সে তিষ্ঠতে পারছে না। ওখানে সে ফুটবল খেলে, আর এই সেদিন দুটো গোলা পায়রা পুষেছে। একদিন লুকিয়ে সে কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

এক পয়সা দামের সরু পোস্টকার্ড, ছাপাগুলো একটু বেগুনী রংয়ের,—ডানপাশে পঞ্চম জর্জের চেহারা। সেই চিঠি ছিল আমার মন্ত্র, সেই চিঠি ছিল অবারিত মুক্তির প্রথম ছাড়পত্র। আরো কিছু ছিল সেই চিঠিতে—ছিল আমার ভ্রমণের সঙ্কেত। ঘরের থেকে বাহির, সে বাহির অনেক বড়। বিধিনিষেধের বাইরে যে-জীবন—সে জীবনের আস্বাদ আমার দরকার ছিল। স্নেহ-মোহ-বন্ধনের অতীত যে মহাজীবনের ডাক—তার অচ্ছেদ্য আকর্ষণ আমাকে টেনে নিয়ে যেতো নিমতলা ঘাটের একপ্রান্তে অশ্বত্থতলার ছায়ায়,—যেখানে প্রাচীন অশ্বত্থের একটা ডাল ঝুলে পড়েছে গঙ্গার জলে,—স্রোতের তাড়নায় সেই ডালের পাতাগুলি থরথর করে। থাকতো আশেপাশে মাঝিমাল্লা, এসে পৌঁছতো কত দেশের কত মহাজনী নৌকা; স্টীমারের সাইরেন বেজে যেতো মাঝগঙ্গায়,—খেয়া পারাপার কত হয়ে গেছে পাল তুলে নিয়ে। আমার মন প্রত্যেকটি নৌকা ধ'রে চলা-ফেরা করতো এপার থেকে ওপারে।

একদিন বলাই বললে, চল্ মাণিকতলার খাল পেরিয়ে যাবো বাঘমারির দিকে। কিন্তু সাবধান, ওদিকে ডাকাতের ভয়,—সন্ধ্যার পর আলো জ্বলে না। ওই পথ দিয়ে গেলে পায়রাটুনি, তারপর উল্টোডিঙ্গি,—সেখানে মাথার উপর দিয়ে রেলগাড়ী যায়। পথ হারালে কিন্তু আর কোনদিন বাড়ী ফেরা যাবে না।

মাঠ দেখেছিস কখনো? কখনো দেখেছিস ধানের ক্ষেত? আম জামের বাগান? তাল আর তেঁতুলের বন?

গলা কাঁপতো জবাব দিতে। বলতুম, না।

আমার দাদামশায়ের ধান ক্ষেত আছে হাওড়া জেলায়। যাবি একদিন সেখানে? সেখানে কিন্তু বাঘের ভয়! বনে শিয়াল ডাকে। ডাক শুনেছিস শেয়ালের?

এবারেও বলতুম, না।

বলাই বলতো, এমন বোকা তুই? তোর কিছু হবে না!

বলাইয়ের চোখে মুখে যেন বিশ্বপৃথিবীর অভিজ্ঞতা,—যেন সে জ্ঞানের ভাণ্ডার।

আমি তাকে শ্রদ্ধা জানাতুম সমস্ত হৃদয় দিয়ে। সমবয়সী হলেও সে যেন আমার চেয়ে হাজার বছরের বড়।

বড় হয়ে কলকাতায় ঘুরতে হবে তা জানিস? অনেক বড় কলকাতা মনে রাখিস। চৌরঙ্গী দেখেছিস? দেখেছিস বাগবাজার।

সত্যি দেখা হয়নি কলকাতা! আজো কি সব পথ ঘুরেছি, সব গলি মাড়িয়েছি? প্রত্যেকটি আঁকাবাঁকা পথ হোলো এক একটি চেতনার মতো। কত রহস্যে নিবিড়, কত ছোট ছোট জীবনের কাহিনী।

ভোরের মধুর বাতাস উঠেছে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে। বসন্তের পাতাঝরা প্রায় শেষ হয়ে এলো পথের দুই পাশে। পাখীরা ঘুম ভেঙে উঠেছে, কিন্তু রোদ ওঠেনি তখনও। দীর্ঘ বিস্তৃত পথ উত্তর দিকে যেন অজানা রহস্যের দিকে চ'লে গেছে। দুই পাশে তখনও রয়েছে প্রান্তরের ভগ্নাংশ, তখনও ওখানে হাল বলদ নিয়ে চাষীদের দেখা পাওয়া যেতো। পথটা পায়েহাঁটা। তখনও যানবাহনের রেওয়াজ হয়নি। কিন্তু আর যাবো কতদূরে? অন্ধ আকর্ষণ আর কতদূরে টানবে এমন ক'রে? সুতরাং নিয়তির হাত ছাড়িয়ে যেন এক সময় পালিয়ে আসতুম।

শ্যামবাজারের মোড়ে তখনও আধুনিক সভ্যতা গ'ড়ে ওঠেনি। দু'একটি চিড়ে-মুড়কীর দোকান, আর অবাঙ্গালী ফেরিওয়ালাদের এক একটি কেন্দ্র। পথের দু'ধারে খোলার খাপরা, সেখানকার বস্তির মেয়ে পুরুষেরা আসে বড় রাস্তার ধারে জল নিতে। দেশবন্ধু পার্কের দিকটা ছিল জলামাঠ, মাঠের প্রান্তে উল্টোডিঙ্গির খাল—সেদিকে যেতে ভয় করতো দিনের বেলা। নাবালক দলের অসমসাহসিক অভিযান হোতো ওই দিকে। শ্যামবাজারের পশ্চিম দিকটায় এলে তবে সভ্যজগতের দেখা পাওয়া যেতো।

বলাই বললে, বালীগঞ্জে যাবি একদিন?

বললুম, সে কোন্ দিকে?

বিজ্ঞের মত হাসি হেসে সে বললে, কলকাতা কিন্তু সেখানেই শেষ। তারপর সুন্দরবন।

তেলের আলো জ্বলতো মনোহর পুকুরের পথে! দু'ধারে দুর্গম বনময় জঙ্গল জলা। কোথাও কোথাও মুড়ি আর ছোলা-ভাজার দোকান। কালীঘাট পর্যন্ত আসা যেতো সাহস ক'রে। দক্ষিণ দিকটা জলাময় অন্ধকার বন। এধারে ওধারে ছোট ছোট গ্রাম্য বস্তি। মহানির্বাণ মঠ পর্যন্ত এসে মনোহরপুকুরের সরু পথ কোন্‌দিকে যেন হারিয়ে গেছে। বলাই বলতো, আর নয় কিন্তু, আর কিছু আমি চিনিনে।

ইচ্ছা হোতো আরো যাই। যাই সুন্দরবনের দিকে। যাই সেই হিংস্র অরণ্যালোকে, যাই গঙ্গাসাগরে,—যাই সেখানে—যেখানে আজো কেউ যায়নি। কিন্তু বেলা প'ড়ে এলো—মনোহরপুকুরের বনের গাছপালার মাথায় পড়ন্ত রোদ চিকচিক করছে। অবেলার দিকে অজানা পথে পা বাড়াতে আর সাহস হয় না। এখনও হাঁটতে হবে দু'ঘণ্টা তবে বাড়ী পোঁছতে পারবো।

নতুন বালীগঞ্জের পত্তন তখনও হয়নি, তখন রাসবিহারী এভেনু কল্পনার অতীত। দুর্গম বনময় গ্রাম, এলোমেলো পথ, সেই পথ ধ'রে যেতো পুরনো ছ্যাকড়াগাড়ী—সেই গাড়ী বালীগঞ্জ স্টেশন থেকে পালপার্বণে যাত্রীদের নিয়ে পেঁছে দিত কালীঘাটে। সেই পথ ধ'রে সোজা ফিরে আসা, কালীঘাট ছাড়িয়ে ভবানীপুরে এসে পেঁছতে পারলে তবেই দুর্ভাবনাটা যায়। এক সময়ে পথ ফুরিয়ে যেতো, কিন্তু পথের নেশা ফুরতো না। তন্দ্রাচ্ছন্ন চক্ষে ছবি এঁকে যেতুম মনে মনে। সমস্ত চেতনাটার উপরে অসংখ্য পথের দাগ ধ'রে আমার কল্পনা ছুটে যেতো—যার কোন আদি অন্ত নেই।

মামা একদিন বাড়ী ফিরে এসে বললেন, এবারে আর সাতশো রাক্ষুসীর ঘরে হাঁড়ি চড়বে না—ব'লে রেখে দিলুম।

দিদিমা বললেন, অলক্ষণের কথা শোনো! ব'ল কেন, কি হয়েছে শুনি?

মামা চোখ-মুখ বিকৃত ক'রে বললেন, কলিযুগের শেষ হবে এবার! বড়বাজারে নবগ্রহের যজ্ঞ বসেছে, খবর কি কিছু রাখো? মহামারী, জলপ্লাবন, ভূমিকম্প। তোমাদের পাখীর বাসা ভাঙ্গবে এবার।

বাসা ভাঙ্গলেই তোর মন ঠাণ্ডা হয়, কেমন? আজ ক'ছিলিম টেনে এসেছিস, শুনি?

মামা এবার চেঁচিয়ে বললেন, বাঙ্গালী পল্টন চলেছে যুদ্ধে, খবর রাখো?

দিদিমা বললেন, কোথায় যুদ্ধ?

মুখ বেঁকিয়ে মামা বললেন, ইউরোপে—তোমার বাপের বাড়ীতে! ইউরোপ কোথায় জানো?

দিদিমা মুখ তুলে চেয়ে রইলেন। মামা বললেন, এ যুদ্ধে আর কাউকে বাঁচতে হবে না! সব আমি শুনে এলুম গোবর্ধনের দোকান থেকে। ছেলেপুলে রাস্তায় যদি বেরোয়, আমি বাঁচাতে পারবো না। হেদোর মোড়ে সব সেপাই ব'সে গেছে। টুঃ শব্দটি করেছো কি একেবারে দ্বীপান্তরে চালান্ দেবে।

মামা আরো ব'লে দিলেন, এ যুদ্ধে ইংরেজ যদি হারে তবে বংশে বাতি দিতে আর কেউ থাকবে না। দেশে অরাজকতা আর প্রলয়। আর যদি জেতে, তবে দেখে নিয়ো তোমার মেজজামাইয়ের মতন আমিও রায়-বাহাদুর টাইটেল্ পেয়ে যাবো।

মামা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

সে-রাত্রে আমার চক্ষে ঘুম রইল না। ইউরোপ শব্দটা আমাকে পেয়ে বসেছিল। শিশুপাঠ্য ভুগোলে ইউরোপের মানচিত্রটা থাকে বাঁ দিকে। তন্দ্রাচ্ছন্ন কল্পনায় আমি তখন বেরিয়ে পড়েছি ভারতবর্ষের থেকে। চলেছি আফগান ইরান পেরিয়ে, চলেছি আরব আর ভূমধ্যসাগর অতিক্রম ক'রে—চলেছি সাত সমুদ্র তেরো নদী উত্তীর্ণ হয়ে। চলেছি দূর থেকে দূরে। আমার চোখে ঘুম নেই।

বলাই—আমার সহপাঠী—তার হাত থেকে সেই আমার প্রথম চিঠি পাওয়া। সেই চিঠি এনেছিল পথের সংবাদ, পথ হারাবার নেশা, পথ ভুলে যাবার মোহ। ঘরে যারা মানুষ, ঘর তাদেরকে বেঁধে রাখে। ঘরে সুখ আছে, মুক্তির আনন্দ নেই। সেই

বালে কলকাতা ছিল অনেক বড়—যেন আদি-অন্ত হীন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মহানগর হয়ে এসেছে ছোট। কথা বইতে বইতে শহর ফুরিয়ে যায়।

বলাই বলতো, এ-পথে হাঁটা হোলো, ও-পথটা বাকি রইলো—এ হলে চলবে না। সব রাস্তা, সব গলি পেরিয়ে যাওয়া চাই।

ভুগোলের শিক্ষক বলতেন, ট্রেনে যদি বিলেত যাওয়া হয়, তবে কোন্ পথে?

মামা বলতেন, বল্ দেখি পগেয়াপটি কোন্ দিকে? কোন্ দিকে জানবাজার? গ্যাঁড়াতলা কোথায়?

বলতে পারতুম না, অবাক হয়ে থাকতুম। কতটুকু পথ জানি, এটি বড় কথা নয়। কতখানি পথ অপরিচিত রয়ে গেল সেইটিই আসল কথা। ক্ষুধা জেগে ওঠে মনে মনে,—রেলপথ ট্রেনের চাকার নীচ দিয়ে ক্ষুধার্ত মন ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে, খরস্রোতা গঙ্গার তরঙ্গে তরঙ্গে চলে, আকাশ-পথের উড্ডীন পাখীর ডানার তলায় তলায় ছুটে যায়। মন যায় দুর্গম অবণ্যলোকে, দুরারোহ পর্বতের চূড়ায় চূড়ায়, ঝড় আর ঝঞ্ঝায় বিক্ষুব্ধ অন্ধকার সমুদ্রের বিভীষিকায়। এই সুবিশাল প্রাচীন ভারতের সর্বত্র পিপাসার্ত মন প্রদক্ষিণ ক'রে বেড়ায়।

কিন্তু বলাইয়ের সেই প্রথম চিঠিই হোলো মূলমন্ত্র—প্রথম প্রেরণা। বলাই এখন মস্ত উকীল।

আমার দ্বিতীয় উদ্দীপনা ছিল শ্রীমান নন্দদা। তাঁর কথাও বলবো। তার চোখ দুটো লাল। বড় বড় তারা দুটোয় রক্তের দাগ লেগে থাকতো। কবে যেন কোন্ ডাক্তার বলেছিল, এখন থেকে যদি চোখের চিকিৎসা না করা হয় তবে ভবিষ্যতে চোখ দুটো নষ্ট হযে যেতে পারে।

খুনী মাসিমা কেঁদে উঠলেন। তাঁর ওই একটিই ছেলে। ওকে নিয়েই তিনি বিধবা হয়েছেন আজ বছর পাঁচেক হোল। খুনী মাসিমা ডাক্তারের কথা শুনে প্রথমে কাঁদলেন চেঁচিয়ে। তারপর কাঁদলেন ডুকরে-ডুকরে। তারপরে কাঁদলেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। কিন্তু যে ব্যক্তির চোখের অসুখ, সে বন্ধুবান্ধব নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে চড়িভাতি করতে গেল, কিংবা ঘুড়ি আর লাটাই নিয়ে ছাদে উঠলো, কিংবা পাড়ার ছেলের কাছে সাইকেল বাগিয়ে নিয়ে গেল তৎনবার বালীগঞ্জের দিকে বেড়াতে। আমরা রইলুম খুনী মাসিমার আশে পাশে! সমস্ত রাত্রি ধ'রে তিনি বারান্দার ধারে পড়ে অত্যন্ত করুণ নিঃশ্বাস ফেলেন, একা ব'সে থাকলে তাঁর চোখ বেয়ে জল পড়ে,—আমরা কেউ কাছে গিয়ে বসলে তিনি মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চ'লে যান্। তাঁর নিজের ছেলেটির যদি দুই চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়, তবে উপরের দিকে তাকাতে তাঁর ভালো লাগবে কেন?

ডাক্তার বলেছিলেন, চোখ দুটোর রীতিমতো চিকিৎসা না হওয়া পর্যন্ত খুব বেশী পড়াশুনো করাটা ভালো হবে না। ওতে নাকি দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি হওয়া সম্ভব।

খুনী মাসিমার ছেলের নাম নন্দলাল! আমার চেয়ে বড়। নন্দদা এর আগে নীচের ক্লাশে ফেল করেছিল বার দুই! ইস্কুল যাবার নাম ক'রে সে যেত গঙ্গায় সাঁতার কাটতে,—সঙ্গে তা'র থাকতো গুলু ওস্তাগর লেনের বন্ধু—জলিল আর কেষ্টা—ওরা তিনজনে মিলে হাফপ্যাণ্ট প'রে সারাদিন ধ'রে গঙ্গায় সাঁতার কাটতো, আর বাড়ী এসে পৌঁছতে ঠিক বেলা চারটের সময়ে যখন ইস্কুলের ছুটি হয়। হাতে বই খাতা, পরণে ধুতি আর জামা। চোখ দুটো লাল! সেই লাল চোখ দেখে খুনী মাসিমা আবার ডুকরে কেঁদে উঠতেন। বলতেন, পড়াশুনো করতে গিয়ে আমার ছেলের চোখ দুটো যদি যায়, তবে নাইবা হোলো পড়াশুনো! চোখ যদি বাঁচে, তবে ভিক্ষে করেও খেতে পারবে! নন্দ, বাবা—বই-খাতা তুই আর ধরিসনে!

খুনী মাসিমার কান্না দেখে নন্দদা চোখ পাকিয়ে ব'লে উঠতো, একজামিন্ দিতে হবে না? আমার হয়ে তুমি পাস করবে? লেখাপড়া ছাড়লে খেতে দেবে কেউ?

নন্দদার নাকটা টেপা—চোখ দুটোর সঙ্গে সমতল। কিন্তু বিদ্যার প্রতি তা'র এমন নিবিড় অনুরাগ দেখে খুনী মাসীমা আবেগে অধীর হয়ে আঁচলে চোখ মুছতেন। আমি জানতুম ইস্কুল না গিয়ে নন্দদা রাস্তায় রাস্তায় গুলি খেলে, আর লাট্টু ঘোরায়; আমি জানতুম জলিল আর কেষ্টর সঙ্গে এমন সব জায়গায় সে আনাগোনা করে আর তাস খেলতে ব'সে যায়, যেখানে কখনো যেতে নেই! নন্দদা কোত্থেকে যেন টাকা আনে, আর বন্ধুবান্ধব নিয়ে খাবারের দোকানে ঢোকে, কিংবা গাড়ীভাড়া দিয়ে টিকিট কিনে খেলা দেখতে যায়। লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে থিয়েটারেও যেতে দেখেছি। কিন্তু এ সব খবর আমার মুখ দিয়ে বেরোলে আর রক্ষে নেই। নন্দদার নামে যদি কা'রো মুখ থেকে নিন্দে রটে, তবে খুনী মাসিমা চিৎকার ক'রে তা'র ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন—এই ছিল ভয়। সবাই জানতো, লেখাপড়ায় নন্দদার এতটুকু মনোযোগ নেই, এবং পাড়ার অনেকগুলি ছেলে নন্দদার দলে মিশে একেবারে নষ্ট হতে বসেছে। পাশের বস্তির পিছনে গিয়ে হাওয়া-গাড়ী-মার্কা সিগারেট খাওয়া, মতি মিত্তিরদের বাগানে গিয়ে লুকিয়ে ময়লা তাস সাজিয়ে জুয়া খেলা, বেষ্টুদের ঘরে গিয়ে হারমোনিয়ম বাজানো—আর নয়ত এক একদিন অনেক রাত পর্যন্ত থিয়েটার দেখে বাড়ী ফেরা! এ সমস্ত কথা যদি কখনো খুনী মাসিমার কানে উঠতো, তবে তিনি চিৎকার করতেন। বিধবার এক ছেলের বিরুদ্ধে পাড়াপ্রতিবেশী সবাই যে একজোট হয়েছে, এই সত্য আবিষ্কার করতে তাঁর এক মিনিটও দেরি হোতো না। আমরাও অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করতুম।

নন্দদার চোখের চিকিৎসা হয় না, কিন্তু খুনী মাসিমা ছুটে যান গোয়াবাগানের শীতলা তলায়, কাঁসারিপাড়ার ঠাকুর বাড়ীতে, ঠনঠনের কালীতলায়, আনন্দময়ীর মন্দিরে,—আর নয়তো কালীঘাটে জোড়া পাঁঠা মানৎ করতে। বনের পশুপক্ষী কেঁদে যায় খুনী মাসিমার দুঃখে। গরীবের ছেলে, মাথার ওপর কেউ নেই, ভবিষ্যতের

সংস্থান নেই, উপার্জন ক'রে খাওয়াবার মতন মানুষ নেই,—এর ওপর চোখ দুটি যদি নষ্ট হয়ে তবে মাতাপুত্রে দাঁড়াবে কোথায় ?

খুনী মাসিমা কেঁদে কেঁদে অন্ধ হন্। অন্নজলের দিকে তাঁর রুচি থাকে না, ঘরকন্নার প্রতি তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন, পরিবারস্থ সকলের প্রতি তাঁর ভ্রুক্ষেপও নেই,—মুখের উপরে কাপড় মুড়ি দিয়ে তিনি এক কোণে পড়ে থাকেন। সমস্ত বাড়ীটায় অশান্তি আর উদ্বেগ যেন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

নন্দদা গিয়ে কাওরাপাড়ার বস্তিতে ঢোকে। সেখানে পাঁচু পালের সঙ্গে ব'সে তুবড়ী আর ফানুস তৈরী করে, আর নয়তো সবাইকে নিয়ে ব'সে বটতলার বই পড়তে পড়তে হেসে খুন হয়। আমি যাই অনেক সময় নন্দদার পিছু পিছু, তবে আমার ডিগডিগে চেহারাটার জন্য শাস্তির ভয় ছিল প্রচুর। পাঁচু পাল নন্দদাকে পয়সা জোগাড় ক'রে আনতে বলে। ওরা ঝুপসি ঘবের মধ্যে ব'সে বিড়ি টানতে থাকে।

ঘুড়ি লাটাই নিয়ে নন্দদা যখন ছাদে উঠে, খুনী মাসিমা যান্ তার সঙ্গে সঙ্গে। আমি লাটাই ধরি, নন্দদা ঘুড়ি ওড়ায়, আর ছাদের সিঁড়ির শেষ ধাপটির ওপর ব'সে খুনী মাসিমা ঘুড়ির দিকে তাকিয়ে কাঁদেন। আমি ভাবতুম তিনি কাঁদেন কেন। একদিন খুনী মাসিমা এগিয়ে এসে নন্দকে ডাকলেন,—'নন্দ, বাবা, ঘুড়িটে কি ভালো ক'রে দেখতে পাচ্ছিস ?

নন্দদা তখন তিনকড়ি চাটুজ্যের ঘুড়িব সঙ্গে প্যাঁচ খেলছিল। অন্যমনস্কভাবে বললে, হ্যাঁ, একটু একটু পাই।

ব্যস !—কেঁদে উঠলেন খুনী মাসিমা, মধুসূদন, নারায়ণ ! তুমি বাছার চোখ দুটি রেখো বাবা ! সিদ্ধেশ্বরী কালীকে আমি সোনার চোখ গড়িয়ে দেবো ! নন্দ, বই পড়তে কি খুবই কষ্ট হয়।

আঃ তুমি যাও এখান থেকে !—নন্দ কঠিন লাল চক্ষে খুনী মাসিমাকে ধমকে ওঠে। তার চোখের তারা দুটোর নীচে শাদা অংশটায় রক্তের রেখা দেখা যায়। তারপর বলে, একশোবার বলেছি না যে, তেমন কষ্ট হয় না ! শুধু চোখ দুটো জ্বালা করে জল পড়তে থাকে, আর মাথা ঘুরে বমি আসে !

আঁৎকে ওঠেন খুনী মাসীমা ! বলেন, অ্যাঁ, কি বললি ?

বলবো আবার কি ? ঘ্যানঘ্যান ক'বো না এখানে ! লেখাপড়া করতে গিয়ে যদি মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে যাই, তা'তে তোমাদের ক্ষতি কি ? লেখাপড়া হলেই হোলো ! —ভো কাটা ! দুয়ো—দুয়ো—

তিনকড়ির ঘুড়ি কেটে গেছে। নন্দদা আনন্দে চীৎকার ক'রে ওঠে। পিছনে ফিরে দেখি, খুনী মাসিমা তখন আবার ডুকরে ডুকরে কাঁদছেন। নন্দদার সুগভীর অভিমানের কথা শুনে তাঁর বুকের মধ্যে সমুদ্র উথলে উঠছে। তিনি নন্দদার চক্ষুরত্ন দুটির জন্য মন্দিরে মন্দিরে ঠাকুরের পায়ের তলায় মাথা কুটছেন বটে, কিন্তু চিকিৎসা করবার চেষ্টা একবারও করেন নি, তাই নন্দদার এই অভিমান !

খুনী মাসিমা চোখের জল মুছে নীচে নেমে গেলেন।

পরদিন সকালে বহু চেষ্টার পর চারটি টাকা জোগাড় ক'রে খুনী মাসিমা নন্দদার হাতে দিয়ে চোখের ডাক্তারের কাছে পাঠালেন। আমাকে যেতে বললেন সঙ্গে। কিছুদূরে গিয়ে নন্দদা আমাকে এক মনোহারির দোকানের সামনে দাঁড় করিয়ে গেল ডাক্তার বাড়ীর দিকে। প্রায় পনেরো মিনিট। তারপর সে ফিরে এসে দু আনা খরচ ক'রে এক শিশি ভেসেলিন পমেড কিনলো, এবং রাস্তার কলের জলের সাহায্যে লেবেলটি তুলে ফেলে বাড়ীর দিকে চললো। আমাকে এক সময় শাসিয়ে রাখলো, খবরদার, আমার বিষয়ে কোন কথা তুই বাড়ীতে বলবিনে। এই নে, চার পয়সার দই খাস।

চারটি পয়সা নন্দদা আমার হাতে দিল। সেই পয়সা পেয়ে কেবল যে পরম কৃতার্থ বোধ করলুম তাই নয়। আমি ভাবলুম, এত বড় দাতাকর্ণও ভুভারতে নেই। বহুকাল পরেও দেখেছি, নন্দদা অপরের নাম সই জাল ক'রে অপরের নামের কোম্পানীর কাগজ ভাঙ্গিয়ে এনেছে, আর সেই টাকা দিয়ে কন্যাদায়গ্রস্ত বাপকে উদ্ধার করেছে।

যাই হোক, বাড়ী ফিরে আসতেই খুনী মাসিমা আলুথালু হয়ে ছুটে এলেন,— ডাক্তার কি বললে, নন্দ ?

নন্দদা নিঃশ্বাস ফেলে ধপ ক'রে মেঝের ওপরেই ব'সে পড়লো। সেই হতাশ মুখ দেখে মায়ের প্রাণ হাউ হাউ ক'রে উঠলো। নন্দদা বললে, চোখ নষ্ট হওয়ার চেয়ে আত্মহত্যা করা ভালো!

অ্যাঁ! আত্মহত্যে? কেন, বাবা? কি বললে ডাক্তার?

ডাক্তার বললে, তেমন আশা নেই! তবে অনেক দিন ধ'রে ওষুধ চালাতে হবে!— এই ব'লে সেই লেবেল তোলা পমেডের শিশিটা বা'র করলো।—পুনরায় বললে, চার টাকাই ডাক্তার নিল, আর এই ধার ক'রে ওষুধ এনেছি আড়াই টাকা! ওবেলা টাকা দিয়ে দিয়ো।

মেসোমশায় মারা যাবার আগে কিছু রেখে যাননি। সামান্য কিছু জামা কাপড়, কতকগুলো পেতল কাঁসা, গোটা দুই তিন বাক্স প্যাঁটরা, মাকড়ি নাকছাবি, বাঁধানো-শাঁখা-নোয়া এবং দড়িহার মিলিয়ে আন্দাজ শতখানেক টাকার সোনাদানা। তিন চার মাস ধ'রে নন্দদার চোখের চিকিৎসার পর দেখা গেল, চোখের উন্নতি তেমন কিছু হয়নি বটে, তবে মাসিমা সর্বস্বান্ত হয়েছেন। তিনি কালীঘাটে যে জোড়া পাঁঠা মানৎ করেছিলেন,—সেই ছাগলদুটি কিনতে গেলে অন্তত পাঁচ ছয় টাকা লাগবে বৈকি! কিন্তু সে টাকাও বর্তমানে যোগাড় করা আর সম্ভব নয়!

অবশ্য এই চার মাসের মধ্যে নন্দদার অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছিল। পাঁচু পাল নাকি তা'কে উপহার দিয়েছে সিল্কের পাঞ্জাবী আর রেশমী রুমাল; জলিল তা'কে নাকি দিয়েছে ফাউন্টেনপেন আর পামসু জুতো। কেষ্ট দিয়েছে দুই শিশি এসেন্স। নন্দদা মাথায় এতদিন ধ'রে লাগিয়েছে ভেসেলিন পমেড, আর আলবোর্ট কেটে টেরি বাগিয়েছে। তা'র রেশমী পাঞ্জাবীর পকেটে হাওয়াগাড়ী সিগারেটের বদলে কাঁচি সিগারেটের বাক্স আর দেশলাই খড়খড় করে। থিয়েটার দেখে সে বাড়ী ফিরে আসে অনেক রাত্রে। অনেক রাত্রি হ'লে কিন্তু অসুবিধা নেই, কেননা কৈফিয়ৎ দিতে

হয় না। সমস্ত দিনের বেলাটা সূর্যের আলোয় তাঁর দুই চোখে যন্ত্রণা হয়, রাত্রে অন্ধকারে বাগানে গিয়ে অনেকক্ষণ নিরিবিলি ব'সে থাকলে চোখ আর মাথা দুই ঠাণ্ডা থাকে।

মামা একদিন খুনী মাসীমাকে ডেকে বললেন, ওরে, তোর ছেলেকে দেখে এলুম পগেয়াপটির মোড়ে—গঁ্যাড়াতলা থেকে খানিকটা এগিয়ে—

কেন, সেখানে কেন?

গাঁটকাটার দলে ভিড়েছে যে!

আমার ছেলের মানে এত বড় বদনাম দিচ্ছ তুমি?—খুনী মাসিমা চীৎকার ক'রে উঠলেন,—তুমি নিজে কি? তুমি ঠকেয়েছ কত লোককে? কত লোককে ধাপ্পা দিয়ে টাকা মেরেছ? তোমার কোন্ গুণে ঘাট আছে?

মামা খানিকটা দাঁড়ালেন। পরে বললেন, হুঁ, আমার পাপের টাকায় খেয়ে-প'রে আমারই ওপর তম্বি! কেমন?

খবরদার।—ওধার থেকে দিদিমা চেঁচিয়ে উঠলেন। বললেন, আমার স্ত্রীধনে কেনা সম্পত্তি,—টাকা আমার!

তোমার টাকা!—মামা হাঁকলেন, ফলনা ভটচার্যির টাকায় তোমার গুষ্টি মানুষ হচ্ছে না? তোমার টাকা! কেন, দেশে উকিল মোক্তার নেই? আদালত নেই? হাইকোর্ট নেই?

দিদিমা তারস্বরে চীৎকার করলেন, মুখ সামলে কথা বলিস, ননস্যান্! এখনই গোঁসাইকলুকে খবর দিয়ে তোকে একেবারে গো-টে-হেল্ করে ছাড়বো! খবরদার!

কোনো ভাষার বর্ণমালার সঙ্গে বিন্দুমাত্র পরিচয় দিদিমার না থাকলেও তিনিও ইংরাজীতে কটূক্তি করতে পারতেন। কিন্তু মামা আর কোনো জবাব দিতে পারলেন না। কেন না ভীমকায় গোসাইকলু নামক সেই সমাজরক্ষক কুস্তীগীর হোলো দিদিমার অতি বাধ্য—সুতরাং তাঁর কথাটা স্মরণ ক'রে মামা আপাতত রণে ভঙ্গ দিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

নন্দদার চরিত্রের প্রতি এমন ভয়ানক কটাক্ষ শোনা ইস্তক খুনী মাসিমা মেঝের উপর প'ড়ে ডুকরে কাঁদছিলেন—এক সময় সহসা মুখ তুলে হাউ হাউ ক'রে বললেন, ছেলে যদি আমার মন্দ হয়েই থাকে, তবে মামার মতনই ভাগ্নে হয়েছে?

মামার মতন ভাগ্নে! মামা ভিতর থেকে একবারটি বেরিয়ে এলেন। পুনরায় বললেন, মামা গাঁট কেটেছে, কিন্তু ধরা পড়েনি কখনো! তোর ছেলে হোলো কাঁচা চোর! ধরা পড়লেই মরা—এই ব'লে রাখলুম! বলে কিনা, মামার মতন ভাগ্নে! রাম বলো! রামে আর রামছাগলে!

মামা আবার ঘরে ঢুকে তামাক টানতে বসলেন।

কিছুদিন পরে কোথা থেকে যেন ফিরে এসে নন্দদা হঠাৎ একদিন ঘোষণা করলো, সে বিদেশে যাবে!

বিদেশে!

খুনী মাসিমা সবেমাত্র হবিষ্যি করতে বসেছিলেন। সেদিন দ্বাদশী। তিনি আঁতকে উঠে ভাত ফেলে দৌড়ে এলেন। বললেন, কোথা যাবি বাবা? কোন্ বিদেশে, নন্দ?—তাঁর গলা কান্নায় আটকে গেল।

নন্দদা উত্তর দিল না। জামাকাপড় ছেড়ে বিছানায় উঠে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লো। খুনী মাসিমা কাছে এসে তা'র মাথায় হাত রেখে বললেন, নন্দ, কি হয়েছে বাবা? কোন্ দুঃখে যাবি বিদেশে? হ্যাঁ, বাবা, কথা বলছিসনে যে?

খুনী মাসিমা ফুঁপিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ পরে নন্দদা কণ্ঠে গভীর বেদনা নিয়ে বললেন, সকলের চক্ষুশূল হয়ে থাকার চেয়ে সকলের চোখের আড়ালে চ'লে যাওয়াই ভালো!

সন্তানের বেদনায় জননীর প্রাণ আকুল-ব্যাকুল হয়ে উঠলো। কেঁদে উঠে খুনী মাসিমা বললেন, তুই চক্ষুশূল হয়ে চলে গেলে আমি আর এখানে থাকবো মনে করেছিস? মা গঙ্গার কোলেও কি আমার ঠাঁই হবে না, নন্দ? কিন্তু তুই কোথায় যাবি, বাবা? নন্দ, আমার সাত রাজার ধন!

নন্দদা গভীর ও উদাস কণ্ঠে বললে, যাবো অনেক দূরে—জাহাজে চ'ড়ে সে দেশে যেতে হয়!

অ্যাঁ! জাহাজে! সমুদ্দুরের পথে!—খুনী মাসিমা ভাঙ্গা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন। বাড়ীর সমস্ত বাতাসটা যেন সেই ব্যথায় ও কাতরতায় ঘুলিয়ে উঠলো। তিনি অনেকটা যেন ভেঙ্গে পড়লেন বিছানার একপাশে। কাঁদলেন তিনি অনেকক্ষণ। তারপরে একসময় বললেন, কোন্ দুঃখে তুই সমুদ্দুর পেরিয়ে যাবি, বাবা? হ্যাঁরে, নন্দ?

নন্দদাও তরে মায়ের সঙ্গে কঁকিয়ে উঠলো, আমার জীবনের কি দুঃখ, তা তোমরা কি জানবে?

আমি জানবো না, তবে কে জানবে বাবা?

অনেকক্ষণ পরে নন্দদা বললে, যাকগে, আমাকে যেতেই হবে সে-দেশে। এদেশে লেখাপড়া হলো না,—সে দেশেই যাবো। যদি কোনোদিন অন্ধ হয়ে যাই, তবে সে-দেশের লোক কি আর আমাকে দয়া করবে না? আমার দুঃখ নিয়ে আমি চ'লে যেতে চাই!

সমস্ত দিন ধ'রে নন্দদা বিছানায় প'ড়ে রইলো, আর সমস্ত দিন ধ'রে খুনী মাসিমা সেই একভাবে কাঁদতে লাগলেন আর ছেলেকে কাকুতি করতে লাগলেন। অবশেষে যখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলো তখন নন্দদা বালিশের পাশ থেকে মুখ তুলে বললে, আমি কথা দিয়েছি জাহাজের ক্যাপ্টেনকে, তিনি আমার জন্যে টিকিট কিনেছেন। যদি তোমরা সবাই মিলে আমাকে যেতে না দাও, তবে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে, তা জানো?

বড় বড় চোখ মেলে নন্দদা মায়ের দিকে তাকালো। সেই চোখে নিশ্চিত আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত দেখতে পেয়ে খুনী মাসিমা শিউরে উঠলেন!

কী কান্না দীর্ঘ রাত পর্যন্ত। আমি নন্দদার পাশে শুয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছি। খুনী মাসিমার কাতর কান্না দেখলে বনের পশুপক্ষীও বোধ হয় কেঁদে যায়। মনে হচ্ছিল নন্দদার হয়তো চোখের অসুখ, কিন্তু মাসিমা যে একেবারেই অন্ধ! অজ্ঞান ব'লেই না অন্ধ! মা মাত্রেই বোধ হয় অন্ধ!

ডুকরে ডুকরে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে—খুনী মাসিমার সেই কান্নার আদি অন্ত নেই! ওদিকে জীবনের সমস্ত দুঃখ নিয়ে বালিশের তলায় মুখ গুজে প'ড়ে আছে নন্দদা! নন্দদা চিরকালের মতো নিরুদ্দেশে চ'লে যাবে! চাকরি যদি সেই দেশে কোথাও পায় ভালো, যদি না পায় তবে তা'র সমস্ত ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। পৃথিবীময় খুঁজলেও আর নন্দদাকে পাওয়া যাবে না।

রাত বোধ হয় দুটো বাজে। চারিদিক নীরব। বাড়ী সুদ্ধ সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার চোখেও ঘুম এসেছিল। এমন সময় খুনী মাসিমা আবার ককিয়ে উঠলেন, তবে কি কোনো উপায় নেই? তবে কি কাল ভোরে উঠে গিয়ে গঙ্গার কোলেই আমাকে ঝাঁপ দিতে হবে, বাবা?

নন্দদা প্রথমটা জবাব দিল না। নিশুতি রাত! ও ঘরে বড়দার বড় ঘড়িটার টিক-টিক শব্দ হচ্ছে। পাছে কোথাও কেউ শুনতে পায় এ জন্য গলা নামিয়ে একসময় নন্দদা বললে, আছে একটা উপায়, তুমি পারবে?

যেমন ক'লেই হোক পারবো, নন্দ! বাবা আমার!

নন্দদা বললে, হয় জাহাজে যাওয়া, আর নয়ত আত্মহত্যা, দুইয়ের একটা! কিন্তু একটা উপায় আছে এখনও!

খুনী মাসিমা অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করলেন, কি বল্? মন খুলে বল্?

পরে কিন্তু আমাকে দোষ দিয়ো না ব'লে রাখছি!

খুনী মাসীমার অশ্রুভরা দুটো চোখ জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো। বললেন, না দোষ দেবো না, তুই বল্!

নন্দদা বললে, কেউ যেন না জানে! আমার চারিদিকে এখন গোয়েন্দা। আমি নজরবন্দী। যদি না যুই, পুলিসে ধরে! তবে হ্যাঁ, ক্যাপ্টেনকে যদি শতখানেক টাকা ঘুষ দেওয়া যায়, তবে হয়ত টিকিটখানা বাতিল হ'তে পারে! তুমি কিন্তু একথা কোথাও প্রকাশ ক'রো না ব'লে দিচ্ছি। গোয়েন্দাদের কানে যদি ওঠে, তাহলে আমার তিন বছর জেল্!

খুনী মাসিমা সুদীর্ঘ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, না কোথাও বলবো না। কাল আত্মীয় কুটুম্ব মহলের দরজায় দরজায় হত্যে দিয়ে সন্ধ্যের আগে তোকে টাকা দেবো! ভয় কি তোর, নন্দ?

অন্ধকারে নিঃসাড়ে শুয়ে আমি হাসলুম। এ আমি জানতুম!

সেকালের ভট্চার্যিবাগানের সেই বত্রিশ নম্বর বাড়ীর গায়ে ছিল মস্ত পুকুর। আশপাশে ছিল জাম তেঁতুল আর কাঠচাঁপার জঙ্গল। সবাই জানতো সেই পুকুর-ঘাটে থাকতো যক্ষি বুড়ী, জলের নীচের থেকে উটে এসে বসতো সে ঘাটের সিঁড়িতে। ধুতরোর মতন তা'র শাদা চুল, ভয়ানক তার চোখেব তারা। চৈত্রের দুপুরে যখন জাম গাছের ডালে ব'সে কাকের চোখে তন্দ্রা নামতো, দূরের কোন্ রেলের বাঁশী শোনা যেতো, আর কাঁসারিরা গলি দিয়ে পেরিয়ে যেতো ঠন্ঠনিয়ে—সেই সময় হয়ত কোনো মধ্যাহ্নের ঘুমভাঙ্গা বালক চুপি চুপি যেতো পুকুর ঘাটে, কিন্তু যক্ষি বুড়ীর ভয়ে তাকে থমকে দাঁড়াতে হোতো ওই বাড়ীর খিড়কি দরজায়। জাম তেঁতুলের বনে উদাসী হাওয়া যেতো ফুরফুরিয়ে, আর ঘুঘু ডেকে যেতো কোনো ভাঙ্গা পাঁচিলের পাশ দিয়ে, পথ দিয়ে যেতো সেই অদ্ভুত মেয়েছেলে,—'বা ত ভা-লো ক-রি, দাঁতের পোকা ভালো করি,—সেই মেয়েছেলের পিঠে ঝোলানো থাকতো ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলি, কানে রুপোর কানবালা, হাতে একগাছা রুপোর চুড়ি, আর খড়ের মতন শুকনো তা'র মাথায় চুল। ওরা কোন্ জাত, কোন্ দেশের—কোনোদিন জানা যেতো না। ওরা কলাপাতায় তেল মাখিয়ে দাঁতের ওপর চেপে ধ'রে মন্তর পড়ে, আর সেই মন্তরের চোটে দাঁতের ভিতর থেকে গাদা গাদা পোকা বেরিয়ে আসে। তখন দেখা যেতো সেই ডাইনীর চোখে যেন পিশাচীর উল্লাস! দাও তখন তাকে চারটি পয়সা।

খিড়কির সেই পুকুরে তারপর কোথা থেকে এসে মাটি পড়তে লাগলো। দেখতে দেখতে পুকুর বুজে মাঠ হয়ে গেল। দেখতে দেখতে যক্ষি বুড়ী জলের তলাকার রাজ্য ছেড়ে তার হিসেব নিকেশ শেষ ক'রে কোথায় গেল চ'লে—তার খবর আর কিন্তু কেউ নিল না। ওরা হাওয়ায় ভেসে চ'লে যায়, ওদের ডানা আছে,—ওরা জ্যোৎস্নারাত্রে শাদা চুল এলিয়ে আকাশ-পথে উড়ে গিয়ে আবার হয়ত কোনো অজানা পুকুরে জায়গা নেয়—সেখানেও চৈত্রের দুপুরে মধুর হাওয়া ওঠে, জল ছল ছল করে ঘাটের শেষ সিঁড়িতে, বটের ঝুরি নেমে আসে জলে, আশে পাশে যজ্ঞি ডুমুর আর কাঁটা ফুলের ঝাড়। যক্ষি বুড়ীর চোখে তন্দ্রা নামে।—এমনি ক'রে কত গল্প শুনে যেতুম!

যেখানে ছিল পুকুর সেখানে জ'মে উঠলো গাড়ীর আড্ডা। আর সেই জঙ্গল কেটে জ্ঞান ভটচার্যি'র পাকাবাড়ী উঠলো। যেখানকার ছায়ায় গিয়ে পা টিপে টিপে এগোতে গা ছম্ছম্ করতো, সেখানে এসে পড়তে লাগলো রাজমিস্ত্রিদের মালমসলা, গরুর গাড়ী বোঝাই ইঁট আর চুন সুরকি। দেখতে দেখতে কোথায় গেল সেই জামতেঁতুল-তলা,—আর ঝোপ-ঝাড়, সেখানে এলো উগ্র দিনের আলো, লোকজনের আনাগোনা, আর ফড়ে দালালদের হিসেব নিকেশের কচকচি। চেয়ে-চেয়ে দেখলুম, যেন একটা মস্ত কিছু ওখান থেকে বিদায় নিয়েছে; ওখানকার সেই কাঁটা জঙ্গল, সেই ছমছমে বাঁশবনের ছায়া, সেই শালিক পাখীর কণ্ঠে আর কাঠবিড়ালীর ঝিলিকে চমকে ওঠা বোশেখ মাসের

দুপুরের তন্দ্রা, তারাও যেন ওই সঙ্গে বিদায় নিয়ে গেছে। কাজ সেরে গেছে সবাই—শুধু রেখে গেছে আমাকে যেন সমস্ত ওলোটপালটটা দেখবার জন্য! আমি যেন সকল ভাঙ্গনের সাক্ষী! বাল্যকালটা আমাকে পিছনে ফেলে ওদের সঙ্গে যেন চ'লে যাচ্ছে।

সেই বত্রিশ নম্বর বাড়ী চ'লে গেছে অনেক কাল আগে। সেখান থেকে ভেঙ্গে এখন সতেরো নম্বর। এরই সঙ্গে আমাদের আশৈশব নিবিড় পরিচয়। কিন্তু আবার ভাঙ্গন ধরেছে এখানেও।

দিদিমা বললেন, ওরে, এ বাড়ী আমাকে বেচতেই হবে, নৈলে সুরেন রায়ের দেনা শুধবো কি ক'রে? পাটা বন্ধক দিয়ে এক-এক মেয়েকে পার করা হোলো, নাতিদের বে'থা দিলুম—এক এক ধাক্কার টাকা এনে দিতে হোলো। আর এ বাড়ী থাকবে না।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে দিদিমা পুনরায় বললেন, একে একে পাঁচটি জামাই গেল, খুনীকে আর নিবারণকে রাখতে পারলুম না। আমি আর কেন থাকি সংসারে!

দিদিমার পিঠের পাশটিতে ব'সে ছিলুম। আর সবাই ছিল আশেপাশে। সেদিন সামনে দিয়ে খাট সাজিয়ে নিয়ে গেল এ পাড়ার অক্রূর চাটুয্যেকে—যার গলায় থাকতো রুপোর চেন বাঁধানো রুদ্রাক্ষর মালা, চুলের রাশি পড়তো পিছন দিকে, কপাল জোড়া সিঁদুর, কাঁধে ঝোলানো পাটকরা গামছা, হাতে মস্ত লাঠি। বিরাট শরীর ছিল তাঁর। চোখ দুটো দেখে ভয়ে আমরা পালিয়ে আসতুম সদর দরজা থেকে। সেই অক্রূর চাটুয্যেকে নিয়ে গেল সামনে দিয়ে। আর নিয়ে গেল ললিতবাবুকে আর ভাদুড়ী মশাইকে। তারপরে গেল সাতুবাবু।

দিদিমা আঁচলে আবার চোখ মুছে বললেন, পেটের ছেলে মানুষ হয়নি,—ওরা ছিল আমার সাত ব্যাটা! পাড়া কানা হয়ে গেল। এবার একে একে সব যাবার পালা!

দিদিমা?

কেন, বাপি?

বাড়ীবিক্রি হ'লে আমরা কোথা যাবো?

দিদিমার গলা দিয়ে কান্না উঠে এলো। তিনি বললেন, পথে পথে ভেসে যাবো! ওই কাওরা বস্তির সামনে দিয়ে যাবে বড় রাস্তা—সারি সারি বাড়ী আর বড় বড় দোকান। এমন কি আর থাকবে! কার্তিকরা বাড়ী ছেড়ে চললো, দীপুদের আড্ডা ভাঙলো, লালাদের দোকান উঠলো,—গঙ্গার মা'র ঘর আর আস্তাবল ভেঙ্গে এবারে সাফ হয়ে যাবে!

আমার কথার জবাবটা খুঁজে পাচ্ছিনে। পথে পথে ভেসে যাবো—কিন্তু সে কোন্ পথ? এ গলির পরে সেই গলি, তারপর ওই গলি—গলি পেরোলে ট্রাম রাস্তা, সেটা ছাড়িয়ে গির্জার পাশ দিয়ে সে অনেক দূরে! সেখানেও ত' ভাঙ্গন ধরেছে! ছাতুবাবুর বাজার ছাড়িয়ে গঙ্গায় যাবার পথে সব ভাঙ্গছে, ভাঙ্গছে মাণিকতলায়, শুঁড়িপাড়ায়, ভাঙছে কাঁসারিপাড়ায়, জেলেটোলায়—ভাঙ্গছে চারদিকে। ঘর বাড়ী সব ভেঙ্গে দিচ্ছে, আর ভেঙ্গে দিচ্ছে মন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখা যায় ভাঙ্গা বাড়ীর ভিতরকার শোবার

ঘরের দেওয়াল আর কুলুঙ্গী, অন্দর মহলের সব লুকোনো আড়ু রাখার জায়গা ঃ ওই সব ঘরে কেঁদেছে, কত লোক হাসির সঙ্গে চোখের জল গড়িয়েছে,—আর ওখানে ছিল কত নন্টুর মা, কত রত্নেশ্বরের মরা ছেলে যজ্ঞেশ্বর, কত সরলার মারখাওয়া শিশু। ওরা সবাই হিসেব চুকিয়ে চ'লে গেছে ঘর ভেঙ্গে।

পথের ধারে দাঁড়িয়ে আমার কান্না পেতো !—

দালাল আনাগোনা করছে বাড়ীতে। তার নাম রামলাল। বুড়ো, কিন্তু লম্বা চওড়া। গলার আওয়াজ ভয়ানক মোটা। যমদূতের মতন এসে দাঁড়ায়—এ বাড়ী সে বিক্রি করিয়ে দেবে। বাড়ী বিক্রি হয়ে গেলে কে কোথায় যাবে জানা নেই। কিন্তু শিকড় নড়েছে। কেউ যাবে কাশী, কেউ কেষ্টনগর, কেউবা যাদবপুর। কিন্তু মামা যাবেন কোথায় ?

মামা চেঁচিয়ে ওঠেন পাশের ঘর থেকে। বাড়ী বিক্রি ! বলে—যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই ? জাল-উইলের জোরে কা'র বাপের সম্পত্তি হস্তান্তর করতে চায় ? মাগি যেদিন বায়না করবে, সেই দিনই হাইকোর্টে ঠুকবো এক নম্বর। বাপের ব্যাটা যদি হই, তবে ডুবো জাহাজ আবার তুলে আনবো।

দিদিমা হেঁকে ওঠেন—যা যা যা, ভারি সাধ্যি তোর ! বলে, ছুঁচোর গোলাম চামচিকে ! যা পারিস করগে যা।

মামা বললে, হ্যাঁ, তাই যাবো। হাইকোর্টের পায়দারা আসবে, ঘুঘু চরবে, দারোয়ান ছুটবে—তবেই আমার নাম নোগে ভট্চায। তিন পুরুষ ধ'রে মামলা চলবে, আমি গ্যাঁট হয়ে ব'সে থাকবো এই ফল্না ভট্চার্যি'র বাড়ীতে।

রামলাল বুড়ো খদ্দের আসে মাঝে মাঝে—এ বাড়ী দেখে যায়। মামা বললে, ব্যাটাকে বাগে পাবো যেদিন, মুরগি-জবাই করবো !

কান পেতে শুনি দিদিমার গলা। সে গলায় যেন আর পুরনো তেজ নেই; কান পেতে শুনি মামার আওয়াজ, সেই আওয়াজের জোর যেন কবে থেকে ক'মে গেছে ! ভাঙ্গন ধরেছে ও'দের শক্তিতে, যেমন ভাঙ্গন ধরেছে পুরনো কলকাতায়। অবিনাশ কবিরাজের বাড়ী ভাঙ্গছে, ওই যেখান থেকে লাল রঙের বড়ি এনে দিতুম—সেই বাড়ীতে থাকতো গঙ্গাজলের গন্ধ। বুড়ো কবিরাজের চেহারাটা ছিল গঙ্গাজলের বর্ণ, সে গায়ে জড়িয়ে থাকতো তসরের চাদর—মাথায় ছিল তার শাদা চুল, আর শ্বেত চন্দন মাখানো থাকতো বুড়োর কপাল জুড়ে। কবিরাজের সেই মস্ত দোকান একদিন উঠে গেল ঃ সরকারী কুলীরা ভাঙ্গতে লেগেছে তা'র বাটীটা। থাকবে না কেউ আর এ পাড়ায়। চৌধুরীরা চলে যাচ্ছে, সর্বাধিকারীরা বাড়ী খুঁজছে। আর গলির মধ্যে সেই ললিতবাবুর খুব সুন্দর বৌ—সেই যে আমাকে কাছে বসিয়ে হাসিমুখে তালের বড়া খাওয়াতো —তারা যেন কবে চ'লে গেছে কোন্ পাড়ায়। খোঁজ পেলুম না কোথায় হঠাৎ একদিন চ'লে গেল সেই অন্ধ গঙ্গার মা তার ঘরটি ছেড়ে। অন্ধকার একটি ঘরে থাকতো সেই বুড়ী, তার চৌকীর তলায় থাকতো পিতলের কয়েকটি বাসন। অন্ধকার থেকে সেই বাসন চকচক করতো, আর মনে প'ড়ে যেতো যক্ষি বুড়ীর করাল চোখ। গঙ্গার মা পা

বুলিয়ে-বুলিয়ে উঠতো তা'র ঘরে, সিঁড়িতে, কোমর থেকে চাবি নিয়ে খুলতো ঘর, আর তোলা উনুনে গুলের আগুন ধরিয়ে ভাত ফুটিয়ে খেতে ব'সে যেতো। ছোট্ট ঢিল ফেলতুম ওর ঘরের মধ্যে, আর বুড়ী আরম্ভ করতো গালাগালি, কান পেতে শোনা যায় না সেই কদর্য ভাষা। কিন্তু গঙ্গার মা চ'লে যাবার পর ব্যথায় ভারি হয়ে উঠেছে মন। যারা দুঃখ পেয়ে গেছে আমার হাতে, তাদেরই জন্যে নিঃশ্বাস পড়েছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে!

শেতলবাবুদের বস্তি ভাঙতে আরম্ভ করেছে, পাঁচু পালরা চ'লে যাচ্ছে পাড়া ছেড়ে। সেই অন্ধ বুড়ো একদিন ম'রে গেল—সেই যে খড়কে পুড়িয়ে মন্তরপড়া জলে ছ্যাঁকা দিত, আর আমার হাত থেকে নিত পাঁচটি পয়সা। শিশুর তড়কা হলে এক পয়সা, ভূতে পেলে কিন্তু জলের দাম বেশী। সেই বস্তির থেকে হরার মায়ের গলার আওয়াজ আর শুনিনে; কাওরানি বুড়ী আর লালার দোকানে পোস্ত দানা কিনতে আসে না,—ওরা কেউ মরেছে, কেউ বা স'রে গেছে।

এ বাড়ী বিক্রি করবেন দিদিমা! ওই যে বেলতলার ছাদে ছিল ভাঙ্গা রেলিংটা—শিশুদের প'ড়ে যাবার ভয়ে ওটার ফাঁকে দড়ি বেঁধে রাখতে হতো। কিন্তু এবার থেকে আর দরকার হবে না। বিণ্টুবাবুর ছাদের দেওয়াল থেকে চুণ-বালুর চাপড়া খ'সে পড়ছে। ইঁটের চণ্ডী নাকি জানান দিচ্ছে, এ বাড়ীতে আর আমাদের জায়গা নেই। এই বেলতলার ছাদে দাঁড়ালে গন্ধ পাওয়া যেতো শরৎকালের, যখন আসেন দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী—তিনি আসেন কৈলাস থেকে,—এই শরতের মেঘ যেদিকে ভেসে যায়, রাজহাঁসরা আসে যে-দেশ থেকে। শোনা যেতো আগমনী গান এই বেলতলার ছাদ থেকে। কবেকার কোন্ জননীর বুকফাটা কান্না সোনামাখানো রোদ্দুরে আর হাওয়ায় ভেসে আসতো আমাদের কানে—"কবে যাবে গিরিবর আনিতে আমার উমাধনে। যাও গিরি আনিতে গৌরী, মা বিনে উমা কত কেঁদেছে।"

কোন্ মা কেঁদেছে কবে? কাঁদবে না কি মা বসুমতী এই বাড়ীর অনেক নীচের থেকে—যেদিন আমরা একে একে ছেড়ে চলে যাবো? কাঁদবে না কি আজকের এই এলোমেলো হাওয়া অন্ধকার ঘরে ঘরে—যখন একজনও কেউ এখানে থাকবে না? এখান থেকে বড় ছাদের পাঁচিল পেরিয়ে দেখা যায় কার্তিক মাসের ঠাণ্ডা আকাশ,—গোলা পায়রারা পাখার শব্দ ক'রে উড়ে গিয়ে যেদিকে উধাও হয়ে যায়, আর নিমগাছটা হেমন্তের হাওয়ায় থরথরিয়ে ওঠে, আর বেলগাছ থেকে কাকের বাসা সেই হাওয়ায় শুকিয়ে ঝ'রে পড়ে। এখান থেকে দেখতুম শ্রাবণ মাসের বর্ষা—ওই নারকেল গাছটা যেন কুঁকড়ে যেত ঝড়ে বৃষ্টিতে, শ্যাওলাধরা ওর পাঁচিল থেকে জল গড়িয়ে আসতো—আর সেই শ্যাওলার ওপর নাক রেখে শুঁকতুম শ্রাবণ মাসের ভিজে গন্ধ। সব ছেড়ে এবার আমাদের চলে যেতে হবে! বুড়ো রামলাল খদ্দের আনছে একে একে।

দিদিমা?

দিদিমা চুপ ক'রে শুয়ে ছিলেন বেলতলার ছাদে। জবাব দিলেন, কেন, ভাই?

কান্নায় থতিয়ে গেল বালকের মুখের আওয়াজ। একটু সামলে নিয়ে বললুম, বাড়ী বিক্রি হ'লে তুমি যাবে কোথায় ?

আমি ? আমি যাবো কাশী। যেদিন শেষ হবে সেদিন হাড় ক'খানা যাবে মণিকর্ণিকায়। কাশী, কাশী বিশ্বনাথ !

দিদিমার বুকের ভিতরটা ওই বিশ্বনাথের জন্যে যেন হাহাকার ক'রে উঠতো, হাহাকার করতো এ বাড়ীর মমতায়। সেই হাহাকার শুনতুম কান পেতে। সেই হাহাকারে শুনতে পেতুম কলকাতার ভাঙ্গনের আওয়াজ,—আসছে যেন নতুন, কিছু একটা নতুন। হয়ত ঘোড়ায় চড়ে আসছে সেইকল্কি অবতার, তার পায়ের ধুলো উড়ছে চারিদিকে ! আমরা কোথায় ঠিকরে যাবো কেউ জানে না। সামনের ভবিষ্যৎটা ভয়ের মতন এসে দাঁড়াচ্ছে।

বোনেদের একে একে বিয়ে হয়ে চলে গেছে। যারা কাছে ছিল, পাশে ছিল, তারাও দেনা পাওনা বুঝে নিয়েছে। মামার সেই ডালিম গাছ শুকিয়ে গেছে, পুষি বিড়ালটা মরে গেছে কোথায় কোন্ আঁস্তাকুড়ের পাশে শুয়ে। পাশের বাড়ীর সেই ভাগ্নি বিনু—তারও বিয়ে হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে কানামাছি খেলাটা জমে উঠেছিল দিনে দিনে। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখলুম, আর কাছে আসে না। ভিতর মহলে সে থাকে, ঘাগরার বদলে শাড়ী পরে, বিনুনির বদলে খোঁপা বাঁধে, নতুন মামীর সঙ্গে হাসি তামাশা করে। বিনু হোলো বড়লোকের মেয়ে, গরীবের ছেলেটার সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হয়েছিল। সমস্ত দিনমান ধরে যার সঙ্গে খেলাধুলোর কথাই শুধু ভাবতুম, হঠাৎ একদিন সমস্ত খেলা ফেলে রেখে সে ভিতরে গিয়ে ঢুকলো। পিছন ফিরে একবারও তাকালো না, কাঙ্গাল গরীবের দুটো আকুল চোখ তার দিকে কেমন উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে রয়েছে ! বিনু একদিন শ্বশুরবাড়ী চলে গেল।

দেখতে দেখতে ক্ষিরি নাপতিনি চোখ বুজলো ; মরে গেল মানুর মা। তারপর মরে গেল নয়নদাদা। নয়ন দাদার বয়স হয়েছিল চার বছর কম একশো। শনদড়ির মতো তার মাথার চুল, কোঁচকানো চামড়ার মধ্যে তার শরীরে ছিল চওড়া হাড়, কথা বলতো কম,—শ্যাকরা বাড়ীর টাকা আদায় ক'রে বেড়াতো এখানে ওখানে। সে নাকি মরবার আগে পর্যন্ত এক সের ক'রে খাঁটি দুধ খেতো ! দেখলুম বেহারী বুড়োর গঙ্গাযাত্রা। বুড়ো খাবি খাচ্ছে,—তাকে খাটে ক'রে ঝুলিয়ে নিয়ে গেল নিমতলায়।

বাড়ীর ভিতর ঘরকন্না ভাঙ্গছে। ন'মাসিমা চলে গেছেন কাশী—আগে ভাগে ছেলে মেয়েকে নিয়ে। সমস্ত বাড়ীময় প্রবল অশান্তি বাধিয়ে সরলা গেছে শ্বশুরবাড়ী ! মামী বলছেন, বাড়ী বেচে আমায় কিছু দিয়ো। চিরকাল তোমাদের বাড়ীতে ঝিগিরি করলুম,—এবারে বেরিয়ে পড়বো। আমি গিয়ে থাকবো কেষ্টনগরে। সেখানে আজও আমার বাপ-খুড়োর গুষ্টিরা বেঁচে আছে।

দরজার মাথার উপরে যে ঘর, সেই ঘরে ছিল অরুণ চৌধুরী। জমিদারের ছেলে সে, শান্তিপুরের ধুতি পরতো, সারাদিনে পাঁচ ছয়বার চান্ করতো সাবান দিয়ে—আর গায়ে একটি গেঞ্জি দিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতো। তা'র ছিল একটু মাথার দোষ, নিজের মনে কী বকতো, আর চাকরকে সরিয়ে নিজের হাতে পান সাজতে বসতো। কী সৌখীন তা'র নজর, কী সুন্দর তা'র চেহারা। হঠাৎ একদিন রাত্রে সে খুন করতে উঠলো তা'র চাকরটাকে। চীৎকারে ঘুম ভাঙলো আমাদের। মামা এদিন থেকে লাঠি ঠকঠক করলেন, কিন্তু খুনে পাগলের সামনে গিয়ে তাঁর দাঁড়াবার সাহস ছিল না। চাকরের চীৎকারে অত রাত্রেও রাস্তার লোক জড়ো হোলো। শেষকালে তাকে তালাবন্ধ ক'রে চাকরটা বেরিয়ে এসে এক কোণে রাত কাটালো। পরদিন থানা পুলিস। সেই জমিদারের ছেলেকে নিয়ে গেল নাকি বহরমপুরে।

সব ঘরের গল্প আমার মুখস্থ। শূন্য মহলের অতীত কাহিনীরা আমার কানে আর মনে যেন রাত হলেই ভীড় ক'রে আসে। সেই ছিন্নভিন্নরা প'ড়ে থাকবে শূন্য ঘরে ঘরে, ঘুরে বেড়াবে এ বাড়ীর হাওয়ায়, দেওয়ালে-পাঁচিলে, আনাচে। কিন্তু আমরা আর এখানে থাকবোনা।

মামা যেন একটু বদলে গেছেন, একটু ঠাণ্ডা হয়েছেন। একদিন বললেন, বাড়ী বিক্রি হয়ে গেলে বাড়ী আমি ফেরৎ পাবো—কিন্তু কত টাকায় বিক্রি হচ্ছে শুনি ?

দিদিমা বললেন, বটে, টাকার গন্ধ পেয়েছিস বুঝি ? তোর এত মাথা ব্যথা কিসের ?

আমার বাপের সম্পত্তি।

বাপের মুখে জল দিয়েছিলি ? ঘাটে গিয়ে আগুন দিয়েছিলি ?

মামা মুখ বিকৃত করে খিঁচিয়ে উঠলেন, পুরনো কাসুন্দি তুলে পাড়া জানান্ দিচ্ছ ? বিষ খাইয়ে কা'রা পাগল করেছিল ফলনা ভটচাযি কে ? জাল-উইলে কা'রা সই করিয়ে নিয়েছিল পাগলকে দিয়ে ?

মুখ সামলে তুই কথা ক'স বলে দিচ্ছি।—দিদিমা রুখে বসলেন। ঝড়ের ডাক শুনে আমরা ঘরে গিয়ে লুকোলুম।

মামা তেড়ে উঠে বললেন, টাকার ভাগ আমি চাই, নৈলে হাইকোর্টে গিয়ে ওই জাল উইল আর বিষ খাওয়ানো প্রমাণ করবো!

তবে হাইকোর্টেই যা, মেনিমুখ নিয়ে ঘরে বসে থাকিস কেন ? টাকা চাস কোন্ লজ্জায় ?

মামা বললেন, যাবো, হাইকোর্টেই যাবো,—তার আগে সব নিকেশ ক'রে যাবো। তোকে নিয়ে যাবো। ছুরিখানা আমার আজও ভোঁতা হয়নি।

মামা ঘরে গিয়ে ঢোকেন। মাঝে মাঝে তাঁর ছুরিতে মরচে ধরে যায়, মাঝে মাঝে সেই ছুরি তিনি শানিয়ে তোলেন। সেই ছুরিটি একদিন আমি লুকিয়ে দেখে এসেছি। সেখানা ছোরা নয়,—ছোট্ট পেন্সিল্ কাটা ছুরি। কিন্তু তারই ভয় ক'রে এসেছি আমরা এতকাল। ওর চেয়ে খুন্তি ভালো, চিমটে ভালো, এমনকি সোনা-নরুণও

ভালো। ছয় পয়সা দামের ছোট্ট একখানা ছুরি। যা ছোট ছেলের পকেটে-পকেটে ঘোরে।

তবু সকলের মধ্যে একটা হৃৎকম্প ছিল—যেদিন বাড়ী বিক্রি হবে, সেদিন মামার কি উত্তাল চেহারা। দানবের হুঙ্কারে সেদিন কেঁপে উঠবে বাসুকীর ফণাটা, কেঁপে উঠবে পৃথিবীর তলাটা। সেদিনকার ভূমিকম্পের দোলনটাকে সইবে? কা'র এমন সাহস? ঠাকুর ঘরে গিয়ে দিদিমা চুপি চুপি আলোচনা করেন। যেদিন বাড়ী বিক্রি হবে, সেদিন দিদিমাকে বাঁচানোর জন্য থানা থেকে পাহারাওয়ালাকে আনা দরকার,—বটতলার থানায় ডায়েরী ক'রে আসা চাই সকলের আগে। মামা ভয়ানক হিংস্র, তাঁর হাত থেকে সাবধান থাকা দরকার।

সাতপুরুষ ধ'রে শিকড় নেমে গেছে এই পাড়ার মাটির তলায়, তা'কে উপড়ে ফেলবার সন্ধিক্ষণ এসেছে এবার। আর সময় নেই, নতুনের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে, ভাঙ্গনের আওয়াজ আসছে কানে। গুছিয়ে যদি নিতে হয় তবে এই বেলা। এই বেলা ঘট ভ'রে নাও, কাজ সেরে রাখো, ফসল ঘরে তোলো। এবার ঝড় উঠবে, ঈশানের কোণে কালো মেঘ জমেছে, তুফান আসবে সমুদ্রে। এই বেলা তীরে ওঠো।

দিদিমা বলেন, ওরে, ন্যায়বাগীশের বংশ, গলগণ্ড মেলাবার গুষ্ঠি। বন কেটে বসতি বসেছিল ওই বত্রিশ নম্বর বাড়ীতে। সে অনেককালের কথা ভাই।

মুখ তুলে তাকাতুম দিদিমার দিকে।

দিদিমা গল্প ব'লে যেতেন। যশোর খুলনা জেলার এক বামুনের ছেলে ঘুরতে ঘুরতে এসেছিল সুতোনুটিতে, ছেলেটার নাম ছিল অনন্তরাম। দেখতে রাজপুত্তুর, কিন্তু গলায় ছিল গলগণ্ড। সে আজ দুশো বছর আগের কথা রে, তখন এদেশে নবাবী আমল, কোম্পানীর রাজত্ব তখনও হয়নি। রেলগাড়ী নেই, পায়ে হাঁটা পথ। ছেলেটা এসে উঠলো শোভাবাজারের মস্ত রাজবাড়ীতে। সেখানে হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া। রাজার ঠাকুর বাড়ীতে গিয়ে ছেলেটা পুরুতের কাজ নিল। খায় দায়, আর থাকে একটা ঘরে। রাজবাড়ীর পুজো, পাওনা-গণ্ডা বেশ ভালোই। অনন্তরাম রোজ গঙ্গাস্নান সেরে এসে গলায় উড়ুনীখানা জড়িয়ে পুজো করতে বসে। পুজো করে এক মনে, পুজোর মন্তর শুনে সকলের গায়ে কাঁটা দেয়। একদিন কিন্তু রাজার নজরে প'ড়ে গেল। রাজা বললেন, ঠাকুর মশাই, তোমার গলায় ওই উড়ুনী-খানা কেন জড়ানো থাকে? অনন্তরাম মিছে কথা বলতে পারতেন না। বললেন, রাজামশাই, গলায় আছে আমার গলগণ্ড! ওটা নিয়েই আমি জন্মেছি। রাজার মুখ গম্ভীর হোলো। বললেন, শরীরে একটা খুঁৎ নিয়ে রাজবাড়ীতে তোমার পুরুত-গিরি করতে আসা উচিত হয়নি। তুমি এমন শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ, এত ভক্তি তোমার, ঠাকুরের দয়ায় ও রোগটা কেন তোমার সারেনি? এই কথা শুনে অনন্তরাম উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ব্রাহ্মণের মুখের ওপর এত বড় কথা? আমি চললুম। এ রোগ যদি সারাতে পারি তবেই দেবতার ভজন করবো, নৈলে না খেয়ে মরবো পথের ধারে শুয়ে।

এই ব'লে ন্যায়বাগীশ গঙ্গায় চললেন। ঘাটে গিয়ে গলাজলে নেমে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনদিন চোখ বুজে। তিনদিন পরে সেই গলগণ্ড মিলিয়ে গেল।

মিলিয়ে গেল!—আমরা উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলুম দিদিমাকে।

হ্যাঁ, মিলিয়ে গেল। অনন্তরাম ফিরে এলো হাসিমুখে আবার রাজবাড়ীতে। সেই দেখে রাজা কেঁদে পড়লেন সেই ব্রাহ্মণের পায়ে। বললেন, অপরাধ নিয়ো না, ঠাকুর—কি বলতে কি বলেছি! তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি নারায়ণ! তোমার পায়ের ধুলোয় রাজবাড়ী পবিত্র হোক। যা তুমি চাও তাই দেবো! ন্যায়বাগীশ বললেন, আমি দেবসেবা চাই, আর কিছু চাইনে। রাজা সে কথা শুনলেন না। তিনি ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করলেন। তখন কাঁসারিপাড়া, ঠনঠনে, বার-শিমলে, পাঁটিবাগান—সমস্তই জঙ্গল, বাদুড়বাগানের ওদিকে বাঘ ডাকে, কালীঘাটে যেতে গেলে ডাকাতে অঞ্চল পেরিয়ে যেতে হয়,—মাঝখানে ধান ক্ষেত আর বন বাদাড়। সেই সময় ন্যায়বাগীশ জায়গা পেলেন এই বার-শিমলেয়। সেই থেকে এ পাড়ার নাম হোলো ভটচার্যি বাগান। তোর মামাতো ভাইকে নিয়ে এই হোলো সাত পুরুষ। ন্যায়বাগীশের বংশ যে! ওদের কত বোল-বোলা, বারো মাসে তেরো পার্বণ,—ওদের কথায় রাজা ওঠে বসে।

টিপটিপ ক'রে রেড়ির তেলের পিদিমটা জ্বলে। বালিধসা ফাটলধরা দেওয়ালে দুশো বছর আগেকার ছায়ারা যেন ন'ড়ে বেড়ায়। সেকালের সেই নবাব, সেই শোভা-বাজারের রাজা, সেই সেপাই সান্ত্রী পাহারা,—তাদের সঙ্গে এসে দাঁড়ায় তরুণ ব্রাহ্মণ—আপন অহঙ্কার আর মহিমায় ওই পিদিমের আলোয় জ্বলজ্বল ক'রে।

দিদিমা বলেন, শুনবি তবে আর এক গল্প? শোন্ তবে—

তিনি যেন আরেক যুগে এসে থমকে দাঁড়ান্,—আরেক গল্প তুলে ধরেন আমাদের চোখের সামনে।

ফরিদপুরের বেলেকাঁদি গাঁয়ে এক বর গিয়েছিল বিয়ে করতে। হাবড়া জেলার বর, বরযাত্রীরাও তাই। বিয়ের দুদিন পরে কনেকে সঙ্গে নিয়ে বরের দল শেষ রাত্রে উঠেছে নৌকোয়,—মস্ত বজরা নৌকো। ভোরের আলো ফুটতে দেখা গেল, বছর তেরো বয়সের একটি বামুনের ছেলে সেই নৌকোয় সবাইকে লুকিয়ে উঠে বসেছে আগের রাত্তিরে। রাত কাটিয়েছে পাটাতনের নীচে। ছেলেটার পৈতে হয়েছে সবে, মাথাটা ন্যাড়া, গায়ে শাদা চাদর—দেখতে একেবারে চাঁদের টুকরো। বিষয় আশয় সম্পত্তি আত্মীয় স্বজন ছেড়ে ছেলেটা বিবাগী হয়ে চললো ওদের সঙ্গে, কিছুতেই নৌকো থেকে নামলো না! ওদের সঙ্গেই এলো পালিয়ে। হাওড়া রামকেষ্টপুরের ঘাটে নেমে সেই ছেলে এসে উঠলো এদের বাড়ীতে—সাঁতরাগাছিতে। লেখাপড়া নিয়ে ছেলেটা বসে গেল, ওদের ঘরেই মানুষ হতে লাগলো। কোথায় রইলো তা'র মা-বাপ, কোথায় রইলো তা'র দেশ-গাঁ। সেই বাড়ীতে ছিল গোলাপসুন্দরী ব'লে খাঁয়েদের মেয়ে। খাঁগুষ্ঠির ছেলেমেয়ের রূপের বড় দেমাক। সেই মেয়ের সঙ্গে বেঁধা দিয়ে খাঁয়েরা ওই

ছেলেটাকে করলো ঘর জামাই। ঘর দিলে, জমি দিলে, ভাগের ভাগ দিলে। সেই গোলাপসুন্দরীর রূপ ছিল ডাকসাইটে। এত রূপ সেই মেয়ের যে, নিজের দিকে চাইতে পারতো না। একদিন কি হোলো জানিস ভাই? নিজের রূপ দেখে নিজেই সে পাগল হয়ে গেল। নীচের তলাকার একখানা এঁদোপড়া অন্ধকার ঘরে তাকে বন্ধ রাখতে হোলো! আহা, একুশ বছর বয়সে সেই গোলাপসুন্দরী পাগল অবস্থায় একদিন ম'রে গেল! রেখে গেল একটি ছেলে আর দুটি মেয়ে।

এপাশ থেকে মা বললেন, পুরনো কথা আর কেন তোলো, মা? ওসব কাহিনী ডুবে যেতে দাও!

দিদিমা বললেন, তা হোক মা। কবে বলতে কবে ম'রে যাবো, সব কথা ব'লেই যাই। ওরা বংশ পরিচয় জেনে রাখুক। গোলাপসুন্দরী কে জানিস, ভাই?

ভাইবোনেরা সবাই মুখ তুলে তাকালুম দিদিমার মুখের দিকে। দিদিমা বললেন, সেই হোলো তোদের ঠাকুমা! তখন মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমল। আর ওই ছেলেটাই তোদের ঠাকুরদাদা!

পিদিমের আলোটা তখন প্রায় নিবে এসেছে। সেই অন্ধকারে কি দেখতুম? কী দেখতুম জানলার বাইরে অন্ধকার নিমগাছটার সেই ঝাপড়াগুলোর ভিতরে! অতীতকাল কোথাও কথা কইছে না! বোবা রাত্রি বুকের ওপর চেপে বসে। এই অবরোধের ভিতর থেকে পালিয়ে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতুম। ওই যেমন পালিয়ে এসেছিল অনন্তরাম ন্যায়বাগীশ, যেমন পালিয়ে এসেছিল সেকালের সেই এক তরুণ কিশোর! গলায় তা'র পৈতের গোছা, শাদা উড়ুনী গায়ে জড়ানো, মাথাটা ন্যাড়া—সুন্দর সুকুমার কিশোর। আমিও যেন চলেছি তা'র সঙ্গে সেই শেষ রাত্রে। নৌকায় চলেছি নদীপথে নিরুদ্দেশে। টলমল করছে নৌকা, অকূলের দিকে পাড়ি দিয়েছি আমিও তা'র সঙ্গে। ভবিষ্যৎ জানা নেই, জানা নেই এ জীবনের কোনো পরিণাম! সমস্ত কাঁদন বাঁধনকে ডিঙ্গিয়ে, স্বজন পরিজন আত্মীয় বন্ধুকে ছেড়ে—ওর সঙ্গে একই নৌকায় পাড়ি দিয়ে অন্ধকার থেকে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে লাগলুম।

ভাঙ্গন ধরেছে কলকাতায়, ভাঙ্গন ধরেছে পাড়ায় পাড়ায়। কে যেন তাড়না করছে। দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না,—এগিয়ে যেতে হবে! কত জঞ্জাল জমেছে এই বাড়ীতে, কত কালের কত নোংরা স্তূপাকার হয়ে উঠেছে এখানে ওখানে, একোণে ওকোণে। কত ফাটলে বাসা বেঁধেছে চামচিকে, কত গর্তে ঢুকে রয়েছে কেঁচো আর কাঁকড়া বিছে, কত কীটপতঙ্গ সাপখোপ। এর উপরে পড়বে ভাঙ্গনের আঘাত। ঝাঁটা দিয়ে ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাবে সবাইকে।

কালো বিড়ালটা কাঁদলেই ছাঁৎ ক'রে ওঠে বুকের ভিতরটা। ওর কান্নাটা কানে এলেই বুঝতে পারি, এ বাড়ীর থেকে আমাদের বাস উঠবে। দিদিমা বাড়ী বিক্রি করবেন। রামলাল দালাল খদ্দের আনছে।

ভাঙ্গন ধরেছে আমাদের মনে, বাঁধন ভেঙ্গেছে আমাদের জীবনে। জঞ্জাল সরিয়ে আমাদের এখান থেকে চ'লে যেতে হবে। আমরা সবাই ঘরভাঙ্গার কাজে লেগে যাই।

কী আছে আমাদের ? আছে আবর্জনা, আছে অদরকারী অনেক সামগ্রী। ওরা কোনো কাজে আসবেনা আমাদের, ওরা কেবল দিনে দিনে জমে উঠেছে আমাদের আশেপাশে। টিনের কৌটো, খালি শিশি, ছেঁড়া মাদুর, পায়াভাঙ্গা জলচৌকি, পুরনো জুতো, কানাভাঙ্গা কাঁচের বাটি, পারাওঠা ময়লা আরশি, দাড়াভাঙ্গা চিরুনী। ময়লা বালিশ থেকে তুলো বেরিয়ে পড়েছে, তোশকের ভিতর থেকে বেরিয়েছে নাড়িভুঁড়ি। ফুটো বালতি, মাটির হাঁড়িকুঁড়ি, ছেঁড়া ছাতা,—ভাঙ্গনের মুখে ওরা একটি একটি ক'রে বেরিয়ে পড়েছে আজ লোকসমাজের সামনে। ওরা আমাদের যাবার পথ আগলে রেখেছিল এতকাল, এবার যাবার তাড়ায় ওদেরকে পা দিয়ে সরিয়ে চ'লে যাবো।

হঠাৎ ওই আবর্জনার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ে অদ্ভুত সামগ্রী। গোয়ালীয়রের রাজামার্কা একটি তামার পয়সা! পুরনো কাঠের সিন্দুকের ভেতর থেকে একপাল আরশোলার সঙ্গে বেরিয়ে আসে সমুদ্রের শুকনো একখণ্ড ফেনা! আমরা অবাক হয়ে পরীক্ষা করতে থাকি। ঝুপসি কুলুঙ্গির ভিতর থেকে কেউ হাত বাড়িয়ে খুঁজে পায় কোন্ দেশের পাহাড়ের একটি রামখড়ি। একরাশি ঝিনুক খুঁজে পেয়ে যাই আমরা। পেয়ে যাই গয়া-র পাথরবাটি, এক টুকরো কষ্টিপাথর, একটি চুম্বক লোহা, এক শিশি চুয়া, পঞ্চবটির একখানা পুরনো ছবি, পিতলের পিনাটে বসানো একটি ছোট শিবলিঙ্গ, তীর্থযাত্রার একখানা পুস্তিকা, ধূমপানের একটা পাইপ। ছোট একটি পুঁটলীও খুঁজে পাই। তা'র মধ্যে রুদ্রাক্ষ, লাল সুতো, টিনের আয়না, শুকনো ফুলের গুঁড়ো, সিঁদুর মাখানো চাউলের দানা। কী যেন আবিষ্কার করি সমস্ত সামগ্রীর মধ্যে। ওর মধ্যে কত দেশের কাহিনী, কত ভ্রমণের ইতিহাস, কতকালের পুরনো গন্ধ!

কী কৌতূহল আমাদের চোখে মুখে। মা লক্ষ্য করতেন, কিন্তু কথা বলতেন না। অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করলে ধমক খেতুম,—ফেলে দে, ফেলে দে—ওসব জঞ্জাল আর সঙ্গে নিয়ে যাসনে।

জঞ্জাল, সবাই জানে। কোনো কাজে আসবে না, এও জানা। তবু ওই জঞ্জালেই মস্ত পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। ওরা খবর আনে অতীতের প্রাচীনের, ওরা খবর আনে সুদূরের। সমগ্র বাল্যকালটা যেন অস্থির কৌতূহলে সমস্ত সামগ্রীর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

বাড়ী ছেড়ে যাবার আগে দিদিমার মন শোকাচ্ছন্ন। তবু আমাকে ওই জঞ্জালের কাহিনী জানতে হবে বৈ কি, না জানলে স্থির থাকবো কেমন ক'রে বাকি জীবনটা? ভূগোলে প'ড়ে এসেছি যে সব দেশের নাম, তা'রা কেমন ক'রে এলো আমাদের ঘরের কুলুঙ্গিতে,—আমাদের ওই ভাঙ্গা কাঠের সিন্দুকে ?

দিদিমা ? তুমি জানো ?—আমার জিজ্ঞাসা অস্থির হয়ে উঠে।

চোখের জল মুছে দিদিমা বলেন, আহা অজ্ঞান—কোত্থেকে জানবে বলো মা ? তিন মাসের ছেলেটি রেখে বাপ গেল, বাপের পরিচয় জানতে সাধ হয় বৈ কি। আহা, চোখে যেন আজো দেখতে পাচ্ছি। এই এতখানি বুকের ছাতি, মটর ডালের মতন রং,

ঝাঁপা ঝাঁপা কোঁকড়া চুল, কী লম্বা চওড়া। পাশ দিয়ে গেলে পথের লোক চেয়ে থাকতো। রূপ দেখেই ত' ঘরে জামাই ক'রে এনেছিলুম ! দেশ বিদেশে ঘুড়ে বেড়াতো বাউণ্ডুলে হয়ে, বাপ ছিল ঘরজামাই, তাই অহঙ্কার ক'রে বাপের সম্পত্তি ছুঁলো না,—শেষকালে ওর মামা গিয়ে ওকে ধরলো কাশীতে। সেইখানেই তোর মায়ের সঙ্গে বিয়ে দিলুম ভাই। জামাইটি আমার বড্ড বদরাগী ছিল, কারো তোয়াক্কা রাখতো না। চাল নেই চুলো নেই—কিন্তু রাজার মতন মেজাজ ছিল ! চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলতো,—শ্বশুর-শাশুড়ী শালা শালীকে গেরাহ্যি করতো না। বিয়ের রাত্তিরে বাসরে ব'সে বললে, বউ আমার শ্যামবর্ণ হোলো, আমি খুশী। সুন্দরী হ'লে কথায় কথায় আমার সঙ্গে ঝগড়া বেধে যেতো !—নতুন জামাইয়ের কথা শুনে আমরা সবাই অবাক।

পিতৃ-পরিচয় শুনে স্তব্ধ হয়ে দিদিমার দিকে চেয়ে রইলুম। দিদিমা বললেন, পড়াশুনোয় বড্ড মনোযোগ ছিল ! যত রাজ্যের বই এনে রাত জেগে জেগে পড়তো। রাশি রাশি বই ! বই নিয়ে একবার বসলে ঘরকন্নায় তা'র মন থাকতো না।

নিঃসাড়ে বসে সমস্ত গল্পটা শুনে যেতুম ! রেঁড়ির তেলের পিদিমটা জ্বলে পুড়ে এক সময় যেন খাক হয়ে যেতো।

পুরনো কলকাতাটা ভাঙ্গছে। ওর সঙ্গে বাল্যকালটাও যেন শেষ হয়ে আসছে। বস্তি ভেঙ্গে যাচ্ছে আশে পাশে। ময়নাদের ওখান থেকে ঘুঁটে কিনে আনতুম, তাদের ঘরকন্নাও একদিন ভেঙ্গে গেল। খাঁদা শুঁড়ি একদিন এসে জানালো, গোসাঁইবলু ম'রে গেছে। দিদিমা চোখের জল মুছলেন। ভাদুড়ীদের কর্তার শ্রাদ্ধে নেমন্তন্ন খেয়ে এলুম এই ক'দিন আগে। ছাদের আলসের ধারে দাঁড়িয়ে যতদূরে দৃষ্টি চ'লে যেতো—পশ্চিমে আর উত্তরে—খোলার চালা আর বস্তি, পুরনো বাড়ী আর অলি-গলি,—সর্বত্র শুধু ভাঙ্গছে। হুকুম এসেছে ভাঙ্গনের। সবাই ছন্নছাড়া হয়ে চলেছে।

আমাদের যাবার দিন স্থির হোলো।

গোলা পায়রারা থাক্ ওদের কোটরের মধ্যে, চামচিকেরা থাক্ ফাটলে-ফাটলে, ইঁদুরেরা থাক্ গর্তগুলোয়, আনাচে কানাচে থাক্ মাঝরাত্রির সেই ভূত পেত্নী দৈত্য পিশাচের দল,—ওদের সকলের হাতে রাজ্যপাট রইলো—আমরা এবার বিদায় নিয়ে চ'লে যাচ্ছি।

অল্প জায়গার মধ্যে ঘুরছিলুম এতদিন। আশে পাশে আঁকাবাঁকা গলি ঘুঁজি, বস্তির ভিতরকার বিচিত্র গোলক ধাঁধান পথ,—কিন্তু সমস্তটা যেন আমার চিরকালের চেনা। গঙ্গার মার মতন আমিও যদি অন্ধ হতুম, তবে আমারও অসুবিধে হোতো না। পা বুলিয়ে বুলিয়ে গন্ধে-গন্ধে—সমস্ত পাড়াপল্লীর প্রত্যেকটি পরিচিত ঘরে, প্রতি গলিতে অনায়াসে ঘুরে আসতে পারতুম। চোখ বুজে আমি চ'লে যেতে পারতুম মিত্তিরদের বাড়ী বাঁদিকে রেখে অর্জুনের দোকান ছাড়িয়ে মহাকালী পাঠশালাটা পেরিয়ে পুঁটি বাগানের পথটা ধরে কাঁচদের বাড়ীর ধার দিয়ে। তারপর সোজা ফিরে আসতে

পারতুম আমাদের গলিতে। কিন্তু এর বাইরে যে কলকাতা, সেটা আমার কাছে গল্প, আমার কল্পনা। আজ সেই অজানা কলকাতার মস্ত বড় বিস্তারের মধ্যে কোথাও চ'লে গিয়ে আমাদের আশ্রয় নিতে হবে। সেই জগৎটা একেবারে অপরিচিত। পুরনোটা পিছনে ফেলে যেতে কান্না আসছে, নতুনটা মনে মনে দুর্ভাবনা আনছে। আমাদের যাবার দিন স্থির হয়ে গেল।

মামা বললেন, আমি যাবো না, এ আমার বাপ পিতামোর ভিটে। যদি বিক্রি হয়, তবে হাইকোর্ট থেকে ফিরিয়ে আনবো। আবার ভাড়া বসাবো এ বাড়ীতে। আবার ডালিমের গাছ এনে বসাবো বেলতলার পাঁচিলে, আবার নতুন বেড়াল পুষবো। এ আমার হকের ধন, একে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না। আর যদি দেখি তেমন বেগতিক, তবে রইলো আমার কাছে ওই ছুরি। নিজের বুকে বসাবার আগে আর পাঁচটাকে নিকেস ক'রে তবে যাবো।

বেশ, তাই করিস,—দিদিমা চুপ ক'রে যান। যাবার জন্য তিনি গোছগাছ করতে ব্যস্ত ছিলেন। বিবাদ আর তিনি বাড়াতে চান না। ছেলের বুদ্ধি, বিদ্যা ও শক্তির সীমা তাঁর জানা ছিল।

কিন্তু আমরা এখান থেকে এর আগে গিয়েছি অনেকবার, আবার ফিরে-ফিরে এসেছি। বাগমারিতে গিয়েছি, গিয়েছি সেই বলুদে পাড়ায়। তারপর গিয়েছি লতাদের বাড়ীতে, সেখান থেকে সেই কেষ্টদাসীদের বাড়ী। গিয়েছি বটে,, কিন্তু থাকতে পারিনি,—আবার দিদিমা এখানে এনেছেন ফিরিয়ে। এবার যাচ্ছি মাণিকতলায়। এই আমাদের শেষ যাওয়া, শেষ ক'রে চ'লে যাওয়া।

এখানকার এই জরাজীর্ণ ঘরে ঘরে আমার অবাধ্য বাল্যকালটা যেন আব্দার ধরে কাঁদতে বসেছে। ওই মামার জন্যে কাঁদছে মন অকারণে। ওই মামার হাতে হয়েছে কত অপমান, কতদিনের কত লাঞ্ছনা। ভাতের থালা ফেলে পালিয়েছি ও'র ভয়ে, ঘর ছেড়ে পথে গিয়ে দাঁড়িয়েছি ও'র তাড়ানায়, ও'র মুখের গালাগালি শুনে সবাই কানে আঙ্গুল দিয়েছি, ও'র ছুরি আর লাঠির আতঙ্কে বন্ধ ঘরে থেকেছি আমরা কতদিন। কতবার থানায় খবর দিয়ে পাহারাওয়ালাকে এনে বসাতে হয়েছে; গোসাঁইকলু, অক্রুর চাটুয্যে আর মণি মিত্তির এসে দাঁড়িয়ে কতদিন বিবাদ মিটিয়েছে তা'র সংখ্যা নেই,—কিন্তু তবু দিদিমা একবারও ভয় পাননি। দুরাচার ও দুঃশীল পুত্রকে পৈতৃক সম্পত্তির থেকে বঞ্চিত করতে তিনি একটুও পশ্চাৎপদ হননি। দিদিমা আমাদের বড় কঠোর। অশ্বত্থ যত বৃদ্ধ হয়েছে, ততই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষ মুহূর্ত অবধি তিনি টলেননি।

ঘোষ লেনের সামনে মাণিকতলায় যেদিন ভাড়াটে বাড়ীতে গিয়ে উঠলুম, সেদিন এবাড়ী কেনবার খদ্দের ঠিক হয়েছে। মামা রইলেন একা। আগামী বৃহস্পতিবারে বিক্রয় কোবালা রেজিষ্ট্রি হবে।

বাড়ী মস্ত বড় ছিল, মামী তাই ভয় পেলেন। মামী বললেন, তিনমহল বাড়ী—এ বাড়ীতে থাকবে কে একলা? সন্ধ্যের আলো দেবে কে? ঝাঁট পড়বে কা'র হাতে?

আফিংখোরের সঙ্গে আমি একলা বাস করতে পারবো না। গলা টিপে যদি আমাকে মারে একদিন, তবে জানবে কেউ? কে দস্যুকে সামলাবে?

দিদিমা বললেন, দস্যু তোমার স্বামী নয়? সাত পাক ঘোরোনি একদিন? শুভদৃষ্টি করোনি? অগ্নিসাক্ষী ক'রে এক পিঁড়িতে বসোনি? এক বিছানায় শোওনি?

রাম বলো! গেল জন্মের কথা!—মামী বাঁকা মুখে ঠোঁট উল্টে বললেন, গাঁজাগুলি খেয়ে ভূতনেত্য করবে জানলে মাথার সিঁদুর কবেই মুছে ফেলতুম। আমি থাকবো না, ছেলের সঙ্গে আমি কালই কেষ্টনগরে চ'লে যাবো।

মামী সত্যই চ'লে গেলেন তা'র পরের দিন। যাবার ঠিক আগে মামা চেঁচিয়ে বললেন, হ্যাঁ, আছে! তোর কেউ সেখানে ঠিকই আছে! তুই নষ্ট মেয়েমানুষ,—পঁয়ত্রিশ বচ্ছর ধ'রে তুই সেই ব্যাটাকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছিস। সে আজ তোকে ডাকছে সেখান থেকে।

মুখে আগুন কথার!—মামী ঠিকরে উঠলেন।

তামাকের গড়গড়ার সেই বড় চিমটেটা নিয়ে মামা তাড়া ক'রে গেলেন মামীকে, আর প্রবীণ বয়স্কা মামী তাঁর পুঁটলিটি হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন। সদর দরজায় ছুটে এসে দাঁড়িয়ে মামা শাসালেন, ফের যেদিন ধরতে পারবো, সেদিন এই চিমটে দিয়ে তোর মাংস তুলে-তুলে নেড়িকুকুর দিয়ে খাওয়াবো!

মামী ততক্ষণে হন হন ক'রে লালার দোকান ছাড়িয়ে শীলেদের বাড়ীর ধার দিয়ে নির্মল সরকারের বাড়ীর পাশ দিয়ে ছুটে চললেন পূর্বদিকে। মামীর পক্ষে বিয়ের পরে এই প্রথম বাপের বাড়ী যাওয়া! যাবার ঘটা দেখে পাড়ার লোকে ভেঙ্গে পড়েছিল।

অতঃপর মামা রইলেন একা সেই শূন্যপুরীতে! তিনি ঘড়ি সারানোর কাজ তখনও করেন বটে, কিন্তু ঠিক বোঝা যায়নি, তাঁর আহারাদির পর্বটা চলে কেমন ক'রে। বাড়ীটায় দিনের বেলাতেই একা থাকতে কেমন ছমছম করে, রাত্রির কথা ত' আলাদা। খাঁ খাঁ করছে তিনমহল, ভিতরের ঘরে ঘরে হাওয়ার হাহাকার, নীচের তলাটা প্রেতলোক, আশেপাশে কোথাও জনমানবের সাড়াশব্দ নেই, বস্তিপল্লীতে সরকারি ভাঙ্গনের ফলে সমস্ত লোকজন পাড়া ছেড়ে কে কোথায় চ'লে গেছে, অন্ধকার সাঁ সাঁ করছে বাড়ীর ভিতরে ও বাহিরে। হয়ত পিদিমের তেল ফুরিয়ে এসেছে, কিন্তু সে অন্ধকারে কোনো এক ঘরে ব'সে রয়েছেন মামা। চোখে তাঁর ঘুম নেই, কিন্তু ঘুমেল চোখ। গড়গড়ার নলটা হাতে, আফিঙের আমেজ আছে মাথায়, উবু হয়ে ব'সে আছেন তিনি ছেঁড়া কাঁথার ওপর,—আর ভাবছেন শুধু হাইকোর্টের কথা। এই প্রেতপুরী তাঁর পৈতৃক, এ হোলো ফলনা ভট্টাচার্যির সম্পত্তি,—তিনিই একমাত্র ওয়ারিস, সুতরাং মহামান্য হাইকোর্টের সাহায্যে এ সম্পত্তি জননীর হাত থেকে ছিনিয়ে আনা দরকার! মামলা একবার ঠুকলে আর তাঁকে রোখে কে?

কিন্তু মামলার খরচের টাকা?

মামা এলেন একদিন সকালে মাণিকতলার ভাড়া বাড়ীতে। বাড়ী বিক্রির রেজেস্টারী তা'র এক সপ্তাহ আগে হয়ে গেছে। দিদিমা সমস্ত টাকা পেয়ে গেছেন ক্রেতার হাত থেকে। এখন তিনি অতিশয় শোকার্ত হয়ে কাশী যাবার জন্য মন প্রস্তুত করছিলেন। বাড়ী ছেড়ে দেবার জন্য মামাকে একমাসের সময় দেওয়া হয়েছিল।

মামা এসে দিদিমার সামনে অদূরে বসলেন। পুরনো ছাতাটি দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে বললেন, হয়ে গেছে বিক্রি? টাকা পেয়ে গেছ?

দিদিমা বললেন, হ্যাঁ।

মামা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে এক সময় বললেন, হুঁ, গজকচ্ছপ! পাছে মামলা বাধে আমার সঙ্গে, তাই ব্যাটা এখনো দখল নিতে আসেনি বুঝতে পারছি।

দিদিমা বললেন, সে আসেনি, পেয়াদা আসবে! বাঁশের চাড়া দিয়ে তুলবে। একমাস পেরিয়ে গেলেই গলাধাক্কা!

তুমি বোঝো না, বিষয় সম্পত্তির কিছু বোঝো না তুমি!—মামা বললেন, আমি না বলেছিলুম, স্ত্রীধনের প্রমাণ নেই? ছেলে ওয়ারিশন্ থাকতে মায়ে বেচতে পারে না? ওসব বিক্রি আর রেজেস্টারী রাখো! টাকা হোলো কপালের ফল, হাতে পেয়েছ রেখে দাও। আর টাকা পেলেই কি সম্পত্তি হাতছাড়া হয়! আদালত-মকোদ্দমা নেই? হাইকোর্ট নেই? বাড়ীর কওলা রেজিস্টারী দলিলে বেচে টাকা পেয়েছ, বহুৎ আচ্ছা, টাকাটা তুলে রেখে দাও। ল্যাঠা চুকে গেল! আমি বাড়ী ছাড়িনি, কারণ বাড়ী আমার! তুমি বাড়ী ছেড়েছ, টাকা তোমার! সোজা কথা! টাকাটা তোমার, আর বাড়ীখানা আমার!

দিদিমা বললেন, সকালবেলা বুঝি গাঁজায় দম দিয়ে এসেছিস?

ওই দ্যাখো, উলটো বুঝলি রাম!—মামা যেন একটু ক্লান্তকণ্ঠে বললেন, কথাটা বোঝো, সাক্ষীর জোরে কি না হয়! অত বড় হাইকোর্ট দাঁড়িয়ে আছে শুধু সাক্ষীর জোরে! তোমার সাক্ষী না হয় হীরেন দত্ত, আর আমার সাক্ষী খাঁদা শুঁড়ি নেই? ওই তোমার গোবর্ধন ময়রা নেই? কার্তিক স্যাকরা নেই? সব আছে, সব উঠবে মাটি ফুঁড়ে! মামলার টাকা পেলেই বাড়ীখানা ফিরিয়ে আনবো!

মামলা চালাবি, হাইকোর্ট করবি, সাক্ষী ডাকবি,—টাকা দিচ্ছে কে তোকে?

তুমি!—মামা এবার গুছিয়ে বসলেন।

আমি! আমার নামে মামলা করবি, আর আমি তোকে টাকা দেবো? নেশাভাঙ ক'রে বুঝি তোর আর মাথার ঠিক নেই?

ওই দ্যাখো, আবার উলটো বুঝলি রাম! তোমার নামে মামলা হবে কেন? যে ব্যাটা বাড়ী কিনেছে, তা'র নামে! জাল-উইলের সম্পত্তি সে যে বেনামীতে কিনেছে! তুমি টাকা নিয়ে ব'সে থাকো গ্যাঁট হয়ে, ওবেটাকে আমি ঘুঘুর ফাঁদ দেখাবো! দেখছো না, ওই জন্যেই আজো দখল নিতে আসেনি! ব্যাটা ফাঁকি দিয়ে সম্পত্তি হাত করতে গিয়েছিল কিনা, তাই পুলিশের ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। এ যে ফৌজদারি মামলা, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর!

দিদিমার কাছাকাছি আমি এক পাশে বসেছিলুম। মামা হঠাৎ আমার দিকে তাকালেন। বললেন, কথাগুলো গিলছে দ্যাখো! ব্যাটা নিঘ্‌ঘাত গোয়েন্দা, মনে-মনে সব টুকছে!

মামার সেই ছোট ছোট ভীমরুলের মতন চোখ দেখলেই আতঙ্কে গলা শুকিয়ে আসতো। আস্তে আস্তে উঠে আমি আড়ালে স'রে গেলুম। মামা পিছন থেকে বললেন, জন-জামাই-ভাগ্‌না, তিন নয় আপনা! লুটেপুটে সব নিলে চিরকাল।

দিদিমা এবার আসল কথাটা পাড়লেন। বললেন, তাহলে তুই মামলাই করগে যা, আমার কাছে আর কেন?

তাই ত' যাবো,—শুধু টাকাটার অপেক্ষা।—মামা বললেন, আগে বাড়ীখানা ভাড়া দেবো, রসিদ কাটবো নিজের নামে। নতুন দলিল তৈরী করবো—উকীল এটর্নীরা আমার হাত-ধরা। সাক্ষীরা সব মজুত। বেটাকে এবার তুর্কি নাচন নাচাবো।

দুর্গা দুর্গা,—তোকে পেটে ধরেছি, সাত জন্মের পাপ! কিন্তু তোকে আমি পথের 'বেগার' করবো না। কুপুত্তুর যদ্যপি হয়, কুমাতা কখনো নয়! তিন হাজার টাকা তোকে আমি দেবো—লোকে জলেও ত' ফেলে দেয়,—তাই দেবো। এই টাকা নিয়ে মানে-মানে যদি জীবন কাটাতে পারিস ত' ভালো, নৈলে ভিক্ষে করিস, আমি আর খোঁজ নেবো না!

ঘাড় দুলিয়ে মামা বললেন, উল্টো বুঝলি রাম! তিন হাজার টাকা খরচ ক'রে তিরিশ হাজার টাকার সম্পত্তি ফিরিয়ে পাবো, এটা দেখলে না! তুমি দেখাবে গোপাল মল্লিক, আমি দেখাবো হাইকোর্ট। তিন হাজারই সই! মাসে পাঁচশো টাকা মামলায় খরচ হ'লে ছ'মাসে সম্পত্তি ফিরবে ওই টাকায়! কাঠ-গড়ায় দাঁড়িয়ে বলবো, হুজুর, খরচা সুদ্ধ আমার বাড়ী ফেরৎ চাই! জজের পেশকার হোলো আমার এক কলকের ইয়ার!—হ্যাঁ, টাকাটা কখন দেবে বলো দিকি?

কাল এসে নিয়ে যাস।—দিদিমা ওঠবার চেষ্টা করছিলেন।

ওর ওপর আর গোটা পঞ্চাশেক টাকা আমাকে দিয়ো। আমারো এই শেষ পাওনা! বাজারে কিছু ধার আছে, জামা কাপড় বিছানা কিছুই নেই, দুধের দরুণ তিন টাকা বাকি, আফিঙও ফুরিয়ে এলো! হাত একেবারে খালি।

মামার ক্লান্তকণ্ঠে কোথায় যেন উদ্দীপনার অভাব মনে হচ্ছিল। যে ব্যক্তি পরিবারের সবাইকে চিরদিন হত্যার ভয় দেখিয়ে ছুরিতে শান দিয়ে এসেছে, সে যেন হঠাৎ আজ জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

পরদিন এসে মামা টাকা নিয়ে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু কোনদিন তিনি মামলা ঠোকেননি। তা ছাড়া হাইকোর্ট অনেক দূর, অনেক কাঠখড় না পোড়ালে হাইকোর্টে পৌঁছন যায় না। তা'র চেয়ে বরং ওই টাকায় খাঁদাশুঁড়িদের পাড়ায় গিয়ে তিনটাকায় একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে দিব্যি দিন কেটে যাবে। তা'র আগে চুলের ঝুঁটি ধ'রে মামীকে বাপের বাড়ী থেকে টেনে আনা দরকার।

কিন্তু মামী আর এজীবনে স্বামীর ঘরে ফিরবেন না। কথা উঠলো, তবে কি মামা যাবেন শ্বশুরবাড়ী? কেউ বললে, তা যেতে পারেন। কেউ বললে, গেলেও মামীকে আর ফেরানো যাবে না। কেউ বা বললে, রাম বলো! শ্বশুরবাড়ী যাবেন উনি কোন্ মুখে? বছর তিরিশ আগে এক জামাই ষষ্ঠীর দিনে খাদ্‌রি বাঁশ নিয়ে শাশুড়ীকে ঠ্যাঙাতে গিয়েছিলেন। খড়ে নদী সাঁতরে শ্বশুর পালান, আর শাশুড়ী সেই জামাই ষষ্ঠির রান্নাবান্না ফেলে এক বাগ্দীর বাড়ীতে ঢুকে প্রাণ বাঁচান্!

তারপর?

তারপর যা হয়! পাড়ার ছেলেরা লাঠি সোঁটা নিয়ে পাঁদাড় পেরিয়ে জামাইকে তাড়া করে! কিন্তু জামাই তা'র আগেই শ্বশুরের বাক্স ভেঙ্গে লুটপাট ক'রে খিড়কির বাগান পেরিয়ে সট্‌কান্ দেয়! ধরতে পারেনি কেউ!

সুতারং জানতে পারা গেল, মামীকে ফিরিয়ে আনবার জন্য মামার পক্ষে আপাতত শ্বশুরবাড়ীর দেশে যাওয়া সম্ভব নয়। কিছুকাল পরে দিদিমার কানে খবর এসেছিল, হাইকোর্টের কোন্ উকীলের ফাঁদে মামা নাকি পা দিয়েছেন। সে-ব্যক্তি নাকি এই কথা জানিয়েছে, বাপের সম্পত্তি ছেলেই পায়। মামলা একবার ঠুকলেই বাজীমাৎ।

কাশীতে ব'সে দিদিমা এই খবর পেয়েছিলেন। কিন্তু আর কিছু জানবার ঔৎসুক্য তাঁর ছিল না। নিঃশ্বাস ফেলে কেবল বলেছিলেন, অনন্তরাম ন্যায়বাগীশও একদিন ভিক্ষেয় বেরিয়েছিল পথে পথে, দু'শো বছর পরে তা'র বংশ আবার ভিখিরি হোলো! মরুক গে, আমি আর ভাববো না!

প্রায় বছর ন'য়েক পর্যন্ত স্ব-গৌরবে মামা জীবিত ছিলেন। শেষের দিকে ঘুরতে ঘুরতে তিনি গিয়েছিলেন কাশী। দিদিমা তখন দৃষ্টিশক্তিহীন, কপর্দকশূন্য।

কাশীতে আমি তখন এক ছাপাখানায় চাকরী করি এবং দিদিমার কাছাকাছি থাকি। মামা উঠেছিলেন সোনারপুরার কোনো একখানা বাড়ীর নীচের তলাকার ঘরে। সমগ্র পল্লীটি মামার দাপটে তখন হৃৎকম্প। মামার কণ্ঠে সেই পুরনো ভাষা, সেই অতিপরিচিত কণ্ঠস্বর,—স্ত্রীধনের সম্পত্তি? সোনার পাথরবাটি? জাল-উইলের জোরে আমাকে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে খারিজ করেছে! আর আমি সবুর সইবো না। এবার এলাহাবাদ হাইকোর্টে এক নম্বর।

নখদন্তহীন বটে, কিন্তু বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের সেই প্রাচীন হিংস্রতা আজও অব্যাহত রয়েছে। তীর্থশ্রেষ্ঠ কাশীতে থেকেও তাঁর চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি। স্বভাবধর্ম তাঁর অক্ষুণ্ণই ছিল। দুর্যোধন মৃত্যুকাল অবধি সত্যাশ্রয়ী ছিল বৈ কি।

ঘটনাচক্রে মাসীর বাড়ী ছেড়ে আমাকে এক হিন্দুস্থানীর বাড়ীতে ঘরভাড়া করতে হয়েছিল। মাসিক ভাড়া দুই টাকা। মামা একদিন হঠাৎ সেখানে গিয়ে উঠলেন!

দৈনিক বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা উপেন মুখুজ্যে মশায় কাগজ বের করার আগে আহিরীটোলার শ্যামাচরণ ভাদুড়ীর কাছ থেকে হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন। উভয়ে ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ভাদুড়ীমশায়ের পরিবারবর্গ ছিলেন বৈবাহিক সূত্রে বিভূতি ওরফে রামেদের নিকট কুটুম্ব। সেই বসুমতীতে যুদ্ধের সময় থেকে অতিশয় উত্তেজনাকর শিরোনামা দিয়ে খবর বেরোত। একখানা কাগজকে ঘিরে দশ পনেরোজন লোক আশেপাশে দাঁড়িয়ে আকুল আগ্রহে খবর শুনত, পড়ত শুধু একজন ব্যক্তি। সংবাদপত্র পড়ার অভ্যাস না থাকার জন্য পদে পদে ওই পাঠকটিকে ভাষা, বাক্য, শব্দ, বানান—প্রভৃতির উপর হোঁচট খেতে হত। শ্রোতারা অনেক সময় বিরক্ত হলেও দাঁড়িয়ে থাকত এবং ভিড় বেড়েই যেত। ইংরেজী কাগজ সাধারণ লোকে পড়ত না। উচ্চ-বর্ণ এবং উচ্চ-শিক্ষিত যারা— শুধু তাদের এক বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে ঘুরত স্টেটসম্যান, ইংলিশম্যান, ডেলি নিউজ ও বেঙ্গলী কাগজ। প্রথম দুখানা ছিল ইংরেজ বণিক সম্প্রদায়ের এবং তারা আড়ালে থেকে গভর্নমেণ্টের শোষণ ও শাসননীতি নির্ধারণ করত। পুলিস, হাইকোর্ট, আদালত, জেলাপ্রশাসন, প্রত্যেক বড় বড় সদাগরি প্রতিষ্ঠান, পোর্ট কমিশনারস্, প্রেসিডেন্সি বিভাগ, ম্যাজিস্ট্রেট মহল, হাইকোর্টের বার-লাইব্রেরী সর্বত্র ইংরেজ হ'ল কর্তা। সমস্ত শিক্ষা বিভাগ ওদের হাতে। তখন দু-তিনটি বিদেশী ব্যাঙ্ক ছাড়া একটিও এদেশী ব্যাঙ্ক ছিল না। শুধু ছিল ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল—সে ওদেরই হাতে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, ধনী-নির্ধন—সবাই ছিল ওদের বশম্বদ। যারা বড় বড় পদস্থ বাঙালী, তারা ধন্য হত ওদের সাহচর্যে। কোনও ইংরেজ সাহেব কোনও অপিসের বড়বাবুকে বেল বাজিয়ে ডেকে পাঠিয়েছেন, কিংবা ধমক দিয়েছেন, কিংবা তাঁর কাজের ঈষৎ সুখ্যাতি করেছেন—তা হলে ব্যস, সে রাত্রে তাঁর গৃহিণীর কাছে কী খাতির বেড়ে যেত! সেই গৃহিণী পাড়া-পড়শীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে অথবা আত্মীয়কুটুম্ব, জামাই, বেহাই—সবাইকে নেমন্তন্নে ডেকে সালঙ্কারে রসিয়ে রসিয়ে স্বামীর গৌরবগরিমার কাহিনী প্রচার করতেন!

তবে? এরা কারা? বসুমতীতে বেরিয়েছে, দেশের ভাল ভাল অনেক লোককে 'ভারত প্রতিরক্ষা' আইনে আটক করেছে? কেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ দেশত্যাগ করেছেন, আর তাঁর ভাই বারীন ঘোষ আন্দামানে বন্দী? তবে কেন সেই বাঘের সঙ্গে লড়াই-করা বাঘা যতীন মুখুজ্যে এই সেদিন বালাসোরে বুড়িবালমের ধারে লড়াই করল কলকাতার পুলিস কমিশনার টেগার্টের দলের সঙ্গে?

অজ্ঞান বিভূতির বয়স তখন বছর দশেক।

আবার সেই বারো বছর বয়সে শ্নেছে ওই বসুমতীতে—"প্রতিহিংসা, রক্তপ্লাবন, রুশিয়ার জারের ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে উন্মত্ত জনতা। বলশেভিকদের রণতাণ্ডব। লেনিনের সৃষ্টি পৃথিবীর নতুন ইতিহাস। সর্বহারা, ক্ষুধার্ত উৎপীড়িত নূতন জাতির আশা-ভরসা!"

তারপর চলে গেছে অনেক দিন। এখন তার পনেরো বছর বয়স। ওই বসুমতী আর নায়ক—এ দুখানা কাগজে সে দেখল, ভারতের রাজনীতিতে অহিংসবাদ এবং সর্বত্যাগী গান্ধীজীর অভ্যুত্থান। চিত্তরঞ্জন দাস, লালা লাজপত রায়, মোতিলাল নেহরু—আরও অনেক নাম শুনছে!

সেদিনের ওই অবাধ্য স্বেচ্ছাচারী ছেলেটার বাইরের চেহারা ছিল কৃশকায়। এমন কোনও বৈশিষ্ট্যের ছাপ নেই, যেটা অন্যের চোখে পড়বে। বন্ধুমহলে ও থাকত পিছিয়ে, ওর স্বাতন্ত্র্য বা স্বকীয়তা নেই, কেউ ওকে গ্রাহ্য করে না, মানুষ বলে ভাবে না। জ্ঞান, বুদ্ধি, চাতুরী, বিচক্ষণতা চিন্তাশীলতা, কূটনীতি—কিছু ওর মধ্যে নেই! ও যেন হাঁদা, উটমুখো, ওকে ঠিক সম্পূর্ণ মানুষ বলতে বাধে! ও থাকে সকলের শেষে, সবার পিছনে, চক্ষের আড়ালে। ও সব সময় চুপ করে থাকে, শুধু চেয়ে চেয়ে মনে মনে ভাবে।

কেউ কি জানে, ওর মনের গঠন কোথায় কি ভাবে তৈরি হচ্ছে? কেউ কি খোঁজ রাখছে কেমন ওর মনের প্রতিক্রিয়া? প্রতিদিনে প্রতিক্ষণে অলক্ষ্যে চারিদিকের জীবন থেকে ওর মন কি কি পদার্থ তুলে নিচ্ছে? ওর লেখা-পড়ার খবর, খেলাধুলো বা দুরন্তপনার খবর, ওর অন্ন বস্ত্র ইত্যাদির খবর সবাই নিচ্ছে—নিচ্ছে না শুধু ওর মনের খবর। কেউ একবারও জানতে চাইছে না, ও-ছেলেটা কী একা, কী নিঃসঙ্গ, কী নিস্পৃহ! অগণিত সংখ্যক বন্ধু আছে ওর, কিন্তু ওর মন যে কথায় কথায় পথ হারায়—কেউ কি তার খোঁজ রাখে?

পরের বছরে ওরা শুঁড়িপাড়া ছেড়ে উঠে গেল নারকেলডাঙ্গায় সেই মতি সেনের গলিতে! এ যেন আরও অবনতি। চারদিকে কাঁচা বীভৎস নর্দমা, সমস্ত দিন দুর্গন্ধেভরা! সরু গলির পূর্ব দিকটায় কয়েকখানা কোঠা বাড়ি, পশ্চিমটা সমস্তই হোগলা বস্তি। ওখানে থাকে নাপতে, ধোবা, মুদিমশলার দোকানী, ফিরিওলা, মোটরের ড্রাইভার, ছাপাখানার কম্পোজিটার—এমনি নানা লোক। কিন্তু এবার এই গলিতেই ওদেরকে থাকতে হবে চিরস্থায়ী। সর্বাপেক্ষা অসুবিধা, কলকাতার এই পূর্বপ্রান্ত ওদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। পরিচিত সমাজ, বন্ধু মহল, আত্মীয়-পরিজন, চেনা পথঘাট—এখান থেকে অনেক দূরে, তার চেয়ে দূর হ'ল গঙ্গা! কেউ আর নেই যেন ওদের। ওরা এখন একক পরিবার। আত্মীয়-স্বজন পরিজন থেকে ওরা বিচ্ছিন্ন, ওরা সম্পূর্ণ সমাজচ্যুত। ওরা যেন নোঙর-ছেঁড়া নৌকা!

নিচের তলায় ছোট বড় তিনখানা ঘর, দক্ষিণে উঠোন, পূর্বদিকে রান্না ভাঁড়ারের দুখানা ঘর। দোতালায় পশ্চিমমুখো দুখানা মোটামুটি ভাল ঘর। সম্পূর্ণ বাড়ি। ভাড়া মোট পঁয়তাল্লিশ টাকা। দাদাদের মাইনে বেড়েছে বছরে বছরে অল্পে অল্পে,—

কিন্তু পুষ্যি বেড়েছে তার চেয়েও বেশি। বাড়িতে দুটি বউ এসেছে। মোট দশ জন পুষ্যি। সব মিলিয়ে একশ টাকার মতো আয়। না, দারিদ্র্য ঘোচে নি! সেই অভাব অনটন, সেই অসন্তোষ ভিতরে ভিতরে। সেই কোনও মতে প্রাণধারণ করা।

ওই ছেলেটা—যার সম্বন্ধে আশা ভরসা করার কিছু ছিল না, সে ম্যাট্রিক টেস্ট দেবার আগে পালাবার চেষ্টা করছিল। ডি-ভ্যালেরা পালিয়েছে ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে জাহাজের তলার দিকে লুকিয়ে আয়ার্ল্যান্ড থেকে আমেরিকায়। নরেন ভটচার্য ওরফে মানবেন্দ্রনাথ রায় পালিয়েছে রাশিয়ায়, রাসবিহারী বোস পালিয়েছে জাপানে, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে এশিয়ায়। এই ছেলেটার সহপাঠী হরিদাস মাস্টারের ছেলে গত বছর পালিয়েছে নিউইয়র্কে। সে খৃষ্টানের ছেলে, কিন্তু এখন কপালে সিঁদুর মেখে পেতলের ছোট ছোট দেবমূর্তি সামনে বসিয়ে সে নাকি নিউইয়র্কের কোনো রাস্তায় গণৎকারের ছক নিয়ে বসে। বেশ মোটা তা'র রোজগার। সাহেব-মেমদের হাতের রেখা বিচার করে তাদের ভবিষ্যৎ এমন ব'লে দেয় যে, একটির পর একটি মিলতে থাকে। এখানে ওর বাড়িতে খবর এসেছে, পিন্টু আছে রাজার হালে। পাতু পালাবার কথা ভাবছে, সেও খৃষ্টান। তার মাসি বেথুন কলেজের মেট্রন। এ ছেলেটা তার ওখানে যায় পাতুর সঙ্গে। বেথুন কলেজের ভিতরে ভীষণ কড়াকড়ি, কোনও পুরুষ মানুষের পক্ষে হস্টেলের মেয়ে-মহলে যাওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু ওরা এখনও পুরুষ হয়ে ওঠে নি! ওরা মেয়েদের মধ্যে গিয়ে এখনও চুলবুল করতে শেখে নি, এখনও যৌনচেতনা ওদের দেহের মধ্যে বিষবাষ্প ঘুলিয়ে তোলে নি।

এ ছেলেটাও পালাবার চেষ্টা করছিল। জাহাজে পালানোই সবচেয়ে সুবিধা। সেও খালাসী হয়ে যাবে। যাবে সমুদ্রে, ভাসবে তরঙ্গে তরঙ্গে। সে ভূগোলের ভাল ছাত্র, এবারেও ফার্স্ট হয়েছে। সে জানে পৃথিবীর আগাগোড়া মানচিত্র। সে যাবে ছয়টি মহাদেশে। সে রবিনসন ক্রুশোর মতন নেমে পড়বে নির্জন এক দ্বীপে। সে খুঁজবে নতুন জীবন, উজ্জ্বলন্ত প্রাণ, অক্লান্ত অধ্যবসায়ের পথ। লেখাপড়া? উচ্চ-শিক্ষা? ভাবী চাকরিতে উন্নতি?—না, ওসব থাক। সুন্দর সুশৃংখল জীবন চাইছে না সে। ললিত লাবণ্যের মদিরতা তার কাম্য নয়। তাকে ডাকছে সমুদ্র, মরুভূমি; তাকে ডাকছে অজানা দেশ, ডাকছে উত্তুঙ্গ পর্বতমালা, গহন অরণ্যানী, ডাকছে এমুন্ডসেন্, ডাক দিয়ে যাচ্ছে কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস, ডাকছে ভিকটোরিয়া ওয়াটার ফলস্!

ম্যাকিনন ম্যাকেনজি আপিসে জাহাজের খালাসী রিক্রুট করা হচ্ছিল। সেখানে প্রায়ই ভিড় ক'রে থাকে নোয়াখালি আর চট্টগ্রামের মুসলমান বাঙালীরা। ওরা জলাদেশের মানুষ, সাঁতারে বিশেষ পটু। ওদের পোশাক হ'ল ছিটের লুঙ্গি, গায়ে বেনিয়ান, কাঁধে গামছা। ওরা জাহাজের দড়িদড়া টানে, মেসিন-ঘরে কাজ করে, বর্ষা-বাদলে ঝড়ের সমুদ্রে ওরা ডেকের তেরপল ঝোলায়, বিপদের কালে নৌকা ও লাইফ-বেল্ট নামিয়ে দেয়, ওরা জাহাজের নিরাপত্তার খোঁজ রাখে।

লুঙ্গি কোথায় পাওয়া যায়, ছেলেটা জানে না। গামছা একখানা জুটল। কিন্তু বেনিয়ানের বদলে গেঞ্জি। খালি পা। তাই সই। কিন্তু ও কি ওর দুঃখিনী বিধবা জননীকে দুঃখ দিয়ে যাচ্ছে? যিনি চিরকল্যাণময়ী, ভক্তিমতী, ধর্মপরায়ণা,—তাকে কি সে আঘাত দিয়ে যাচ্ছে, যাচ্ছে প্রতারণা করে? কই না, সে ত ঠকাচ্ছে না, সে ত নিষ্ঠুরতার কোনও ইতিহাস রেখে যাচ্ছে না, সে ত জননীর কোল ছাড়া থাকছে না! যেখানে যে-দেশে যে-সমুদ্রেই সে যাক না কেন, জননীর আশীর্বাদ যে চলল তার পিছু পিছু! সে যাচ্ছে না, তাকে নিয়ে যাচ্ছে যেন আরেকজন কেউ, তাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না তার ভিতরকার আত্মতাড়না! যে তা'র সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে, যে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে, সেও যেন অশরীরী এক বিশ্বজননী বিশ্বেশ্বরী!

ছেলেটা চোখের জল মুছল লালদীঘির পাড়া দিয়ে যাবার সময়। কেন তার অন্তরাত্মা এই দিনমানের রৌদ্রের আলোয় এমন ক'রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে? সে পিছন ফিরে তাকাল। কই না, কেউ তাকে অনুসরণ করছে না ত? সে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে স্ট্র্যান্ড রোডের মোড়ে দাঁড়াল। আজ সোমবার, ওরা আজ লোক নিচ্ছে।

লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে ওরা। সোরগোল করছে ওরা নিজেদের ভাষায়। কিন্তু সে ভাষা কি বাংলা? রাম আগে এ ভাষা শোনে নি ত? ওর সহপাঠী গৌরীশঙ্কর, সে নাকি বাঙ্গাল দেশের ছেলে। বাঙ্গালদের ভাষায় সে কথা বলে। কিন্তু সে দুর্বোধ্য নয়। এ যেন অন্যপ্রকার। এর বাক্য, শব্দ, উচ্চারণ, হাসি, পরিহাস—কোনটাই সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। ওদের সবাই বয়স্ক, বহুলোকেরই কালো-কালো দাড়ি, কালো-কালো চেহারা, ষণ্ডা-ষণ্ডা দেখতে,—কিন্তু ওদেরই সঙ্গে ওকে এখন থেকে থাকতে হবে। অথচ ওদের সঙ্গে ওর মিলছে না কোথাও। ভাষায়, চেহারায়, স্বাস্থ্যে ভঙ্গীতে,—কোথাও মিল ঘটছে না!

হঠাৎ এল এক যমদূত। খাকি পোশাক পরা, গোঁফ চোমরানো এক হিন্দুস্থানী আপিসের দারোয়ান। পিছন থেকে এসে ওর ঘাড়ের কাছে গেঞ্জিটা মুচড়িয়ে ওকে টেনে আনল লাইনের ভিতর থেকে।—আরে লওণ্ডে, হিঁয়া ক্যা কাম? জবাব দো!

ভয়ত্রস্ত মুখে রাম কি যেন বলতে গিয়ে থতিয়ে গেল। অতগুলো লুঙ্গির মধ্যে তার কেবল ধুতি! অতগুলো কালো লোকের মধ্যে সে নাকি ধওলা! অতগুলো চুলদাড়ির মধ্যে তা'র শুধু গোঁফের রেখা! সে ধরা পড়ে গেল তার হিন্দু-বৈশিষ্ট্যের জন্য। হিড়হিড় করে লোকটা তাকে টেনে নিয়ে এল বাইরে। তারপর কপালে কি ঘটল, সেটা আর আলোচ্য নয়। রাস্তার এক পাহারাওলা তা'কে ধরে বেশ ঝাঁকুনি দিয়েছিল!

মতি সেনের গলির দক্ষিণ প্রান্তে ষষ্ঠিতলা রোড। পূর্বদিকে কিছুদূর এগিয়ে গেলে স্যার গুরুদাস বাঁড়ুয্যের চারখানা বাড়ি। এদিকে পাড়ার এক লাইব্রেরীতে সেদিন সন্ধ্যাবেলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতায় আগুন ছুটছিল। লোকে লোকারণ্য। তখন লাউড-স্পীকারের যুগ আসে নি।

সর্বত্যাগী দেশবন্ধুর কণ্ঠে ঝলসিয়ে উঠেছিল তাঁর প্রাণোত্তাপ: "এ মিথ্যে, এ ফাঁকি, এ প্রতারণা! ইস্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি—এ সব ত গোলামখানা! ওই গোলামখানায় তৈরি হয় ইংরেজ শাসকশ্রেণীর ক্রীতদাস! আমার দেশ, আমার জাতি, আমার সমাজ—এর ওপর শুধু আমার প্রভুত্ব চলবে! স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার! আজ তাই গোলামখানা ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়তে হবে দেশের যুব সমাজকে। দেশের আশা ভরসা যারা,—যারা দেশের ভবিষ্যৎ। সমস্ত দেশ ও জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে। কোটি কোটি ভারতবাসী এই অহিংস সংগ্রামে এগিয়ে এলে সাধ্য কি ওদের—এই শক্তিকে রোখে? এই স্বরাজলাভ আর স্বাধীনতালাভ যদি না ঘটে, তবে আমার মৃত্যুর পর তোমরা লিখে রেখো, বাংলাদেশে এক বাতুল জন্মেছিল!"

সভাস্থল ফেটে পড়েছিল উন্মত্ত করতালিধ্বনিতে।

শীতকাল। পরদিন বৃষ্টি হচ্ছিল। হু হু ক'রে শীতার্ত বাতাস বয়ে যাচ্ছে। হেদুয়ার পূর্বদিকে স্কটিশ চার্চ কলেজের বড় গেটের সামনে সত্যাগ্রহী যারা পথ আগলিয়ে শুয়েছিল তাদেরকে দেখার জন্য শত শত লোক ছাতা মাথায় দিয়ে আশে-পাশে ভিড় করেছে। এ 'গোলামখানা' বন্ধ করতে হবে। কোনও ফাঁকে কেউ যেন ভিতরে ঢুকতে না পারে। আগে স্বরাজ পাওয়া চাই, তারপর নতুন শিক্ষাপদ্ধতি চালু হ'লে তবেই লেখাপড়া! ইংরেজিতে বলা হয়েছিল, "Education can wait but Swaraj can not."

এ সব অহিংস আন্দোলন। যদি কেউ ভিতরে ঢুকতে চাও, তবে সত্যাগ্রহীদেরকে মাড়িয়ে ভিতরে ঢোকো! অনেকেই ঢুকছে মানুষকে মাড়িয়ে-মাড়িয়ে। স্কচ প্রফেসর, খৃষ্টান ও হিন্দু প্রফেসর, রাজভক্ত সমাজের দু'চারজন ছাত্র, কলেজ স্টাফের দু'চারজন চাকুরে।

ওদের মধ্যে পাশ ফিরে শুয়েছিল শ্রীমান রাম। শীতে আর বৃষ্টিতে সে কুঁকড়িয়ে গেছে। ভিজেছে আগাগোড়া। রাস্তার মেঝের ঠাণ্ডা অসহ্য মনে হচ্ছে। মুখখানা কেবল সে বাঁচাচ্ছে পাছে কেউ জুতো দিয়ে তা'র মুখ থেঁৎলিয়ে যায়! চোখ পিট-পিট করছিল সে। মোটাসোটারা যেন তাকে না মাড়ায়! তা'র ঠ্যাং দুখানা জুতো দিয়ে রগড়িয়ে দিয়ে গেল এক অধ্যাপক। ওর বাপ বোধ হয় তা'র মেসোর মতই বুড়ো রায়বাহাদুর! এবার দম বন্ধ করে মুখ টিপে রাম পড়ে রইল গাদাগাদির মধ্যে। বৃষ্টি পড়ছিল টিপটিপ করে।

স্বরাজ পাবার পর দেশের চেহারা কেমন হবে, স্বরাজ কেমন বস্তু, প্রকৃত অর্থ তা'র কি প্রকার—এসব ব্যাপার রামের কাছে খুবই অস্পষ্ট। দেশবন্ধুর বক্তৃতায় তার শরীরের রক্ত টগবগ ক'রে ফুটে উঠেছিল সত্য, কিন্তু এখন এই শীতের দিনে ঝড়ো বৃষ্টিতে তার সেই রক্ত হিম হয়ে এসেছে। সন্ধ্যার পরেই তা'র নিশ্চয় জ্বর আসবে, সেই সেবার ১৯১৭ সালের ডেঙ্গুজ্বরের মহামারীতে যেমন তাদের খুব জ্বর হয়েছিল। জ্বর হয় হোক, কিন্তু নিমোনিয়ায় মারা গেলে স্বরাজ দেখছে কে? রাম এবার কোঁচার খুঁট খুলে মুড়ি দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে বুকের তলায় দু'হাত চেপে রইল।

ওতে একটু গরম হয়। বেলা দশটা থেকে চারটে,—ছ'ঘণ্টা। সুদীর্ঘকাল! সত্যাগ্রহীরা মড়ার মতো প'ড়ে রইল সেই টিপিটিপি বৃষ্টির মধ্যে।

সে যে অনন্তকাল। মাঝে মাঝে চিৎকার উঠছে, 'বন্দে-এ মাতরম্।' আজ শ্রীমান রামও ওদের সকলের মতো দেশের 'বীরসন্তান', ও নাকি আজ পরাধীন ভারতের মুখোজ্জ্বল করছে! ওরা নাকি দেশ ও জাতির গৌরব। 'বন্দে-এ-এ মাতরম্।'

শত শত লোক ছাতা মাথায় দিয়ে কিংবা বর্ষাতি চড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে। কিন্তু দূরের থেকে দু-চারজন লাঠিওলা লাল-পাগড়ি দেখা মাত্র ছাতাসুদ্ধ দৌড় মারছে! ওরা আগে পালাবার পথ ঠিক করে রাখে! আগে পৈতৃক প্রাণটা, তারপর স্বরাজ। যঃ পলায়তি স জীবতি!

কী বোকা ঐ রাম! ওখানে ওই বৃষ্টির মধ্যে মুখ থুবড়িয়ে থেকে আর কতক্ষণ ধ'রে সে ভারতের মুখোজ্জ্বল করবে? শীতে কাঁপছে সে, কিন্তু হাসি পাচ্ছে! সেই সকাল আটটায় সে খানচারেক বাসি রুটি খেয়ে নারকেলডাঙ্গা থেকে হাঁটতে হাঁটতে এখানে এসে সটান শুয়ে পড়েছে। এখন বেলা প'ড়ে এসেছে।

হঠাৎ রামের কেমন যেন সন্দেহ হ'ল। আর কোথাও টুঁ শব্দ নেই, কোনও দিক থেকে আর বন্দে মাতরম্ শোনা যাচ্ছে না। সে মুখের থেকে কাপড় সরিয়ে মাথা তুলল। আরে, এ যে কোথাও কেউ নেই! সামনে কলেজের গেট বন্ধ। সবাই ভোজবাজির মতো কখন যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে! ত্রি-সীমানার মধ্যে জনমানব নেই। শুধু অদূরে দু'জন লাল-পাগড়ি তা'র দিকে চেয়ে হি হি ক'রে হাসছিল।

অত চওড়া রাস্তার ওপর বোকারাম কতক্ষণ একা ওইভাবে পড়েছিল, কে জানে। এবার সে তড়াক ক'রে উঠে দাঁড়াল। জবজব করছে ভিজে সর্বাঙ্গ। জামা কাপড়ে আগাগোড়া জুতোর কাদার ছোপ-ছোপ দাগ। হেদুয়ার জলে জামা কাপড় না কাচলে বাড়ি যাবার উপায় নেই। শুধু ফিতে বাঁধা জুতো-জোড়াটা জলে ডুবিয়ে নিলেই চলবে। রাম সবসুদ্ধ নিয়ে হেদুয়ায় ঢুকল।

শ্রীমান সে বছর টেস্ট পরীক্ষা দিল এবং ফার্স্ট চান্সেই বেরিয়ে গেল।

জানুয়ারী মাস থেকে আবার প্রবল রাজনীতিক আন্দোলন। পরিচালনা করছেন গান্ধীজী। এই আন্দোলনে এই প্রথম নামলেন বাঙ্গালী মহিলা। দেশবন্ধুর স্ত্রী বাসন্তী দেবী, দেশবন্ধুর ভগ্নী ঊর্মিলা দেবী। ওঁদের সঙ্গে বেরোলেন হেমপ্রভা মজুমদার আর জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী। সম্রাটের পুত্র প্রিন্স অফ্ ওয়েলস আসছেন ভারত ভ্রমণে, তাঁকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, তিনি যেখানেই যাবেন—সেখানেই হরতাল হবে! অহিংস ভারতের অন্য অস্ত্র নেই। ভারতব্যাপী ধরপাকড় আরম্ভ হয়ে গেল। মহিলারা সত্যাগ্রহ আরম্ভ করলেন এবং তাঁদের গ্রেপ্তার করা হ'ল। কর্তৃপক্ষ সেইকালে গান্ধীজীকে ছয় বছরের জন্য জেলে পাঠালেন। উত্তাল হয়ে উঠল ভারত।

সেই বছরেই অর্থাৎ ১৯২২ সালের দোল পূর্ণিমার দিন বেরোল 'আনন্দবাজার

পত্রিকা'। ওই ছেলেটা গিয়ে পটলডাঙ্গার মোড় থেকে দু' পয়সা দিয়ে একখানা লাল শিরোনামার কাগজ কিনে নিয়ে এল।

সেই বছরেই রাম পাস করল, কিন্তু স্কটিশ চার্চ কলেজের বুড়ো প্রিন্সিপ্যাল জে জে ওয়াট ওকে কলেজে ঢুকতে দিল না। ওর বিরুদ্ধে অনেক নালিশ। ও নাকি বালগঙ্গাধর তিলকের শোকমিছিলে অংশ নিয়েছিল, মিশনারি ইস্কুলের মধ্যে দোল খেলেছিল, কয়েকজন মাস্টারকে নানাভাবে হায়রান করেছিল, ক্লাসের ভিতরে ব'সে 'দেশের শত্রু' গান্ধীর গল্প ফেঁদেছিল, এবং কলেজ-গেটে সত্যাগ্রহ ক'রে শুয়ে পড়েছিল। ইস্কুলে ওর রেকর্ড খুব খারাপ।

কান্নাকাটি, হাত জোড় করা, ক্ষমা চাওয়া, নাকখৎ দেওয়া—কোনও কিছুতেই ওয়াট সাহেবের মন ভিজল না। ওরা সামনে দিয়ে একে একে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা স্কটিশ কলেজে ভর্তি হল। রাম একা পথে নেমে এল।

বাইবেল পরীক্ষায় ওর নম্বর বেশ ভাল উঠত। ও গেল ডাফ চার্চে। সেখানকার খাতায় ওর নাম ছিল কাশীনাথ। বছর দুই আগে ওর বন্ধু নবকুমারের সঙ্গে ওর মাথাতেও পুণ্যসলিল জর্ডন নদীর জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। মন্ত্র পাঠ করেন রেভারেন্ড। ওর নামের আগে বসানো হয়, ভিক্টর। তখন থেকে ও নাকি খৃস্টান! যেমন পাতু, পিন্টু, মিমি, আঙুলকাটা যতিনদা এবং আরও অনেক বন্ধু। কিন্তু হোক না খৃস্টান, এদিকে সে যে নিষ্ঠাবান কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান, ঋগ্বেদে তাঁর অধিকার। সুতরাং যথাসময়ে সেই বছরেই ওর হয় 'উপনয়না'! দিদিমার বাড়িতে যাগযজ্ঞ, হোম—মহা ধুমধাম। সেই হোমের আগুনের সামনে ওকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করতে হ'ল। ওর কান ফুঁড়ে হলুদ সুতো আর সোনার কাঠি ঢুকিয়ে দিল। ওর মাথা ন্যাড়া ক'রে দেয় নাপিত। ওর আঙুলে ওঠে ছিলেকাটা আংটি, গায়ে গরদের জোড়, হাতে তালপাতা বাঁধা যষ্টি। চারদিনের দিন ভোরে গিয়ে গঙ্গায় 'দণ্ডী' ভাসানো। ফিরে এসে 'নিয়মভঙ্গ'। তখন রাজবেশ ধারণ করো! ও যে হিন্দুকুলতিলক বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ।

কিন্তু জর্ডন নদীর জল মাথায় ছিটোবার পর ওই ছেলেটা পেয়েছিল প্যাকেট মোড়া ভাল-ভাল খাবার। চপ, কেক, সন্দেশ, খাস্তাকচুরি—অনেক। একখানা সিল্কের রুমাল, এক শিশি এসেন্স, এক বাক্স পিয়ার্স সোপ, ঘুড়ি ও লাটাই। সানডে-সকালের সার্ভিসে লজেন্স, চকোলেট আর কেক। পাঁচ বছর আগে সেই দর্জিপাড়ার নিবারণ দাসের সুন্দরী বৌটা শ্রীমান বিভূতির চোখে জল দেখে বলেছিল, এ শুধু জল নয় ভাই, এ হল প্রেমাশ্রু। তোমার বয়স আমার চেয়ে অনেক কম। কিন্তু তুমি ওঁদের মতন পরম বৈষ্ণব।

বোষ্টমদের মুখে এমন স্তুতিবাদ শুনে ছেলেটার ল্যাজ মোটা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে আসলে ছিল নির্বোধ। সে ওই মেয়েছেলেটার কথা শুনে ওদেরই কীর্তনীয়ার দলে ভিড়ল। ওর গলাটা মন্দ ছিল না। মাকে লুকিয়ে-লুকিয়ে বিভূতি বেরিয়ে পড়ত ওপাড়া থেকে সে-পাড়ায় কীর্তুনেদের সঙ্গে বারোয়ারি মিছিলে গান গেয়ে—

প্রেমে ঢল ঢল গল গল গল ছল ছল ছল করুণ নয়নে দুটি ভাই। ও তার একটির নাম গৌরহরি আরেকটির নাম হয় নিতাই—'।

ওদিকে মিশনারি ইস্কুলে ওর সহপাঠী বন্ধুদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ছিল আলতাফ, জলালুদ্দিন ও কামাল। ওরা ওকে নিয়ে যেত ওদের সেই নিকিরিপাড়ায়। সেখানে ছিল মসজিদ,—তা'র উঠোনে গুলী খেলা হত। সেখানে আজান্ দিত ঠিক সন্ধ্যার আগে। সেখানে কলমা পড়ায়। কিন্তু তা'র ভাষা আর উচ্চারণ কারও রপ্ত হত না। আল্‌তাফ হাসত। ওখানে চারদিক নোংরা, আর সেই কাওরাদের মতন বস্তি, নালা-নর্দমা। মুর্গি চরত চারদিকে। ওখানে যাতায়াত করতে ভাল লাগত না। না, ওটায় আর দরকার নেই।

ওকে স্কটিশ চার্চ কলেজে যখন কোনমতেই নিতে চাইল না ও তখন রবিবার সকালে ডাফ চার্চের সার্ভিসে গিয়ে ঢুকল। বাইরে থেকে এসেছেন একজন নামকরা বিশপ। তাঁর পিছনে জ্যোতির্মণ্ডলময় খ্রীস্টের সৌম্যমধুর ছবি। মাতা মেরী তার পাশে। যীশু পাপীকে ক্ষমা করেন, অপরাধীকে আশ্রয় দেন। অন্যায় ও দুষ্কৃতকারীকে তিনি কল্যাণের পথ দেখিয়ে দেন, দুঃখীর দুঃখ দূর করেন। ওই দিকে তাকিয়ে বিভূতি বার দুই চোখের জল মুছল।

কিন্তু, এত কাণ্ড করেও বিভূতির পিতামহপ্রতিম ওই খৃস্টান ধর্মযাজক ওয়াট সাহেবের মন কিছুতেই পাওয়া গেল না। বারম্বার অনুরোধ-উপরোধ, কিন্তু তিনি আপন সিদ্ধান্তে অটল রইলেন।

অবশেষে নিঃসঙ্গ বিভূতি গিয়ে আমহার্স্ট স্ট্রীটের সিটি কলেজে ভর্তি হল। তার মনে রুদ্ধ আক্রোশ জমা হতে লাগল। প্রতিশোধস্পৃহা, হিংস্রতা, বিদ্রোহবাদ বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি আকর্ষণ, চলতি জীবন ব্যবস্থার প্রতি অহেতুক বিরাগ—এগুলি তাকে পেয়ে বসল।

অত্যন্ত বিরক্তি, বিদ্বেষ ও ঔদাসীন্যের সঙ্গে সে মাসের পর মাস কলেজ করতে লাগল। খৃস্টান সমাজের সঙ্গে তার সকল সম্পর্ক সে ছিঁড়ে ফেলে দিল। মেয়েদের ডান্ডাস হস্টেল্, ওয়ান্ হস্টেল্, ডাফ চার্চ, অগিল্‌ভি, ডাফ হস্টেল,—এদের ত্রি-সীমানার থেকে সে দূরে চলে গেল।

এবার সে যেন আসছিল ধীরে ধীরে একটা অজানা বাইরের জীবনে। সে ঘুরছিল আপন গণ্ডীর মধ্যে, পরিচিত সমাজের আশেপাশে। সে যেন এবার সেখান থেকে সরে যাচ্ছিল, ছিট্‌কিয়ে পড়ছিল এখান থেকে ওখানে। কী সে চাইছে সে জানে না, চোখের সামনে যা আসছে, তা সে চায় না। তার গতি ও বিধি কারও জানা নেই। ওর মনের খবর কেউ রাখছে না। ও যাচ্ছে মাসের পর মাস ভরা দুপুরের রৌদ্রে সেই হোগলা-কুঁড়ের মোড়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে, কিংবা সেই মেট্‌কাফ হলের ইম্পিরিয়ল লাইব্রেরীতে, কিংবা কলেজের মাইনে থেকে কিনছে কতকগুলো সাময়িক পত্র আর ওয়েলিংটনের মোড় বা প্রেসিডেন্সির রেলিং থেকে মাঝে মাঝে পুরনো বই।

ছেলেটা নিজের মধ্যে রচনা করেছিল একটা বিচিত্র লক্ষ্মীছাড়ার জগৎ। সেই

জগতে তার কোনও দোসর খ‌ুঁজে পাওয়া যেত না। শৈশব থেকে সে শ‌ুধ‌ু নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে ঘ‌ুরেছে। অন্ধ কুসংস্কার, কুর‌ুচি কুশিক্ষা, তার সঙ্গে অন্ধ আচার, য‌ুক্তিহীন অন‌ুষ্ঠান, অর্থহীন লোকাচার—সব মিলিয়ে চারিদিকে যেন বেড়াজাল, র‌ুদ্ধশ্বাস অবরোধ। সেই কালে এক সময় সে গিয়ে দাঁড়াল সরকার বাগানে নতুন বন্ধ‌ুদের মাঝখানে।

এটা ছিল ব্রাহ্মদের পাড়া। ওদের মধ্যে ঢুকল সে। তাকে 'আনন্দমেলার' সভ্য করে নেওয়া হল। প্রতি দোল প‌ূর্ণিমায় বার্ষিক উৎসব। মাঝে মাঝে ছোটখাটো সম্মেলন। এই সম্মেলনের যিনি হোতা তাঁকে সবাই বলে, 'রাঙ্গাদা'। তাঁর পোশাকী নাম হরিহর চন্দ্র। যেমন মধ‌ুরভাষী, তেমনি অমায়িক। চেহারা যেমন সুশ্রী তেমনি মিষ্ট আচরণ। রাঙ্গাদার স্ত্রী হলেন তর‌ুণ ছেলেদের বৌদি। তিনি শিক্ষকতা করতেন রামমোহন লাইব্রেরী হলে ছোট একটি ইস্কুলে।

একে একে এ-বাড়ি আর ও-বাড়ি আর সে-বাড়িতে পাওয়া গেল দিদি তার বৌদিদি আর মাসিমা। অম‌ুক দাদা আর অম‌ুক মামা আর এক আধটি ছোট্‌কা। ওর মধ্যে মাঝে মাঝে পাইকপাড়ার মাঠে বালকবালিকা আর তর‌ুণ-তর‌ুণীর উৎসব। ওই প্রথম স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল 'মেয়ে' দেখা গেল। যারা স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ে, যারা গান গায় রবিঠাকুরের, যারা চড়িভাতি করতে যায় বন্ধ‌ুদের সঙ্গে।

ওখান থেকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গলিঘ‌ুঁজিতে আনাগোনা, ছেলেমেয়ে মহলে জনপ্রিয়তা, এখানে ওখানে নেমতন্ন, টুকিটাকি চিঠি লেখালেখি, এমন কি মান-অভিমানের পালা পর্যন্ত। কার সঙ্গে কার বেশি ভাব তাই নিয়ে চুপি চুপি জল্পনা। ওই কানাকানির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তর‌ুণ-তর‌ুণীরা। ইভা, ললিতা, নোটন, সত্যেন, দীপেন। কে ল‌ুকিয়ে সিনেমা দেখেছে, কে গোপনে প্রতিমা দর্শন ক'রে এসেছে, কোন্‌ ছেলে অশ্লীল একটা উক্তি করেছে, কা'র বির‌ুদ্ধে কে লাগিয়েছে, এবং কার গোপনীয় চিঠি কে ধরে ফেলেছে,—এ নিয়ে অজস্র কলকাকলী। ওই পাড়াতেই সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দিরের কোণে ছিল 'প্রবাসী' আপিস এবং ওই সর‌ু গলিতেই থাকতেন কোন কোনও আচার্য—তাঁরা অতিশয় রক্ষণশীল।

শ্রীমান্‌ বিভূতি ওরফে কাশীনাথ ওরফে রাম,—যে-ছেলেটা আত্মীয়মহলে খোকা নামে পরিচিত,—সে ধীরে ধীরে এক অর্বাচীন সাবালক তৈরি হচ্ছিল। সে এখন নিজের শ্বাসরোধী ঘর ছেড়ে বাইরের জীবনে ঘর খ‌ুঁজছিল। সে ঢুকছে ব্রাহ্মসমাজে আর তার কাছে সঙ্গীত সমাজে, সে যাচ্ছে রামমোহন লাইব্রেরী আর গড়পার, সরকার বাগান আর সিংহীবাগান। সে স্কুল ছেড়ে কলেজে পড়ে, সে আনন্দমেলার সভ্য, নানা ব্রাহ্মপাড়ায় সে দিদি আর বৌদিদিদের অন্তরঙ্গ। তাকে দেখে মেয়েমহলে কেউ আড়ষ্ট হয় না, ছেলেমহলে কেউ হেনস্তা করে না, প্রবীণমহলে কেউ অনাদর করে না। সে নিরীহ, সে নীতিমান, সে সঙ্গীত, কাব্য ও সাহিত্যপ্রিয়। কেউ কেউ বলছে সে নাকি লেখক। সে হাতের-লেখা ম্যাগাজিনে অনেক লিখেছে। তার লেখা বেরিয়েছে নাকি 'মজলিশ' আর 'শঙ্খে'। একদা তার একটি গল্প চেয়ে নিল রাঙ্গাদা। সেই

লেখাটা ছাপা হল 'কল্লোল' নামক এক মাসিক পত্রে। সেটি ১৯২৩। সেই বছরেই 'কল্লোলের' জন্ম।

ছেলেটা বোধ হয় এবার লেখক হতে চাইছে। এবার থেকে বোধ হয় একরাশি চুল রাখবে।

এই সময় একটি ছোট্ট ঘটনা ঘটে, সেটি ওই ছেলেটি ভুলতে পারে নি। মনোমোহন বাবু নামক জনৈক অচেনা ব্যক্তি একদা গায়ে পড়ে পথের উপরেই ওই ছেলেটার সঙ্গে আলাপ করে। অতঃপর ঠিকানা নিয়ে বাড়িতে আনাগোনা করতে থাকে। মাঝে মাঝে চায়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে টোস্ট-আমলেট্ ইত্যাদি খাওয়ায়।

একদিন লোকটা নানা কথায় ছেলেটাকে নিয়ে গেল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। চোরবাগান ছাড়িয়ে চাষাধোবাপাড়ার ভিতর দিয়ে গেলে যে-দরজাটা পাওয়া যেত, সেই গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকেছিল। যাঁর সঙ্গে আলাপ হল, তিনি প্রবীণ ও সৌম্যদর্শন, পাকা দাড়ি গোঁফ। নাম ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অতি অমায়িক ও মিষ্টভাষী। তিনি কয়েকখানি বই বার করে ছেলেটাকে উপহার দিলেন। সেগুলি ব্রাহ্মসমাজ দর্শন সম্বন্ধে লেখা। ঠাকুর মশায় বিশেষ সমাদর জানিয়ে ওই ছেলেটাকে বললেন, তোমাকে আমি ব্রাহ্মোফাই করে নিতে চাই।

মন্দ কি? ছেলেটা হাসিমুখে রাজি হয়ে গেল। সে হিন্দু, সে খৃষ্টান, সে মুসলমান, পার্শী, বৌদ্ধ,—কোনটা সে নয়? ওই ক'খানা বই পড়ে আজ থেকে সে ব্রাহ্ম হবে, এবং বোধ হয় খাতায় নাম উঠবে, এবং ওঁদের সংখ্যা বাড়বে,—এই ত।

ঠাকুর মশায়ের ওখানে চমৎকার জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেদিন বইগুলো সঙ্গে নিয়ে ফিরবার পথে কল-মুখরিতকণ্ঠে ছেলেটা বলেছিল, প্রত্যেক সপ্তাহে আপনার সঙ্গে আসব, মনে রাখবেন মনোমোহনবাবু।

কিন্তু মনোমোহনবাবু আর কোনদিনই আসেন নি এবং ছেলেটাও আর কোনও-দিন যায় নি।

সেই রামখোকা একদা ডুবে গেল, কাশীনাথ হারিয়ে গেল, বিভূতি তলিয়ে গেল! ওই সংজ্ঞাগুলোর ভিতর থেকে যে ছোকরা নানা ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্যে ঘুরে ফিরে বেরিয়ে এসে কলকাতার রুক্ষ কর্কশ পথে দাঁড়াল, সে আরেকজন! সে দরিদ্র, অর্ধ-উপবাসী, হতভাগ্য। সে শুনে এসেছে এতকাল, তার স্বর্গত পিতার এক মস্ত গ্রন্থ-সংগ্রহশালা ছিল, সেই সমস্ত বই মাত্র চার পয়সা সের দরে সময়-সময় বিক্রি করে তবে তাদের অন্ন জুটত। তারও স্বপ্নের মতো মনে পড়ে, বস্তার পর বস্তাবন্দী বই পড়ে থাকত অন্ধকার সিঁড়ির তলায়—সেগুলোর মধ্যে আরশোলা, উই আর নেংটি ইঁদুরের রাজত্ব ছিল। তেতলার দোছত্রীতে থাকত অনেকগুলো বস্তা—যেগুলো বর্ষায় ছাদের ফাটলের জলে সপসপ করত। ওদেরই ভিতর থেকে বই টেনে তাদের কাগজে ছোট বাচ্চাদের দুধ গরম করা হত এবং বাড়িতে ঘুঁটে না থাকলে ওইসব বই জেবলেই উনুন ধরানো চলত।

ওই ছেলেটা কেবল হাঁটছিল নারকেলডাঙা থেকে মাণিকতলায় জগন্নাথ দে-র নতুন বাড়িতে। পাঁচ মাস ধরে সে-বাড়িতে চলছিল ভগবদ্‌গীতার ব্যাখা, কৃষ্ণকীর্তন, প্রভাসখণ্ড ও শ্রীচৈতন্যলীলা। কথকতা করছিলেন নিত্যানন্দ গোস্বামী। সুদীর্ঘ পাঁচ মাস—পৌষের আরম্ভ থেকে বৈশাখের শেষ। এই পাঁচ মাসের প্রতিদিনটি ছিল ওই ছেলেটার একাগ্রতার ও নিষ্ঠার ইতিহাস। এই পাঁচ মাস অবধি বেদনায়, কান্নায় আনন্দে, রসের কল্পনায়, মর্মের যন্ত্রণায় ও অন্তরের নিবিড় প্রেরণায়—সে ছিল আলোড়িত। প্রতিদিন সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত দশটা—সে যেন উঠে আসত অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যুর থেকে জীবনে! মৃত্যুর বেড়াজাল যেন চারিদিক থেকে তাকে ঘিরে রাখত, কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায় মুক্তি দিত ওই নিত্যানন্দ গোস্বামী। ওই লোকটা কীর্তনকথা ও আঁখরের মায়াজাল বিস্তার করে ওর একাগ্র চিত্তকে নিয়ে যেত আর্যাবর্তের সকল পুণ্যতীর্থে। ও গিয়েছে দ্বৈপায়ন হ্রদে আর দ্বারকায়, গিয়েছে প্রভাসে আর কৈলাসে, গিয়েছে বৃন্দাবনের ধীরসমীর আর কালীয়দমনের ঘাটে। ওর মন সর্বত্র কেঁদে বেড়িয়েছে।

বৈশাখের সংক্রান্তি তিথিতে সেবার ভরা শুক্লপক্ষ। সেদিনের শেষ অনুষ্ঠানের পর ছেলেটা সেই ঘন জ্যোৎস্নায় আপনমনে ফটক পেরিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় ভিড়ের ভিতর থেকে তার ঠিক পাশেই নারীকণ্ঠে শুনল, শোনো—

সচকিত হয়ে সে ফিরে তাকাল। চওড়া কালাপাড় শাড়ি পরা সুশ্রী এক মহিলা। তার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠা। মহিলা বললেন, আমাকে একটু এগিয়ে দেবে? রাত অনেক হয়েছে ত—

গলা পরিষ্কার করে ছেলেটা সসম্ভ্রমে বলল, চলুন—

দু'জনে বেরিয়ে হেদোর মোড়ের দিকে চলল। কথা কিছুই নেই—কেনই বা থাকবে? দু'জন সম্পূর্ণ পরস্পর-অপরিচিত। তবু সেই রাত্রির জ্যোৎস্নার তলায়-তলায় ওই ছেলেটার পা কাঁপছিল! মহিলা এক সময় বললেন, আমি কাছেই থাকি, এই হেদোটুকু পেরিয়ে গেলে সামনেই রায়বাগানের গলিতে—

যেন রূপমতীর দেহচ্ছটা! বেথুন কলেজের নিরিবিলি ফুটপাথ ধরে যাচ্ছিল দু'জনে। হঠাৎ মহিলা বললেন, বলো ত, এত লোক থাকতে তোমাকে কেন বললুম এগিয়ে দিতে?

ছেলেটা নির্বোধের মতো তাকাল ওঁর ধবধবে মুখশ্রীর দিকে। ওর মুখে কোন কথাই যোগালো না।

মহিলা বললেন, তা হলে শোন। এই পাঁচ মাস ধরে কেত্তনের আসরে কতবার তুমি আমার দিকে চেয়ে দেখেছ, মনে পড়ে? তুমি চেনা হয়ে গিয়েছ!

ছেলেটার কপালে ঘাম দেখা দিয়েছিল।

রায়বাগানের গলিতে ওরা ঢুকল। সরু গলিতে জনমানব কেউ নেই। শুধু কোন্ বাড়ি থেকে যেন শোনা যাচ্ছিল কালোয়াতি গান। ওরা সোজা এসে সিংহ-

মূর্তিমার্কা ফটকটির ডানদিকে ঘুরল। মৃত্যুঞ্জয়বাবুর বাড়ির ঠিক পাশেই আস্তাবলটার উঠোনে মহিলা ঢুকলেন। এ পাড়ার সব বাড়ি ও ছেলেটার চেনা।

বিদায় নেবার আগে মহিলা স্মিতমুখে বললেন, তোমাকে খুব ভালো লেগেছিল তাই বলে যাচ্ছি। কী যে ছিল তোমার চোখে, আমি খুব আকৃষ্ট হতুম। এই যে, এ বাড়ির নিচের তলায় আমি থাকি। বিধবা মানুষ, একলাই থাকতে হয়। একটা শুধু ঝি আছে, ঘর আগলায়।

ছেলেটা বলল, এবার আমি যাই—

মহিলা ও কথাটা কানে নিলেন না। কী যেন ভাবছিলেন। পরে বললেন, ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে বলি, মাঝে মাঝে এসো, গল্প করব, তোমাকে খাওয়াবে। কিন্তু সে সব থাক্, আমার সাহস হয় না। আচ্ছা, এসো—। মহিলা যেন সরীসৃপের মতো ভিতরের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ছেলেটা হাঁটতে হাঁটতে এসে হেদোয় ঢুকল। ঘাসের উপর এসে বসল।

হাওয়া দিয়েছে দক্ষিণের। হেদোর জল সেই হাওয়ায় আন্দোলিত হয়ে জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে। সে ভাবছিল, এ তার নতুন অভিজ্ঞতা। মহিলা কেন নিজের পরিচয় দিলেন, এবং কেনই বা গল্প করার ইচ্ছা প্রকাশ করেও তাকে আসতে একপ্রকার মানা করলেন,—এসব দুর্বোধ্য। যেটা রয়ে গেল ছেলেটার মনে, সেটি হ'ল, এই চন্দ্রহসিত জনবিরল রাত্রে একটি ছোট্ট ঘটনার ব্যঞ্জনা। ওই চন্দ্রবরণা নারী যেন মহাকাব্যের সেই আদি মহাসিন্ধুর ভিতর থেকে চিরযৌবনা উর্বশীর মতো সামনে প্রতিভাত হয়েছিল। ওই ছেলেটার মনে যেন বিগলিত রৌপ্যপ্রবাহের মতো একপ্রকার কাব্য সেই রাত্রে উচ্ছলিত হচ্ছিল।

ছি, এসব ভাবতে নেই। ললিত লাবণ্যের মোহ-মদিরতা তার জন্য নয়। সে মনে মনে বিবেকানন্দর একান্ত অনুরাগী। স্বামীজীর প্রত্যেকটি বই ও বাণী তার কণ্ঠস্থ। এ ধরনের ছোট ছোট ঘটনা তাকে ভুলে থাকতে হবে। তার সামনে এখন সুদীর্ঘ জীবনের পথ। তার এই ভাবান্তর তার পক্ষে অপমানজনক।

তুমুল রাজনীতিক আন্দোলন চলছে তখন দেশে। অসহযোগ আন্দোলনে বিশেষ কিছু হয় নি। ৩১ ডিসেম্বর পেরিয়ে গেলেও 'স্বরাজ' আসে নি। গান্ধীজী জেলে। বেরিয়ে এলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও মোতিলাল নেহরু। প্রথম জনের পিছনে এসে দাঁড়াল পরিণত যুবা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত—দেশবন্ধুর সকল কর্মের দোসর। এ ছাড়া আরও তিনটি তরুণ যুবক—সুভাষচন্দ্র, হেমন্ত সরকার ও কিরণশঙ্কর রায়। ওঁদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র আই-সি-এস চাকরি নিলেন না, হেমন্তকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যুজ্জ্বল রত্ন, এবং কিরণশঙ্কর ব্যারিস্টার ও তেওতার জমিদার। মোতিলাল নেহরুর পাশে পাশে সসঙ্কোচে আসছিলেন জওহরলাল—মোতিলালের একমাত্র পুত্র। দেশবন্ধু ও মোতিলাল—উভয়ে দেশবরেণ্য নেতা স্বরাজ্য পার্টি সৃষ্টি করলেন। এবার কাউন্সিলে ঢুকতে হবে। বাইরে থেকে অসহযোগ আন্দোলন আর নয়, এবার ওই বৃটিশ শাসনচক্রে ঢুকে ভিতর থেকে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। একে একে এলেন শরৎ বোস, রাজা কিশোরীলালের ছেলে তুলসী গোস্বামী, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং আরও

অনেকে। ভারতবর্ষ আবার চেতিয়ে উঠল। ইস্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলামখানায় ছেলেরা আবার ঢুকল। এই রকম একটা সময়ে স্কটিশ চার্চ কলেজে বোধহয় প্রথম সহশিক্ষার প্রচলন হ'ল। ছেলের সঙ্গে মেয়ে বসবে একই ক্লাসে— ? বজ্রাঘাত হ'ল রক্ষণশীলদের পাড়ায় পাড়ায়! কাগজে-কাগজে ব্যঙ্গচিত্র। কটুক্তি আর ব্যঙ্গোক্তি। দেশের সর্বনাশ হ'তে চলল, সমাজ ভেঙ্গে পড়ল, ছেলেরা উচ্ছন্নে যেতে বসল, মেয়েরা কলঙ্কবতী হয়ে উঠল!

সেই বছর প্রাক্তন অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাদুড়ী ইডেন গার্ডেনের একজিবিশনে 'সীতা' ও 'আলমগীর' মঞ্চস্থ করেন। এর আগে উনি ম্যাডান থিয়েটার্স এবং আর দু'চারটি প্রতিষ্ঠানে আবর্তিত হয়ে বন্ধুমহলের সহযোগে এবং আত্মবিশ্বাসের জোরে নিজের রঙ্গমঞ্চ সৃষ্টি করেন। উনি থিয়েটার-জগতে আবির্ভূত হয়ে পুরনো কালকে ভাঙছেন এবং নতুন কালের উদ্বোধন করছেন, নতুন ধরনের অভিনয়কলা ও রীতির প্রবর্তন করছেন, এইটি লক্ষ্য করে 'অবতার' সাপ্তাহিকে কটূক্তি ছাপা হতে লাগল! উনি নাকি মদ খেয়ে স্টেজের ভিতরে ও বাইরে 'হাম আলমগীর হ্যায়' বলে মাতলামি করে থাকেন। শিশিরকুমারের বয়স তখন বোধ হয় চৌত্রিশ। বয়স হিসাবে এটি নাকি মদ্যপানের উপযুক্ত কাল।—কিন্তু বড় আর্টিস্টের প্রতিভা নিরঙ্কুশ! সে কথায় কেন মানবে সমাজনীতি, কেনই বা প্রতি পদক্ষেপে তার পায়ের তলায় কাঁটার মতো ফুটবে সামাজিক বিধিনিষেধ? কবি, শিল্পী, গায়ক, অভিনেতা, সাংবাদিক, ঔপন্যাসিক প্রভৃতি চিন্তাজীবীরা যদি কিছু কিছু নেশাভাঙ না করে তবে তাদের স্বভাবশূন্যতা ভরবে কী দিয়ে? বড় বড় ব্যারিস্টার, দেশনেতা, সমাজপতি, কাগজের সম্পাদক, সমরনায়ক—এঁরা নেশা না করলে চলবে কেন? মাতালদের জন্য ত মদ নয়!

শিশিরকুমারের চারিদিকে বন্ধুরা ঘিরে দাঁড়ালেন। অবনীন্দ্রনাথের জামাতা ও সুলেখক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, চারুচন্দ্র রায়, অধ্যাপক অরুণ সেন, নরেন্দ্র দেব, যোগেশ চৌধুরী এবং আরও অনেকেই এলেন।

কলেজ স্ট্রীটের মোড়ের কাছে হ্যারিসন রোডের ওপর 'আলফ্রেড থিয়েটার' ভাড়া নেওয়া হল। তখন ওই ছেলেটা নিজের পারিবারিক অধিকারে ওই থিয়েটারে আনাগোনা করতে লাগল। ব্রাহ্মদের পাড়া ছেড়ে দিল।

॥ ৮ ॥

গঙ্গার সঙ্গে যোগ ছিল প্রায় আশৈশব। চুঁচড়ো-নৈহাটির গঙ্গা, শান্তিপুরের গঙ্গা, শিবপুর-রামকৃষ্ণপুর-বদরতলার গঙ্গা, স্বরূপগঞ্জ আর নবদ্বীপের গঙ্গা, খড়দা, বারাকপুরের গঙ্গা,—এসব অতি পরিচিত। ওই দুরন্ত ছেলেটার নড়া ধরে নিয়ে যাওয়া হ'ত আনন্দময়ী আর নিমতলার স্নানের ঘাটে। নৌকায় সে ভেসে বেড়িয়েছে বহুবার।

তখন বড়বাজারের ঘাট থেকে স্টীমার ছেড়ে উত্তর গঙ্গার দিকে সেই শিবতলার ঘাট পর্যন্ত যাওয়া যেত ছয় পয়সায়। এপার ওপার করত স্টীমার। প্রথম বড়বাজারের ঘাট ছেড়ে আহিরিটোলার ঘাট, ওপারে শালকিয়া বাঁধাঘাট, আবার এপারে কাশীপুর, ওপারে বেলুড়, বালী আর উত্তরপাড়া, তারপর কুটীঘাট আবার এপারে এঁড়েদা, আর শিবতলা। কিন্তু জেটিতে একবার নামলেই সেই ছ'পয়সার টিকিট বাতিল। যদি স্টীমারের নিচের তলায় থাকো, কেউ কিছু বলবে না। ওই ছ'পয়সায় গা-ঢাকা দিয়ে সারাদিন গঙ্গায়-গঙ্গায় ঘোরো। বন্ধু সঙ্গে থাকলে কথাই নেই। জুডো খেলো, ওয়ার্ডমেকিং খেলো, ফুট-কড়াই ভাজা বা নকুলদানা খেতে থাকো, দাবার ছক নিয়ে বসে যাও,—কেটে যাবে সারাদিন।

কুটীঘাট-পরামানিকের ঘাট থেকে উঠে পূর্বদিকে এসে বরানগরের বাজার ছাড়ালে সোজা পথ গেছে সিঁথির দিকে। সিঁথি থেকে পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে ঘুঘুডাঙ্গা স্টেশনে। জনবিরল বন-বাদাড়ের দিকে। দিনের বেলা পেরোতেও ভয়-ভয় করে। ছুরি দেখিয়ে ছিনিয়ে নিত পয়সা-কড়ি। সেই কারণে এই পথে দল বেঁধে যেত জেলেরা। ওই পথেই জেলেদের সঙ্গে ছেলেটার ভাব হয়েছিল। সবাই মিলে ওখান দিয়েই ঘুরতে ঘুরতে এল বেলগাছিয়া-পাতিপুকুর হয়ে উল্টোডিঙ্গির দিকে।

সেদিন কে আড়াল থেকে সাজিয়ে তুলছিল ওই ছেলেটার জীবনের একেকটি উপচার? সে কি ভাগ্যের নিত্য-নূতন কৌতুক, না বিদ্রূপ? সেই নিয়তি কি কোনও পরম পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে চাইছিল? সে কি তার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে একটির পর একটি উপকরণ যুগিয়ে দিচ্ছিল? কে আছে ছেলেটার পিছনে? অদৃশ্য কি কেউ তার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে এক -অজানা থেকে অন্য-অচেনায়?

দিন তিনেক পরে সে এসে উঠল উল্টোডিঙ্গির খালধারে স্টীমবোটে। খর রৌদ্র মাথার উপর। অগণ্য ঝুড়ি-পালা আর চেঙ্গারি উঠেছে সেই বোটে। ভিতরে ঠাসা-ঠাসি ময়লা মানুষের দল। ঘর্মাক্ত সেই জেলেদের গায়ের গন্ধের সঙ্গে মিলেছে ওই ঝুড়ি-চেঙ্গারিগুলোর আঁসটে গন্ধ। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের গরম। লক্ষ লক্ষ মাছি আক্রমণ করেছে ওই স্টীমবোট। এই বোট নতুন খালের ভিতর দিয়ে যাবে ভাঙ্গড়ের দিকে। কলকাতা আর শহরতলীর মাছ সাপ্লাই হয় এই জলপথে।

ওই কলেজ-পালানো ছেলেটা সেই নারকেলডাঙ্গা থেকে খালি পায়ে আর গেঞ্জি গায়ে হাঁটতে হাঁটতে এসেছে মানিকতলার খালধার দিয়ে। কী আনন্দ আর উদ্দীপনা তার। সে মাছের কারবারে নামছে, জেলেদের দলে ভিড়ছে। ওদের মধ্যে মিলে যেতে গেলে ওদের মতন হওয়া চাই। জুতো আর জামা চিরদিনের মতন বোধ হয় তাকে ত্যাগ করতে হ'ল। রৌদ্রে, বর্ষায়, শীতে—ওই ময়লা গেঞ্জি। বর্ষায় ভেজো, শীতে কোঁচার খুঁট দিয়ে গা ঢাকো। স্যার পি-সি-রায় প্রচার করেছেন, বাঙ্গালী ব্যবসায় নামুক, নইলে দেশের উন্নতি নেই।

দেশের উন্নতি? কই না, দেশের উন্নতির জন্য ত সে বেরোয় নি? সে বেরিয়েছে তা'র ভিতরের থেকে একটা অপ্রতিরোধ্য তাড়নায়। সে ভাসতে চাইছে নিত্য-নূতনের

তরঙ্গে-তরঙ্গে। তার ঔৎসুক্য, তার কৌতূহল, তার শিকলছেঁড়া মন, তার বেপরোয়া প্রকৃতি—এরা তা'কে কোনওদিন স্থির থাকতে দিচ্ছে না। দেশের উন্নতির কথা ভাববে, এমন বিদ্যে তা'র নেই।

নতুন খালের দিকে সারেঙ বড় চাকাটা ঘোরালো। ঝকঝক শব্দ তুলে বোটখানা জল কাটতে কাটতে চলল। কলকাতা খুব কাছে, কিন্তু সেই কলকাতা কোথা দিয়ে কখন যেন হারিয়ে গেল। খালের একধারে বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তর, অন্যধারে ঝোপ-ঝাড়, নারকেল-বাগান আর আম-কাঁঠালের গাছ। মাঝে মাঝে বাঁশবন। কোথাও কোথাও গোলপাতার চালাঘর, নয়ত করোগেটের। আশেপাশে ছোট ছোট গ্রাম, জেলেদের বাস। ঘাটের ধারে তালের ডোঙ্গা ভাসছে কোথাও কোথাও, আর নয়ত বাচ্চারা স্নানে নেমে জল ছোড়াছুঁড়ি করছে। পাখিরা কল-কাকলী করছে অশ্রান্ত।

এ দৃশ্য দেখে নি সে আগে। সে জানে না গ্রাম কেমন, সে দেখে নি কেমন করে জল-মাটি-গাছ আর ধানক্ষেতের সঙ্গে মানুষ জড়িয়ে থাকে। সে যেন ছিটকিয়ে এলো বিচিত্র এক অজানা জগতে, যার কোনও, সংবাদ কলকাতার কেউ রাখে না। একেকটি জনবসতি যেন অনাদিকালের ছোট ছোট ছবি। ফুলে ফলে রঙে রসে, মৌমাছি আর প্রজাপতি-পতঙ্গে নতুন খালের দুই পার ছেলেটাকে যেন নিয়ে চলল কোন্ বৈকুণ্ঠ-লোকে। তন্ময় হয়ে সে চেয়ে ছিল।

স্টীমবোট এসে পৌঁছল কেষ্টপুরে। তখন খর মধ্যাহ্ন কাল।

কে জানত এমন একটা বড়সড়ো জনপদ রয়েছে কলকাতার এত কাছে? এটা কেষ্টপুর টোল্। এখানে গভর্নমেণ্ট খাজনা আদায় করে জেলে আর বেপারীদের কাছ থেকে। এখানে কাঁচা পাকা বহু ঘর বাড়ি। বহুলোকের বাস। কোথাও কোথাও ধানের গোলা আর খড়ের গাদা। ঢেঁকির পাট শোনা যাচ্ছে এখান থেকে। চোখ-বাঁধা এক বলদ অদূরে সরষের তেলের ঘানি ঘোরাচ্ছে। মুর্গি চরছে ডাঙ্গায়, খালের জলে পাতিহাঁস ভাসছে।

না, এখানে নয়। এর পরে যেখানে স্টীমবোট থামবে সেইখানে নামা। ওই যে, এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে সেই সরু কাঁচা পথ, যে-পথ গেছে শূলী-মোহান্তর সেই আখড়ায়। ওখান থেকেই আসে গাজনের একদল সন্ন্যাসী। হ্যাঁ গো হ্যাঁ—চড়ক-তলা আরেকটু এগিয়ে। কাঁটাঝাঁপ, বঁটিঝাঁপ, আগুন ঝাঁপ—সে সব কি আর আছে এখন? এই ত এবারের চড়কে সেই ছোকরাটা মারা গেল! লোহা দিয়ে পিঠে ফুঁড়ে উঠল চড়ক গাছে। তারপর নামল যখন মরা ছেলে। আজকাল থানা-পুলিসে বড়ই কড়াকড়ি।

স্টীমবোট এসে থামল আরেক ঘাটে। সামনে কালীর এক মন্দির স্থাপনা। শোভারামের সঙ্গে ছেলেটা একখানা তক্তার ওপর দিয়ে ঘাটে এসে নামল। ঘাট থেকে পথ গিয়েছে এঁকে বেঁকে। চারদিকে ঝোপঝাড়, কলাবাগানে কলার কাঁদি ঝুলছে। নারকেল বনে হাওয়া উঠেছে। বাঁশবনে ছম্‌ছম্ করছে ছায়াপথ।

কয়েকখানা চালাঘরের ফাঁকে একখানা ছোট পাকা দালান। সেখানে শোভারাম

ছেলেটাকে এনে তুলল। এখানেই ব্রাহ্মণ-সেবা হবে। এক ঘটি জল আর গামছা আনো। আসন দাও ব্রাহ্মণকে। অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করো।

দেখতে এলো সবাই। ময়লা গেঞ্জির তলায় ব্রাহ্মণের উপবীত দেখা যাচ্ছে। মেয়ে-পুরুষ ভিড় ক'রে দাঁড়াল চারদিকে। একে একে এলো মর্তমান কলা, বাতাসা, দই আর চিঁড়ে।

মোড়ল বলল, বামুন ছিল না এ গাঁয়ে। তুমি আমাদের বাপের ঠাকুর। এখানে বাম্ভন-পিতিষ্ঠে হবে। সরো বাছা তোমরা, বাম্ভনের গেরাস দেখতে নেই। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। এই ত কোশ দেড়েক পুবদিকে বিদ্যেধরী পোরোলেই শুলী-মোহান্তর আখড়া। ওখানে সব আছে, বাঠাকুর। শৈব-শক্তি-বোষ্টম—সব আলাদা আলাদা ঠাঁই।

ক্ষুধার্ত ছেলেটা টাউ-টাউ ক'রে চিঁড়ের ফলার গিলছিল। তখন শোভারাম চান্ করতে গেছে কলাবাগানের কুয়াতলায়। কিছু ভেবো না বাঠাকুর—বৃদ্ধ মোড়ল ব'লে যাচ্ছিল,—ওই আখড়ায় তোমার ঘর আমরাই বেঁধে দেবো। বেড়া দিয়ে তোমার উঠোন ঘেরা থাকবে। থাকবে তুমি নিজের মনে জপতপ নিয়ে। আখড়ায় বোষ্টমীরা আছে। তোমার জল তুলবে, রান্না করবে, বাসন মাজবে, কাপড় কাচবে—সব।

ছেলেটা প্রশ্ন করল, কেন, ওরা কেন করবে?

মোড়ল তা'র ফোকলা দাঁতে হেসে উঠল,—শোন কথা! বাম্ভন কিনা,—তাই কথা উঠছে! তুমি যে হবে আমাদের গুরু-পুরুতের বংশ, ওরা তাই হবে সেবাদাসী! ও যে ওদের ধম্ম, বাঠাকুর!

আমি তবে কি করব সারাদিন?—ছেলেটা জানতে চাইল।

তুমি?—আবার হাসল মোড়ল,—স্রেফ পাঁজিপুঁথি, যাগযজ্ঞি! সে সব কথা হবে একে একে। কত সৌভাগ্য আমাদের তোমার পায়ের ধুলো পড়ল গাঁয়ে। তুমি বাম্ভন, তুমি শুধু কুষ্টিবিচার করবে, হাত দেখবে। বামুন মানেই জ্যোতিষী আর গণৎকার। তবে হ্যাঁ, একটা কথা। এটা কালীর থান। তোমার হাতেই থাকবে সব। মারণ-উচাটন-বশীকরণ বলো, কবচ-মাদুলি ঘুনুসি বলো, জলপড়া-বাটিপড়া-বেড়িধরা যাই বলো,—সব তুমি।

আমি ত এসব জানিনে?

হাসিতে আবার ফেটে পড়ল মোড়ল। তারপর অধীর উল্লাসে বলল, তুমি জান না ত জানে কে ঠাকুর? তোমাকে যে এবার চিনেছি। তুমি দরিদ্দ্য বাম্ভনের বেশ ধ'রে এসেছ নারায়ণ—তুমি যে ছলনাময় ঠাকুর!

জলযোগ শেষ করে ছদ্মবেশী নারায়ণ পাতে প্রসাদ রেখে এবার উঠলেন। পিছনের ঠাণ্ডা ঘরটায় তাঁর জন্য বিছানা ও তাকিয়া। তিনি যখন এসে বসলেন, তখন একটি মেয়েছেলে বড় একখানা হাতপাখা নিয়ে আগে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করল, তারপর পিছন দিকে দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণরূপী নারায়ণকে হাওয়া করতে লাগল। কিন্তু

তখন বাইরের দিকে কল-কোলাহল আরম্ভ হয়ে গেছে নারায়ণের প্রসাদ কাড়াকাড়ি নিয়ে।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর্ব কিছু বিলম্বিত লয়ে। তার আগে আরেকবার মোড়ল এসে ঢুকল। বলল, ওরে ক্ষেন্তি, তুই এখন পালা, পাখাখানা দিয়ে যা।

ক্ষেন্তি যাবার পর বুড়ো দরজাটা একটু ভেজিয়ে দিল। তারপর বাতাস করতে করতে বলল, যা বলছিলাম ঠাকুর। তুমি শুধু টিকি রেখে মাথার চুল ফেলে দেবে। তারপর নামাবলী আর ছোপানো কাপড়। কেন্টপুর থেকে ভাঙ্গড়—তোমার হাতের মুঠোয় থাকবে। খবর একবারটি রটলে দশ হাজার শিষ্য-সেবক। বছরে মাথাপিছু একটাকা গুরুপ্রণামী। তোমার ভাবনা থাকবে কিছু? শুলী-মোহান্ত হ'ল গোড়ায় জেলে-কৈবর্ত। তুমি হ'লে জাতকেউটে, বর্ণশ্রেষ্ঠ বামুন। তোমার পিঠিঠে আমরা সবাই করব। তোমার ত শাক্তমত, শৈব আচার। হ্যাঁ, সব জানি। শুলী-মোহান্ত বাবাজী আফিং সেবা করে, তুমি কেন যাবে সস্তার কারবারে?

ছেলেটা একান্ত আগ্রহে মোড়লের সদুপদেশ ও পরামর্শ শুনছিল। এবার বলল, দামী কারবারটা কেমন?

শোনো কথা ঠাকুরের!—মোড়ল বলল, বুঝলে না? আমরা হলুম সহজিয়া দলের লোক, আমাদের সব সহজ! আসলে ত বোষ্টম গো। বাউলরা ত আমাদেরই ঘরের লোক! তোমার কিছু ভাবনা নেই, ঠাকুর। মেয়েরা আছে আখড়ায়, বাদামী ভাঙ বেটে দেবে তোমার। ওই যে বোটে এল ওরা সবাই, ওদের কোঁচড়ে-কোঁচড়ে গাঁজা আর চরস। যত চাও তুমি, যখন-তখন পাবে!

ওসব খায় কেন?—ছেলেটা প্রশ্ন তুলল।

আহা, একেই বলে অজাতশত্তুর বামুনকুমার!—মোড়ল বলল, বলি, ছোট-কলকের ছ্যাঁদা ছোট কেন বল ত নারায়ণ? তিনি যে ছোট্টটি হয়ে আসেন! তিনি যে চিরশিশু! শৈব-শক্তি-সহজিয়া—সব তিনি! তার আগে শুধু ধোঁয়া, ধোঁয়ার কুণ্ডলী থেকেই ত তাঁর আবির্ভাব, ঠাকুর। যাই দেখি এবার ভোগ রান্না কতদূর হ'ল।

মোড়ল বাইরে গেল।

ভয়-ভয় করছে ছেলেটার। সে এসেছে এক উদ্দেশ্য নিয়ে, কিন্তু এটা অন্যপ্রকার। এ যেন অক্টোপাসের ফাঁদ, চারদিক থেকে বেষ্টন করছে তাকে। কিন্তু এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা লোভনীয় প্রস্তাব,—দশ হাজার শিষ্য! বছরে দশ হাজার টাকা! ২৪ পরগণায় এক লাখ শিষ্য ধরে নিতে কতক্ষণ? অর্থাৎ বছরে এক লাখ টাকা! মঠ, মন্দির আখড়া, আশ্রম,—এরাই ত সৌভাগ্য সৃষ্টির পথ! লোকটা বলছে ভাল। নেড়ামাথায় টিকি থাকবে—থাক্‌ না কেন? নামাবলী, গেরুয়া, পায়ে খড়ম, হাতে অঙ্গুরীয়, গলায় শোধন করা কণ্ঠী! ছেলেটার বিশ্বাস, ওকে মানাবে ভাল! তবে ওই গোটা চার-পাঁচ নেশা—আফিং গাঁজা ভাঙ চরস তামাক, এগুলো তা'র মামার কল্যাণে তা'র কাছে নিতান্ত অপরিচিত নয়! তা ছাড়া মামা এখন কাশীবাসী। বাবা

বিশ্বনাথ ওইগুলো দিয়েই তাকে ভুলিয়ে রেখেছেন। নইলে তিনি এতদিন এলাহাবাদ হাইকোর্টে এক নম্বর মামলা ঠুকতেন। আসল কথা, ছেলেটা সেদিন ভয় পেলেও যেন ভরসা হারাল না। আর যাই হোক সে বেরিয়েছে ভাগ্য অন্বেষণে। ইংল্যাণ্ডের অবাধ্য ছেলেরা ভাগ্য অন্বেষণে যায় অস্ট্রেলিয়ায়,—দশ হাজার মাইল দূরে। পিণ্টু গিয়েছে নিউ ইয়র্কে। পাতুরা যাচ্ছে লণ্ডন। মিমিরা বোধ হয় চলল ডেট্রইট, মিসিগানে। সে ত রয়ে গেল কলকাতার কাছাকাছি। অতই বা ভয় কিসের।

মধ্যাহ্ন ভোজের বর্ণনায় আর কাজ নেই। প্রথম পাতে ছিল খাঁটি গাওয়া ঘি, শেষ পাতে ঘন খাঁটি দুধের সঙ্গে হিমসাগর আম আর চাটিম কলা।

অতঃপর অপরাহ্ণের দিকে শোভারাম ওকে নিতে এল। এবার যেতে হবে।

শোভারাম ঘাটের দিকে যেতে যেতে বলল, ঠাকুরমশাই, আপনি আমাদের মান্য। শুনলেন ত জ্যাঠার কথা ? উনি আপনাকে পিতিষ্ঠে করবেন!

ছেলেটা বলল, তা কি করে হয় শোভারাম ? আমি এসেছি অন্য কাজে। তোমাদের সঙ্গে থেকে মাছের কারবার করব। তুমি বলেছিলে পঁচিশটি টাকা সঙ্গে আনতে। তাও এনেছি। না ভাই, ওসব কথা এখন থাক, গুরুপুরুতগিরি আমার দ্বারা হবে না।

শোভারাম হাসছিল, হাসতে হাসতেই ঘাটে এসে নামল। সামনে একখানা সরু ছিপ নৌকায় ওদেরই তিনজন লোক পোটলা-পুঁটলি নিয়ে বসেছিল। শোভারাম আগে নৌকায় উঠে ছেলেটার হাত ধ'রে তুলে নিল। ওরা নিজেরাই লগি টেনে নৌকা ছাড়াল।

জানা যাচ্ছে না কোথায় যাচ্ছে নৌকা। তখন গোধূলিকাল, সূর্য সম্পূর্ণ ডোবে নি। চারিদিকে প্রাণীচিহ্নহীন একটা বিশ্বলোক যেন প্রতিভাত। ধু ধু করছে একধারে দিগন্তপ্রসার প্রান্তর, অন্যদিকে বনময় ছায়াছন্ন একটা ভূখণ্ড। এই নৌকার মোট পাঁচটি আরোহীকে বাদ দিলে অস্তিত্বলোকে আর কিছু নেই। পাখিরা বাসায় ফিরেছে।

কালো কালো ময়লা চেহারার লোক। প্রত্যেকেই ষণ্ডামার্কা। ওদের মাংসপেশী দেখলে দুর্ভাবনা আসে। এরা পরোয়া করে না পরিশ্রমের। বড় বড় ভারী ওজনের বাঁক নেই কাঁধে, বোঝা নেয় মাথায়, মাছ ভাত খায় প্রচুর, ঘুমোয় সাংঘাতিক।

অন্ধকার ছেয়ে আসছে চারদিকের খাল আবার একস্থলে দু'ভাগ হয়েছে। ওরা বাঁক নিল বাঁ দিকে। ডানদিকে সেই শাখা স্রোত ছমছমে অন্ধকারে দূরে গিয়ে কোথায় যেন বিবাগী হয়ে গেল। বাঁদিকের খাল আবার এক সময় দু'ভাগ হয়ে এক সঙ্কীর্ণ নালা পথে ঢুকল। নৌকা যেন ডুবে গেল দু'ধারের ঝোপ-ঝাপড়ার মধ্যে। ওরা এবার হাত দিয়ে বাইতে লাগল।

ভীত কণ্ঠে ওই অন্ধকারেই ছেলেটা বলল, এ কোথায় আনলে শোভারাম ?

এই যে ঠাকুর মশাই এই আমাদের 'আলা'।

আলা !

হ্যাঁ, এ হ'ল মুক্তোরামের ভেড়ি। ওর নামডাক খুব। এখানেই উঠি আমরা।

নৌকা রাখল পাড়ের গা ঘেঁষে। পাড়ে উঠে ওরা ছেলেটার হাত ধ'রে তুলে নিল। উঠেই সে দেখল দিগন্তের দরজা যেন সকল দিক থেকে ওর চোখের সামনে হঠাৎ খুলে গেছে। স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছে না কিন্তু ঠাহর ক'রে সে দেখল, সে দাঁড়িয়ে রয়েছে দিক্‌চিহ্নহীন বিশাল এক সমুদ্রের তীরে,—ক্ষণে ক্ষণে যে-সমুদ্র ঝড়ো বাতাসে উর্মিমুখর হয়ে উঠছে।

এবার সেই 'আলা'। আলা মানে আলয়, এই প্রথম সে জানল। একটি মাত্র গোলপাতার ঘর, সেই ঘরটি দুলছে ঝড়ো হাওয়ায়। এ ঘর মুখ থুবড়িয়ে পড়বে যে কোনও মুহূর্তে। ওরই মধ্যে ঢুকে ওরা কেরোসিনের কুপি জ্বালল। ছেলেটা ভিতরে এসে দাঁড়াল।

ঘরে একখানা ন্যাড়া তক্তা, তার ওপর প্রেতমুণ্ডের মতো ময়লা একটি বালিশ। মেঝের এক কোণে কালিঝুলি মাখা একটা মাটির হাঁড়ি, একখানা কালো তৈলাক্ত কড়াই। তারই কাছে খান দুই চটা ওঠা কলাইয়ের থালা। একটা বড় পোঁটলা রয়েছে একপাশে। কেরোসিনের কুপির শিখা ছাড়িয়ে শিস উঠছে গলগলিয়ে।

সেদিনের সেই তরুণ যুবক আজকের আমি নই, এবং আমার মধ্যেও সেই ছেলেটার অস্তিত্ব যেন আর খুঁজেও পাচ্ছিনে। সে যেন কবে কোথায় হারিয়ে গেছে খোঁজ করি নি। তবু তাকে দেখছি আজ খুঁটিয়ে। সে অজ্ঞান, সে মূঢ়, সে বেহিসেবী, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। কিন্তু বিচার করলে দেখা যেত, সে এনেছিল একটা উদ্দাম প্রাণশক্তি, কেমন যেন একটা অজেয় অধ্যবসায়, একটা অফুরন্ত অনুপ্রেরণা। যে প্রতিভা ও তীক্ষ্নবুদ্ধি সৌভাগ্যকে জয় ক'রে আনে, লক্ষ্মীর বরপুত্রে পরিণত করে—সেই প্রতিভা তা'র কিছু ছিল না। তাই আবার বলি, সে নিজে কিছু করছে না, তাকে অন্তরাল থেকে নিয়ন্ত্রণ করছে তার নিয়তি,—একটা অন্ধ অদৃশ্য শক্তি!

ও বাইরে এসে দাঁড়াল। ওর সমগ্র ভবিষ্যৎ, ওর কর্মজীবন, ওর ইহলৌকিক সমস্ত উচ্চাভিলাষ, এ আলার মধ্যে বাঁধা রইল। ও ছেড়ে দিল সংসার, বন্ধু-সমাজ, আত্মীয় পরিজন। ওই সমুদ্রের সীমানায় দাঁড়িয়ে ও বোধ হয় কাঁদছিল। কিন্তু বাইরে ওর কান্নার চিহ্ন নেই। না চোখের জল, না ডুকরানো, না এতটুকু শব্দ। ও শান্ত, অবিচল, দৃঢ়চিত্ত। কিন্তু আমি জানি, ও কাঁদছিল ভিতরে ভিতরে। ওর সেই ভিতরে আমি আজও বাসা বেঁধে আছি। ওর প্রকৃতির তলায় তলিয়ে থাকত একটা নিষ্ফলতার নৈরাশ্যবাদ। মাঝে মাঝে ভয় হয়, ও যেন উঠে এসেছে বেদান্তবাদের স্ফুলিঙ্গ সঙ্গে নিয়ে। হাত বাড়িয়ে সর্বাগ্রে যেটা ধরতে যায়, সেটাতেই ওর প্রথম নিস্পৃহা। আমি ঠিক জানি উপরের ওই অন্ধকার তারকাখচিত গগনলোক দিগন্তের যে সমুদ্ররেখার তলায় ডুবছে, সেইদিকে নিশ্চল ও নিঃশব্দে তাকিয়ে ও কাঁদছিল বুকফাটা কান্না!

দুর্যোগ বা বর্ষার ঝড় নয়,—এক প্রকার প্রমত্ত বিপ্লবী বাতাসের অস্থিরতা। বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। ওই ঘরে ঢুকেছে মোট ছয়জন—তা'কে নিয়ে। শোভারাম, মদন, শশধর,—আরও যেন কে কে। একজন কে যেন কি একটা হাতে

নিয়ে এবার বেরিয়ে এল। বলল, ঠাকুরমশাই, মাছ ভাজা, মাছের ঝোল আর ভাত। এবার জবাব দিলুম, এ ত খুব ভাল।

আপনার অসুবিধে হবে বইকি। তবে নুন-মসলাপাতি সঙ্গেই এনেছি। মিষ্টিজলও আছে দু'কলসী।

মিষ্টি জল মানে?

লোকটা বলল, এখানে যে সব নোনা! এর নাম বাদা। এখানে জল কেউ মুখে দেয় না।—এই ব'লে সে এগিয়ে গেল, কতটা দূরে গিয়ে জলের ধারে দাঁড়িয়ে পুনরায় বলল, তবে এই যে বাঁধটা দেখছেন, এটা আমাদের নিজের। এটার জল একটু খরা, তবে আমরা খাই মধ্যে মাঝে।

লক্ষ্য করি নি অন্ধকারে। লোকটা তিন চার মিনিটের মধ্যেই পর পর গোটা চারেক মাছ টপাটপ ছিপ দিয়ে গেঁথে হেঁচকা দিয়ে তুলল। এ যেন পোষা মাছ, যখন তখন কথা শোনে। ওর মধ্যে একটা মাছ বঁড়শির থেকে খুলে লোকটা আবার জলে ফেলে দিল। বলল, না, ওটা নেব না। বড্ড কাঁটা—কী মাছ ওটা?

ওর নাম আমলেট, ঠাকুরমশাই—এ কথা কয়টা বলতে বলতেই সে আর একটা মাছ গেঁথে তুলল। হাঁ, এ মাছটা বড় বাটা, এতেই হবে।

ওর সঙ্গে সঙ্গে অপরিসীম কৌতূহল নিয়ে আমিও ঘরে এসে দাঁড়ালুম। কাঠের ধোঁয়ায় ঘরখানা ভরে গেছে। উনুনে ভাত চড়েছে। আমি বললুম, শশধর, আমাকে ওই ছোট বঁটিখানা দাও, আমি মাছ কুটে হলুদ মেখে দিই। দাও—

কী যে বলেন ঠাকুরমশাই?—ওরা সবাই হেসে উঠল,—আপনি বাম্ভন, মাথার মণি,—আমরা সেবাদাস। এ কি আপনার যুগ্যি?

কথাগুলি শুনতে ভাল, আত্মাভিমানে সুড়সুড়ি লাগে। কিন্তু এর জন্য আমি আসি নি। ওদের মধ্যে মিলিয়ে যাব, ওদের সঙ্গে একাকার হব, সেই আমার একমাত্র পরিচয়। আমি লেখাপড়া জানি, আমার উচ্চ বর্ণ, আমি নিচের তলায় নামতে শিখি নি, অপরিচ্ছন্ন জীবনের মধ্যে তলিয়ে যেতে পারিনে,—এসব আমার গৌরব নয়। আমি গরীব, আমি ভাতকাপড়ের সংগ্রামে নেমেছি, আমার সমস্ত জীবন ঘামে রক্তে আর চোখের জলে কর্দমাক্ত হয়ে উঠুক সেই আমি চাই! না, আমি এখানে খাতির নিতে আসি নি, বামুনাই আমার পেশা নয়,—সভ্যনীতি, শিক্ষাভিমান, শহুরে চাকচিক্য, পরিচ্ছদের বৈশিষ্ট্য—ওসব আমার জন্য নয়। আমি নেমেছি জীবন সংগ্রামে। আমি চাই রোজগার! সেই রোজগার আমি মায়ের হাতে তুলে দেবো।

একে একে ভাত মাছ ভাজা আর মাছের ঝোল রান্না হ'ল। এবার আমার আড়ষ্টতা ঘুচেছে। গায়ের গেঞ্জিটা খুলে ফেললুম। পরে এগিয়ে এসে বললুম, সরো তোমরা। আমি ঠুঁটো জগন্নাথ নই, শোভারাম। আমি তোমাদের ভাত বেড়ে দেবো।

ঠাকুরমশাই, আমরা যে পাপে ডুববো। ওরা হকচকিয়ে গিয়েছিল।

ডুবে গেলে আবার তোমরা উঠবে, ভয় কি ? কিন্তু আমি বিনা মেহনতে তোমাদের ঘাড়ে চ'ড়ে থাকব, এ আমার অপমান।

আমি ওই হাঁড়ি কড়াই আর থালা বাটির মাঝখানে মেঝের উপরে চেপে বসলুম। খান চারেক কলাইয়ের থালা আর কলার পাতা সাজালুম ওদের সামনে। শোভারাম চেঁচিয়ে উঠল, ঠাকুরমশাই, মোড়ল কাকার কানে যদি একথা ওঠে, তাহলে আমাদের আর রক্ষে থাকবে না।

হই চই ক'রে আমরা সবাই হেসে উঠলুম।

লাল রংয়ের বুকুড়ি চা'লের গরম-গরম ভাত, মাছ ভাজার পরে মাছের ঝোল,—উপাদেয় আহার। ছয়জন মিলে অন্তত দেড় সের মাছ উঠল। আমি হিসেব জানি। মাছ অন্তত আট আনা। তা ছাড়া সবাই মিলে কমসে কম সের তিনেক চা'লের ভাত খেল। তিনসের চা'লের দাম আজকাল কমপক্ষে চার আনা।

আহারাদির পর থালা-বাসন ধোওয়া, এঁটো পাড়া, ঘর নিকানো ইত্যাদির পর আমি বললুম, মনে রেখো মদন, আমি বামুন হলেও রাঁধুনি বামুন! তোমরা যোগাড় দিয়ো, আমি দু'বেলা রাঁধব। ওসব আমি জানি। আর শোনো শোভারাম, তুমি আমার মূলধন চেয়েছিলে পঁচিশ টাকা। এই নাও, এ টাকা তুমিই রাখো।

টাঁ্যাক থেকে পঁচিশ টাকা বার করে শোভার হাতে দিলুম। সিকে পাঁচেক শুধু আমার হাতে রইল।

এতক্ষণে সম্পর্কটা যেন অনেকটা সহজ হ'ল। ওরা চেয়েছিল ব্রাহ্মণ সন্তানের জাত মান বাঁচাতে, চেয়েছিল আমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে! ওরা এখনও শোনে নি আমি মিশনারি ইস্কুলে মানুষ। খৃষ্টান, মুসলমান, পার্শি, বৌদ্ধ, হিন্দু—সব সমাজের ছেলেদের সঙ্গে পড়েছি, খেলেছি, এক পাতে খেয়েছি—কিন্তু জাত মান খোওয়া যাচ্ছে কিনা কেউ বলে নি। আজও যখন গুলু ওস্তাগর লেনের তরুণ উকীল সোফিয়ার রহমনের স্ত্রী লুৎফন্নেসা বউদিদির কাছে মাঝে মাঝে খাবার খেতে যাই, তখন তিনিও একবারও বলেন না, খোকা এবার তোর জাতধর্ম সব গেল। না, কেউ বলে না। ডাফ চার্চের চৌধুরীরা বলে না, পার্শিদের গজদার আহমেদরা বলে না, বৌদ্ধ বীর-বাহাদুর বলে না,—কিছুই কেউ বলে না। আমি ওদেরই একজন। ওদের বাইরে আমি নই।

ঘরে কোথাও জানালা বা দরজার কপাট নেই। ভিতর-বাহির এক হয়ে সব হু হু করছে। চোর আসে না, ডাকাত পড়ে না। রৌদ্র, বৃষ্টি ও শীত—এই তিনের থেকে শুধু মাথা বাঁচানো। এ গৃহস্থ ঘর নয়।

দুজন বাইরের মাঠে কি ভাবে শুয়ে পড়ল আমি দেখি নি। ওরা ঘুমোবার আগে গাঁজা টেনে নিচ্ছিল। ওদের মধ্যে একজন দমভোর ধোঁয়া টেনে উচ্চকণ্ঠে গান ধরেছিল, "মানুষ-রতন চিনল না রে, গেলো পুতুল পুজে জনম গো ভাই—"

ঘরের মধ্যে নিকানো মেঝের উপর শুয়ে পড়েছে শোভারাম ও আরেক জন।

আমি শুয়েছি তক্তার ওপর। কিন্তু ময়লা বালিশটা মাথায় দিতে পারি নি, এত দুর্গন্ধ। নিজের গামছাখানা পুঁটলি পাকিয়ে নিয়েছিলুম।

বেশিক্ষণ নয়, হয়ত বা মিনিট দশেক। তারপরেই একে একে ওদের নাক ডেকে উঠল। সেজো মাসিমার নাকডাকা শুনেছি, আস্তাবলের ছকুমিঞার নাক ডাকা জানি। এ কিন্তু অন্য প্রকার গর্জন। বাইরে গোঁ গোঁ করছে ঝড়ো হাওয়া, মাঝে মাঝে মড় মড় শব্দে দুলছে এই খড়ের চালা। কিন্তু ওরা নিশ্চিন্ত, এ ঘর ভূমিসাৎ হবে না!

ঘরখানা কখন মড়মড়িয়ে আমার নাকের উপরেই ভেঙে পড়বে, এই কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় আমারও চোখে ঘুম এসেছিল। সে ঘুম কতক্ষণের কিছু মনে নেই।

এক সময় হই-হল্লা উঠল বাইরে। ওদের চেঁচমেচি শুনে আমরাও জগে উঠলুম। এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে, তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার।

যেখানে যা ছিল, পিছনে প'ড়ে রইল। ওদের নেশা কেটেছে, প্রয়োজন মতো ঘুমিয়েও নিয়েছে। ওদের পিছনে পিছনে আমিও ঘাটে নেমে এলুম।

এবার দেখি দু'খানা ছিপ নৌকা দড়ির খোঁটায় বাঁধা। একখানায় অনেকগুলো মাছের ঝোড়া জলে আটকানো। শোভারাম অন্ধকারে আমার হাত ধরে ছিপে তুলে পর পর দু'খানা ছিপ চক্ষের পলকে ছেড়ে দিল সরু খাল থেকে বেরিয়ে চওড়া খালের দিকে।

রাত সাঁ সাঁ করছে। কত রাত আমি জানিনে। হয়ত দেড়টা কি দুটো। কিন্তু ওরা ঠিক জানে রাত কত। কৃষ্ণপক্ষের শেষ প্রান্তে যে ক্ষতচন্দ্র দেখা দিয়েছে পূর্বাকাশে,—যার আলো নেই, অথচ আছে এক ভৌতিক আভা,—ওরা তার থেকে রাত্রির হিসাব জানে। কিন্তু আমার চোখে তখনও ঘুম কাটে নি। কোমরে গামছাখানা বেঁধে খালি গায়ে সরু পাটাতনে বসে আছি কোনও মতে,—শুধু ঝুড়িগুলোর দুর্গন্ধে একটু অস্বস্তিবোধ হচ্ছিল।

সেই সেদিনকার খালের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল পৃথিবী, সভ্যতা ও কলকাতা শহর। ছিপ দু'খানা বেশ ছুটে চলেছে এ-খাল থেকে ও-খালে। আমি দুঃখিত, লগি আমার হাতে দিচ্ছে না। আমি লজ্জিত, ওদের মতো কঠিন দানবীয় স্বাস্থ্য নিয়ে ছোট দাঁড় বাইতে পারছিনে। তীরবেগে এবার দু'খানা ছিপ পর পর ছুটে যাচ্ছে। উপরে শুধু এক-আকাশ তারা। আমাদের দুপাশে শুধু অন্ধকার বনজঙ্গল।

ঘণ্টা দেড়েকের বেশি নয়। আমাদের ছিপ দু'খানা অতি দ্রুতগতিতে বড় জলার দিকে এসে পৌঁছল। তখন আমরা দেখতে পেলুম বড় বড় আলো এবং ক্রমে অনেক মানুষের আওয়াজ। এ যেন নতুন এক জগতের দ্বার খুলছে চোখের সামনে। ওরা এবার দেখিয়ে দিচ্ছিল সেই রাত্রেই বিস্তীর্ণ নিচে এক একটা জলরাশির পরিচয়,——এই যে দেখছেন এটা শিরিশ সাঁপুইয়ের ভেড়ি, এটা সরকারদের। এগিয়ে আসছে ওই যে বেলেঘাটার নস্করদের ভেড়ি। এবার আসছে কার্তিক দাসের ভেড়ি।

অত আলো জ্বলছে কেন ওদিকে ?

হা হা হা হা,—ঠাকুরমশাই এখনও দেখতে পায় নি! ওই ত সব মাছ মারছে! দেখছেন না জাল তুলছে, ঝুড়ি ভরছে সব ?

চোখে তখনও আমার ঘুম জড়ানো। ছিপ দু'খানা আরও অনেকটা এগিয়ে এসে থামল একখানে। বোধ হয় শত শত ছিপ জড়াজড়ি করে রয়েছে খাল-বিলের ধারে ধারে। আমি ছিপ ছেড়ে ঘাটে উঠে এলুম।

চারিদিকে বড় বড় কারবাইডের আলো বাঁশের ডগায় বাঁধা। ইতর ভদ্র মানুষের প্রবল ভিড় সর্বত্র। সেই কোলাহল আর হট্টগোলের মধ্যে চিৎকার করে নিলামের ডাক পড়ছে। শেষ রাত্রির এই সময়টুকু ওদের পক্ষে কম। নোনা জল থেকে তোলা তাজা মাছ—এ মাছ এখনই পাচার করা দরকার। নইলে এই প্রচণ্ড গরমের দিন, দু-চার ঘণ্টা এদিক ওদিক হ'লে মাছে পচ ধরবে। এই তাড়াহুড়োয় সবাই দিগ্বিদিক-জ্ঞান-শূন্য মাছের ঝুড়ি ভরছে শত শত—তার মধ্যে পার্সে, ট্যাংরা, কাঁকড়া, বাগদা, তরুই, বাটা, কাৎলার পোনা, সরলপুঁটি, ভেট্‌কির ছানা, বাণমাছ, আমলেট—এগুলি লাফাচ্ছে সেই উজ্জ্বল আলোয়। সব মাছ মিলিয়ে ঝুড়ি। প্রত্যেকটা ঝুড়ির স্ট্যাণ্ডার্ড মাপ আছে। দশ, পনেরো, বিশ, পঁচিশ, ত্রিশ—ইত্যাদি সেরের মাপে ঝুড়ি। নিলামের ডাকে যে ঝুড়ির দর যেমন ওঠে। সেইজন্য চিৎকার উঠছে চারদিক থেকে। সমস্ত ব্যাপারটা নগদ কারবার।

ঠাকুরমশাই, ও ঠাকুরমশাই,—এদিকে—এদিকে এগিয়ে আসুন। এখানে মাল কিনছি—

শোভারাম চিৎকার করছিল দূর থেকে।

ভাল ক'রে কিছু তলিয়ে বুঝবার চেষ্টায় আমি এগিয়ে দেখি, একসঙ্গে শোভারামের দল অনেকগুলো ঝুড়ি নিলামে আটকিয়ে ফেলেছে। ওরা গার্ড দিচ্ছে ছোট বড় প্রায় ত্রিশটা ঝুড়ি আগলিয়ে। শুনলুম প্রায় ষোল সতেরো মণ মাছ। এদিকে ওরা মোট বারো জন। আমাকে নিয়ে তেরো।

পঞ্চু বলল, ঠাকুরমশাই, হিসেব হবে পরে। আপনার আছে তিন ঝুড়ি। মদন, তোল্—দেরি করিসনে। এই শশধর—ঝুড়ি তোল্। তুমি এখানে দাঁড়াও ঠাকুরমশাই, নইলে ঝুড়িকে ঝুড়ি সাফ—

সময় নেই কারও। সবাই ছুটছে, সবাই চেঁচাচ্ছে। ওই এক ঘণ্টা দু'ঘণ্টার মধ্যে যে অদ্ভুত ধরণের অশ্লীল কটুক্তি ও ইতর ভাষার প্রয়োগ চলছিল পরস্পরের প্রতি,—সেগুলি নিয়ে একখানা অভিধান তৈরি করা চলে।

একটি দুটি চারটি—এইভাবে সব ঝুড়িগুলো গিয়ে উঠল ছিপ নৌকায়। কিন্তু আমার চোখ এড়াল না সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে চুরি, তঞ্চকতা, কারচুপি, জালিয়াতি, ধাপ্পা এবং অসাধুতা—সমস্তই মিলে মিশে রইল। ভেড়িগুলোর মালিকপক্ষে রয়েছে ফড়ে, দালাল, ঘুষখোর, বশম্বদ, চাটুকার—সব শ্রেণীর লোক। মাঝে মাঝে ওদের আলাপচারী আমাকে হতবুদ্ধি করে দিচ্ছিল।

পরপর চারখানা ছিপ ছাড়ল শোভারামের দলের। সেগুলো শুধু দ্রুতগতি নয়, তীরগতিতে ছুটে চলল উত্তর খালের পথে। তখন পূর্বদিকের আকাশের প্রান্তে প্রথম উষা চিকচিক করছে। সমস্ত বিশ্বচরাচর তখনও অন্ধকার। ভরা গ্রীষ্মকালের সেই অস্পষ্ট উষার মধুর স্নিগ্ধ বাতাস যেন মানুষের সমস্ত দুর্গন্ধ ও মালিন্যকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ছিপ ছুটেছে নক্ষত্রবেগে। কলকাতার লক্ষ লক্ষ লোক যখন নিদ্রায় অচেতন, তখন আমরা যাচ্ছি তাদের জন্য মাছের ঝোল-ঝালের ব্যবস্থা নিয়ে। আমাদের পক্ষের চারখানা ছিপে অতগুলো ঝুড়ি-ঝোড়ার সঙ্গে চলেছে চোদ্দ-পনেরো জন। এটি ওদের জাত-ব্যবসা। ওরা চিরকাল ধরে বংশ-পরম্পরায় এই কাজ করে চলেছে। ওরা জেলের দল।

আমরা যাচ্ছি অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। প্রত্যুষের কিরণচ্ছটায় এখনও রং ধরে নি। যে গতিতে আলো ছুটে আসছে পৃথিবীর আকাশের দিকে, আমাদের ছিপগুলো তারও চেয়ে দ্রুততর। এ যেন প্রচণ্ড প্রাণশক্তির খেলা, যৌবনশক্তির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

কেষ্টপুর ছাড়িয়ে চলে যাবার পর দু'-একটা পাখির কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। নারকেলতলার পাশে সেই গ্রামখানার ঘুম এখনও ভাঙে নি। দূরে থেকে কলকাতার কয়েকটা আলো চিকচিক করছে। আমাদের নৌকাদলের সামনে ও পিছনে আরও বহু নৌকা ছুটে যাচ্ছিল।

এক সময়ে বললুম, পঞ্চু, শোভারাম আর মদনকে দেখতে পাচ্ছিনে যে? ওরা কি পেছনে আসছে?

পঞ্চু বলল, ঠাকুরমশাই, আপনি এখনও জানতি পারো নি। ওরা সব ছড়িয়ে গেছে। রাসমনিবাজার বেলেঘাটা দিয়ে ওরা গেছে সেই ভবানীপুর আর কালীঘাটে। শিয়ালদা গেছে অন্যদল। আমরা যাচ্ছি পাতিপুকুর, ঘুঘুডাঙ্গা, বউবাজার, ছাতুবাবুর-বাজার কাশীপুর—সবখানে। হাজার মণ মাছ ঘুরবে, ঠাকুরমশাই। এছাড়া জাওয়ালি আছে, গোয়ালন্দ আর অন্নপূর্ণা ঘাটের ইলিশ আছে। তবে কি জানেন ঠাকুরমশাই, ইলিশে লাভ নেই। দু' আনা ছ' পয়সা দরের ইলিশ, ওতে লাভ কম। তবে হ্যাঁ—

উষার কনক কিরণ চিকচিক ক'রে উঠেছে। খাল এখানে আবার দু'ভাগ হয়ে গেল। আমাদের দলের খানচারেক নৌকা এসে লাগল পুলের তলা দিয়ে উল্টোডিঙ্গির এক ঘাটে। এরই মধ্যে ভিড় জমেছে মেছুনি আর পাজারিদের। বড় বড় দাঁড়িপাল্লা এসেছে। দশ সের মাছ কিনলে পাঁচ পোয়া ফাউ দিতে হবে—এটাই রীতি। শশধর এক সময় আমাকে ধরিয়ে দিল, ঠাকুরমশাই, তিন টুকরিতে আপনার মাছ আছে মোট একমণ দশ সের। হিসেব ঠিক রাখবেন। আজকে টান আছে বাগদার, পাঁচ আনার কম বড় বাগদা ছাড়ব না!

বললুম, সব মাছ ত ঝুড়িতে মিশে আছে একসঙ্গে। কোনটা কত, তুমি জানবে কি করে?

ঘাটে মাল নামাতে নামাতে শশধর বলল, ঠাকুরমশাই, ঝুড়ি দেখলেই ওরা চিনবে। দশ সের বাগদা জল খাবে প্রায় তিন সের। ওদের লাভ ওইখেনে।

হট্টগোল আর কোলাহলে ঘাটের ধার মুখর। সেখানে বড় পাল্লায় ওজন নিয়ে চেঁচামেচি আর ফাউয়ের পরিমাণ নিয়ে কলহ-কচকচি। মেয়েছেলের মুখে অশ্লীল ভাষা শুনে কানে আঙুল দিতে হয়। তিন টাকার টুকরি পাঁচ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সাত টাকার টুকরি বেচলো বারো টাকায়। ওর মধ্যে যে ফাঁকি সে জেলেরা জানে। পাজারিরা ঠিক জানে লাভ কোথায়। আমি একটু সরে গিয়ে দূরে দাঁড়ালুম। তখন প্রভাতকাল। বোধ হয় যেন পাঁচটা বাজে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শূন্য ঝুড়িগুলো আবার উঠল নৌকায়। পরে ওগুলো যাবে স্টীমবোটে। ঘণ্টায় একখানা স্টীমবোট ছাড়ে। এবার জেলেদের কাজ প্রায় শেষ হ'ল। এখন থেকে শুধু ফড়ে, পাজারি আর মেছুনি। ওরা মাছ খাওয়াবে কলকাতা আর শহরতলীকে।

এক সময় পঞ্চু আমার হাতে সাতটা টাকা দিয়ে বলল, আপনার এগারো টাকার মাছ আঠারো টাকার ছেড়ে দিলুম, ঠাকুরমশাই। কিন্তু আপনার মূলধনের পঁচিশ টাকা ঠিকই রইল! এটা আপনার লাভের কড়ি!

॥ ৯ ॥

না বাড়ী আর ফিরব না। বাড়ী ফিরলেই ত—সেই দারিদ্র, অভাব আর অনটন। সেই আশাহীন উদ্দেশ্যহীন দিনযাপনের দৈনন্দিন গ্লানি। যেন সবটাই নিরানন্দ দিয়ে ঘেরা।

তবু গৃহত্যাগের পর সপ্তাহ তিনেক বাদে একবার একবেলার জন্য মাকে দেখতে গিয়েছিলুম। খরচ-খরচা বাদ দিয়ে হাতে জমেছিল প্রায় একশ' টাকা। ওটা লুকিয়ে মায়ের হাতে দিয়ে খপ্ করে একবার তাঁর পায়ের ধুলোও নিয়েছিলুম। কিন্তু ওই সঙ্গে প্রায় টাকা তিনেক খরচ করে মায়ের জন্য একজোড়া কোরা থানধুতি এবং একখানা নামাবলী কিনে দিয়ে এসেছিলুম। জননীর চোখে সেদিন জল এসেছিল। আমার গায়ে শুধু ছিল ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জি, পরনে নোংরা ধুতি, আর খালি পা।

পালিয়ে এসেছিলুম অপরাহ্ণের দিকে। স্টীমবোট ধরে সোজা চলে এসেছি 'আলায়'। পথঘাট এখন আমার সব চেনা।

না, এই ভাল। এখানে নোঙর বাঁধা আছে জীবনের। এখানে দু'বেলা মাছ ভাত, অবারিত স্বাধীনতা, শাসন-বাঁধন নেই কোনওদিকে। আমি ওদের চাল তেল নুন মসলা ইত্যাদি প্রায়ই কিনে দিই, ওদের রান্না করি, ওদের ভাষায় কথা বলি এবং ওদের মধ্যে মিলিয়ে থাকি। হ্যাঁ, এই ভাল। এখানে টাকার গন্ধে আমার নেশা

লেগেছে। আমার লগ্নির পরিমাণ এখন দাঁড়িয়েছে একশ' টাকা। আজকাল আমার অ্যাকাউন্টে মাছ কেনা হয় পাঁচ থেকে ছয় মণ। এই তিন মাসে আমি হাত-জাল কিনেছি একখানা, গোটা চারেক পলো কিনেছি। ঘন বর্ষার মধ্যে ছুটোছুটি করতে হয়, সেজন্য একটি ছাতা, পরনের ধুতি গেঞ্জি, কলকাতায় যাবার জন্য একজোড়া নটবর দাসের মজবুত চটি। আমি টাকায় ভাসছি।

নিজেই আমি ছিপ নৌকো চালিয়ে যেতে পারি আজকাল। ডোঙ্গা নিয়ে এপার ওপার হতে শিখেছি। এর মধ্যে একদিন গিয়েছিলুম কালীতলায়। মোড়ল আমাকে দেখে পাদ্যঅর্ঘ দিল। আমি যে বামুন, একথা এখানে এলে মনে পড়ে। আমার পায়ের ধুলো নেবার হিড়িক প'ড়ে যায়।

মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হচ্ছিল, ওরা আজকাল আমাকে মাঝরাত্রে ভেড়িতে নিয়ে যেতে চায় কেন? আমি ব্রাহ্মণ, আমি লেখাপড়া জানা লোক, আমি ওদের মধ্যে বেমানান—এসব কথা আমার কানে এসেছে। কিন্তু ওদের মনের কথা ছিল অন্যপ্রকার। শোভারাম সেইটিই একদিন আমাকে বলল।

—ঠাকুরমশাই, জেলে হয়ে জন্মাতে হয়, নৈলে জেলেকে চেনা যাবে না। মাছ ধরার কারবার আপনি পারবেন না, ঠাকুরমশাই—

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল। দিন কয়েক থেকে ওদের কারবারে মন্দা দেখা যাচ্ছিল। বৃষ্টিতে মাছ তেমন ওঠে না। শোভারাম আলায় বসে আছে আজ তিনদিন।

আমি একটু উদ্বিগ্নভাবেই বললুম, কিন্তু তিন মাসে এসব কাজকর্ম আমি কি কিছুই শিখি নি, শোভারাম?

শিখেছেন ঠিকই। তবে দেখুন না কেন ঠাকুরমশাই, আপনার কাজ আমাদেরই চালিয়ে নিতে হচ্ছে। আমাদের লাইসেন্সে আপনি মাছ কিনতে পাচ্ছেন। চৌকিদার আপত্তি তুলছে।

বিশেষ সঙ্কোচের সঙ্গেই শোভারাম তার মনের কথা খুলে বলছিল। আমি চুপ করেই রইলুম। শুধু এক সময় বললুম, শোভারাম, আমি ভুলি নি। তুমিই আমাকে পথ দেখিয়ে একাজে নামিয়েছিলে।

তা অবিশ্যি বলতে পারেন, ঠাকুরমশাই।—শোভারাম জবাব দিল, তবে কিনা তখন ভেবেছিলুম, দু'চারদিনেই আপনার শখ মিটে যাবে।—বলতে বলতে সে নিজেই উঠে দাঁড়াল। আজ বাড়ি যাচ্ছি, আবার একদিন কথা হবে'খন।

বৃষ্টি ধরেছিল। শোভারাম ঘাটে গিয়ে ছিপ নিয়ে কালীতলার দিকে পাড়ি দিল। ও হ'লো মোড়লের এক সম্পর্কে ভাইপো। আমার মনে নানা সন্দেহ ছোঁক ছোঁক করতে লাগল।

ওরা হিসেব করে দেখেছে গত তিন মাসে আমার খাতে শ'পাঁচেক টাকারও বেশি আদায় হয়েছিল। আমি হলুম উট্‌কো একটা বাইরের লোক। এ যেন অনেকটা ওদের ভাগ থেকে কেড়ে নেওয়া! দেখতেই পাচ্ছি কেনাবেচার ব্যাপারে ওরাই সর্বময় কর্তা। আমার নিজের লাইসেন্স নেই, সুতরাং আমার কারবারটা ওরাই পরিচালনা

করে। আমার নিজস্ব একখানা ছিপও নেই। অথচ ওদের ছিপ ওরাই তৈরি করে। আমি নৌকা নির্মাণ জানিনে। আমার পক্ষে লোকজন রাখা সম্ভব নয়, এটি সুস্পষ্ট। লোক রাখা মানে ভাগীদারকে ডেকে আনা। ভাগীদার মানে ওদেরই চেনা লোক। ওদেরই সঙ্গে তার যোগসাজস থাকবে। এছাড়া আরও কথা আছে। গত কয়েক দিন থেকে লক্ষ্য করছিলুম, আমারই লগ্নির টাকার মাছ কিনে ওরা লভ্যাংশ নিয়ে যাচ্ছে শতকরা ষাট টাকারও বেশি। আমি ক্রমশ যেন ওদের দয়ার পাত্র হয়ে যাচ্ছি।

এসব আমি জানি এবং কালক্রমিক অভিজ্ঞতায় ওদেরও প্রকৃত চেহারা অনেকটা জেনেছি। আমি বরং পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে ভোঁড় জমা দিতে পারি, কিন্তু জেলেদের অন্নে ভাগ বসাবার অধিকার আমার কোথায়?

পর পর চারদিন শোভারাম এল না। কিন্তু তিন দিনের দিন অপরাহ্নের দিকে পঞ্চু এসে হাজির। পায়ের ধুলো নিয়ে সে বলল, পেটের রোগে ভুগছে শোভারাম, —আমাকে তাই পাঠিয়ে দিল।

বললুম, তোমরা মাছ মারতে যাচ্ছ না কেন?

ওমা, যাচ্ছি ত—পঞ্চু বলল, আপনার কষ্ট হয় তাই সঙ্গে নিইনে আপনাকে! মোড়লের যে কড়া হুকুম, আপনার গায়ে না আঁচ লাগে।

পঞ্চু তার ট্যাঁক থেকে মোট পঁয়ষট্টি টাকা বার ক'রে আমার হাতে দিল। বলল, এ টাকা আপনার। শোভারাম পাঠিয়ে দিল।

এবার আমি বললুম, পঞ্চু, মোড়ল যাই বলুক, তোমরা আমাকে সঙ্গে নিচ্ছ না, এটা দুঃখের কথা। আমি তোমাদেরই লোক, একথা ভুলো না। জেলে, কেননা আমি জাল ফেলি। আমি রোজ রাত্তিরে তোমাদের সঙ্গে যাব এ আমার আনন্দ।

আচ্ছা, আমি শোভাকে গিয়ে বলি আপনার কথা।

পঞ্চু চ'লে গেল। বুঝতে পারা যাচ্ছে সে বেশিক্ষণ অন্তরঙ্গ আলাপ চায় না। আকাশ ধরেছে এখন। আলার বাইরে এক পা বাড়ালেই অবারিত সেই দিগ্‌দিগন্ত। সামনে, থইথই করছে সীমানা চিহ্নহীন 'সমুদ্র'। তার ক্রোড়ভূমি রয়েছে এখানে এক আধ টুকরো। এই ক্রোড়ভূমিরই পূর্বান্তে বিদ্যাধরী বুজে এসেছে নোনামাটি আর বালুতে। সেখানে একপাশে একখানা ড্রেজার মাঝে মাঝে বুঝি মাটি কাটে। পঞ্চাশ বর্গমাইলের মধ্যে মাত্র দু'খানা 'আলা'। একখানা আমার এই ঘর, অন্যখানা মাইল তিনেক দূরে। এই সমুদ্রেরই ভিন্ন নাম হ'ল পুরাকালের 'লবণহ্রদ'। এর সমস্ত জলই নাকি বঙ্গোপসাগরের। ইতিহাসের কোন্ পর্বে এক মহাঝঞ্ঝা ছুটে আসে দক্ষিণের সেই সাগর থেকে, এবং তারই তাড়নায় এক বৃহৎ জলোচ্ছ্বাস সুন্দরবন ভেদ ক'রে এতদূর পর্যন্ত এসে আছড়িয়ে পড়ে। এরই এক অংশের নাম 'বাদা', অন্য একটি অংশ 'মহিষবাথান'।

আমি একা, নিঃসঙ্গ। এ নিঃসঙ্গতা আমার পক্ষে নতুন। এখান থেকে শুধু আমি নয়, লক্ষ কণ্ঠের চিৎকারও দূরের কোন জনপদে গিয়ে পেঁছিবে না। আমি নিতান্তই একা। আমিই আমার সঙ্গী।

নিজের মধ্যেই কথা ওঠে, একা ভয় করে না তোর ? করে বইকি। আমি বরাবরই ভীরুপ্রকৃতি। চোর-ডাকাতের ভয়, ভূত-পেত্নীর ভয়, মামার দরুন সেই ছোটবেলাকার পিশাচের ভয়। ভয় আমার মৃত্যুর। ভয়—আমার সামনে যে জীবনটা প'ড়ে রয়েছে তাকে। আমাকে পথ দেখাবার কেউ নেই, তুলে ধরার মানুষ নেই, যদি কোথাও মুখ থুবড়িয়ে পড়ি, তবে নিজের শক্তিকে ভর ক'রেই উঠে দাঁড়াতে হবে।

ইতিমধ্যে খরচ করেছি কম নয়। তবুও এবার আমার টাকা জমেছে অনেক। বোধ হয় এখন সাড়ে চারশ' টাকার কাছাকাছি। গুনতে ভয় করে, কেন না এত টাকা এক সঙ্গে আমি দেখি নি! সব টাকাই আমার, ভাবতে গেলে গা ছমছম করে।

সেদিন সারারাত্রির প্রবল বৃষ্টির পর সকালে একটু রোদ দেখা দিয়েছিল। পলো দিয়ে আমি মাছ ধরছিলুম বাঁধের নালীর ধারে ব'সে। কিন্তু ওটার মধ্যে একটা খেলার আনন্দ ছিল। কাঁকড়া, বাগদা, ট্যাংরা ও বাটার ছানার সঙ্গে প্রায়ই উঠে আসছিল এক-একটা ঢোঁড়া সাপ। এগুলো জলঢোঁড়া, দেড় হাত থেকে দুহাত লম্বা। চক্ষের পলকে আমি পলোটা জল থেকে তুলে নিচ্ছিলুম। তারপর একগাছা বাঁকারির সাহায্যে সেই সাপটাকে তুলে শূন্যে ছুঁড়ে দিচ্ছিলুম, সেটা ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছিল শঙ্খচিল। এই খেলা নিয়ে সারাদিন কাটানো চলে।

কাঁকড়ায় আমার দরকার নেই বাগদাগুলো ছেড়ে দিচ্ছিলুম। ছোট ছোট দু'-চারটে বাটা, একজনের পক্ষে যথেষ্ট।

মাছগুলো নিয়ে যখন উঠব, তখন দূরের থেকে আওয়াজ কানে এল, ঠাকুরমশাই ?

মুখ তুলে দেখি দূর থেকে খালের পার দিয়ে আসছে আমাদের সেই ভাঙ্গোড়ের 'বট-বাবাজি'। আমি হাত তুলে বুড়োর দিকে চেয়ে হাসলুম। পরনে তার সেই গেরুয়া, কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফ, পিছন দিকে ঝুঁটি বাঁধা চুল। দুটি জিনিস তার সঙ্গেই থাকে। একটি হ'ল ভিক্ষার ঝুলি, অন্যটি তার একতারা। আমাকে সে মনে করে একজন পাকা সমঝদার। সেইজন্য অনেকদূর থেকেই সে তার বাউল গান ধরেছিল—"মনের মানুষ মনের মাঝে কর অন্বেষণ রে—" বুগ-বুগ বুগুং বুগুং—বুগ-বুগ—

আবার ধরল, "মনের মানুষ যথায় বিহারে/আট বন্ধ করে দেখ নিগম দ্বারে/তারে আগে চিনবে মন/দুদ্দু কয় শুনেই সারা হই আমি রে—"বুগ-বুগ-বুগুং বুগুং—

গাইতে গাইতে বট-বাবাজি কাছে এল।

এদিকে কোথায় যাচ্ছলে, বাবাজি ?

আর যাব কোথায় বাবা ? মেগে-পেতেই খাই পাঁচ জায়গায়, তাই আসি-যাই। কই, শশধর, পঞ্চু—ওদের দেখছিনে ?

বললুম ওরা ক'দিন আসছে না, আমিও অপেক্ষায় আছি। বাবাজি এখানে আজ তুমি খাবে। আমি রান্না করছি—

বট-বাবাজি বলল, সে কি ঠাকুরমশাই, আমি যাচ্ছিলুম শুলী-মোহান্তর আখড়ায়, সেখানে রাধাষ্টমীর বরাত আছে। নাচ গান হচ্ছে আজ। কাল আবার এই পথ দিয়েই ফিরব।

বললুম, বেশ যাবে বইকি। তবে আমার এখানে চারটি খেয়ে যাও। আর ধরো দু'একখানা গান,—বেশ গলা তোমার বাবাজি। তুমি গান ধরো, আমি রান্না সেরে নিই।

ঘরে এসে বসল বট-বাবাজি। ঝুলি-ঝোলা রাখল, একতারাটা নামিয়ে রাখল পাশে। বললুম, বড্ড মাছি। মশারিটা খাটিয়ে দিই, বাবাজি?

বাবাজি বলল, তা দাও, মাছিতে টি'কতে দেয় না!

নতুন একটা জোলার মশারি কেষ্টপুরের বাজার থেকে সাতসিকে দিয়ে এনেছিলুম। মশারিটা বড়। ভিতরে চারজনে ব'সে বেশ তাস খেলা চলে।

মশারি খাটাচ্ছিলুম, তখন বট-বাবাজি বলল, ঘরে তামাক-টামাক আছে কিছু, ঠাকুরমশাই?

আছে বইকি।—সোৎসাহে বললুম, তুমি সুস্থ হয়ে বসো, আমিই সেজে দিচ্ছি।

মশারিটা খাটিয়ে আমি ওর জন্য ছোট কলকেটা বা'র করলুম। গাঁজার জটি ছোট হাঁড়ির মধ্যেই ছিল। ছোট কলকেটার মধ্যে 'ঠিকরে' বসিয়ে এক একটা শিকড় ছিঁড়ে-ছিঁড়ে কলকেটা বেশ নিরেট ক'রে ভ'রে দিলুম। তারপর সাঁপির ময়লা ন্যাকড়াখানা একটু ভিজিয়ে বাবাজির হাতে দিয়ে বললুম, কলকেটা তুমি মুখে ধরো, আমি দেশলাই জেবলে দিই।

বাউল বাবাজি তাঁর কলকে টেনে দম নিতে লাগল। আমি ততক্ষণে মাছ কুটে বাটনা বেটে আলু-পটল কেটে রান্নায় ব'সে গেলুম। আমি কৃতার্থ। শিল্পী ও গায়কের সামান্য সেবা করার সুযোগ পেয়েছি, এ আমার সৌভাগ্য। ওর গান আমাকে যেন পথ চিনিয়ে নিয়ে যায় চলমান সংসারযাত্রার বাইরে অনেক দূরে। সেখান থেকে আমার ফিরতে দেরি হয়। আমার জীবন-সংগ্রাম বা অন্ন-সংস্থানের সকল প্রচেষ্টা কেমন যেন মিথ্যা মনে হয়।

বাবাজি প্রাণভ'রে ধূমপান করল।

আমি ততক্ষণে আলু-পটল ভেজে নিয়ে বাটনা গুলে ঝোল চড়িয়েছি। অতঃপর ভাজা মাছ তার মধ্যে ছেড়ে নুন দিয়ে মশারির মধ্যে এসে ঢুকলুম। চেয়ে দেখি বাবাজির রক্তজবার মতো দুই চোখ রসের নিবিড়তায় নিমীলিত—যেন রবি বর্মার সেই আঁকা দেবাদিদেবের ধ্যানস্তিমিত দৃষ্টি। একতারাটি নিয়ে আমি ওর হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম।

যে সুর ধরল বাবাজি, সে নাকি যোগিয়া বাউল। ধীরে ধীরে কণ্ঠে তার সুরের লহরী সঞ্চারিত হ'ল:

"ওরে মন শোন রে—
আপন জনমের কথা যে জানে রে
ভাই/সকল ভেদ সেই ত জানে,
তার তুলনা নাই। রজঃবীর্য রসের
কারণ, এ দেহ হইল সৃজন, যারে

ধ'রেস্‌জন পালন তারে কোথা
পাই—" ব্‌গ ব্‌গ ব্‌গ্‌ং ব্‌গ্‌ং—
"ওরে মন শোন রে আমার—" ব্‌গ্‌ং
ব্‌গ্‌ং—

বট-বাবাজি একবার থামল। প্রশ্ন করলুম, এ গান কাদের বাবাজি?

বাবাজি বলল, দুদ্দুশাহর গান ঠাকুরমশাই। লালন ফকিরের শিষ্য দুদ্দু, আমার গুরু। এ গান পুবে-পশ্চিমে হে'টে বেড়ায় বাবা—

আমার অনুরোধে বেরেগীবাবা আবার সেই পুরনো গানটা ধরল, "এ মায়া প্রপঞ্চ-ময়/ভবের রঙ্গমঞ্চ মাঝে রঙ্গের নট নটবর হরি/যারে যা সাজায় সে তাই সাজে/কর্মক্ষেত্রে জীবমাত্রে মাতৃসূত্রে সবি গাঁথা কেহ পুত্র কেহ মিত্র কেহ ভগ্নি কেহ ভ্রাতা/কেহ সেজে এসেছেন পিতা, কেহ স্নেহময়ী মাতা/সে যে কত রঙ্গের অভিনেতা নাচে কত সাজে সেজে।"

আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলুম। বাইরে মধ্যাহ্নকাল যেন তৃষ্ণায় টা-টা করছিল। নোনা জলের হাওয়ায় ঝলকে ঝলকে আসছিল মাছের গন্ধ। তার সঙ্গে শঙ্খচিল আর মাছরাঙ্গাদের অবিশ্রান্ত মুখরতা। এদেরই মধ্যে একাকার হয়ে মিলে যাচ্ছিল বট-বাবাজির দেহতত্ত্বের গান। আমি তন্ময় হয়ে গিয়েছিলুম।

আহারাদির পর বাসনপত্র ধুয়ে ঘর নিকিয়ে আমিও মাছির উৎপাত এড়াবার জন্য বাবাজির মশারির মধ্যে জায়গা নিয়েছিলুম। আমি বামুন, এজন্য বুড়ো একটু প্রতিবাদ করেছিল। কিন্তু বামুনের জাত কোনও অবস্থাতেই যে যায় না, এটা ওকে বোঝাতে হয়েছিল।

দুজনেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।—

ওর কাছেই খবর পেয়েছিলুম' শূলী-মোহান্তর আখড়া এখান থেকে ক্রোশ দুই। তবে জলাবিলের ধার দিয়ে তয়ে-তয়ে গেলে পোয়াটাক রাস্তা কম পড়তে পারে। আজ রাধাষ্টমীর দিনে সেখানে মস্ত ধুমধাম। কালীতলা, ধানকুনি প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সব লোকজন ভেঙ্গে পড়বে। খাওয়া দাওয়ার খুব ঘটা।

ঘুম থেকে উঠে আমি বললুম, বাবাজি, আমিও যাই চলো তোমার সঙ্গে। মোড়লরা থাকবে ওখানে?

বলো কি ঠাকুরমশাই, ওদেরই ত কাজ। দশ-বিশটে ভেড়ির জেলে-মালোরা ভেঙ্গে পড়বে ওখানে—বট-বাবাজি বলল, আর তুমি হলে বাভন, মাথার মণি। তুমি সঙ্গে গেলে আমি ডবল ভেট পাব। বাচ্চাকাচ্চারা দু-দিন ভালমন্দ খেয়ে বাঁচবে।

আমি তৈরি হয়ে নিলুম। খাটো ধুতিখানা পরলুম—একটু ছে'ড়া বা হলুদের দাগ-লাগা—সত ভ্রূক্ষেপ করলুম না। ময়লা ধুতিখানা আরও ছে'ড়া। ওখানা থাক এখানে। পুরনো গেঞ্জিটা ঘর নিকোবার কাজে লেগেছে। হাতকাটা কোরা টুইল শার্টটা পরলুম বটে, কিন্তু ময়লা ধুতির সঙ্গে মিলল না। সমস্ত টাকা নিয়ে পেট-কাপড়ে বাঁধলুম। পাঁচশ' টাকারও বেশি। চটিজুতো জোড়াটা কাগজে মুড়ে

কাজি দিয়ে বাঁধলুম। ওটা হাতে নেবো। ছাতাটা সঙ্গে নিলুম। বৃষ্টি ধরলেও শ্রাবণ এখনও শেষ হয় নি। গামছাখানা বেঁধে নিলুম কোমরে।

বেরিয়ে পড়লুম বট-বাবাজির সঙ্গে। ঘর ত খোলাই, ওর কবাট নেই। জানলাও তাই। কিন্তু চোর ডাকাত—কোন দিনই আসে নি। শুনেছি মধ্যে মাঝে অচেনা বিভুঁইয়ের লোক এই সব 'আলায়' দু-এক রাত কাটিয়েও যায়। সঙ্গে চারটি চাল ডাল তেল-নুন থাকলেই হ'ল—যত খুশি মাছ খেয়ে যাও।

আমি রেখে গেলুম আমার কয়েকটা পলো, একখানা হাত-জাল, ওই বড় মশারি আর গোটা দুই বালিশ। কিছু তেল-নুন-মসলা, কিছু সব্জি, সের দুই ডাল—ওগুলোও রেখে গেলুম। চাল রইল হাঁড়িভরা। ওদের সবাইকে একদিন খিচুড়ি খাওয়াব ভেবে রেখেছিলুম।

এ রাস্তা আমার জানা নেই। মাঝে মাঝে নরম কাদায় পা ডুবে যাচ্ছে। চোরকাটা আর ঝোপড়া জঙ্গলে ভরে গেছে এখান ওখান। বাবাজির সঙ্গে যাচ্ছিলুম খানা খোন্দল পেরিয়ে। অবেলার আকাশে তখন মেঘ জমছিল। আমরা পা চালিয়ে চললুম।

বোরেগী বলল, ঠাকুরমশাই, আরেকটু জোরে পা চালাতে হবে। মেঘে অন্ধকার হচ্ছে ও দিকে।

হোক না—আমি বললুম, এমন সুন্দর দেশ, একটু দেখতে দেখতে যাই না কেন? ওটা বুঝি মিষ্টি জলের বাঁধ? লাল পদ্ম ফুটেছে! নারকেলের বন ছেয়ে রয়েছে সব দিকে। না, আর মাছরাঙ্গাদের দেখা যাচ্ছে না—

তবু হনহনিয়েই যাচ্ছিলুম। এক সময় টিপ টিপ করে বৃষ্টি নামল। কিন্তু এ বৃষ্টি কতটুকু সেই সে-রাত্রির তুলনায়? দু'খানা ছিপ-নৌকো নিয়ে সেই সেদিন সরু খালের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলুম সবাই মিলে। যাচ্ছিলুম তাড়দার ভেড়িতে মাছ মারতে। রাত তখন দুটো। বৃষ্টি এল ঝমঝমিয়ে। খোলা মাঠের নিচে সেই বৃষ্টির ঝাপটা আর শাসানি জীবনে কবে দেখেছি? সেই বৃষ্টি যেন উন্মত্ত, সে যেন সেই রাতে অন্ধ বিশ্ব চরাচরকে চাবুক মেরে তাড়না করছে! কোথায় পাব আশ্রয়? কী বা ঢাকব নিজেদেরকে? আমরা ছিলুম সাতজন। শোভারামরা আমার জন্য ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু সত্যিই বলব, আমি সেই অন্ধকারে উল্লাসে যেন আত্মহারা হচ্ছিলুম। দেখতে দেখতে দু'খানা ছিপ ভরে গেল জলে। নালাপথের পাড় নেই, সে যেন নর্দমার মতো। এক সময় আমরা সাতজনেই জলে নামলুম। সে যেন প্রাণপণ সংগ্রাম। ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে সে যেন জয়-পরাজয়ের কঠোর দ্বন্দ্বযুদ্ধ। অবশেষে সেই দু'খানা নৌকাই উপুড় করতে হ'ল। তাদেরই পিঠের ওপর আমরা সাতজন বসলুম। সেদিন রাত চারটের পর বৃষ্টি থামল। তাড়দার ভেড়ি থেকে মাছ নিয়ে যখন কলকাতায় গিয়ে পেঁছিলুম বেলা তখন দশটা বাজে। খুব সম্ভব কলকাতার বাবুরা সেদিন ডিমসিদ্ধ-খিচুড়ি খেয়ে আপিস গেছে। ঘন বর্ষায় মাছের কারবারে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় বলেই মাছ হয়ে যায় দো-রসা কিংবা পচা! বর্ষার সন্ধ্যায় ইলিশ আর তপসের

বাজার ভাল—ভেড়ির মাছের আদর কম। পুজো পর্যন্ত এইভাবে চলে। তারপর থেকে বাগদা ছেড়ে গলদা চিংড়িতে আসে। ইলিশের বদলে ভেটকি-ভাঙড়।

দেখতে দেখতে বৃষ্টি বেড়ে উঠল। বট-বাবাজি বলল, আর ত কিছু উপায় দেখিনে, ঠাকুরমশাই।

দাঁড়াও।—আমি বললুম, ঝমঝমে বর্ষা, এ এখন ধরবে না। তুমি তোমার একতারাটি পুরো নাও ঝুলির মধ্যে, আর এই ছাতাটা নাও হাতে।

বট-বাবাজি বলল, সে কি কথা, তোমার উপায়? এ যে প্রবল বৃষ্টি, সাপের মাথা ছিঁড়ে পড়ে!

ছাতাটা খুলে বাবাজির হাতে দিয়ে বললুম, তোমার ওই একতারাটা ভিজলে আজ গান করবে কী দিয়ে?

তা যা বলেছ ঠাকুরবাবা, ওটিই খাঁটি কথা।—বট-বাবাজি বলল, ঝুলির মধ্যে ভিক্ষের চাল আর গোটা দুই ঝিঙে-পটলও আছে। তা বাবা, আমাকে সবাই ভালই বাসে।

পথ তখনও বাকি আধ ক্রোশের মতো। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হচ্ছিল। মাঝে মাঝে মেঘ ডাকছে। আমার জামাকাপড় সপ-সপ করছে জলে। শার্টের নিচে গেঞ্জি নেই। তাই ভয় হচ্ছে পাছে টাকাগুলো সব ভিজে যায়। মাথার চুল কাটা হয় নি অনেক দিন, সেজন্য চোখ পর্যন্ত চুলের ঝালর নেমে এসেছে। চার মাসের মধ্যে আরসিতে মুখ দেখি নি! সাবান, চিরুনি ইত্যাদি চোখেই পড়ে নি। নুন-সরষের তেল, কাঠের ছাই আর নিমের ডালি—এরা হচ্ছে দাঁতন। ধোবা-নাপিত কোন দিন চোখেও পড়ে নি। আমি আগাগোড়া অপরিচ্ছন্ন। নিজের আগেকার চেহারা আমার মনেও পড়ে না।

বট-বাবাজি এক সময় বলল, ঠাকুরমশাই, এবার এসে গেছি আমরা। ওই যে টিনের চালা দেখা যাচ্ছে। মাঝখানে শুধু ঘরামিদের বস্তিটা। হ্যাঁ, কুমোরপাড়া কাছেই—বাঁধ পেরোলেই পাব। তোমার ছাতাটা আমার ঝুলিটাকে বাঁচিয়ে দিল। এসো বাবা—

বৃষ্টি তেমনিই চলছে। পথ দেখিয়ে নিয়ে এল বাবাজি। বাঁধের পর কুমোরপাড়া, তারপর বাঁশবাগান পেরিয়ে ঘরামিদের বস্তি। তারপর এল মস্ত 'নারকেলতলা' আর কলাবাগান। সেটা ছাড়িয়েও আবার অনেকটা। যখন আমরা এসে আখড়ার বাগানে ঢুকলুম, তখনও সন্ধ্যার দেরি রয়েছে। বৃষ্টি ও বর্ষা এতক্ষণ পরে যেন এবার একটু থমকিয়ে গেল!

জলটুলি-জেলেপাড়ায় আজ রাধাষ্টমী তিথির উৎসবে অযাচিতভাবে সাক্ষাৎ 'নারায়ণে'র আবির্ভাব ঘটেছে, এই খবর যখন রটল—তখন কী প্রকার পরিস্থিতি দাঁড়াল সেটা অনুমান করে নিতে হয়। আমি দৈবাৎ ব্রাহ্মণ, কিন্তু আমি যে নারায়ণ—এটা ওরা বিশ্বাস করে!

শুধু মেয়ে-পুরুষ নয়, গ্রামবাসী যেখানে যে কেউ ছিল, ভেঙে পড়ল আমার

চারদিকে। এ যেন পরম পুণ্যদর্শন। জেলে, জোলা, মালো, পোদ, বারুই, নমোশূদ্র—সব মিলিয়ে সেই বৃহৎ জনতা। জালি-হালি দুই আছে। আমি না হয় ভিনদেশী বামুন, কিন্তু এরা সবাই ত আমার দেশেরই মানুষ! চারদিকে দেখছি জীবন্ত কঙ্কাল, ঘন কালো তাদের বর্ণ, ছিন্নভিন্ন ময়লা পরিচ্ছদ, উলঙ্গ ছেলেমেয়ে, অর্ধনগ্ন নারী ও পুরুষ। ছোটবেলায় চাটুজ্যেগিন্নির শ্রাদ্ধে দেখেছিলুম শত শত সর্বহারা কাঙ্গালীদের ভোজন. দেখেছিলুম রাজেন মল্লিকের বৃহৎ প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে শতসহস্র অন্নভিক্ষুর দল—এরা সেই তাদেরই সগোত্র! আমার গলা শুকিয়ে উঠেছিল।

প্রথম চেনা লোক পেলুম মোড়লকে। তার লাফালাফি আর চেঁচামেচি দেখবার মতো। আমার দুই পা ভরা কাদা, ময়লা ধুতি সাদা হাফশার্ট ভিজে থপথপ করছে, মাথার চুল দিয়ে তখনও জল নামছে। কিন্তু তা বললে কি হয়? 'ধুলো-পা' ব্রাহ্মণের পাদ্য-অর্ঘ্য কই? সেটা যে সবার আগে! আসন কই? বরণমালা কই? চারদিকে হই-চই প'ড়ে গেল।

মোড়ল কপাল চাপড়িয়ে খানিক ছুটোছুটি করল। কিন্তু দেখতে দেখতে এসে পোঁছল সিঁদুর মাখানো ছোট্ট পিতলের ঘড়া। ভিতরে একটি আম্রপল্লব। ঘড়ার উপরে বসানো পিতলের সরা। তার মধ্যে চাল, সুপুরি, পান, পৈতা ও দক্ষিণার দরুন কয়েকটা তামার পয়সা। একখানা নতুন গামছা ওর সঙ্গে।

আমি টিনের চালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। সেই ঘড়া রাখা হ'ল আমার পায়ের কাছে। কে যেন আনল ধূপ, ধুনো আর প্রদীপ। অতঃপর গ্রামের এবং এই আখড়ার আবালবৃদ্ধবনিতা দূরের থেকে একে একে প্রণাম করতে লাগল। আধ ঘণ্টা ধরে সেই প্রণামের পাট চলল।

এক সময় চিৎকার করে উঠল মোড়ল—তোদের মনে পড়ে সেই সে-বছর এক মোড়ি-পোড়া বামুন ছটকিয়ে এসেছিল এ গাঁয়ে? এ আর তোমার সেই ঢোঁড়াসাপ নয়। এ হ'ল খাঁটি সোনা, জাত-কুলীনের বংশ। ঢোঁড়া দেখে এলি এতকাল, এবার গোখরো দেখে যা। কিন্তু আর নয়, এবার পালা সব—যা, যা পালা!—ঠাকুর, নারায়ণ—তুমি এবার প্রসন্ন হও। আসন 'গোরহোন' করো।

কাগজ মোড়া ভিজে চটি জোড়াটা ঠিক জায়গায় রেখেছিলুম। পাদ্য-অর্ঘ্য যা পেলুম তার মধ্যে কয়েকটা পয়সা ছাড়া গামছাখানারই যা দাম। আমি তখন ডাকলুম বট-বাবাজিকে। বললুম, তোমার ঝুলির মধ্যে এগুলো সব তুলে রাখো। কাল যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা হয় যেন।

বট-বাবাজি কৃতার্থ হয়ে ঘড়া, সরা, বাতাসা, সুপুরি ও গামছাখানা ঝুলিতে ভরে নিল। দক্ষিণার পাঁচটা পয়সাও সে ঝুলিতে ফেলে রাখল।

শুলী-মোহান্তর সঙ্গে পরে আমার দেখা হবে। তার আগে মোড়ল আমার জন্য চমৎকার টিনের একটি চালাঘর ও বারান্দার বন্দোবস্ত করে দিল। ভিতর দিকে তার উঠোন, ফুলবাগান, স্নানাদির জায়গা এবং এপাশে রান্নাঘর।

এই উঁচু বারান্দায় দাঁড়ালে সমগ্র আখড়াটাই দেখা যায়। মোড়ল বলল, তা প্রায়

বিঘে প'চিশেক জায়গা হবে। আম-কাঠাল লেবু-লিচু পেয়ারা-পেঁপে সবই হয়। শাকসব্জি কিনতে হয় না। গোয়াল আছে মস্ত বড়। ঘানি একটা আছে। চিঁড়ে-মুড়ি-মুড়কি খই-বাতাসা এরাই করে। এ আর নতুন কি, ঠাকুর? সব আখড়াতেই এই একই ব্যবস্থা। লোক ত আর কম নয়! ষাট-সত্তর জনের দু-বেলা খোরাকি। মেয়েছেলেরা এখানে সেবাদাসী হয়ে আসে, এখানেই থেকে যায়। তোমাকে ত বলে-ছিলুম ঠাকুর সেই চার মাস আগে, এখানে একবার বসলে আর কোন ভাবনাই নেই। পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে জপতপ পুজো আহ্নিক নিয়ে থাকবে, হাজারে হাজারে শিষ্যসেবক আসবে।

এতক্ষণ পরে আমিই বললুম, শূলী-মোহান্ত কোথায়?

এখানেই আছে—মোড়ল বলল, তবে আজ রাধাষ্টমী কিনা, ভর নিয়ে আছে গোপাল মন্দিরে। রাত্তিরে তোমাকে নিয়ে যাব।

আরেকবার গলা নামিয়ে মোড়ল বলল, তা যদি বললে ঠাকুর, তা হলে শোন শূলী-মোহান্তকে আমিই এখানে বসিয়েছি। ও আগে ছিল কীর্তনে, শোভারামের বাপের সাকরেদ। বোরেগী বাউলদের সঙ্গে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরত। হাতে থাকত একগাছা ত্রিশূল, গলায় কণ্ঠী, আর অঘোরীদের দলে ভিড়ে শ্মশানে রাত কাটাত। আমিই ওকে তুলে এনেছিলুম, ঠাকুর।

কথাবার্তা চলছে এমন সময় একটি অল্পবয়স্কা আঁটসাঁট মেয়েছেলে বারান্দায় এসে উঠল। মুখখানা হাসি-হাসি। সটান এসে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে বলল, বড়জ্যাঠা, আমিই ঠাকুরের সব ভার নিচ্ছি, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না—

এ আবার কে রে? এমন সহজ কণ্ঠস্বর মেয়েমানুষের? একটু অবাক হয়ে ওর দিকে যখন তাকিয়েছে, মোড়ল তখন বলল, তোর সাতজন্মের তাপস্যে রে মানদা, এজন্যে ঠাকুরের সেবার দখল পেলি!

মানদা বলল, তোমাদের সকলের পুণ্যে পেয়েছি, বড়জ্যাঠা।

মোড়ল বলল, এবার তবে আমি যাই ঠাকুর! আবার আসব এক সময়। মানদা রইল তোমার সব কাজে। ওই যে, বলতে বলতেই যমুনি এসে পড়েছে! এত দেরি হ'ল? ভাঁড়ারে পেলি সব?

হ্যাঁ, বাবা—বলতে বলতে একটি ঘন-শ্যামবর্ণা মেয়ে একটি ধামা, তার উপর একটা চেঙ্গারি এবং ডান হাতে হ্যারিকেন ল্যাম্প নিয়ে বারান্দায় উঠে এল।

দুইজন স্ত্রীলোক দেখে আমি আড়ষ্ট। দুজনের মধ্যে মানদা সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের কোনও মেয়েছেলে সেমিজ বা জামা পরে না। পরার রেওয়াজ এখনও বোধ হয় হয়নি। মাঝে মাঝে আমাকে মাথা নিচু করতে হচ্ছিল!

ওরা দুজনেই ভিতরে গেল। দুটো ধামা-চেঙ্গারিতে কি কি সামগ্রী এনেছে আমি লক্ষ্য করি নি। ভিতর থেকে ওদের গলার আওয়াজ, বালতির ঝনঝনানি এবং অন্যান্য সাড়াশব্দ পাচ্ছিলাম। মেয়ে দুটো কাজকর্ম জানে এটা বুঝতে পারছিলুম।

সেই ভিজে জামা-কাপড় আর দু-পা ভর্তি কাদামাটি মেখে হতবুদ্ধি হয়ে বসে আছি—সময় চলে গেছে ঘণ্টা দেড়েক। এমন সময় ভিতর থেকে মানদা এসে আমার একটা হাতের নড়া ধরে তুলল। বলল, এসো ঠাকুর, আমি সব করে দিচ্ছি। যমুনি দেখ, জল একটু গরম হ'ল কিনা।

হয়েছে, এবার নিয়ে এসো।—যমুনি ভিতর থেকে জবাব দিল।

ভিতরের উঠোনে ফুলবাগানের কোলের কাছেই স্নানের জায়গা। সেখানে এনে মানদা আমাকে একখানা টুলের ওপর বসাল। তার পর নিজেই আমার জামার বোতাম খুলে শার্টটা মাথা গলিয়ে তুলে নিল। যখন সে আমার স্নানের সুবিধার জন্য কোমরের কসি আলগা করে ধুতিখানা এলোমেলো করতে চাইল, আমি বললুম, দাঁড়াও, আমার টাকা আছে পেট কাপড়ে—

মানদা বলল, আচ্ছা আচ্ছা—যমুনি, নৈবিদ্যির গামছাখানা দে ত? আলোটা কাছে এনে দে।

যমুনি আলো আর একখানা ছোট্ট গামছা নিয়ে এসে রাখল। সেই গামছায় আমার টাকাগুলো বাঁধলুম। মানদা সেটি নিয়ে পাশের বাতাবি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখল। তারপর গরম জলের বালতিতে ঠাণ্ডা জল মিলিয়ে ঘটি দিয়ে সে আমার মাথায় ঢালতে লাগল। কিন্তু সে তার নিজের কাজের সুবিধার জন্য আমার সব লজ্জাশরম ঘুচিয়ে দিল। মাঝে মাঝে বাধা দিচ্ছিলুম, কিন্তু মানদা আমার গায়ে মাথায় মুখে সাবান ঘষতে ঘষতে বলল, ঠাকুর, তুমি এখনও পুরুষ হও নি, তোমাকে দর্শন করেই বুঝেছি, তুমি এখনও কাঁচা।

নিতান্ত এক কচি শিশুকে উলটিয়ে-পালটিয়ে আপাদমস্তক সাবান মাখিয়ে যেমন স্নান করায় বাড়ির গৃহিণী—এও প্রায় তাই। আড়ষ্টতা, প্রতিবাদ, বিরক্তি প্রকাশ—কোনটার অবকাশ নেই, এবং সে ভ্রূক্ষেপও করছে না। মাঝে মাঝে তার স্তনের মুল আমার চোখে ও নাকে ঠেকছিল, কিন্তু তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নেওয়াটাই তার পক্ষে আগে দরকার।—'এই যমুনি, ব্রাহ্মণ দিগম্বরকে দর্শন করবি ত আয়! কাদা মাটি ময়লা মাখা ছিল হীরে—দেখে যা একবার, ঝলমল করে উঠেছে! ক্ষীরের পুতুল দেখে যা—'

ওধার থেকে যমুনি বলল, দুধ ওৎলাচ্ছে মানদাদি, উঠতে পারছিনে।

স্নানের পর আমাকে একখানা গেরুয়া কাপড়ে জড়িয়ে টাকার পুঁটুলিটা সঙ্গে দিয়ে মানদা আমাকে এনে বসাল শোবার ঘরের একখানা চৌকিতে। আমি কিছু না, আমার কোন স্বকীয়তা নেই, আমার সব লজ্জার বাঁধন শেষ করে দিয়েছে এই সহজিয়া দলের মেয়ে, আমি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়।

মানদা গিয়ে শিশি বার করে আনল। তার থেকে সুগন্ধ তেল কয়েক ফোঁটা হাতে নিয়ে আমার মাথার চুলে মাখাতে মাখাতে বলল, ঠাকুর, তোমার এই কৃষ্ণ কেশ-রাশি যে রেশমের গোছা!

এবার বললুম, কাল আমার মাথাটা ন্যাড়া করে দিয়ো। মাথায় টিকি রেখে আমি এই আশ্রমেই থাকব।

ঠাকুর, সব তোমার ইচ্ছে, সব তোমার আশীর্বাদ।—মানদা বলল, কেন ন্যাড়া হবে? আচার অনুষ্ঠান কি তোমার জন্যে? তোমার এই চুলের রাশির মধ্যে আমি রক্ত-গোলাপের গন্ধ জমিয়ে রেখে দেবো, ঠাকুর।

মানদা চিরুনি এনে আমার মাথা আঁচড়িয়ে দিল। এমন সময় যমুনি এসে আসন পেতে ঠাঁই করল। তারপরে এল ফল-মিষ্টির থালা। আরেক থালায় বসানো জাম-বাটিতে ঘন দুধ। সঙ্গে বড় বড় মর্তমান কলা, চিঁড়ে, বাতাসা ইত্যাদি। মানদা আমাকে আসনে বসিয়ে দিয়ে বলল, ঠাকুর এবার সেবা হোক?

আমি খুবই ক্ষুধার্ত ছিলুম। আসনে বসে ব্রাহ্মণের কৃত্য আচরণ করে নিলুম গেলাসের জলে। 'পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ।'

যমুনি পিছন থেকে বাতাস করতে লাগল।

এমন ঘন দুধের ফলার আর কবে এমন করে খেয়েছি, মনে পড়ে না। ওর সঙ্গে চটকিয়ে নিয়েছিলুম নেয়ো কাঁঠালের কোয়া। একতাল ছানার সঙ্গে লাল জাভার চিনি—অতি উপাদেয়। ফলের থালায় ফল আর মিষ্টি অনেকই রয়ে গেল। আমি এবার উঠলুম। যমুনি হাত ধুইয়ে দিল।

শোবার ঘরখানা বেশ বড়। দক্ষিণের দুটো বড় বড় জানালা ঘেঁষে বড় তক্তার উপর নধর বিছানা পড়েছে। ঘরে ধুনো গন্ধের সঙ্গে ধূপ জ্বালানো হয়েছে। দক্ষিণের হাওয়ায় কেয়ার সৌরভ ভেসে আসছে। আমি বিছানার ওপর বসলুম।

হাতে একটা ছোট বাটি নিয়ে মানদা ঘরে এসে ঢুকল। আমার সঙ্গে তিলমাত্র পরামর্শ না করেই সে আমার কপালে সাদা চন্দন মাখাতে লাগল। কপালের পর গলা, বুক, হাত, পিঠ—একে একে মাখিয়ে দিল। পরে বলল, এবার একটু বিশ্রাম করে নাও ঠাকুর—পরে তোমাকে নিয়ে যাব।

বললুম, কোথায় নিয়ে যাবে?

ও মা, তোমার পায়ের ধুলো না পড়লে কীর্তনের আসর পবিত্র হবে কেন। এখন আরতি হচ্ছে মন্দিরে। সখীসঙ্গে শ্রীরাধা আসবেন শ্যামকুঞ্জে। আজ তোমার ইচ্ছায় সারারাত কীর্তনগান চলবে।—মানদা বলল, তাই ত তোমাকে চন্দনবিলাস নিবেদন করলাম ঠাকুর?

মানদা, তুমি লেখাপড়া শিখেছ কোন্ ইস্কুলে?

মানদা বলল, আমি? আমি একবর্ণও লেখাপড়া জানিনে, ঠাকুর!

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলুম। পরে প্রশ্ন করলুম, আচ্ছা মানদা, সহজিয়া কাকে বলে?

মানদা আমার দুই পা ধরে একবার মাথায় ঠেকালো। সবেমাত্র সে স্নান করে এসেছে। হেঁট হতেই তার ভিজে চুলের আলগা খোঁপা ভেঙে পড়ল বিছানায়। মেয়েটা আমারই সমবয়সী, বরং দু'এক বছরের বড়ও হতে পারে। গায়ের রংটা গঙ্গা-

জলের মতো। মাথা তুলল মানদা এবার। চোখে যেন তার একটা ধ্যানাবেশ। বলল, কিছু জানিনে ঠাকুর, কিছু জানিনে। যা সহজ তাই শুধু জানি। আমি নয়, তিনি। সকলের মধ্যে তিনি। তিনিই যা কিছু করছেন আমার হাত-পা দিয়ে। আমি শুধু দাসী। দাসী আমি সকলের। সকলের পায়ের তলায় জায়গা পাই তাতেই আমি ধন্য।

দিদিমার মুখে কামাক্ষ্যার গল্প শুনেছিলুম। পুরুষ মানুষ সেখানে গেলে নাকি আর ফিরতে পারে না। সেখানকার মেয়েরা নাকি ডাকিনী আর যোগিনী। তারা জানে মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদি। পুরুষেরা তাদের কাছে 'ভেড়া' বনে যায়।

অনেক রাত্রে মানদা আমাকে আখড়ার এখানে-ওখানে নিয়ে গেল। সেখানে মস্ত এক মণ্ডপ। সেই মণ্ডপে কীর্তনের আসর বসেছে এবং যিনি কীর্তনীয়া তিনি কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে আখর ধরছেন একটির পর একটি। এসব আমার কাছে খুবই পুরনো। কিন্তু ঐ আসরেই দেখলুম, দল বেঁধে বসে আছে মাড়ল, শোভারাম, পণ্ডু, বমন, চিন্তামণি, শশধর—সবাই। কীর্তন বেশ জমেছে।

ওখান থেকে সরে মানদা আমাকে দাঁড় করালো শিবমন্দিরের সামনে। আজ রাধাষ্টমী, শিবের সমাদর কম। এসে দাঁড়ালুম কালীর থানে। সমগ্র আখড়ায় তিনটি মাত্র পাকা ঘর, এবং তিনটিই মন্দির। এবারে এলুম গোপালের ঘরে, অর্থাৎ রাধা-কৃষ্ণের মন্দিরে। এখানে পূজা পাঠ ও শয়নারতির আয়োজন চলছে। আমি থমকিয়ে দাঁড়ালুম। যিনি আয়োজন করছেন, তিনি ত হিজড়ে! হিজড়েই ত!

উনি কে?

মানদা বলল, উনিই শুলী-মোহান্ত! আজ উনি আছেন রাধাভাবে। ওঁর মাথার জটা আজ বেণী হয়ে উঠেছে। আজ ওঁর শ্রীরাধার বেশ। ওঁর পায়ে আলতা, সিঁথিতে সিঁদুর, পরনে শাড়ি, গলায় আর হাতে অলঙ্কার।

আমাদের চাপা কথাবার্তা শুনে রাইবেশী শুলী-মোহান্ত আমাদের দিকে চেয়ে মৃদু মধুর হাসলেন। মানদা আমার কানে কানে বলল, ঠাকুর, হাসিটুকু দেখলে ত? ও হাসি বৃন্দাবনের ধীর-সমীরের বংশীবটের! দেখছ না, কৃষ্ণকে উনি জড়িয়ে ধরে আছেন? ভাবে বিভোর দুই চক্ষু?

হঠাৎ চোখ পড়ল বট-বাবাজি বসে রয়েছে দরজার একটু আড়ালে। এক সময় ছোট কল্কেটায় একটা বড় রকমের টান দিয়ে সে 'শ্রীরাধিকার' হাতে ওটা এগিয়ে দিল। শ্রীরাধিকা সেই ময়লা ন্যাকড়াটা কল্কেয় জড়িয়ে মুখের কাছে ধরলেন।

এর পর মানদা আমাকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে চালাঘরগুলি দেখাল। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সহজিয়া ও বাউল,—সব মিলে আছে গায়ে-গায়ে—যার একটিও তলিয়ে বুঝবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি সেদিন আমার আয়ত্তে আসে নি।

মানদা যখন আমাকে খাইয়ে-দাইয়ে বিছানায় শোয়াল, রাত তখন সাঁ সাঁ করছে। যমুনি ঘুমোচ্ছে ভিতর দিকের বারান্দায়। মানদা গিয়ে আহারাদি সেরে একখানা হাতপাখা নিয়ে ঘুমের আগে আমার বিছানার ধারে বসে বাতাস করতে লাগল।

পালা-পার্বণ মিটতে দিন দুই লাগল।—আখড়ায় এখন আর বাইরের লোক কেউ নেই। জলটুঙি-জেলেপাড়া এখন শান্ত। শুনলুম চার-পাঁচ দিনে আখড়ায় যা উপার্জন হয়েছে, পুজো পর্যন্ত তাতেই বেশ চলে যাবে।

সকালবেলা সেদিন স্নান ও জলযোগ সেরে বসেছি, এমন সময় এল মোড়ল আর শুলী-মোহান্ত। মোহান্তর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। চোখ দুটো গুলি-গুলি, দাড়ি-গোঁফ কামানো, গলায় ও হাতে রুদ্রাক্ষের মালা ও তাগা। পরনে ফিকেবর্ণ গেরুয়া। মোড়লের সঙ্গে সেও দূরের থেকে আমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল। বলল, ঠাকুর, আমিও তোমার দাসানুদাস।

মোড়ল বলল, ধরে এনেছি মোহান্তকে। বলি, তুমিও চলো সঙ্গে, ঠাকুরের পায়ে দু'জনেই কেঁদে পড়ব,—তাতে যদি মন পাই।

মোহান্ত বলল, ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা যদি এ গাঁয়ে হয়, তবে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই থাকবে, কিন্তু আমাদের মোক্ষলাভের পুণ্য!

আমি চুপ করে হাসছিলুম। মানদা এগিয়ে এসে বলল, বড় জ্যাঠা, আমি বলি আরও দু'চারদিন যাক্ না কেন, ঠাকুরের মন একটু বসুক, আমাদের সেবায় ওঁর মন একটু তুষ্ট হোক, তখন কথাটা তুললেই চলবে। এতই বা তাড়া কিসের বাবাজী?

আচ্ছা, আচ্ছা,—সেই ভাল, মানদা ঠিকই বলেছে। ঠাকুরমশাই, তোমার ধুতি-চাদর আজ ভোরে এসে পেঁছেছে, আমি গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এস হে মোহান্ত, মানদাই রইল ঠাকুরমশায়ের কাছে, মনের কথা মানদাই বুঝবে ভাল। বুঝলে মোহান্ত, আসল কথাই হ'ল মনের সন্তোষ!

বারান্দা থেকে কয়েক পা এগিয়ে শুলী-মোহান্ত বলল, মোড়ল, কোথা থেকে এমন এমন চাঁদের টুকরো ধরে আনলে বলো দেখি?

চাপা গলায় মোড়ল শুধু জবাব দিল, যদি পাঁচজনে মিলে ওকে ধরে রাখতে পার মোহান্ত, আমাদের সাতজন্ম উদ্ধার পাবে। এখন সব রইল মানদার হাতে।

বট-বাবাজি সেদিন সন্ধ্যায় আমাকে জলা-জঙ্গল আর মাঠ-ময়দানের ভিতর দিয়ে এই আখড়ায় এনেছিল। কিন্তু কোনও পথই আমার চেনা নেই। এ গ্রামের পিছন দিকটা নারকেলের বন আর ঘন বাঁশবাগান। পশ্চিম দিকে মস্ত এক দীঘি, তার পরে আবার বনবাগান। মানদার কাছে শুনেছি, ওদেরই ভিতর দিয়ে প্রায় আড়াই ক্রোশ পেরিয়ে গেলে তবে সেই কেষ্টপুরের খাল। রোজ বেলা দশটার পর একখানা স্টীম-বোট ওই খাল দিয়ে কলকাতার দিকে যায়। ওই খাল দিয়েই আমরা চার মাস ধরে গেছি মাছের ছিপ নিয়ে। খাল পর্যন্ত যেতে পারলে বাকি সব রাস্তা আমার চেনা। আমার মন চঞ্চল হচ্ছিল।

মুমুনি রান্না চাড়িয়েছিল ভিতর দিকে। মানদা বোধ করি রান্নারই আয়োজন করে দিচ্ছিল। এমন সময় বাইরে সাড়াশব্দ পাওয়া গেল এবং দেখতে দেখতেই ভিতরে এসে দাঁড়াল শোভারাম, পঞ্চু আর শশধর।

আমি উঠে হাসিমুখে ওদের অভ্যর্থনা জানালুম। বলা বাহুল্য, ওরাই এদেশে আমার সব চেয়ে বেশি পরিচিত এবং সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ।

শোভারাম পায়ের ধুলো নিয়ে মেঝের উপরেই বসল। ওরাও পাশাপাশি বসে পড়ল। শোভারাম বলল, কাজকর্মের ঝামেলা যাচ্ছে ঠাকুরমশাই, দু'দণ্ড এসে বসব আপনার কাছে, তা আর হয়ে উঠছে না।

বললুম, এ বছরের সমস্ত বর্ষার দুর্যোগ তোমাদের সঙ্গে কাটিয়েছি। তোমরা আমার একান্তই আপন, শোভারাম। একসঙ্গে থেকেছি, খেয়েছি, রোজ রাত্তিরে মাছ মারতে বেরিয়েছি। সব কষ্টের মধ্যেও আনন্দ ছিল। কিন্তু আজ আমাকে সরিয়ে দিতে চাইছ কেন, বলো ত?

আমার কথায় কিছু হৃদয়ের সুর, কিছুবা অনুযোগও ছিল,—সেটার আবেদন ওদের কাছে ঠিক কতটুকু আমার জানা নেই।

পঞ্চু বলল, যাই বলুন, এসব কাজ আপনাকে মানায় না, ঠাকুরমশাই। গাঁ সুদ্ধ লোক আমাদেরই নিন্দে করছে। তা ছাড়া আমাদেরও অসুবিধে—

শোভারাম বলল, মাছ কেনাবেচায় অনেক হুজ্জুতি, ঠাকুরমশাই। দেখেছেন ত সব? আপনাকে সামলিয়ে আপনার জন্য নিলেম ডাকবো, আবার এদিকে আমাদের দিক সামলাব,—এত হয়ে উঠছে না।

আর কি কি অসুবিধে বল?

শশধর বলল, প্রথম হ'ল ছিপ নৌকোয় আপনার মাল ধরানো। আপনার নৌকোও নেই, নিজের লোকজনও নেই। ভেড়িতে আপনার লাইসেন্সও নেই। কেউ আপনাকে চেনে না।

কি জানেন ঠাকুরমশাই, এ হ'ল মুখখিস্তি আর জাল-জালিয়াতির কারবার—পঞ্চু আমাকে বোঝাতে লাগল, আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি কেন এই নরকে নামবেন? আমাদের এটা হ'ল জাত-ব্যবসা, আমরা চোদ্দ পুরুষের জেলে।

শোভারাম বলল, আখড়ায় আপনার কেমন লাগছে, ঠাকুরমশাই?

হাসিমুখে বললুম, দিনরাত্তির খাচ্ছি, সেবা নিচ্ছি, আর বেকার হয়ে বসে আছি। এ যেন সুখের ফাঁদে পড়ে গেছি। চারিদিক থেকে জাল ফেলেছে, মাছের মতন ধরা পড়ে খাবি খাচ্ছি।

ওরা সবাই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল।

এবারেই হ'ল ওদের আসল কথা। শোভারাম তার পেটকাপড় থেকে এক গোছা টাকা বার করে বলল, আমরা কোনমতেই আপনার কাজে আসতে পারলুম না ঠাকুর-মশাই—আমাদের মাপ করবেন। এ আপনার সেই একশ টাকা, যেটা লগ্নি করেছিলেন। আর এই হ'ল পঞ্চান্ন টাকা—চার পাঁচ দিন আপনার নামে মাছ কেনাবেচা করেছি।

পণ্ড টাকাগুলো এক করে আমার কাছে গছিয়ে দিল।

ওরা যেন মুক্তি পেয়ে বাঁচল, এমন ওদের মুখ চোখ। আমার আর বলবার কিছু রইল না। ওদের অন্নে ভাগ বসাচ্ছিলুম, এবং ওদের ব্যবসা কেড়ে নিচ্ছিলুম—এইরূপ একটা মানসিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল। সুতরাং আমিও বোধ হয় এবার থেকে নিষ্কৃতি পেলুম।

শোভারাম বলল, আপনি আমাদের আলা ভরে রেখে এসেছেন দেখলুম। পাঁচ-পাঁচটা পলো, একখানা হাতজাল, তারপর আলার মধ্যে অত বড় মশারি, দুটো বালিশ, খাবার জিনিসপত্তর—ও সবই যেন আপনার আশীর্বাদ। আপনাকে মনে থাকবে চিরকাল।

শশধর বলল, এবার আপনি ঠিক জায়গায় এসেছেন। আপনি ব্রাহ্মণ, এই আপনার উপযুক্ত ঠাঁই। শিষ্য-সেবক দলে দলে জুটবে, কোনও কিছুর ভাবনা থাকবে না। মোড়লকাকা আপনার সব গুছিয়ে দেবে।

ওরা এক সময় বিদায় নিল। কিন্তু একথা জেনে গেল, আমার মাছের কারবারে গনেশ পলটালো বটে তবে আমি এই গ্রামের কুলগুরু হিসাবে এখানেই প্রতিষ্ঠিত হবো! ওরা এখানে আমাকে গোদান ভূমিদান সবই করবে, আমার জন্য পুকুর কাটবে, বাস্তুভিটার মধ্যেই নারায়ণের মন্দির গড়বে। আমার গোলায় নিজস্ব ধান উঠবে, এবং খামারে আমার জন্য শাক-সব্জি ফলানো হবে। কোন ভাবনাই আমার আর থাকবে না।

সবই আমার কাছে আজগুবী মনে হচ্ছিল। যা কিছু শুনেছি গত চার মাস ধরে—সব আমার কাছে মিথ্যে এবং হাস্য-কৌতুকের বিষয়। আমি আধুনিক কালের ছেলে, ঘর থেকে বেরিয়েছি ভাগ্য অন্বেষণে, নেমেছি জীবন সংগ্রামে, মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি কঠোর বাস্তবের। আমি করব গুরুগিরি? আমার জন্য গোলাভরা ধান আর পুকুরভরা মাছ? আমি জোটাবো শিষ্যসেবক? আমি হাসলুম। এরা সবাই মিলে আমাকে যেন একটা মধ্যযুগীয় আচার-সংস্কারের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে অবাস্তব লাগছিল।

দেখতে দেখতে অনেক টাকা জমল আমার। একদা বহু চেষ্টায় বহুজনের কাছে হাত পেতে তিরিশটি টাকা যোগাড় করেছিলুম। এবার গিয়ে সেই টাকা কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করব। খরচ-খরচা করেও এখন আমার হাতে জমেছে সাতশ' টাকারও বেশি। নগদ করকরে সাতশ'।

গামছার পুঁটলিটি বার ক'রে আমি আজকের টাকার গোছাটা একসঙ্গে করে আবার গেরো দিলুম।

ওরা আমাকে সরিয়ে দিয়ে বোধ হয় ভালই করল। ওই দুর্যোগ আর দুর্গতির মধ্যে আমার উপার্জনের নেশা অপেক্ষা নতুন একটা জীবন আবিষ্কারের উদ্দীপনা ছিল প্রবলতর। আমি তরঙ্গের চূড়ায়-চূড়ায় লাফিয়ে বেড়াতে চাই। আমি চাই নিত্য

নতুনের ডাক শুনতে। আমি এক, কিন্তু আমি বহু হ'তে চাই। আমারও মন বলছিল, না, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনওখানে!

খাওয়ার আগে মানদাকে বলেছিলুম, আমি একবারটি বাড়ি যাব। মাকে দেখি নি অনেকদিন।

মানদা আমাকে আদর করে বলল, বেশ ত, দু'চারদিন ঘুরেই এসো। তবে আর এক কাজ কর না কেন, ঠাকুর? আসবার সময় মাকে সঙ্গে এনো। তিনি এখানে হবেন দেবী প্রতিমা। তাঁরও সেবা করে আমরা ধন্য হব। বলো আনবে তাঁকে?

তিনি রাজি হলে নিশ্চয় আনব। কাল ভোরেই আমি যাব।

মানদা বলল, না, তোমাকে একলা যেতে দেব না। আমি আর বড় জ্যাঠা গিয়ে তোমাকে স্টীমবোটে তুলে দিয়ে আসব।

বেশ।

কিন্তু সেইদিন রাত্রের দিকে মানদার আচরণ ও ব্যবহারে আমি খুশী হতে পারি নি। সে যেন আমার মনের অতল তলের একটা নিশ্চেতন স্পৃহাকে বাইরে টেনে বার করতে চাইছিল—সাপের ল্যাজ ধরে বেদেনীরা যেমন সাপকে গর্তের ভিতর থেকে টেনে আনে। আমি বিরক্ত হচ্ছিলুম, কিন্তু তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। মুমুনিকে সে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল হয়ত বা এই কারণেই। তার এই অতিশয় দৈহিক সমাদর সইতে না পেরে যখন বিছানায় উঠে বসলুম মানদা তখন শান্ত হাস্যে বলল, ঠাকুর, তুমি নারায়ণ, আমি সামান্য সহজিয়া মেয়ে। দেহই আমার নৈবেদ্য, তোমার চরণের সেবায় তুমি গ্রহণ করো, ঠাকুর।

আমি ঠিক কি বলব বুঝতে পারছিলুম না। রাত তখন সাঁ সাঁ করছে, কেউ কোথাও জেগে নেই। তাছাড়া এই ছোট আশ্রমটি আখড়ার একদম দক্ষিণ প্রান্তে। মাঝখানে মস্ত উঠোন, তারপর ফুলের ছোট বাগান, এবং তারপরে কীর্তনের সেই মণ্ডপ।

মেয়েটার চোখ দুটো কেমন যেন আবেশ-মদির, একটু যেন নিমীলিত। লোকে বলবে ওর মুখশ্রী ভাল, স্বাস্থ্যশ্রী আরও ভাল,—ওর খোলা গা আমি বহুবারই দেখেছি এবং সেদিকে মানদা ভ্রূক্ষেপও করে নি।

কিন্তু ওকে দেখে আমি ভয় পাচ্ছিলুম।—

মানদা হাসিমুখে প্রশ্ন করল, বসে রইলে ঠাকুর, ঘুম আসছে না?

ওর মুখের দিকে আবার তাকালুম। আমি দেখছি ওর দুই চোখে অতি মধুর তন্দ্রাবেশ, কিন্তু আমার দিব্যচক্ষু দেখেছে সেটি সত্য নয়! সহজিয়া মেয়ে কাকে বলে আমি জানিনে, কিন্তু শিকারকে সামনে রেখে যে-বাঘিনীর চোখ ধ্যানতন্দ্রায় জড়িয়ে থাকে তাকে বিশ্বাস করতে বাধে!

বললুম, তুমি গিয়ে শুয়ে পড় না কেন?

আচ্ছা, তাহলে এবার তুমি ঘুমোও ঠাকুর। আমি একটু বাতাস দিয়ে যাই। বড্ড গুমোট।

আবার আমি জানালার দিকে পাশ ফিরে কঠিন প্রতিজ্ঞা মনে নিয়ে শুয়ে পড়লুম। হ্যারিকেনের আলোটা জ্বলছে ঘরের ওদিকে। মানদা আর আমার গায়ে হাত দিল না। শুধু পিঠের দিকে বাতাস করতে লাগল।

আমি তিন মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

মানদা কিন্তু সত্যই বলেছিল। শ্রাবণের শেষ এবং ভাদ্রের প্রারম্ভে গুমোট দেখা দেয়। জানালা দিয়ে কতক্ষণ ফুরফুরিয়ে বাতাস আসছিল, এবং সে-বাতাস কতক্ষণ আগে থেমেছে আমি টের পাই নি। মানদা কখন হাতপাখা রেখে তক্তা থেকে নেমে মেঝের উপর গড়িয়ে পড়েছে তাও আমি জানিনে। কিন্তু গরমের চোটে এক সময় ছাঁৎ করে আমারই ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখি গলা দিয়ে আমার ঘাম নেমেছে এবং মশাও বেশ কামড়াচ্ছে দু'চারটে। আলোটা তেমনিই জ্বলছিল।

কোঁচার খুঁট দিয়ে ঘাম মুছলুম। মশাগুলো তখনও গায়ের আশেপাশে ঘুরছে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরে দেখি, কলাবাগানের মাথার উপর বোধ করি মেঘ জমেছে। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

হাতপাখাখানা মানদা কোথায় রাখল দেখতে গিয়ে চোখ পড়ল মেঝের দিকে। মানদা অকাতরে হাত-পা ছড়িয়ে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। পাখাখানা রয়েছে তার ডান হাতের মুঠোয়।

আমি শিশু নয়, বালক নয়, আঠারো বছরের তরুণ পুরুষ! আমি জ্ঞাতাস্বাদও নই। তবু অবাক বিস্ময়ে মানদার আনগ্ন আপাদ-মস্তক চেয়ে রইলুম। সে সহজিয়া মেয়ে, যিনি দেহতত্ত্বরসের দেবতা তাঁরই উদ্দেশে মানদা আত্মনিবেদিতপ্রাণা! দেবতার প্রতি অঙ্গের জন্য তারও প্রতি অঙ্গ কাঁদে! সেই দেবতা যেন তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সকল লজ্জাবরণ ঘুচিয়ে দিয়ে আমার সামনে ওকে মেলে ধরেছেন!

দেখতে দেখতে বজ্র-বিদ্যুতের সঙ্গে মুষলধারায় বৃষ্টি নামল। স্নিগ্ধ বাতাসের ঝাপট এল ঘরের মধ্যে। আবার আমি শুয়ে পড়লুম।

পরদিন যথাসময়ে ওরা আমাকে স্টীমবোটে তুলে দিয়েছিল। মানদার সঙ্গে ছিল মোড়ল আর শোভারাম। আমাকে বিদায় জানাবার কী ঘটা! সঙ্গে দিতে চেয়েছিল এক হাঁড়ি ক্ষীর, কয়েকটা ঝুনো নারকেল আর এক ছড়া মর্তমান কলা। আমি কিছু নিই নি। ওরা দিয়েছিল ধুতি চাদর, একটি সোনার অঙ্গুরী, গেরুয়ার দোপাট্টা— আমি তাও রেখে এসেছি। আমার নিজের হাত-কাটা টুইল শার্ট, খাটো ধুতি এবং আমার কেনা এই চটি জুতো—ব্যাস, এই যথেষ্ট। তবে নৈবিদ্যির গামছায় বাঁধা টাকার পুঁটুলিটা পেট-কাপড়ের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছিলুম! আমি এখন অনেক টাকার মানুষ। অগাধ টাকা এখন আমার। সেদিন এত লোক যাচ্ছিল স্টীমবোটে, কিন্তু ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে বিশ্বাস করলুম, আমার মতো ধনী কেউ নেই ওদের মধ্যে! ওরা কি জানে কত টাকা আছে আমার সঙ্গে! সকলের লোভের চক্ষুর উপর দিয়ে সৌভাগ্যের পুঁটলি নিয়ে যাওয়া কী আনন্দ সে কাকে বোঝাব? আজকাল একটা

এম· এ পাস করা ছেলে কুঁড়ি টাকার চাকরির জন্য ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরছে, সে কি জানে তার তিন বছরের মাইনে আমার ট্যাঁকে গোঁজা রয়েছে?

যাই বলো, ওই মেয়েটার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচলুম! আর দুদিন থাকলে আমার মাথায় খুন চাপত! মেয়েটার মতলব একেবারেই ভাল ছিল না। আমাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যেন যৌন দুর্নীতির পিচ্ছিল পথে নিয়ে যাচ্ছিল। কথায়-কথায় আমার ধর্ম, আমার ব্রহ্মচর্য, আমার ইজ্জত পর্যন্ত নষ্ট করছিল। আমি যে কৌমার্য ব্রতধারী এবং স্বামীজীর মন্ত্রসিদ্ধ—মানদাকে এটা কোনমতেই বোঝানো যাচ্ছিল না। সে বোধ হয় আমাকে দু'বছরের কচি শিশু ছাড়া আর কিছু মনে করে নি।

বট-বাবাজিকে ছাতাটা দিয়ে দিয়েছি, ওতে আমার দুঃখ নেই। সে বড় মধুর বাউল গান গায়। রৌদ্রে আর বর্ষায় তাকে ভিক্ষায় বেরোতে হয়, ছাতাটা তার দরকার।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা আনন্দের কথা এই, আমি এযাত্রা পালিয়ে বাঁচলুম।

এরপর টাকা নিয়ে বেশ কিছুদিন ছিনিমিনি চলল। যাদের কাছ থেকে তিরিশ টাকা ধার নিয়েছিলুম, তাদের নাকের ডগায় প্রত্যেকটি টাকা ধরে দিলুম। তারপর আনলুম আট আনায় একসের রাবড়ি, পাঁচ আনায় একসের চিনিপাতা দই। পয়সা-পয়সা শ্রেষ্ঠ আম-সন্দেশ, কে কত খাবে খাও! ছ'আনা সের কাটা রুই, ছ'আনা মাটন,—রান্নাঘরে মোচ্ছব লেগে গেল। ডিম খাওয়া বাড়িতে নিষিদ্ধ, সুতরাং গা ঢাকা দিয়ে এক সময়ে হোটেলে গিয়ে ডবল-ডিমের অমলেট খেয়ে এলুম তিন পয়সায়। বউদিদির জন্য ভুংলা গরদের শাড়ি আট টাকায়, মায়ের জন্য পুজোর বাসন, বিছানা-বালিশ-ওয়াড়-মশারি, রাত্রের দিকে সবাই খাবে গাওয়া ঘিয়ের লুচি, —টাকা উড়তে লাগল কিছুদিন ধরে। ওদিকে তেরো বছর বয়সের ভাগ্নেটা আসে যখন-তখন। সে পাকা চোর। সে যদি পয়সাকড়ির গন্ধ পায় তবে আর রক্ষা নেই। তার ধারণা, ভাগ্নেদের জন্ম হয় মামাদের তপিল মারবার জন্য। খবর পেয়েছিলুম, প্রত্যেক বাক্স-প্যাটরার দ্বিতীয় চাবিটি সে আগেভাগে সংগ্রহ করে রাখে। সাধু সাবধান।

মায়ের ইচ্ছা, পুজোর পর তিনি কাশী-বৃন্দাবন হরিদ্বার জয়পুর-পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থ করতে যান। আমি উল্লাসে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলুম। আমার তখন চোখ ফুটেছে, পথঘাট চিনেছি, বাইরের ডাক মাঝে মাঝেই কানে আসে। আমি এখন সাবালক, সাবালকের সব লক্ষণ এখন আমার মধ্যে পরিস্ফুট। মেয়েদের স্নানের সামনে এখন আর আমি দাঁড়াইনে। বরং আমার মাসতুতো-পিসতুতো-মামাতো ভাইদের মিলিয়ে বারো চোদ্দটি যাঁরা আমার বউদিদি, তাঁরা আমাকে সামনে দেখলে তাঁদের দেহের পুঁজিপাটার উপর ভিজে কাপড় টেনে-টুনে দেন। এখন আমি সাবালক, আর আমি কারো পরোয়া করিনে!

প্রথমেই কাশী এলুম। কিন্তু গত বছর শীতকালে যখন আসি তখন এখানে হয়েছিল প্রথম 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'। কী ঘটা তিনদিন ধরে! রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর হয়েছিলেন সভাপতি। অনেক নামজাদা সব লেখক এসেছিলেন। একজন বুঝি লেখিকা কে যেন। আমি আবদার ধরেছিলুম ভলাণ্টিয়ার হবো। ওই একটা লাল রংয়ের ব্যাজ আমার জামায় লাগানো থাকলে আমার পক্ষে ওই সম্মেলন হবে অবারিতদ্বার। সুতরাং কিশোর দাদা তাঁর বন্ধু ভূপেন বিশ্বাসকে বলে আমার ব্যবস্থা করলেন। কাশীরাজের দেওয়ান ললিতবিহারী সেনরায়, বিশু ও বেণী গুপ্ত, দু-চারজন মহামহোপাধ্যায়, আরও কত লোক। ওদের সকলের মধ্যে উজ্জ্বল হলেন রবিঠাকুর। কাঁচাপাকা দাড়ি, ধবধবে রং, গায়ে শাল, নাকে টেপা-চশমা, তার ডাঁটি নেই। বিরাট পুরুষ। উনি নাকি প্রায় সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন।

আর আমার কিছু মনে নেই। গত বছর আমি নাবালক ছিলুম। কিন্তু এ বছর? এ বছর আমি মাছের ব্যবসা করে দু'হাতে টাকা রোজগার করেছি। দুর্যোগে, দুস্তরে অন্ধকারে,—কঠিন সংগ্রামের মুখোমুখি হয়ে বার বার আমার ছিপনৌকা ডুবে যেতে চেয়েছিল, আর আমি সমস্ত বর্ষাকালটার ঝড়ের আঘাতে বৃষ্টির তাড়নায় ছিন্নভিন্ন চেহারায় বিপরীতের বিরুদ্ধে লড়াই করে এসেছি। ওরই মধ্যে দেখে নিয়েছি মানুষের ভালবাসা আর মমত্ববোধ, মানুষের স্বার্থপরতা আর ইতর চক্রান্ত, ওরই মধ্যে দেখেছি আনন্দে বেদনায় দুঃখে নৈরাশ্যে দুঃসহ দহনে আমি বিপর্যস্ত এবং দ্বন্দ্বদোলায়িত। আমার অন্তত: পঁচিশ বছর বয়স বেড়ে গেছে। এখন আমি সাবালক।

কাশীতে এখনও তেলের আলো জ্বলে, শুক্লপক্ষে তাও থাকে না। খোয়ার রাস্তায় শুধু একা আর টাঙ্গা। চারদিকে জপতপ পূজোপার্বণ। গভীর রাত্রে নাকি কালভৈরব পাপীদের অস্থি নিয়ে ছুঁড়ে দেন ব্যাসকাশীর দিকে, পুণ্য বারাণসীতে তাদের ঠাঁই নেই। প্রতিদিন প্রত্যূষে কুচবিহারের কালীবাড়ীর উচ্চচূড় নহবতখানায় অতি মধুর শানাইয়ের সুর ওঠে। সেই সুর ভেসে যায় উত্তরবাহিনী গঙ্গার প্রবাহে। সেই মধুর সুরধ্বনিতে আমাদের ঘুম ভাঙ্গে।

তীর্থযাত্রীর সংখ্যা বেড়ে উঠল কাশীতে। কাশী থেকে যাচ্ছিলুম বৃন্দাবনের দিকে। এটি অযোধ্যা ও রোহিলাখণ্ডের রেলপথ, এবং এটি যুক্তপ্রদেশকে ছেয়ে রয়েছে।

এই যুক্তপ্রদেশ থেকে মাঝে মাঝে বজ্র-কণ্ঠের ডাক দিচ্ছেন মোতিলাল নেহরু। পাঞ্জাবে যেমন পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায়। বাঙ্গলায় যেমন দেশবন্ধু। দেশবন্ধুর প্রতি অসীম অনুরাগ নিয়ে উঠেছেন চারটি প্রতিভা। নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ী, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, সঙ্গীতাচার্য কিন্নরকণ্ঠ দিলীপ-কুমার রায়, এবং রাজনীতিতে যিনি প্রথম আবির্ভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বজনপ্রিয় হয়ে উঠলেন, সেই সৌম্য সুদর্শন তরুণ কুমার সুভাষ চন্দ্র বসু। বিলাত-ফেরত উচ্চাভিলাষী যুবকের পক্ষে সর্বাপেক্ষা লোভনীয় যে চাকুরি, যার নাম আই সি এস, সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই চাকুরি পরম অবহেলায় অনেকটা যেন ঘৃণার সঙ্গে পরিত্যাগ করলেন, এবং ঝাঁপ দিলেন দেশকর্মে। এই যুক্তপ্রদেশে স্বরাজ্য পার্টি একটি পরিণত রূপ নেয় এবং সম্ভবত এই বছরেই জওহরলাল নেহরু ব্যারিস্টারী ছেড়ে

দেন। স্বরাজ্য পার্টির প্রবল শক্তিলাভের ফলে ইংরেজ শাসকবর্গ এবার সচকিত হন।

মথুরায় এসে বিশ্রামঘাটে থমকিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। আশা ছিল কংসের কারাগার দেখব, দেখব শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থল, দেখতে পাব যমুনার ঠিক কোন্ ঘাট থেকে জন্মাষ্টমীর বর্ষামুখর ও বজ্রবিদ্যুদ্দাম-শিহরিত গভীর রাত্রে বসুদেব তাঁর শিশুকৃষ্ণকে বুকে করে নদী পার হয়েছিলেন। দেখব সেই স্থলটি, যেখানে বাসুকী তাঁর সহস্র ফণায় বাসুদেবের মাথায় ছত্র ধারণ করেছিলেন এবং ধর্মরূপী শৃগাল তাঁকে নদী উত্তরণের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

না নেই, সে-যুগ কবে শেষ হয়ে গেছে। আমরা এলুম বৃন্দাবনে। ঘুরে বেড়ালুম নিধুবন আর মধুবনে, বেত বন আর মাঠ বনে, দেখে বেড়ালুম লালাবাবুর কীর্তি আর গোবিন্দের মন্দির। কখনও অন্ধকারে, কখনও তেলে-জ্বালা গলি-ঘুজিতে, কখনও শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায়, আবার কখনও বা ধীরসমীরে বংশীবটে কালীয় দমনের ঘাটে ঘাটে—কী যেন খুঁজলুম! প্রাচীন পাথরের গন্ধে-গন্ধে, ভগ্নজীর্ণ অট্টালিকার আনাচে-কানাচে, মন্দিরের পূজারীর দুর্বোধ্য পূজামন্ত্রে—কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম আকুল আগ্রহে। যা জানিনে, বুঝিনে, অনুমান বা উপলব্ধি করিনে, যার আস্বাদ পাই নি কখনও, যার ইশারা কোথাও দেখিনে, আমি যেন খুঁজছিলুম সেই অনাস্বাদিতকে।

এসে দাঁড়ালুম জয়পুরে। চারিদিকে রক্তবরণ জাফরিকাটা বিচিত্র অট্টালিকা। সে অপরূপ ছবি। এখানেও গোবিন্দজী আর যশোরেশ্বরী কালী। সে সব যেন অনেক ইতিহাস অনেক কালের। আম্বের দুর্গ আর সেই গলতার প্রপাত,—সর্বত্র যেন কোন্ প্রাচীনের কাঁদন ফুঁপিয়ে ওঠে! না, এরা এখন তোলা থাক আমার মনের মনিকোঠায়। ভিড়ের ভিতরে দাঁড়িয়ে এদের দেখব না। একা দেখব এদের একান্ত করে। এখন এরা থাক। আমি শুধু পথ চিনে রাখি।

আজমীর নয়, আজমের। যেমন বিকানের, যশলমের। উচ্চারণে ভুল হলে চলবে না। অম্বর দুর্গ নয়, ওটা আমবের। আমার সহপাঠী বন্ধু গিরিজা সেন—জয়পুর মহারাজার প্রাক্তন মন্ত্রী সংসারচন্দ্র সেনের নাতি—তাকে প্রশ্ন করো, সে নির্ভুল উচ্চারণ করবে। আজমের থেকে পুষ্কর। পুষ্কর দুষ্কর—পাণ্ডারা বলে। কূর্ম-পৃষ্ঠ আরাবল্লির একটুখানি অংশ পেরিয়ে গেলে পুষ্কর হ্রদ। সেখান থেকে মরুভূমি। বালুর মধ্যে পা ডুবে যায়। প্রতি পদক্ষেপে বড় বড় কাঁটা পায়ে ফোটে। ওরই ভিতর দিয়ে ওঠো সাবিত্রী পাহাড়ে। ব্রহ্মার দুই স্ত্রী—সাবিত্রী আর গায়ত্রী। সাবিত্রীর মন্দিরটি ছোট, যেন নিরভিমান, তার অঙ্গসজ্জা নেই, অলঙ্করণ নেই। ভিতরে একটি জয়পুরী শ্বেত-বর্ণ বালিকা বধুর মূর্তি। সে যেন নিত্যকাল ধরে বড় বড় চোখে চেয়ে রয়েছে চারিদিকের রুক্ষ ধূসর মরুভূমির দিকে। সাবিত্রী, তুমি থাকো তোমার শাঁখা, সিঁদুর আর নোয়া নিয়ে। আজ আমি দেখে যাচ্ছি তোমাকে আমার জননীর চোখ দিয়ে। আবার আমি আসব, একান্ত করে তোমাকে দেখে যাব!

সমস্ত ভ্রমণটা যেন স্বপ্নাবেশ এনেছিল আমার দুই চোখে। আমি যেন যন্ত্রচালিত,

অদৃশ্য দিশারী আমাকে দেখিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি যেন চিরকালের সেই নিত্য তীর্থপথিক, যার প্রারম্ভ ও পরিণতি নেই। আমি যেন অনাদিকালের পরম নিয়মের সঙ্গে আমার গতিকে মিলিয়ে রেখেছি।

শেষ রাত্রির শীতের হাওয়ায় একদা লাকসার পেরিয়ে হরিদ্বারে এসে পেঁছলুম। ১৯২৩, নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহ। যারা গাড়ী থেকে নামল তারা আমার চোখে নতুন। ঊলি-ঝুলি ময়লা পরিচ্ছদ, আধা-উলঙ্গ, বৈরাগী, বাউণ্ডুলে, মাথায় ঝাঁকড়া-জটা, কাঁধে কম্বল, হাতে লোটা—তারা নামল দলে দলে। না, পরিচিত বাঙ্গালীর মুখ দেখছিনে। কোথাও দেখছিনে শিক্ষিত-ভদ্রের ছাপ, দেখছিনে পালিশ করা আধুনিককে। ঘরকুনো বাঙ্গালী দু'চারজন হয়ত পথ ভুলে আসে, কিন্তু সে যেন খবরের কাগজের খবর! বিচিত্র বলেই প্রকাশিত হয়।

ছোট স্টেশনটি পেরিয়ে বাইরে এসে দেখছি একটি জনপদ। একদিকে দু'চার-খানা বাড়ী, মাঝে মাঝে বস্তি, ফাঁকে ফাঁকে এক-আধখানা পুরি-কচুরির দোকানে উনুন জ্বালিয়ে কড়াই চাপানো হয়েছে। অন্য দিকে ঘন ঝোপ আর অফুরন্ত জঙ্গল, তারই মধ্যে কোথায় যেন বিল্বকেশ্বর মন্দির। সামনে মস্ত মনসা পাহাড়—তার নিচে আগাগোড়া সমগ্র জনপদটাকে মনে হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র, মানুষদেরকে মনে হচ্ছে পিপীলিকা শ্রেণী!

যে-গঙ্গাকে জেনেছি আশৈশব, এ গঙ্গা সে গঙ্গা নয়। সেই গঙ্গার নাম হুগলী নদী, সেখানে প্রচলিত ভাগীরথী। এখানে হরিদ্বারের নীলধারা, ওধারে মায়াপুরের মূলগঙ্গা, চণ্ডী পাহাড়ের নীচে। আমি রুদ্ধবাক, তন্ময়, তদ্‌গত, তদ্ভাবে ভাবিতম। নুড়ি পাথরে ভরা নীল নদী দেখি নি আগে, প্রবলা খরস্রোতার উল্লাস-গর্জন কেমন আগে জানতুম না। চারিদিকে পাহাড়, ওপারে বাবলার ঘন জঙ্গল, দূরে হিমালয়, আরও দূরে অস্পষ্ট শুভ্র তুষারচূড়া।

আমাদের প্রবীণ পাণ্ডা কুম্ভকরণের ধর্মশালার ঠিক নিচে অশ্বত্থ গাছের তলায় রক্তবর্ণ সিঁড়ির ধার দিয়ে চলেছে বেগবতী গঙ্গা, সেই সিঁড়ির ধারে বসে দেখতে দেখতে কান্না এলো আমার চোখে। সেই কান্নার উৎস ছিল আমার মূল সত্তায়, সেখান থেকে যেন একটা আনন্দধারা আমার সর্বদেহে একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। আমি বাস করছি এক রোমাঞ্চ আনন্দে। আমার নিবিড় উপলব্ধির মধ্যে যেন সমগ্র শৈব হিমালয় জপের আসনে বসে তার বীজমন্ত্র পাঠ করছে। সেই ধ্যানাবেশ আমার দুই চোখে আনছিল ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুর প্রবাহ।

কলকাতার সরকার বাগানে ব্রাহ্ম ছেলেমেয়েদের মুখে যে কবিতাটি প্রায়ই শুনতুম, সেটি যেন আজ পরমার্থ বহন করে আনল "এতদিনে জানলেম যে কাঁদন কাঁদলাম সে কাহার জন্য/ধন্য এ জাগরণ ধন্য এ ক্রন্দন/ধন্য রে ধন্য।"

মা বোধ করি লক্ষ্য করছিলেন আমার ভাবান্তর। তাঁর চোখে আমার কিছুই এড়ায় না। তিনি দেখেছিলেন আমি দল ছাড়া, আমার গোত্রের সঙ্গে ওদের কারও মিল নেই। আমি হঠাৎ এমন একদিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলুম, যেখানে আমি খেইহারা,

দিশেহারা—কে যেন অদৃশ্য হাত বাড়িয়ে আমার সকল শৃঙ্খল মোচন করে দিচ্ছিল। মা সব দেখছিলেন। কিন্তু তাঁর চিরকালের অবাধ্য সন্তানটির প্রতি তাঁর কিছু পক্ষপাতিত্ব ছিল।

সত্যনারায়ণের মন্দির ছাড়িয়ে সোজা গিয়ে পেঁছিলুম হৃষিকেশে। এক অনুন্নত ক্ষুদ্রতর জনপদ সাধুসন্ত, বোরেগী আর তীর্থযাত্রী ছাড়া অন্য কেউ আসে না। অধিকাংশ হাঁটাপথের মানুষ। পথের উপর দিয়ে চন্দ্রভাগার ক্ষীণধারা গিয়ে মিশেছে নীলধারা গঙ্গায়। উত্তরে পর্বতশীর্ষে নরেন্দ্রনগরের প্রাসাদ দেখা যাচ্ছে। পশ্চিম দিকে দেরাদুনের গহন অরণ্য। ওদিকটা হিমালয়ের তরাই অঞ্চল। আমরা হিমালয়ের তোরণদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি।

সমস্ত ব্যাপারটা আমার চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হচ্ছে মাত্র একটি দিনের মধ্যেই। আমি যেন চারিদিকের আশ্চর্য হিমালয়ের প্রতি স্তরে স্তরে শুনতে পাচ্ছিলুম সেই অনাদিকালের মন্ত্র, 'জয় শিবশম্ভো!' আধুনিককাল, মানব সভ্যতা, ভারতের রাজনীতিক আন্দোলন, আমার অন্নসংগ্রাম ও নব্য সাহিত্য চিন্তার এলোমেলো জটিলতা সব আমার পিছনে পড়ে রইল। আমি লছমনঝুলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলুম —যেন আমি এক অজানা অচেনা নতুন পৃথিবী আবিষ্কার করেছি।

লছমনঝুলায় দাঁড়িয়ে অগাধ নিচে দেখি, নীলকণ্ঠ পর্বতের পায়ের তলা দিয়ে চলেছে ভাগীরথীর নীলধারা। জল যে হয় এত নীল, এত স্বচ্ছ—আগে জানতুম না। নীলকণ্ঠের নীলাভা আর সূর্যদীপ্ত আকাশের নির্মল নীলিমা জাহ্নবী যেন আপন বক্ষে ধারণ করেছে। উত্তরে দূরে চেয়ে দেখি এই নীলধারা যেন কোন্ এক রহস্যলোক থেকে বেরিয়ে এ সছে।

আপাতত এই আমার সীমা, আর এক পাও নয়। ঝুলাপুল পেরিয়ে মুনি-কি-রেতির তপোবনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে এসে গীতাভবনের ঘাটে নেমে নৌকাযোগে আবার এপারে এলুম। দেখে গেলুম হিমালয়ের প্রবেশ পথ। এই পথে আমার ইষ্টমন্ত্র তুলে নিয়েছিলুম।

কে যেন সেদিন আমার সামনে ভারত এবং মহাভারতের সকল দরজা খুলে দিয়েছিল। কেউ আমাকে টানছিল, কেউ যেন আমার ঝুঁটি ধরে নাড়া দিচ্ছিল।

কেন সেবার ফিরতি পথে প্রথম গিয়ে দাঁড়ালুম দিল্লীতে? সেই সেদিনকার পাথরের পাঁচিলে ঘেরা দিল্লী কি ব্যঞ্জনা এনেছিল আমার মনে? চারিদিকে বিধ্বস্ত তার প্রাচীন ইতিহাস। সেই ইতিহাসের শ্মশানভূমির আশেপাশে ঘুরেছিলাম। পাঁচিলের ওপারে নতুন দিল্লী তখন তৈরি হচ্ছে। এদিকে যমুনার ধারে বিরাট দিল্লী দুর্গ, যার নাম লালকেল্লা। তার সামনে বিস্তীর্ণ ময়দান। ময়দানের ওপারে জুম্মা মসজিদ। যানবাহন একমাত্র হ'ল টাঙ্গা।

পুরনো দিল্লীর ধর্মশালায় দু'দিন কাটিয়ে আমরা ফিরলুম। তখন সুবিধা ছিল এই, রেলগাড়িতে যাত্রীসংখ্যা থাকত একেবারেই কম।

॥ ১১ ॥

ইংরেজের ওপর রাগ ক'রে আমরা মাটির ওপর ভাত রেখে খাচ্ছিলুম। 'গোলামখানা' ত্যাগ করে গিয়ে লেখাপড়া নষ্ট হতে বসেছে। বহু ভাল ছেলে মার খাচ্ছে। 'জাতীয়' ইস্কুল বা কলেজ ব'লে যেগুলো রাতারাতি গজিয়ে উঠেছিল, সেগুলো অপদার্থ। সেখান থেকে আদর্শবাদী শিক্ষকরা একে একে গা-ঢাকা দিচ্ছিল। তেল না থাকলে পিদিম জ্বলে না।

মাঝ থেকে আমি কেন ঠকে যাই? আমারও ভবিষ্যৎ আছে, উচ্চাভিলাষ আছে, মানুষের মতন মানুষ হবার চেষ্টা আছে—সুতরাং নিজের দিকটাও দেখা দরকার! ডিগ্রি না থাকলে চাকরি-বাকরির কোনও আশা নেই।

পুজোর আগে কলেজে গিয়ে বাকি-বকেয়া সমস্ত মাইনে চুকিয়ে দিয়ে এলুম। অধ্যক্ষ হেরম্ব মৈত্র মহাশয়ের কাছে কেঁদে-কেটে একখানা চিঠিও লিখলুম।

জানুয়ারীর গোড়ায় আবার ঢুকলুম কলেজে। আমার লেখাপড়ার রেকর্ড খুব খারাপ ছিল না। প্রথম সারিতেই বসতুম। রোল-কল করতেই কুড়ি মিনিট চ'লে যেত। অনেকদিন ধ'রে আমার কয়েকটি বন্ধু আমার হয়ে 'প্রক্সি' দিত—সেটা এবার বন্ধ হ'ল। এ কলেজে তখনও সহশিক্ষার চলন হয় নি, সুতরাং সহপাঠিনীর প্রতি ইশারা-ইঙ্গিত, কাগজের কুটি ছুঁড়ে মারা বেঞ্চের তলা দিয়ে পায়ে পা ঠেকানো, পরোক্ষ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ,—এসব বদ্-অভ্যাস ছিল স্বপ্নবৎ। আমি মনোযোগী ছাত্র ছিলুম।

হঠাৎ একদিন মনে প্রশ্ন দেখা দিল। কী বকর-বকর করছে ওই লোকটা—ওই লজিকের অধ্যাপক মিঃ গুপ্ত? মাথা নেই, মুণ্ড নেই, শুধু 'দিনগত পাপক্ষয়' ক'রে যায়? ওঁর ত বইপড়া বিদ্যে! নিজে চার-পাঁচটা পাস করেছেন কতগুলো বই পড়ে। সেই একই বস্তু আর কথার কচকচি আবার আমাদের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন—বইয়ের বাইরে জীবনের সঙ্গে যার কোনও যোগ নেই! ইতিহাসও তাই। গ্রীস, রোম আর ইংরেজের ইতিহাস! চুলোয় গেল ভারতবর্ষ। কেন পড়ব ওসব—যার সঙ্গে আমাদের তিলমাত্র যোগ নেই? এর সঙ্গে আবার কেমিস্ট্রি! দু'রকমের রস মিললে তৃতীয় রসটা হয় অন্যপ্রকার! তা হয় হোক, আমি ত হ'তে চাইছি রেল-আপিসের কেরাণী! সব শেষে আবার 'বটানি।' ওই বটানির পাঠ নিতে আবার ছোটো সেই বহুবাজারের মোড়ে, যে-বাড়িটায় গাছপালা সাজানো। সামান্য সাধারণ লতাপাতা, শেবড়-মাকড়, গাছ-পালা—কিন্তু কিম্ভূত কিমাকার তাদের একেকটা বিদেশী নাম, যা কোনও দিন কোন অর্থ বহন করে না! আমি খুঁজছিলুম নিজের জন্য জীবনের পাঠ—এই বিভ্রান্তিকর গ্রন্থপাঠ নিয়ে কী হবে আমার? কলেজে শুধু সৃষ্টি হয় বেকার আর নৈরাশ্যবাদী।

মাস দুই কাল আমি এই 'মূর্খের স্বর্গে' বাস করেছিলুম। তারপর নেমে এলুম পথে। আমি চাইনে এই কলেজ-মেসিনে তৈরি আমার কোনও নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ।

বাঁধাধরা জীবন স্বীকার করিনে। প্রচলনের সমস্ত শৃঙ্খল আমি চূর্ণ ক'রে দেবো। আমি কলেজী আদর্শের কল্যাণ চাইনে, তথাকথিত সামাজিক জীবন চাইনে, মনীষীদের উপদেশ আমার কোনও কাজে লাগবে না! আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, চরিত্রের আদর্শ, ন্যায়নীতি, সস্তা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, অধ্যাপকদের অপরিণামদর্শী শিক্ষাদান—সব মিথ্যে, ভণ্ডামি, সব অর্থশূন্য। কোনও বিধি-নিয়মের দাসত্বে আমার মন খাপ খাচ্ছে না। আমি চাইছি সর্বব্যাপী একটা ভাঙ্গন—কিন্তু সেই ভাঙ্গন কি প্রকারে হবে, সেটি আমি ভেবে পাচ্ছিনে।

ইতিমধ্যে 'শঙ্খ' এবং 'মসলিশ' নামক সাপ্তাহিকে আমার দু'তিনটে লেখা বেরিয়েছে। 'কল্লোল' কাগজেও বেরিয়েছে আরেকটা। হাতে-লেখা ম্যাগাজিনেও বোধ হয় চার-পাঁচটা। তার মধ্যে ছিল প্রভাত কিরণ বসুর কাগজ। উনি আমাদেরই স্কটিশের ছাত্র। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বাঙ্গলায় তিনি ফার্স্ট হয়ে স্বর্ণপদক পান। আমাদের ইস্কুলেই পড়ত স্টিফেনস্ নির্মলেন্দু ঘোষ। তার অকালমৃত্যুতে রজনী সেনের একটি গান গাওয়া হয়েছিল, "ফুটিতে পারিত গো, ফুটিল না সে,/সে যে মরমে ম'রে গেল, মুকুলে ঝরে গেল,/প্রাণভরা আশা তার সমাধি পাশে—" ইত্যাদি।

আমার সমস্ত লেখাগুলোই ছিল রাবিশ। ছাপার আগে পর্যন্ত মন্দ লাগত না—কিন্তু বেরোবার পর নাক সিঁটকিয়ে উঠতুম। আগাগোড়া তাদের মানে খুঁজে পেতুম না। হরিহর চন্দ্র ওরফে 'রঙ্গাদা' কিন্তু অন্য কথা বলতেন।

তখনও আমার খেলাধূলা করা খেলা দেখার যুগ চলছে। এখানে-ওখানে ম্যাচ খেলতে নিয়ে যায়। ফুটবল আর হকিতে আমি মন্দ নয়। বলাইদাস চাটুয্যে আমাদের স্কুলের ছাত্র ছিলেন, এবং খেলা-ধূলোয় তাঁর সর্বাঙ্গীণ পারদর্শিতার জন্য তাঁকে স্কুলের উঁচু ক্লাসে বছরের পর বছর ধরে রাখা হয়েছিল। আমরা কয়েকজন তাঁরই ছায়ায় খেলা করতুম। তখন মোহনবাগানের গৌরবের যুগ। ক্যালকাটা-মোহনবাগান, ডালহৌসী-মোহনবাগান, সমারসেট-মোহনবাগান,—এসই খেলা ছিল ঐতিহাসিক। গোষ্ঠ পালকে সমগ্র বাঙ্গলা তখন ভারত-গৌরবের আসনে বসিয়েছিল। গোষ্ঠপাল ব্যাক-এ খেলেন, তাঁর কাছাকাছি এসে বিরুদ্ধপক্ষের সাহেব খেলোয়াড়দের নাকাল হতে দেখলে আমরা বড়ই পুলকিত হই। ক্যালকাটার লেফট-আউট নাইট আর গোষ্ঠ পালের সংঘর্ষণ যেন প্রবাদের মতন ছিল! এন্‌সাইটস্ গ্যালব্রেথ বেনেট, কলভিন, কালী অর্থাৎ কাহালী, কুমার, পল্টু, রবি গাঙ্গুলী, মম্মথ, রাজেন সেন,—এঁরা গড়ের মাঠে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। সামাদ, রসিদ,—এঁদেরকেও কেউ ভোলে নি। আমি মোহনবাগান ক্লাবের নিষ্ক্রিয় সভ্য ছিলুম কিছু কাল। সেই কালে ওয়াই-এম-সি-এর সভ্য হয়ে রোজ সন্ধ্যায় হ্যারিসন রোডে একসারসাইজ করতে যেতুম।

এই সময় কাজী নজরুল ইসলাম ঝড় তুলেছে বাঙ্গলার সাহিত্যে। রুশ নর্তকী আনা পাবলোভা নাচতে এসেছেন কলকাতায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিসর্জন নাটকে জয়সিংহের ভূমিকায় কালো জাল দিয়ে তাঁর শ্মশ্রু গোপন করে মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন।

তাঁর সেই তীব্র তীক্ষ্ন কণ্ঠ,—"দাক্ষিণ বাতাস যদি বন্ধ হয়ে যায়/ফুলের সৌরভ যদি নাহি আসে/যদি দশদিক ভয়ে ওঠে দশটি সন্দেহম/তবে কোথা সুখ—" অন্যত্র —"করুণায় কাঁদে প্রাণ মানবের/দয়া নাই বিশ্বজননীর ?" শিল্পের জগতে রয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ আর গগনেন্দ্রনাথ,—তাঁদের ভূরি সম্ভার নিয়ে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন গল্প-সাহিত্যের উজ্জ্বলতম রত্ন,—তাঁর সম্বন্ধে সম্ভব-অসম্ভব বিভিন্ন ও বিচিত্র কাহিনী শোনা যাচ্ছে। তিনি বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত, গৃহী না সন্ন্যাসী, চরিত্রবান বা চরিত্রহীন, তিনি গেরুয়া পরে একটি চেন বাঁধা নেড়ি-কুকুর নিয়ে শিবপুরের পাড়ায়-পাড়ায় ঘোরেন কিনা,—এইসব নিয়ে নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা ! এ ছাড়া আছেন বঙ্গসাহিত্যের বীরবল প্রমথ চৌধুরী, সঙ্গীত জগতে দিলীপ রায়, সম্পাদক সমাজে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও জলধর সেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার আশুতোষ, চিকিৎসা জগতে স্যার নীলরতন সরকার, সুন্দরীমোহন দাস ও বিধানচন্দ্র রায়। বিজ্ঞান জগতে স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ও স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়। অভিনয় ও নাট্য-কলায় মনোমোহন নাট্যমন্দিরের স্রষ্টা শিশির ভাদুড়ী। প্রসঙ্গত বলা চলে, থিয়েটারের প্রথম বাঙলা নামকরণ করেন শিশিরকুমার এবং তিনিই প্রথম নাটকের বিজ্ঞাপনে ছবি দেওয়া প্রবর্তন করেন। তাঁর এই উদাহরণে অনুপ্রাণিত হয়ে কলকাতার বহু দোকানপাট ও প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ডে বাঙলা নাম প্রবর্তিত হয়। যেমন মর্ডান শু স্টোর্স হয়ে ওঠে পাদুকা শিল্পসদন। ভারতী পত্রিকাকে ধরে এক-কালে একটি লেখকগোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। সেই গোষ্ঠীর কেন্দ্র ছিল আমাদের বাড়ির সামনে নন্দ চৌধুরীর গলির মোড়ে ট্রাম রাস্তার ওপরেই গজেন ঘোষের বাড়ি। তিনি সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান এবং বাতব্যাধিগ্রস্ত। ওঁর বাড়ির নাম আমরা রেখেছিলুম হলদে বাড়ি। ওখানে পানাহারের মজলিস বসত প্রায়ই। কে কে ওখানে আড্ডা দিতে আসতেন, তখনও আমার জানবার বয়স হয় নি। আরেকটি সাহিত্যের মজলিশ ছিল মানসী ও মর্মবাণী নামক মাসিকপত্রকে কেন্দ্র করে। তার মধ্যমণি ছিলেন নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়। শুনেছি সেখানে যেতেন রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, রায় বাহাদুর খগেন মিত্র, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, শিল্পী যতীন সেন ও আর্যকুমার চৌধুরী—যাঁর স্ত্রী ছিলেন অসামান্য রূপ-লাবণ্যবতী কবি শ্রীমতী লীলা দেবী,—যাঁর পিতা ছিলেন রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়। আর্য চৌধুরী মহাশয়কে আমি দেখি নি, কিন্তু শিল্পীর হাতে তৈরি লীলা দেবীর ছবি দেখেছি মানসী ও মর্মবাণীতে। পরবর্তী-কালে একদা ঘটনাচক্রে ঠাকুর মহাশয়ের নিউ আলিপুরের সুবৃহৎ অট্টালিকায় লীলা দেবীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি তাঁর কাব্যগ্রন্থাদি আমাকে উপহার দেন। তাঁর মধুর সৌজন্যে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম।

কিন্তু ওসব আলোচনা এখন থাক।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে আমি ছোড়দার কল্যাণে আরেকটি নতুন বউদিদি পাই। ইনি কৃষ্ণনগর অঞ্চলের মেয়ে, এবং আমার চোখ দিয়েই অনূঢ়া কন্যাকে পছন্দ করে আসি।

কিন্তু এই সময় আমার ভিতর ও বাহির থেকে কেমন একটা ডাক আসছিল, সেটি আমার মনকে কিছুতেই স্থির থাকতে দিল না। আমার পড়াশুনো গেছে, হিজি-বিজি সাহিত্য রচনায় অরুচি, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা গ্লানিতে ভরে উঠছে,—প্রেতচ্ছায়ার মতো ভবিষ্যৎ চিন্তা আমাকে অনুক্ষণ অনুসরণ করে। আমার চুল ছাঁটার মতো পয়সা নেই, নতুন জামা-জুতো-ধুতি বহুদিন থেকে ভুলে গেছি। আমি নিঃস্ব, সর্বহারা, আমার মধ্যে জমছে আগ্নেয় লাভা, আমি জন্মবিপ্লবী, আমি আত্মদ্রোহী, আমি এখন লেনিনের মন্ত্রে দীক্ষিত! এই বছরেই লেনিনের মৃত্যু ঘটে জানুয়ারি মাসে। এই বছরেই মৃত্যু ঘটে স্যার আশুতোষের—যখন তিনি ডুমরাঁও রাজ মামলা পরিচালনায় ব্যস্ত ছিলেন। এই বছরেই মৃত্যু ঘটে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের,—তিনি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট কাউন্সিল নির্বাচনে পরাজিত হন এবং রাজনীতিক কলঙ্ক মাথায় নিয়ে অনেকটা ভগ্নহৃদয়ে মারা যান। তাঁর পরাজয়টি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জয়গৌরব হিসাবে ঘোষিত হয়। কলকাতার মেয়র হন দেশবন্ধু।

একদিন অতি প্রত্যুষে হাতে একটি ছোট পুঁটলি নিয়ে যখন সদর দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ মা উঠলেন জেগে! চোরের মতো আমি পালাচ্ছিলুম, ধরা পড়ে গেলুম।

এত ভোরে কোথায় যাচ্ছিস রে?

মায়ের মুখের দিকে তাকাবার সাহস ছিল না। আমার মিথ্যা বলার অভ্যাস কিছু কম, কিন্তু আজ বললুম,—মেদিনীপুরে ম্যাচ খেলতে যাচ্ছি, মা।

মা জানতেন আমি ফুটবল খেলতে যাই এখানে ওখানে। তিনি বললেন, ফিরবি কখন?

ফিরব?—থমকিয়ে থতিয়ে গেলুম—ফিরব হয়ত রাত্তিরে নয়ত কাল ফিরব মা। আর নয়ত দু-একদিন,—মানে—

মা আমাকে বিশ্বাস করতেন। তাঁর কণ্ঠে শুধু স্ফুরিত হ'ল, দুর্গা দুর্গা, সাবধানে খেলিস, পায়ে যেন চোট লাগে না! দুর্গা, দুর্গা—

আমার কান্না পাচ্ছিল। পাছে ভেঙ্গে পড়ি, পাছে সত্য কথা বলে ফেলি, এজন্য মার পায়ের ধুলো নেওয়া অসম্ভব মনে হ'ল! আমি বেরিয়ে চলে গেলুম। তখন প্রভাতকাল, কেউ জাগে নি পথেঘাটে। আমি প্রায় ছুটছিলুম নারকেলডাঙ্গার পথ ধরে মানিকতলায়। পুরনো পুল পেরিয়ে ডানহাতি ক্যানাল রোড ধরে উত্তরে। ছুট ছুট। কে যেন তাড়া করেছে পিছন থেকে ধরবার জন্য। আমি বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছি দেশ ছেড়ে পালাবার জন্য। আমার পকেটে আছে মোট দু'টাকা পাঁচ আনা মাত্র। দেশত্যাগের পক্ষে এই যথেষ্ট! সন্ন্যাসীদের কী থাকে যখন তারা গৃহত্যাগ করে? কী ছিল পিণ্টুর, যখন সে নিউইয়র্ক পেঁছিয় ? কত টাকা সঙ্গে ছিল, যখন ডি-ভ্যালেরা জাহাজের খোলে ছদ্মবেশে ঢুকে আমেরিকায় পালায়? রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করে কত টাকা সঙ্গে নিয়ে? আমি এখন যাচ্ছি বর্মায়, সেখান থেকে হংকং, তারপর টোকিও, তারপর জাপান থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে ক্যালিফর্নিয়া!

আমার পথ অনেক দূরে।

এই আমার কর্মসূচী! অতি স্বচ্ছ, অতি সরল। কোথাও অস্পষ্টতা নেই।

শ্যামবাজার থেকে আমার নিত্য সহচর রবি সরকারকে সঙ্গে নিয়ে সোজা ট্রামে চড়ে এসপ্লানেড, সেখান থেকে আউটরাম ঘাট। সময় কম শিগগির চল। এগিয়ে চল, থামিসনে কোথাও। গতি চাই, বেগ চাই, ইচ্ছার জোর চাই, চরম লক্ষ্যে পৌঁছনো চাই! চল শিগগির চল। পিছনে ওরা কাঁদুক, ওরা চিরকাল কাঁদে! আমরা চিরকাল পালিয়ে যাই! "আমরা চলি সমুখপানে, কে আমাদের বাঁধবে?/রইল যারা পিছুর টানে, কাঁদবে তারা কাঁদবে।"

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া স্টীম নেভিগেশনের সমুদ্রগামী জাহাজ 'এলিফ্যান্টা' যেন আমাদের জন্যই দাঁড়িয়ে ছিল। দু'জনের হাতে দুটো পুঁটলি। আমরা দেশ ছেড়ে পালাচ্ছিলুম, কিন্তু ছদ্মগাম্ভীর্যের স্টাইল বজায় রেখে রবি সগর্বে এগিয়ে চলল। তার বাবা নতুন এক ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, অহঙ্কার তাকে মানায়।

সকাল সাড়ে আটটায় জাহাজ ছাড়ল। স্টীমারে চড়েছি, স্টীমবোটেও চড়েছি, কিন্তু এই বৃহৎ অতিকায় সমুদ্রগামী জাহাজে এই প্রথম। এ যেন ছয়তলা প্রাসাদ। আমরা উপরের ডেক-এর যাত্রী, কিন্তু আমরা যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। একটির পর একটি সাহেবী কেবিন, তাদের স্নানাগার, ডাইনিং হল, তাদের জন্য রিজার্ভ করা বারান্দা ও লাউঞ্জ। ডেক-এর উপরতলায় ক্যাপ্টেন, ইনজিনিয়ার, ডাক্তার—এদের একেকটি কেবিন। নিচের তলায় মস্ত দোকান, বাজার, বেচাকেনা চলছে সেখানে। খাঁটি ঘিয়ে ভাজছে গরম-গরম পুরি আর কচুরি, সিঙ্গাড়া আর জিলাপি। সন্দেশ আর পানতুয়া। না থাক্, লোভ করলে আমাদের মানাবে না, আমরা বেরিয়েছি ভাগ্য অন্বেষণে! তবে হ্যাঁ, খাঁটি ঘিয়ের সুগন্ধ অন্যপ্রকার। রবি যেন পাক খেয়ে গেল। বলল, দশটা বেজে গেছে দেখছি। তা হ'লে দয়া করে পেট ভরে খেয়ে নাও!

রবির খরচে পেট ভরে খেলুম।

ডেক-এর যেদিকটায় আমরা জায়গা নিয়েছিলুম, সেখানে ছিল ইঞ্জিনঘরের একটা অতি কটু ও বীভৎস গন্ধ। সেই গন্ধটা কেমন করে এড়ানো যায়, এই ভেবে রবি কিনলো হাতীমার্কা এক প্যাকেট সিগারেট, দাম দু'আনা। জীবনে সেই প্রথম আমাদের ধূমপান! 'পান' নয়, পাফিং। গলার মধ্যে ধোঁয়া গেলেই বিষম কাসি। সেদিন সেই জ্বলন্ত সিগারেট মুখে দিয়ে মনে হ'ল কী যেন একটা চিরকালের জন্য হারালুম! নীতি, আদর্শ, চরিত্র, সংযম,—সব মিলিয়ে কোথায় যেন কি একটা সর্বনাশ ঘটে গেল। ওই ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে অস্পষ্ট চেহারায় এসে দাঁড়িয়েছেন আমার আদর্শ পুরুষ স্বামীজী, আমার সর্বংসহা জননী—!

সূর্যাস্ত ঘটেছে পশ্চিম সমুদ্রে, তারই রক্তের আলিম্পন এখনও দেখতে পাচ্ছি দিগন্তে সমুদ্রের প্রান্তরেখায়। অন্যদিকে ধূসর অন্ধকার ছেয়ে আসছে। ডায়মণ্ড হারবারের সর্বশেষ লাইট-পোস্ট আর দেখা যাচ্ছে না। জাহাজ অদৃশ্য হচ্ছে

বঙ্গোপসাগরে বৃহত্তর ব্যাপ্তির মধ্যে। ধীরে ধীরে বিশ্বচরাচরের অবলুপ্তি ঘটছে অন্ধকারে। আমি ডেকের শেষ প্রান্তে রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিলুম। রবি ইতিমধ্যে বন্ধুত্ব পাকিয়েছে জাহাজের ইনজিনিয়ার সৌম্যদর্শন মিঃ ভাদুড়ির সঙ্গে।

বাহির-সমুদ্র সহজেই জানিয়ে দেয়, যত বড় জাহাজই হোক,—তরঙ্গভঙ্গের উত্থান-পতনের কাছে সে একটি দেশালাইয়ের বাক্স ছাড়া অন্য কিছু নয়। অন্ধকারে বোধ হয় মৌসুমী বায়ুর তাড়না ছিল, তাই জাহাজ একবার যেন উঠে যাচ্ছে শূন্যলোকে, আবার তখনই তলিয়ে যাচ্ছে যেন সমুদ্রগর্ভে! দেখতে দেখতে আমার অন্ত্রে-তন্ত্রে যে-বিপ্লব দেখা দিল এবং ঘূর্ণি লাগল, সেটাতেই আমি 'সমুদ্রপীড়ায়' আক্রান্ত হলুম। শরীরের ভিতরে যে বিকার দেখা দেয় এবং নাভিমূল থেকে উপর দিকে যে কাঠ-বমি উঠতে থাকে, সে বোধ হয় মৃত্যুবই যন্ত্রণা! আমি টলতে টলতে একস্থলে গিয়ে অচৈতন্যের মতো হয়ে যন্ত্রণায় গড়াগড়ি দিতে লাগলুম। রবির বোধ হয় অতটা হয় নি, কিন্তু সেও ক্ষণে ক্ষণে কাতরাচ্ছে।

একালের বিমানে যেমন 'বাম্পিং' হয় এয়ার-পকেটে। বিমানে যাত্রীদের বমির জন্য ঠোঙার বন্দোবস্ত থাকে। রেক্লাইনিং সীটে কোন-কোনও যাত্রী অনড় হয়ে গোঙাতে আরম্ভ করে।

চতুর্থ দিনে রেঙ্গুন বন্দরে পৌঁছেছিলুম।

অতঃপর আমাদের দুঃখের, দুর্গতির ও অনাহারের জীবন আরম্ভ হতে লাগল। আমরা সারাদিন টো টো করে ঘুরে বৃষ্টি-বাদলে ভিজে পথেঘাটে যা তা খেয়ে সন্ধ্যার পরে আশ্রয় নিতুম স্থানীয় দুর্গাবাড়িতে। মন্দিরের যিনি 'কেয়ার টেকার', সেই লোকটার নাম কবিরাজ বাড়ী তার চট্টগ্রামে। লোকটা যখন-তখন আমাদের তাড়িয়ে দিত। কিন্তু আমরা অবাধ্য নেড়িকুকুরের মতো আবার এসে একপাশে জায়গা নিতুম। রাত্রের দিকে বর্ষায় ফুটো ছাদ দিয়ে নাটমন্দিরে জল নামত, আমরা সেই জলে চাটাই-খানা বিছিয়ে রাত কাটাতুম। এক শ্রেণীর উন্নাসিক বাঙালী জানতে পেরেছিল আমরা ভাগ্য অন্বেষণের জন্য বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছি!

বর্মায় চিরদিন পূর্বঙ্গের লোকসংখ্যা বেশি। বিশেষ করে চট্টগ্রাম, ঢাকা ও নোয়াখালি থেকেই অধিকাংশ বাঙালী ওখানে নানা কাজ নিয়ে থাকে। রেল বিভাগে, ডাকঘরে, একাউণ্ট আপিসে এবং অন্যান্য সরকারী আপিসে প্রচুর বাঙালী। এরা শিক্ষিত মধ্য ও স্বল্পবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক। তখনও বাঙালী মুসলমান সম্প্রদায়ের থেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ দাঁড়িয়ে ওঠে নি। মনে রাখা দরকার, তৎকালে বর্মা, মালয়, সিঙ্গাপুর ও সিংহল—এরা কেউ স্বতন্ত্র বা স্বাধীন রাষ্ট্র নয়। এরা সবাই তখন ব্রিটিশ ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত।

সেদিন অপরিণতবুদ্ধি দুটি তরুণের যে পরিমাণ রোমাণ্টিক অভিযানের পরি-কল্পনা ছিল, ঠিক সেই পরিমাণেই তাদের সাধারণ জ্ঞান ছিল কম। দরজায় দরজায় তারা ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ে ঘুরছিল, এবং আপিসে আপিসে তারা পায়ে ধরে বেড়াচ্ছিল।

তারা একথা সেদিন বোঝে নি যে, দৈন্য ও ভিক্ষায় ভাগ্যের চাকা ঘোরে না। ওই চাকা ঘোরাতে গেলে হাতের কব্জির জোরের সঙ্গে বুদ্ধির জোর থাকা দরকার। আমরা শ্রমিক হতে না চেয়ে আপিসের কেরাণী হ'তে চেয়েছিলুম—সেইখানেই আমাদের ভুল ঘটেছে। কেরাণী হবার দৈন্য অপেক্ষা শ্রমিকের মর্যাদা অনেক বড়।

এই ভ্রান্তির ফলে আমাদের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগল। ক্রমশ আমরা মানহারা, আশ্রয়হারা ও সর্বহারা হয়ে যাচ্ছিলুম। আমাদের ময়লা ও ছিন্নভিন্ন পরিচ্ছদ যথেষ্ট সম্ভ্রমসূচক না হওয়ার জন্য বাঙালী সমাজে গিয়ে দাঁড়াবার উপায় রইল না। আমার চটিজোড়াটা এমনভাবেই ছিঁড়ে গেল যে, ওটা মেরামত করার চেষ্টা বাতুলতা। সারা দিন-রাত্রের মধ্যে আমরা দু'জন চার পয়সার ভাত কিনে খাচ্ছিলুম। বহু দোকানে ব্যাঙ, নানাবিধ সরীসৃপ, বহুবিধ ছোট ছোট চতুষ্পদ, শূকরের নাড়ি, নানা পাখির দেহ,—এগুলি সুসিদ্ধ অবস্থায় ঝুলছে। সাদা ইঁদুর, সাদা আরশোলা, বড় বড় পতঙ্গ, সামুদ্রিক কাঁকড়া,—এগুলি নাকি খুবই সুস্বাদু। আমরা দু'জনে সেদিকে ক্ষুধার্ত ও লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে নিরাশ হয়ে চলে যেতুম। আমাদের উচ্চাভিলাষ এবং পৃথিবী পর্যটনের বাসনা—এ দুটোর ধার ক্ষয়ে যেতে লাগল।

স্থানীয় 'পন শপে' আমার শার্টটা বাঁধা দিয়ে চার আনা পেয়েছিলুম। ওতে আমাদের দিন তিনেক চলেছিল। তারপর বাঁধা দিতে হ'ল হাতঘড়িটা। ওটার দরুন পাওয়া গেল একটি টাকা। তৎক্ষণাৎ আমরা সেই নিদারুণ বর্ষার মধ্যে পথে নেমে একটি খাবার দোকানে ঢুকলুম। পোকা-মাকড় দিয়ে প্রস্তুত 'নাপ্পি' আর পেটভরা ফুরফুরে গরম ভাত,—যেমন উপাদেয় তেমনি রুচিকর। পেটে ক্ষুধা থাকলে নাকে দুর্গন্ধ লাগে না—সেদিন প্রথম উপলব্ধি করেছিলুম। যাই হোক, সেদিন আমাদের ছয় আনা খরচ হয়ে গেল।

আমরা ধীরে ধীরে নিচের স্তরে তলিয়ে যাচ্ছিলুম। আমাদের একমাত্র বাঁচবার পথ তখন রইল চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, পকেটমার এবং দোকানে ঢুকে হাত-সাফাই! মুশকিল এই, কোনটাতেই আমাদের হাত রপ্ত নয়। স্বামীজী বলেছেন, বরং চুরি করা ভাল, কিন্তু নিষ্ক্রিয় থাকা অপরাধ। আমরা নিষ্ক্রিয় নই, দৈনিক ষোল ঘণ্টা পথে পথে ঘুরি। ওরই মধ্যে একদিন গেলুম 'বড় ফয়া' দর্শন করতে। বুদ্ধের এত মন্দির ভারত বা বর্মা কোথাও নেই। মন্দির প্রবেশ-কালে সম্মুখের বৃহৎ সোপান-শ্রেণীর দুই ধারে সুন্দরী বর্মী মেয়েরা ফুল বেচতে বসেছে। ওদেরই মধ্যে যে-তরুণীটিকে রবি সর্বাপেক্ষা সুশ্রী মনে করল, তারই কাছ থেকে দু'আনার ফুল কিনে বসল!

করলি কি? দু'আনা যে আমাদের একদিনের খাইখরচ।

রবি জবাব দিল, ও তুই বুঝবি নে। আফটার অল্ মেয়েটা হ'ল বিউটি!

ইতিমধ্যে গত কয়েকদিন থেকে দু'একজন লোক আমাদের দিকে লক্ষ্য রাখছিল আমরা জানতুম। ওদের মধ্যে একজন সেদিন মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। লোকটা বাঙালী। বলল, আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তোমাদের নিশ্চয় মনে পড়বে

তোমরা কোয়ারেনটাইন থেকে পালিয়ে এসেছিলে ?

আমরা বললাম, তা হবে, আমাদের অসুখ-বিসুখ কিছু নেই। আপনি কে ?

ভদ্রবেশী লোকটা বলল, আমি পুলিস বিভাগ থেকে আসছি, সি-আই-ডির লোক। তোমরা কি কলকাতা থেকে পালিয়ে এসেছ ?

কেউটে সাপ, নরখাদক বাঘ এবং ইংরেজ আমলের বাঙ্গালী গোয়েন্দা,—এরা প্রায় সমগোত্রীয় ! রবি বলল, অনেকটা প্রায় সেই রকম !

এখানে থাকবে কতদিন ?

রবি একটু আত্মাভিমানী। সে ফস করে বলল, যতদিন না পুলিসে ধরা পড়ি !

লোকটা আমাদের আপাদমস্তক যখন পরীক্ষা করছে, তখন সবিনয়ে আমি বললুম, ওর কথা ধরবেন না। আমিই বলি। আমাদের যে অবস্থা এখন দাঁড়িয়েছে তাতে হয় আমাদের গ্রেপ্তার করুন, নয়ত পুলিসে চাকরি দিন্।

পুলিসে চাকরি ?—ভদ্রলোক একটু অবাক হলেন।

রবি বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা গোয়েন্দাদের কাজকর্মের ওপর নজর রাখতে পারব !

রবির কণ্ঠে বিদ্রূপ ছিল। আমি একটু ভয়ই পাচ্ছিলুম।

আচ্ছা, আমি এখন যাচ্ছি—লোকটা বলল, আবার ঠিক সময়েই দেখা হবে। তবে জেনে রাখা ভাল, বিনোদ চক্কোত্তি ঠাট্টা সহ্য করে না !

লোকটা চলে গেল। আমরা তখন এমনি বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলুম যে, আমাদের সর্বপ্রকার ভয় ঘুচে গিয়েছিল। আমরা প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় এক মাস ধরে আশা-ভরসাহীন সংগ্রাম করে যাচ্ছিলুম। এখন আমরা কোনও ব্যক্তিকে আর গ্রাহ্য করিনে। আমরা নীতিভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছিলুম।

সংশয়-সন্দেহে অবিশ্বাসবাদে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ঘৃণা ও আক্রোশে আমাদের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটছিল। আমরা নৈরাশ্য ও নিষ্ফলতাবোধে ভেঙ্গে পড়ছিলুম। এর ফলে আমাদের ক্রুদ্ধ মন বাঙ্গালী সমাজের প্রতি হিংসা বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে উঠছিল। ওঁদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন যাঁরা আমাদের সাহায্য করতে পারতেন। আমি ও রবি কাজ চেয়েছিলুম, দয়াভিক্ষা চাই নি। ওঁদের কায়েমী স্বার্থে পাছে যা লাগে সেজন্য ওঁরা সতর্ক ছিলেন, কলকাতার কেউ এসে ওঁদের মাঝখানে না বসে ! ওঁদের মধ্যে আমরা কুটিলতা, ইতরতা ও স্বার্থপরতা দেখতে পাচ্ছিলুম। অনেক সময় দেখতে পাচ্ছিলুম, ওঁরা সামাজিক সৌজন্য ও স্বাভাবিক ভদ্রতাও রক্ষা করতে পারেন নি। আমার 'জলকল্লোল' নামক গ্রন্থে এ কাহিনীর আনুপূর্বিক আলোচনা করেছি।

আমাদের কাছে শেষ সম্বলস্বরূপ ছিল একটি 'বায়নোকুলার।' ওটি বিলেতী সামগ্রী। এই দূরবীনটি সমুদ্রযাত্রায় অনেক সময় কাজে লাগে। রবির কাছে শুনলাম ওর দাম বুঝি উনিশ পাউন্ড। সন্দেহ নেই, বিশেষ মূল্যবান। রবি বলল, শোন, তুই চলে যা। গিয়ে বাবাকে খবর দে। আমি ওই ব্যাটা কবিরাজের আনাচে-কানাচেই থাকব। বাবাকে বলে দিস।

আর কোনও উপায় আমাদের সামনে ছিল না। রাতটা কোনও মতে কাটিয়ে

সকাল আটটার পর গেলুম আবার সেই 'পন শপে'। সেখানে তখন দরিদ্র, দুঃস্থ, হতভাগ্য এবং চোর, গাঁটকাটা ও নানা দুষ্কৃতকারীর দল ভিড় করে রয়েছে। ছোট, কাউণ্টারের ভিতর দিয়ে দেখি, ঘরখানা স্তূপাকার গার্হস্থ্য সামগ্রীতে ভরা। বাসন-পত্র, ভাল ভাল ছবি, নানা রকম পোশাক, কাঁচের নানাবিধ জিনিসপত্র, রেশমের লুঙ্গি, জরির টুপি, অনেক রকমের ঘড়ি, ছোট ছোট বুদ্ধ মূর্তি মখমলের জোব্বা, শ্বেত-পাথরের তৈরি অ্যাপলো মূর্তি—আরও বহুরকমের সামগ্রী। আমাদের সময় যখন এল, তখন আমরা দূরবীনটি বাড়িয়ে দিলুম। ওরাই বিচার করে বলবে, এর ওপর কত টাকা দেওয়া চলে! বহুক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর ওরা বলল, পনেরো টাকা।

পনেরো টাকা?—রবি আঁতকিয়ে উঠল—ওর দাম তিন শ' টাকা তা জানো?

ওরা সব জানে। দিব্যদৃষ্টি ওদের, আমাদের অবস্থার কথাও জানে। এক সময় জানলা গলিয়ে দূরবীনটি ফেরত দিয়ে ওরা বলল, কুড়ি টাকার বেশি দেওয়া যাবে না।

অনেক ভেবেচিন্তে রবি তাতেই রাজি হ'ল। এটা ত আর বিক্রি নয়, শুধু বাঁধা রাখা হচ্ছে মাত্র। বাবা খবর পেলেই ছুটে আসবেন, তখন ওর কান ধরে ঘড়ি আর বায়নোকুলার আদায় করে নেবো!

সেই দিনই সকাল সাড়ে দশটার সময় ছুটতে ছুটতে আমরা রেঙ্গুন বন্দরে এসে এক শাম্পান নিয়ে রেঙ্গুন নদীর মাঝামাঝি পৌঁছিয়ে জাহাজের সিঁড়িটা ধরলুম। জাহাজ তখন ছেড়েছে। উপর থেকে খালাসীরা দড়ি ঝুলিয়ে সেই সিঁড়ি টেনে তুলল। যেন ছিপের সাহায্যে আমাকে মাছের মতো খিঁচ মেরে টেনে নিল। ওরা আমার এই দুঃসাহসিক জিমন্যাস্টিক দেখে একেবারে হতবাক। আর, আমি যে এভাবে দোলায়মান শাম্পান থেকে সোজা জাহাজের ডগায় উঠে আসতে পারি, এতে আমিও অবাক। রবি তখনও শাম্পান থেকে আমার দিকে চেয়ে হতভম্ব। আমি দূরে উপর থেকে হাত নেড়ে বিদায় জানালুম। আমাকে দিল পনেরো টাকা জাহাজ ভাড়া, এক টাকা সর্বপ্রকার খুচরো খরচ, এবং সঙ্গে দিয়ে দিল হাফ পাউণ্ড একখানা পাউরুটি এক আনা। বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু, তোমাকে নমস্কার! অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় আমার চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল।

এ জাহাজখানাও অতি বৃহদাকার। নাম 'এডাভানা'। আমার গায়ে সেই উলি-ঝুলি ছেঁড়া ও ময়লা হাতকাটা জামাটা। ধুতিখানা থপথপ করছে ভিজে, মালকোঁচা বাঁধা। মাথায় পাগলের মতো একরাশ এলোমেলো রুক্ষ চুল। খালি পা। পাউরুটি-খানা বেকায়দায় নদীর জলে ভিজে গেছে। যেমন ভিজেছে ষোলখানা এক টাকার নোটের গোছাটা। আমার আর কিছু নেই, আমি সর্বহারা। আমার সর্বাঙ্গ অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা।

ডেক-এর উপর শুয়ে পড়লুম। আমার শীর্ণকায় চেহারায় আর কোনও শক্তি-সামর্থ্য নেই। আমি ভয়ানক ক্লান্ত, তার চেয়েও বেশি ক্ষুধার্ত। ফুরফুরিয়ে হাওয়া আসছে দেখে আমি পাঁউরুটিখানা একটু শুকোতে দিয়েছিলুম। ওখানায় আমার তিনদিন চলবে। চারদিনের দিন পৌঁছব কলকাতায়। কিন্তু শুকোবার আগেই এক

সময় উঠে আন্দাজে ভিজে পাঁউর্টিখানার এক-তৃতীয়াংশ কামড়িয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল্ম। কী সুন্দর ধারালো দাঁত আমার! আট আউন্স র্টির এক-তৃতীয়াংশ খেয়ে ফেলতে এক মিনিট লাগল কি? বার বার ভাবছিল্ম আর এক কামড় খাওয়া যায় কিনা। না যায় না, কাঠের খ্ঁটির পাশে সযত্নে র্টির দ্ই-তৃতীয়াংশ রেখে দিল্ম। ওর জলে ভেজা গন্ধটুকুও যেন ভাল লাগছিল!

ফিরতি-পথের কাহিনীটুকু না বললেই হয়ত ভাল হ'ত।

ওই পাঁউর্টিখানা ম্খের কাছে রেখেই এক সময় শ্য়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিল্ম। কখন বাহির-সম্দ্রে জাহাজ চলে এসেছে জানতে পারি নি। সম্দ্রের সুন্দর বাতাসে আমার ঘ্ম ঘনীভূত হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি যে প্রবল জ্বরে অঘোর অচৈতন্য হয়ে পড়েছি, এ আমি ব্ঝতে পারি নি। হঠাৎ ঘ্ম ভাঙ্গলো, সম্দ্রের একটা বড় ঢেউ ডেক-এর উপরে উঠে আমার সর্বদেহকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য ড্বিয়ে দিল। আমি পলকের মধ্যে হাত বাড়িয়ে পাঁউর্টিখানাকে ধরতে গেল্ম, কিন্তু জলের প্রচণ্ড তাড়নায় সেখানা ছট্কিয়ে ভেসে দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল!

পাগল-ঘণ্টা বেজে উঠেছে জাহাজে। সম্দ্র-লোক ধ্সর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তারই ভিতর দিয়ে দানবীয় বেগে সাইক্লোনের ঘ্র্ণিঝঞ্ঝা ছ্টে ছ্টে আসছে। জাহাজের রোলিং আরম্ভ হয়েছে। একবার বাঁদিকে কাত হয়ে প্রায় শ্য়ে পড়ছে, তখনই ডেক-এর উপরে উঠে আসছে প্রবল একটা তরঙ্গভঙ্গ, আবার সোজা হচ্ছে, এবং আবার ডান-দিকে কাত হয়ে পড়ছে সেই বিরাট ঢেউটাকে তুলে নেবার জন্য। আমি সেই তরঙ্গ-জলের আঘাতে আহত প্রতিহত হয়ে অচেতন জ্বর নিয়ে ক্ষণে ক্ষণে 'স্নান' করছিল্ম!

চোখ ব্জে কাঠের চৌকির খ্ঁটিটা আমি শক্ত ক'রে ধ'রে পড়েছিল্ম। জাহাজের প্রচণ্ড দোলায় আমার কাঠ-বমি হচ্ছিল। কিন্তু আমার অন্তরাত্মা ছ্টে গিয়েছিল বহ্ দ্রে সাগর সীমানা পেরিয়ে সেই নারকেলডাঙ্গার বাড়িটিতে—যেখানে এই সন্ধ্যা-বেলায় ঠাকুরঘরে প্রদীপ দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে মা বসেছেন আদ্যাস্তোত্র পাঠে। আমি শ্নছিল্ম জননীর সেই কণ্ঠস্বর! "—অরণ্যে রণে দার্ণে শত্র্ মধ্যে ইনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে তমেকা গতির্দেবী নিস্তারদাত্রী নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দ্র্গে—"

আমি যেন দেখছিল্ম তাঁর দ্ই চোখে দশধারা নামছে!

হঠাৎ আমার পায়ের উপরে কেউ পা দিয়ে ঝাঁকুনি দিল। আমার পক্ষে উঠে বসা সম্ভব ছিল না। শ্ধ্ বেহ্ঁশ অবস্থায় মাথা তুলল্ম। দেখল্ম সে জনৈক খালাসী। এতক্ষণ মৃদ্ আলোর আভায় সে আমায় দেখতে পায় নি। আমি জানি ডেক-এর উপর তরঙ্গ চলাচলের আতঙ্কে অন্য যাত্রীরা প্রাণভয়ে নিচের দিকে 'হোল্ডের' মধ্যে পালিয়েছে। উপর দিকে ঝড়জলের মধ্যে আমি নিঃসঙ্গ একা।

লোকটা আবার আমার পায়ে পা দিয়ে নাড়া দিল: এই ওঠ—নিচে যা—মরবি এখানে? জলের টান দেখছিস নে?

নড়তে পারল্ম না জ্বরের প্রবলতায় ও সাম্দ্রিক পীড়ায়। বোধ হয় সেই নোয়াখালির খালাসী আমার ওপর রাগ ক'রে থাকবে। সহসা সেই জল-প্রবাহের

মধ্যেই তার বলশালী হাতে আমার ঠ্যাং দু'খানা ধ'রে হিড়হিড়িয়ে টেনে নিয়ে গেল হোল্ডের সিঁড়ির কাছাকাছি। তারপর বিড়ালছানার মতো আমার ঘাড়ের মাংস ধ'রে তুলে সিঁড়ির সরু ধাপগুলির মধ্যে ঠেলে দিল। আমার অক্ষম শরীর টাল সামলাতে পারল না। সিঁড়ি দিয়ে গড়গড়িয়ে ছিটকিয়ে আমি নিচের তলায় গিয়ে পড়লুম দুটি অর্ধমৃত দেহের উপর—তাদের একজন হল কাবুলিওলা, অন্যজন ওড়িয়া। আমার নতুন ক'রে দৈহিক লাঞ্ছনা আরম্ভ হ'ল।

ওড়িয়া লোকটি সামুদ্রিক পীড়ার ফলে ওখানেই পায়খানা ক'রে অনড় হয়ে প'ড়ে রয়েছে। শুধু আঘাত পেয়ে একবার কাতরিয়ে উঠে আমার মাথার দু'ঘা বসিয়ে দিল। কাবুলিওলা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে আমার মাথার একমুঠি চুল সজোরে পড়পড় ক'রে ছিঁড়ে তুলে নিল! এবম্বিধ প্রহার চলল সমস্ত রাত। ওদের ওই নরককুণ্ড থেকে একটু দূরে স'রে যাবার শক্তি আমার সেই রাত্রে আর ছিল না।

আচমকা আঘাত পেয়েছিল সেই ছিটগ্রস্ত কাবুলিওলা, সেজন্য তার আক্রোশ ভুলল না। মোট আড়াই দিন ধ'রে সে আমাকে ক্ষত-বিক্ষত করেছিল। আমার দুই কানের পাশে জুলপি ছিঁড়ে ছিঁড়ে রক্তাক্ত করল, তার হিংস্র নখ দিয়ে চিমটি কেটে আমার হাতে, পিঠে ও গলার কাছে একটির পর একটি কালশিরা তুলল। লাথি মেরে পিঠ দুমড়িয়ে দিয়েছে যখন তখন। আমাকে নিরুপায় হয়ে সেই বীভৎস উৎপীড়ন মুখে বুজে বরদাস্ত করতে হয়েছিল। বেহুঁশ জ্বর নিয়ে এবং কাঠ-বমির বেগ চেপে আমি মাঝখানের দু'দিন সম্পূর্ণ উপবাসী ছিলুম।

চতুর্থ দিনে প্রত্যুষে নিয়তির নির্দেশে কাবুলিওলা শাস্তি পেল। সে উঠে উঁচুতে লোহার চাদরে-ঢাকা পাটাতনে ব'সে পাঠানী সঙ্গীত ভাঁজতে আরম্ভ করেছিল। হঠাৎ সেই লোহার মোটা শীটখানা পিছলে উলটিয়ে যাবার ফলে সে নিচের তলায় প'ড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু নিজেই সে লোহার পাড় ধরে একহাতে ঝুলে পড়ে এবং অবশ্যম্ভাবী দুর্ঘটনা থেকে বাঁচে। কিন্তু সম্পূর্ণ বাঁচে নি। দু'জন খালাসী তার একখানা হাত ধরে হিঁচড়িয়ে পিঠখানা ঘষড়িয়ে যখন তাকে টেনে তুলল, তখন তার পিটের আধখানা চামড়া ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে। রক্ত পড়ছে ঝরঝরিয়ে শেষ নিচের তলাকার হোল্ডের যাত্রীদের গায়ে।

জাহাজের দোলা শান্ত হয়েছে। কখন জাহাজখানা এসে ঢুকেছে ডায়মণ্ড হারবারে জানতে পারি নি। আমার কাঠ-বমি ও শারীরিক বিকার কখন যেন থেমে গেছে টের পাই নি।

এবার আমি উঠলুম। কাবুলিওলা তখন চিৎকার করছে যন্ত্রণায়। জাহাজের ডাক্তার তার সেই ছেঁড়া পিঠের ওপর ঢেলেছে টিঞ্চার আইওডিন।

আমার সর্বশরীরে কালশিরা, রক্তের দাগ এবং প্রহারের ব্যথা। সেই অবস্থায় উঠে এলুম ডেক-এর উপর। বহুদূরে তীরভূমির সবুজ রেখা দেখা যাচ্ছে। সমস্ত দুর্যোগ, দুর্গতি ও উৎপীড়ন ভুলবার চেষ্টা করছিলুম উজ্জ্বল বিশ্বলোকের দিকে চেয়ে। অবশেষে আষাঢ় মাসের খররৌদ্রের ভিতর দিয়ে বেলা এগারোটার পর জাহাজ এসে

ভিড়জা আউটরাম ঘাটে। পনেরোটি টাকা দিয়ে আমি নেমে এলুম।

বাবুঘাটে স্নান ক'রে চারটি ভিজে ছোলা কিনলুম ঘাটপাণ্ডার কাছে। জ্বর আমার কমেছে। ছোলা চিবোতে চিবোতে সেই খররোদ্রে বাড়ির দিকে চললুম। অতঃপর দিন পনেরো বাদে রবি তা'র বাবার সঙ্গে রাজবেশে বাড়ি ফিরে এসেছিল।

॥ ১২ ॥

নিত্যনৈরাশ্যের মধ্যে আমি তলিয়ে যাচ্ছিলুম। চারদিক ঘিরে রয়েছে আমার বিষণ্ণ চিন্তা, আমারই চিত্তের গ্লানি। বীতশ্রদ্ধ আমি, কারও প্রতি কোনও সময়ে শ্রদ্ধা রাখতে পারছিনে। আমি যেন অকারণে মার খাচ্ছিলুম, কে মারছে তাকে চোখে দেখছিনে।

একটু একটু লিখতে আরম্ভ করেছিলুম। কিন্তু যা কিছু লিখছি সব যেন নিজের কাছে অরুচিকর, সব যেন বাতুলের প্রলাপ। প্রত্যেক লেখায় অর্থহীন অজ্ঞানের হাস্যকর প্রতিকৃতি দেখে নিজেই কৌতুক বোধ করি। এক সময় একে একে সবগুলো একত্র করে কুটিয়ে ছিঁড়ে জঞ্জালের সেই বালতিতে ফেলে দিয়ে আসতুম।

সর্বাপেক্ষা লজ্জার কথা, এই অক্ষম রচনার কয়েকটি ছাপা হয়েছিল ফণী পাল আর 'চাঁদমুখ-হীরকদুলের' লেখক শরৎ চাটুয্যের 'গল্প-লহরীতে'। আমার কোনও ছাপা লেখা পড়তে আমার নিজেরই লজ্জা হ'ত।

সারাদিন কাটিয়ে দিতুম মেট্‌কাফ হলে, অর্থাৎ ইম্পিরিয়ল লাইব্রেরীতে। চার্লস গাভিস্‌, ফিলিপ ওপেনহেম বা জন ক্রিস্টফার—এরা কেমন একটা সস্তা রস যুগিয়ে দিত। শেক্‌স্‌পীয়র, মিলটন, থ্যাকারে, মেকলে—এরা ছিল দু'চোখের বিষ। হ্যাঁ, দু'চোখের বিষ! বিশেষ করে শেক্‌স্‌পীয়র। ওর পুরনো কালের ইংরেজী বোঝবার জন্য অক্সফোর্ড, ওয়েবস্টার আর চেম্বার্স-এর খানতিনেক অভিধান, পাশে রাখতে হ'ত। হ্যাঁ, দু'চোখের বিষ! সেই জন্য চার্লস ল্যাম্বের থেকে শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের গল্পগুলো শুধু পড়ে নিতুম।

প্রতিদিন দুপুরে যাওয়া নারকেলডাঙ্গা থেকে হেয়ার স্ট্রীট এবং ফিরবার পথে আমাদের পুরনো পাড়া পটিবাগান-মানিকতলা হয়ে ফিরে আসা—কম বেশি মাইল আস্টেক। রাজাবাজার থেকে ট্রাম আছে—কিন্তু কে দেবে আমার দৈনিক রাহাখরচ? চা বা টিফিন? কেন, রাস্তার কলে কি জল ফুরিয়ে গেছে?

শিয়ালদা স্টেশনের ঠিক বাইরে রাস্তার কোণে মুসলমানের একটি প্রসিদ্ধ পরটা ও শিককাবাবের দোকান ছিল। পাছে ওর সুগন্ধ নাকে আসে, এজন্য অপর ফুটপাথ দিয়ে চলে যেতুম। মায়ের শাসন ছিল: খাবার দেখলে লোভ করতে নেই, চেয়ে খেতে নেই এবং ধার করে কখনও কিছু মুখে তুলতে নেই! দিনের একবার যদি এক মুঠো

অন্ন জোটে, সেই কি ভগবানের আশীর্বাদ নয় ?

সন্ধ্যার পর থেকে কিছুতেই যখন আমার নিঃসঙ্গ জীবনের কয়েক ঘণ্টা আর কাটতে চায় না, তখন আবিষ্কার করলুম আমাদেরই বাড়ির অদূরে এক নোংরা বস্তির মধ্যে একটা নাটুকে আড্ডা। সেই ক্লাবের একটা নামও বুঝি আছে। আমাকে নিয়ে গিয়েছিল প্রতিবেশী বঙ্কুবাবুর ছেলে নরেশ—আমার সমবয়স্ক। সে প্রতিদিন দুপুরে আমাদের বাসস্থানের পিছনের পুকুরে আমাকে সাঁতার শেখাবার চেষ্টা পেত—যা কোনদিনই শিখতে পারি নি।

এই ক্লাবে গিয়ে ঢোকবার পথটা ছিল অন্ধকার, দুঃসাধ্য ও দুর্গন্ধময়। প্রতিবেশীদের নালা-নর্দমা বয়ে যেত ওরই ভিতরে ভিতরে। খাটা পায়খানার বীভৎস নরককুণ্ড চোখে পড়ত ঠিক সামনেই। কাদের বাড়ির ট্যাঙ্ক থেকে জল উপচিয়ে ছিটে এসে লাগত যাতায়াতের পথে। ওরই পাশ কাটিয়ে যাবার সময় হঠাৎ একটা লাফ দিয়ে পগার ডিঙ্গিয়ে যেতে হ'ত।

সবটাই ছমছমে অন্ধকার। বাঁ পাশে একখানা গোলপাতার চালাঘর। ভিতরের দেওয়ালগুলো মাটির। ছোট ছোট গোটা দুই জানলা, ওতেই হাওয়া-বাতাস আসত যতটা সম্ভব। সুবিধা ছিল এই, মাটির মেঝের সমস্তটা জুড়ে দর্মার উপরে পাটি পাতা, এবং খানচারেক হাতপাখা মজুত থাকত। ক্লাবের চাঁদা মাসে দু'আনা।

প্রথম দিনেই যাদের দেখলুম তাদের মুখ আমাদের নিতান্ত অচেনা নয়। এ পাড়ারই লোক। এই গলির মোড়ের কাছে মনোহারী দোকানের ফটিক এ অঞ্চলের যে-নাপিত সকালের দিকে বাক্স নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, এখানে এসে তা'র প্রথম নাম জানলুম বটু। সতীশ আর নিতাই—ওরা ওদের দাদার মসলার দোকানে কাজ করে। যতীনবাবু নাকি শা-ওয়ালেসের কেরাণী। মনিবাবু শুঁড়োর ইস্কুলের মাস্টার। হারু বুঝি ডাকঘরের পিওন। ওদের মধ্যে একমাত্র বীরেশ্বর, যার কথাবার্তা প্রথম দিনেই আমার একটু ভাল লেগেছিল। সর্বাপেক্ষা কৌতুকের বিষয় ছিল, একটি প্রৌঢ় ব্যক্তির আচরণ। লোকটার নাম ক্ষিতি মিত্তির। সে ওই হারিকেন ল্যাম্প-জ্বালা ঘরে ঢুকত না, অন্ধকারে ওই নোংরা আনাচে-কানাচেই সন্ধ্যা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত কাটাত এবং প্রতি দশ মিনিট অন্তর এসে ক্লাবের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে নাটক সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে যেত!

আমাদের ক্লাবের এখন 'দেবলাদেবীর' মহড়া চলছে। 'মোশন' মাস্টার হলেন যতীনবাবু। তিনি 'খিজির খাঁর' পার্ট করবেন। তাঁর প্রণয়িনী হলেন 'মতিয়া'। মতিয়ার পার্ট করবে বটু। 'দেবলা' সাজবে সতীশ। পার্ট বিতরণ আগেই হয়ে গেছে, তবে আমি যদি রাজি হই, আমাকে জনৈক সেনাধ্যক্ষের ভূমিকায় নামানো হবে। এটা দেখার দরকার ছিল, ক্লাবের প্রত্যেক মেম্বারই যেন পার্ট পায়। ক্লাবের মেম্বার হয়ে বড়ই আনন্দে এবং উৎসাহে আমার সন্ধ্যাগুলি কাটছিল। এটি লক্ষ্য করছি, যারা নিয়মিত ক্লাবে আসে তাদের অধিকাংশই সিদ্ধি খেয়ে আসে। বীরেশ্বর ওটার নাম দিয়েছিল 'সাকসেস'। ওখানে প্রায় সবাই বিড়ি ফুঁকত, তার ঘন ধোঁয়ায়

হারিকেনের আলোটাও ঝাপসা দেখাত।

ওরই মধ্যে হঠাৎ অন্ধকার থেকে সারা দিত ক্ষিতি মিত্তির। তা'র সঙ্গে পাবলিক থিয়েটার মহলের সকলেই নাকি পরিচিত। গিরিশ ঘোষ, দানিবাবু, অমর দত্ত, সুশীলা, তারাসুন্দরী, অমৃত বোস, কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, ক্ষেত্র মিত্র, অপরেশ মুখুজ্জে, উপেন মিত্র—এ'দের মধ্যে অনেকেই নাকি তার ইয়ারবক্সি! ক্ষিতি মিত্তিরকে দিনের আলোয় কখনও দেখি নি। একদিন লোকটা বিড়ি ধরালো দেশালাই জেলে। সেই আলোয় দেখি, লোকটার খোঁচা-খোঁচা পাকা দাড়ি-গোঁফ। বয়স অন্তত ষাট-বাষট্টি। বেশ বুড়ো চেহারা।

একদিন আমার প্রশ্নের উত্তরে নরেশ চাপা গলায় বলল, ওর খদ্দের অনেক। তাদেরই জন্যে অন্ধকারে ঘোরাঘেরা করে!

কেন?

বুঝলে না, ও যে কোকেন বেচে পয়সা কামায়! বেশ ভাল কারবার!

সেইদিন প্রথম জানলুম লোকটার ইতিবৃত্ত। লোকটার বসবাস হ'ল শুঁড়োর ওদিকে রাসবাগানে। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার পর আসে এই বস্তিতে।

এই প্রসঙ্গেই আমার আরেক যতীনকে মনে পড়ছে। আমার চেয়ে সে সাত-আট বছরের বড়। তা'র এক হাতের মাঝখানের বড় আঙুলটা বুঝি কী এক কারণে কাটা গিয়েছিল, সেই কারণে তা'কে বলা হ'ত 'আঙুলকাটা' যতীন। সে আমার দাদার সহপাঠী, এজন্য সে আমার শৈশব থেকেই পরিচিত। যতীনদা খৃস্টান এবং অবিবাহিত। বাঙ্গলা সাহিত্য নিয়ে সে পড়াশুনা করত এবং কয়েকজন লেখকের সঙ্গেও তার পরিচয় ছিল।

একদিন অনেক রাত্রে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ধ'রে ফিরছিলুম। নন্দ চৌধুরীর গলির মোড়ে যতীনদার সঙ্গে দেখা। সারাদিন পরে মনের মতো সঙ্গী পেয়ে বড় খুশী হলুম। এ পাড়া ছেড়ে বহুদূর নারকেলডাঙ্গায় গিয়ে পড়েছি এজন্য বড়ই বেদনা-বোধ ছিল। যতীনদাকে ভালই বাসতুম।

এ কি, হয়েছে কি তোর? এত টলছিস কেন?—বলতে বলতে আমি তাকে ধ'রে ফেললুম।

এলোমেলো পা ফেলতে ফেলতে সে বলল, রাধু আজ খাওয়ালো রে।

রাধু! সে আবার কে? মেয়েছেলে?

রাঙ্গা-রক্তিম চোখে যতীনদা আমার দিকে ফিরে হাসল। পান খেয়েছে দেখলুম। পরে বলল, দেশি রে দেশি, ছ'আনা পাঁট! পুরো পাঁটই মেরে দিলুম। চল হেদোয় গিয়ে একটু বসি।

হাঁটতে হাঁটতে এসে হেদোয় ঢুকে ডানহাতি একখানা বেঞ্চে বসলুম। নতুন ধরনের একটা গন্ধ পাচ্ছিলুম যতীনদার মুখ থেকে। এতকাল ধ'রে যে-চেহারায় ওকে দেখে এসেছি, এ সে ব্যক্তি নয়—এ অন্য। আজ প্রথম আমি জানলুম, সে নেশা করে!

আমার কণ্ঠ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল। প্রশ্ন করলুম, এ তুই কোথায় নেমে যাচ্ছিস.

যতীনদা ?

যতীনদার ঘাড় গুঁজে পড়ছিল। এবার সে মাথা তুলল। বলল, এ আবার তুই কি বলছিস ? যেখানে ছিলুম সেখানেই ত আছি !

তুমি নেশা করেছ ? মেয়েছেলের হাত থেকে মদ নিয়ে খেয়েছ !

এবার সোজা সে আমার দিকে তাকাল। বলল, ওরে, তুই মাথায় ঢ্যাঙ্গা হয়েছিস। কিন্তু তুই তেমনি কচি, তেমনি অজ্ঞান। শোন, জীবনটা সোজা পথে চলে না রে—তার পথ চিরকাল আঁকাবাঁকা !

তাই বলে তুমি নোংরায় ডুববে ?

কোনটা নোংরা রে ? কোনটাই বা শুচিশুদ্ধ ?—যতীনদা বলল, তুই না লেখক ? চলতি বিশ্বাস, আর চলতি নীতি কি তোর জন্য ? তুই যদি সব রকম পুরনো সংস্কারের ফাঁদে পা দিস, তাহলে সেই ফাঁসেই ত জড়িয়ে মরবি। যাকে তুই নোংরা বলছিস, সেটা যে সত্যিই নোংরা কে বললে তোকে ?

আমি চুপ ক'রে গেলুম। যতীনদার মাথাটা আবার নুয়ে পড়েছিল। কিন্তু এক সময় মাথা তুলে সে হাসল। বলল, এত কষ্টে তুই লেখাপড়া শিখলি, কিন্তু এক ফোঁটা বিদ্যেবুদ্ধি তোর হ'ল না !

নেশা করলে কি বিদ্যেবুধি বাড়ে ?

বাড়বে কেন, চাপা পড়বে !—যতীনদা বলল, সেটাই দরকার। প্রশ্ন যত দেখা দেবে, তত অশান্তি। যত জানবি তত দুঃখ পাবি। যত আশা করবি ততই মার খাবি। জীবনকে চারিদিক থেকে যত দেখবি, ততই ভুগবি নৈরাশ্যে ! কিন্তু সব চাপা পড়ে নেশায়, মনে রাখিস।

এসব কি বলছ তুমি ?

জড়িত কণ্ঠের প্রলাপের সঙ্গে যতীনদা বলল, যা বলছি তা মিলিয়ে নিস নিজের সঙ্গে। জ্ঞান যত বাড়বে, দুঃখ তত বেশি। বুদ্ধি যত পাকবে, ততই দেখবি তুই বোকা ! কিছু চাসনে কোথাও, কিছু কামনা করে দুঃখ টেনে আনিসনে। যা আসে তাই নে, টানাটানি করিসনে কিছু। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ কতটুকু জানিস তুই ? মদ আমি খেয়েছি শুধু নিজের মধ্যেই তলিয়ে যাব ব'লে ! প্রবৃত্তিটা পাপ নয়, মনে রাখিস।

কী বললে ?

পাপ এক জিনিস, প্রবৃত্তি অন্য বস্তু ! মদভাঙ খাব, মেয়েদের কাছে যাব, এগুলো পাপ নয় রে, এগুলো জীবনেরই স্বাভাবিক অঙ্গ, আনন্দেরই ক্ষেত্র।

উত্তেজিত হয়ে বললুম, কিন্তু সামাজিক আর নৈতিক অপরাধ ?

ঘাড় তুলে যতীনদা আমার দিকে তাকাল। বলল, তুই ত লেখক হতে যাচ্ছিস। একথা কি জেনেছিস পৃথিবীর সব দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সামাজিক আর নৈতিক অপরাধের থেকে জন্মেছে ? শেক্সপীয়র থেকে রবি ঠাকুর—সেই একই কথা। দেখছিসনে চোখের সামনে চোখের বালি, ঘরে বাইরে আর শ্রীকান্ত ? তুই কি রামায়ণ

আর মহাভারত আগুনে পুড়িয়েছিস? কালিদাসের ঋতু সংহার আর কুমারসম্ভব—কি করবি ওদের নিয়ে? থাম্, ওসব কথা তুলিসনে।

রাগ করে আমি বললুম, আচ্ছা বলতে পার, যে মেয়েছেলে তোমাকে হাতে তুলে খাওয়াল, সেই তোমার রাধু কেমন প্রকৃতির মেয়ে?

কেমন ক'রে জানব?—যতীনদা বলল, তুই কি জানিস তুই কেমন? রাধু কি জানে কেমন তা'র প্রকৃতি? তা'র ব্যবহারেই তা'র পরিচয়! সে শুধু আনন্দিনী। চলরে এবার উঠি। আমাকে ধর একটু—

ওকে সামলিয়ে নিয়ে চললুম। হেদো থেকে বেরিয়ে যতীনদা বলল, শোন, সুনীতি-দুর্নীতি, ভালমন্দ—সব নিয়েই জীবনের বিচার। সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত মনই হ'ল নিষ্পাপ মন। ওই যে রাধুকে ছেড়ে এলুম, ওখানেই আমার শেষ! ও থাক ওর জগতে।

ওর বাড়ির কাছাকাছি এসে ওর হাতের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলুম, তোমার হাতের মুঠোয় কি ওটা?

ও দুটো সন্দেশ রে। রোজই কিনে নিয়ে যাই।

কেন!

যতীনদা বলল, মা যে বিধবা রে, রাত্রে আচমনী কিছু খান না—।

ওকে দরজা পর্যন্ত পেঁছিয়ে আমি ফিরলুম। কথা রইল সামনের শনিবার দুপুরে আবার আসব। রাত এগারোটা বাজে। আমার পথ অনেক দূর। শুঁড়ি-পাড়া, মানিকতলা, মুগীপাড়া ছাড়িয়ে পুল পেরিয়ে সোজা—বস্তির পর বস্তি। তারপর এক সময় ডানহাতি নারকেলডাঙ্গার পথ।

শুঁড়িপাড়ার মোড় থেকে পশ্চিম দিকে তখন ভাঙ্গন চলছে। এই ভাঙ্গনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে একের পর এক বস্তি। দিদিমার বাড়ি, দীনু স্যাকরার ঘর, ললিতবাবুর গলি, গঙ্গার-মার কুটির, শেতলদের সেই ঝোপড়া, অন্ধ বুড়ো আর হরার মা'র বস্তি, এগুলো এক একে ভাঙ্গছে। অমন যে গজেন ঘোষের সেই 'হলদে বাড়ি', নন্দ চৌধুরীদের পাকা ইমারত, অবিনাশ কবিরাজের পাড়া, গোঁসাই কলু আর খাঁদা শুঁড়ির আড্ডা, এমন কি সেই নিমগাছওলা এ পাড়ার বেশ্যাবাড়িটা পর্যন্ত—একে একে সব নিশ্চিহ্ন হচ্ছে। ওদেরই সঙ্গে ধ্বংস হচ্ছে পুরনো জীবন আর সাবেকী মনোবৃত্তি। কোদাল আর গাঁইতির ঘায়ে ভেঙ্গে পড়ছে পুঞ্জীভূত যত কুসংস্কার, যত মূঢ়তা আর অজ্ঞান, যত কুশিক্ষা আর অন্ধ আচার!

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেইকালে একটির পর একটি ভাঙ্গন দেখছিলুম।

আমার শৈশব ও কিশোরকালের নিত্যসঙ্গিনী সেই ধনীকন্যা মানু—তাদের বাড়িও ভাঙ্গা পড়ল! তা'রা নেই, কোথায় যেন চ'লে গেছে। কিন্তু আমার মনে রেখে গেছে কেমন অপমানের ক্ষতচিহ্ন, রেখে গেছে কৈশোর-অনুরাগের পদদলিত এক কাহিনী। মানুকে ভুলতে পারা সহজ নয়।

এই বিপুল ভাঙ্গনের আদি-অন্ত দেখে বেড়াতুম যতীনদাকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় প্রতি-

দিন সন্ধ্যাকাল থেকে। অন্ধকার ও দুস্তর সেই অঞ্চলের ভিতরে ভিতরে কেরোসিনের লম্ফ নিয়ে বসে থাকত শ্লথচরিত্রা টুলিবউ, আর যমুনি, কুর্লাপবরফওলা রামু, মল্লিক-দের বাড়ির সেই ডাটো ঝি—যে-মেয়েটা ওই অন্ধকারে রামুর ঘরে এসে ঘণ্টাখানেক থেকে চ'লে যেত, আর সেই ঘরামিদের ছেলেটা—যার নাম ছিল নন্দ—যে গাঁজা আর চরস কিনে নিয়ে যেত রামুর কাছ থেকে তার বাবুদের জন্য! ওই অন্ধকারের মধ্যেই সংগোপন সরীসৃপের মতো এগিয়ে আসত জেলেটোলা আর সিঙ্গিবাগানের ওদিক থেকে মেয়েছেলেরা। তারা অনেকে এসে ঢুকত কুলি-মজুরের তাঁবুর মধ্যে। যাবার সময় চার আনা আট আনা রোজগার ক'রে নিয়ে যেত।

সন্ধ্যার পরে এ অন্য জগৎ, এ সব হ'ল কলকাতার সুড়ঙ্গলোক—দিনমানে যার প্রত্যক্ষ পরিচয় হ'ল কর্মমুখরতা। সেই ছায়াময় রহস্যলোকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যতীনদা অবশেষে আমাকে বা'র ক'রে আনত আলোকাজ্জ্বল কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে!

এই ভাঙনের ভিতর থেকেই পরবর্তীকালে জন্ম নেয় বিবেকানন্দ রোড। এই ভাঙন দেখেছিলুম দর্জিপাড়া, শ্যামবাজার অঞ্চলে, দক্ষিণ পাইকপাড়ায়, এণ্টালিতে এবং আরও অনেক জায়গায়। ওদের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একে একে সেণ্ট্রাল অ্যাভেনুর সম্প্রসারণ, ভুপেন বোস অ্যাভেনু, দেশবন্ধু পার্ক। পুরনো পাইকপাড়ার ধানক্ষেত হারিয়ে গেল। এণ্টালিতে মস্ত বাজার। পুরনো কড়েয়া ভেঙ্গে নতুন শহর। বিরাট বস্তি অঞ্চল ভেঙ্গে নাম হ'ল 'পার্ক সার্কাস'।

এই সব ভাঙনের আনাচে কানাচে ঘুরে যতীনদা যে-ধরনের জীবনের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটিয়ে দিত, তার সঙ্গে আর যাই থাক, নৈতিক ব্যাখ্যার কোনও সঙ্গতি থাকত না। এক এক সময় ভয় পেতুম কলকাতার সেই ভুগর্ভলোকে আনাগোনার কালে।

লালদীঘির দক্ষিণ-পূর্বে রানীমুদিনীর গলি কেউ কি আজ মনে রেখেছে? যদি যতীনদা আমাকে না নিয়ে যেত সেই বাগবাজারে বিনি ধোপানির বস্তিতে, তবে কি কোনও কালে তা'র খবর পেতুম? কম্বুলেটোলার ভিতর দিয়ে শ্যামপুকুর আর কুমোরটুলি ছাড়িয়ে যাচ্ছি ত যাচ্ছিই। সেই খালের ধার, পুরনো সেই মারাঠা ডীচ লেনের পাশ কাটিয়ে,—সরু গলিটা যেখানে মিশেছে নিয়োগী লেনে। কোথাও তখন পথেঘাটে ইলেকট্রিক আলো নেই। আছে চৌকো গ্যাসের আলো,—যেটা অস্পষ্ট, ছায়া ছমছমে, একটার থেকে অন্যটা অনেক দূরে। যার নিস্তেজ সাদা আলো কলকাতাকে রহস্যময় ক'রে রাখত।

অগণিত সংখ্যক গোলপাতার চালা, কোনটা করোগেট, কোনটা বা খোলার ঘর। কিন্তু ওই সরু গলির দু'পাশের সারিতে প্রতি দরজায় একটি-দুটি বা তিনটি মেয়ে সাজগোজ করে সামনে কেরোসিনের কুপি জেলে অপেক্ষা করত, কতক্ষণে কে কার আগে কোন্ পথচারীর নেক-নজরে পড়বে!

কিন্তু এ হ'ল বাইরের দিক। আমার কাছে মিনিট পনেরোর জন্য ছুটি নিয়ে যতীনদা ঢুকে যেত ওই সাপের গর্তে! তারপর এক সময় মেয়ে মহল পেরিয়ে মাক—

খানের উঠোন ডিঙিয়ে যে-ঝুপসি কাঁচা মাটির দাওয়ায় গিয়ে নিঃশব্দে হাজির হতুম, সেখানে অধিকাংশই পুরুষ! কালো কালো চেহারা, কেউ গুণ্ডা, কেউ দাগী আসামী, কেউ বেশ্যার গর্ভজাত, কেউ মনোহারী সামগ্রী বিক্রি ক'রে বেড়ায়, কেউ ট্রামের কনডাকটার, কেউ পাইকারি বাজারে সব্জি কিনে অন্যত্র খুচরো বেচে আসে—। আবার ওদেরই মধ্যে এসে ঢোকে বীটের পাহারাওলা,—সেও দু'চার আনা খরচ ক'রে একটা মেয়েকে নিয়ে দু' ঘণ্টা কাটিয়ে যায়। এ সব কোনও দিন কিন্তু আমার খারাপ লাগে নি। ভয় পেয়েছি, প্রতিবার এই ভূগর্ভে ঢোকার আগে গা ছমছম করেছে, নৈতিক শুচিতার প্রশ্নে মন মাঝে মাঝে থমকিয়ে গেছে, অনেক সময় মনে হয়েছে ভেসে যাচ্ছি, তলিয়ে যাচ্ছি, কোথায় যেন ডুবে যাচ্ছি! কিন্তু একবারও মনে হয় নি আমি অন্যায় করছি, দুর্নীতির তলায় নামছি, অথবা নিজের কাছে কলঙ্কিত বোধ করছি। আশেপাশে ময়লা তাস নিয়ে জুয়াখেলা চলছে, চোলাই মদ নিয়ে বস্তির মেয়েদের কাছে বেচে আসছে এবং তাদেরই মাঝখানে ব'সে যতীনদা পরম আনন্দে বিশেষ এক-ধূমপান করছে—আর আমি মশগুল হয়ে আড্ডায় জমে যেতুম।

তবু ওরই মধ্যে আমি যেন নিষ্কাম, আমি যেন স্পর্শলেশশূন্য। কেন আমি ওদের নিন্দা করব? পাশে প'ড়ে আছে মাতাল, এপাশে সেই 'মাসি' তার চুল এবং শরীর এলিয়ে হাসি তামাশায় মুখর হচ্ছে, ওপাশে জুয়ার পয়সা নিয়ে ভাগাভাগি চলছে, কেরোসিনের শিখা উঠে ঝুপসি ঘর শ্বাসরুদ্ধ হচ্ছে—আমি আমোদ পাচ্ছি নিজের মনে!

কখন বেরিয়ে আসি,—রাত অনেক। কিন্তু বাগবাজার থেকে নারকেলডাঙ্গার পথ সোজা খালধার দিয়ে। মানিকতলায় শুধু বাঁক নেবে যতীনদা,—তাঁর মায়ের জন্য সন্দেশ নিয়ে বাড়ি ফিরবে! আমার পথ মাইল চারেক। মল্লিক-গঞ্জ পেরিয়ে আরেকটু গিয়ে ডানহাত।

বাড়ি ফিরি এগারোটা থেকে রাত বারোটার মধ্যে। কেউ জেগে নেই, শুধু মা ছাড়া। মা যেন আমার জীবনের অতন্দ্র প্রহরী! তাঁকে দেখলেই মনে হ'ত আমার সমস্ত অশুচিতা পথের বাইরে ফেলে মন্দিরে এসে ঢুকেছি!

আমাদের ক্লাবটাকে মাঝে মাঝে মনে হ'ত নরককুণ্ড। দিনের বেলা এর আশপাশ অতি বীভৎস। কিন্তু রাত্রির ছায়ায় অনেক কুদৃশ্য ঢাকা পড়ে সেইজন্য আসা যাওয়ায় অতটা আপত্তি দেখা যায় না। তবু ভিতরে ময়লা হারিকেনের সিস, বিড়ির ধোঁয়া, সিদ্ধি-আফিংয়ের নেশায় অনেকে বুঁদ. মাঝে মাঝে দরজা পেরিয়ে দুর্গন্ধের ঝাপটা ভিতরে আসা,—প্রায়ই মনে হ'ত, আমরা যেন নরককুণ্ডের মধ্যে কিলবিল করছি!

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার পর ক্লাবে ঢুকে দেখি, জনৈক সৌম্যদর্শন বয়স্ক যুবক বেশ জমিয়ে ভিতরে বসেছেন। উনি নবাগত, আগে ওঁকে আমি দেখি নি। ভদ্রলোক বোধ হয় সপ্তাহখানেক দাড়িগোঁফ কামান নি। পরনে খদ্দরের পানজাবি, সেটি আধময়লা, খদ্দরের ধুতির সঙ্গে মিলে রয়েছে। বয়স তিরিশ পেরিয়ে কতটা এগিয়েছে ঠাউরে

দেখতে হয়। লোকটি অতি বিশুদ্ধ বাংলা, এবং অতি পরিচ্ছন্ন নির্ভুল ইংরেজিতে যে-পরিমাণ কথা বলেন, তার চেয়ে বেশি পরিমাণে সিগারেট টানেন!

ক্লাবের মেম্বারদের এতদিন পর্যন্ত আমার সম্বন্ধে সামান্য একটা সমীহ ভাব ছিল। আমি রুচিবান লোক, সংযত আলাপ করি, গাম্ভীর্য রক্ষা করে চলি, এবং শিক্ষা-দীক্ষায় আমার নাকি কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। আজ হঠাৎ এই লোকটি আবির্ভূত হয়ে আমার সেই প্রতিষ্ঠা ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই অপহরণ করে নিলেন। এ ব্যক্তির অত্যুগ্র উজ্জ্বলতার কাছে আমি বিবর্ণ। ইনি অনর্গল বিশুদ্ধ ইংরেজির সঙ্গে বাংলা মিশ্রিত ব'লে যাচ্ছিলেন তুলনামূলকভাবে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বঙ্গীয় নাট্যশালার তুলনামূলক ইতিহাস, ফরাসী বিপ্লবের নাটকীয় কাহিনী এবং জার্মানীর বিসমার্ক ও ইংল্যাণ্ডের ডিসরেইলীর জীবননাট্য। ভদ্রলোক আধ-ঘণ্টার মধ্যে রুশ বিপ্লবের কাহিনী বুঝিয়ে দিলেন এবং যেহেতু এই বছরের জানুয়ারী মাসেই লেনিনের মৃত্যু ঘটেছে, সেজন্য লেলিনের জীবনাদর্শ ও বলশেভিক পার্টির কর্মসূচী অতি মনোজ্ঞভাবে বুঝিয়ে দিলেন। আগে লক্ষ্য করছিলুম, শেক্‌স্‌পীরর ও বার্নার্ডশ ওঁর একেবারে মুখস্থ। ক্রমশ দেখতে পাচ্ছিলুম টলস্টয় আর টুর্গেনিভ, ডস্টয়েভস্‌কি ও ম্যাক্সিম গোর্কি— এঁরা কণ্ঠস্থ। 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্টের' পাতার পর পাতা উনি ব্যাখ্যা করে ব'লে যাচ্ছিলেন। ফরাসী মোপাসাঁ, রুশ চেকভ, টুর্গেনিভের 'স্মোক', টলস্টয়ের ওয়ার অ্যাণ্ড পীস,—এঁদের সবাইকে উনি যেন প্রথম আমাদের সামনে ধরলেন!

কে এই ব্যক্তি? আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূতের মত চেয়ে রইলুম। শুধু যে এক বিচিত্র নতুনের স্বাদ পাচ্ছিলুম তাই নয়, আরেক পৃথিবীর তোরণদ্বার আমার সামনে খুলে যাচ্ছিল। নিজেকে এত ক্ষুদ্র, এত অকিঞ্চন এবং এত অজ্ঞ আর কোনও দিন মনে হয় নি।

—পাপ করে মানুষ, কিন্তু পাপের জন্য সে জন্মায় নি! মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় মহৎ সভ্যতা সৃজনের কীর্তি, ঈশ্বর নামক এক আইডিয়ার আবিষ্কার, সমাজ-চেতনার উদ্বোধন এবং সেই মানুষেরই নিজের হাত দিয়ে জীবনের বিরাট অপচয়ের আয়োজন। ইভল্যুশন থিয়োরির মূল ব্যাখ্যাটা আগে জানা দরকার।

এক কোণে ব'সে এবার সভয় ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করলুম, কিন্তু মহাভারতের কর্ণ? সে কি নিয়তির হাতের পুতুল নয়? নিজের ওপর কি তার কর্তৃত্ব ছিল?

ক্লাবের সবাই নিশ্চুপ।

ভদ্রলোক আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, কর্ণ চরিত্র হ'ল একটা বিশেষ যুগের মানবতাবাদের আইডিয়া,—অনাদিকালের নৈরাশ্যবেদনার প্রতীক। দৈব আর পুরুষকারের প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব। কর্ণ হ'ল মহাভারতের চিরকালীন বাস্তব-চরিত্র,—সকল কালের আধুনিক।

লোকটি নিঃসন্দেহে সেদিন আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন? সে-রাত্রে আমার ঘুম হয় নি। পরে ওঁর নাম জেনেছিলুম বিধুবাবু।

বর্ষাকাল তখনও চলছে। বৃষ্টি এসেছিল সেদিনও সন্ধ্যার পর।

বাড়ি ফিরে পথে হঠাৎ ষষ্ঠীতলার মোড়ে বিধুবাবুর সঙ্গে দেখা। দেখা হতেই তিনি বললেন, আরে, এই যে,—তোমার কথাই সেদিন থেকে ভাবছিলুম! মণিবাবুর মুখে তোমার খুব সুখ্যাতি শুনলুম। আচ্ছা, চা খাবে একটু? এসো—

কাছেই এক অ-বাঙ্গালীর রংচঙে তেতলা বাড়ির ভিতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তিনি বললেন, এই যে, সোজা তেতলায় উঠে এসো।

তেতলায় উঠে এলুম। এখানে বিধুবাবুর দখলে একটি আসবাবলেশশূন্য শোবার ঘর, একফালি একটি রান্নাঘর এবং কলতলা। ওঁর ঘর থেকে দেখা যাচ্ছিল রান্নাঘরের ভিতরটা। উনি যখন চায়ের ব্যবস্থা করতে গেলেন, সেই সময় হঠাৎ আমার চোখে পড়ল, দরজার ফাঁকে ওঁর স্ত্রীর একখানা হাতের প্রতি। আমার চোখ দুটো অপলক। জানি, এটা চোরাচাহনি। অন্ধকার থেকে এভাবে লক্ষ্য করা অসামাজিক ও অশোভন। কিন্তু এমন সুশ্রী, নিটোল ও কমনীয় একখানা হাত সচরাচর চোখে পড়ে না। হাত-খানার সেই লাবণ্য এবং ললিত ভঙ্গী সুন্দরী নারীর রূপ সম্বন্ধে আমাকে যেন প্রথম সচকিত ক'রে তুলল। সেই হাতে একগাছি মাত্র রক্ত-নীল বর্ণের কাঁচের সরু বালা রয়েছে দেখলুম। লক্ষ্য করছিলুম বিধুবাবুর ঘরে একখানা শতরঞ্জি, একটা পুঁটলি, একখানা হাত-পাখা, কলাইয়ের একটা গেলাস এবং সিগারেটের খালি বাক্স ও পোড়া দেশালাইয়ের কাঠি ছড়ানো। একটাই মাত্র হ্যারিকেন ল্যাম্প। সেটা একবার এ ঘরে, একবার রান্নাঘরে ঘুরছে।

পেয়ালা ইত্যাদি নেই। মহিলা সামনে এলেন না, কারণ স্বামীর পরিচিত হলেও আমি নবাগত। চট ক'রে সামনে এসে উপস্থিত হওয়া মেয়েদের পক্ষে রেওয়াজ-বিরোধী। কলাইয়ের বাটিতে সেদিন চা খেলুম।

আসবার সময় বিধুবাবু বললেন, কাল সকালে আমি এ বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছি। তবে এই পাড়াতেই একটা ঘর নিচ্ছি। ষষ্ঠীতলা লাইব্রেরীর সামনে একতলা বাড়িটা তুমি চেনো?

বললুম, চিনি, ওটা পণ্ডুদের বাড়ি।

ওখানেই যাচ্ছি। কাল সকাল দশটায় খেয়েদেয়ে আমার ওখানে আসতে পারবে?

হ্যাঁ, নিশ্চয় পারব।

পরদিন থেকে ওঁর কর্মজীবনের সঙ্গে আমার অন্য একটা জীবন আরম্ভ হয়ে গেল। বিধুবাবু প্রথমে আমাকে নিয়ে গেলেন 'প্রবাসী ও মর্ডান রিভিউ' আফিসে। উনি যে প্রবাসীর জনৈক বিজ্ঞাপন-ক্যানভাসার, এ আজ প্রথম জানলুম। তখনকার ব্যবসায়ীরা চট ক'রে বিজ্ঞাপন দিতে চাইত না। বহুদিনের উমেদারির ফলে যদি বা এক-আধটা বিজ্ঞাপন দিত, তার বিলের দরুন টাকা আদায় ক'রে আনতে রক্ত-আমাশয় হ'ত! এই কাজে উঞ্ছবৃত্তি ছিল প্রচুর। কিন্তু বিধুবাবু ছিলেন একটু অন্যপ্রকারের। তিনি নানা ধরনের বর্ণাঢ্য বক্তৃতা দিয়ে ব্যবসায়ীকে প্রভাবিত করতেন, ইংরেজি কোটেশনের চটক দেখাতেন, হিন্দী বলতে পারতেন, এবং ব্যবসায়ের মূলনীতি সম্বন্ধে এদেশের ব্যবসায়ীরা যে কত অজ্ঞ, সেটা বিশ্লেষণ ক'রে বুঝিয়ে দিতে জানতেন। এই

আমি প্রথম জানলুম, উচ্চশ্রেণীর ক্যানভাসার কা'কে বলে। যাই হোক, ওঁকে দেখেছি এইভাবে দৈনিক পাঁচ থেকে দশ টাকা রোজগার করছেন। তার থেকে চা ও জলখাবার খাচ্ছেন দৈনিক দেড় বা দু'টাকা। সর্বাপেক্ষা অবাক হতুম ওঁর খয়রাতির হাত দেখে। ওঁর সঙ্গে হাঁটতুম দৈনিক কমবেশি দশ মাইল। চৌরঙ্গী, ধর্মতলা, চাঁদনি, টেরেটিবাজার, রাধাবাজার, তুলোপটি, পগেয়াপটি, মুর্গিহাটা আর পাথুরে-ঘাটা। কাদায়, বর্ষায়, জলে, পরিশ্রমে আর লোকের ভিড়ে,—ওঁর সঙ্গে আমিও জন্তুর মতন পরিশ্রম করতুম। কিন্তু সেই হাঁটাহাঁটির মধ্যে দেখতুম অন্ধ, আতুর ভিখারি, কাঙ্গাল—এদের মধ্যে বিধুবাবু তাঁর কষ্টার্জিত অর্থ ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

দারিদ্র্য কি পাপ? মোটেই নয়।—বিধুবাবু পথের মাঝখানেই থমকিয়ে বলতেন ধন বণ্টন ব্যবস্থার কারচুপি—তার থেকে দারিদ্র! ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য কেমন ক'রে জন্মাচ্ছে বলতে পার? সমাজব্যবস্থায় বিপ্লব না এলে বদলাবে কিছু?

আমি বললুম, দু'চার পয়সা ভিক্ষে দিলে কি সব বদলিয়ে যাবে?

হাসিমুখে বিধুবাবু বললেন, না, ভিক্ষেটা কিছু নয়। ওটা মনুষ্যত্বের সান্ত্বনা! যারা প্রাসাদে থাকে, তারা কাঙ্গালকে দেখতে পায় না, তাই ভিখারির দুঃখ-দুর্গতিও জানে না। কিন্তু আমরা যে ওদের গায়ে-গায়ে থাকি, আমরা জানি সব। মানুষ না খেয়ে যখন কাঁদে, তার গলার আওয়াজ চিনি।

এক-একদিন দেখেছি উনি প্রায় শূন্য হাতে বাড়ি ফিরছেন, কিন্তু সেটি আমার ভাল লাগত না। প্রায় তিন মাস হ'ল ওঁর সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে ক্লান্ত হচ্ছি। ঘুরছি নিঃস্বার্থভাবে। কিন্তু লোকটার বিদ্যাবত্তার পরিবেশটি আমার ছাড়তে ইচ্ছে হয় না। সব চেয়ে ভাল লাগত ওঁর ঈশ্বর-বিদ্বেষের যুক্তি। দেখতে পেতুম নৈতিক চরিত্র, আধ্যাত্মবাদ, বড় বড় আদর্শ, পূজাপার্বণ, হিঁদুয়ানির নানা অনুষ্ঠান, ঠাকুর-দেবতা, ধর্মবিষয়—এ সব ব্যাপারে ওঁর প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা। উনি ধনী সম্প্রদাদের শত্রু, উনি চান মানুষের ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিতে, উনি রুশ বিপ্লবের অনুরাগী। আমার আরেকটি উৎসাহের কারণ ছিল এই, উনি ফরাসী, জার্মানী, ইতালীয়, স্কানডিনেভিয়ান, রুশ, পোল্যাণ্ড ইত্যাদি বহু সাহিত্যের সংবাদ রাখতেন। উনি মুখে মুখে ইউরোপীয় বহু সাহিত্য থেকে কোটেশন উদ্ধার করে আমাকে শোনাতেন। এ ধরনের স্মৃতিশক্তি আগে আমি দেখি নি। শেকস্‌পীয়রের ওপর এরকম দখল এক শিশির ভাদুড়ীরই আছে জানতুম: শুনেছি- শিশিরবাবু বিদ্যাসাগর কলেজে যখন শেকস্‌পীয়র পড়াতেন তখন অন্যান্য কলেজ থেকে অনেক ছাত্র ক্লাস কামাই করে তাঁর আবৃত্তি শুনতে আসত। বিধুবাবুর প্রতি আমার অনুরাগ এইভাবেই বেড়ে যাচ্ছিল।

'প্রবাসী' আপিসে সকলেই বিধুবাবুর সুখ্যাতি করতেন, এবং তাঁরই সূত্রে কারো কারোর সঙ্গে আমি পরিচিত হই। প্রথম পরিচয় হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এটা ১৯২৪। এইবছরেই বেরোয় 'শনিবারের চিঠি'। ওদের আপিস ছিল 'প্রবাসী' আপিসের ভিতরে। 'চিঠির' সম্পাদক হলেন যোগানন্দ দাস—ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের ছোট ছেলে। মধুকরকুমার কাঞ্জিলাল হলেন অশোক চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ছোট ছেলে। অনেক লেখক ও লেখিকা ছদ্মনামে 'চিঠিতে' লিখতেন। অন্য এক নব্য যুবক ছিলেন 'শনিবারের চিঠি ও প্রবাসীর' প্রুফ রীডার —তাঁর নাম সজনীকান্ত দাস। ওই চিঠিতে তাঁর ব্যঙ্গ কবিতা মধ্যে মাঝে ছাপা হ'ত। ওখানেই প্রথম দেখলুম অজাতশত্রু হাস্যরসিক এবং সঙ্গীত বিশারদ নলিনীকান্ত সরকার মহাশয়কে। ওঁদের অন্যতম আড্ডার স্থল ছিল 'বাসন্তী কেবিন,' অর্থাৎ চায়ের দোকান। আরেকটি আড্ডা প্রবাসীর গেটের সংলগ্ন 'বিপিনবাবুর হোটেল'। শনিবারের চিঠিতে নজরুলের বিরুদ্ধে আক্রোশ, বিদ্বেষ ও বিদ্রূপ—এই সব যাঁরা প্রকাশ করতেন তাঁদের মধ্যে মোহিতলাল মজুমদার ছিলেন প্রধান। পরে এর কারণটি জেনেছিলুম।

এই সময় নারকেলডাঙ্গায় 'যুব সংঘ' নামক একটি জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়, এবং আমি তার জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে নির্বাচিত হই। তখন দেশবন্ধুর আমল, এবং তরুণ সুভাষচন্দ্র বসু কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্‌জিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত হন। দেশবন্ধু মেয়র। ডাঃ বিধান রায় মহাশয় দেশবন্ধুর দক্ষিণ হস্ত। ওঁদেরই আদর্শে 'যুব সংঘ' তৈরি হয়। প্রধান কর্ম ছিল মুষ্টিভিক্ষা, চাঁদা ও পুরনো কাপড়-জামা সংগ্রহ করে দুঃস্থদের মধ্যে বিলি করা। এই সব কাজ চলবার কালে আমরা একটি 'মহতী' সাহিত্যসভার আয়োজন করি। সেই সূত্রেই আমি যাঁদেরকে নারকেলডাঙ্গায় ডেকে আনি তাঁরা হলেন যোগানন্দ দাস, মোহিতলাল, সজনীকান্ত, হেমন্তকুমার, নলিনীকান্ত এবং আরও দু'একজনকে। সভাপতি হন মোহিতলাল। এই উপলক্ষে আমি একটি ছন্দ ও মিলযুক্ত বড় কবিতা লিখি, এবং সেই সভায় পাঠ করি। একে একে সবাই বক্তৃতা করেন। গান গাইলেন নলিনীকান্ত সরকার। পরিশেষে সভাপতি তাঁর ভাষণের পর নিজেই বলেন, তিনি তাঁর একটি কবিতা পাঠ করবেন। তিনি তাঁর জামার পকেট থেকে একখানি নবপ্রকাশিত বই বার করেন, তার নাম 'স্বপন পসারী'। সেই বই থেকে 'কালাপাহাড়' নামক একটি বড় কবিতা তিনি উচ্চ, দীর্ঘ ও তীব্র কণ্ঠে আবৃত্তি করেন। শ্রোতারা বেশ প্রভাবিত হন। লজ্জার সঙ্গেই বলি, আমার সেই অক্ষম ও কাঁচা কবিতাটা বন্ধুরা ছবির মতো বাঁধিয়ে ক্লাব ঘরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখে!

এই বছরেই এক সময় বিধুবাবু বলেন, তুমি যখন লেখক হয়ে উঠছ, তখন এসো, একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বের করা যাক। সম্পাদক কে হবে? আমি প্রস্তাব করলুম, নলিনীকান্ত সরকার! সুতরাং সেই দিনই দুপুরবেলায় ছুটলুম জেলেটোলা স্ট্রীটে। নলিনীবাবুকে খুঁজে বার করে আমাদের পরিকল্পনার কথা বললুম। তিনি কমপক্ষে মাসিক চল্লিশ টাকা চাইলেন।

চল্লিশ টাকা! ভয় পেয়ে ফিরে এলুম। কিন্তু আমি অদম্য। অবশেষে সম্পাদক হলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহকারী ও হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট অশ্বিনীকুমার ঘোষ—তাঁর বাসস্থান ৯৪-এ, গড়পাড় রোড, সেখানেই কাগজের আপিস হবে—চেয়ার টেবিল র‍্যাক ইত্যাদি পাওয়া যাবে। কাগজের নাম হবে 'বিচিত্রা'।

এর কিছুকাল আগে ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রামানন্দবাবুর সহকারী ছিলেন, তিনি গিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়ে। তাঁরই স্থলে এসেছেন অশ্বিনীবাবু—সদাশয় ও অমায়িক ব্যক্তি। তাঁর মিষ্ট প্রকৃতি আমাকে বিশেষভাবে অভিভূত করে।

ঠিক এই সময়টাকে আমাকে নারকেলডাঙ্গা ছাড়তে হয়। পারিবারিক অভাব ও অনটন তার মূল কারণ। পঁয়তাল্লিশ টাকা বাড়িভাড়া দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমরা শ্যামপুকুরের তেলিপাড়ার এক অতি সঙ্কীর্ণ চোরাগলিতে একটি পুরনো বাড়ির একতলাটা ভাড়া নিই। নারকেলডাঙ্গা ছাড়ার জন্য আমি খুবই মর্ম-পীড়া বোধ করেছিলুম। যাই হোক, এই নতুন জায়গায় ঠিকনা দিয়ে আমি তদানীন্তন চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গের সঙ্গে দেখা করে 'বিচিত্রা'র ডিক্লারেশন আদায় করি। ইংরেজ ভদ্রলোক আমাকে একটু নাবালক ও অর্বাচীন মনে করে ঈষৎ সমাদর জানিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুকাল আগে গড়ের মাঠে ক্যালকাটা-মোহন-বাগানের এক ম্যাচ খেলার কালে এক ইংরেজ বা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্ট আমাকে অকারণে মারধোর করে—সেই কারণে শ্বেতচর্মীদের ওপর আমার বিজাতীয় আক্রোশ ছিল। গান্ধীজীর অহিংসাবাদ আমার কাজে লাগে নি।

ঠিক এই সময়টায় রবীন্দ্রনাথের 'রক্ত করবী' নাটকটি প্রবাসীর ক্রোড়পত্র আকারে প্রকাশিত হয়। অশ্বিনীবাবু সেই ক্রোড়পত্রাকার নাটকটির তিনশ' কপি ছাপাখানা থেকে এনে 'বিচিত্রা'র নতুন আপিসে জমা করেন।

॥ ১০ ॥

সাপ্তাহিক 'বিচিত্রার' প্রকাশক ও মুদ্রাকর আমি। কিন্তু যেহেতু কাগজটি ছাপা হবে প্রবাসী প্রেস থেকে, সেই কারণে বিধুবাবু অশ্বিনী ঘোষের সুপারিশ নিয়ে ভোলানাথ দত্তর দোকান থেকে চার পাঁচ রীম কাগজ প্রতি সপ্তাহে নেবার বন্দোবস্ত করলেন। মানিক দাস ছিলের প্রবাসীর ছাপাখানার কর্তা। তিনি বললেন, লেখার কাপি আর কাগজ নিয়মিত যোগান পেলে ঠিক সময়ে প্রতি সপ্তাহে কাগজ বা'র ক'রে দেবো! মলাট ছাড়া ইমিটেশন আইভরি ফিনিশ চব্বিশ পৃষ্ঠা প্রবাসী সাইজের কাগজ, দাম এক আনা!

বিধুবাবুর হাতে কাগজ ও বিজ্ঞাপন আনার ভার। আমার ওপর রইল লেখা সংগ্রহ, প্রুফ দেখা, বিজ্ঞাপন সাজানো, কাগজ বাজারে ছাড়া, এবং সমস্ত হিসাব রাখা। তৎকালে 'ভারতী' গ্রুপের লেখকরাই সাহিত্যের বাজার ছেয়ে রয়েছেন। একে একে তাঁদের কাছে আনাগোনা আরম্ভ করে দিলুম। কাজ একটা পেলুম, মানে আকাশের চাঁদ হাতে এল।

চার্চিলের ভাষায় তখন আমার 'ঘাম আর চোখের জলের' যুগ। আমি যেন নিয়তির ক্রীড়নক, যেমন খেলাচ্ছে তেমনি খেলছি! মিছে কথা ব'লে যাচ্ছি অনর্গল, কিন্তু নিজের কথা নিজেই শুনে অবাক হচ্ছি। কিন্তু আমি ত মিথ্যা বলিনে, অসাধু চিন্তা করিনে? কোনও দিন কারোকে ঠকিয়েছি, প্রবঞ্চনা করেছি—এ আমার মনে পড়ে না। 'বিচিত্রা'কে কেন্দ্র ক'রে দেখছি, লেখকরা মিথ্যা কথা বলে, মিথ্যাচার করে, আত্মস্তুতিতে মুখর হয়, যশোলাভের জন্য হাস্যকর চেষ্টায় লিপ্ত হয়। দেখতে পাচ্ছি তাদের চারিত্রিক ও নৈতিক দুর্বলতা, পারস্পরিক বিদ্বেষের মুখরতা,—যা দেখতে পাচ্ছি তা না দেখলেই ভাল হ'ত। সাহিত্যকর্মীদের সম্বন্ধে সেই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা।

'বিচিত্রা'র প্রথম সংখ্যা যেদিন বেরোল, সেদিন আনন্দে ডিগবাজি খেলুম। কাগজ বিক্রেতাদের দলপতি পাতিরামের কাছে নিজেই কাগজ পৌঁছিয়ে দিয়ে এলুম কলেজ স্ট্রীটে। মোড়ে মোড়ে যেন কাগজ থাকে, কারণ এ কাগজ যুগান্তকারী! কাগজ রাখলুম বাসন্তী কেবিনে, কাগজ রেখে এলুম বিপিনের দোকানে। শিয়ালদার স্টলে, মনোমোহন নাট্যমন্দিরে, হুইলারের দোকানে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে, ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীতে এবং নারকেলডাঙ্গা যুবসঙ্ঘে।

বাসের চলন তখন অল্প অল্প হচ্ছে। রিকশা দেখা দিয়েছে কলকাতার এখানে-ওখানে। ট্যাক্সির দাম বোধহয় চার আনা মাইল। ঘোড়ার গাড়ি সর্বত্র। কোনটাই আমার অবস্থায় কুলোবে না। সুতরাং হাঁটা ছাড়া অন্য পথ নেই।

পর-পর দুই সংখ্যা এত সামান্য বিক্রি হ'ল যে ভয় পেয়ে গেলুম। অর্থনীতিক ব্যাপারটা বিধুবাবুর হাতে। বিজ্ঞাপনাদি তিনিই দেখছেন। আমি আরেকবার কোমর বাঁধলুম।

অশ্বিনীবাবু মাসখানেকের মধ্যে আমার দুটি লেখা ছাপলেন 'বিচিত্রা'য়। একটি ছোট গল্প, অন্যটি 'দার্শনিক' এক প্রবন্ধ। গল্পটি প'ড়ে রামানন্দবাবুর কন্যা এবং সুলেখিকা শ্রীমতী শান্তা দেবী অশ্বিনীবাবুকে জানালেন, প্রবাসীতে এটি ছাপা হ'লে লেখক কিছু টাকা পেতে পারতেন।

টাকা! কথাটা শুনে সেদিন চমকিয়ে উঠেছিলুম। লিখলে টাকা পাওয়া যায় তাহলে? তবে কি সাহিত্য সেবা শুধু কথার কথা মাত্র? ওটা কি তবে ঠিক সেবা নয়, মজুরি? সে-রাত্রে আমার ঘুম হয় নি। কোথায় কি যেন একটা আমার মধ্যে ভেঙ্গে টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছিল। তবে কি আপিসের কেরাণীর কলম আর সাহিত্য-স্রষ্টার কলম একই বস্তু? যারা মাটি কাটে, রাস্তা খোঁড়ে, ফসল বানায়, কল-কারখানা চালায়, সাঁকো বাঁধে, অট্টালিকা নির্মাণ করে—তাদের সঙ্গে কবি, শিল্পী, সাহিত্যকার কি একই পর্যায়ভুক্ত? শান্তা দেবীর সুখ্যাতি শুনে আমি আহত প্রতিহত হয়েছিলুম।

রবীন্দ্রনাথের কাছে অশ্বিনীবাবু বিচিত্রা পাঠাতেন, এটি আমার জানা ছিল না। হঠাৎ একদিন অশ্বিনীবাবু আমার কাছে এসে বললেন, এই দেখুন, রবীন্দ্রনাথ আপনার

কাগজের জন্য একটি কবিতা দিয়েছেন। পড়ুন—

তৎক্ষণাৎ আমি কবির সুন্দর হস্তাক্ষরের কবিতাটি পড়তে বসলুম :

"আনমনা গো আনমনা/তোমার কাছে আমার বাণীর মাল্যখানি আনব না।/বার্তা আমার ব্যর্থ হবে, সত্য আমার বুঝবে কবে/তোমারও মন জানব না।/আনমনা গো আনমনা···।"

কবির কবিতাটি নিয়ে বিচিত্রার বিশেষ একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বোধ হয় এই সংখ্যাটিতেই সজনীকান্ত প্রথম স্বনামে তাঁর একটি কবিতা ছাপবার জন্য আমার হাতে দিয়ে যান। সেই কবিতার প্রথম দুটি ছত্র ছিল : "দেহের বসন লুটায় ধরণী, অশনি ঝলকে নয়ন কোণে, হৃদয়ের ভাব স্ফুরে না অধরে, গুমরি গুমরি ফিরিছে মনে।" সজনী আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিলেন।

পরের মাসের প্রবাসীর 'সঙ্কলন' বিভাগে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয়। এটি অনেককাল পরে গান হয়ে ওঠে।

দুটি কারণে আমার মধ্যে প্রচণ্ড উদ্দীপনা দেখা দেয়। প্রথম, 'আনমনা' কবিতাটি—দ্বিতীয়, অশ্বিনীবাবুর মুখের কথা, মহাকবি নাকি আমার দার্শনিক প্রবন্ধটির ওপর চোখ বুলিয়ে অশ্বিনীবাবুকে আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন। তা হবে। কিন্তু আমার ওই অক্ষম অপদার্থ রচনার জন্য বাহাদুরিবোধ এল না মনে, এল একটা ভাবাবেগ! সেদিন যেন প্রথম নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করলুম আমার ভিতরের উৎপীড়িত মানবাত্মাকে। আমার সেই উনিশ বছরের জীবনে কতটুকু বা দুঃখ পেয়েছি? কিন্তু সেদিন যেন সব দুঃখ-দুর্গতি, দারিদ্র্যের উৎপীড়ন, অন্নাভাব, নৈরাশ্য—সমস্তই যেন একত্রিত হয়ে আমার গলার ভিতর থেকে ঠেলে উঠল!

সেদিনকার খোয়া-মাড়ানো পথে ও ফুটপাথে, আকাশের আলোয়, ছ্যাকড়া গাড়ির গতিতে, রিকশাওলার ঘর্মাক্ত মুখে···আমি দেখতে পাচ্ছিলুম আমারই ছবি! দেখতে পাচ্ছিলুম আমার ভিতরের ইস্পাতের ফলাটা যেন দুঃখের দ্বারা শানিত হয়ে ঝলমল করছে। আগুনে বার বার দগ্ধ হচ্ছে, কিন্তু কঠিন হয়ে উঠছে বার বার।

বিধুবাবু আমাকে একটি নতুন কথা শিখিয়েছেন, "শ্রমের মর্যাদা"! ওর ইংরেজী সংজ্ঞা হ'ল, dignity of labour! তুমি মেথর, ঝাড়ুদার, তুমি ফেরিওলা, মজুর-মিস্ত্রি, তুমি রিকশা টানো, গাড়ি চালাও, নর্দমা ঘাঁটো···যাই করো তুমি, সব তোমার "ডিগনিটি অফ লেবার।" এই নিয়ে বিধুবাবু আমাকে এক পরীক্ষায় ফেলেছিলেন।

তখনও নারকেলডাঙ্গায় ছিলুম। ষষ্ঠীতলা আর বড় রাস্তার মোড়ের কাছাকাছি চওড়া নর্দমার ধারে একটা কুকুর মরে পড়েছিল। দিন তিনেক ধরে দেখছিলুম কর্পোরেশনের ধাঙড় ওটাকে এখনও তোলে নি। বিধুবাবু সেইদিকে আমার চোখ ফিরিয়ে বললেন, তুমি কি পারো সকল সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে ওই মরা কুকুরটার সৎকার করতে?

আমি হাসলুম। অহংকার আমার মনকে স্পর্শ করল। আমি যুবসঙ্ঘের সেক্রেটারী। এ-পাড়া ও-পাড়ায় কোথাও মৃত্যু ঘটলে আমাদের কাছে খবর আসত। দরকার

হবামাত্র আমরা শবদেহ কাঁধে তুলে নিয়ে যেতুম সেই নিমতলার শ্মশানে…চার মাইল দূরে।

—ভেবে দেখো এটা মানুষের মড়া নয়।

আবার হাসলুম,—মরে গেলে সব দেহই সমান!

বিধুবাবু বললেন, তুমি কিন্তু বর্ণশ্রেষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণ! ডোমের কাজ করতে যাচ্ছ!

বললুম, বামুনের জাত যায় না!

—কিন্তু হিঁদুয়ানি?

আমি এগিয়ে গিয়ে নর্দমার ধার থেকে মরা কুকুরটাকে তুললুম। একটু দুর্গন্ধ পাচ্ছিলুম। কিন্তু কী এসে যায়? ওটাকে ঝুলিয়ে নিয়ে সহাস্যে বললুম, চলুন, হিঁদুয়ানির চেয়ে বড় 'ডিগনিটি অফ লেবার'!

জানি এটা ছেলেমানুষী বাহাদুরি। কিন্তু প্রয়োজন হ'লে মুর্দাফরাসের কাজ করব না, এ কেমন কথা? আশেপাশে দু'চারজন লোক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাদের বিস্ময়চক্ষুর সামনে দিয়েই পচা কুকুরের দেহটি সযত্নে ঝুলিয়ে নিয়ে চললুম!

খালের পুল পার হয়ে সোজা চ'লে এলুম রাজাবাজারের মোড়ে। ওখানে ধাপার মাঠে জঞ্জাল নিয়ে যাবার রেল-ওয়াগন দাঁড়িয়ে থাকত সকাল থেকে সারাদিন। কুকুরের শবদেহটি তারই মধ্যে ফেলে দিলুম।

সেই সপ্তাহ থেকেই আমি 'বিচিত্রা' ফিরি করতে আরম্ভ করেছিলুম। আমি হকার, এ আমার গৌরব। আমি ঝাড়ুদার, সেও আমার গৌরব। আমি মেহনতী শ্রমিক, আমি ওয়ার্কার—সকল প্রকার কাজই আমার পক্ষে শ্রদ্ধেয়। 'বিচিত্রা' ফিরি করতে আরম্ভ করলুম শিয়ালদা ও নৈহাটির মাঝখানে ট্রেনে ট্রেনে ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে। বিকাল পাঁচটা থেকে রাত আটটা। দাঁতের মাজন, হজমি গুলী, বাতের তেল, মাথা ধরার মালিশ, আমাশার ওষুধ, চানাচুর—এদের ফেরি করছে যারা, আমি তাদেরই সঙ্গে বেচছি একখানা 'বিচিত্রা', দাম এক আনা। কী আনন্দ আমার—যখন এক আনা ফেলি পকেটের মধ্যে।—"বাড়ী ফেরবার আগে একখানা 'বিচিত্রা' নিয়ে যান মশাই! বন্ধুগণ, বাঙ্গালী হ'ল সাহিত্যপ্রিয়, সাহিত্য তাদের মরণ-বাঁচনের বিষয়। এই কাগজে নতুন জীবনের স্বাদ পাবেন। নারী জাগরণের খবর পড়ুন। এ কাগজে বৃটিশ শাসনের কঠোর সমালোচনা দেখবেন! বায়স্কোপের সব খবর আছে। দাম মাত্র এক আনা!"

মনে মনে প্রতিজ্ঞা ছিল, আট-দশখানা ট্রেনে অন্তত পঞ্চাশখানা কাগজ বেচে তবে বাড়ী ফিরব। পঁচিশ পার্সেণ্ট কমিশন, সুতরাং প্রতি কাগজে আমার নিজস্ব এক পয়সা থাকবে। এই ক'রে যদি মাসে উনিশ-কুড়ি টাকা পাই, তবে আমার পয়সা খায় কে? বাড়িতে প্রতি মাসে অন্তত পনেরো টাকা ঠিকই দিতে পারব। স্যার পি. সি. রায় তখন প্রবল আন্দোলন তুলেছিলেন, বাঙ্গালীর ছেলে চাকরি-বাকরি না খুঁজে স্বাধীন ব্যবসায়ে নামে না কেন!

একদিকে আমি আকাশ কুসুম রচনা করছিলুম মনে মনে, অন্যদিকে প্রতিদিন কাগজ বিক্রির দরুণ সব দিক থেকে কুড়িয়ে পাঁচ-ছয় টাকা জমা দিচ্ছিলুম বিধুবাবুর কেন্দ্রীয় অর্থভাণ্ডারে। রামানন্দবাবুর ছোট ছেলে সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান অশোক চট্টোপাধ্যায়, ভ্রাতুষ্পুত্র হেমন্তবাবু এবং অশ্বিনী ঘোষ মহাশয় যথেষ্ট বদান্যতার পরিচয় দিচ্ছিলেন। কিন্তু ভোলানাথ দত্তর দোকানে এবং প্রবাসী প্রেসে এই চার মাসে মোট কত টাকা দেনা হয়েছে আমার জানা ছিল না। আমি থাকি শ্যামপুকুরে, প্রবাসী প্রেস রাজাবাজারে, ভোলানাথ দত্ত রাধাবাজারে, আপিস গড়পারে এবং বিধুবাবু থাকেন নারকেলডাঙ্গায়। পারস্পরিক যোগাযোগ যেন ক্রমশ কমে যাচ্ছিল।

মাস তিনেক পরে হঠাৎ একদিন হেমন্তবাবু আমাকে ধরলেন। বললেন, বিধুর খবর কিছু পাচ্ছিনে। সে কোথায় বলতে পারেন?

বললুম আমার সঙ্গে কিছুদিন দেখা হয় নি।

ওর কাছে প্রবাসীর বিজ্ঞাপন আদায়ের টাকা জমেছে অনেক—প্রায় হাজারখানেক ত হবেই। ক্ষুদু (অশোক) ওর খোঁজ করছিল!—হেমন্তবাবু নিজেই চ'লে গেলেন।

দিন দুই পরে অশ্বিনীবাবু বললেন, ভোলানাথ দত্তর ওখান থেকে তাগাদা দিচ্ছিল। বিধুবাবুকে দেখতে পাচ্ছিনে। টাকা কি আপনিই দেবেন?

আমি?—একটু ভয় পেয়ে আমি বললুম, আমি কিছু জানিনে ত? সব টাকাই থাকে বিধুবাবুর কাছে। কত টাকা হবে সবসুদ্ধ?

তা প্রায় সাতশ'! ওর মধ্যে ছাপাখানা, ব্লক, দপ্তরি, ভোলানাথ দত্ত—সবই আছে।

সেদিন চিন্তিতভাবে অশ্বিনীবাবু তাঁর বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি বসেছিলুম 'বিচিত্রা' আপিসে। আমি এখানে সর্বময় কর্তা। রোজ আসি সকাল দশটায়, বাড়ী ফিরি রাত দশটায়। কিন্তু টাকা পয়সার তহবিল থাকে বিধুবাবুর কাছে। তিনি টাকা দিতে পারেন নি কেন, এটা আমার জানা দরকার। 'বিচিত্রা'-র বিজ্ঞাপনের দরুণ টাকা, এতদিনের নগদ বিক্রির টাকা, প্রবাসীর পাওনা টাকা—সব মিলিয়ে অন্তত হাজার দেড়েক হবে বইকি।

আপিস থেকে বেরিয়ে পূর্ব পথে খালধারে এলুম। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে পুল পেরিয়ে ষষ্ঠীতলা এসে পেঁছিতে আধঘণ্টার ওপর লাগল। লাইব্রেরির সামনে এসে দেখি পশুদের বাড়ির দরজার বাইরে তালা লাগানো। খানিকক্ষণ থমকিয়ে গেলুম। গলাটা আমার শুকিয়ে উঠল। আমার চারিদিকের দৃষ্টিপথে কেমন যেন সন্দেহের ছায়া দেখতে পেলুম!

ষষ্ঠীতলা ধরে কিছুদূর পূর্ব পথে এসে দেখলুম, সেই মনোহারির ছোট্ট দোকানে ফটিক তেমন বসে রয়েছে। আমাকে দেখেই সে উল্লসিত হয়ে উঠল। আমি চলে যাবার পর নাকি এ পাড়া অন্ধকার। ক্লাব রিহার্সাল বন্ধ আছে, 'যুবসঙ্ঘে' এখন আর কাজ তেমন চলছে না।

—আমাকে এক গেলাস জল দাও, ফটিক।

জল খেয়ে সুস্থ হয়ে আমি বললুম, আচ্ছা ফটিক, বিধুবাবুর বাড়ীতে তালাবন্ধ দেখলুম। ওরা কোথায়?

ফটিক আমার দিকে সটান তাকালো। বলল, কিছু জানো না তুমি?

বললুম, কী জানব?

ফটিক বলল, ভেতরে এস। এখন দুপুরবেলা খদ্দের নেই। এস—

ভিতরে গিয়ে বসলুম। ফটিক গল্প ফাঁদল। সেই বউটা উপোস করে থাকে। বিধুবাবু কোন কোনও দিন রাত্রে আসে, সকালে বেরিয়ে যায়। এদিকে একদিন রাত্রে বউটার প্রসববেদনা ওঠে। পাশের বাড়ীর লোক জানতে পেরে লাইব্রেরির প্রেসিডেণ্ট সুশীলবাবুকে খবর দেয়। দাই আসে। শেষ রাত্রে একটা মেয়ে হয়। সুশীলবাবু নিজের পকেট থেকে সব খরচা দেন। তিনি একজন ঝিকেও রাখেন ওই বউটির সঙ্গে।

—তারপর?

বিধুবাবু গায়েব হয়েছিল দশ-বারো দিন। পরে শুনলুম একদিন হঠাৎ মাঝ-রাত্তিরে এসে আগে ঝিটাকে তাড়িয়ে দেয়, তারপর বউ ও বাচ্চাকে নিয়ে সেই রাত্রেই নিরুদ্দেশ হয়। চার পাঁচ মাসের ঘর ভাড়া না দিয়েই কেটে পড়েছে। আমাদের সেই ধীরেন ভঞ্জকে মনে আছে তোমার? সে বিধুবাবুর সব জানে।

—আর কি জানার আছে ফটিক?

—আছে, আছে।—ফটিক বলল—ও মেয়েটি ওর বিয়ে করা বউ নয়! ও ছিল বিধবা। ওকে ফুসলিয়ে বার করে আনে দুই বন্ধু, বিধু আর একজন। প্রথম জন ফুর্তি মেরে পালিয়েছে, বিধু হ'ল দ্বিতীয়। মেয়েটা ওকেই আঁকড়িয়ে ধরে।

আমার কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করছিল। বললুম, ওরা এখন কোথায় আছে বলতে পারো, ফটিক?

—আমি ত বলতে পারিনে, ভাই। তবে ধীরেনদা কবে যেন বলছিল, ওরা শুঁড়োর ওদিকে রাসবাগানে বুঝি গা-ঢাকা দিয়ে আছে।

বললুম তুমি ভাই এক কাজ করো। বিধুবাবুকে আমার খুব দরকার। ধীরেন-বাবুর কাছ থেকে যদি ওঁর ঠিকানা পাও, রেখে দিয়ো, ভাই। আমি আরেকদিন আসব।

—দাঁড়াও, ফটিক বলল, ধীরেনদা ওষুধ ক্যানভাস করতে যায়, তুমি জানো। দিন তিনেক আগে সে গেছে বিহারের ওদিকে। ফিরতে তার পনেরো দিন, হয়ত এক মাসও হতে পারে, আমি বলতে পারিনে। তুমি সেই বুঝে এসো।

ফিরবার পথ ছিল আমার দীর্ঘ। হাঁটতে হাঁটতে বিধুবাবুর বক্তৃতার কথাই ভাবছিলুম:

চৌর্যবৃত্তিটা পাপ কে বললে? প্রতারণার কৌশল—সে ত শুধু মস্তিষ্কের খেলা! মানুষ অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না কি? সচ্ছলতা যদি থাকে তবে

কেন চুরি করবে ? অর্থবণ্টন ব্যবস্থার ত্রুটিই ত সাধু ব্যক্তিকে অসাধু করে তুলছে ! প্রতারণাটা তোমার গায়ে লাগছে, কিন্তু যেটা অপ্রত্যক্ষ,—যার নাম স্টক-এক্সচেঞ্জ, সামান্য একটা তামার পয়সার হেরফের করে বড় বড় ব্যবসায়ীরা যখন লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করে—সেটা কি প্রতারণার কৌশলমাত্র নয় ?—বিধুবাবুর কথাগুলো কানে বাজছিল।

কোন্ রাস্তা দিয়ে কোন্ দিকে যাচ্ছিলুম, অতটা লক্ষ্য ছিল না। শুধু ভাবছিলুম, আমি কি প্রতারিত বিধুবাবুর হাতে ? উনি আমার বিশ্বাসকে নষ্ট করে বুক ভেঙে দিয়ে যাচ্ছেন—এ কি সত্যি ?

অতঃপর দেখতে দেখতে 'বিচিত্রা'র নাভিশ্বাস উপস্থিত হ'ল। শেষ সংখ্যাটা বাজারে ছেড়ে দিয়ে গড়পারের আপিস ত্যাগ করলুম।

'কল্লোল' মাসিক পত্রিকার প্রথম বছরেই কোন্ মাসে যেন আমার একটি লেখা ছাপা হয়। কিন্তু ওদের সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ ছিল না শুধু হরিহর চন্দ্রকেই আমি রাঙাদা বলে ডাকতুম কয়েক বছর আগে থেকে। সম্প্রতি 'কল্লোলে'র যুগ্ম সম্পাদক গোকুল নাগ মারা গেলেন যক্ষ্মা রোগে, আমি এটি শুনে একটি শোক-বার্তা পাঠিয়েছিলুম, সেটি 'কল্লোলে' ছাপা হয়েছে দেখছি।

এদিকে প্রবাসী আপিসে ওঁরা আমারে শ্যামপুকুরের ঠিকানা জানতেন, কারণ ওই ঠিকানাটাই 'বিচিত্রার' শেষ পৃষ্ঠায় ছাপা হ'ত। অশ্বিনীবাবু মধ্যে মাঝে আমার কাছে টাকার তাগাদা দিয়ে লোক পাঠাচ্ছিলেন। বিধুবাবু আমাকে ডোবান নি, ডুবিয়েছেন প্রবাসীকে আর অশ্বিনীবাবুকে। এর মধ্যে আমি কিন্তু নৈতিক অপরাধে অপরাধী ! আমি 'বিচিত্রা'র প্রকাশক, আমারও দায়িত্ব ছিল বইকি।

ধীরেন ভঞ্জ বুদ্ধিমান লোক, তারও বাড়ি শুঁড়োর ওদিকে। সে বিধুবাবুর গতিবিধি একটু-আধটু জানত। বিধুবাবুর ঠিকানার একটি বর্ণনা সে রেখে গিয়েছিল ফটিকের কাছে। শ্যামপুকুর থেকে ষষ্ঠীতলা তিন থেকে চার মাইল। একদিন ভোরে উঠে দুর্গা বলে রওনা হলুম।

ফটিকের কাছে ঠিকানার নির্দেশ নিয়ে স্যার গুরুদাসের বাড়ীর পাশ কাটিয়ে রেললাইনের পুলের তলা দিয়ে চললুম শুঁড়ো পেরিয়ে রাসবাগানে। বেলা আন্দাজ ন'টা। বোধ হয় মাঘের শেষ। সকালের হাওয়াটা স্নিগ্ধ। পুলিসের কুকুর যেমন হাওয়ায়-হাওয়ায় অপরাধীর গন্ধ শুঁকে শুঁকে এগোয়, আমি তেমনি গলিঘুঁজি এপাশ ওপাশ দেখতে দেখতে গিয়ে একটি ছোট ময়দানের কাছাকাছি এলুম। এদিকে অনেকগুলো ঘোড়ার গাড়ির মেরামতি আড্ডা ও আস্তাবল। কোথাও ঘোড়ার পায়ের তলায় নাল্ বসাবার আগে ছুরি দিয়ে ক্ষুরের চোক্‌লা কাটছে, কোথাও দলাই-মলাই চলছে, কোথাও বা গাড়ি জুতে ঘোড়াকে দানাপানি ও ঘাস দেওয়া হচ্ছে। ঘোড়াকে জল খাওয়াবার জন্য কলকাতা ও শহরতলীর সর্বত্র লোহা-বাঁধানো লম্বা চৌবাচ্চা থাকে। ভিস্তিরা ওগুলোয় জল ভরিয়ে রাখে। ভিস্তির চামড়াভরা জল কেনে বহু

পরিবার। কলকাতায় জলের অভাব প্রচুর। গুটি গুটি এগোচ্ছিলুম। রাস্তার নাম 'রাসবাগান লেন'। বাড়ীর নম্বর নেই। আছে বর্ণনা। লেন, বাই লেন, ফার্স্ট লেন, সেকেণ্ড লেন। সে যেন এক গোলক ধাঁধা। হঠাৎ এক ফাঁকা ছোট মাঠের সামনে এসে থমকিয়ে গেলুম।

অদূরে দরজার কাছে এক সুন্দরী মহিলা চোখের জল মুছলেন, এবং তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে বছর-দশেকের একটি ছেলে। আমি বিধুবাবুর স্ত্রীকে স্পষ্ট করে কোনও দিন চোখ তুলে দেখি নি। কিন্তু ওই ছেলেটি আমাকে দেখামাত্র এগিয়ে এল। কাছে এসে বলল, আপনি কি অমুক?

—হ্যাঁ—

—একবার আসুন, বউদিদি ডাকছেন।

আমাকে সামনে দেখেই বিধুবাবুর স্ত্রী ডুকরিয়ে কেঁদে উঠলেন। মাথায় তাঁর ঘোমটা, মুখখানি আনত!—পরনে আধময়লা যেমন তেমন একখানা মিলের শাড়ি, হাতে সেই ঘন বেগুনী রংয়ের কাঁচের একগাছা চুড়ি। ওঁর ওই প্রকার কান্না দেখে আমি হতভম্ব হয়ে গেলুম।

কিন্তু সে কয়েক মুহূর্ত মাত্র। একথা কে না স্বীকার করবে, সুন্দরী রমণীর বুক-ফাটা কান্না দেখলে পুরুষমাত্রই চঞ্চল হয়ে ওঠে? প্রশ্ন করলুম, বিধুবাবু কোথায়?

—তিনি নেই!

ছেলেটা বলল, তিনি ভোরবেলা উঠে বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে চলে গেছেন—বউদিদি ছিলেন পুকুরঘাটে।

—কোথায় গেছেন তিনি?

এবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মহিলা বললেন, আজ তিন দিন থেকে ওই বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে আমার সঙ্গে কাড়াকাড়ি করছিলেন—

—কেন?

নতমুখে মহিলা বললেন, মেয়েটাকে উনি ওই আস্তাবলের লোকদের কাছে বিক্রি করেছেন!

বজ্রাহত কণ্ঠে বললুম, বিক্রি? নিজের মেয়েকে?

ছেলেটা বলল, ওই যে ওপাড়ার আস্তাবল দেখা যাচ্ছে, ওখানে আছে মনসুর আলি, ও সব জানে।

মহিলা তেমনি করেই কাঁদছিলেন।

আমি নিজে রোগাটে, অনাহারী, দুর্বল দেহ। কিন্তু এই শুকনো কাঠের মধ্যেও অগ্নিদেবতার চৈতন্য আছে, ঠিক সময় দাউ দাউ করে জ্বলে! ইস্পাতের লিকলিকে তলোয়ার,—দরকার হলে সর্বাপেক্ষা বলবান দস্যুরও মাথা কাটে! দধীচির অতি-শীর্ণ কঙ্কাল, কিন্তু সেই কঙ্কালে বজ্রদণ্ড তৈরি হয়। আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা অতি পৈশাচিক প্রতিহিংসা যেন ধকধক করে জ্বলে উঠল। শান্ত কণ্ঠে আমি বললুম,—আমি যাচ্ছি এখন, দেখি কি করতে পারি। আবার আমি আসছি আপনার এখানে।

এ ছেলেটি কে ?

—এঁদেরই বাড়ি। আমরা একখানা ঘর নিয়ে থাকি।

আমি তখনকার মতো চলে গেলুম।

মনসুর আলিকে খুঁজে বার করতে লাগল ঘণ্টাখানেক। চেহারাটা সৌম্য। কাঁচা-পাকা দাড়ি, সিপসিপে চেহারা। সে চার-পাঁচখানা ঘোড়ার গাড়ির মালিক। তাদের দেশ বিহার শরিফে। লোকটা বাঙ্গলা বোঝে। আমি বললুম, বাচ্চা মেয়েটা কোথায়, আলিসায়েব ?

আমার চেহারা দেখে লোকটা তৎক্ষণাৎ সব বুঝে নিল। বলল, সে বাচ্চা লেড়কি আছে দো মাহিনেকা! লেকিন বাচ্চাকে নিয়ে ত আজ চলে যাচ্ছে আমার শাড়ুভাই ?

—কোথায় যাচ্ছে ? সে মেয়েকে আমি এখনই ফেরৎ চাই। ফেরৎ দেবে কিনা শুনি!

মনসুর আলি শান্ত কণ্ঠে বলল, বাবু, সাচ্ বাত শুনুন। বাচ্চার বাপটা হারামি আছে। বাচ্চাটাকে জোর করে আমার বিবির কাছে গছিয়ে দিয়ে পঁচিশঠো রুপিয়া লিয়ে গেছে। বাচ্চা মেয়েটা বহুৎ সুন্দর আছে। আমরা ফেরৎ দিতে এখনই রাজি—যদি না বাচ্চাকে রেলগাড়িতে নিয়ে গিয়ে থাকে। বাচ্চাকে লিয়ে গেছে কলাবাগানে। দোপহর বারো বাজে ট্রেন।

বসির মিঞা ফীটন নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, মনসুর আলি ওকে থামালো। বসিরকে বলে দিল, রহমৎ মিঞার কাছে এঁকে নিয়ে যা। বাচ্চা লেড়কিকো ওয়াপস দে নে কহোগে। বাবু, এই গাড়িতে আপনি এখনই চলে যান্ কলাবাগানে। টাকাকড়ির কথা পরে হবে।

আমি ছুটে গিয়ে বসির মিঞার ভাড়াটে ফিটন গাড়িতে চড়ে বসলুম। এই প্রথম উঠলুম ফিটনে। একটি বলবান ঘোড়া গাড়ি টেনে চলল।

এর পর থেকে যে ঘটনা-পরম্পরা, সে এক দুর্জয় অভিযানের মতো। রাজা-বাজারের মোড়ে বৃটিশ-প্রশাসন-বিরোধী এক মিছিলের জন্য গাড়ি আটকিয়ে গেল। বিপ্লববাদীদের একটা অংশ কর্পোরেশনে নানা কাজ নিয়ে ঢুকেছে। লর্ড লিটন এখন বাঙ্গলার গভর্নর। সমগ্র বাঙ্গলা অসন্তোষে ভরা।

আমাদের গাড়ি পটলডাঙ্গার ভিতর দিয়ে কলাবাগান বস্তিতে যখন ঢুকল, তখন পৌনে এগারোটা। সেই বস্তি ছোট ছোট সঙ্কীর্ণ গলিতে বিভক্ত। তার শাখা-প্রশাখা কোন দিক দিয়ে কোথায় গিয়ে মিশেছে বলা কঠিন। বীভৎস নোংরা ও জঞ্জাল চারি-দিকে। বসির মিঞা একপাশে গাড়ি রেখে একটি চালাঘর ঢুকল এবং এক মিনিটের মধ্যে এসে জানালো, রহমৎ মিঞা যার বিবি আর বাচ্চাকে নিয়ে পাঁচ মিনিট আগে হাওড়া স্টেশনের দিকে গেছে।

বসির মিঞার মুখে-চোখে কিছু চাতুরী ছিল। একটু গড়িমসি করছিল। সে চায় আমাদের পৌঁছবার আগে হাওড়া থেকে গাড়িখানা যেন ছেড়ে যায়।

অনেক চেঁচামেচির পর আবার ওকে নড়ালুম। গাড়িখানা এবার গলি দিে

বেরিয়ে এল হ্যারিসন রোডে আলফ্রেড থিয়েটারে কাছাকাছি। বসির এবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও গাড়ি ছুটিয়ে দিল। আমি পুলিসের ভয় দেখিয়েছিলুম।

তখন হাওড়া স্টেশনে পৌঁছতে হ'ত পুরনো পনটুন ব্রীজ পেরিয়ে। হ্যারিসন রোড ধরে সোজা পশ্চিম পথে স্ট্র্যান্ড রোড অতিক্রম করলেই সেই পুল। পথের দুধার দেখতে দেখতে যাচ্ছি আকণ্ঠ উদ্বেগ নিয়ে। আজ সেই দিনের কাহিনী যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। স্টেশনের ঘড়ি তখন চব্বিশ মিনিট পিছিয়ে চলে। এপারে এলে ক্যালকাটা টাইম্। এখন পৌনে বারোটা। সওয়া বারোটায় পাটনার গাড়ি ছাড়বে।

বসির আমার কড়া শাসনে ছিল। স্টেশনের পুলিস আপিস আমি জানি। মেয়েটাকে না দিতে চাইলে আমি যা করবার তাই করব। বসির মিঞা প্লাটফরমে এসে একখানা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় রহমৎ মিঞাকে ধরল। ওর বিবি বোরখার ঢাকা মুখের থেকে সরিয়ে আমাদের দিকে তাকাল। জানলা দিয়ে দেখলুম, ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চাটাকে ন্যাকড়া পেতে বেঞ্চের উপর ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। আমি সটান গাড়িতে উঠে গিয়ে সেই ন্যাকড়াসুদ্ধ বাচ্চা মেয়েটাকে কোলে তুলে নিলুম। আমার মনে হচ্ছিল সেদিন আমি এই বাচ্চার জন্য জীবন দিতে পারতুম! রহমতের সঙ্গে বসিরের আলাপাদি আমার বোধগম্য হ'ল না।

সেদিন বাইরে এসে ট্যাক্সি ভাড়া করেছিলুম। সেই ট্যাক্সিতে বাচ্চাকে নিয়ে যখন রাসবাগানে পৌঁছলুম, বেলা তখন একটা বাজে। মেয়ে নিয়ে ফিরেছি শুনে পাগলিনীর মতো মাঠের ধারে বেরিয়ে এলেন বিধুবাবুর স্ত্রী। লাজলজ্জা, সম্ভ্রম— সব ভুলে গিয়ে নিজের বুকের কাপড় সরিয়ে বাচ্চার কচি মুখটি স্তনের রক্তিম বিন্দুর উপর তিনি চেপে ধরলেন। পরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ওই দস্যুর হাত থেকে আপনি আমাকে বাঁচান্। আমার মা নেই, কিন্তু বাবা এখনও বেঁচে। আমি যত অন্যায় করে থাকি না কেন, বাবা আমাকে ফেলবেন না। আমি ওই বিশ্বাসঘাতকের হাত এড়াতে চাই। আপনি আমাকে দয়া করে বাবার কাছে রেখে আসুন।

মহিলার নাম নাকি অণিমা। এই কথা স্থির রইল সামনের শনিবারে আমি প্রস্তুত হয়ে এসে ওঁকে কেষ্টনগরে নিয়ে যাব।

এ কাহিনী এখানে শেষ হচ্ছে না, কেন না প্রবাসী ও বিচিত্রার হিসাব রইল বিধুবাবুর কাছে। অশ্বিনীবাবু আমাকে তাগাদা দেবার জন্য রইলেন, ছাপাখানার মানিকবাবু অপেক্ষা করতে লাগলেন এবং ভোলানাথ দত্তরা তাঁদের বিলের দরুণ টাকার অপেক্ষায় রইলেন। প্রবাসীর কর্তৃপক্ষ হয়ত বিধুবাবার বিরুদ্ধে পুলিসের হুলিয়া বার করতে পারতেন, কিন্তু তাঁরা আর অগ্রসর হন নি। বিধুবাবু বোধ হয় ভদ্রমনের দুর্বলতাগুলি জানতেন।

যাই হোক, আমার কপালে আরেকবার ডিগবাজি খাবার দুর্ভাগ্য ছিল। আমি যথানির্দিষ্ট শনিবারে শ্রীমতী অণিমাকে তাঁর পিত্রালয় নিয়ে যাবার জন্য রাসবাগানের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিলুম, কিন্তু অণিমাদেবী ও তাঁর বাচ্চা কেউ নেই বাড়িতে! শুনলাম দিন দুই আগে গভীর রাত্রে একখানা রিক্শা এনে বিধুবাবু তাঁর স্ত্রী ও

বাচ্চাকে নিয়ে গেছেন কেউ জানে না।

ছেলেটা বলল, ঘর ভাড়াও দিয়ে যায় নি। আমরা সবাই তখন ঘুমোচ্ছিলুম।

এই ঘটনার বছর চার-পাঁচ পরে আমি এই বিষয়টি নিয়ে তৎকালীন 'ভারতবর্ষে' একটি ছোট গল্প লিখি।

॥ ১৪ ॥

গরানহাটার মোড় বলতে বিডন স্ট্রীট আর চিৎপুরের সংযোগ স্থলটিকে বোঝাতো। ওখান থেকে শেয়ারের ঘোড়ার গাড়ি ছাড়ত বরানগরের বাজার পর্যন্ত। বরানগরে আমাদের আত্মীয়কুটুম্ব অনেক। শেয়ারের গাড়িতে নিত চারজন, মাথাপিছু দু'আনা ভাড়া। বরানগরে আমার এক বয়স্ক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার কথা। আলমবাজার জুট মিলে আমার একটা চাকরি জুটতে পারে এমন সম্ভাবনা ছিল।

ইস্কুলে থাকত আমরা একটি ফুটবল ক্লাব করেছিলুম। নাম ছিল গরানহাটা স্পোর্টিং। রবি সরকার ছিল তার ক্যাপ্টেন। চাঁদা ছিল মাসে দু'আনা, যেটি কোন-কোনদিন দিতে পারি নি। এই গরানহাটার পথ ধরে কিশোর বয়সে বরানগর যাবার কালে মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে একটি গোলাপী রংয়ের পুঁটলি কুড়িয়ে পাই ট্রাম-রাস্তার উপরে। ছোট্ট পুঁটলি, কিন্তু ওজন প্রচুর। পুঁটলিটা হাতে নিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলুম। এ টাকার পুঁটলি, অন্য কিছু নয়। কিন্তু এর মালিক কেউ কোনও দিক থেকে ছুটে আসছে না তবু আমার সর্বাঙ্গ থর থর করছিল উত্তেজনায়। আমাকে তখন পিছন থেকে লক্ষ্য করছিল দু'জন ঠেলাওয়ালা—তা'রা আমার পিছু নিয়েছিল। অদূরে পূর্ব ফুটপাথে এক সরকারী স্নানাগারের কাছাকাছি যখন এসেছি, তখন ওই দুটো লোক আমাকে ডেকে নিয়ে সেই স্নানাগারে ঢুকল, এবং আমার হাত থেকে পুঁটলিটা কেড়ে নিয়ে বলল, যাও, ভাগো, এ হামার চীজ হ্যায়।

আমি দাঁড়িয়ে রইলুম নির্বোধের মতো। কিন্তু ওদের তর সইল না। পুঁটলি খুলে ওরা দেখল বড় একমুঠো ঘোড়া-মার্কা গিনি। আমি হতবাক হয়ে রইলুম। জীবনে ওই প্রথম দেখলাম গিনির চেহারা কেমন!

সেদিনকার সেই বছর বারো বয়সের অর্বাচীন মূঢ় ছেলেটাকে ভয় দেখিয়ে ওরা বলল, চুরি করে পালাচ্ছিলে, কেমন? এখনো দাঁড়িয়ে থাকলে পুলিসে ধরিয়ে দেবো!

আমি শান্তভাবে বেরিয়ে গেলুম সেই স্নানাগারের ভিতর থেকে। বাড়ী ফিরে ঘটনাটা বলেছিলুম। মা আমাকে আদর করে বলেছিলেন, পরের জিনিসে নাই বা লোভ করলি! বরং এই ত ভাল, যত ঠকবি ততই শিখবি! যা, খেলাধুলো করগে. যা—কাঁদিসনে—।

যাই হোক, বরানগরের কাজ সেরে যখন আবার গরানহাটার মোড়ে এসে গাড়ি

থেকে নামলুম, বেলা তখন আন্দাজ সাড়ে দশটা। আগের দিন রাত্রে ছিল পূর্ণিমার চন্দ্রগ্রহণ। আজ ভোর থেকে পথে পথে গঙ্গাস্নানের যাত্রীদের খুব ভিড় লেগেছে। সেই ভিড়ের ভিতর দিয়ে যখন ছাতুবাবুর বাজার ছাড়িয়ে পূবদিকে কিছু দূর এগিয়েছি, তখন হঠাৎ পাশ থেকে এক নারীকণ্ঠ আমাকে ডাকল, রাম নাকি রে ?

থমকিয়ে ফিরে তাকালুম। কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবিষ্কার করলুম, এ সেই নিবারণ দাসের বউ কেষ্টদাসী। তেমনি সুশ্রী চেহারা আর সুন্দর স্বাস্থ্য। গলায় তেমনি বোষ্টমের পাঁচনরী, কণ্ঠী, গায়ে রেশমী একখানা চাদর জড়ানো, পরনে সরু কালাপাড় একখানা ধুতি। পা খালি।

হেসে বললুম, অনেকদিন পরে দেখা। বোধ হয় সাত-আট বছর হবে !

কেষ্টদাসী আমাকে তুই না বলে তুমি বলল,—কী ঢ্যাঙ্গা হয়েছ ? অথচ আমার চেয়ে তুমি পাঁচ বছরের ছোট। আজকাল আছ কোথায় তোমরা ? মাসিমা কেমন আছেন ? তোমার দাদারা, দিদিরা, বউদিদি—সব ভাল ত ? তোমার ছোড়দার বিয়ে হয়েছে ? দিদিমা আছেন ত ? তোমাদের সেই যমদূতের মতন মামা ?

একরাশি প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে চললুম। বেথুন কলেজের কোণে ট্রাম রাস্তার মোড়ে এসে কেষ্টদাসী বলল, না, না—এখন বাড়ী ফিরতে হবে না। আমাদের ওখানে চল। এই ত গোয়াবাগানের মোড় ছাড়িয়ে আরেকটু এগোলেই আমাদের বাড়ী—উঃ—

—কি হল ?

কি যেন ফুটল পায়ের তলায় !—বলতে বলতে হেঁট হয়ে কেষ্টদাসী পায়ের তলাটা ঝাড়ল তার হাত দিয়ে। একবার পা ফেলল। না, যায় নি। ভিতরটায় বেশ লাগছে, খচখচ করছে।

ওই নিয়েই কেষ্ট দাসী ট্রাম রাস্তা পেরিয়ে হেদুয়া আর স্কটিশ কলেজ ছাড়িয়ে নিরিবিলি ফুটপাথ ধরে চলল। সে আমার বয়সের থেকে অত বড়, আমি তার নির্দেশ অমান্য করতে পারিনে। একদা লুকিয়ে লুকিয়ে আমি ওর ফাই-ফরমাশ খেটে দিতুম, নিবারণ দাসকে লুকিয়ে ওকে খাবার এনে খাওয়াতুম,—তাই কেষ্টদাসী আমাকে খুব ভাল বাসত।

একটি পান-চুরোট-তামাক মেলানো ছোট বেনের মসলার দোকানের সামনে এসে কেষ্টদাসী দোকানের লোকটিকে বলল, নুটু, একে চিনতে পারিস ? এ সেই খোকা, যার কথা তোকে বলতুম।

নুটু হাসি মুখে তাকাল আমার দিকে। বলল, আপনাদের সব কথা মাসির মুখে শুনেছি। মাসি, তুমি ওকে ছেড়ো না। আজ পার্বণের দিন, ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে দাও। আপনি থেকে যান রামবাবু, এখানে চানটানের কিছু অসুবিধে হবে না।

আমি বললুম, তা মন্দ কি, ভালমন্দ একদিন খেয়েই যাই !

দোকানটির গায়ে সরু একটি গলি, তারই ডানদিকে এক তেলেভাজা খাবারের দোকান। এই দোকানের বাড়ি একতলা। কেষ্টদাসী আমাকে নিয়ে গলির ভিতরে

এক পুরনো বাড়িতে ঢুকে একতলার ছাদে এনে তুলল।

ছাদ খুব বড় নয়। তার দক্ষিণ দিক ঘেঁষে উত্তরমুখী ঘরখানায় কেষ্টদাসী থাকে। পাশেই ছোট একটি করোগেটের চালা। চালার পাশেই একটা কলতলা। একজন মাত্র ব্যক্তির পক্ষে আদর্শ বাসস্থান।

ঘরে এসে গায়ের চাদরখানা খুলে রেখে কেষ্টদাসী পা ধুয়ে এল। আমি তক্তাখানার উপর বসে বললুম, দাসমশাই কদ্দিন মারা গেছেন, দাসীদি?

হাসিখুশী মুখে কেষ্টদাসী বলল, বেঁচেছি,—এই চার বছর হল। আমার সব জ্বালা জুড়িয়েছে। আমি মুক্তি পেয়েছি, খোকা। তুমি ত দেখেছ কতবার, আমার পিঠে আর গায়ে কালশিরের দাগ দিনের পর দিন। এগারো বছরে আমার বিয়ে হয়েছিল, বাইশ বছর বয়স অবধি শুধু ওই ভণ্ড বোরেগীর হাতে মার খেয়েছি। সেই মার খেয়ে তোদের কাছে লুকোতুম। আমার কান্না দেখে তোরা যখন কারণ জানতে চাইতিস, আমি বলতুম, প্রেমাশ্রু! মনে পড়ে?

—খুব মনে পড়ে!—আমি হাসতে লাগলুম।

পাশে এসে একবারটি বসে ছিল দাসীদি। এবার উঠে আমার গায়ের জামাটা ও গেঞ্জিটা ছাড়িয়ে নিল। এসব তার অনেককাল আগের অভ্যাস, আমি তখন খুব ছোট। দাসীদি বলল, বড্ড ময়লা করেছিস জামা-কাপড়। দাঁড়া, আমি সব সাবান দিয়ে কেচে দিচ্ছি। এই নে, একখানা চাদর জড়িয়ে থাক্‌। ধুতিখানাও ছেড়ে দে।

কেষ্টদাসী গায়ের আঁচলটা পিছন দিক থেকে ঘুরিয়ে আলগা গা ঢেকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে নিচের তলার দিকে গেল। ওর ঘরটিতে আসবাবপত্র বেশ গোছানো। দরজার পাশে ওর পুজো-আহ্নিকের জায়গা। কাঁচের বাক্সের মধ্যে বিষ্ণুমূর্তি, গৌর-নিতাইয়ের ছবি,—প্রতি বাক্সের কাঁচ চন্দনের ছিটে দেওয়া। রোশন-চৌকিতে পুজোর বাসন সযত্নে সাজানো। একখানা পশমের আসন উলটিয়ে রাখা। আলনায় ঝুলছে যোগিয়া রংয়ের আরেকখানা চাদর, একখানা পাটকরা কালা কাশিপাড় শাড়ি, নতুন গামছা একখানা, একটি প্রমাণ সাইজের সেমিজ। এ-ছাড়া প্যাটরা-বাক্সগুলি বেশ গুছিয়ে রাখা। একটি র‍্যাকের ওপর কয়েকখানা বই গোছানো। রামায়ণ-মহাভারত ছাড়া প্রহ্লাদ চরিত্র, অন্নদামঙ্গল, সাবিত্রী উপাখ্যান, নল-দময়ন্তী, শ্রীবৎস-চিন্তা, বেহুলা-লখিন্দর প্রভৃতি বটতলায় ছাপা কয়েকখানা বই। সরু তক্তাখানায় একজনের মতো বিছানা পড়তে পারে।

মিনিট দশেক পরে কেষ্টদাসী ফিরে এল। হাতে তার দু' ঠোঙ্গা খাবার। ঘরে এসে বলল, মুখখানা তোর শুকিয়ে গেছে। কিছু খেয়ে নে।—ওরে, আমার পায়ের তলাটা ভারি কষ্ট দিচ্ছে। কী যে ফুটল!

একখানা কাঁসার থালা এনে সে ঠোঙ্গা দুটো রাখল। তারপর তক্তায় বসে নিজের পায়ের তলাটা দেখল হাত বুলিয়ে। খচখচ করে খুব লাগছে।

বললুম, একটা ছুঁচ দাও, দেখি কি ফুটেছে।

কেষ্টদাসী ছুঁচ বার করে এনে ঠিক হয়ে বসল। আমি ওর একখানা পা আমার

হাতের কাছে টেনে নিলুম। তারপর হেঁট হয়ে সাবধানে ছুঁচ দিয়ে একটু একটু খুঁচিয়ে অবশেষে ছোট্ট একটি কাচের কণা বার করে দিলুম। সে খুব স্বস্তি পেল।

অতঃপর পাখানা সরিয়ে নিয়ে হাসিমুখে কেষ্টদাসী উঠে দাঁড়াল। তারপর থালায় রাখল মিষ্টান্ন, গরম গরম বেগুনি আর পেঁয়াজবড়া। খুশী হয়ে বললুম, মনে পড়ে এমনি পেঁয়াজবড়া এনে তোমাকে ছাদে ডেকে চুপি চুপি খাওয়াতুম?

কেষ্টদাসী বলল, এখন আর এসব ভাবতে নেই রে, এখন আমি বিধবা!

—মানে? তুমি খাবে না আমার সঙ্গে?

—খেতে নেই রে!

তৎক্ষণাৎ আমি উত্তপ্ত হয়ে উঠলুম। উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, দাও আমার ধুতি, জামা আর গেঞ্জি, এক্ষুণি আমি চলে যাব।

আমার পথ আড়াল করে দাঁড়াল কেষ্টদাসী। বলল, তুই বিধবার আচার-বিচার নষ্ট করতে চাস?

আমার কণ্ঠে উত্তেজনা ছিল। ফস করে বললুম, তুমি কোনদিন সধবা ছিলে না, দাসীদি!

কেষ্টদাসী চুপ করে গেল। নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তুই ঠিকই বলেছিস্ রাম। দে, আমার মুখে তুলে দে। তুই ব্রাহ্মণ, তোর হাতেই প্রথম খাই। তুই আগে কামড় দে, বাকি আধখানা আমার মুখে পুরে দে।

তাই করলুম। সাত-আট বছর পরে মাত্র ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দু'জনে যেন পরমাত্মীয় হয়ে উঠলুম। একে একে সবগুলি খাচ্ছিলুম দু'জনে। হঠাৎ এক সময় মুখ তুলে দেখি কেষ্টদাসীর চোখ বেয়ে জলের ধারা নামছে। সে যে কাঁদছিল বুঝতে পারি নি এতক্ষণ। যাই হোক, এক সময়ে সে উঠে দাঁড়াল। বলল, এ আনন্দ জীবনে পাব, এ কখনও ভাবি নি। দাঁড়া খাবার জল এনে দিই। তুই একটু বিশ্রাম কর, আমি কাজকর্ম সারি, রান্না চড়াই। কেমন?

কেষ্টদাসী ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে রাজকৃষ্ণ রায়ের 'প্রহ্লাদ চরিত্র' গ্রন্থখানি বের করে আমার কাছে দিয়ে বলল, মনে আছে তোর, মাসিমা আমার উৎপীড়ন দেখে এ বইখানা উপহার দিয়েছিলেন? তোর মাকে আমি দেবী মনে করি রে! ওঁর মুখে আদ্যাস্তোত্র পাঠ কোনও দিন ভুলব না।

কেষ্টদাসীর উৎসাহ লক্ষ্য করার মতো। সে রান্নাঘরে গিয়ে তোলা উনুনে আগুন দিল, তারপর সাবান দিয়ে আমার কাপড়জামাগুলো কেচে নিংড়িয়ে ঝেড়ে ছাদের রোদে শুকোতে দিল। এক সময় ঘরে এসে বলল, এই নে, তোর জামার পকেটে ছিল তিন আনা পয়সা আর এই আধখানা পোড়া সিগ্রেট। তুই বুঝি আজকাল সিগ্রেট খাস? খুব লায়েক হয়েছিস দেখছি।

বইখানার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আমি সলজ্জ হাসি হাসছিলুম।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নুটু উপরে এসে গেল বার দুই। আমি অতিথি, সুতরাং রান্নাঘরে একটা আয়োজন ছিল বইকি। দ্বিতীয়বার এসে নুটু আমার কাছে বসল।

সে আমার সমবয়সী।

বললুম, দোকানের কাজকারবার কেমন?

নুটু বলল, মোটামুটি ভালই। তবে কি জানেন, লোকে বড্ড বেশি ধার চায়। চেনা লোককে ধার না দিয়ে উপায় থাকে না। ওতে টাকাপয়সাও মার যায়। লোক রেখেছি দুটো, ওরা দশ-দশ কুড়ি টাকা পায়। এদিকে মাসি আর আমি। বাড়িটা নিজের, এই যা সুবিধে। হ্যাঁ, যা বলতে এসেছিলুম। আপনি থেকে যান না মাসির এখানে দু'চারদিন? এখানে কোনও অসুবিধে নেই। তবে মাসি ত মাছ ছোঁয় না, আমি নিচের ঘরে মাছ রান্না করে নিই। অনেক সময় হোটেল থেকেও রান্না মাছ আনিয়ে নিই। দু'আনা লাগে এক প্লেট,—বড় বড় দু'খানা রুই মাছের গাদা। চমৎকার রান্না।

নিচের থেকে ডাক এল নুটুর। সে উঠে চলে গেল।

আমি গুটি গুটি এগিয়ে কেষ্টদাসীর রান্নাঘরে ঢুকলুম। সে বেশ ফলাও করে গুছিয়ে নিয়ে বসেছে। আমাকে বলল, পিঁড়েখানা টেনে নিয়ে বোস।

বললুম, এ যে অনেক আয়োজন। শুক্তো, ডাল, পোরের ভাজা, ছানা, কড়াইশুঁটির ডালনা, লাউ-বড়ির ঘণ্ট,—করেছ কি?

কেষ্টদাসী বলল, মাছরান্না আসছে তোর জন্যে।

—মাছ!—আমি চটে উঠলুম,—মাছ আনলেই ফেলে দেবো। তুমি যা খাও না, আমি তা মুখেও তুলব না। এখনি মানা করো নুটুকে।

কেষ্টদাসী বলল, আমি জীবনেও মাছ ছুঁই নি রে। আঁষটে গন্ধে আমার বমি আসে। আচ্ছা, আমি বলে দিচ্ছি নুটুকে।

স্নান করতে যাবার আগে আমি বললুম, আচ্ছা দাসীদি, আমি যে তোমাকে এক-এক সময় মাছের চপ এনে লুকিয়ে খাওয়াতুম, তোমার মনে পড়ে না?

এলোচুল পিঠের উপর ফিরিয়ে কেষ্টদাসী বলল, ওটা ছিল বোরেগীর ওপর রাগের কথা। ওটা প্রতিশোধ। লোকটা যত বেশি শাসন করত, তত বেশি বিগড়ে যেতুম। আমাকে জিদ পেয়ে বসত। লোকটাকে ঠকাতে পারলে, ধাপ্পা দিয়ে মিছে কথা বলতে পারলে খুশী হতুম।

—তোমার মুখে পেঁয়াজের গন্ধ পেত না?

কেষ্টদাসী আমার দিকে তাকাল। চেয়ে রইল কতক্ষণ। পরে বলল, মুখের কাছে মুখ এনেছে কোনদিন? ওর পায়ের তলায় ঘরের এক কোণে পড়ে থাকতুম। ওর লম্বা লম্বা মুলোর মতন দাঁত দেখলে ভয় হত!

ফস করে আমি বললুম, আমার বেশ মনে পড়ে দাসীদি, মেজদি আর বড়বউদি বলাবলি করত—তোমার মতন এমন সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ওই বুড়ো-হাবড়া দাঁতালো লোকটার কেমন করে বিয়ে হয়!

কেষ্টদাসী প্রায় রান্না শেষ করে আনছিল। ভাত হয়ে গেছে। ডালনা নেমেছে। পোরের ভাজা ক'খানা শুধু বাকি। কেষ্টদাসী বলল, মেয়েদের ইচ্ছেতে কি আর

এদেশে বিয়ে হয় রে? তা যদি হত তাহলে হাজার হাজার পুরুষকে লাথি খেয়ে ফিরে যেতে হত!

উনুনের আঁচের আভায় কেষ্টদাসীর রক্তিম মুখখনায় যে-ঘৃণার চেহারা দেখলুম, তাতে ওর জীবনের ব্যর্থতাটাই প্রকাশ পেল। কিন্তু আমিও ত পুরুষ, আমিই বা ছাড়ব কেন? ঈষৎ ক্ষুব্ধকণ্ঠেই বললুম, সব রকমেই লোকটাকে গালাগালি করছ। তবু একটা কথা থেকে যাচ্ছে, দাসীদি। রাত্তিরে দরজায় খিল এঁটে ওই জন্তুর সঙ্গেই ত তুমি সহবাস করতে।

—সহবাস!—যেন গর্জিয়ে উঠল কেষ্টদাসী,—সহবাস মানে কি তুই জানিস?

আমিও উত্তেজিত হয়ে বললুম, এক ঘরে এক সঙ্গে থাকলে তাকে কি সহবাস বলে না?

এবার হঠাৎ হেসে উঠল সে। বলল, তুই চিরকাল একটু বোকা। ওই জন্যেই তোর ভগ্নিপতিরা তোকে রামখোকা বলে খেপাতো। যা, চান করে আয়। মেয়ে-পুরুষ এক ঘরে থাকলেই তাকে সহবাস বলে না।

আমি উঠে স্নান করতে গেলুম। সুগন্ধী সাবান মেখে স্নানটা ভালই হ'ল।

ফিরে এসে দেখি ঘরের মধ্যে ঠাঁই করে আসন পেতে কেষ্টদাসী ভাত বেড়েছে। গরম ভাতে ঘি খাবার জন্য একটা মায়ের কাছে আবদার ধরতুম, তার মনে আছে। সেজন্য সে ভাতের মুণ্ডির ওপর গাওয়া ঘি দিয়েছে। পাথরের বাটিতে একবাটি চিনপাতা দই। সে জানে আমি দইয়ের পরম ভক্ত।

কেষ্টদাসী তখনও হাসছিল। কিন্তু খেতে বসবার আগে সে চন্দনের বাটি থেকে চন্দন নিয়ে আমার কপালে, হাতে ও পিঠে মাখিয়ে দিল। তারপর জবাকুসুমের শিশি থেকে কয়েক ফোঁটা তেল নিয়ে আমার সাবানঘষা মাথার চুলে বেশ করে মাখিয়ে চিরুনি দিয়ে আঁচড়িয়ে দিল।

আমার মনে পড়ছিল সেই শুলী-মোহান্তর আখড়ার সহজিয়া মানদাকে। সেখানে ছিলুম আমি ঠাকুর-গোঁসাই, পরম গুরু, শ্রদ্ধার দ্বারা পূজিত। কিন্তু এখানে সখী-ভাব। সখীভাবে যেন সেই চিরকালীন শ্রীরাধা।

দু'জনে মুখোমুখি খেতে বসেছিলুম।

নুটুর কথা উঠল। কেষ্টদাসীর বাবার প্রথম পক্ষের বড় মেয়ে মিলি, তারই ছেলে নুটু। নুটুর দোকানের সব উন্নতি মাসির আশীর্বাদে। মাসি পয়মন্ত। কেষ্টদাসীর সব খরচ দেওয়া ছাড়াও নুটু ওর হাতখরচ দেয় মাসে দশ টাকা। কাপড়, চাদর, লেপ, বিছানা এটা ওটা—এসব খরচ আলাদা। নুটুর বিয়ের জন্য কেষ্টদাসী মেয়ে দেখছে।

আমি বললুম, ভালো করে মেয়ে দেখে এনো। ঘর ভালো দেখে নিয়ো। নইলে তোমার অন্ন উঠবে! মনে রেখো, বিয়ের পর মা-বাপ পর্যন্ত পর হয়!

নুটুদের আমিষ রান্না হয় নিচে। কেষ্টদাসী এক সময় গিয়ে দেখে এল, এবং নিশ্চিন্ত হয়ে আবার উঠে এল।

—ওকি, গায়ে জামা দিচ্ছিস যে? এখন যাওয়া হবে না।—এই বলে সে পুব-

জানালাটা বন্ধ করে দিল। ও বাড়ী থেকে এ ঘরের ভিতরটা দেখা যায়।

কেষ্টদাসী আমার জন্য এনেছে চারটে সিগারেট। খুব খুশী হলুম আমি। কাগজের মোড়ক খুলে সে আমার মুখে আগে একটা পান পুরে দিল। ওর থেকে আমি ওর মুখে দিলুম একটা। তারপর ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে কেষ্টদাসী মুখে একটা সিগারেট দিয়ে দেশলাই জেবলে ধরল। হাসি মুখে আমি বললুম, মাছ না হয় তুমি খাও না, কিন্তু একটা সিগারেট খেতে দোষ কি?

কেষ্টদাসী আমার পাশে তক্তায় শুয়ে একখানা হাতের ওপর মাথাটার ভর দিয়ে বলল, তা আমি খেতে পারি। বেশ ত, তুই একবার টান, আমি একবার টানি।

দু'জনে মিলে একটা সিগারেট বেশ আনন্দ করে টানছিলুম, এমন সময় কেষ্টদাসীর গলায় বিশম লাগল। বিশমটা বেড়ে উঠল পলকের মধ্যে। আমি উঠে বসে ওকে তুললুম। ধোঁয়া গেছে ওর গলায় আটকিয়ে। কাশতে কাশতে ওর দম আটকাবার যোগাড়। এক সময় ওর বিশম থামল। ওর মুখ-চোখ রাঙ্গা হয়ে উঠেছে। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে জল এনে ওর মুখে চোখে বুলিয়ে দিলুম।

কেষ্টদাসী লজ্জা পেয়েছিল। সেই জন্য সে কিছুক্ষণ মুখ গুঁজে পড়ে রইল। আমাদের দুজনেরই গায়ে সাদা চন্দনের সুগন্ধ, তার ওপর ওর ভাঙ্গা চুলের রাশি ছড়িয়ে পড়েছে আমার হাতের ওপর তার ফুলেলা গন্ধ নিয়ে। এবার ও সুস্থ হয়েছে।

যখন ছুটি নিলুম, প্রায় তখন সন্ধ্যা। কেষ্টদাসীর ইচ্ছা ছিল, রাতটা এখানে থেকে যাই। আমি বললুম, বাড়ী চিনে গেলুম, আবার একদিন আসব।

ইতিমধ্যে সে আমার জন্য একজোড়া সন্দেশ এনে রেখেছিল। বিদায় নেবার আগে সন্দেশ দুটো আমাকে খাইয়ে তবে ছাড়ল।

আমার সহপাঠী বিজন প্রায়ই বলত, হুগলি ডিভিশনের পোস্টাল সুপারিনটেন্ডেন্ট আমার মামা। তুই দরখাস্ত করবি একখানা? পোস্টাল পরীক্ষায় পাস করলে চাকরি হয়। একটা চান্স নে না? সামনের মাসেই ওদের পরীক্ষা হবে।

দরখাস্ত একখানা পাঠিয়েছিলুম। এক সপ্তাহের মধ্যে জবাব আসায় বুঝতেই পারলুম, বিজন গিয়ে ওর মামার কাছে আবদার ধরেছিল।

মাসখানেকের মধ্যে জেনারেল পোস্ট আপিসের পিছনের লালবাড়ির একটি হ'ল-এ গিয়ে পরীক্ষায় বসলুম। ইংরেজি ডিকটেশন, এরিথমেটিক, বাংলা আর সেই মোটা পোস্টাল গাইড বইখানা থেকে প্রশ্ন। যথাসময়ে ফলাফল জানলুম, পোস্টাল গাইডে চার নম্বরের জন্য ফেল মেরেছি, বাংলা আর অঙ্কে ভালই, তবে ডিকটেশনে ফার্স্ট হয়েছি। আমাদের ইস্কুলে প্রায়ই স্কচ সাহেবদের কাছ থেকে ডিকটেশন নিতে হত। আমার কান খাড়া থাকত এবং বানান ভুল করতুম না।

যাই হোক, পরীক্ষার ফল শুনে যখন হাঁ করে বসে আছি, এমন এক দিনে আলমবাজার জুট মিল থেকে খবর এল, অমুক দিন অমুক সময়ে অমুক সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে পার।

লাফিয়ে উঠলুম সেই ময়লা কাগজের তিন লাইন চিঠি পেয়ে। যথানির্দিষ্ট দিনে আলমবাজার মিলের মধ্যে গিয়ে ঢুকলুম। চিঠিখানা সঙ্গে নিয়ে এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সাহেবের কাছে হাজির হলুম। লোকটা পাইপ মুখে দিয়ে আমার আপাদমস্তক দেখে বলল, টুমি টো ভড্ডলোক আছো! হামি চাই মজডুর! এক টাকা ডেলি। ইটোয়ারে মজডুরি নেই, শনিচরে হাফ।

হাসি মুখে বললুম, আমি পারব, স্যার।

—টুমি এ-বি-সি, ওয়ান-টু-থ্রি বসাতে পারবে? লিখা-পড়ি জানো?

সাহেবের ধারণা, এসব কাজে নিরক্ষররাই আসে মজুর হয়ে। আমি সহাস্যে বললুম, আমি সব কাজ পারব।

সাহেব বেল বাজিয়ে চাপরাসীকে ডেকে বলল, ইনকো লে যাও সর্দারকে পাস। হাফ প্যাণ্ট অওর গেঞ্জি দে দো। মোতায়েন হো গৈ।

মস্ত গোঁফওয়ালা এক স্থূলকায় হিন্দুস্থানীর কাছে আমাকে নিয়ে এল। লোকটা আমার পুরনো নামটাই টুকে নিল,—কাশীনাথ শর্মা।

—শর্মা। তুম বামন হ্যায়?

ফস করে বললুম, আমি কাজ করতে এসেছি। আমি মজদুর।

আমার কাজ জুটে গেল। পরনে হাফপ্যাণ্ট আর গেঞ্জি, হাতে আলকাতরার টিন আর মোটা তুলি। প্রথম আরম্ভেই লোহার পাত দিয়ে প্রায় পঞ্চাশটা বাঁধানো পাটের গাইটের উপর রোমান হরপের সঙ্গে নম্বর বসানো। সেই বিধুবাবুর মন্ত্র আমার মধ্যে কাজ করছে, 'ডিগনিটি অফ লেবার!'

বিরাট এক-একটা হলে এক সঙ্গে বোধ হয় হাজার মেসিন চলছে। পাটের এত ধুলো আগে জানতুম না। নাকে কাপড় বেঁধে মজুররা মেসিনের কাজে যোগান দিচ্ছিল। সর্দার বলেছে, সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা পাঁচটা। মাঝখানে এক ঘণ্টা টিফিন। টিফিনের আগে ভেঁপু বাজবে।

অপরিসীম উৎসাহ নিয়ে আমি কাজে মেতেছিলুম। দু' ঘণ্টার কাজ আমার হাতে দেড় ঘণ্টায়। মিলের পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গা। চারদিক কী সুন্দর। যে-সব সাহেব কর্তাব্যক্তি তাদের ভাল ভাল দোতলা কোয়ার্টার। তেমনি ফুলের বাগান, মনোরম পরিবেশ। কাজকর্মের মধ্যে যখন ডুবে আছি, তখন একজনই মজুর বলল, ওভারটাইমু ঘণ্টা চার আনা!

সব জায়গাতেই ওভারটাইম। আসলের চেয়ে সুদ মিষ্টি! ওভারটাইমের পয়সায় রাহাখরচ আর জলখাবার ছাড়াও হাতে কিছু থাকে। আমার ওপর ভার পড়ল চটের থলে গুনে গুনে ঠিক জায়গায় নম্বর দিয়ে স্ট্যাক করা। আমি স্থির করলুম, সকাল সাতটায় রোজ এসে পেঁছিব, এবং সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত কাজ করে 'টাইম' জমা দেবো। ছুটির দিন কাজ করলে আরও ভাল। দু'টাকা ডেলি শুনলুম।

চটের থলে গুনতে গুনতে নিজের অর্থনীতিক সৌভাগ্য গণনা করছিলুম। প্রত্যেক মাসে হার্ড ক্যাশ অন্তত করকরে চল্লিশ টাকা নিয়ে তবে যায়! তবে হ্যাঁ, মেয়ে-

ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশার কথা ভুলতে হবে। বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডাবাজি আর আর চলবে না! গড়ের মাঠে খেলা দেখা শেষ করো! সিগারেট ছেড়ে দেওয়াই ভাল। আর সাহিত্য? ওসব বেকারের বিলাপ! ঘরের মধ্যে বসে অলস রস-কল্পনার ফেনা! ওতে কালি, কলম ও কাগজের বাজে খরচ। না, আর আমি ওতে নেই!

নাচতে নাচতে শ্যামপুকুরের বাড়িতে গিয়ে মাকে জানালুম, বুঝলে মা, মন দিয়ে খাটতে পারলে মাসে বেকসুর চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা! তবে আমাকে কি করতে হবে জানো, মা? শ্যামপুকুর থেকে আলমবাজার—যেতে আসতে আট থেকে দশ মাইল! রোজ অতটা যাওয়া ভোরে উঠে…একটু কষ্ট হয়। আমি হয় যাব আহিরিটোলা থেকে ইস্টিমারে, আর নয়ত—

—নয়ত কি?

সলজ্জ কণ্ঠে বললুম, তুমি ত আর দেবে না, শুনে কি হবে?

হাসিমুখে মা বললেন, বুঝেছি তোর মতলব। মুখপোড়া, কেনু তবে একখানা সাইকেল! যা লাগে দেবো।

—দেবে? সত্যি দেবে বলছ? না চাইতেই দেবে?

মা বললেন, কাল গিয়ে দর জেনে আসিস।

সেদিন রাত্রে আমার ঘুম হয় নি। আমি পুরুষমানুষ, এনে খাওয়াব সবাইকে, এই ত আমার নীতি। আমি নেবো, আদায় করব, অন্যের তহবিলের দিকে তাকাবো—এ উদ্দেশ্য আমার নয়। মনে মনে প্রার্থনা করলুম, আমি যেন মায়ের এই ভালবাসার যোগ্য হতে পারি। কিন্তু তাই বা বলি কেমন করে? আমি যে ভয়ানক অবাধ্য। আমি অপরিণামদর্শী। আমার নিয়মানুগত্য নেই, শৃঙ্খলা সদাচার সামাজিকতা চরিত্রনিষ্ঠা—এসব কিছুই নেই যে আমার। আমি দেখতে পাচ্ছি আমার শাসন-বাঁধন-হীন মন যেতে চাইছে একটা বন্য জীবনে, রস যেখানে নিবিড় ও একান্ত,—আমি যেতে চাইছি সেই উচ্ছৃঙ্খল অবারিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার দিকে, মানুষ যেখানে সহসা পেঁছয় না!

যে-সাইকেলখানা আমি কিনলুম, তার নাম হ'ল রাজ্-হুইট্‌ওয়ার্থ্। বেশ ভাল জাতের খাঁটি জিনিস। সঙ্গে নতুন ধরনের বেল্, আলো, পিছন দিকেরও লাইট্, তার সঙ্গে কিছু যন্ত্রপাতি, সলিউশন্, খানিকটা রবার—যেন সালঙ্কার একটি অন্তঃপুর সম্পত্তি। সবসুদ্ধ দাম পড়ল প্রায় দেড়শ' টাকা। ভোরবেলা কিছু খেয়ে দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে আলমবাজারে গিয়ে পেঁছই। সাইকেল চড়ায় আমার সামান্য একটু নাম খ্যাতি ছিল। আমাকে তখন বেশ চিনত সমর শা, চরণা মিত্তির, সুধা বোস—প্রভৃতি যারা বড় বড় সাইক্লিস্ট। যাই হোক, চটকলে গিয়ে আমি ভূতের মতন মেহনত করতুম এবং খাকি হাফপ্যান্ট ও ময়লা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে আমি আমার কর্ম-জীবনে ডুবে যেতুম। প্রভাতকালে আসবার সময় বাড়ী থেকে আমার অতি প্রিয় যে সামগ্রী খেয়ে আসতুম সে হ'ল চারটি পান্তাভাত আর পেঁয়াজচচ্চড়ি, আর নয়ত বাসি রুটির সঙ্গে একডেলা গুড়। দুটোই উপাদেয়। টিফিনে খেতুম মজুরদের দলের

সঙ্গে ছাতুর তাল, কাঁচালঙ্কা আর পাকা কলা। চার পয়সার টিফিনে পেট ভরে যেত। ওভারটাইমে খেতুম না।

আমি ওই সুপারভাইসার সাহেবটির সুনজরে পড়বার চেষ্টা করে সাফল্য লাভ করেছিলুম। সপ্তাহ তিনেক বাদে লোকটা যখন জানল আমি কলেজে পড়া ছেলে, ব্যাকরণ-ভুল-করা ইংরেজি বলতে পারি হোঁচট খেয়ে খেয়ে এবং হকি ও ফুটবল ভালই খেলি, তখন ওই লোকটা একদিন আমাকে তুড়ি ও শিস দিয়ে কুকুরকে ডাকার মতো করে ডাকল, এবং ওর প্রসন্ন মুখখানার দিকে চেয়ে শ্বেতচর্মী'র প্রতি আমার বহুদিনের ঘৃণা ভুলে গেলুম। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটা বলল, টুমার কাজে হামি সন্‌টোস হইয়াছি।—ডো মাহিনা কাম করো। হামি টুমার উন্নটি করিয়ে দেবো।

আমাকে সাপ্তাহিক মজুরি দেওয়া হত। এক মাস পরে হিসেব করে দেখলুম, আমি একান্ন টাকা উপার্জন করেছি। খাটলেই পয়সা! মোট পাঁচ টাকা এক মাসে আমার হাতখরচ। বাকি টাকা প্রণামী দিলুম মাকে!

সন্ধ্যার পর ফিরে আমার প্রথম কাজ সাইকেলটি ঝাড়ামোছা। ওটাই যেন আমার বিশ্রামের অঙ্গ। জীবনে আমি এই প্রথম আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু পেয়েছি। ওর দুই চাকায়, স্পোকে, চেনে, বল-বেয়ারিং-এ, ওর দুটো আলো আর সীটে—ওর প্রতিটি অঙ্গের সঙ্গে আমার করুণ ভালবাসা মিলিয়ে ছিল। স্থির করেছিলুম, সপ্তাহে একদিন ওকে বিশ্রাম দেবো। আমি সেদিন হাঁটব, কিন্তু ওর বিশ্রাম দরকার। ও আমার জীবনে এনেছে গতি, আনন্দ আর সাচ্ছল্য। সাইকেলটি ঝাড়ামোছার কাজটা আমার পক্ষে যেন সেবা ও শুশ্রূষার কাজ। ওর সমস্ত কলকব্জা আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে ও যেন চিরদিন সুখে থাকে, ও যেন নিত্য জাজ্জ্বল্যমান হয়ে বিরাজ করে। ওর দিকে চেয়ে চেয়ে ওর কথা ভেবে ভেবে আমার আনন্দের আর সীমা থাকে না।

এক গরীব গৃহস্থ-ঘর থেকে হঠাৎ এক কথায় দেড়শ টাকা বেরিয়ে এল, এটার পিছনে সামান্য কথা আছে বইকি। দিদিমা তাঁর বাড়ি বিক্রি করে মাকে কিছু টাকা দিয়ে কাশী চলে যান। মায়ের ইচ্ছা ছিল, কোথাও এক টুকরো জমি কেনা,—পরে ছেলেরা সেই জমিতে ঘর তুলবে। এই সূত্রে মা শিশির ভাদুড়ীকে একবারটি ডেকে পাঠান, কারণ ওঁদের এক টুকরো জমি ছিল সাঁতরাগাছির চৌধুরীপাড়ায় ওঁদের পুরনো ভিটের সামনে। শিশিরবাবুরও ইচ্ছা, ওই সাত কাঠা জমিটুকু আমরা নিই। মা এই সূত্রে শিশিরবাবুর হাতে কিছু টাকা দেন। বড় বউদিদির পায়ের ধুলো নিয়ে তিনি বলে যান মনোমোহন নাট্যমন্দিরের ওপর নোটিশ পড়ে গেছে, ওটা ভেঙ্গে সেণ্ট্রাল অ্যাভেনু (বর্তমানে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনু) টানা হবে বাগবাজার এবং ডান দিকে ঘুরে শ্যামবাজারের পাঁচ-মাথা পর্যন্ত। সুতরাং আমাকে এখন নতুন থিয়েটার করতে গেলে অনেক টাকার দরকার। এ টাকা আমার কাজে লেগে যাবে।

অতঃপর মনোমোহন পাঁড়ে মশায়ের থিয়েটার-বাড়ি ভাঙবার আগেই শিশিরবাবুরা উঠে গিয়ে কর্নওয়ালিশ থিয়েটার ভাড়া নিয়ে ওর নামকরণ করলেন 'নাট্যমন্দির'। ওঁদের গৌরবের যুগ আগেই আরম্ভ হয়েছিল। এর পরের বছরে শিশিরবাবু আমাকে

একখানা গোলাপী রংয়ের চিরস্থায়ী প্রবেশপত্রের কার্ড দিয়ে বলেছিলেন, তুমি আমাদের 'পাবলিক রিলেশন্সের' দায়িত্ব নিয়ে থেকো!

কিন্তু কিছুকাল পরে শিশিরবাবুর মা বলে পাঠালেন, এমন কাজ কখনো করো না বড়বউমা, তোমার পুঁজির টাকা জলে পড়বে। ওই জমির ওপর মামলা-মোকদ্দমা লেগেই আছে। ও-জমি আমাদের কারো ভোগে আসবে না। শিশিরকে বলেছি তোমার টাকা ফেরত দিতে।

শিশিরবাবু টাকা ফেরত দিয়েছিলেন, এবং তাঁর মা সত্যই বলেছিলেন।

যাই হোক, আমাদের আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হওয়ার জন্য মায়ের হাত ক্রমশ শূন্য হয়ে আসছিল। সম্পূর্ণ শূন্য হবার ঠিক আগে মা আমাকে সাইকেলটি কিনে দেন।

মেহনত বেশি করতুম, অন্য কর্মীর চেয়ে বেশি কাজ করে দিতুম এবং ওভারটাইমে বহু মালের হিসাব নিয়ে বহু গাইটে দাগ টানতুম,—এজন্য আমি এক-আধদিন ছুটিও নিতুম। মাঝে মাঝে ওই সাহেবটার তোষামোদ করার জন্য ভাল ভাল রঙীন ফুল তুলে তোড়া বেঁধে ওর কোয়ার্টারে গিয়ে চাপরাসীর হাতে দিয়ে আসতুম। আমাকে ওরা শর্মা বলে ডাকত।

তখন জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি। রৌদ্রদগ্ধ দিনে অসহ্য গরম। আমি সেদিন কাজে যাই নি। মধ্যাহ্নভোজন সেরে দুপুরবেলায় আমার পশ্চিমমুখো ছোট্ট বাইরের ঘরটি ছেড়ে ভিতরে গিয়ে একটু ঠাণ্ডায় বিশ্রাম নিচ্ছিলুম। সদর দরজাটা বন্ধ। সাইকেলখানা ঝাড়ামোছো করে যাতায়াতের পথে যথাস্থানে রেখেছি।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই। প্রায় চারটে বাজে তখন উঠেছি। অনেকক্ষণ দেখি নি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়কে। প্রিয় নয়, প্রিয়তম।

এ কি, সাইকেল? সাইকেল কোথায়? সদর দরজা খোলা—

কাঠের উঁচু স্ট্যাণ্ডের ওপর সাইকেল থাকে চেন দিয়ে তালাবন্ধ করা! কে নিয়ে গেল সাইকেল আমার বিনা হুকুমে? কোথা গেল সাইকেল?

—মা-আ-আ-আ—।

মা ছুটে এলেন আমার চিৎকারে। চুপ করে দাঁড়ালেন এক মিনিট। পরে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "হ্যাঁ, চুরিই গেছে! ও সাইকেল তোর নয়। যার জিনিস, সেই নিয়ে গেছে। তারই ভাগ্য!

গায়ে জামাটা চড়িয়ে ছুটে বাইরে গেলুম। কোন্ দিকে যাব চোর ধরতে? ডান দিকে, না বাঁ দিকে? তেলিপাড়ায়, না কম্বুলেটোলায়? শ্যামপুকুরে, না বাগবাজারে? বেলগাছিয়া, না বামুনগাছি?

আমি শুধু ছুটছিলুম এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে। আমার দুই চোখে ছিল হিংস্র পাগলের চাহনি। আমার হাঁটায় আর ছোটায় মিলে গিয়েছিল। আমি যেন প্রাণপণে ছুটছিলুম চোরের পিছনে, আর আমার পিছন থেকে তারা করে আসছে যেন অট্টহাসি হেসে আমারই নিয়তি। রায়বাগান থেকে রামবাগান, মুর্গিহাটা থেকে বেলেঘাটা, পাকপাড়া থেকে পালপাড়া, শ্যামবাজার থেকে গোরাবাজার, উল্টোডাঙ্গা

ঘুঘুডাঙ্গা, ফড়িয়াপুকুর থেকে কড়েয়া,—আমি শুধু হাঁটছি। শিবপুর থেকে শালিমার, ভবানীপুর থেকে আলিপুর, নতুনবাজার থেকে রাধাবাজার, শিয়ালদহ থেকে আড়িয়াদহ, বালিগঞ্জ থেকে টালিগঞ্জ, বেনেপুকুর থেকে পাতিপুকুর—প্রতি সাইকেলের দোকানে আর কারখানায়, প্রতি আপিসে, প্রতি গাড়ির আড্ডায়, প্রতিটি কল-কারখানায়। আমি শুধু হাঁটছি আর নিজের বুকের ভিতরকার নিরুপায় ক্ষুধার্ত নেড়ি কুকুরের কান্না শুনছি। শুধু কেবল সাইকেলের জন্য নয়, সাত দিনে দেড়শ' মাইল হাঁটছি শুধু দেড়শ' টাকার অস্থাবর সম্পত্তির জন্য নয়,—আমি হাঁটছি আমার জীবনের সেই প্রথম ভালবাসার জন্য, আমার বুকের ধন ছিনিয়ে নিয়ে গেছে আমারই নিয়তি,—তাই হাঁটছি আর কাঁদছি। সন্তানহারা নর্তকী ইসাডোরা কেঁদে কেঁদে পথে পথে ফিরেছে তার শোকবিহ্বলতায়। আমার এই মর্মচ্ছেদী বেদনা কি তার চেয়ে গভীরতর ছিল না?

পৃথিবী হাসছে চারিদিকে, সুন্দর আকাশে প্রভাতের জ্যোতির্ময় রৌদ্র হাসছে, মহানগরীর পাড়ায় পাড়ায় কল্লোলে হেসে উঠছে সবাই, নাচে-গানে-আমোদে-আনন্দে কোলাহলে-হট্টগোলে সর্বত্র হাস্যমুখর,—আমি তখন ভালবাসার জন্য কাঁদছি অন্ধকার গলির প্রান্তে এক কোণে দাঁড়িয়ে।

এমনিভাবে যখন সাইকেলের সন্ধানে পথে পথে ফিরছিলুম, তখন একদিন চিঠি এল, হুগলী পোস্টাল ডিপার্টমেণ্টে তোমার চাকরি হয়েছে। তুমি শ্রীরামপুরে যাও।

শ্রীরামপুরের বড় ডাকঘরে গিয়ে আমার উপস্থিত হবার একটি বিশেষ তারিখ ছিল। তারই জন্য যখন দিন গুনছি তখন ১৬ জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দার্জিলিংয়ে 'স্টেপ-অ্যাসাইড' নামক বাড়িটিতে দেহরক্ষা করেন। এই সর্বনাশা সংবাদে সমগ্র ভারতবর্ষ চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। মোতিলাল নেহরু শোকে মুহ্যমান হন। সুভাষচন্দ্র তখন মান্দালয় কারাগারে বন্দী। দেশবন্ধু তাঁর মৃত্যুর আগে সমগ্র ভারতের রাজনীতিক চেতনাকে জয় করেছিলেন, এবং তার ফলে গান্ধীজী কিছু ছায়াচ্ছন্ন হন। জওয়াহরলাল তখনও যথেষ্ট প্রাধান্য পান নি। এই ঘটনার প্রায় দু' বছর আগে ওই দার্জিলিংএই দেশবন্ধুর সহকর্মী দাশরথি সান্যাল নিউমোনিয়া রোগে মারা যান। আমাদের বাড়ীতে শোকের ছায়া পড়ে। দাশরথি দেশবন্ধু অপেক্ষা প্রায় সাত বছরের বড় ছিলেন।

শত্রুর মৃত্যু ঘটলে বৃটিশ-ভারত গভর্নমেণ্ট তখনকার কালে রাতারাতি উদার হয়ে উঠত। জানত শত্রুর যখন নিপাত ঘটেছে, তখন সেই সূত্রে দুর্নাম কিছু ঘোচানো যাক। তারা দেশবন্ধুর শবদেহ কলকাতায় আনার পক্ষে সর্বপ্রকার সহায়তা করেছিলেন। এই সূত্রে খ্যাতিমান হয়েছিলেন আমাদের এক আত্মীয়, ন্যাড়া গোঁসাই ওরফে অনুপলাল। তিনি দার্জিলিংয়ের লোক। দেশবন্ধুর তদ্বির-তদারকের ভার ছিল তাঁর ওপর। তিনি দাশরথিরও সেবক ছিলেন। যাই হোক, স্বয়ং গান্ধীজী দেশবন্ধুর শব নিয়ে আসছিলেন শিয়ালদা স্টেশনে ট্রেনযোগে। তিরিশ লক্ষ শোক-বিহ্বল জনসাধারণ সেই ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিল।

স্টেশন প্লাটফরমে হাজার হাজার নিরেট জনতার মধ্যে নেংটি ইঁদুরের মতন আমিও দাঁড়িয়েছিলুম। জনতা রুদ্ধশ্বাস, নির্বাক ও নীরব। তৎকালীন কলকাতার সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান ও বৌদ্ধ জননেতাগণ প্ল্যাটফরমে উপস্থিত। তারই মধ্যে হঠাৎ একটা থাপ্পড় মারার শব্দে উপস্থিত সবাই একসঙ্গে চমকিয়ে উঠল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তামাসাচ্ছলে বিপিন পালের পিঠের উপর সজোরে চড় বসালেন। শোকাচ্ছন্ন জনতা অবাক।

আচার্যের এই 'মারাত্মক' ভালোবাসা সেদিন অনেকের কাছেই স্বীকৃত ছিল।

॥ ১৫ ॥

শ্যামপুকুরের সেই চোরা গলির অভিশপ্ত জরাজীর্ণ বাড়ি, যার নিচেব তলাটা ছিল জন্তুর ঝুপসি খোঁয়াড়ের মতো। উনুনে আগুন দিলে ঘণ্টাখানেক অন্ধকার হয়ে থাকত,—ঘুঁটে-কয়লার ধোঁয়া বেরোত না। উপর থেকে বাড়িওয়ালা আপত্তিকর জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে ফেলতো নিচের তলায় এবং তাদের দুর্গন্ধ নোংরা ধোয়াট নামত নিচে, ছিটে লাগত গায়ে। প্রতিবাদ জানালে শুনিয়ে দিত, আমরা তেলিপাড়ার লোক, মনে রাখবেন।

আমরা বেলগাছিয়া পুলের ঠিক নিচে এক গলিতে বাড়ী ভাড়া করলুম। গরীব গৃহস্থ যখন বাসা-বদল ক'রে গরুর গাড়ীতে ঘরবসতি মালপত্র নিয়ে যায়, তখন পথচারীরা তাদের অর্থনীতিক অবস্থা বুঝে নেয়। এই সূত্রে মামার কথাও আসে। আমার মামা গাঁজা-আফিম খেতেন। বোধ হয় সেই কারণেই তিনি তাঁর পঞ্চাশ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীর নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে প্রায়ই সন্দিহান হয়ে উঠতেন। ফলে স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষার জন্য একবার তিনি স্ত্রীকে নিয়ে গরুর গাড়িযোগে পুঁটিবাগান থেকে খড়দহ যাত্রা করেন। তখন আমি খুবই ছোট। সেই গাড়িতে ছোটখাটো মালপত্র আমাকেই তুলতে হয়েছিল। বেশ মনে পড়ে, গাড়ীর সামনে মামা, মাঝখানে তাঁর প্রিয় পুষি বিড়াল এবং গাড়ীর ল্যাজের দিকে ঘোমটা দেওয়া মামী! ওদেরই ফাঁকে ফাঁকে ছেঁড়াকাথা মাদুরের পুঁটলি, তোলা উনুন, বালতির মধ্যে ফালিবাঁধা ঝাঁটা—ঝাঁটার আলগা দিকটা আকাশের দিকে উঁচিয়ে, ১৯ শতাব্দীতে কেনা একটি রংচটা তোরঙ্গ, চটের থলের মধ্যে কলাই ও লোহার বাসন—তা'র ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে ফাটা বেলুন আর খুন্তির ডগা। এ ছাড়া ডাল ভাত রান্নার মেটে হাঁড়ি, তিজেল ও মালসা, জলের ভাঁড়, তার সঙ্গে মামার গড়গড়া আর তালিমারা বিবর্ণ ছাতাটা—যার ভিতর থেকে দু'গাছা লোহার কাঠি বেরিয়ে পড়েছে। ওদেরই মাঝখানে শান্ত হয়ে ব'সে পুষি বিড়ালটি সেদিন কলকাতার শোভা দেখতে দেখতে চলল।

এবম্বিধ স্থান পরিবর্তনের ফলে মামীর নৈতিক শুচিতা কতখানি রক্ষা করা গিয়েছিল, সে আলোচনা আগেই করা আছে।

সে যাই হোক, বিড়ালটার প্রতি সেদিন আমার বড় ঈর্ষা হয়েছিল!

আমাদের গরুর গাড়ী দু'খানা গলির শেষ প্রান্তে এসে বাঁহাতি ঘুরে এক কোণে দাঁড়াল। এ বাড়ীর নিচের তলাটা ভাল। রান্নাবাড়ি আলাদা, চকমিলানো উঠোন এবং একটি পুজোর দালান। আমি পেলুম বাইরের ছোট্ট ঘরটি। বাড়িখানা মজবুত।

এই বাড়িতে গুছিয়ে ব'সে একটি প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় যোগ দিলুম। প্রবন্ধটির নাম হ'ল, "বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান।" এটি সাহিত্যকর্ম। তখনকার রেওয়াজ ছিল, মেয়ের নাম দিয়ে কিছু লিখলে হয়ত বিচারকরা একবারটি পাতা উলটিয়ে দেখতে পারে। পুরুষ লেখক হ'লে না দেখেই হয়ত ফেলে দেবে বাতিল-কাগজের ঝুড়িতে। সুতরাং আমি 'মাধুরী দেবী' নাম নিয়ে যে প্রবন্ধটি লিখলুম, সেটি ঠিক দিনের বেলায় দেশালাইর কাঠি জেলে সূর্যকে দেখিয়ে দেবার মতো! সেটি সযত্নে পাঠিয়ে দিলুম যথাস্থানে।

মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছিল। শ্রীরামপুরের বড় ডাকঘরে আমার চাকরি হয়েছে, সুতরাং ঠিক দিনটিতে দুর্গা ব'লে বাড়ী থেকে একদিন বেরোলুম। বেলগাছিয়া থেকে বাগবাজারের স্টীমার ঘাট। হোক না কেন বৃষ্টি, সমস্ত হাঁটা পথটাই ত উপার্জনের পথ। অতঃপর স্টীমারে চ'ড়ে বালিঘাটে। সেখান থেকে প্রায় দেড় মাইল হেঁটে গিয়ে বালি স্টেশন। টিকিট কিনে ট্রেন ধ'রে বালি থেকে উত্তরপাড়া, তারপর কোন্নগর, রিষড়া, তারপর শ্রীরামপুর। কী আনন্দ, বালিখালের ধার দিয়ে দিয়ে স্টেশন! আমার বাঁ দিকে হাওড়া জেলা, ডানদিকে হুগলী।

শ্রীরামপুরের বড় ডাকঘর খুঁজে নিলুম। স্বয়ং পোস্টমাস্টার মশায় দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে ধ'রে নিয়ে বসালেন। চেয়ারখানা ভাঙ্গা, পুরনো বাড়ী, আপিসের ভিতরটা ঝুপসি, ওরই মধ্যে তেলের আলো জেলে কাজ করছে পিওনরা। ইনি হলেন রতনবাবু—মনি অর্ডার দেখছেন। ইনি পূর্ণবাবু—রেজিস্ট্রেশন আর সেভিংস, উনি বিনয়বাবু—স্ট্যাম্প আর খাম-পোস্টকার্ড বেচেন। আর ওই বাইরে ব'সে রয়েছে আমাদের বুড়ো গোঁসাই,—মনি অর্ডার ফর্ম লিখে দেয়। তুমি এখন আমারই অ্যাসিস্টাণ্ট হয়ে কাজ করবে।

ডাকঘরের কাজকর্ম কে না দেখে বেড়িয়েছে। সবাই জানে কি কি কাজ হয় ডাক-ঘরে। হাসি-হাসি মুখে একে একে সকলের কাজ দেখে বেড়ালুম। মাস্টার মশাই এক সময় তাঁর সই-সাবুদের কাগজগুলি গোছাতে দিলেন। পাঁচ মিনিটের কাজ তিন মিনিটে সারলুম। খাতাপত্র গুছিয়ে দিলুম। ইনসিয়োর করা মোড়কগুলির ওপর যথাযথভাবে গালা ও শিলমোহর পড়েছে কিনা পরীক্ষা করলুম। এনট্রিগুলো মিলিয়ে নিলুম। ইলেকট্রিকের পাখা বা আলো নেই ঘরে,—দরদর ক'রে ঘাম পড়ছিল। টিফিন বলে কিছু নেই ডাকঘরে। কোনও কোনও কর্মী শুকনো মুখে বাইরে গিয়ে মাঝে মাঝে বিড়ি টেনে আসে। ময়লা জামাকাপড়, বোধ হয় দাড়ি কামাবার পয়সা

ও সময় জোটে না, রোগা উপবাসী মুখ, কাজ ক'রে যাচ্ছে অশ্রান্ত। আমি অবেলার দিকে মাস্টার মশাইয়ের নির্দেশে মনি অর্ডারের একটা লম্বা ফর্দ তৈরি ক'রে দিলাম।

মাস্টারমশায় প্রবীণ বয়স্ক, তাঁর মাথায় মস্ত টাক। তিনি আমুদে সাদাসিধে লোক। সপরিবারে তিনি থাকেন এই বাড়ীরই ভিতর মহলে। দুপুরবেলায় এক সময় সিন্দুকের চাবি বন্ধ ক'রে ভিতরে গিয়ে তিনি চারটি খেয়ে এলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখলুম, কয়েকটি ছেলেমেয়ে ভিতর দিকের দরজা দিয়ে আমার দিকে উঁকিঝুঁকি মারছে। নতুন মানুষকে দেখে তাদের মস্ত আমোদ। এক সময় একটু চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন করলুম, মাস্টারমশাই, আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি?

মাস্টারমশায় আমার দিকে চেয়ে হাসলেন। বললেন, স্টেশন মাস্টার, ইস্কুল মাস্টার আর পোস্ট মাস্টার—এদের ছেলেমেয়ে বেশি হয়! ওদের বিয়ে হলে 'পুত্র-কন্যে, আসে যেন প্রবল বন্যে'। সেদিক থেকে আমি বেঁচেছি বাবা, বুঝেছ? আমার মাত্র পাঁচটি মেয়ে আর চারটি ছেলে! গেল বছর বড় মেয়েটার বিয়ে দিয়েছি আটশ' টাকা খরচ ক'রে। দুশ' টাকা নগদ, আড়াইশ টাকার গহনা, তার ওপর নমস্কারী ফুলশয্যে বরাভরণ বাসন-কোসন, তা বাদে বিয়ের খরচ। একশ' লোকের খাইখরচ। দেনা চেপেছে ষাট টাকা! সব জিনিস এখন মাগ্যি!

আমার আর কিছু শোনার দরকার ছিল না। ভদ্রলোক তবু ব'লে চললেন। তিনি হলেন বাগচী এবং শাণ্ডিল্য গোত্র। তাঁদের আদি বাড়ী নদীয়ায়।

সেদিন সন্ধ্যার পর সেই একই পথ দিয়ে বেলগাছিয়ায় ফিরেছিলুম।

এমনি ক'রে প্রতিদিন আসছি আর যাচ্ছি। দৈনিক খরচ চালিয়ে দু'চার পয়সা টিফিন খাব, তা সম্ভব নয়। আমি উপবাস করতে শিখেছি আশৈশব। একদিন স্থির করলুম, না, এভাবে চলবে না! সেই সময় একদিন পথে আলাপ হ'ল দুটি সুদর্শন তরুণ যুবকের সঙ্গে। মিষ্ট প্রকৃতির দুই যুবক—ডাবু লাহিড়ী এবং সুকুমার দত্ত। এঁরা স্থানীয় যুবক মহলে প্রতিপত্তিশালী। তাঁদের কাছে আমার সমস্যার কথা বললুম। তাঁরা আমার জন্য একটি বাসস্থান ঠিক ক'রে দিলেন।

ঘরটি একটি ডোবার ঠিক পাশে। দুইয়ের মাঝখানে সরু যাতায়াতের পথ। ডোবায় জলের চেয়ে জঞ্জাল ও কাদা বেশি। তার মধ্যেও পানাভর্তি। বোধ হয় এ-পাড়ার সমস্ত নোংরা জঞ্জাল ওই ডোবায় পড়ে, এবং এইভাবেই ওটা একদিন বুজবে, বোধ হয় এই ছিল পৌর কর্তৃপক্ষের প্রত্যাশা।

এ ঘরটি দিনের বেলা খালিই প'ড়ে থাকে। সন্ধ্যার পরে ভিতরবাড়ি থেকে আসে একটি হারিকেন। আমি সকাল-সন্ধ্যা দোকানে দোকানে খেয়ে বেড়াই। বাজারের কাছাকাছি আছে একটা ভাতের দোকান।

রাত্রের দিকে পাড়ার ছেলেরা একে একে ঘরটাতে এসে ঢোকে। এটা যে ড্রামাটিক ক্লাব, এবং 'সাজাহান'-এর রিহার্সাল চলছে, আগে বুঝি নি। স্বয়ং সাজাহান বিড়ি খাচ্ছেন ঘন ঘন, তাঁর কন্যা 'জাহানারা' কদর্য ভাষায় 'বাপকে' গালি দিচ্ছে, আওরঙ্গজেব চাঁটি মারছে যশোবন্তকে এবং দারা ও রোশনারা চাপাগলায় অশ্লীল

মুখখিস্তি করছে। যখন রিহার্সাল আরম্ভ হয়, রাত তখন ন'টা। আমি ওই ডোবার ধারে মশার কামড় সহ্য ক'রে অন্ধকারে অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকি, কতক্ষণে ওদের রিহার্সাল ভাঙবে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর ওখানে বসেই আমার ঢুলুনি আসে। ওরা চলে যাবার পর তক্তাখানার ওপরেই একটা ময়লা বালিশ নিয়ে কাৎ হয়ে পড়ি। সমস্ত রাত ধ'রে এ ঘরখানা যে বায়ুরন্ধ্র থাকে এবং বড় বড় মশার সাংঘাতিক কামড়ে যে আমার সর্বাঙ্গে চাকা-চাকা দাগ ফুটে ওঠে, এ আমি গভীর ঘুমের মধ্যে একটি-বারও টের পাইনে।

এর মধ্যে আরেক উৎপাত। একদিন ছুটির পর আপিস থেকে বেরিয়ে আসছি এমন সময় মাস্টারমশায়ের ছেলেটা আমাকে ডাকল। আমি ওদের বাসার মধ্যে এই প্রথম ঢুকলুম। গিন্নি ফস করে বেরিয়ে এসে বললেন, ওমা, এ যে চাঁদের মতন ছেলে! এসো বাবা, এসো। ওরে শিবু, দে না টুলখানা এগিয়ে। না বাবা, ও চেয়ারখানার পায়াভাঙা, তুমি টুলেই বসো।

এমন সময় মাস্টারমশাই এলেন। আমি কাঁচুমাচু।

গিন্নি বললেন, তা হবে না? বিদ্যের জাহাজ যে! এই ত, উনিই বলছিলেন, কোনও কাজ তোমার হাতেই লাগে না! ছ'মাসের মধ্যেই তোমার মাইনে বাড়বে!

মাস্টারমশাই বললেন, আমার সুপারিশ আমি এরই মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছি। বলেছি, সাতদিনের মধ্যে সমস্ত কাজ শিখে গেছে! আর কিছু নয়, আমারই মাথা উঁচু হ'ল। তোমার উন্নতি মারে কে?—বলতে বলতে তিনি কলতলায় গেলেন।

গিন্নি বললেন, ঠিক লোকের হাতে এসেছ, বাবা। তোমাকে আর কিছু ভাবতে হবে না। বলি কোথা গেলি? অ টেঁপি, এবার খাবার নিয়ে সামনে আয়। বাছার মুখখানা যে শুকিয়ে গেছে!

বছর পনেরো-ষোল বয়সের একটি লজ্জাশীলা মেয়ে একটি পেতলের রেকাবিতে একখানা ঠাণ্ডা নিমকি ও একটি মুগের নাড়ু নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। বুঝতে পারা গেল টেঁপি সাজসজ্জা করে চুল এলিয়ে মুখে একটু পাউডার বুলিয়ে সামনে এসেছে। গিন্নি বললেন, তা যাই বলো বাবা, এ মেয়ে আমার লক্ষ্মী। রান্না-বান্নায় হাত একেবারে পাকা। কুটনো-বাটনা, কাপড় কাচা, বাসন মাজা—যে কাজই দাও, হাসিমুখ। তেমনি ওর পান সাজার হাত! কোলের ভাইবোনদেরকে টেঁপিই ত মানুষ ক'রে তুলল, বাবা।

একখানা নিমকি আর ওই বোট্‌কা গন্ধের মুগের নাড়ু চিবোতে কতক্ষণ লাগে? টেঁপি ক্ষিপ্রহাতে এক গেলাস জল এনে দিল। আমি জল খেয়ে অমায়িক মধুর সৌজন্যে এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, এবার আমি যাই।

টেঁপি হঠাৎ মাথাটা দুলিয়ে চুলের রাশি ঘুরিয়ে ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। আমি নিতান্ত নাবালক নই। বোনেদের বিয়েগুলো আমার দেখা আছে।

গিন্নি এবার একটু গলা নামিয়ে বললেন, শুনেছি বাবা, হুগলি ডিভিশনের কর্তা নাকি তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে। উনি ত পোস্টমাস্টার, ওঁর খ্যামোতা আমার

জানা আছে। এই ত, আমার বড় ছেলে ভোনা এবার একটা পাস করল। ওর কথা তুমি একটু মনে রেখো বাবা।

আজ্ঞে আচ্ছা—

বেরিয়ে আসছিলুম গিন্নি আবার বললেন, এখন থেকে তুমি আমাকে মা বলো কেমন? কী মিষ্টি ছেলে। আমি তোমার মা।

সহাস্যে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলুম। কিছু দূর পথ পেরিয়ে একস্থলে থমকিয়ে দাঁড়ালুম।—মা? আমার শরীর যেন কাঁপছিল এক বিদ্যুৎ শিহরণে। না, আমি অন্য কারোকে মা বলতে পারব না। মা আমার একজনই। সেই মাকে দেখি নি এক সপ্তাহ। আমি হাঁটতে হাঁটতে এলুম সেই ডোবার ধারে। সেই ঘর, সেই মশা, সেই অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে ভবিষ্যতের ছবি আঁকা। না, সে ছবি আজ থাক।

মুখ ফিরিয়ে স্টেশনের দিকে ছুটে চললুম। আজ শনিবার, অনেক গাড়ি আছে। টিকিট কিনে স্টেশনে উঠে এলুম। আমি এই টানে সোজা ছুটে গিয়ে চেঁচিয়ে মাকে ডাকব।

পথ যেন আর ফুরোচ্ছে না। বালিখাল পেরিয়ে স্টীমারঘাটে এসে দেখি বাঁশি দিচ্ছে স্টীমার। ছুট্, ছুট্—ছুটতে ছুটতে জেটির ভিতর দিয়ে এসে লাফিয়ে উঠলুম স্টীমারে। মাথার উপরে তখন আকাশ ডাকছিল দড়িদড়া খুলে নিচ্ছিল খালাসীরা।

বাগবাজার ঘাটে স্টীমার থেকে নেমে সোজা দৌড়। আকাশ ভেঙ্গে তখন বৃষ্টি নেমেছে। সবাই ছাতা খুলেছে, সবাই খুঁজছে মাথা বাঁচাবার আশ্রয়। আমি হন-হনিয়ে ছুটে যাচ্ছিলুম। নন্দ বোসের গলি, হরলাল মিত্তির—সব ফেলে ছুটছি। তারপর শ্যামবাজার, তারপর পুল—ছুট ছুট। মা যেন হয়ে উঠেছেন বিশ্বজননী, আমি যেন যাচ্ছি তাঁরই মন্দিরে।

যখন মায়ের সামনে এসে হাসিমুখে দাঁড়ালুম—তখন তাঁর চিরকালের চির-নাবালকের সর্বাঙ্গ বেয়ে বৃষ্টির জল ঝরছে।

সরকারী চাকরি—আগুনে পোড়ে না, জলে ডোবে না।

একবার যদি কোনও মতে ঢুকতে পেরেছ তাহলে আর ভাবনার কিছু রইল না। জীবনের সোজা হিসেব নির্ভুল অঙ্কের মতো কষা হয়ে গেল। তুমি শুধু যন্ত্রচালিত।

কিন্তু তার জন্য প্রতি রাত্রে ওই পচা ডোবের ধারে দমবন্ধ ঘরে ওই ভয়াবহ মশার কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত হবো? তার চেয়ে আগুনে পোড়া বা জলে ডোবা ভাল।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা আস্তানা বার করলুম। শ্রীরামপুর কোর্ট-কাছারির ঠিক সামনে একখানা পুরনো বাড়ির দোতলায় দক্ষিণমুখী একখানা ঘর। ঘরে থাকে আরও দুজন। একজন পুলিসের অ্যাসিস্টাণ্ট সাব-ইনসপেক্টর অন্যজন পঞ্চানন পাল। পঞ্চাননের বাঁ হাতখানা কনুই পর্যন্ত কাটা। শীর্ণকায় এবং কৃষ্ণবর্ণ। উনি আদালতের মুহুরি। পুলিস সাহেবটি আদালতে কাজকর্ম করেন। যাই হোক, ওই ঘরে ওঁদের সঙ্গে আমার জায়গা হয়ে গেল। সীটভাড়া মাসে দু টাকা। আমার জায়গাটুকুতে শতরঞ্চি পড়ল আর মাথার দিকে এক কোণে রাখলুম কালো

টিনের সুটকেসটি।

আমার পক্ষে সুবিধা এই নিচের তলায় ছিল পাইস হোটেল। দু'আনায় পেটভরা ভাত, ডাল, চচ্চড়ি, ছোটমাছের ঝাল, একখানা মাছের ঝোল এবং চাটনি। যদি আরেক পয়সা বেশি দাও তবে গরম ভাতে একপলা ঘি। কলাপাতায় খেতে দিত, তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে যেত কলাইয়ের ডাল বা মাছের ঝোল। তাই উপাদেয়। স্নানাহার সেরে আপিস যাবার পথে গুনগুনিয়ে গান আসত গলায়। দিনগুলো চলে যেত তরতরিয়ে।

এখন আমার অবস্থা সচ্ছল। পরনের পাঞ্জাবিতে মুক্তো বসানো একসেট বোতাম —তার দাম নিয়েছে ছ'আনা। বছর তিনেক আগে বড়দা আমাকে একটা আট টাকা দামের হাতঘড়ি পেজেন্ট করেছিল—সেটা সারিয়েছি আট আনায়। ফিতেবাঁধা এক-জোড়া জুতো আর গেঞ্জি—দুটোয় গেছে সাড়ে তিন টাকা। আমি এখন ফিটবাবু।

পঞ্চাননের মাইনে পনেরো টাকা, তবে মক্কেলদের কাছ থেকে বকশিশ ইত্যাদি মিলিয়ে কুড়ি-পঁচিশ টাকা আন্দাজ রোজগার করে। একখানা মাত্র হাত চালিয়ে এত টাকা রোজগার—নিশ্চয় গুণবান ব্যক্তি। কিন্তু তার চেহারাটা একেবারেই সুশ্রী নয়, তার ওপর ওই নুলো হাত! মাঝে মাঝে দেখি মেঝের উপর বসে আমার আয়না-চিরুনি নিয়ে এক হাতেই সে টেরি বাগাচ্ছে। মাঝখানে কবে যেন একদিন আমার বোতামের সেটটা সে চেয়ে নিল। বলল, আজ একটু বেড়াতে যাব, তাই তোমার বোতামটা পরে যেতে চাইছি—

—বেশ ত!

আমার তখন অবস্থা ফিরেছে। মন খুশীতে ভরা। রাত্রে যখন খেয়েদেয়ে উপরে উঠে আসি, তখন পাইস-হোটেলের একটা ঝি আমাাক ডেকে অযাচিতভাবে এক খিলি পান দেয়। হোটেলেরই সংলগ্ন ঝুপসি ঘরটার ভিতরে দাঁড়িয়ে সে যখন পান নেবার জন্য হাতছানি দিয়ে ডাকে, তার ডাকার ভঙ্গীটা দেখলে আমার গা যেন ছমছম করে! একদিন পান খাওয়া বন্ধ করলুম।

পুলিস সাহেবের বাড়ি হ'ল বর্ধমানে। তাঁর মাইনে বোধ হয় টাকা পঁয়তাল্লিশ। তিনটি ছেলেমেয়ে। আবার নাকি একটি হবে। তিনি খাকি রংয়ের শার্ট আর প্যাণ্ট পরেন। মাথায় শক্ত চকচকে একটা কালো টুপি। কিন্তু ভদ্রলোক কথাবার্তা বলেন কম, এবং সর্বক্ষণই যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। যখনই কথা বলেন, তখনই অভাব-অভিযোগের ক্ষোভ। শ্রীরামপুরে থাকতে গেলে খাই-খরচ, বাস ভাড়া, জলখাবার, ধোবা-নাপিত —সব মিলিয়ে কমবেশি কুড়ি টাকা পড়ে। দেশে বিধবা মা, অবিবাহিত বোন, বেকার ভাই, অসুখ-বিসুখ, লোক-লৌকিকতা—মাত্র পঁচিশ টাকায় কি হয়? আপনি ভাই বেশ আছেন! দিনরাত পকেটে টাকা পয়সা ঝমঝম করছে। সংসারের দায়ধাক্কা কিছু নেই। দাদারা রোজগার করে···

পঞ্চানন ওর সঙ্গে যুগিয়ে দিল, তুমি ভাই বড়মানুষের ঘরের ছেলে! যেমন দিল-দরিয়া মেজাজ, নজরও তেমনি উঁচু! এই ত' এক কথায় মুক্তোর বোতাম ছড়াটা

আমাকে দিয়ে দিলে—। চাকরি করা তোমাকে মানায় না।

ওর কথা শুনে আমি অবাক। কে বললে, ওকে আমি বোতাম ছড়াটা দিয়ে দিয়েছি? পরতে দিয়েছিলুম শুধু একদিনের জন্য তারপর আর ফেরৎ দেয় নি। ব্যবহার করছে নিয়মিত। ওর ওই কথায় পর ছ'আনা দামের বোতাম ছড়াটার ওপর আমার ঘৃণা এসে গেল!

এ সপ্তাহে বাড়ি যাই নি। শনিবারে ছিল সরকারী ছুটির দিন। সেদিন ভোরে উঠে শেওড়াফুলি হয়ে গেলুম তারকেশ্বরে। সেখান থেকে আবার গেলুম হুগলির ইমামবাড়ায়। ভ্রমণ কিছু আমার যখন তখন চাই। আমার চাই গতি। গতি মানে প্রাণ। গতিহীনতার অন্য নাম প্রাণহীনতা!

রবিবারে গঙ্গা—ওটা আমার বাঁধা। গঙ্গায়-গঙ্গায় ভাসছে যেন সেই আমার বাল্যকাল। নৌকায়-নৌকায় আমার মন ঘুরে বেড়ায়। চলন্ত স্টীমার যে গুরুগম্ভীর নাদধ্বনি তোলে, সে যেন আমার রক্তে চিরকালীন একটা বেগের আবেগ আনে। রবিবার সারাদিন কাটে আমার গঙ্গায়—কোর্ট-কাছারির এলাকা ছুটির দিন জনশূন্য থাকে। আমি গিয়ে বসি বটের ছায়ার নিচে, যেখানে তার ঝুরি নেমেছে গঙ্গার স্রোতের উপর। সেই ভরা নদীতীরের বটের ছায়ার তলায় একাকী ব'সে আমি যেন স্থির চক্ষে চেয়ে থাকি আমার নিজের ভিতরে। ভিতরের সে যেন আরেক আমি। চারিদিকের চাঞ্চল্যের মাঝখানে সে যেন আপন আসনে স্থির হয়ে ব'সে থাকে!

এমন সময় একদিন মায়ের চিঠি এল, এই শনিবারে বাড়ি চলে আয়। তোকে নিয়ে যত গণ্ডগোল। বেনামে কোথায় কি লিখেছিস, তার জন্য লোকজন আসবে সামনের রবিবারে। ঠিক আসবি।

শনিবার বিকালে বাড়ী এসে হাজির হলুম। বিশেষ এক প্রতিষ্ঠান থেকে একখানা চিঠি এসেছে 'মাধুরী দেবীর' নামে। কেয়ার অফ—আমার ছোড়দাদার নাম। হাসিমুখে চিঠিখানা পড়লুম। প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন, বিচারক-মণ্ডলীর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই, আপনার লিখিত প্রবন্ধ "বাঙ্গলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান" একশ' আটাশটি প্রাপ্ত প্রবন্ধের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এজন্য স্বর্ণমণ্ডিত রৌপ্যপদকটি আপনার প্রাপ্য। আমাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি আপনাকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য আগামী রবিবার সকাল ৯টা হইতে ১০টার মধ্যে আপনার বাটীতে যাইবেন। ইতি—

সর্বনাশ! এখন উপায়? বাড়ির সবাই হাসাহাসি করছে আমার এই ছদ্মনামটি নেওয়ার জন্য। মা বলছেন, ত্রাহি মধুসূদন! মাথায় উঠল স্বর্ণমণ্ডিত রৌপ্যপদক। সেদিন সমস্ত রাত ঘরের কড়িকাঠ গুনে কাটল!

পরদিন যথাসময়ে একখানা মোটরগাড়ি এসে গলির মুখে দাঁড়াল এবং জনতিনেক ভদ্রলোক এসে দরজায় কড়া নাড়লেন। আমি এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানালুম। তখন কথায়-কথায় চা খাওয়াবার চালাও রীতি চালু হয় নি। শুধু মিষ্টান্নর সঙ্গে কচুরি, নিমকি, সিঙ্গাড়া। কিন্তু তারপর?

ঠিক সময়টিতে মেজবউদিদি একগলা ঘোমটা দিয়ে একটু আব্রু বাঁচিয়ে দরজার পাশে এসে দাঁড়াল। পরিচয় করিয়ে দিলুম, ইনিই মাধুরী দেবী, আমার দাদার স্ত্রী। রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি ওঁর একান্ত অনুরাগ ও নিষ্ঠা।

অতঃপর ভদ্রলোকরা 'মাধুরী দেবীর' রচনাটি নিয়ে প্রশংসায় যত পরিমাণ মুখর হন, আমার ঠ্যাং দু'খানা ঠিক তত পরিমাণেই ঠকঠক ক'রে কাঁপতে থাকে। ওঁরা বিদায় হ'লে বাঁচি। এদিকে মেজবউদিদিকে বলা ছিল, খবরদার একটি কথাও যেন বলো না! শুধু ঘাড় নাড়বে, নমস্কার জানাবে। একগলা ঘোমটার ভিতর দিয়ে তোমার থুঁতনিও যেন না দেখা যায়। যেন হেসে ফেলো না। ঘোমটার ভিতর দিয়ে লোকগুলিকে দেখবার চেষ্টা ক'রো না যেন। তুমি শুধু পর্দানসীন কাঠের পুতুল! বুঝেছ? মনে থাকে যেন।

মেজবউদি অগ্নিপরীক্ষায় পাস ক'রে গেল।

ওঁরা জানালেন, আগামী অমুক তারিখে 'সঙ্গীত সমাজ হলে' পুরস্কার বিতরণ করা হবে। আপনি উপস্থিত থেকে এই পুরস্কারটি গ্রহণ করলে আমরা বিশেষ বাধিত হবো।

তৎক্ষণাৎ আমি এগিয়ে মেজবউদির ঘোমটার ডগার কাছে মুখ রাখলুম কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। মেজবউদি পূর্ব নির্দেশ মতো নির্বাক। এবার আমি স'রে এসে ওঁদের বললুম, ওঁর পক্ষে সভা-সমিতিতে যাওয়া ত সম্ভব নয়, বুঝতেই পারছেন! উনি আমাকে পাঠাবেন একখানা চিঠি দিয়ে। আমিই যাব।

ওঁরা সৌজন্য সহকারে বিদায় নিয়ে যখন গাড়িতে গিয়ে উঠলেন, তখন আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। আমার পক্ষে সুবিধা ছিল এই, দু চারজন দেশনেত্রী ছাড়া কোনও গৃহস্থের বউ-ঝি সেইকালে সভা-সমিতিতে যেত না।

এর কিছুকাল আগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর গান্ধীজী বেশ কিছুদিন কলকাতায় ছিলেন, এবং যাবার আগে তখনকার শ্রদ্ধেয় জননেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে কলকাতার মেয়রের পদে বসিয়ে যান। এর ফলে বাঙ্গালার রাজনীতিতে গৃহ-বিবাদের অশান্তি ক্রমশ ধূমায়িত হতে থাকে এবং গান্ধী-বিরোধী উগ্রপন্থীরা সভা-সমিতি ও সংবাদপত্রে নানা কথা বলতে থাকে। এই সময় মান্দালয় জেলে থাকাকালে সুভাষচন্দ্র কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, এবং অনেকের ধারণা, সুভাষচন্দ্রের খাদ্যে বৃটিশ শাসকদের ইঙ্গিতে বিষ মেশানো হয়েছিল। তরুণ সুভাষচন্দ্র ছিলেন দেশবন্ধুর মানসপুত্র এবং বাঙ্গলায় সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। তিনি যেমন রূপবান, তেমনি তাঁর যৌবনশ্রী। তিনি সংযতবাক, গম্ভীর, পরিহিতব্রতী এবং ব্রহ্মচর্যব্রতধারী। শিবের ছবির পাশে সুভাষচন্দ্রের ছবি টাঙিয়ে বাঙ্গালী মেয়েরা পূজার আসনে বসতো। সুভাষচন্দ্র ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীঅরবিন্দের উত্তরসাধক। তিনি গীতা-ধর্মে অনুরক্ত এবং 'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'—এই দৈবহিংসায় বিশ্বাসী। সেনগুপ্ত বয়োজ্যেষ্ঠ, সুভাষ কনিষ্ঠ। সেনগুপ্ত গান্ধীপন্থী, অহিংসাবাদে বিশ্বাসী, কংগ্রেসের প্রিয়। কিন্তু এই দুই নেতার পিছনে দাঁড়াল দুই দল এবং সংবাদপত্রগুলিও দুই

দলে ভাগ হয়ে গেল। দেশবন্ধু দলের দুটি প্রধান মুখপত্র 'ফরওয়ার্ড' ও 'বাঙ্গালার কথা'। এই কাগজ দুটি পরিচালনা করেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, নলিনীরঞ্জন সরকার, শরৎচন্দ্র বসু ও নির্মলচন্দ্র চন্দ্র। তাঁদের নাম ছিল 'বিগ ফাইভ'।

যাই হোক, নির্দিষ্ট দিনে 'সঙ্গীত সমাজ' হলে সবান্ধবে গিয়ে দেখি সভাপতি যিনি তিনি মেয়র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। তিনি ছাড়া স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, আচার্য পি সি রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস এবং আরও অনেকে উপস্থিত। আমার কান দুটো ভোঁ ভোঁ করছিল। তবু ওরই ভিতরে আমি যেন 'শ্রীমতী মাধুরী দেবী'র প্রতি ঈর্ষান্বিত হচ্ছিলুম! সে যেন আমারই প্রাপ্য সব প্রশংসা লুটে নিয়ে যাচ্ছে! মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি যখন মাধুরী দেবীর লিখিত চিঠিখানা পড়লেন, তখন সভাস্থলে হাততালি। কী ন্যাকামি মাধুরীর সেই চিঠিতে! আমি সামান্য অজ্ঞাতনামা লেখিকা, অন্ধকার গৃহকোণের এক বধূ। সেই অন্ধকারে নেমেছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের রশ্মি। আমার রচনাটি তাঁরই আলোয় আলোকিত। আমার কৃতিত্ব কিছু নেই…এ তাঁরই গৌরব!

ন্যাকা, ন্যাকা'—আগাগোড়া ন্যাকা! তবু এক সময় মাধুরী দেবীর নাম উঠল, এবং আমি মঞ্চের উপর উঠে গিয়ে মেয়রের হাত থেকে মেডেলটি নিয়ে নমস্কার জানালুম। আবার হাততালি!

অতঃপর আগামী কয়েক মাসের মধ্যে 'মাধুরী দেবী'র নামে বোধ হয় পর পর তিনটি প্রবন্ধ তৎকালীন সাপ্তাহিক 'বিজলী' কাগজে ছাপা হয়। তখন 'বিজলী'র দ্বিতীয় পর্যায়। সম্পাদক ছিলেন দু'জন। সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও সুবোধ রায়। দু'জনেই কবি। প্রথম পর্যায়ের 'বিজলী' বেরোয় বোধ হয় ১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে। সম্পাদক ছিলেন নলিনীকান্ত সরকার। তৎকালে 'বিজলী'র লেখকদের মধ্যে ছিলেন বারীন ঘোষ, উপেন বাঁড়ুয্যে, শচীন সেনগুপ্ত এবং বোধ হয় তরুণ কবি নজরুল ইসলাম। এঁরা প্রায় সকলেই শ্রীঅরবিন্দের অনুগামী এবং বিপ্লববাদী। বারীন ঘোষ ও উপেন বাড়ুয্যে আন্দামান জেল ফেরৎ। সেই 'বিজলী' ছিল সাংবাদিক জগতের গৌরব। কিন্তু এ 'বিজলী' ও খুব জনপ্রিয়। এই কাগজে ছাপা হবার জন্য মাধুরী দেবীর সেই অক্ষম প্রবন্ধগুলির 'মিথ্যা খ্যাতি বেড়ে ওঠে কথায়-কথায়।' আমার নিজের লেখা ছাপা হবার পর আমার একটুও ভাল লাগত না! লেখাগুলি পাঠাতুম শ্রীরামপুর থেকে।

এই বছরে প্রথম প্রকাশ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি আরম্ভ করি। এক তরুণ বয়ঃকনিষ্ঠ বেকারকে খুঁজে পেয়েছিলুম। সে কাব্যোৎসাহী ও সাহিত্যরসিক। নাম সুবল মুখুজ্যে। থাকত বাগবাজারে। সে আমাকে দিয়ে দেশবন্ধু পার্কে আমাদের এক সান্ধ্য আড্ডায় আবৃত্তি করিয়ে নিত। আমার একাকী জীবনে সুবল আমার দোসর হয়ে উঠেছিল। সে পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরত। শ্রীরামপুরে চলে যেত আমার সঙ্গে। সারাদিন কাটিয়ে সে ফিরত বাগবাজারে। শ্রীরামপুরের গঙ্গার জলের পাতায় বসে আমরা দু'জনে রবীন্দ্রচর্চায় কাটাতুম। সুবলের

বাবার অবস্থা মোটামুটি ভালই। বাড়ীঘর নিজেদেরই। তার বাবা আপিস বেরিয়ে গেলে দুপুরবেলা বাবার হুঁকোর সে অম্বুরি তামাক খেত। আমিও ছুটির দিনে মধ্যেমাঝে তার বাড়িতে গিয়ে দুপুরবেলায় হুঁকো ধরতুম।

সুবলের বয়স আঠারো, আমার কুড়ি। আমরা উভয়ে ক্রমে ক্রমে উভয়ের নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠলুম। বাগবাজারের অন্নপূর্ণার ঘাটের ঠিক পাশে একটি সরকারী নহরের মাথায় শান-বাঁধানো সাঁকোর উপর দুজনে বসে আমরা পশ্চিম সূর্যাস্তের আভায় আরক্তিম গঙ্গার দিকে চেয়ে রবীন্দ্রনাথ মুখস্থ বলতুম। তখন 'চয়নিকা' কাব্যসংকলন 'সঞ্চয়িতা' হয়ে ওঠে নি! 'পূরবী-মহুয়া-পুনশ্চ' তখনও বেরোয় নি। আমার আবৃত্তির ফাঁকে ফাঁকে সুবল হাতে হাতে যে-তামাক সাজত, সে ঠিক অম্বুরি তামাক নয়! আমি যখন 'আহ্বান' কবিতাটি আগাগোড়া আবৃত্তি করতুম, তখন মনে হত, অত্যুৎকৃষ্ট মাদক সেবন ছাড়া এই বিস্ময়কর কবিতার রহস্য-আত্মার মূল ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করা যায় না! আমাদের এবম্বিধ নিষিদ্ধ ধূমপানের মধ্যে রবীন্দ্রকাব্য জড়িয়ে থাকত, এবং রাত এগারোটায় যখন বাড়ি ফিরতুম তখন দুই তরুণ যুবকের চক্ষু রবীন্দ্ররসে ঢুলুঢুলু হয়ে আসত!

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের রুশ বিপ্লব কেবলমাত্র ভলগা নদীতেই তুফান তোলে নি, সেই ঝড়ে হুগলি নদীতেও তরঙ্গের বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের পর বাঙ্গালী পল্টন যখন মেসোপোটেমিয়া থেকে ফেরত এল, তাদের সঙ্গে ফিরে এল এক হাস্যোচ্ছল তরুণ বাঙ্গালী কবি, কাজী নজরুল ইসলাম। তার সঙ্গে খাপ খাচ্ছিল না চলতি সাহিত্য ও সমাজজীবনের ধারার সঙ্গে। সে ঢেউ তুলেছে নতুন চেতনার। সাহিত্যের ধারাবাহিক ঐতিহ্যের ধার সে ধারে না, রবীন্দ্রনাথের শিষ্যকুলের সে কেউ নয়, তার চিন্তাধারার ভঙ্গী অন্য প্রকার। সে দলছাড়া, গোত্রছাড়া। সে বিপ্লবী ও বিদ্রোহী। সে সমাজ, ধর্ম, জাতি, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও কাব্যের নীতি—কিছুই মানে না। সে তার প্রত্যেক কবিতায় যেন একটা উচ্চকণ্ঠের আওয়াজ তোলে, যেটা নতুন। কাজী নজরুল ছাড়া আরেকজনকে দেখা যাচ্ছে, সে 'আত্মশক্তি' সাপ্তাহিকের শিবরাম চক্রবর্তী। তার বক্রোক্তি, বিদ্রূপ, অনুপ্রাস, প্রকাশের তীক্ষ্ণতা, একই শব্দের ধ্বনি নিয়ে বিভিন্ন কৌতুক, বাক্যরচনার চাতুর্য—সব মিলিয়ে শিবরাম চক্রবর্তী অনন্য। অন্য দিকে ধূমকেতুর মতো যাঁর আবির্ভাব, সেই কাজী নজরুল বার করলেন দ্বি-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'। চারদিকে নবসাহিত্য চেতনার একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

বাঙ্গলা সাহিত্যে বামপন্থা এল রুশ বিপ্লবের পর। সর্বহারাদের কথা এল, এল দারিদ্র্য ও দুঃখবাদের কথা। যারা অন্ন ও আশ্রয়হীন, যারা মাথা তুলতে গেলেই মাথা ঠোকে, নোংরা বস্তির যারা মানহারা নরনারী, যারা তাদের ক্লেদাক্লিষ্ট জীবনে আশা-আশ্বাসের আলো খুঁজে পায় না—তারা এসে পৌঁছল নতুন সাহিত্যভাবনার মধ্যে। বাঙ্গলা সাহিত্যে 'কমিউনিজম' শব্দটার প্রথম প্রচলন করলেন প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়। তিনি প্রিন্স ক্রপটকিনের কোনও একটি বইয়ের অনুবাদ প্রকাশ করলেন 'ভারতী'তে।

সাহিত্যে যখন এই প্রকার একটা ভাবান্তর চলছে, সেই সময় অতি আধুনিক সাহিত্যের আড্ডা 'কল্লোল' গোষ্ঠীতে একটা ভাঙ্গন ধরল এবং মুরলীধর বসুর নেতৃত্বে নতুন এক মাসিকপত্র বাঙ্গলা সন ১৩৩৫-এর আষাঢ় মাসে বেরিয়ে এল। নাম 'কালি-কলম'। সম্পাদকের মধ্যে যাঁকে দেখলুম তিনি হলেন 'কয়লা-কুঠি' সিরিজের সেই লেখক শৈলজা মুখোপাধ্যায়—যিনি আমার আঙ্গুলকাটা যতীনদার বন্ধু! এখানে এসে শৈলজা হয়ে উঠেছেন শৈলজানন্দ। এর আগে মেয়েলী নাম শুধু শৈলজা—বোধ হয় কাজে লাগত। আমার যতদূর মনে পড়ে শৈলজানন্দর আগে কোনও লেখক অথবা লেখিকা কুলি-কামিন, শ্রমিক-মজদুর প্রভৃতিদের নিয়ে এমন সার্থক ছোটগল্প লেখেননি। তাঁর এই অনন্যতা তাঁকে 'নাটের গুরু' বানিয়েছিল।

আমার কাছে কল্লোল আর কালি-কলম দুই ছিল সমান। আমি কালি-কলম-এ গল্প পাঠালুম, তিন দিনের মধ্যে কালি-কলমের পক্ষ থেকে আমার কাছে আমন্ত্রণপত্র এল। নাম সই, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

সেই বছর প্রথম দেখলুম কয়েকজন লেখক ও সম্পাদককে। তাঁদের মধ্যে প্রথম শৈলজানন্দ, যাঁর প্রকৃত নাম শ্যামল বা শ্যামলানন্দ। তারপর মুরলীধর বসু, পবিত্র গাঙ্গুলী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, দীনেশরঞ্জন দাশ, মণীশ ঘটক, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি। এদিকে দেখছিলুম জগদীশ গুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ, হেমচন্দ্র বাগচী ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। মাঝে মাঝে আসে আরও দুই তরুণ—গিরিজা মুখোপাধ্যায় ও হুমায়ুন কবির। কবিরকে কখনো বাঙ্গালীর পোশাকে দেখা যায় না।

আমিই যে মাধুরী দেবীর ছদ্মনামে 'বিজলী'তে লিখি—এই নিয়ে একদিন হাসা-হাসি হই-চই হয়ে গিয়েছিল। একে একে দেখেছিলুম সাবিত্রীপ্রসন্ন এবং সুবোধ রায়কে। একদিন দেখলুম তরুণ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁর জার্মানি যাবার প্রাক্কালে। আরেকদিন কল্লোল আপিসে দেখলুম বুদ্ধদেব বসুকে—তার বয়স তখন বছর আঠারো। খর্বকায় তরুণ —ঢাকা কলেজে বি. এ. পড়ে। ওর সঙ্গে ছিল সুদর্শন অজিতকুমার দত্ত। অজিতের ডাক-নাম টুনু, সেও কবিতা লেখে।

কল্লোল এবং কালি-কলম—উভয়েরই লেখক ছিল সর্বজনপ্রিয় নজরুল। সে থাকত তখন কেষ্টনগরে। কিন্তু তার সর্বাপেক্ষা নিকট বন্ধু হলেন নলিনীকান্ত সরকার এবং তার সব রকমের দায়ধাক্কা পোহাতে হত পবিত্র গাঙ্গুলীকে। যে কোনও আড্ডায় কাজী এলেই হাসি-তামাসার রসরঙ্গ চলত! তার প্রবল প্রাণশক্তির অতি প্রাচুর্য প্রত্যেক বন্ধুকে নাচিয়ে তুলত। সে নতুন নতুন কবিতা ও গান লিখে আনত। হারমোনিয়াম নিয়ে গান গাইতে বসে গানের প্রতি ছন্দে, সমে এবং মিলে তার হাসির ধমকে-ধমকে, যে আনন্দ মুখর হয়ে উঠত—সেই দৃশ্য যারা দেখে নি, তারা নজরুলকে চেনে নি। চারটি সামগ্রী হাতের কাছে পেলে নজরুল মহা খুশী হয়ে উঠত। এই চারটি সামগ্রীর দাম ছিল মোট ছয় পয়সা। ডবল ডিমের অমলেট, এক পেয়ালা চা, পান ও জরদা।

এই বছরে নজরুল তার একটি প্রসিদ্ধ কবিতা লেখে 'কালিকলম'-এ। কবিতাটির নাম 'মাধবী-প্রলাপ'। কলকাতার পুলিস মহলের বিবেচনায় এই কবিতাটি অশ্লীল বলে বিবেচিত হয়েছিল এবং সেজন্য সম্পাদক মুরলীধর বসু ও প্রকাশক শিশির নিয়োগীকে দু'চার দিন ধরে থানা-পুলিসে হাঁটাহাঁটি করতে হয়। এ ব্যাপারটি নিয়ে নিত্যানন্দলোকের অধিবাসী নজরুল যে সরস ও সুন্দর অশ্লীল বাক্যটি তার হাসির উচ্চরোল সহ উচ্চারণ করে, সেটি ছাপার অক্ষরে আর প্রকাশ করা চলে না!

আমি কল্লোল-এর প্রথম বছরের থেকে যেমন ওর লেখক, কালিকলম-এরও তেমনি। এই বছর থেকে কল্লোল-এর আকার হ'ল প্রবাসী ও ভারতবর্ষের মতো। পরের বছরে বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছিল। কল্লোল-এর এক গল্প-প্রতিযোগিতায় আমার 'নরায়ণ' নামক একটি ছোট গল্প পাঁচ টাকা প্রাইজ পেয়ে গেল! তখনকার দিনের পাঁচ টাকা! নিত্য উপবাসী ব্যক্তির মুখের সামনে যদি কেউ পোলাও-পরমান্ন তুলে ধরে—কেমন লাগে?

'কল্লোল'-এ মাঝে মাঝে ছাপা হচ্ছিল এক মেয়ে-কবির সনেট। সেগুলি উজ্জ্বল এবং মনোজ্ঞ। পরে কোথায় যেন শুনলুম তিনি অল্পবয়স্কা বিধবা। কিছুদিন বাদে এক সময় জেনেছিলুম, তিনি আমারই সহপাঠী নবকৃষ্ণ ঘোষের সহোদরা। এখন তিনি থাকেন আমারই মামার বাড়ীর পাড়ায় দীনবন্ধু লেনে। নাম রাধারানী দত্ত। একদা 'উত্তরা' সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তী ও আমি এলাহাবাদগামী এক ট্রেনের কামরায় শ্রীমতী রাধারানী দত্তকে প্রথম দেখি। তখনও তাঁর বিধবার সজ্জা। এই সুন্দরী ও মিষ্টভাষিণী তরুণীকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলুম।

লিলুয়ার এক বাড়িতে নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে বিধবা রাধারানীর বিবাহ হয়। কালিকলম ও কল্লোল গোষ্ঠীর প্রায় সবাই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলুম।

শনিবারে বিকেলে আসতুম কলকাতায়, সোমবার সকালে চলে যেতুম শ্রীরামপুর। কিন্তু আমার মনে বিদ্রোহের সঞ্চার হচ্ছিল। নিত্যদিন এক প্রকার অসন্তোষ আমাকে যেন পেয়ে বসে। মর্মের মূল থেকে উঠে আসে যেন এক অতৃপ্তি, সেটা আমার মনের দিগ্‌দিগন্তকে শ্রাবণের কালো মেঘের মতো ছেয়ে ফেলে। আবার ওরই মধ্যে মনে-মনে বিদ্যুৎলতার মতো এক-একটা কঠিন প্রশ্ন ঝলকিয়ে ওঠে। জীবন কি? পথ কি? পরিণাম কি? কি পেয়েছি এবং কীই বা পাই নি?

আমার সামনে দিয়ে বর্ষার ভরা ভাগীরথী ঢেউ তুলে সেই বটের ঝুরিকে নাচিয়ে নাচিয়ে ব'য়ে যেত। আমি ছমছমে সন্ধ্যায় ঘরে উঠে আসতুম।

সেদিন পঞ্চানন বলল, তোমার রিস্টওয়াচটা একটু হাতে পরতে দেবে ভাই? আজ একটু বেড়াতে যাব!

পঞ্চাননের মুখের দিকে তাকালুম। সে আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড়। —চল না, আজ দু'জনেই একটু বেড়িয়ে আসি?—পঞ্চানন উৎসুখ হয়ে উঠল।

মন্দ প্রস্তাব নয়। আমি তৈরিই ছিলুম। আমার হাতঘড়িটা আমিই ওর ডান হাতে পরিয়ে দিলুম। কারণ বাঁ হাতটা ওর নুলো। আজ তার সাজ-সজ্জার বাহার ছিল!

কাছারিপাড়া থেকে চাতরার এক নিরিবিলি পল্লী মাইল খানেকের মধ্যে। দু'দিকেই চালাঘর এবং পথ অন্ধকার। পঞ্চুদা বলল, ভয় পেয়ো না, আমার সঙ্গে সঙ্গে এসো! এ পাড়া আমার সব চেনা।

দূরে-দূরে পথের এক ধারে তেলের আলো জ্বলছিল। সেগুলো যেন ঠিক প্রেতিনীর চক্ষু! কতদূর যাচ্ছিলুম হিসাব করি নি। হঠাৎ এক স্থলে এসে পঞ্চানন দাঁড়াল। আমি কোনদিকেই এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি। এবার দেখলুম এক-একটি চালাঘরের দরজায় দু'তিনটি ক'রে মেয়ে হাসি-খুশী মুখে কিলবিল করছে। এক-এক দলের কাছে একেকটি কেরোসিনের কুপি জ্বলছে। তার থেকে ময়লা শীষ উঠছে। মেয়েগুলির চেহারা ভাল নয়।

পুলকিত কণ্ঠে পঞ্চানন আমাকে ডাকল, আরে, একটু কাছেই না হয় এলে! বলো না কাকে বেশি পছন্দ হয়? এই দ্যাখো, এটি হ'ল বীণাপাণি, ওটি খ্যান্তমণি, এপাশেরটি মাধু—

কাছে এগিয়ে এসে দেখলুম একে একে! অন্ধকারে সুস্পষ্টভাবে কারোকে সঠিক-ভাবে দেখা না যায় সেইটিই ওদের যেন ইচ্ছা! ওধার থেকে হঠাৎ একজন মেয়ে-ছেলে বলল, আমি গো আমি। হোটেলে রোজ আমার হাত থেকে পান নিতে ভুলে গেছ? সন্ধ্যের সময় আমি রোজ দু' ঘণ্টার জন্যে আমার ঘরে আসি। শুকো মাইনেতে কি আর ঘরকন্না চলে? দু'দুটো বাচ্চা—ইচ্ছে করে কেউ এ পথে আসে না! এসো, আর কেন চক্ষুলজ্জা—?

একদা সেই বিশ্বাসঘাতক চণ্ডাল বিধুবাবু আমাকে পড়তে দিয়েছিল ডস্‌টয়ভস্কির 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট'। আমি নিজে এখন সেই নৈরাশ্যবাদী দুঃখী রাসকল-নিকভ! আমার মুখ দিয়ে বিড়বিড় করে উচ্চারিত হচ্ছিল, "Sonia Sonia, I did not bow down to you personally, but to the suffering humanity in your person."

পঞ্চানন ডাকল, ও কি ভাই, ফিরে যাচ্ছ নাকি?

—হ্যাঁ—

ছুটে এল পঞ্চানন। মিনতি ক'রে জানাল, আমাকে তবে একটা টাকা ধার দিয়ে যাও ভাই—

একটা টাকা তার হাতে দিয়ে সেই সন্ধ্যায় ছুটি নিলুম!

সেটা শ্রাবণের শেষ দিকে। রাত দশটার পর থেকে আকাশ যেন বজ্রকণ্ঠে আমাকেই ডাক দিচ্ছিল! সেই বজ্রে শুনছিলুম বংশীধ্বনি! দুকূল-প্লাবিনী গঙ্গার বটের ছায়াতল থেকে সেই বাঁশী আমাকে ডাকছিল! এমন সময় নিচের তলায় পশ্চিমের গলি থেকে সেই মসলার দোকানের ছোকরাটা দোকানের ঝাঁপ ফেলার আগে প্রত্যেক দিনের মতো আজও উদাত্ত কণ্ঠে গান গেয়ে উঠল: "আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে/নিজেরে করিতে গৌরব দান, নিজেরে না যেন করি অপমান—"

ঝম-ঝম-ঝম করে নুপুরে-নিক্কণে শ্রাবণের বৃষ্টি নেমেছিল অন্ধকার রাত্রে। আমার ঘুম এসেছিল। এ পাশে পুলিস সাহেব নিদ্রায় নিশ্চুপ, ওপাশে সুখের নিদ্রার মধ্যে পঞ্চাননের নাক ডাকছে।

কখন্ ঠিক মনে নেই, রাত কত তাও জানিনে। হঠাৎ এক সময় ছাঁৎ ক'রে ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমার মাথার দিকে কার যেন নিঃশব্দ পদসঞ্চার অনুভব করলুম। তখনও বাইরে শ্রাবণের প্রবল ধারাবর্ষণ চলছে। রাত নিশুতি। আমি কাঠ হয়ে পড়ে রইলুম।

ঈষৎ বিস্ময়ে আমি সেই ঘন অন্ধকারে চোখ মেলে দেখি, পুলিস সাহেব আমার জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে অতি সন্তর্পণে টাকা-পয়সাগুলি বার ক'রে নিয়ে আবার তাঁর জায়গায় ফিরে গিয়ে চুপি চুপি শুয়ে পড়লেন। আমার পকেটে প্রায় টাকা চারেক ছিল। মাস কাবার হ'তে এখনও পাঁচ-ছ'দিন বাকি।

হোক না কেন পুলিসের কর্মচারী! রোজগার ত পঁয়তাল্লিশ টাকা। উপরি নিয়ে না হয় পঞ্চাশ। ঘরে আমারই মতো বিধবা মা, অবিবাহিত বোন, বেকার ভাই, ধোবা-নাপিত, লোক-লৌকিকতা,—তার ওপর নিজের খরচ অন্তত কুড়ি টাকা—। পুলিস চোর নয়, কেউই চোর নয়,···অবস্থার দোষে মানুষ চোর হয়ে ওঠে। ধনাঢ্য ব্যক্তি পকেট মারে না।

যাক্ আমি এখন সর্বস্বান্ত, সুতরাং নিশ্চিন্তে আবার ঘুম এল!

হয়ত আমি এই শ্রীরামপুরেই দাঁড়িয়ে প্রকাশ করতে পারতুম, এখানকার সম্ভ্রান্ত লাহিড়ীরা, সাণ্ডেলরা, কোনও কোনও মৈত্র—আমার নিকট-আত্মীয়। বলতে পারতুম আমার পিসিমার অতি-নিকট কুটুম্ব হলেন রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর গোষ্ঠীর। কিন্তু কেন? ওদের সঙ্গে আত্মীয়তা থাকলেও আত্মার কুটুম্ব ওরা কেউ নয়? ওদের অস্তিত্ব কেন স্বীকার করব আমার জীবনে?

আমি সর্বহারা—এই আমার অহঙ্কার। দারিদ্র্য আমার শ্রেষ্ঠ ভূষণ।

॥ ১৬ ॥

কয়েকমাস আগে একবার হঠাৎ আমার একটা দুর্মতি হয়েছিল, আমি কলকাতার হেস্টিংসের পাড়ায় মিলিটারি ব্যারাকে বসে একটি পরীক্ষা দিয়ে এসেছিলুম। বিষয় ছিল ইংরেজি সাব্‌সটেন্স, ইংরেজি ডিকটেশন ও অঙ্ক। পরীক্ষার ফীস নিয়েছিল পাঁচ টাকা। পরীক্ষার্থী ছিল জনদশেক।

দিন পনেরো পরে জবাব এসেছিল, আমি পাস করেছি এবং অমুক দিনে অমুক সময়ে এবং অমুক স্থলে আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

যথানির্দিষ্ট দিনে গিয়ে দেখি, এটা আলিপুরের হাওয়া-আপিস। সেখানে একটি

কক্ষে বসেছিলেন সামরিক পোশাকে এক লেফটেনাণ্ট কর্নেল। তিনি ডাক্তার, তিনিই আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন। খোঁজ নিয়ে জানলুম আমিই একা,—বাকি পরীক্ষার্থীরা সবাই ফেল মেরেছে।

এক সময় কর্নেল আমাকে ডেকে অত্যন্ত আপত্তিকরভাবে আমার শরীর এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উত্তমরূপে পরীক্ষা করলেন। আমি হেঁট হলুম, চিৎ এবং উপুড় হলুম। শুয়ে শুয়ে একখানা করে পা তুললুম, এবং সেই পা ধরে সাহেবটা হ্যাঁচকা দিতে লাগল। আমাকে দম নিতে বলল, কাশতে বলল, বুক ফোলাতে বলল, এবং এক-আধবার নীতিবিরুদ্ধ ও অশ্লীল পরীক্ষা করল। সাহেবরা যে নেটিভদের শরীরে এভাবে হাত দেয়, এই প্রথম জানলুম।

তারপর লোকটা হাত ধুয়ে এসে টেবিলে বসল, এবং কি যেন লিখতে লিখতে আমাকে প্রসন্নমুখে বলল, তোমার মতো পারফেক্ট স্বাস্থ্য কোন বাঙ্গালী ইয়ং ম্যানের দেখি নি। আচ্ছা, এবার যেতে পারো। পরে খবর পাবে।

আমি সেলাম ঠুকে পালিয়ে বাঁচলুম। আমি তখনও একটু রোগাটে। কিন্তু সাহেবের মুখে স্বাস্থ্যশ্রীর সুখ্যাতি এমন বস্তু যে, কিছুদিন গর্বের সঙ্গে নেচে বেড়ালুম। নাঃ, এবার মিলিটারি জীবন আমাকে ডাক দিচ্ছে। আমার মধ্যে যে ক্ষাত্রশক্তি পুঞ্জীভূত, এবার তার উদ্বোধন ঘটুক। আমি সৈন্য বিভাগে ঢুকব, বন্য বর্বর জীবন যাপন করব। অরণ্যে, প্রান্তরে, মরুভূমে, মধ্যপ্রাচ্যে, সুদূর প্রাচ্যে, সেলেবিস বোর্নিওতে, দক্ষিণ আমেরিকায়, বারমুডায়, কানাডায়,—সর্বত্র যাব অজানা অনামা এক বাঙালী তরুণ। কেউ জানবে না আমার পরিচয়, কেউ খোঁজ করবে না আমার। আমার হাতে থাকবে শুধু সসাগরা ধরিত্রী! আমাকে বীর্যবান হতে হবে, দুঃসাধ্যের পথে নামতে হবে। আমি কঠিন নিবিড় ক'রে বাঁচতে চাই, আমি দুর্ধর্ষ হ'তে চাই। সমস্ত ভীরুতার বিরুদ্ধে, অনড় জড়ত্বের বিরুদ্ধে, অন্ধ কুসংস্কার আর কুশিক্ষার বিরুদ্ধে—আমার হবে প্রচণ্ড প্রবল জয়যাত্রা। আমি যুদ্ধে যাব, আগুন আর বিপ্লবে ঝাঁপ দেবো, স্যাপার্স আর মাইনার্সের মতো পথ কাটতে কাটতে এগোবো। আমার তেজিয়ান ঘোড়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটবে, ধুলো উড়বে, কপাল বেয়ে গড়াবে আমার ঘাম আর রক্তের ধারা,—আমাকে সৈনিক হ'তে হবে।

আলিপুরের ট্রামরাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আমি যেন আমার অন্তরাত্মার মূল শিকড় ধরে কাঁপছিলুম এক বিচিত্র উত্তেজনায়। না, আমার পথ সাহিত্যের পথ নয়, আমার পথ রুক্ষ রূঢ় জীবনের। আর আমি কলম চাইনে, এবার চাই বন্দুক। দারিদ্র্যের পঙ্কিল অবমাননার তলায় তলিয়ে কেন আমি লিখতে যাব বস্তির বীভৎস নোংরামির কথা—কেন লিখতে যাব নৈরাশ্যের, দুঃখবাদের, বেদনার ও করুণার কাহিনী? কোন্ দেশে নেই অন্ধ, খঞ্জ, আতুর, পাগল, চোর, লম্পট ও ভিখারী-কাঙ্গালী? কোন দেশে নেই বেশ্যা আর যৌনসরীসৃপ। আমি কেন বানাতে যাব বেশ্যাকে সতী ও লম্পট চরিত্রহীনকে প্রেমিক? না, পারব না। রিরংসাকে মনোহর সজ্জা দেবো না!

এবার আমি সাহিত্যের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলুম। এবার আমি চাইছি সমরানল

জবলুক। আমি জন্মবিপ্লবী, বিপ্লব-ঘোষণার দিনে আমার জন্ম। পৃথিবীর কোথায় কোন্ দেশে বিপ্লবের আগুন জবলেছে, আমি মনে মনে তাদেরই সঙ্গী। আমি চাইছি বিরাট এক ভাঙ্গন, চাইছি ছারখার, চাইছি পুরাতনের সর্বনাশা ধ্বংস, আমি চাইছি নতুন এক পৃথিবী। পরিবর্তন নয়, বিবর্তনও নয়,—চাইছি নবজাতককে!

আশ্বিনের মাঝামাঝিতেও বৃষ্টি হচ্ছিল।

আজ শনিবার, আমার মাইনে পাবার দিন। আমার আগেই পঞ্চানন আর পুলিস সাহেব বেরিয়ে গেল। আমার হাতঘড়ি, বোতাম, একটা টাকা ও একটি পানজাবি—আজও পঞ্চানন ফেরত দেয়নি। ওগুলোর ওপর আমারও যেন বিতৃষ্ণা এসে গেছে। আমার পাতলা টিনের বাক্সটায় ছিল আয়না-চিরুনি, সেগুলি এখন পঞ্চাননের নিজস্ব। আমি যে ওদের মালিক, একথা আমিও ভুলতে বসেছি।

স্নানাহার সেরে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বড় ডাকঘরে গিয়ে হাজির হলুম। কী সমাদর সেখানে আমার! গত মাসে মোট চারদিন আমার কামাই, তবু মাস্টারমশায় পরম স্নেহবশত খাতাপত্রে সে-সব 'ম্যানেজ' করে রেখেছেন। আমার অনন্যসাধারণ যোগ্যতা সম্বন্ধে ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টার্সে তিনি নোট পাঠিয়েছেন। কী সৌভাগ্য, সেবার সন্দেহবশে পুরনো খাতাপত্র ঘেঁটে একটা মোটা অঙ্কের ভুল বার করে দিয়েছিলুম, তাই রক্ষে। মনি অর্ডার, রেজিস্টেশন, সেভিংস, স্ট্যাম্পস—এদের হিসেব—মাস্টারমশাই বলেন, আমার নখদর্পণে! ইনসিয়োর, পার্সেল, মেলব্যাগ মেলানো, রেল-পিওনের রসিদ, টাকাকড়ি গুনে মেলভ্যানে তুলে দেওয়া—এসব আমি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি কে করছে? মাস্টার মশাইয়ের কেবলই ভয় পাছে আমার মতন সুযোগ্য কর্মীকে হেড কোয়ার্টার্সে বদলি করে নিয়ে যায়। আমার সহপাঠী বিজন, তার মামা যে হেড আপিসের সর্বেসর্বা। আমার ভবিষ্যৎ উজ্জবল থেকে উজ্জবলতর হবে।

টিফিন নেই আজ। তবু বেলা একটা নাগাত মাস্টারমশাই মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য ভিতরে গেছেন। সেই সুযোগে অন্যান্য কেরানী ও পিওনরা একটু বাইরে গিয়ে হাঁপ ছাড়ছে। আমার নিজের অনেক কাজ, একে একে সাজিয়ে গুছিয়ে তাড়া বেঁধে নোট লিখে রাখছিলুম।

এমন সময় দুটো ছেলেমেয়ে ভিতরের দরজাটা একটু ফাঁক করে আমার দিকে চেয়ে কী যেন বলাবলি করছিল নিজেদের মধ্যে। আমি একবার মাথা তুলে তাকালুম। হাফ প্যাণ্ট পরা ছেলেটা বলল, আপনার ক্ষিধে পায় না?

হেসে বললুম, না—।

ওদের পিছনে বোধ হয় টেঁপি এসে আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। সম্ভবত তারই ইঙ্গিতে ফ্রকপরা মেয়েটা এবার বলল, ক্ষিধে পেলেই ভেতরে চলে আসবেন!

—সে কি? ক্ষিধে পেলেই আমাকে খাওয়াবে?

—হ্যাঁ, ঠিক খাওয়াবো। আপনি যে আমাদের জামাইবাবু হবেন!

অবাক হয়ে ওদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকালুম। ওরা খিল খিল করে হেসে হুড়মুড়িয়ে পালালো। বিস্ময় বিরক্তিতে আমি চুপ করে গেলুম।

আগাগোড়া নির্ভুল হিসেব করে সব গুছিয়ে রেখে যখন ছুটি নিলুম, বেলা তখন আড়াইটে। আবার আসতে হবে সেই সোমবার! আবার শুরু হবে নতুন করে সেই "দিনযাপনের প্রাণধারণের গ্লানি'! আপাতত বিদায় নিলুম!

মাইনে পঁয়ত্রিশ টাকা—সোজা কথা নাকি? ডাকঘরে বসেই পনেরো টাকা মনি অর্ডার করলুম মায়ের নামে। রাস্তার দোকানে বসে বেশ মোটা জলখাবার খেয়ে নিলুম। ওতেও 'হার্ড ক্যাশ' বেরিয়ে গেল দশ পয়সা। পাইস-হোটেলে এসে ম্যানেজারের দেনা শোধ করলুম সাড়ে চার আনা। ধোবার ঘরে দু' আনা বাকি পড়েছিল—ওর দরজা ঠেলে নাকের ওপর ধরে দিলুম।

ব্যস, আর আমার কোন দেনা নেই। আমি অঋণী, আমি স্বাধীন, আমি অবারিত। মুক্ত বিহঙ্গ কাকে বলে? কাকে বলে ছিন্নবাধা? কাকে বলে সকল সংস্কারমুক্ত বৈদান্তিক? "দাও আমারে অশোক মন্ত্র অভয় মন্ত্র তব, দাও আমারে অমৃতমন্ত্র, দাও গো জীবন নব।"

আমার আত্মার আর্তনাদ আমাকে ক্ষণে ক্ষণে অস্থির করে তুলছে। আমাকে নব-জীবন দাও, অন্ধকারে পথ চিনিয়ে দাও, চারিদিকের পঙ্কিল নরককুণ্ড থেকে আমাকে তুলে ধরো, আমাকে উৎক্ষিপ্ত করো মহাশূন্যে—

ঘরে এসে টিনের বাক্সটার আংটা ধরে তুলে নিয়ে বেরিয়ে যাবো—এ কি, এত হালকা কেন? একটু অবাক হয়ে মেঝের উপর ব'সে কব্জাটা খুলে দেখি, ভিতরটা সম্পূর্ণই শূন্য। তিন-চারখানা ধুতি, গোটা দুই পানজাবি, নতুন গেঞ্জি, খান চারেক রুমাল, সাবান, তেল, সোয়ান-মার্কা পেন, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম—কোনটার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। মা দিয়েছিলেন ছোট্ট একটি প্রসাদী ফুলের পুঁটলি, সেইটি পড়ে আছে শুধু এক কোণে। আর আছে জেবের মধ্যে খান-তিনচার চিঠি আমার নামে।

কে চুরি করেছে, স্বচক্ষে দেখি নি! কেন করব সন্দেহ পঞ্চাননকে অথবা পুলিস সাহেবকে? কেনই বা অনুমান করব?

পোড়া মুখে আমি আবার হাসছিলুম!

যাই হোক, চিঠিপত্রগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিলুম। প্রসাদী ফুলের পুঁটলিটি পকেটে পুরলুম। তারপর টিনের বাক্সটা নিয়ে নিচে নেমে এলুম। নিচে তখন রাত্রের রান্না-বান্নার আয়োজন চলছে। মাংস রান্নার গন্ধ বেরিয়েছে।

ম্যানেজার বলল, বাড়ি যাচ্ছেন নাকি, বড়বাবু?

বললুম, না, যাচ্ছিনে। শুনুন, এই স্যুটকেসটা পঞ্চুদার, ওকে ফেরত দেবেন। আমি যাচ্ছি একটু বিশেষ কাজে—

মিথ্যা বললুম—গত্যন্তর ছিল না। পিছন থেকে ম্যানেজার বলল, এ-বেলা মটন কোর্মা হচ্ছে, খেয়ে বলবেন কেমন! দশ পয়সা ফুল প্লেট!

প্রসাদী ফুল রইল পকেটে—আমি চললুম। ওটা যে আমার দৈবের প্রতি অখণ্ড বিশ্বাস, তা নয়। ওর মধ্যে আমার মা রইলেন। যতদূরে আমি যাব, মা যাবেন সঙ্গে! খানা-খোন্দলে পড়তে পারি, বিপথগামী হতে পারি, বিপদে দুর্গমে দুর্গতিতে

জড়িয়ে পড়তে পারি—মা থাকবেন সঙ্গে! আমি সর্বহারা, কিন্তু মা-হারা নয়!

বর্ধমানের ট্রেনে আমি উঠে বসলুম।

বৃষ্টিতে ভিজেছে জামাকাপড়। তা ভিজুক, হাওয়ায় এখনি শুকিয়ে যাবে। এখন চারটে বাজে, ছটার মধ্যে বর্ধমান। ডেলি প্যাসেনজারদের ভিড়ের মধ্যে বসে ভাবছিলুম সরকারী চাকরি আগুনে পোড়ে না, জলে ডোবে না। শুধু তাই নয়, সেই চাকুরে-ব্যক্তি নিখোঁজ হলে চাকরি ছোটে তার পিছু পিছু।

যাই বলো, আজ আমি বাঁচলুম। চাকরি মানেই পরের অধিনতা আর বাধ্য-বাধকতা। আমি কিছু না, আমার স্বকীয়তা কিছু নেই, আমি যেন সরকারের বিরাট যন্ত্রশালার সামান্য একটি স্ক্রু মাত্র, যন্ত্রীরা আছে পিছনে। আমার ইচ্ছার কিছু দাম নেই, শুধু তাদের ইচ্ছার ক্রীতদাস আমি!

বাইরে আকাশ অন্ধকার, বৃষ্টি পড়ছে অবিশ্রান্ত। দু-দিকে সবুজবর্ণ শস্য-প্রান্তর বর্ষার দুর্যোগে যেন খাঁ খাঁ করছে। এ বছর দেবীর নৌকায় আগমন। ফল, শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা!

একে একে অনেকগুলি স্টেশন পার হয়ে গেল। বর্ধমানে যখন গাড়ি এসে থামল তখন সঠিক সন্ধ্যা হয়নি। বৃষ্টি ধরেনি, কিন্তু কমে গেছে। স্টেশনে নেমে এক পেয়ালা চা খেতে ইচ্ছে হয়েছিল—কিন্তু থাক। স্টেশন থেকে বেরিয়ে দেখলুম, সামান্য টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আমি একটা বিশেষ পথ ধরে চললুম সেরিস্তা-দার সাহেবের বাড়ি।

বেশি নয়, মাইল খানেক, মিনিট পনেরোর পথ।

অবশেষে এক বাগানবাড়ির ভিতর ঢুকে সোজা দোতলায় উঠে এলুম।

—আরে, তুমি?—ছোড়দিদিমা হাঁকলেন।

—এ কি, তুই হঠাৎ?—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী চেঁচিয়ে উঠল। এটি বিশ্বনাথের ছোটমামার বাড়ি। তিনি এখানকার সেরিস্তাদার ফণীন্দ্রনাথ আচার্য। ওরা সবাই ডাকে 'ফতোমামা'।

ছোড়দিদিমার চেহারাটি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা! দাদামশায় লম্বা সৌম্য পুরুষ। তিনি কানে কম শোনেন, তাই একটা যন্ত্র কানে লাগানো থাকে। অতি ভদ্র ও অমায়িক। আমাকে দেখে বললেন, চাকরি করবে? আমার হাতে আছে একটা—

বললুম না—চাকরির শখ মিটেছে। এবার থিয়েটারে নামব, দৌবারিকের পার্ট দিয়ে আরম্ভ করব। আপনি ওঁদের একটু বলে দিন—

দিদিমা বললেন, সে তো চাকরের পার্ট!

—সেই ত ভাল, সবচেয়ে নিচে থেকে আরম্ভ!

ওঁরা সব হাসতে লাগলেন।

আহারাদির পর রাত্রে একটি ঘরে বিশ্বনাথ ও আমার বিছানা একটাই পড়ল। মশা খুব, তাই পাখা খোলা। শুয়ে শুয়ে বললুম, আমাকে ডেকেছ কেন?

বিশুকাকা বলল, তুই আমাকে কাশী নিয়ে চল, তোর সেখানে অনেক চেনা।

সেখানে ত থিয়েটার নেই ?

—থিয়েটার ! থিয়েটার আমি আর জীবনেও করব না, অনেক শিক্ষা হয়েছে।

হেসে বললুম, কোন শিক্ষাই তোমার হয়নি বিশুকাকা। এই নিয়ে বার তিনেক বড়বাবুর সঙ্গে তোমার বিরোধ বাধল। কেন বাধল, আমি বেশ জানি। তোমার সুন্দর চেহারা ও 'দেবচরিত্রই' তোমার শত্রু।

বিশ্বনাথ আমার চেয়ে দশ-বারো বছরের বড়। এবার ফস করে সে ধমকিয়ে উঠল, বলল, খুব ফাজলামি শিখেছিস, না ? 'অনড্বান' কোথাকার।

—ফাজলামি নয় শোনো।—আমি বললুম, বড়বাবুর সঙ্গে তোমার বিরোধের খবর শুনলে দেশের লোক কি বলবে ? তুমি দেবচরিত্র মানে দেবরাজ ইন্দ্রের চরিত্র! তোমার ইন্দ্রত্ব বড়বাবু আর কতদূর সইবেন ? তুমি ত 'বজ্র অফিস' নও, বজ্র অফিস হলেন তিনি। হও না কেন তুমি সহোদর, বড়বাবু তোমার অবাধ্যতা আর বাড়াবাড়ি সইবেন কেন ?

কিছুক্ষণ কন্দর্পকান্তি বিশ্বনাথ চুপ করে রইলেন। পরে বললেন, থাক ও-সব কথা। আমি এখন সন্ন্যাস নিতে চাই, তুই আমাকে সাহায্য কর। আমি বিশুদ্ধানন্দর কাছে দীক্ষা নেবো। চল্ আমরা দুজন কাশী যাই।

আমি খুব হাসছিলুম। বললুম, অর্থাৎ 'গন্ধবাবা'র সাকরেদি করতে চাও! কিন্তু তোমার জন্যে যে 'বিশুদ্ধ কাননে' আগুন জ্বলবে, সেটি কি গন্ধবাবা নেবাতে পারবেন ?

—কেন এ-সব চালাকি করছিস ? কেন আগুন জ্বলবে ?

—এই যে বললুম তুমি দেবরাজ—সেই কারণে!—আবার হেসে বললুম, শোনো তবে রবি ঠাকুরের দুটো লাইন : "যেথা চলিয়াছ সেথা পিছে পিছে স্তবগান তব আপনি ধ্বনিছে—।" আমি ছাড়া তোমায় কেউ এত ভাল চেনে না—তোমার সব খবর আমার নখদর্পণে !

বিশ্বনাথ বললেন, নে, যত পারিস গালমন্দ কর, কিন্তু সন্ন্যাসী আমি হবই।

—তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসিনী কে হচ্ছেন ?

—সন্ন্যাসিনী ?—বিশুকাকা বলল, ওরে অনড্বান, এবার ঘুমো।

তিনি নিজেই পাশ ফিরে শুলেন। তখন গভীর রাত !

মনে করেছিলুম ছোড়দিদিমার এখানে বেশ কয়েকদিন কাটাবো এবং অতিশয় ভুরি-ভোজের মধ্যে ডুবে থাকব। কিন্তু অঙ্গে-বঙ্গে-কলিঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে। তিন দিনের দিন 'নাটমন্দির' থেকে শিশিরবাবুর বার্তা এসে পৌঁছল তাঁর ফতোমামার কাছে : "বিশু নিরুদ্দেশ হবার পর আমরা কেঁদে-কেঁদে বেড়াচ্ছিলুম। পনেরো দিন পরে আজ খবর পেলুম সে তোমার ওখানে। গলায় গামছা দিয়ে করজোড়ে জানাচ্ছি, ওরে বিশু তুই যেখানেই থাকিস, ত্বরায় আমার কোলে ফিরে আয়। ইতি—'

বিশুকাকা বোধ হয় এইটিই চাচ্ছিল। সে আগে একবার প্রাণ খুলে হেসে নিল।

আমিও সেই সঙ্গে হাত জোর করে বললুম, হে দেবরাজ, ঝড়-মেঘ-বৃষ্টির দেবতা, এবার আবার তুমি দয়া করে ফিরে যাও তোমার নৃত্যসভায়! হে ইন্দ্র, তোমার পলায়নের মূল কারণগুলি আমি জানি, নরনারী নির্বিশেষে যাঁরা তোমার জন্য অশ্রু-ত্যাগ করছেন, তাঁদের সকলকেই উত্তমরূপে চিনি। আমি বিশ্বাস করি, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনে তুমি শিশিরকুমার অপেক্ষা অনেক বড় অভিনেতা!

—থামু, অনড্বান!—বিশ্বনাথ মুখ লুকিয়ে সরে পড়লেন।

সে-যাত্রা সন্ন্যাস নেওয়া তৎকালে স্থগিত রইল, এবং বিশ্বনাথ সোৎসাহে বেলা দেড়টার ডাক-গাড়িতে কলকাতা রওনা হলেন। আড্ডাটা যখন ভেঙেই গেল তখন আমিই বা এখানে ঝুলে থাকি কেন? ছোড়দিদিমা ও দাদামশায়ের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও আমি বেরিয়ে পড়লুম বিকালে এবং সন্ধ্যার দিকে পোনে পাঁচ টাকার টিকিট কিনে এক নিরিবিলি থার্ড ক্লাসে উঠে কাশীযাত্রা করলুম। চলো তীর্থ কাশী। 'হে ভবেশ, হে শঙ্কর, সবারে দিয়েছ ঘর, আমারে দিয়েছ শুধু পথ!"

কী সুন্দর লাগল সন্ধ্যারাত্রির আসানসোল। কী মধুর মনে হচ্ছিল ধানবাদ গোমো আর হাজারিবাগ রোড। তারপর গাড়ি যখন গুর্জান্ডির অন্ধকার সুড়ঙ্গলোকে ঢুকল—তখন এসেছে দুই চোখে আমার ঘুমঘোর। সব ঘুম আমার সুখের ঘুম—জাগরণ হ'ল দুঃখের। "যত দুঃখ পৃথিবীর/যত পাপ যত অমঙ্গল/যত অশ্রুজল, যত হিংসা হলাহল—"

কাঠের বেঞ্চের উপর পা ছড়িয়ে শুয়েছিলুম, গাড়ি ফাঁকা। পুজোয় আর বড়দিনে শুধু ভিড় হয়, অন্য সময় একজন যাত্রী একখানা পুরো বেঞ্চ নিয়ে থাকে। ভ্রমণেও আনন্দ। খাঁটি ভয়সা ঘিয়ের পুরি আট আনা সের। অর্থাৎ এক-একখানা পয়সা-পয়সা। এক পয়সার চিনাবাদাম খেতে খেতে পঞ্চাশ মাইল গাড়ি চলে যায়। সকালবেলাকার ব্রেকফাস্ট—দুটো ডিমের পোচ, দুখানা মাখন টোস্ট, একটা কলা, ছোট এক পট চা—মোট চার আনা। এক মণ মোট বইলে স্টেশনের কুলি এক আনা। বেনারস সিটি বা ক্যান্টনমেন্ট বা সিকরোল থেকে সোনারপুরার সড়ক পর্যন্ত একা ভাড়া দু' আনা। সাইকেল-রিকশা তখন জন্মায় নি।

পরদিন সকাল আটটায় সোনারপুরার বড়বাড়িতে এসে পেঁছিলুম। এ আমার নিঃসন্তান রায়বাহাদুর মেসোর বাড়ি। যেহেতু নিঃসন্তান এবং অবস্থা সচ্ছল, সেজন্য মাসিমাকে ঘিরে মৌমাছিরা থাকে। মেসোমশাই মারা গেছেন কয়েক বছর আগে। আমার অন্য দুই মাসির দুই ছেলেকে ওঁরা মানুষ করেছেন, সুতরাং তারাই এই সমস্ত স্থাবর সম্পত্তির মালিক হবে, এটি বলাই বাহুল্য। আমি আসি-যাই, এই আমার আনন্দ। আমি এলে গৃহকর্ত্রী খুশি হন সম্ভবত এই কারণে যে আমি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। কাশীতে আসি আমার আত্মিক আকর্ষণে।

এবারে 'বড়বাড়ি' জমজমাট। আমার সবচেয়ে বড় লাভ আমার দিদিমা, তিনি এখন কাশীবাসিনী। বয়স প্রায় আশি। তাঁর পেটে যে দস্যুর জন্ম, সেই মামা আছেন পাশের বাড়িতে। মামী তাঁর করাল গ্রাস থেকে ফসকিয়ে পালিয়েছেন বাপের

বাড়ি কেষ্টনগরে। মামার অন্নবস্ত্র ও ঘরভাড়া যোগাচ্ছেন তাঁর ধনবতী সহোদরা। কিন্তু বৃদ্ধ মাতুল এখনও লাঠি ঠুকে মাঝে মাঝে হুমকি দিচ্ছেন, এবার এলাহাবাদ হাইকোর্টে দিদিমার বিরুদ্ধে তিনি এক নম্বর মামলা ঠুকবেন। তাঁর পিতা ফলনা ভট্টাচার্যির কলকাতার সম্পত্তি বেনামে স্ত্রীধন বলে বিক্রীত হয়েছে, সেই সম্পত্তি তিনি গোপাল মল্লিকের হাত থেকে উদ্ধার করবেন।

দুর্যোধন তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত আপন সত্যে অবিচল ছিলেন। আমার ধারণা, সকলের আগে মামাই প্রথম স্বর্গে পৌঁছবেন। হয়েও ছিল তাই। বিরাশী বছর বয়সে দিদিমা পুত্রহারা হয়েছিলেন।

কী আনন্দ কাশীতে। অহল্যাবাঈ ঘাটে এবারে দেখছি ইলেকট্রিকের আলো। পুজোর আর দেরি নেই। দোকানপাটের সাজসজ্জা চলছে। বিশ্বনাথের গলিতে বাঙ্গালী দোকানদাররা বেনারসী শাড়ির ভাণ্ডার নিয়ে বসেছে। সমগ্র কাশী খাদ্যের প্রাচুর্যে ভরা। এক সের ভাল সন্দেশ আট আনা। রাবড়ি পাঁচ আনা। দশ সের ভাল দুধ এক টাকা। কাটা রুই চার আনা। প্রায় এক পোয়া মাছ ফাউ। কাশী-বাসীরা অধিকাংশ নিরামিষ খায়, আমরাও তাই। মাংস বা ডিমের বাজার নেই। শুধু কিশোরদাদাদের রান্নাঘরে মাছ রান্না হয়।

আমার ডাকঘরের চাকরি নেবার আগে সুযোগ পেলেই কাশী আসতুম। ১৯২৪-এ দিলীপকুমার রায় কাশীর পাড়ায়-পাড়ায় গান গেয়ে অমৃতের প্রবাহ এনে দেন। তাঁর পরম সুন্দর যৌবনশ্রী, তাঁর কণ্ঠের অপরূপ মাধুর্য, তাঁর স্বভাবচরিত্র ও ব্যবহারের নির্মলতা—এগুলি আমাদের মনকে মুগ্ধ ও অভিভূত করেছিল। তাঁর উদাত্ত মধুর কণ্ঠের সেই 'বঙ্গ আমার জননী আমার, মলয় আসিয়া কয়ে গেল কানে, মুঠো মুঠো রাঙ্গা জবা কে দিল তোর পায়ে মা গো—' এবং আরও বহু গান স্মরণীয় হয়ে আছে। ওঁর সঙ্গে থাকতেন হাসির গানের নলিনীকান্ত সরকার মশায়। গানে গানে ওঁরা পাগল করছিলেন সমগ্র বাঙ্গালীটোলাকে। ওঁদের আসর বসতো দেবনাথপুরার গোপালবাড়িতে, সোনারপুরায়, পাঁড়ে হাউলিতে, তিল-ভাণ্ডেশ্বরে, রামাপুরায়—এবং আরও নানা পল্লীতে। আমার বন্ধু কালী মাস্টার, বৈদান্তিক কেদারনাথ, বিদগ্ধচিত্ত প্রফুল্ল, সুরসিক পণ্ডিত ননী—আমরা সবাই দিলীপকুমারের গানের নেশায় উন্মত্ত হয়ে ওঁদের পিছনে পিছনে ধাওয়া করতুম। 'উত্তরা'র সুরেশ চক্রবর্তী ছিল ওঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। তখন 'উত্তরা' একখানি শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র এবং প্রবাসী বাঙ্গালীর মুখপত্র। 'উত্তরা'র লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, ধূর্জটি মুখুজ্যে, রাধাকমল, কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায় ইত্যাদি।

এবারে যাঁর কাছাকাছি এলুম, তাঁকে দূরের থেকে বহুকাল ধরে দেখে এসেছি। তখন থাকতুম মানিকতলায় শুঁড়িপাড়ার ভাড়া বাড়িতে। অদূরে আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে লোহাপটির পাশেই এক বাড়িতে থাকতেন শিশির ভাদুড়ীরা, আর ইনি থাকতেন ঘোষ লেনের ভিতরে ঢুকে ঠিক সামনে উত্তরমুখী সুন্দর দোতলা বাড়িটিতে। বাড়িটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। পরে এই বাড়িটিতে শিশিরবাবুরা এসে কিছুকাল ছিলেন। তখন

ও-বাড়িতে আমার যাতায়াত ছিল।

যাই হোক, এই ভদ্রলোক সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যখন বড় রাস্তায় এসে পড়তেন, তখন ওঁকে আমি আমাদের বাড়ির দরজা থেকে লক্ষ্য করতুম। ওঁর পরনে কোঁচানো ধুতি, পায়ে পামশু, গায়ে অতি ফিকা নীল রংয়ের দীর্ঘলম্বিত পানজাবি, মাথায় ঘন চুলের রাশি ব্যাক-ব্রাশ করা। কিন্তু ওঁর চলনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ছিল এই, পথের দু'-পাশে ওঁর ভ্রূক্ষেপ থাকত না। প্রত্যেক দিন গোধূলিকালে ওঁকে শুধু দেখার জন্য আমি এ-ফুটপাথে অপেক্ষা করতুম। দেখতুম ওঁর বিশাল স্বাস্থ্যবান শরীর, পশুরাজ সিংহের মতো বলিষ্ঠ। উচ্চতায় ছয় ফুটের কাছাকাছি। ওঁর শান্ত নির্লিপ্ত উদাসীন দৃষ্টি পশ্চিমের পথ অপেক্ষা পশ্চিম আকাশের দিকে নিবদ্ধ থাকত। পথের যানবাহন বা লোক চলাচল—সকল কিছুর প্রতি ওই বিরাট সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। আমার সবিস্ময় শ্রদ্ধা ওঁর পিছু পিছু যেত। ওঁকে আমি ভুলি নি।

আবার কয়েক বছর পরে হঠাৎ ও'কে দেখি শ্যামবাজারের মোড়ে এক চায়ের দোকানে। বেলা তখন প্রায় এগারোটা—এ সময়ে চায়ের দোকানে ভিড় থাকে না। কোথায় যেন এক অদৃশ্য চুম্বক শক্তি কাজ করছিল আমাদের উভয়ের মধ্যে বহুদিন থেকে। আমি তখন কর্মহীন বেকার। নৈরাশ্য দারিদ্র এবং দুঃখবাদ আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। আমি ওই দোকানে একান্তে দু' পয়সার এক পেয়ালা চা নিয়ে সময় কাটাচ্ছিলুম। অকস্মাৎ ও'র আবির্ভাব ঘটল এক সময়। হ্যাঁ, ইনি সেই ব্যক্তি, সেই বিশাল পুরুষ। সেই ভ্রূভঙ্গী, সেই ঔদাসীন্য, সেই নির্লিপ্ততা। কিন্তু এবার তাঁর পোশাক অন্য রকম। পায়ে স্যাণ্ডাল, পরনে খদ্দরের ধুতি, চুড়িদার ছিটের সেই দীর্ঘলম্বিত পানজাবি এবং পিঠের দিক থেকে সামনের দিকে টানা বাসন্তী রংয়ের এক-খানা মোটা খদ্দরের চাদর। তখন ডিসেম্বর মাস। উনি পথের দিকে চেয়ে কি দেখছিলেন জানিনে। হয়ত জনস্রোত, হয়ত জীবন, হয়ত বা কোনও দূর অতীত বা ভবিষ্যৎ। কিন্তু আমার মনে এমন এক নৈবেদ্যর ডালা প্রস্তুত হচ্ছিল যা কোনদিন কারও জন্য সাজাই নি! উনি চা খেয়ে পয়সা দিয়ে এক সময় চলে গেলেন।

কিন্তু কে এই অনন্যসাধারণ পুরুষ! হাজার হাজার মানুষের মধ্যে এ'র মাথা উঁচু হয়! লক্ষ মানুষের মধ্যে কে এই একক?

আরেকদিন ও'কে দেখলুম শ্যামবাজারের বাজারের ফুটপাথটা যেখানে এসে ভবনাথ সেন স্ট্রীটে শেষ হয়েছে—যার দোতলার মস্ত হলঘরটি শিশিরবাবু ভাড়া নিয়েছেন তাঁর থিয়েটারের রিহার্সালের জন্য। ওই হলে আমি গিয়েছিলুম শিশির-বাবুর কাছে বিশেষ কারণে। হঠাৎ ফিরে দেখি সেই উনি! আমি মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকালুম। উনি উদাসীন—ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে অন্য দিকে চলে গেলেন।

আমার বন্ধু কালী মাস্টার নিয়ে গেল আমাকে কুচবিহারের কালীবাড়ি ছাড়িয়ে কয়েক পা গিয়ে বাঁ হাতি ফরিদপুরার গলিতে। গলির প্রান্তে একটি বটগাছের ডাল-পালা নেমেছে, তার অপর প্রান্তে একটি ছোট মসজিদ এবং ছোট ছোট বালকদের জন্য

একটি মাদ্রাসা বিদ্যালয়। এই গলি এঁকে বেঁকে গিয়েছে সোনারপুরায়। এই গলিরই কোণের দোতলা বাড়ির নিচের তলাকার ঘরে কালী মাস্টার আমাকে এনে তুলল। ঘরে ঢুকেই দেখি, সেই তিনি!

কালী বলল, এই দেখুন সুধাদা, কাকে এনেছি! এ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আজকাল বেশ গল্প লিখছে—

আমি এগিয়ে এসে পায়ের ধুলো নিলুম। উনি আমার প্রতি একবার মর্মচ্ছেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে নস্য নিলেন। নস্যের গুঁড়ো পড়ছে ওঁর হাতকাটা ফতুয়ায়, কিন্তু সেদিকে ওঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। আমাকে দেখে হঠাৎ ওঁর এল প্রবল উত্তেজনা, ফলে উনি প্রবলতর কণ্ঠে হাঁক দিলেন, বিরিজলাল—?

জনৈক হিন্দুস্থানী ছোকরা ভিতর থেকে ছুটে এল। উনি চায়ের অর্ডার দিলেন। আমার পরে এল কেদার, তার সঙ্গে প্রফুল্ল। অতঃপর এল হাস্যমুখর পরিহাসরসিক অপূর্ব ভটচায্যি। সুরেশ চক্রবর্তী একবার এসে ঘুরে গেল। শুনলুম গত তিন-চারদিন থেকে ওয়েলস-এর আউট-লাইন অব ওয়ার্লড হিসটরি' নিয়ে আলোচনা চলছে! কথাপ্রসঙ্গে এসেছেন বার্নাড'শ, ফ্যাবিয়ান সোস্যালিজম, ওই সঙ্গে প্রফেসর রাধাকৃষ্ণনের 'ফিলজফি অফ রবীন্দ্রনাথ', তার সঙ্গে উঠল ভাইকাউণ্ট স্যামুয়েলের শেষ গ্রন্থের আলোচনা। কথায় কথায় এল শেকসপীয়র, শেলী, মিড-ভিকটোরিয়ান যুগের ডিকেন্স এবং একালের মেজফিল্ড ও চার্চিলের 'রেটরিক'।

আমরা সবাই তরুণ-বয়স্ক শ্রোতা, আর সুধাদা নিজেই বক্তা, তার্কিক, উচ্চকণ্ঠ ও বিবদমান। সর্বশেষে আসেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ আদ্যোপান্ত সুধাদার মুখস্থ। "বিবাগী মনের ভাবনা ফাল্গুন রাতে/উড়ে চলে মোর উৎসুক বেদনাতে—"

অক্টোবরের মধুর স্নিগ্ধ হাওয়া উঠেছে কাশীতে। নীল নির্মল আকাশ যেন মাঝে মাঝে শিউরে উঠছে দুগ্ধশুভ্র মেঘদলের রোমাঞ্চ স্পর্শে। দুর্গাপুজোর দিন আসন্ন। মহালয়ার তর্পণ শেষ হয়ে গেল বাঙ্গালীটোলার ঘাটে ঘাটে। ঘাটগুলোর থেকে মাটি ও কাদা এখনও সরে নি, তাই গোড়েন ঘাট থেকে সোজা ঘাটের পথ ধরে এখনও দশাশ্বমেধ পেঁছিনো যায় না। সুধাদা আমাদের দলের নেতা, ওঁর সঙ্গে আমরা দল বেঁধে সড়ক দিয়ে সোজা যাই গোধোলিয়ায়, তারপর দশাশ্বমেধের দিকে। মাঝপথে 'পার্বতী আশ্রম' এর নিচে সুরেশ মুখুজ্যের ওষুধের ডিপো, তার পাশে হরিবাবুর নতুন চায়ের দোকান—রাস্তার ওপার থেকে হরিবাবু এপারে ঘর নিয়েছেন। ওঁর দোকানে চা খেয়ে সেই দশাশ্বমেধের কালীতলার কাছে হরকুমারের বইয়ের দোকান। ওখানে কয়েকখানা লোহার চেয়ার টেনে নিয়ে সকাল দশটা থেকে আড্ডা আরম্ভ। চলত প্রায় বেলা দেড়টা দুটো পর্যন্ত।

ওই মধুর প্রকৃতি হরকুমারের বই-কাগজের দোকানে সুধাদার সঙ্গে আড্ডা দিয়ে যেতেন ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—যাঁর একার খরচ ছিল মাসে পাঁচশ' টাকা, যাঁর জন্য রাজসিক রান্না করত এক গোয়ানীজ পাচক, এবং যাঁর নিরঙ্কুশ অশ্লীল পরিহাস হাসির ফোয়ারা ছোটাত! আসতেন প্রতিষ্ঠাবান লেখক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

ওরফে সকলের 'বড়োদা'। আসতেন গা-ঢাকা বিপ্লবী শান্তি চক্রবর্তী এবং মেদিনীপুরের বিপ্লববাদী নেতা যোগজীবন ঘোষ। আসতেন মহেন্দ্রচন্দ্র রায়—যিনি যোহান বোয়ারের 'গ্রেট হাঙ্গার'-এর অনুবাদ করেছেন 'পরম তৃষা' নাম দিয়ে। 'হাঙ্গার' মানে 'তৃষা' নয়—এটি তাঁকে বোঝানো যায়নি। ওঁদের সঙ্গেই এসে ঘুরে যেতেন প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়—যিনি 'আনন্দসুন্দর ঠাকুর' নামে এখানে-ওখানে সাহিত্য সমালোচনা লেখেন। আমাদের মধ্যে কেদার ও প্রফুল্লর পিছনে দিনরাত গোয়েন্দার খরদৃষ্টি থাকে! সম্প্রতি লখনৌর দিকে কাকোরির কাছে ট্রেন-ডাকাতি হয়ে গেছে, তার জন্য হিন্দুস্থান রিপাবলিকান পার্টির শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, যোগেশ চাটুয্যে, মন্মথ গুপ্ত, যশপাল, প্রতুল গাঙ্গুলী, আমাদের জিতেনদার ছোট ভাই রাজেন লাহিড়ী—এঁরা ধরা পড়েছেন! অন্যতম প্রধান আসামী শচীন বক্সী পলাতক। কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলা সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে। এই ঘটনার প্রায় আট বছর পর কারাগার থেকে 'বন্দী জীবন'-এর লেখক শচীন স্যান্যাল আমাকে কয়েকখানি পত্র লেখেন। তিনি কাকোরি ষড়যন্ত্রের নেতা এবং আমার মীরাটের বন্ধু ও লেখক প্রিয়কুমার গোস্বামীর শ্যালক। কিন্তু এসব পরের কথা।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সেইকালে আমরা তন্ময় হয়ে থাকতুম। গায়কের মধ্যে পঙ্কজ মল্লিক, গায়িকাদের মধ্যে কনক দাস আর ইন্দুলেখা ঘোষ। ইন্দুলেখা তখন রবীন্দ্রনাথের খুবই প্রিয় এবং তিনি আমাদের কাশীরই এক বন্ধু, শান্তির সহোদরা। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে সুরেশ চক্রবর্তীর ভেলুপুরার বাড়ীর একতলার ছাদে সুধাদার সামনে বসে কনক দাসের রেকর্ডের গান "না, না গো না/করো না ভাবনা/যদি বা নিশি যায় যাব না যাব না—"। ইন্দুলেখার "রোদন-ভরা এ বসন্ত"। ওই সঙ্গে রেণুকা সেনগুপ্তার "ওহে গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এল" অথবা "পাগলা, মনটারে তুই বাঁধ—"। রেণুকা হলেন অতুলপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্রী।

ওই চন্দ্রহাস রাত্রে সঙ্গীতের সুরমূর্ছনার আলো-ছায়াপথ ধরে শাসন-বাঁধনহীন দিশাহারা আমরা যেন সবাই শ্বেতপক্ষ বিস্তার করে রাজহংস বলাকার মতো উড়ে অদৃশ্য হয়ে যেতুম দূর গগনের অনন্ত শূন্যে ক্রন্দনের সকল সীমা ছাড়িয়ে এক বৈকুণ্ঠলোকে!

যাক, আর আমার কোনও দুশ্চিন্তা নেই। আমার সুদূর ও অদূর ভবিষ্যৎ আমি এবার স্থির করে ফেলেছি। অতঃপর আমি কাশীবাস করব! তীর্থশ্রেষ্ঠ কাশী ছাড়া আর কিছু ভাবব না। সেদিন রেউড়িতলায় আমাদের সকলের দাদামশায় ও পরিহাস-রসিক প্রসিদ্ধ লেখক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি গিয়ে বলে এলুম, আর কোথাও নয়, দাদামশাই। আপনার 'কাশীর কিঞ্চিৎ' পড়ে আমি মুগ্ধ। এখানেই যা হোক একটা কাজ জুটিয়ে বাবা বিশ্বনাথের পা ধরে পড়ে থাকব!

—মন্দ আইডিয়া নয়, ঐহিক পারমার্থিক দুই হবে।—দাদামশায় হাসলেন,—কিন্তু কি জানো, মানুষের জীবনে যৌবন হ'ল সর্বশ্রেষ্ঠ কাল, সেই কালটাকে সবাই বলে "বয়স খারাপ।" তোমার বয়স খারাপের জন্য কালভৈরব তাড়া করবেন না ত?

আমার সঙ্গে কালীমাস্টার ছিল। দাদামশায়ের ইঙ্গিত বুঝে আমরা দুই কৌমার্য ব্রতধারী যুবক উচ্চরোলে হেসে উঠলুম। তখন মাসিক বসুমতী ও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় দাদামশায়ের দুটি সরস উপন্যাস ছাপা হচ্ছিল।

আমাদের বড়বাড়ি তখন জমজমাট। উপরতলায় থাকেন নিঃসন্তানা গৃহকর্ত্রী তাঁর মোতি-নামিকা বৈষ্ণবী ঝিকে নিয়ে। নিচের তলায় শিবমন্দিরের পাশে আমরা সবাই। নিচের তলাটা মস্ত। মোট ছখানা ঘর। দুখানা বড় ঘরে দুই মাসির পরিবার : তাঁরাও বিধবা। দুই মাসতুতো ভাই, এক বউ আর দুই বাচ্চা। দুই ভগ্নী প্রায়ই এসে থাকে—তাদেরও ছেলেমেয়ে। এ ছাড়া দিদিমা। আমার নিজের ভাগ্নী বুলি, সেও আছে। বুলির বিয়ে হয়েছে আমার এখানকার মাসতুতো দিদির সতীনপো গোপালের সঙ্গে গত বছর শ্রাবণ সংক্রান্তির দিনে। বিয়ে হয় বরানগর পালপাড়ায়। সেদিন সন্ধ্যায় ছিল প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির প্রাকৃতিক তাণ্ডব। বর আমার সম্পর্কে ভাগ্নে, কনে হল ভাগ্নী। আমাদের বাড়ী বেলগাছিয়া থেকে বর যাবে পাল-পাড়ায়, কিন্তু সকল পথেই কোমর অবধি জল। তার ওপর বড় বড় গাছ পড়ে গিয়ে সকল পথ রুদ্ধ। ওদিকে লগ্ন বুঝি বয়ে যায়, আর এদিকে রুদ্রচণ্ডা প্রকৃতি! গাড়ি ঘোড়া ট্রাম ট্যাক্সি—সমস্ত বন্ধ। ভাগ্যবিধাতার ইচ্ছা নয়, আজ বুলির বিয়ে হোক! নির্দিষ্ট লগ্ন যথাকালে বয়ে গেল। বর-কনে দূরসম্পর্কের ভাইবোন, এবং উভয়ের একই গোত্র। ছেলেটা বাঙালী হয়েও অধিকাংশ হিন্দুস্থানী, বয়স বছর পঁচিশ, চাকরি করে মধ্যপ্রদেশে রায়পুর জঙ্গলে,—অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ফরেস্ট রেঞ্জার।

রাত এগারোটার পর আমিই কোমর বাঁধলুম। কোথায় কোথায় জল নেমেছে খবর নিলুম। দশগুণ ভাড়া কবুল করে এক ট্যাক্সি নিয়ে এলুম। শেষ লগ্ন রাত দেড়টা থেকে আড়াইটে। তাই সই। দরকার হ'লে কোথাও থেকে জল ভাঙতে ভাঙতে হেঁটে যাব। বৃষ্টি একটু কমেছে। নাও, এবার ওঠো গোপাল, মালা পরো, টোপর মাথায় দাও। শাঁখ বাজাও তোমরা। ওঠো গাড়িতে। বরযাত্রী কেউ নেই। শুধু পুরুত, নাপিত আর আমি।

তিন থেকে চার মাইল পথ, ট্যাক্সিতে সাধারণত মিনিট পনেরো লাগে। কিন্তু যে পথেই গাড়ী যায় সেই পথ বন্ধ। পথের সব গ্যাসের আলো নষ্ট হয়ে গেছে, সব দিক ঘন অন্ধকার। বেলগাছিয়া থেকে পাতিপুকুর—তারপর পথ বন্ধ। পাইকপাড়া থেকে ঘুঘুডাঙ্গা—ওদিকটা বন্ধ। মোতিঝিল, গোরাবাজার, যশোর রোড—তারপর আর গাড়ী যায় না! বেলঘরের পথ দুঃসাধ্য। বনহুগলি থেকে নওয়াপাড়া বন্ধ। সুতরাং আবার ফিরে এলুম। এবার সাহস করে চললুম শ্যামবাজার আর টালার পুল পেরিয়ে। লালাবাবুর গির্জা ছাড়িয়ে বড়জোর চিঁড়িয়ার মোড়। তারপর শিখ ড্রাইভার বলল, গাছ পড়ে পথ বন্ধ। পাশে নালা। গাড়ি আর যাবে না। গাড়ি থেমে গেল।

গোপাল, নেমে এসো ত? এই বলে আমি নিজেই জলের মধ্যে নামলুম।

গোপাল তৎক্ষণাৎ রাজি। সে কাঠখোট্টা, হিন্দুস্থানী মেজাজ তার, তার শরীরের

মাংসপেশী দেখলে ভয়ে গা ছমছম করে। সে গাড়ির মধ্যেই টোপর, মালা, সিল্কের পাঞ্জাবি, গরদের ধুতি ও গায়ের গেঞ্জি—সব একে একে ছেড়ে তড়াং করে জলে ঝাঁপ দিল। হাঁটুজল ভেঙ্গে গিয়ে সে প্রকাণ্ড অশ্বত্থের বড় বড় শাখা নড়াতে লাগল। ঘন অন্ধকার চারিদিক। গোপালের পরনে শুধু লজ্জানিবারণী একটি জাঙ্গিয়া। তার কুস্তি পালোয়ানের চেহারা দেখে শিখ ড্রাইভার কিছুটা আড়ষ্ট। আমি সেই সুযোগ নিয়ে ড্রাইভারকে হুকুম করলুম, সর্দারজি, আইয়ে। জেরা হাত লাগাইয়ে—

এবার আমরা তিনজন। প্রাণপণ শক্তিতে গাছের ডাল কিছু কিছু সরালুম। গাড়ি পেরিয়ে যাবার মতো ফুট দশেক ফাঁক হল। আমার কাপড় জামা ভিজে থকথক করছিল। কিন্তু গোপালের পক্ষে আর সাজ-সজ্জা করা সম্ভব হল না। গাড়ি এবার হাঁসফাঁস আওয়াজ তুলে ধীরে ধীরে জল ভেঙ্গে চলতে লাগল।

সিঁথি-বরানগর ছাড়িয়ে প্রায় টবিন রোডের মোড়ে এসে গাড়ি আবার বন্ধ হয়ে গেল। যাঃ, এবার সর্বনাশ! প্রায় কূলের কাছাকাছি এসে ভরাডুবি! মেসিনে নাকি জল ঢুকেছে। আরেকটু গেলেই ডানহাতি বামুনপাড়া লেন। রাত একটা।

—গোপাল, যদি সুন্দরী বউ পেতে চাও, তবে পিছন থেকে গাড়ি ঠেলো।

শুধু হুকুমের অপেক্ষা। জাঙ্গিয়াপরা গোপাল সেই জলের মধ্যে হাসিমুখে আবার নেমে এসে বলল, আমি একাই পারব, ছোটমামা—তুমি গাড়িতেই থাকো।

গোপালের অপরিসীম শক্তি। সে ঠেলতে ঠেলতে গাড়ি নিয়ে এল, এবং ড্রাইভার ডান দিকে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে এ-গলির শেষ পূর্বপ্রান্তে গাড়ি আনল। এ-গলিতে জল দাঁড়ায়নি।

কনেপক্ষ জেনেই ছিল আজ বিয়ে হবে না! তারা সদর দরজা বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়েছে। ওদের পুরুত বাড়ি চলে গেছে। কিন্তু আমাদের শব্দ সাড়া পেয়ে ওরা এসে দরজা খুলল। হইচই উঠল। ওই ডামাডোলের মধ্যে ওরা মঙ্গলশংখটা খুঁজে পেল না!

এদিকে বরপক্ষের নাপিত ব্যাটা ততক্ষণে জাঙ্গিয়াপরা কুস্তিগীর গোপালের মাথায় তাড়াতাড়ি টোপরটা তুলে দিয়ে গলায় মালা ঝুলিয়ে দিয়েছে।

কে যেন বুলির ঘুম ভাঙ্গিয়ে ছিল। মস্ত বড় একতলা বাড়ির ওই প্রান্ত থেকে ছুটতে ছুটতে এসে সে আমাকে জাপটিয়ে ধরল। কাঁচ কিশোরী মেয়ে। বয়স সবে-মাত্র এগারো ছাড়িয়েছে। যেমন সুন্দর স্বাস্থ্য, তেমনি সুন্দর মুখশ্রী। অন্য বোনদের তুলনায় ওর রং একটু চাপা। বুলির বয়স যখন মাত্র দশদিন, তখন ওর মা কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে জীবন-মৃত্যুর সমস্যা তোলে। সবাই যখন আঁতুড়ে-মেয়েটার মৃত্যুকামনা করছে, আমি তখন বাচ্চাটাকে বের করে এনে পলতের সাহায্যে ওকে দুধ খাওয়াতুম। তখন আমরা চালতাবাগানে যুগলকিশোর দাসের গলিতে থাকি। ওর চারিদিকে যখন মৃত্যুকামনা চলছে, তখন আমার কোলে-পিঠে বাচ্চাটা বড় হচ্ছিল। আমার বয়স তখন এগারো। এক বছর অবধি ওর মা রইল শয্যাগত, আর বুলি হয়ে উঠল আমার খেলার সামগ্রী। যখন সুন্দর কণ্ঠে হেসে উঠত, আমি ওর নাম দিতুম

'বুলবুলি'! ওইটুকু বয়সের বেশির ভাগ আমাদের বাড়িতেই ওর কেটেছে। মেয়েটা অতিশয় দুরন্ত বলেই আমাদের সকলের প্রিয় ছিল।

পোষা বাচ্চা কুকুর যেমন প্রভুর গায়ে গা ঘষড়িয়ে আদর জানায়, বুলি তেমনি করে আমার গায়ে তার মুখখানা রগড়াচ্ছিল। আমি সকৌতুকে বললুম, এ কি রে, এত কাঁদছিস কেন? ভাবছিলি বিয়েটা বোধ হয় ভেস্তে গেল, তাই না?

বুলি আরও বেশি কেঁদে বলল, বেশ করব কাঁদবো!

আমি ওর পিঠ চাপড়িয়ে বললুম, পোড়ারমুখি, বিয়ের আগে কেউ কাঁদে? কাল যখন বর-কনে বিদেয় হবে, তখন কাঁদবি। আবার হাসবি ফুলশয্যায়। যা শিগগির, এখনই লগ্ন আরম্ভ!

বুলি কেঁদে বলল, নাই বা হতো বিয়ে? তুমি কেন এত রাত্তিরে ভিজতে ভিজতে এলে?

আমি ওকে এবার ধমক দিয়ে সরিয়ে দিলুম। বুলি কাঁদতে কাঁদতে বিয়ের জন্য প্রস্তুত হতে গেল।

শেষ লগ্নে বিয়ে। আগামী কাল ভাদ্র মাস। বুলি কাঁদছিল বটে, কিন্তু জীবন-বিধাতা অন্তরীক্ষে আমার দিকে চেয়ে বোধ হয় কৌতুকরঙ্গে হাসছিলেন! বুলির জীবনের শোচনীয় পরিণাম সেদিন আমার সকল কল্পনার অতীত ছিল।

তবু এ বিয়ে হল। বিয়েতে উৎসবের আনন্দ কেউ পেল না। সবাই যেন অবসন্ন ক্লান্ত। আজ বিয়ে হবে না, এইটিই সবাই ধরে নিয়েছিল।

রাত তিনটের সময় খাবার রুচি অনেকেরই চলে গেছে। আর খাবেই বা কি? ছোলার ডালে ফেনা উঠেছে, সমস্ত মাছের কড়াইতে পচ ধরেছে। নরম সন্দেশ থেকে দুর্গন্ধ বেরিয়েছে, দই-তে আমলাটে গন্ধ।

বিয়ের পর বর-কনে বাসরে উঠল। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। আসছে কাল এখান থেকেই বর-কনে সন্ধ্যার গাড়িতে কাশী রওনা হবে।

কাশীর কথাতেই আবার ফিরে আসি। গত বছর শীতকালে বোধ হয় মীরাটে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন বসেছিল। শরৎ চাটুয্যে মশায় ছিলেন মূল সভাপতি। ফিরবার পথে শরৎচন্দ্রকে কাশীতে ধরে আনে 'উত্তরা'র সুরেশ। কয়েক দিন তিনি কাশীতে কাটিয়ে যান। তখন শীতের গঙ্গায় ভাঁটা পড়েছে। ঘাটগুলি সব জেগে উঠেছে। শরৎচন্দ্রের পরিভ্রমণের সঙ্গীরা সবাই আমাদের বন্ধু। সুরেশ, কালীমাস্টার, অপূর্ব, কেদার, প্রফুল্ল, নরেন এবং আরও অনেকে। ওরা সবাই দল বেধে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে এখানে-ওখানে যেত।

ঘাটে ঘাটে রৌদ্রে ঘুরে বেড়ানো বড় মধুর লাগে। সেদিন শরৎচন্দ্র গোড়েন ঘাটের ধার দিয়ে সদলবলে পেরিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় এক গৈরিকবসন গুম্ফশ্মশ্রু-শোভিত প্রবীণ বয়স্ক ব্যক্তি স্নানের ঘাটে নামছিলেন। তিনি এখানকার কোনু মঠে ব্রহ্মচারী আনন্দস্বরূপ নামে প্রখ্যাত। তাঁর সঙ্গে কয়েকজন শিষ্যসেবকও ঘাটে নেমে

খাচ্ছিলেন।

কাছাকাছি এসে শরৎচন্দ্র ব্রহ্মচারীর দিকে চেয়ে সহসা থমকিয়ে দাঁড়ালেন। —আরে তুমি না সেই আমাদের মণিমোহন ?

ব্রহ্মচারীও থমকিয়ে গেলেন। শান্ত দৈব হাসি হেসে বললেন, তুমি না সেই নেড়ু ? কাশী এলে কবে ?

—এই ত এরা সব ধরে এনেছে আমাকে ভাই।—শরৎচন্দ্র বললেন, তাই ত অনেক দিন পরে দেখছি তোমাকে। কত দিনের কত কথা মনে পড়ছে !

এরা ওরা সবাই হাসিমুখে দাঁড়িয়ে গেল। জাতশিল্পী শরৎচন্দ্র বোধ হয় সেদিনের মধুর রৌদ্রে একটু খোসমেজাজেই ছিলেন। হয়ত একটু সকৌতুক দুষ্টবুদ্ধি তাঁকে পেয়ে বসে থাকবে। তিনি বললেন, বড় আনন্দ পেলুম তোমাকে দেখে হে। বাণপ্রস্থ নিয়েছ মনে হচ্ছে। সেসব দিনের কথা তোমার মনে আছে মণি ?

ব্রহ্মচারী সহাস্যে ঘাড় নেড়ে বললেন, কিছু কিছু— ।

শরৎচন্দ্র বললেন, ওঃ তুমি খেতে পারতে বটে ! মনে পড়ছে, বিনিময়রাণির ঘরে আমাদের সেই আড্ডা ? বিনি তোমাকে চাঁদু বলে ডাকত। তুমি ছিলে একেবারে মদের পিপে।

শ্রোতারা সবাই আড়ষ্ট। স্বয়ং ব্রহ্মচারী আনন্দস্বরূপ স্তব্ধ ও বিমূঢ়। পুরনো বন্ধুকে পেয়ে শরৎচন্দ্র উচ্ছ্বসিত আনন্দে স্মৃতিচারণ করছিলেন, অন্য দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপমাত্র ছিল না। কিন্তু এই সূত্রে কাশীবাসী একজন সংসারত্যাগী সাধক তাঁর শিষ্যসেবকদের কাছে চিরকালের জন্য হয়ত কৌতুকের পাত্র হয়ে গেলেন !

শরৎচন্দ্রের ডাকনাম ছিল ন্যাড়া !

॥ ১৭ ॥

কথায় কথায় অন্য প্রসঙ্গে এসে পড়েছিলুম। যাই হোক, সেই বুলি—যার বিয়েতে গাছ, পাথর ও কলকাতার সমুদ্র ঠেলতে হয়েছিল, সেই বুলিও এই বড়বাড়িতে রয়েছে। গোপাল সেই যে ফুলশয্যা-বউভাতের রাত্রে টেলিগ্রাম পেয়ে রায়পুরে তার চাকরিস্থলে চলে গেছে, এই পনেরো মাসের মধ্যে সে আর আসে নি। তার অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ, আসবার উপায় নেই। তবে কথা আছে, এই ইংরেজি বছরের মধেই সে একবার এসে বুলিকে নিয়ে যাবে। একদিন আড়াল থেকে কানখাড়া করে শুনলুম, বড় বউদিদি বলছেন দিদিকে চাপা গলায়,—আর নিয়েই বা যাবে কেন ? তোমার পুত্রবধূর এখনও 'মাসিকই' আরম্ভ হয়নি যে !

কথাটা আমার কাছে সেদিন যথেষ্ট বোধগম্য হয়নি !

এটা আমার মাসির বাড়ি, কিন্তু বুলির একপক্ষে শ্বশুরবাড়ি। দেবনাথপুরার

অন্ধকার এক গলির মধ্যে তার চেয়েও এক অন্ধকার জরাজীর্ণ তেতলা বাড়ি হল দিদির নিজের বাড়ি। প্রাতঃস্মরণীয়া রানী ভবানীর হাত থেকে দিদির স্বামী গোবর্ধন মৈত্র মশায়ের কোন পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণ-দক্ষিণা হিসাবে এ বাড়ি পেয়েছিলেন। এরই দোতলায় গোবর্ধনবাবুর বড় বোন শুচিবায়ুগ্রস্তা বৃদ্ধা বিধবা রাজলক্ষ্মী ও নিচের তলাকার ঘুটঘুট্টি অন্ধকার একখানি ঘরে আরেক প্রবীণা বিধবা সহোদরা গিরিবালা বাস করেন। তেতলাটা গোবর্ধনবাবুর। তিনি মধ্যপ্রদেশের রেলওয়েতে আর-এম এস-এর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। বেশ ভাল চাকরি। তখন দিদিরা থাকত ঝাঁসীতে। কিন্তু তখন বিলেতী মদের বড় বোতলের দাম ছিল সাড়ে চার টাকা! ফলে, অধস্তন কর্মচারীরা গোবর্ধনবাবুকে প্রায়ই পাঁজাকোলা করে বেলা বারোটায় গাড়ি থেকে নামতো! এর পরিণামে তাঁকে অকালে কর্মচ্যুত করে সামান্য মাসিক পেনসন্ দিয়ে সরানো হয়। এখন তিনি আফিঙ ধরে আনন্দে আছেন। শ্যালকরা সকলেই তাঁর প্রিয়। যাই হোক, মানুষটি কিন্তু অতি অমায়িক এবং মিষ্ট প্রকৃতির। আমি ওঁর পান-সুর্তির কৌটোয় ভাগ বসাতুম। দিদি ওঁর দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী।

কাশীবাস করা যখন সম্পূর্ণ স্থির করেছি, এবং বন্ধুমহলের চেষ্টায় যখন একটা যা হোক কাজকর্মের ফিকিরে এখানে-ওখানে ঘুরছি, তখন শ্রীরামপুর ডাকঘর থেকে একখানা সরকারী চিঠি ঠিকানা-কাটা অবস্থায় এসে হাজির। লিখেছে, তোমার অনুপস্থিতির জন্য কাজকর্মের অসুবিধা হচ্ছে। যেহেতু তোমার সার্ভিস রেকর্ড সন্তোষজনক, সেই হেতু তোমার অনুপস্থিতির কাল ছুটি হিসাবে মঞ্জুর করা হবে। —বাই অর্ডার, হিজিবিজি নাম সই।

চিঠিখানা ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিলুম।

কাশীবাসীরা কেউ চাকরিবাকরি করে না। শিক্ষকতা আছে, অধ্যাপনা আছে, এক-আধটা বীমা কোম্পানী আছে,—কিন্তু কলকাতার মতন পাঁচরকম সওদাগরি চাকরি বলতে বিশেষ কিছু নেই। বন্ধুবর ননী পোস্টাপিসে আমারই মতন কাজ করে। কালী পাড়ায় অ্যাংলো বেঙ্গলী স্কুলে। কেদার প্রফুল্ল বেকার। আমার এক ভাই প্রভাসও বেকার। কিশোরদাদা বাঙ্গালীটোলা হাই স্কুলে পড়ান। বাঙ্গালী গৃহস্থের সংসার চলে হয় পেনসনে আর নয়ত মনি অর্ডারে! শুধু আমার অন্যতম স্থানীয় ভগ্নিপতি হলেন হোমিওপ্যাথী ডাক্তার। আমার ভগ্নি তাঁর তৃতীয়পক্ষের স্ত্রী। মেয়েরা তৎকালে বাঁচতে জানত না, পুরুষদেরকে তাই বার বার বিয়ে করতে হত।

কথাটা কিন্তু সব সময় সত্য নয়। ক্ষিতুরি বুড়ি পঁয়তাল্লিশ বছর আগে বিধবা হয়েছে, রাজলক্ষ্মী ওরফে রাঙ্গাদিদি তিপ্পান্ন বছর আগে স্বামী খুইয়েছেন, গিরিবালার স্বামী মরেছে ওর বয়স তখন দশ বছর। আমি যখন পা টিপে টিপে গোবর্ধনবাবুর তেতলায় উঠতুম, তখন দোতলার অন্ধকার কোণটায় শুচিবায়ুগ্রস্তা বৃদ্ধা রাঙ্গাদিদি উলঙ্গ অবস্থায় নিজের হবিষ্যান্ন প্রস্তুতে অন্যমনস্ক থাকতেন। তাঁর একখানি মাত্র থানধুতি, সেখানা শুকোচ্ছে। তাঁর বিশ্বাস, অন্নমাত্রই অশুচি, এই অন্ন খেয়ে শুধু প্রাণধারণ করা এই মাত্র। আহারাদির পর এঁটো হাতে তেমনি উলঙ্গ অবস্থায়

কী শীত কী গ্রীষ্ম—ঠ্যাণ্ডা মেঝের উপর তিনি পড়ে থাকেন। সন্ধ্যাবেলা সেই হাতে সামান্য মিষ্টিমুখ করে আরেকবার স্নান সেরে তবে শুকনো কাপড় পরেন। সমস্ত দুই হাতে, দুই পায়ে তাঁর হাজা, মুখের দুই পাশে ঘা। নিষ্ঠাবতী বিধবার ইতিহাস এই।

সুধাদার ওখানে চলছে রবীন্দ্রকাব্যের ব্যাখ্যা, বেদান্ত দর্শন, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ক্রমবিকাশ, বার্নার্ড শ'র সঙ্গে ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিসের বিতর্ক। ওঁর ওখানে আসছে শান্তি ঘোষ, আমাদের নরেন, কেশব, প্রবোধ চাটুজ্যে, মহেন্দ্র রায়, যোগজীবনদা,—ওই সঙ্গে আমরা ত আছিই। সকাল আটটা থেকে বেলা দুটো, বিকাল পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা। সুধাদার নিত্য-নূতন ভাষা, নিত্য-নূতন অভিব্যক্তি। তাঁর ঘরে স্তূপাকার বিভিন্ন দেশের মোটা মোটা গ্রন্থ, বিভিন্ন ইংরেজী সব সাময়িক পত্র। কাশীর কারমাইকেল লাইব্রেরী থেকে তাঁর জন্য বহু রকমের বই আসে, কলকাতার 'ইম্পিরিয়ল' লাইব্রেরী তাঁর কাছে বইয়ের পার্সেল পাঠায়।

এমনি একটা সময় বড়বাড়ির কর্ত্রী এবং পরলোকগত রায়বাহাদুরের আত্মাভিমানিনী স্ত্রী ওরফে আমার মেজমাসিমা আমাকে নিচের তলা থেকে একদিন ডেকে পাঠালেন। আমি সাধারণত ওঁকে এড়িয়ে চলি। নিজের সম্পদ এবং অর্থকৌলীন্য সম্বন্ধে উনি বিশেষ সচেতন, সেটি আমার পছন্দ নয়।

উপরতলায় উঠে এলুম। উনি বললেন, একটি কথার জন্য তোমায় ডেকেছি। এই বেঞ্চিখানায় বসো।

বসে পড়ে বললুম, কি বলুন ?

উনি বললেন, তোমার জন্য পাকা পেঁপে আর খোয়ার সন্দেশ রেখেছি, তুমি খাও।

তৎক্ষণাৎ মিছে কথা বললুম, আমি এই দু'মিনিট আগে খেয়েছি। এখন থাক, পরে খাব।

উনি একটু থতিয়ে গেলেন। কিন্তু তখনই আমার দিকে ফিরে বললেন, তুমি ত কোনদিন কিছু চাও নি আমার কাছে ? একখানি গরম চাদর তোমাকে আমি কিনে দেবো।

এবার আমি হেসে ফেললুম। বললুম, এখন একটুও শীত পড়ে নি, চাদর নিয়ে কি করব ? আপনি ডেকেছেন কেন, এবার বলুন।

উনি বললেন, শোনো বলি। তুমি আমার কথা রাখবে এই মনে করেই তোমাকে ডেকেছি। আমি যদি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে তীর্থ করতে যাই, তোমার মা বিশু কি আপত্তি করবেন ?

ওঁর কথাবার্তার ভঙ্গী এবং ভাষা ঠিক মাসিজনোচিত নয়। এ যেন আপিসের বড় সাহেব তাঁর কনিষ্ঠ কেরানীকে ডেকে অনুজ্ঞা জানাচ্ছেন! আমি বললুম, আপনি তাঁকে চিঠি লিখে জেনে নিতে পারেন। তবে আমার বিশ্বাস, কিশোরদাদা অথবা প্রভাস—এদের যে কেউ আমার চেয়ে যোগ্যতর হবে।

ওঁর তীর্থযাত্রার প্রস্তাবটি আমার পক্ষে লোভনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু উনি

বোধ হয় বিশ্বাস করেছিলেন, ওঁর অনুরোধ মাত্রই আমি নেচে উঠব! এবার উনি বললেন, আচ্ছা, আমি তবে আরেকটু ভাববার সময় নিই, কেমন?

আমি সহাস্যে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলুম।

আমার প্রস্তাবটি উনি নেননি! কিন্তু আমাকে না জানিয়ে সেইদিনই উনি কলকাতায় মাকে চিঠি দিয়েছিলেন, এবং চার দিনের দিন সে-চিঠির জবাব এসেছে। পাঁচ দিনের দিন সকালে উনি নিজেই নিচে নেমে এসে আমাকে ডাকলেন। বললেন, বিশু লিখেছে আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে তার কোনও আপত্তি নেই। তা হলে কি আমি দিনস্থির করব?

—করুন।— আমি সহাস্যে জবাব দিলুম। বুঝতে পারা গেল, আমাকেই উনি সঙ্গে নিতে চান।

ওঁর পক্ষে প্রস্তুত হতে সপ্তাহখানেক লাগল। কিন্তু আমি সর্বহারা, আমার কিছু নেই। আমার বাক্স-বিছানা, কাপড়-জামা—সমস্তগুলো দিয়ে এসেছি শ্রীরামপুরের সেই হাতকাটা পঞ্চাননকে। এ ছাড়া ছেনুমাসির সংসারে রোজ প্রায় চার আনার শাকসব্জির বাজার করে দিই—সে-বাজার প্রচুর। আলু, বেগুন, নতুন ফুলকপি, বানুড়া কচু, সাদা মুলো, পালঙ শাক—অজস্র। মাছ, মাংস, পেঁয়াজ—এ মহলে নিষিদ্ধ। ডিম খেতে গেলে সেই দশাশ্বমেধের দিকে হরিবাবুর দোকান! সকালের দিকে গঙ্গাস্নান, পুজো-আর্চা, শিবের জন্য নৈবেদ্যর আয়োজন, জপ-আহ্নিক—সুতরাং সকালে জলযোগের কথাই ওঠে না। বেলা সাড়ে দশটার পরে উনুন ধরানো হয়। মধ্যাহ্নভোজন বেলা সেই দুটোয়। বাঙ্গালীটোলার সব বাড়িতে এই একই রীতি। আমাদের এখানে কচি মেয়ে শুধু বুলি। তাই বড় বউদিদি সকালের দিকে বুলিকে ডেকে নেন নিজের ঘরে।

আমি আছি তাই বুলির দৌরাত্ম্য অব্যাহত। দেবনাথপুরার বাড়িতে সে থাকতে চায় না,—সে-বাড়ি একেবারে খাঁচা। তাই গোবর্ধনবাবু ওকে এখানে প্রায়ই রেখে যান। বুলি এবাড়ি-ওবাড়ির বউ বটে, কিন্তু মূলত সে নাতনী। সেজন্য তার দুষ্টামিটা মাঝে মাঝে নষ্টামিতে পরিণত হয়। এটা ভাঙ্গছে, ওটা ফেলছে, সেটা ছাড়িয়ে দিচ্ছে—তার জ্বালায় সবাই অস্থির। আমাকে দেখলে সে যেন আরও বাড়ায়। সকালের দিকে বাঁদরের পাল আসে, বুলি অমনি ছোটে লাঠি নিয়ে। ওর সুন্দর চেহারা ও বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য, তার ওপর আনন্দের কল-কোলাহলে সমস্ত বাড়িটাকে মুখর করে রাখে,—বুলি তাই সকলের প্রিয়। কিন্তু আসলে মেয়েটা অতি মূর্খ, তাই নিজের জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে সকলকে জ্বালিয়ে তোলে। কৌতুকের বিষয় এই, উপরতলার মেজদিদিমার কাছে বুলি প্রচুর প্রশ্রয় পায়। বুলি তাঁর খুবই প্রিয়।

বুলির খুবই ইচ্ছা, আমি তীর্থে যাবার আগে ওকে কলকাতায় রেখে আসি। কিন্তু ও যে এক পরিবারের পুত্রবধূ, একথা ওর মনে থাকে না। হয়ত এই নাবালিকার যৌগিক দৃষ্টি আমার দূরদৃষ্টিকে ছাড়িয়ে কোনও ভীষণতর ভবিষ্যৎকে সেদিন দেখে থাকবে। কিন্তু আমার যাবার দিনে সে যখন কাঁদতে বসল, আমি চোখ পাকিয়ে

তাড়না করে বললুম, ফ্যাস-ফ্যাস করে আমার সামনে কাঁদলে এবার এক থাপ্পড় দেবো। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে!

চোখের জলসুদ্ধ মুখ তুলে বুলি একবার আমাকে নিরীক্ষণ করল, তারপর ছুটে এসে আমার চুলের মুঠি ধরে টেনে আমার পিঠে গুমগুম করে কিল বসিয়ে দিল।

আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন—এদের সম্বন্ধে মেজমাসীর রসবোধ নেই। তা ছাড়া আরেক কথাও আছে। তাঁর অন্যান্য বোনেরা যে-সকল অঞ্চলে তাঁর আগে এসে ঘুরে গেছেন সেসব অঞ্চল উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। তিনি রায়বাহাদুরের স্ত্রী, ওসব জায়গায় যাওয়া তাঁর প্রেসটিজে বাধে। তিনি জয়পুরে এসে নামলেন গোবিন্দজীর জন্য নয়, যশোরেশ্বরী কালীর জন্য। আম্বের দুর্গে নিতান্ত একটা মন্দির আছে তাই, নইলে আম্বেরে যেতেন না। গলতা ওঁর পক্ষে অর্থহীন। শুধু আমার অনুরোধে গিয়েছিলেন যাদুঘরে।

আজমেরে পুষ্কর-দুস্করে উনি যেতে পারতেন, কিন্তু 'সাবিত্রী'কে পরিত্যাগ করলেন মরুপাথর আর পাহাড়ের ভয়ে। একদিন উনি বললেন, রাজা-রাজড়ার ঘর-দোর আমি দেখতে আসি নি, বুঝেছ? ওতে আমার অরুচি। শুধু শিবের প্রতিষ্ঠে যেখানে আছে সেইখানে চলো।

শিব সর্বত্র, এই আমার ধারণা। বললুম, তা হলে যোধপুরে চলুন?

বেশ চলো।

যোধপুরে পেঁছিলুম। বাজারের দিকে ছিল শিব ও রাধাকৃষ্ণের মন্দির। উনি শিব দেখলেই খুশী। রাজবাড়ির বাইরে সেই পাথরের রেলিং-ঘেরা প্রাঙ্গণ থেকে মরুভূমির চেহারা দেখা বা লালপাথরের পাহাড়গুলো লক্ষ্য করা—এসবে ওঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। যোধপুর থেকে সেই মরু পথে বিকানের, আবার সেখান থেকে ফিরে মাড়োয়াড়—বার বার গাড়িবদল, হয়ত স্টেশনে রাত্রিবাস, হয়ত ধর্মশালা খুঁজে না পাওয়া, হয়ত বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্লাটফরমে কাটানো। যখন রাজকোট হয়ে দ্বারকায় এসে পেঁছিলুম তখন পনেরো দিন পেরিয়ে গেছে। এটি রুক্মিণীপুরী অর্থাৎ মূল দ্বারকা,—এখানে কাটল পাঁচ দিন। এখান থেকে ট্রেনে ভেট-দ্বারকা। সেটি সত্যভামাপুরী। সেই আরব সমুদ্রের খাঁড়ি পেরিয়ে যাতায়াত। ওটায় লাগল দুদিন। আবার ফিরে আসা রুক্মিণীপুরীতে। আবার দিন তিনেক। তারপর প্রভাসতীর্থ,—যেখানে ব্যাধের বাণে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু ঘটে। ওখান থেকে আবার ওখায় গিয়ে পেঁছিনো, এবং করাচির জাহাজে ওঠবার আগে সমুদ্রমধ্যে বিরাট এক মহাজনী নৌকায়। সমুদ্রের পীড়ায় ওঁর কষ্ট হয়েছিল খুব। কিন্তু আমি প্রচুর আনন্দ পেয়েছিলুম বড় জাহাজে উঠে। নৌকা থেকে আমাদেরকে সেই জাহাজে তুলে নেওয়া হয়েছিল। তখন শীতের কাল। আকাশ নীল। আরব সমুদ্র যেমনই নীল, তেমনি শান্ত।

পরদিন পেঁছিলুম বোম্বাই বন্দরের জেটিতে। বোম্বাইতে আছেন বাবুলনাথ আর মহালক্ষ্মী।

এবার খোঁজো ধর্মশালা। খুঁজতে খুঁজতে জনবহুল এক অঞ্চলে এসে পাওয়া গেল মাধোবাগ ধর্মশালা। অনেক সুপারিশ আর অনুনয় বিনয়ের পর আশ্রয় মিললো। মেজমাসির স্থূলাঙ্গ চেহারা দেখে ওরা মনে করেছিল ভাটিয়া বা গুজরাটি বা মারোয়াড়ী ধনপতির স্ত্রী এবং আমি তাঁর ফাই-ফরমাসের অর্ধাহারী তাঁবেদার। আমার মাথায় গামছা জড়ানো, মালকোঁচা ধুতি আর সাবান-কাচা পানজাবি। ধুতিখানা ময়লা, ফলে পানজাবির সঙ্গে মেলে নি। পায়ে খাকি কেড্‌স্‌। আমি এখন আত্মনিগ্রহের অবতার। অর্থাৎ এ যাত্রায় সাবান-তেল-চিরুনি—কোনটাই ব্যবহার করি নি। শুধু নিমের ডাল দিয়ে দাঁতন করি। হবিষ্যান্ন খাই। শতরঞ্চিতে শুই। প্রয়োজন মতো পানজাবির উপর দিয়ে পৈতাগাছটা বার করে রাখি, কারণ ওটায় ব্রাহ্মণত্বের খাতির পাওয়া যায় বেশি। আমি যে একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, এটির জন্য 'মাধোবাগ' ধর্মশালার প্রহরীদের কাছে আমার সম্মান বেড়ে গেল। তারা আমায় শর্মাজি বলে ডাকতে লাগল।

বাবুলনাথের জন্য বোম্বাই হয়ে উঠল মেজমাসির কাছে তীর্থ। সুতরাং তিনি ত্রিরাত্রি বাস করবেন। তাঁর কাছে হস্তী-গুম্ফা, তাজমহল হোটেলের ওদিকটা, মেরিন ড্রাইভ, জুহু বীচ—এদের কোনও দাম নেই। তিনি ধর্মশালার ম্যানেজারকে বলে-কয়ে দোতলার কোণে একটি ঘর নিলেন। তাঁর নিজস্ব একটি ঘর দরকার।

আমি তাঁর খিৎমদগার, সুতরাং আমার স্থান বাইরের বড় দরদালানে। ওটা ভাল, কেননা নভেম্বরেও বোম্বাইতে গুমোট। দালানে গড়াগড়ি দিয়ে ভালই শুই। রাত দশটার পর ধর্মশালার সব আলো নিবে যায়, সেই জন্য তার আগেই সব সেরে নিতে হয়। তবে রাস্তার দিক থেকে অনেকটা আলো দালানে এসে পড়ে।

তৃতীয় দিন রাত্রে যখন হাত পা ছড়িয়ে ওই দালানটায় অঘোরে ঘুমোচ্ছি, তখন একটা সময় কে যেন আমার একখানা হাতের দুটো আঙুলের ডগায় একটু নাড়া দিল। ঘুম যত গভীরই হোক, শরীরের অনেকগুলি স্পর্শকাতর অংশের যে-কোনও একটি ছুঁলেই ঘুম ভাঙে। আমি চোখ মেলে আবছা অন্ধকারে দেখি, হাত তিনেক দূরে একটা মেয়েছেলে শুয়ে হাত বাড়িয়ে আমার আঙুল নাড়ছে।

অনেকটা চাপা গলায় সে প্রশ্ন করল, কডি ক্যা বোল্‌তো ?

অত্যন্ত আড়ষ্ট হয়ে আমি হাতখানা সরিয়ে নিলুম, কিন্তু ওর ভাষাটা বুঝতে না পেরে জবাব দিলুম না। এ-পাশ ফিরে শুয়ে রইলুম। রাত সাঁ সাঁ করছিল।

মিনিট পাঁচ-সাত পরে আবার একখানা হাত আমার কাঁধের কাছে নাড়া দিল। আলি সর্পাহতের মতো পাশ ফিরলুম। হিন্দী ভাষা আমার রপ্ত নয়। তবু বললুম, কেয়া বল্‌তো ?

মেয়েছেলেটা এর মধ্যে আরও কাছে সরে এসেছে। এবার হাসি মুখে বলল, কডি —কডি, কডি ক্যা বোলে ?

তখন বুঝলুম তার বক্তব্য। আসবার আগে প্রভাসের হাতঘড়িটা এনেছিলুম। ওটা হাতেই পরা ছিল। মেয়েছেলেটা জানতে চায়, কটা বেজেছে এখন! এবার

আমার ঘড়িতে একবার ঠাহর করে বললুম, সওয়া বারো বাজে।

মেয়েটা বয়সে ডাটো। বোধ হয় গুজরাটি কি রাজপুতানি হবে। যাই হোক, এত রাত্রে টাইম্ জানতে চাওয়াটা একটু বিসদৃশ। সম্ভবত ওর গরম লেগেছে ঘরের মধ্যে, তাই বালিশ একটা নিয়ে এখানেই শুয়েছে। কিন্তু আমার এত কাছাকাছি সরে আসাটা ওর পক্ষে উচিত হয় নি!

আমি এক হাত সরে আবার পাশ ফিরে শুলুম। মেজমাসীর ঘর বন্ধ, নইলে ওঁর ঘরে গিয়ে পড়ে থাকতুম। কিন্তু প্রায় আধ ঘণ্টা অবধি আমি আড়ষ্ট হয়ে রইলুম, পাছে আবার কোন্ মুহূর্তে ঠেলা খাই! ওর মধ্যে আবার চোখ বুজেই এক সময় অন্দাজ করলুম, মেয়েছেলেটা একবার এখানে-ওখানে নিঃশব্দে ঘোরাঘুরি করে এসে আমার মাথার দিকে উবু হয়ে বসল, এবং আমার মাথাটা নাড়ল। আমি তাকালুম। এবার সে আর কথা বলছে না। আমিও নির্বাক এবং ভয়ে আড়ষ্ট।

মেয়েটা আমার হাত ধরে তুলল। সেই হাতের মুঠি পরুষ ও কর্কশ। এটা বিদেশ-বিভূঁই। আমার পক্ষে বাধা দেবার বা প্রতিবাদ করার মতো শক্তি নেই। আমি শুধু অভিভূত নই, সম্মোহিত। আমার হাত ধরে সে নিয়ে চলল চক-মিলানো বারান্দার আরেক দিকে—যেদিকে রাস্তার আলো পড়ে না। আমার কোনও ব্যক্তিত্ব নেই, বুদ্ধি লুপ্ত, চেতনা আচ্ছন্ন। নিরুপায় আমি, আমাকে বোবায় ধরেছে! অতঃপর উভয়ের আচরণ লক্ষ্য করার জন্য সেই জনশূন্য প্রাণীশূন্য ত্রিযামা নিশীথিনী সম্পূর্ণ আড়ষ্ট ও অসাড় হয়ে রইল!

বোম্বাই ছেড়ে কোথা দিয়ে কোন্ দিকে ঠিক আমরা রওনা হলুম আর কিছু মনে নেই। অনেক অজানা পথ, অনেক না-জানা স্টেশন, অনেকবার ট্রেন বদল। একদম গিয়ে নামলুম মহীশূরে। এটি সামন্ত রাজার দেশ। চারিদিকে রুক্ষ প্রান্তর, ছোট শহর, অদূরে পাহাড়—পাহাড়ের উপর দেবী মহিষাসুর মর্দিনীর মন্দির। মেজমাসী থেকে গেলেন তিন রাত্রি, এটি তীর্থস্থান। পাহাড়ে উঠে গেলে এক বাঁকের কাছে মহিষাসুরের বিরাট মূর্তি। তার পর এগিয়ে গেলে দেবীর মন্দির। পাহাড়ের উপর থেকে দেখা যায়, শহরের মাঝখানে মহারাজার প্রাসাদ।

কিন্তু এ প্রসঙ্গটা ঠিক ভ্রমণের ইতিবৃত্ত নয়। ভাল করে না জানার জন্য অনেক-বার একই পথে যেতে হয়েছে। আমাদের পক্ষে হায়দারাবাদের রায়চূড়ে যাবার দরকার ছিল না। বেশ কয়েকদিন আমাদের অযথা নষ্ট হয়েছে। এবার আমরা গেলুম বাঙ্গালোর হয়ে মাদ্রাজ। সেখানে মাউণ্ট রোডের কাছাকাছি এক ধর্মশালা 'পরমানন্দ ছত্রম্'—সেখানে রইলুম একদিন। কাশী থেকে প্রায় পাঁচ সপ্তাহ আগে আমরা বেরিয়েছি। পথ থেকে চিঠি দিয়েছি কয়েকখানা কলকাতা ও কাশীতে। মাদ্রাজ থেকে মাদুরাই এসে মেজমাসী বললেন, কিশোরকে একখানা জরুরী টেলিগ্রাম পাঠাও, ছয়শ' টাকা তারযোগে এখানে পাঠাতে। হাজার টাকার মধ্যে আর আছে প্রায় একশ' টাকা।

মেজমাসীকে সঙ্গে নিয়ে বড় ডাকঘরে গিয়ে দরকারী সব পরিচয়পত্রাদিসহ হাতের দস্তখৎ রেখে এলুম।

মাদুরাই হ'ল মস্ত তীর্থ, এবং এখান থেকে দাক্ষিণাত্যের সর্বত্র যাবার পথ পাওয়া যায়। আমরা 'পক্ষীতীর্থ' সেরে মাদুরাইতে ফিরে মীনাক্ষী মন্দির দেখে বেড়াচ্ছিলুম। এদিকে এখন প্রায়ই বৃষ্টি হচ্ছিল।

চতুর্থ দিনে টেলিগ্রাফ যোগে টাকা এল। আমরা নিশ্চিত হয়ে রামেশ্বরধামের দিকে যাত্রা করলুম। পরদিন সেখানে পৌঁছলুম। সেই বিরাট মন্দির দেখতে আমাদের দু'দিন লাগল। ত্রিরাত্রি বাসের পর আবার মাদুরাই। তারপর পূর্ব ভারতের পথ ধরে বেজোয়াড়া বা বিজয়ওয়াড়া। ভিজিয়ানো গ্রাম, তারপর রাজা-মন্দির। এটি ছোটখাটো তীর্থ, থাকো দিন দুই! আমরা এদিককার ভাষা জানিনে তাই কী কষ্ট দোকান-বাজারে! সেদিন মধ্যাহ্নকালে নিরিবিলি গোদাবরীর ঘাটে স্নান করতে গিয়ে প্রায় ডুবে মরেছিলুম। নরম মাটি আমার দুই পায়ের তলা থেকে নিচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছিল। আমার সেদিন ফাঁড়া ছিল।

সেই আমার প্রথম ভারত পরিক্রমা!

খুর্দা রোড হয়ে যেদিন পুরীর 'গোয়েঙ্কা ধর্মশালায়' এসে পৌঁছলুম, সেদিন দু'মাস পুরতে আর দু'চারদিন বাকি। ভয়ানক ক্লান্ত আমরা, পথের দুর্দশায় ধূলিমলিন। আমি শীর্ণকায়, মেজমাসীর ওজন কিছু কমেছে! আমাদের পরিচ্ছদ, বিছানাপত্র, পোঁটলাপুঁটলি,—যা কিছু সব ময়লা! আমি ধোবা খুঁজে বার করলুম, সাবান কিনলুম। পাণ্ডাকে দিয়ে 'ভোগ' আনার ব্যবস্থা করলুম, কুয়াতলায় মনের মতন করে স্নানে নামলুম। মেজমাসী দুধ-ঘি খাওয়া মানুষ, তিনি পাণ্ডাকে নিয়ে 'ধুলো পায়ে' গেলেন মন্দির দর্শনে। তিনি ভোগ ও পুজা দেবেন, গুণ্ডিচা বাড়ি যাবেন, গোবর্ধন মঠ দর্শন করবেন, এবং স্বর্গদ্বারে মন্দিরে মন্দিরে ঘুরবেন,—তাঁর অনেক কাজ।

পুরীতে পাঁচদিন। ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ মন্দিরে একদিন। প্রথম দিন পৌঁছেই মাকে চিঠি দিয়েছিলুম। সেই চিঠির জবাব এল—যেদিন আমরা যাচ্ছি ভুবনেশ্বরে। মা লিখেছেন—'আমরা বাড়ি বদলিয়ে আর-জি-কর হাসপাতালের পাশের রাস্তায় ভাড়াবাড়িতে এসেছি এক মাস আগে। এ চিঠি পাবামাত্রই তোমরা চলে এসো। ভয়ানক বিপদ যাচ্ছে। শিগ্‌গির চলে এসো।'

এর পর তৃতীয় দিনের সকালে পুরী এক্সপ্রেসে আমরা হাওড়ায় পৌঁছলুম।

দু' মাস ভ্রমণের পর নতুন ছোট্ট দোতলা ভাড়াবাড়িতে আমরা যেন আছড়িয়ে এসে পড়লুম। কী হয়েছে? খবর কি? কেমন আছ সব? কিসের বিপদ?

শুনলুম বুলির স্বামী গোপাল জংলী জ্বর নিয়ে রায়পুর হাসপাতালে ভর্তি হয়। এক সপ্তাহ পরে মস্তিষ্ক-বিকারের ঘোরে যখন বুলির নাম করে সে প্রলাপ বকতে থাকে, তখন ডাক্তাররা অবস্থা খারাপ ভেবে গোপালের বাবা গোবর্ধনবাবুর কাছে

এক জরুরী টেলিগ্রাম পাঠায়। কিশোরদাদা টেলিগ্রাম করেন আমাদের এখানে। এখান থেকে ছোড়দা ও বুলির বড় ভাই দুলু—দু'জনে রওনা হয়ে যায় রায়পুরে। ওদিকে কাশী থেকে প্রভাস বেরিয়ে পড়ে। এগারো দিনের দিন প্রভাস যখন রায়পুর হাসপাতালে ছুটে গিয়ে পেঁছিয়, তখন গোপালের মৃত্যুর ঘণ্টা দুই বাকি। ছোড়দা ও দুলু গিয়ে পেঁছিয় বারো দিনের দিন। সেই দিন গোপালের মৃতদেহের সৎকার করা হয়!

দ্বিতীয় খবর, গোপালের মৃত্যুর ঠিক সাতদিন পরে গোবর্ধনবাবু হঠাৎ হার্টফেল করে মারা যান!

তৃতীয় খবর, দিদি অর্থাৎ গোবর্ধনবাবুর স্ত্রী তার স্বামী ও সতীনপোর শোকে সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যায়। এখন সে দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় আছে।

আর বুলি?—প্রভাস কি বুলিকে নিয়ে রায়পুরে তার স্বামীর শেষশয্যার কাছে হাজির করেছিল?

না।—

মেজমাসী আর্তস্বরে বললেন, নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

সমস্ত কাহিনীটুকু বিশ্বাস করতে বাধে। আমি হতচেতন হয়ে সব শুনলুম। মা শুধু একদৃষ্টে আমাকে লক্ষ্য করছিলেন। আমি বাড়ি ফিরেছি প্রায় সাড়ে তিন মাস পরে—সেই শ্রীরামপুর থেকে বর্ধমান হয়ে কাশী গিয়েছিলুম। বড়দা ও ছোড়দা দু'জনেই বলল তুই আজই কাশী চলে যা,—বুলিকে নিয়ে আয়।

স্নানাহারের পর মেজমাসী মাকে ডেকে বললেন, বিশু, তোমার ছোট ছেলেটি এই দু'মাস আমার সঙ্গে থেকে খুবই যত্নে রেখেছিল! ছেলে তোমার যেমন সৎ, তেমনি মিষ্টপ্রকৃতি। ওকে সঙ্গে নিয়ে আমি আজই কাশী যেতে চাই। কি বলো তুমি?

মা বললেন, তোমার বাড়িতে এই সব দুর্ঘটনা ঘটেছে, যেতে হবে বইকি। বেশ্ ও যাক্ তোমার সঙ্গে,—বুলিকে আর ওখানে রেখে কি হবে?

আমাকে যেন অনেকটা শুনিয়েই মেজমাসী বললেন, আরেকটি কথা আমি তোমাকে বলে যাচ্ছি, বিশু। তোমার ছেলে আমাকে সকল তীর্থ ঘুরিয়ে এনেছে, প্রতিদিনের সব খরচ খাতায় টুকে আমার কাছে জমা দিয়েছে। দেখেছি ওর কোনও কিছুতে এতটুকু লোভ নেই! আমি স্থির করেছি, আমার বাড়ির উঠোনের ওপর উত্তর অংশটা ঘরদোর সুদ্ধ ওর নামে আমি উইল করে দেবো। আমি গিয়েই আমার উকীল বিশু গুপ্তকে ডাকতে পাঠাবো। তোমার ছেলে যাবে-আসবে,—আমার ওখানেই থাকবে। আমি ওর ভার নেবো।

মা চুপ করে সব শুনলেন। তিনি চিরদিন স্বভাব-শান্ত এবং সংযত। শত দারিদ্র্য এবং অনটনের মধ্যেও তিনি অবিচল ও নিরাসক্ত। তিনি জবাব দিলেন না।

সেদিন সন্ধ্যায় কাশীর গাড়িতে উঠলুম মেজমাসীকে নিয়ে, এবং পরদিন সকালে বেনারস ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে নামলুম। তখন যানবাহনের মধ্যে শুধু টাঙ্গা বা একা। আমাদের টাঙ্গা যথাসময়ে সোনারপুরার বড়বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। একটা

হইচই পড়ে গেল। ছুটে এল সবাই। আমি গাড়ি থেকে নেমে ফটকের মধ্যে ঢুকে কিশোরদাদার ছোট্ট সুন্দর ছেলে কমলকে তুলে নিলুম।

বাড়িতে শোক-তাপ এখন আর নেই। শ্বশুর ও স্বামীর শ্রাদ্ধ করেছে বুলি একই সঙ্গে। বড় ঘরে ঢুকে দেখলুম দিদির ন্যাড়া মাথা, কোমরে মোটা কাছি বাঁধা। পরনে আলুগা পায়জামা, গায়ে একটা জ্যাকেট। আমি কে যেন এক নবাগত, দিদি চেয়ে রইল! বুলির পরনে কালোপাড় ধুতি, মুখে-কপালে-হাতে কালশিরার দাগ, চেহারা শ্রীহীন, মাথার সিঁদুরের জায়গাটা ফ্যাকফ্যাক করছে সাদা। আমাকে দেখে সে এবার আর ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল না, উদাসীনভাবে অন্যদিকে চলে গেল! শুনলুম শ্রাদ্ধবাসরেই দিদি হঠাৎ হিংস্র হয়ে ওঠে, জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করে, ঘরদোর-আসবাবপত্র ভাঙ্গচুর করতে থাকে এবং হতচকিত বুলিকে ধরে বেদম মারপিট করে। সেই মার খেতে খেতে বুলির ফিট্ হয়। অতঃপর দিদিকে পিঠমোড়া করে বেঁধে শিবের বাড়ির কোণের ঘরটায় ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শেকল তুলে দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে পুরুত ভটচার্য প্রাণভয়ে পালিয়েছিল, আমার বৃদ্ধা দিদিমাকে মোতিঝি ছুটে এসে দোতলায় নিয়ে যায়। প্রভাস ও কিশোরদা তখন হাল ধরেন। মালপত্র কিনে এনে আবার শ্রাদ্ধের আয়োজন করা হয়। ছেনুমাসীসহ বড়বউদি বুলিকে সুস্থ করে তুলে ভুলিয়েভালিয়ে শ্রাদ্ধ করতে বসান। পুরুত আবার আসে। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেছে এক মাস হতে চলল।

আমার চিরজীবনের দিদিমার কাছে গিয়ে বসলুম। বৃদ্ধা আমার গলা ধরে শুধু কাঁদলেন অনেকক্ষণ। অমি চুপ করে রইলুম। বাঙ্গালীটোলায় শত সহস্র বিধবাদের মধ্যে আরও দুটি যোগ হ'ল! দিদির বয়স সাতাশ, বুলির এইবার তেরো বছর হবে। ওরা থাকবে ওইভাবে—যতদিন না ওদের যৌবনকাল ধ্বংস হয়। ভাত-কাপড়ের জন্য চেনামহলে দাসীগিরি করবে, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইবে, পাঁচজনের ফাই-ফরমাস খাটবে, রোগ-ভোগ হলে ঔষধ-পথ্য পাবে না, একটু আমোদ-আহ্লাদ করতে গেলে চরিত্রের দুর্নাম রটবে। এইভাবে দিন চলতে থাকবে—যতদিন না ওরা বিগত-যৌবনা হবে। তারপর ধীরে ধীরে আসবে জরা, আসবে প্রৌঢ়ত্ব, আসবে বার্ধক্য। তারপর শুধু মৃত্যুর দিন গোনা। রাঙ্গাদিদি দশ বছরে বিধবা হয়েছেন, এখন তাঁর প্রায় আশি। আছে আরও অনেক বৃদ্ধা আমার জানাশোনার মধ্যে। কাশীর বিধবারা বাঁচে বেশি।

কাশীতে মড়ক ছাড়া ওদের গতি নেই!

প্রভাসকে প্রশ্ন করলুম, কেন তুই বুলিকে নিয়ে গেলিনে রায়পুরে?

—আর বলিসনে সে কথা—প্রভাস বলল, কিছুতেই যেতে দিল না ওর শ্বশুর-শাশুড়ী। আমার পায়ে পড়ে বুলির কী কান্না। সে আমার সঙ্গে যাবার জন্য পাগল। আকুলি-বিকুলি কেঁদে বলছিল, মামা, আমি সেই ফুলশয্যের দিনে তাকে দেখেছিলুম···আর এলো না সে। আমাকে তুমি নিয়ে চলো মামা—পায়ে পড়ি··· আমি হাসপাতালে গিয়ে তার মাথার কাছে বসে থাকব।

কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ী অটল। অত ছোট মেয়েকে একা বিদেশে পাঠাবে না তারা।

বুলি তখন পাগলের মতন চেঁচিয়ে উঠল, ছোটমামা সামনে নেই, তাই আপনারা আমার ওপর এই অনাচার করতে পারলেন— ।

ভাবাবেগে একবার নড়ে উঠে প্রভাসকে কড়া কথা বললুম, তুই না আমার চেয়ে চার বছরের বড় ? কেন তুই বুলির কথা রাখলি নে ? কেন তুই শ্বশুর-শাশুড়ীর কথায় কান দিয়ে মেয়েটার ওপর এত বড় অবিচার করলি ? তোর নিজের বিচারবুদ্ধি ছিল না ?

প্রভাস চুপ। আমি আমার দুই চোখের আগুন নিজেই নিবিয়ে দিলুম !

কিশোরদাদা একদিন আমোকে নিরিবিলিতে ডাকলেন। মেজমাসী তখন বুলিকে নিয়ে ওপরে গেছেন। বুলি সারাদিন প্রায় ওপরেই থাকে। মেজমাসী রাত্রেও ওকে রেখে দেন।

কিশোরদা আমাকে ডেকে নিয়ে শিবের বাড়ির উত্তর প্রান্তের ছোট ঘরখানায় এলেন। দেখি সেখানে বড়বউদিও রয়েছেন। কিশোরদা বললেন, শোন্ বলি রে, রাগারাগি করিসনে। বুলিকে তুই কলকাতায় নিয়ে যা।

বউদি বললেন, মা-বাবাকে দেখলে মেয়েটা তবু একটু শান্তি পাবে !

আমার চোখে আবার আগুন জ্বলে উঠল। বললুম, এখন সবাই মিলে ওকে আপনারা সরিয়ে দিতে চান। কিন্তু ওর স্বামী মারা যাবার সময় আপনারা ওকে যেতে দিলেন না কেন ? কোথায় ছিল আপনাদের নীতিবুদ্ধি ?

কিশোরদা আমাদের সকলের বড় ভাই, উনি আমার অতিশয় প্রিয়। আমি যে ওঁর মুখের ওপর নীতিজ্ঞানের কথা তুলব—এ আমারও স্বপ্নের অগোচর ছিল। উনি তাই আমার দিকে একবার তাকালেন, পরে আমাকে পরম স্নেহে কাছে টেনে নিলেন। বললেন, শান্ত হ, জীবন-মৃত্যুর ঘটনায় কারো হাত নেই। প্রভাসের সঙ্গে গিয়ে স্বামীর মাথার পাশে বসে তার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করবে ওই কাঁচ মেয়ে, সেই বা কেমন হত রে ?

বউদি বললেন, ঠাকুরপো, তোমাকে ডেকেছি অন্য কারণে। বুলিকে আর যেন বিশ্বাস করা যাচ্ছে না— ।

মুখ তুললুম।

কিশোরদা বললেন, শ্বশুরের শ্রাদ্ধের দিন দুই পরে হঠাৎ একদিন দুপুরবেলায় বুলিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কোথায় গেল, কোথায় গেল— খোঁজ খোঁজ ! বুলি কোথাও নেই ! এমন সময় বিকেলের দিকে দেবনাথপুর থেকে ছুটে এলেন রাঙাদিদি। বুলি নাকি তার শ্বশুরের ঘরের মেঝেতে পড়ে গোঁ গোঁ করছে ! হ্যাঁ, আমিই আগে গেলুম সেখানে। প্রভাস আমার বন্ধু গোপাল ডাক্তারকে নিয়ে গেল। কোলের মধ্যে শোওয়ালুম মেয়েটাকে। লক্ষণ সুস্পষ্ট। মেয়েটা আফিং খেয়েছে দুপুরবেলায়। গোবর্ধনের আফিংয়ের কৌটোটা পড়ে রয়েছে একপাশে।

—গোপাল নল চালিয়ে পাম্প করতে আরম্ভ করল। রাত দেড়টার সময় মনে হ'ল মেয়েটা বোধ হয় বাঁচতে পারে।

—খুবই ভুল করেছেন আপনারা—আমি বললুম, ওকে বাঁচানো উচিত হয় নি।

—ওখানেই শেষ হয় নি, ঠাকুরপো,—বউদি বললেন, বুলি কী করেছিল জানা গেল বেস্পতিবারে? ভাগ্যি দেখতে পেয়েছিল মিষ্টির দোকানের রামচরণ!

—ব্যাপার কি?

কিশোরদা বললেন, সন্ধ্যেবেলা, তার ওপর ডিসেম্বরের বৃষ্টি। কনকনে ঠাণ্ডা। ছুঁড়ি গা-ঢাকা দিয়ে সোজা গোড়েনঘাটে নেমে গিয়েছে একেবারে ডুব জলে। একা ওইটুকু মেয়েকে ওই বৃষ্টির মধ্যে জলে নামতে দেখে রামচরণের সন্দেহ হয়। দোকান ফেলে সে ঘাটের দিকে নেমে আসে। বুলি ডুবেছে ততক্ষণে। রামচরণ জলে ঝাঁপ দেয়। যখন ছুঁড়িকে তুলে আনে, তখন সে একপেট জল খেয়ে খাবি খাচ্ছে!

—তারপর?

—নির্জন ঘাট, অত বৃষ্টিতে কেউ কোথাও নেই। রামচরণ ওর মাথাটা নিচের দিকে ঝুলিয়ে বোঁ বোঁ করে ঘোরাতে লাগল। কতক্ষণ পরে বুলির নাক-মুখ দিয়ে গলগল করে জল নামতে থাকে! ছুঁড়ির জান্ বড় কঠিন। সেই অজ্ঞান অবস্থায় ওকে দোকানে এনে তোলে। রাত দশটার পর একটু জ্ঞান হ'লে আমার নাম করে! রামচরণ লোক পাঠায় আমার এখানে। আমি দৌড়ে যাই। রাত এগারোটায় ওকে কাঁধে নিয়ে বাড়ি আসি।

—তুমি ওকে কলকাতাতেই নিয়ে যাও ঠাকুরপো, দেরি করলে আবার হয়ত একটা অঘটন ঘটিয়ে বসবে!

আমি এবার বললুম, ভয় নেই বউদি, আমি এসে পড়েছি, এখন ও আর কিছু করবে না!

—কেমন করে বুঝলে?

—আমি ওকে জানি, বউদি।

পরদিন না ডাকতেই বুলি আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আমি সহাস্যে বললুম, কি রে, এর মধ্যে চান্ করা হয়ে গেল? খেয়েছিস কিছু?

আমার প্রশ্ন অবান্তর, বুলি জানে। বুলি বলল, তুমি একবার ওপরে এসো, ছোটমামা।

বুলি আমাকে নিয়ে দোতলায় মেজমাসীর বড়ঘরের পাশ দিয়ে ছাদের ধারে ছোট ঘরটায় নিয়ে এল। সে বুলি নেই, এ বুলি অন্য। বুলি কাঁদল না আজ। বুলির বয়স বেড়ে গেছে দশ বছর। সে বলল, আচ্ছা ছোটমামা, বাবার মুখখানা আমার আর মনেই পড়ে না, তার মরা মুখখানা দেখলে কিই বা হত? না গিয়ে ভালই হয়েছে!

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বুলি বলল, কিন্তু সে মরেছে, সেজন্যে কি আমার দোষ? দেড় মাস ধরে সবাই মিলে আমাকে কেন মারছে? কী করেছি আমি? এই দ্যাখো না আমার সব গায়ে শুধু কালশিরে! বেলুন দিয়ে, খুন্তি দিয়ে, হাতা-বেড়ি দিয়ে, নোড়া দিয়ে, শেষকালে লাঠি আর ঝাঁটা দিয়ে—

—থাক্ বুলি! আর কিছু বলিসনে...।

হঠাৎ বুলি ককিয়ে কেঁদে উঠল,— মরতে চাই নি, ছোটমামা। গিরিবুড়ি আমাকে আফিংয়ের কৌটো দিবার জন্যে দেবনাথপুরায় নিয়ে যায়। গোড়েনঘাটের দিকে কে আমাকে এগিয়ে দিয়ে আসে জিজ্ঞেস করো ত? তুমি আসবার আগেই ওরা আমাকে মারতে চেয়েছিল।

—কেন?

—প্রতিশোধ নেবে!—কাঁদতে কাঁদতে বুলি বলল, আমি অপয়া, অলক্ষণে,— আমার জন্যে স্বামী-শ্বশুর মরেছে! তোমাকে ওরা সবাই ভয় করে তাই এখন ভালমানুষ সেজেছে! ওরা সবাই খুনে, বিশ্বাসঘাতক, ওরা জোচ্চোর। আমার সব গয়নাগাঁটি কাপড়-চোপড় কেড়ে নিয়ে ওরা বিক্রি করেছে। আর আমার একখানাও কাপড়জামা নেই, ছোটমামা। শুধু কিশোরমামা আর বড়মামীর জন্যেই আমি বার বার বেঁচে যাচ্ছি! তুমি আসবার আগেই আমি মরতে চেয়েছিলুম, ছোটমামা।

আমি উঠে বাইরে এলুম। মেজমাসীমা তখন রান্না চড়িয়েছেন। এগিয়ে এসে আমি বললুম, বুলি দেখছি আপনার কাছেই রয়েছে কাল থেকে?

—হাঁ—মেজমাসী বললেন, আমার কাছেই বুলি থাকু যতদিন ইচ্ছে। তবে ওকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়াই এখন ভালো!

—আমি ওকে আজই নিয়ে যেতুম।—আমি বললুম, কিন্তু ওর গায়ের কালশিরে গুলো একটু মিলিয়ে যাওয়া দরকার। ওর এ চেহারা দেখলে সেখানে আপনার এ-বাড়ির খুবই নিন্দে রটবে। সুতরাং দু'চারদিন আমি সবুর করব!

মেজমাসীমা বললেন, ওর গায়ে এত কালশিরে এল কোত্থেকে?

জবাব দিয়ে বললুম, বুলি বলছে একদল বাঁদর ওকে কামড়িয়ে দিয়েছে! —বলতে বলতে বলতে আমি নিচে নেমে গেলুম। বুলি দোতলাতেই থাকবে।

সেদিন বুলিকে নিয়ে আমি গোধোলিয়ার দিকে বেরোলুম।

আসবার সময় বড়দা আমার হাতে পঞ্চাশটি টাকা যোগাড় করে এনে দিয়েছিলেন। আমি তাই দিয়ে বুলির খানচারেক ভালো শাড়ি, একখানা গরম চাদর, একখানা ভাল কম্বল ও বালিশ, ওর গায়ের জামা, ওর পায়ের মাপের একজোড়া স্যাণ্ডাল,—এগুলো একে একে কিনলুম। আমি বিশ্বাস করি, বুলি সেই কুমারী কিশোরীই রয়েছে! বিশ্বাস করি, ওর এই দুর্ভাগ্য, উৎপীড়ন আর অপমানের মূলে আমি! আমিই সেই ভয়াবহ অভিশপ্ত শ্রাবণরাত্রির দুর্যোগের মধ্যে প্রকৃতির সব বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে বর নিয়ে গিয়েছিলুম সেই অন্ধকারে। না, সে বিয়ে মিথ্যে! বুলির আজও তেরো বছর বয়স নয়।

যা আমার পক্ষে অভাবনীয় ছিল, তাও করলুম। সঙ্গোপনে মেজমাসীমার কাছ থেকে আড়াইশ' টাকা ধার করলুম। আমি জানি অন্য কারোকেই তিনি টাকা ধার দেন না। কারণ তাঁর ধারণা, সকলেই তাঁকে শোষণ করার জন্য ওৎ পেতে থাকে। কিন্তু আমি এতদিনে বিশেষ সুনামের সঙ্গে তাঁর কাছে প্রতিষ্ঠালাভ করেছি। সেজন্য তিনি সোৎসাহে ও সানন্দে টাকা বার করে দিলেন। দুশ' টাকার মধ্যে বুলির হাতের

দু'গাছা সোনার বালা, একটি সরু নেকচেন, কানের দুটো ফুল, একটা স্যুটকেস—এগুলো হয়ে গেল। এ ছাড়া ওর মাথার তেল, সাবান, চিরুনি, কোল্ড ক্রীম, পাউডার, আয়না,—এবং আরেকখানা সিল্কের শাড়ি, এগুলোও দরকার। কালী-মাস্টারের কাছে ধার নিলুম পঁচিশ টাকা।

এক সপ্তাহ বাদে বুলিকে নিয়ে কলকাতা রওনা হলুম।

। ১৮ ।

'নাট্যমন্দির' জমে উঠেছে কলকাতায়। যারা চৌরঙ্গী আর লালদীঘির পাড়া ছেড়ে ধর্মতলা স্ট্রীটেও আসে না, যারা মধ্য ও উত্তর কলকাতাকে 'নেটিভ কোয়ার্টার' বলে উপেক্ষা করে চলত, সেই ইংরেজরা পর্যন্ত মাঝে মাঝে দলবেঁধে এসে শিশির ভাদুড়ীর অভিনয় দেখে যেত। ইংরেজ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনও শ্বেতচর্মীকে আমরা সে-সময়ে দেখি নি ও চিনি নি। তখন সাদা চামড়া মানেই হল ইংরেজ। কিন্তু তবুও মধ্যে-মাঝে দু'একজন ফরাসী এসে যেত চন্দননগর থেকে—ওখানে ছিল ওদের স্বাধীন উপনিবেশ, ইংরেজ প্রশাসন এলাকার বাইরে। ওখানে সস্তায় ভাল মদ পাওয়া যেত। সেজন্য কলকাতার শৌখীন বাবুরা, থিয়েটারের লোকেরা, ব্যবসায়ীরা, শুঁড়িরা এবং আরও নানা শ্রেণীর লোক মোটর নিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে চলে যেত চন্দননগরে। কিন্তু শিল্পী, কবি, সাংবাদিক, সাহিত্য-কর্মী—এরা কেউ বিশেষ যেত না। এদের তখন ডাল-ভাত জুটত না! শুধু ওখানকার গল্প শুনে লালাসিক্ত হতো!

'নাট্যমন্দির' এখন জমজম করছে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে। ওই বিরাট বাড়ি ও হল, শিশিরবাবু ভাড়া নিয়েছেন তিন হাজার একশ টাকায়। ওটাই তখন সমগ্র উত্তর কলকাতার প্রধান আকর্ষণ। আলোকমালায় সন্ধ্যা থেকে সুসজ্জিত! সীতা, আলমগীর, রঘুবীর, নরনারায়ণ, প্রফুল্ল এবং তারপরে ষোড়শী।

'ষোড়শী' হ'ল শরৎচন্দ্রের। মূল বইখানার নাম 'দেনা-পাওনা'। এই বই থেকে প্রথম শিবরাম চক্রবর্তী একটি চমৎকার নাটক উৎপাদন করে এবং সেটি রবীন্দ্র-নাথের ভাগ্নী ও সুপ্রসিদ্ধা দেশসেবিকা সরলা দেবীর সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকার পুজো-সংখ্যায় তখন প্রকাশিত হয়! 'ষোড়শী' নামটি শিবরামেরই দেওয়া। শরৎচন্দ্র তখন জনপ্রিয়তার উচ্চ চূড়ায় অধিষ্ঠিত। কিন্তু তাঁর উপন্যাস যে নাটকাকারে মঞ্চস্থ করা যায়, সেটি সেই প্রথম জানল নাট্যরসিকরা। শিবরাম তার পথিকৃৎ।

এই 'ষোড়শী' নাটকটি পড়ে শরৎচন্দ্র যেমন উচ্ছকিত হন, তেমনি অন্য দিকে শিশিরবাবু ও তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু সুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায় ওরফে আমাদের সুধাদা সেই পরিমাণে আকৃষ্ট হন। ওঁরা দু'জন ছুটে যান শরৎচন্দ্রের সেই সামতাবেড় বা পানিত্রাস গ্রামে। হাওড়া জেলায় দেউলটি স্টেশনে নেমে আন্দাজ মাইল দেড়েক

মাঠ পেরিয়ে গেলে রূপনারায়ণের তীরে—প্রায় তটেরই কাছে শরৎচন্দ্রের বাড়ি। ওঁরা গিয়ে তিনজনে মিলে বোধ হয় স্থির করেন, শিবরামকে এ ব্যাপার থেকে ছেঁটে ফেলা দরকার। বইখানা আবার নতুন করে ঝেড়ে নতুন ভঙ্গীতে লিখতে হবে। কিন্তু শরৎচন্দ্র নিজে নাট্যকার নন এবং নাটক লেখায় তিনি অভ্যস্তও নন। শিশিরবাবু নিজে নাট্যকার বা লেখক কোনটাই নন। সুতরাং স্থির হল এই, তৎকালীন নাট্যশাস্ত্রবিশারদ সুধাদা নিজে শরৎচন্দ্রকে দিয়ে 'ষোড়শী' নাটকটি নতুন করে লেখাবেন। আরেকটি ব্যবস্থা হ'ল এই, শরৎচন্দ্র সংগোপনে কলকাতায় আসবেন এবং শ্যামবাজারে দেশবন্ধু পার্কের নিকটবর্তী রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটে সুধাদার প্রিয়বন্ধু ও ব্যারিস্টার হেমন্ত মিত্রের বাড়িতে বসে কাজ করবেন। সুধাদা তখন ওখানেই থাকেন। যাই হোক, নিতান্ত অন্তরঙ্গ ছাড়া বাইরে এ ব্যাপারটি জানাজানি করতে দেওয়া হয় নি। এই সূত্রে শরৎচন্দ্র প্রায়ই হেমন্তবাবুর বাড়িতে রাত্রিবাস করে যেতেন। কেবলমাত্র সুধাধার জন্যই আমাকে ও-বাড়িতে মধ্যে-মাঝে যাতায়াত করতে হ'ত।

এ ব্যাপারটি নিয়ে শিবরামের সঙ্গে ওঁদের বহু দিন অবধি মনোমালিন্য চলে। 'কল্লোল' ও 'কালিকলম' গোষ্ঠীর অনেকেই শিবরামের পক্ষে ছিল। কিন্তু সবলের সঙ্গে দুর্বলের দ্বন্দ্ব কত কালই বা সম্ভব? অবশেষে শিবরাম তামাশা করে কোন কাগজে যেন লিখল, "শিশি-র ভাদুড়ী তুমি, নহ বোতলের"! পরে শুনেছিলুম, শিবরাম কিছু টাকা পেয়েছিল।

'ষোড়শী' নাটকের অভিনয় সমগ্র বঙ্গদেশকে চমৎকৃত করে। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে দর্শকসাধারণ এই সামাজিক নাটকের অভিনয় দেখে আনন্দ-বেদনায় উদ্বেলিত হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এর অভিনয় দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেন, এবং তিনি শিশিরবাবুকে ডেকে তাঁর 'তপতী' নাটকটি আবৃত্তি করে শোনান। সেই আসরে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনের মেজ ছেলে অধ্যাপক অরুণচন্দ্র সেন তৎকালে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়। অরুণচন্দ্রের মারফত কবি আমন্ত্রণ জানান সুধাদাকে।

কবির সেই পত্রের দু-একটি ছত্র এখানে উদ্ধৃত করছি: "কল্যাণীয়েষু, অরুণ, তোর বন্ধু সুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয়ের কোনো বাধা নেই। পরিচয় হ'লে নিশ্চয়ই খুশি হব—কেননা বাংলাদেশে কারো কাছ থেকে বিশুদ্ধ শ্রদ্ধা পাবার আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছি। ৩রা ভাদ্র ১৩৩৬—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুধাদা কিন্তু দুটি কারণে সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেননি। প্রথম কারণ, তিনি নিজে একটু নিউরটিক, সেজন্য কবির স্তাবক-দলের ভিড়ের মধ্যে তিনি একটু বেমানান হতে পারেন! দ্বিতীয় কারণ, কবি তাঁকে কাব্য আলোচনায় ডাকলে তিনি বেশী খুশী হতেন। রবীন্দ্রকাব্য দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার হিসেবে সুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায় ও পরে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—এঁদের দুজনকেই অনেকে জেনে এসেছেন। তবে সুধাধার যথার্থ তুলনা আমি আজও খুঁজে পাই নি। তাঁর বিদ্যার গভীরতা, তাঁর পাণ্ডিত্যের সহস্রমুখী ধারা, পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতির নিজস্ব সাহিত্যকীর্তির

মূলে উপজীব্য, মানবতাবাদের সঙ্গে রসশিল্পের, কাব্যের ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা, চিরন্তন সাহিত্যনীতির সঙ্গে সকল কাব্যের অতীন্দ্রিয়তাবাদের নিগূঢ়ের সম্পর্ক, মহাকাব্যের সীমাতিক্রান্ত ব্যঞ্জনা—এসব আলোচনায় তাঁর জুড়ি আজও আমার চোখে পড়ে নি। তাঁর অতলস্পর্শ উইসডম বা অধ্যাত্মজ্ঞান তাঁর রবীন্দ্রকাব্য আলোচনায় এমন স্বতঃস্ফূর্ত অনর্গলতায় পরিণত হত যে, তাঁর অন্তরঙ্গরা মুগ্ধ ও অভিভূত অবস্থায় ছয়-সাত ঘণ্টা অবটি স্থাণু হয়ে যেত।

শিশিরবাবুর তুঙ্গে তখন বৃহস্পতি। দিলীপ রায় তাঁর গৌরবোজ্জ্বল কালে ঘোষণা করলেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিদর্শনকালে তিনি মস্কো আর্ট থিয়েটারে জগৎবরেণ্য অভিনেতা কাচালভ-এর যে অভিনয় দেখে তন্ময় হয়েছিলেন, শিশিরকুমার তাঁর চেয়ে কোন অংশেই কম নন। যাই হোক, এবার শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব ও পরামর্শ অনুযায়ী 'তপতী' বা 'রাজারানী'র নাট্যরূপটি মঞ্চস্থ করলেন। মোট ছয় রাত্রি 'তপতী' অভিনীত হয়, তার মধ্যে একটি রাত্রে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। বাঙলার নাট্যশালার ইতিহাসে এই নাটকের বিস্ময়কর প্রযোজনা ও অভিনয়কলার সর্বাঙ্গীণ পূর্ণাঙ্গতা জ্যোতিষ্কের মতো অদ্যাবধি জাজ্বল্যমান। 'তপতী' নাটকের সার্থক প্রযোজনায় সুধাদার হাত ছিল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন 'সীতা' নাটকের পৌরাণিক পঠভূমির বরেণ্য মঞ্চশিল্পী চারু রায়। অতঃপর একে একে শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি নাটক মঞ্চস্থ করেন। তার মধ্যে 'শেষরক্ষা'-ই সর্বজনপ্রিয় হয়।

আমি ইতিহাস লিখতে বসি নি এবং এ কথাগুলি জাতীয় পাঠাগারে বসে গবেষণা করেও বলছিনে। আমি এ সমস্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলুম।

যাই হোক, শরৎচন্দ্রের কথা হচ্ছিল। 'ষোড়শী' নাটকটি মঞ্চস্থ করার প্রাক্কালে শিশিরকুমার প্রাচীরপত্রে শরৎচন্দ্রের নামের পাশে একটি নতুন সংজ্ঞা জুড়ে দেন, সেটি হল 'অপরাজেয় কথাশিল্পী'। সেদিনকার লক্ষ লক্ষ অনুরাগীর দল এই নতুন সংজ্ঞাটি সানন্দে বরণ করে নিয়েছিল।

নাটকের গঠন, তার অঙ্কের ভাগ, রসের সুষম সংবেদন, চরিত্রের সঙ্গতিরক্ষা, সংলাপের ভিতর দিয়ে নাটকের প্রগতি, নাটকের পক্ষে স্বাভাবিক পরিণতি এবং পরিশেষে সামগ্রিক রসসৃষ্টির দ্বারা সর্বজনমনের কাছে তাকে সংবেদনশীল করে তোলা —এগুলির জন্য সুধাদার কাছে বসে শরৎচন্দ্রকে প্রচুর শ্রমস্বীকার করতে হয়েছে! 'দেনা-পাওনা'য় শরৎচন্দ্রের জীবানন্দ ও অলকার মিলন ঘটেছে, 'ষোড়শী' নাটকে সুধাদা 'জীবানন্দ'র মৃত্যু ঘটিয়েছেন। কেননা, ওটাই নাট্য-পরিণতির নৈয়ায়িক রূপ। কারণ, জীবানন্দ তার প্রথম জীবন থেকেই আত্মনাশের বীজ বহন করে যাচ্ছিল! কাশীতে সুধাদার ফরিদপুরার বাড়ির বৈঠকখানায় রাশি রাশি বই কাগজের তলা থেকে আমিই একদিন বেগুনী কালিতে শরৎচন্দ্রের হাতের লেখা 'ষোড়শী'র কয়েকটি দৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলাম। সুধাদা এগুলি বাতিল করে শরৎচন্দ্রকে দিয়ে আবার লিখিয়েছিলেন!

এর পর অপরাজেয় কথাশিল্পীর 'দত্তা' একই উপায়ে এবং সুধাদার সেই একই

প্রকার সহায়তায় পূর্ণাঙ্গ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। 'জীবানন্দ'র ভূমিকার পর শিশিরবাবুর 'রাসবিহারী'র ভূমিকা জনসাধারণকে মুগ্ধ করে।

বোধ হয় এইরূপ একটা সময়ে কোনও কিছু একটা অজ্ঞাত কারণে শিশিরবাবুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের একটা ভুল-বুঝাবুঝি হয়। আমার সঠিক মনে নেই, সম্ভবত স্টার থিয়েটার, ওরফে তৎকালীন 'আর্ট থিয়েটারের' কর্তৃপক্ষ শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' বইটি মঞ্চস্থ করতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু সেই একই সময় শিশিরবাবুও 'রমা' নাম দিয়ে 'পল্লীসমাজ' অভিনয়ের আয়োজন করছিলেন। তখন আর্ট থিয়েটারের সঙ্গে নাট্যমন্দিরের কতকটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক ছিল। আর্ট থিয়েটারে অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ও তখন খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন। তখন শিশিরকুমার, নরেশ মিত্র ও অহীন্দ্র চৌধুরী—এই তিন প্রতিভার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এই নিয়ে কোথাও কোথাও আলোচনাও চলত। ওতে আমরা বেশ কৌতুক বোধ করতুম। নরেশবাবু ছিলেন আর্ট থিয়েটারে, এবং তিনি শিশিরবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সমবয়স্ক। এঁরা তিনজনেই ছিলেন বহুবাজারের প্রাক্তন 'ওল্ড ক্লাবের' সদস্য। অহীন্দ্রবাবু কিছু বয়ঃকনিষ্ঠ, এবং অতিশয় ভদ্র ও মিষ্ট প্রকৃতির। কিন্তু শিশির-কুমার ছিলেন তাঁর গুরুস্থানীয়। আমরা দেখেছি অহীন্দ্রবাবু এক সম্মিলিত অভিনয়কালে শিশিরবাবুর পায়ের ধুলো নিচ্ছেন!

অভিনয় ছাড়াও শিশিরবাবু তাঁর প্রখর পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। দেশ-বিদেশের ভাল ভাল সাহিত্য ও কাব্যগ্রন্থ, বিদেশী সাময়িক পত্রিকাদি, অভিনয় ও শিল্পকলা বিষয়ক গ্রন্থাদি তাঁর হাতের কাছে যুগিয়ে দেবার জন্য দু'একজন লোক মোতায়েন থাকত। কিন্তু অন্য দিকে শিশিরকুমার বেশ উগ্র উচ্চকণ্ঠ, অপ্রিয় সত্য-ভাষী এবং স্পষ্টবাদী। তিনি বাওয়ার হয়ে উঠলে বিশেষ কারও পরোয়া রাখতেন না।

'পল্লীসমাজ' আর্ট থিয়েটারে মঞ্চস্থ করা হবে—এইরূপ একটা চুক্তি করে একদা শরৎচন্দ্র শিশিরবাবুকে বলতে এলেন যে, নাট্যমন্দিরে 'রমা' হয়ে আর দরকার নেই! তখন বর্ষাকাল, বৃষ্টি হচ্ছিল। শরৎচন্দ্রের হাতে ছিল একটি ছাতা। তিনি 'নাট্য-মন্দিরে' ঢুকলেন, এবং কথায় কথায় শিশিরবাবুকে তাঁর সিদ্ধান্ত ও চুক্তির কথা জানালেন। শিশিরকুমার তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হলেন, এবং উভয়ের মধ্যে একটি বচসাই বেধে উঠল। এই সব পরিস্থিতি সুন্দরভাবে আয়ত্তে আনার জন্য সুধাদা একপ্রকার মোতায়েন থাকতেন। তিনি তখনই তাঁর অপূর্ব মাধুর্যময় কণ্ঠে শিশিরবাবু অপেক্ষা প্রবলতর উত্তেজনায় রবীন্দ্রনাথের সুললিত কবিতা একটির পর একটি মুখে মুখে আবৃত্তি করে বাতাসটাকে ঘুরিয়ে দিতে লাগলেন।

এক সময় এক বাটি চা পান করে শরৎচন্দ্র বিদায় নিয়ে বললেন, শিশির, তবে এখনকার মতন আসি, ভাই?

অপরাজেয় কথাশিল্পীর মুখোমুখি দাঁড়ালেন অপরাজেয় আত্মাভিমানী! শিশির-বাবু প্রবলকণ্ঠে বললেন, দাদা, চলে যাচ্ছেন আপনি, বাধা দেবো না। কিন্তু একথা বলে রাখলুম, ওই ছাতা বগলে করে আবার আপনাকে এই 'নাট্যমন্দিরে' ফিরে আসতে হবে।

সুধাদা এগিয়ে গিয়ে শরৎচন্দ্রের পায়ের ধুলো নিলেন। অনেকের তখন ধারণা হয়েছিল, শরৎচন্দ্র-শিশিরকুমার—উভয়ের মধ্যে এই নিয়ে যে সংঘর্ষ, সেটি দুই সমকালীন বৃহৎ ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব। উভয়েই তখন খ্যাতি ও গৌরবের শিখরচূড়ায় সমাসীন। উভয়ের এই সংঘাত আমাদের সকলের মনকে বিষন্ন করে তুলেছিল। যতদূর শুনেছি, আমাদের পাড়ায় গজেন ঘোষের আড্ডায় 'ভারতী' গোষ্ঠীর মজলিশে শরৎচন্দ্র ও শিশিরকুমারের মধ্যে প্রথম অন্তরঙ্গতা হয়। সে অনেক দিনের কথা।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, আর্ট থিয়েটারে 'পল্লীসমাজ' জমে উঠতে পারে নি। ওটার নাট্য-রূপদানে শরৎচন্দ্রের হাত ছিল অনেকখানি এবং তাঁর নির্দেশ তাঁরা বেদবাক্যের মতো বর্ণে বর্ণে পালন করেছিলেন। কিন্তু দর্শকসাধারণ সেটি যথেষ্ট আনন্দ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারল না। নানা দিক থেকে কড়া সমালোচনা হতে লাগল। আর্ট থিয়েটার একদিন 'পল্লীসমাজ' বন্ধ করতে বাধ্য হলেন।

সেটা শীতকাল। নাট্যমন্দিরের ছোট বৈঠকখানাটার বাইরে নাটক ও সাহিত্যের আড্ডা বসেছিল। সকালের দিকে শিশিরবাবুর ওখানে অনেকেই আসতেন। 'নরনারায়ণ'-এর লেখক পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, চারু রায়, সনৎ মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যোগেশ চৌধুরী এবং আরও অনেকে। সুধাদা বরাবরই একটু নিউরটিক অর্থাৎ স্নায়ুচাঞ্চল্যের প্রতীক। তিনি একস্থলে স্থির হয়ে বসতে পারতেন না। সেই কারণে অভ্যাগত বন্ধুবান্ধবদের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত হয়ে উঠতেন।

সেই একদিন শীতের সকালে শীতবস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে শরৎচন্দ্র হঠাৎ শিশির-কুমারের সামনে এসে হাজির।

—আরে, এ কি! আসুন, আসুন, দাদা আসুন। কী সৌভাগ্য আমার—শিশির-বাবু তাঁর পায়ের ধুলো নিলেন।

শরৎচন্দ্র বললেন, তোমার কাছে আবার এলুম, শিশির।

সোচ্ছ্বাসে শিশিরবাবু বললেন, আসবেন বই কি, একশ' বার আসবেন! এ আপনারই থিয়েটার, দাদা। আমরা সবাই আপনার একান্ত অনুরাগী—কিন্তু দাদা, এই শীতকাল, এমন মধুর মিষ্ট রৌদ্র—আপনি ছাতা এনেছেন কেন?

শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ পরিহাস করে বললেন, বাঃ তুমি যে বলেছিলে, এই ছাতা বগলে করেই আবার আমাকে ফিরে আসতে হবে!

হাসির সোরগোল উঠল এখানে-ওখানে। সুধাদা উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করে উঠলেন, "—দেবি, চলিতেছিলাম তব কমলবনে/পথের মাঝে ভুলালো পথ উতলা সমীরণে—"

আর্ট থিয়েটারে আর যিনিই থাকুন, সুধাংশু মুখুজ্যে নেই।

কিছুদিনের মধ্যেই সুদৃশ্য ও সুচিত্রিত প্রাচীরপত্র পড়ে গেল, 'নাট্যমন্দিরে অপরা-জেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের রমা।'

সমগ্র বাঙ্গলাদেশ আনন্দে আন্দোলিত হয়ে উঠল। মঞ্চস্থ হ'ল 'রমা'। নাটকের নাটকীয়তা, অনবদ্য উৎকণ্ঠা সৃষ্টি এবং চরিত্রাভিনয়ের মাধুর্য অনেকের পক্ষেই

স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। বিরাট প্রেক্ষাগৃহ প্রতিদিন জনপূর্ণ। দেড়শ' দুশ' লোক প্রতি অভিনয়ে প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখে।

এর কিছুকাল পরে দক্ষিণ কলকাতার বেহালায় মণীন্দ্র রায় মহাশয়ের অট্টালিকায় বসে শরৎচন্দ্র একদা আমাকে বলছিলেন, তুমি কি সেই লোকটির কথা বলছ—সেই যে ছেঁড়া চটি আর ছেঁড়া ধুতি পরে থাকত? মানে, সেই যে-লোকটি নতুন পানজাবি ছিঁড়ে ফেলে সেলাই করিয়ে পরত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার নাম সুধা মুখুজ্যেই বটে। একটু একটু মনে পড়ছে যেন! আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না, শিশির খুব দাম্ভিক? অত বড় অভিনেতা, অমন একজন বিদ্বান, অমন সুন্দর চেহারা—কিন্তু বড্ড দাম্ভিক!

আমার জবাব মুখে-মুখেই ছিল। কিন্তু সেটি শরৎচন্দ্রের মনঃপূত হয় নি। মনে পড়ছে, ঠিক সেইদিন টাউন হলে 'শরৎ-বন্দনা'র একটি মস্ত আসরের আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, কিরণশঙ্কর রায় এবং বাঙলার লেখক-গোষ্ঠী। কিন্তু তার কিছুকাল আগে হিজলী জেলে ইংরেজ আমলের পুলিস একদিন গভীর রাত্রে বেপরোয়া গুলি চালাবার ফলে প্রায় তিরিশটি জাতীয়তাবাদী কয়েদী যুবক আহত হয় এবং সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন মারা যান। এর ফলে প্রবল আন্দোলন চলতে থাকে। শরৎচন্দ্র ছিলেন সুভাষচন্দ্রের সমর্থক। সেই সময় সুভাষপন্থী 'বঙ্গপ্রদেশ ছাত্র সমিতির' প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তপন্থী 'নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি'। উভয় সমিতিতেই আমার বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা কম ছিল না, এবং 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' এই-ভাবে আমি ওই 'শরৎবন্দনা'র অন্যতম মোড়ল হয়েছিলুম। কিন্তু তৎকালের শোকাচ্ছন্ন বাঙলাদেশে 'পথের দাবীর' স্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে নিয়েও মাতামাতি করাটা সেনগুপ্তপন্থী ছাত্র সমাজ পছন্দ করে নি। ফলে, টাউন হলের মস্ত অনুষ্ঠান তুমুল হট্টগোল ও হাতাহাতির মধ্যে যখন ভণ্ডুল হচ্ছিল, তখন সেনগুপ্তপন্থীদের মধ্যে গুণদা মজুমদার প্রমুখ কয়েকটি জাতীয়তাবাদী যুবক আমাকে ধরে-বেঁধে সোজা সেই গভর্নরের বাড়ির সামনে একাউন্টান্ট জেনারেল আপিসের বারান্দায় রেখে আসে। আমি জানতুম শরৎচন্দ্রকে এখনই এই পথ দিয়েই টাউন হলে নিয়ে যাওয়া হবে, এবং চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনি মণীন্দ্র রায়ের গাড়িতে যখন এসেও পড়লেন—আমাকে আটকাতে হ'ল সেই গাড়ি। শরৎচন্দ্রকে যখন বলা হল 'দক্ষযজ্ঞ' পণ্ড হয়েছে এবং যুবকদের হাতে কারও মান-সম্ভ্রম থাকবে না—তখন অগত্যা শরৎচন্দ্রকে গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল এবং আগাগোড়া ঘটনাটা শোনার জন্য বেহালার জমিদার স্বর্গত সুরেন রায় মহাশয়ের পুত্র মণীন্দ্রবাবু আমাকে তাঁদের গাড়িতে তুলে নিলেন। সেই দিন সন্ধ্যায় শরৎচন্দ্র শিশিরবাবু ও সুধাদার সম্বন্ধে ওই প্রকার মন্তব্য করেছিলেন।—দুর্ভাগ্যের বিষয় এই, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স প্রকাশিত নাটক ষোড়শী, রমা, দত্তা প্রভৃতিতে শরৎচন্দ্রের নাম 'নাট্যকার' হিসাবে ছাপা হতে থাকে, যেটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। অথচ কোনও বইতে প্রকৃত নাট্যরূপদাতা সুধা মুখুজ্জের নামোল্লেখমাত্র নেই।

নিজের কথা বলতে বলতে অন্য কথায় গিয়েছিলুম। কিন্তু 'ধান ভানতে ভানতে শিবের গীত' গাইতে মাঝে মাঝে ভালই ত লাগে !

এবার প্রায় চার মাস পরে বাড়ি ফিরেছিলুম। অর্থাৎ মাত্র দশ দিন আগে কাশী গিয়েছিলুম, বুলিকে নিয়ে আবার ফিরে সুস্থির হয়ে বসেছি। বারো বছর বয়সের মেয়েটা যেন প্রকৃতই গোলাপ ফুল—ওদের গোষ্ঠীটাই রূপলাবণ্যেভরা—সে মেয়েই হোক আর ছেলেই হোক। কাশীতে এই গোলাপের অপমৃত্যু কিছুতেই ঘটল না। এই কিশোরী বিধবা চিরকাল নিজেও জ্বলবে, অন্য সবাইকেও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে। সেই জন্য বুলিকে সটান গিয়ে রেখে এলুম বরানগরে ওদের পালপাড়ার বাগানবাড়িতে—ওর মা-বাপের কাছে। আশা করে রইলুম, ওদের খিড়কির পুকুরে পোড়ারমুখী যেন একদিন ডুবে মরে ! মৃত্যু ছাড়া ওর অন্য কোনও পথ নেই। অতিশয় রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে বুলি—যারা অন্ধ সংস্কারের বাইরে আধুনিককালের কোনও প্রগতিবাদ স্বীকার করে না। ওরা পুরনো কালের গুরু-পুরোহিতের বংশ।

অতঃপর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যখন মায়ের হাতের সুন্দর নিরামিষ রান্না খাচ্ছি এবং বামাচরণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বদান্যতায় বাড়ির সামনে দোতলার দক্ষিণমুখী ঘরখানায় আমি আর মা গল্প করতে করতে রাত্রে একসময় ঘুমিয়ে পড়ছি, সেই সময়টায় মা একদিন বের করে দিলেন দুখানা সরকারী চিঠি। সেই একই চিঠি। হুগলি ডিভিশন পোস্টাল হেড কোয়ার্টার্স থেকে লেখা, তোমার ছুটি বার বার মঞ্জুর করা হচ্ছে ! এই শেষ পত্র অনুযায়ী তুমি অবিলম্বে শ্রীরামপুরের ডাকঘরে এসে কাজে যোগ দাও !

ঘোড়ার ডিম দেবো !

মা বললেন, সে কি রে, এ যে সরকারী চাকরি ! হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবি ? তা হলে করবি কি ?

হাসি মুখে চিঠি দুখানা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বললুম, কি করব তা এখনও ঠিক জানিনে। তবে আমি আপিসের কেরানী হয়ে জন্মাইনি, মা।

মা আমার সর্বংসহা। তিনি আমার ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে নিত্যদিন দুশ্চিন্তায় থাকতেন।

আমার হাতে রয়েছে এখন তিরিশ টাকারও বেশি। সুতরাং অবস্থা আমার এখন খুবই সচ্ছল—আপাতত চাকরি না করলেও চলবে। টাকাটা অবশ্য মায়ের কাছেই রেখেছি, এবং তাঁর কাছ থেকে রোজ দু-আনা বা তিন আনা করে চেয়ে নিই। রোজ তিনটে সিগারেট তিন পয়সা, নয়ত দু' পয়সা 'মারিজুয়ানা বা হাসিস'—প্রাদেশিক শব্দটা আর নাই বললুম—ওই নিয়ে সুবল মুখুজ্যের সঙ্গে চলে যেতুম সেই বাগবাজারের অন্নপূর্ণার ঘাটে—আমাদের সেই নিরিবিলি, শান-বাঁধানো আসনে। সেইখানে বসে 'মারিজুয়ানার' ঝোঁকে ডাক দিতুম পশ্চিম গগনের রবীন্দ্রনাথকে —"আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারম্বার ফিরেছি ডাকিয়া/সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার থাকিয়া থাকিয়া।" ইতিমধ্যে আমি গোটা দুই ট্যুইশনিও জুটিয়ে নিয়েছি। দুটো মিলিয়ে মোট মাসিক আঠারো টাকা !

আমি স্বাধীন, আমি স্বচ্ছন্দ, আমি অনর্গল। ঘুঘু-পাখির পাখার মধ্যে আমার প্রাণের গতিবেগ খুঁজে পাই, গোধূলিকালের গঙ্গাপথের আকাশে বকের পাঁতির মধ্যে আবিষ্কার করি আমার বর্ণরঙীন কাব্য। আমি কি লেখক? আমি কি কবি? না কিছু না। আমি কেউ না, কারও না। "ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন, ছুটত ঘোড়া উড়ত বালি—"

সেদিন সকালে বেরিয়ে সোজা গেলুম নাট্যমন্দিরে। খবর পেয়েছিলুম সুধাদা ওখানে আছেন। যা ভয় ক'রছিলুম ঠিক তাই। সুধাদা ক'দিন ধরেই 'অসুস্থ' হচ্ছেন। তারাকুমার বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, আমাকে দেখেই সহাস্য ক্রোধের সঙ্গে বললেন, বড্ড খোঁজাখুঁজি চলছে, না? যা না সেই গরানহাটার 'অ্যালেন হোটেলের দোতলায়, পেয়ে যাবি সুধাদাকে। যা, নেপেনকেও পাবি ওখানে।

আমাদের 'কল্লোল'-এর নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কিছুদিন থেকে সুধাদার খুবই ঘনিষ্ঠ। নৃপেন স্বভাব-কবি, রোমান্টিক ও আদর্শবাদী। 'কল্লোল'-এর আড্ডায় নৃপেন সর্বদা সমুজ্জ্বল। নজরুলের একটা সময়ে পবিত্র গাঙ্গুলীর মতো নৃপেনও ছিল নিত্য সহচর। ওকে আমাদের অনেকেই বলত 'নেপী'। নৃপেন ছিল কিছু নৈরাশ্যবাদী, তার মধুর ব্যবহারের সঙ্গে তার ভঙ্গীটি ছিল সর্বহারার মতো! বন্ধুমহলে ওটাকে বলা হত 'নৃপেনিজমু'।

ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছিলুম, হঠাৎ বেরোলেন বিশ্বনাথ ভাদুড়ী।

বিশ্বনাথের সঙ্গে আমার সেই বর্ধমানে দেখা—যখন উনি স্থির করেছিলেন সন্ন্যাস নিয়ে গন্ধবাবার চেলা হবেন। আমাকে দেখেই উনি বললেন, সেদিন তুই কি করলি বলু ত? সকলের মাঝখানে বসে অমনি করে 'নর-নারায়ণ' এর কড়া সমালোচনা করলি? ক্ষীরোদবাবু সামনে বসেছিলেন দেখিস নি?

বললুম, না, দেখি নি ত? কিন্তু আমি যে বললুম ওটা পৌরাণিক কাব্য, ঠিক নাটকের মতন মনে হয় না। তুমি তো কেষ্ট সেজেছিলে, তোমার 'সলিলকি' মনে করো তো?

—ছি ছি, তুই একেবারে অনভ্যান!—বিশ্বনাথ বললেন, শোনু, বড়দা তোকে খুঁজছিল। একবারটি দেখা করে যা। আয়, আমিও যাচ্ছি।

শিশিরবাবুর স্ত্রী আত্মনাশ করেন ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে—ওঁরা তখন বাদুড়বাগানের বাড়িতে। অশোকের বয়স তখন মাত্র আট মাস। ওঁর স্ত্রীর শালীনতাবোধ ও মিষ্টপ্রকৃতি আত্মীয়মহলে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। শিশিরবাবু তখন এখানে ওখানে অভিনয় করে বেড়ান। উনি পারিবারিক জীবনে যথেষ্ট গাম্ভীর্য রক্ষা করে চলতেন এবং অন্য পাঁচটি ভাইকে তৈরী করে তোলার দায়িত্ব ওঁর ওপরেই ছিল। বিশেষ করে শেষের তিনটি—হৃষিকেশ, মুরারী ও পুতু ওরফে ভবানী। মেজভাই তারাকুমার ওঁর যথেষ্ট বাধ্য ছিলেন না। কিন্তু সে অন্য কথা। আমি শৈশবে ও বাল্যে শিশির-বাবুকে দেখলেই ফুড়ুক করে পালিয়ে যেতুম। ওঁর ওই মোটা চশমার নিচে অপেক্ষাকৃত ছোট চোখ দুটো ছিল খুব তীক্ষ্ণ।

এদিক ওদিক ঘুরে শিশিরবাবুর কাছে এলুম। বিশ্বনাথ আমাকে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি ওকে খুঁজছিলে বড়দা, ও কাশী গিয়েছিল।

আমি এগিয়ে বড়বাবুর পায়ের ধুলো নিলুম। উনি বললেন, বাবা বিশ্বেশ্বরের মাথায় হাত বুলিয়ে এসে আমার পায়ে হাত বোলাও কেন?

ভয়ে ভয়ে আমি বললুম, সেটা পাথর, এ দুটো জ্যান্ত পা!

হুঁ! সুধা বলছিল তুমি নাকি লিখতে-টিকতে পারো?

এবার মৃদু ভীরু কণ্ঠে বললুম, লিখতে এখনও শিখি নি, তবে হিজিবিজি কাটি।

বড়বাবু আমার নতমুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললেন, লেখক হতে যাচ্ছ, পড়াশুনো কিছু করেছ?

গলা শুকিয়ে উঠছিল, তবু সাহস করে বললুম, পড়াশুনো করলে পণ্ডিত হয়, কিন্তু লেখক হয় না! আপনি পণ্ডিত কিন্তু লেখক নন।

হঠাৎ শিশিরবাবু হেসে ফেললেন, তাই দেখে বিশ্বনাথ সোৎসাহে বলে উঠলেন, ওর কোনও কথা সিরিয়াসলি নিও না বড়দা, ও একটি চীজ তৈরি হচ্ছে!

আমি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ জানালুম। বড়বাবু তখন বললেন, যাক, শোনো বলি। বড় বউদিদিকে বলো, সাঁতরাগাছির জমির টুকরোটা যে মামলায় জড়ানো আমি জানতুম না। না নিয়ে উনি ভালই করেছেন। তুমি কাল সন্ধ্যের পর এসে ঋষির কাউণ্টার থেকে বাকি হাজার টাকা নিয়ে যেও।

বাইরে এসে সেদিন বিশ্বনাথের সঙ্গে বচসা বেধে গিয়েছিল। তাঁর ধারণা, আমি অতিশয় চতুর! আমার ধারণা এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

যাই হোক, দুদিনের মধ্যেই মেজমাসিমার নামে আড়াইশ' টাকা এবং কালী-মাস্টারের পঁচিশ টাকা—এ দুটোই মনিঅর্ডার করে দিলুম। আমার বড়দার আপিসে দেনার দরুণ পঞ্চাশ টাকা শোধ করলুম। মায়ের কিছু কেনাকাটা ছিল, তাতেও গেল টাকা পঁচিশেক। বাকি সাড়ে ছ'শ টাকা মায়ের পোস্ট আফিসের খাতায় জমা দিলুম।

কল্লোল আপিস হ'ল পটুয়াটোলা লেন, কালি-কলমের আপিস কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দোতলায় বরদা এজেন্সিতে। দুখানা কাগজেই আমি নিয়মিত লিখি। কল্লোল নিয়ে তখন বেশ হইচই। বুদ্ধদেবের 'রজনী হ'ল উতলা' নিয়ে অমল হোম প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে তৎকালীন 'অতি আধুনিক' সাহিত্যের দফারফা করে এসেছেন। তার পরে বুদ্ধদেব লিখেছে এক স্মরণীয় কবিতা 'বন্দীর বন্দনা'। প্রমাণ করেছে সে শক্তিমান কবি। অচিন্ত্য আরম্ভ ক রছে 'বেদে' নতুন ভাষাভঙ্গীতে। নব-শক্তির শচীন সেন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বলেছেন, এদের একে একে বিয়ে দিয়ে দাও! বন্ধুরা শচীনের নতুন নাম রেখেছে সাচ্ ইনসেন'। এ ছাড়া যুবনাশ্ব ওরফে মণীশ লিখেছে, 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী', আর প্রেমেন্দ্র তার 'পাঁক' নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। অভিজাত সাহিত্যের সমালোচকরা চেঁচাচ্ছে, এরা নাকি সবাই মিলে নোংরা বস্তির নালা-নর্দমার পাঁক নিয়ে ছোড়াছুঁড়ি আরম্ভ করেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে অভিজাত

সাহিত্যের মুখপাত্ররা 'কল্লোল-কালিকলম' এর প্রায় প্রত্যেক লেখকের কাছে আমন্ত্রণ জানিয়ে রচনা ভিক্ষা করেছিলেন। আমার লেখা মাঝে মাঝে 'প্রবাসী'তেও ছাপা হচ্ছিল। অচিন্ত্যর একটি কবিতা 'প্রবাসী'তে ছাপা হয় মেয়েছেলের নাম দিয়ে।

লেখকদের আর্থিক অবস্থা চিরদিনই শোচনীয়। অতি-আধুনিক গোষ্ঠীর দিন চলে না, অন্ন জোটে না! কেউ যদি কোনও প্রকার পাঁচটি টাকা পায় তবে সে ধনী। এর মধ্যে কারো কারো আবার অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছে। নিজেরই পেট চলে না, তার ওপর আবার বউ। কারো আছে দাদা; কারও বাবা, কারও দিদিমা—কারও বা ঈশ্বর ছাড়া গতি নেই! ওর মধ্যেই এসে দাঁড়িয়েছে জসীম উদ্দিন, মাঝে মাঝে হুমায়ুন কবির আর গিরিজা মুখুজ্যে, আবার ওরই মধ্যে হাওড়ার কোন্ কলেজের সেই মুখচোরা মিষ্টপ্রকৃতি অধ্যাপক জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। অতি-আধুনিক সাহিত্য কতকগুলি নিরন্ন, দরিদ্র, হতভাগ্যদের হাতে যখন জমে উঠেছে, তখন 'শনিবারের চিঠি'র সজনী দাস বেশ বাগিয়ে ওদের বিরুদ্ধে কলম ধরল!

দেড় বছর ধরে নিয়মিতভাবে আমি 'কালি-কলম'-এ লিখেছিলুম। দ্বিতীয় বছরে পুজোর ঠিক আগে প্রকাশক বরদা এজেন্সি ও কালিকলমের মালিক শিশির নিয়োগীর কাছে একদিন মাত্র দুটি টাকার জন্য হাত পাতলুম। তিনি তৎক্ষণাৎ দুটো টাকা বের করে দিলেন। কিন্তু আশ্বিনের পর মাস চারেক বাদে মাঘ মাসে হঠাৎ নিয়োগী মশায় বললেন, টাকা দুটো ফেরত না পেলে তাঁর হিসেবপত্র মেলাবার খুবই অসুবিধা হচ্ছে।

বলতে গেলুম এতদিনের এতগুলো লেখার দাম কি দু'টাকাও নয়?—কিন্তু বলতে পারলুম না, শৈলজানন্দ আমার গা টিপলো। পরের দিন আমার এক পুরনো বন্ধুর কাছে ধার নিয়ে শিশির নিয়োগীর দেনা শুধলুম। 'কালি-কলম' সম্পাদক মুরলীধর বসু ঘটনাটা শুনে আনন্দে মুখোজ্জ্বল করলেন। চোখ দুটো তাঁর বড় বড় হয়ে উঠল, আমি মর্মাহত হয়েছি, সেই কারণে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, এই ত চাই, ভাই। দুঃখের দাহনে যত দগ্ধ হবে ততই ত সাহিত্য চিত্তগ্রাহী হবে! ডস্টয়েভস্কি, গোর্কি চেকভ—ভাবো ত এদের কথা! বুক ফাটবে, চোখ দিয়ে রক্ত ঝরবে, তবে না সাহিত্যে আসবে প্যাশন্! তুমিই ত বলছিলে সেদিন নুট-হামসুনের কথা! দুঃখ চাই, বুঝেছ? ব্যথা, বেদনা, নৈরাশ্য, অসন্তোষ, দারিদ্র্য, অপমান, অন্নাভাব,—তবে ত সেই সাহিত্য থেকে উঠবে বিপ্লব আর সমাজবিদ্রোহ! তবে ত ভেঙ্গে দেবে সব কুসংস্কার, মূঢ়তা আর অশিক্ষা! মনে পড়ছে না তোমার, "ব্যাঘাত আসুক নব নব/আঘাত খেয়ে অচল রবো/বক্ষে আমার দুঃখে তব বাজবে জয়ডঙ্ক—"? এগিয়ে চলো ভাই, এগিয়ে চলো—প্রাণ দিয়ে জীবন দিয়ে বুকের রক্ত দিয়ে শুধু লেখো! দেখছ না চারদিকে অন্যায়, দুর্নীতি, দুরাচার আর মূঢ়তায় জীবন পঙ্গু হয়ে রয়েছে? দেখছ না চারদিকে ঘিরে রয়েছে অচলায়তন? একে ভাঙ্গো, মাথা ঠুকে ঠুকে একে চূর্ণ করো, তোমার কপাল বেয়ে রক্তের ধারা ছুটুক—

কিন্তু যদি না খেয়ে মরি চরম দুর্দশার মধ্যে?

মুরলীদা হেসে উঠলেন উৎফুল্ল আনন্দে। বললেন, সেই ত তোমার সকলের বড় গৌরব! সাহিত্যের জন্য তোমার আত্মোৎসর্গ! সাহিত্যের বড় আদর্শের জন্য তোমার সেই মৃত্যু হবে পরম গৌরবের। পরের 'জেনারেশনে' যারা আসবে তারা তোমার সত্য মূল্য নির্ধারণ করবে।

মুরলীদা সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি। নতুন কালের সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর এই আদর্শবাদের পিছনে ছিল ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটুশনে তাঁর শিক্ষকতা,—মাইনে পেতেন বোধ হয় আশি টাকা! তাঁর একে একে দুই স্ত্রী মারা যান। তৃতীয়-বিবাহের বউভাতে আমরা নিমন্ত্রিত হয়েছিলুম। সেই আসরে গান-বাজনার মধ্যে নজরুল উচ্চহাস্যে যে পরিহাসটি করে, সেটি ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা চলে না! আদর্শবাদ মুরলীদাকে বেশ মানায়।

সেই সময় প্রতি দোল-পূর্ণিমার রাত্রে সকলের চেষ্টায় চাঁদপাল ঘাট থেকে একখানা নৌকা ভাড়া করা হত। ঘন জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়ে সেই নৌকো কুড়ি-পঁচিশজন যাত্রী নিয়ে ভাগীরথীর দক্ষিণ জলপথে পাড়ি দিত। কল্লোল ও কালিকলম গোষ্ঠীর অধিকাংশ লেখক ছাড়াও সাহিত্যোৎসাহী নিকট বন্ধুরা থাকতেন। সঙ্গে থাকত বড় বড় ডেকচিতে লুচি, কচুরি, পোলাও, মাংস, মিষ্টান্ন এবং পানীয় জল। হারমোনিয়ম, বাঁয়া-তবলা, বাঁশী—এগুলোও থাকত সঙ্গে। নজরুল হত মধ্যমণি। গঙ্গায়-গঙ্গায় একূলে-ওকূলে নজরুলের নব নব রচিত সঙ্গীত ও তাদের সুরমাধুর্য ভেসে ভেসে বেড়াত সেই জ্যোৎস্না রাত্রে। সেই নৌকায় আহারাদির পাট চলত। একবার একটি হারমোনিয়মের চাবি ছিল কড়া। টানতে ও টিপতে অসুবিধা হচ্ছিল। নজরুলের পরিহাস তৎক্ষণাৎ তির্যক গতিতে ছুটল। বলল, ও মুরলীদা, তুমি এই 'কুমারী' হারমোনিয়ম কোথা থেকে এনেছ?

উচ্চরোলে সবাই হেসে উঠল।

একবার পূর্ণিমার কোটালে ভয়ানক উঁচু বিরাট এক দৈত্যের মতো বান এসেছিল গঙ্গায়। আমাদের নৌকা আন্দাজ কুড়ি-বাইশ ফুট উঁচুতে উঠেছিল। তখন আমরা মাঝনদীতে। পশ্চিম পারে বটানিক্যাল গার্ডেনস্, পূর্ব পারে সেই বদরতলা। ত্রাহি মধুসূদন! সেবার বটানিক্যাল গার্ডেনস্-এর আঘাটায় আমাদের নৌকা আছড়িয়ে পড়ল। সেদিনের সেই নৌকা ডুবে গেলে তৎকালীন সাহিত্যেরই ভরাডুবি ঘটত, সন্দেহ নেই। যত দূর মনে পড়ছে, তারপর থেকে দোলপূর্ণিমা তিথিতে আর নৌকাযাত্রা করা হয় নি! বান সরে যাবার পর মাঝিমাল্লারা আবার আমাদেরকে অবশ্য নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছিল। সেদিন সকলে বাড়ি ফিরেছিল রাত তিনটের। মৃত্যুর গ্রাস থেকে অতি আধুনিক সাহিত্য মুক্তি পেয়েছিল!

না, কিছু ভাল লাগছে না। সারাদিন যা হোক করে কাটে বন্ধুমহলে। সন্ধ্যার পর থেকে সুবল মুখুজ্যে! কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকে বিষণ্ণতা পেয়ে বসে। প্রতি নিদ্রাহীন রাত যেন নৈরাশ্যে জরো জরো। পৃথিবী বেদনায় পাণ্ডুর, সূর্য শুধু হলদে, চাঁদ শুধু আকাশের এক গভীর ক্ষত। আমি শুধু ভাবছিলুম আমার কোনও

ভবিষ্যৎ নেই! আমি কোনও প্রতিশ্রুতি, কোনও দায়িত্ব, কোনও কর্তব্য পালন করতে আসি নি! আমি চেয়েছিলুম সাংঘাতিকভাবে বাঁচতে। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনের ওপর দিয়ে হাঁটব, তরঙ্গে তরঙ্গে আহত-প্রতিহত হবো! না, এ নয়, এরা কেউ নয়, এরা সবাই যেন চারদিক থেকে আমার মারণের মন্ত্রপাঠ করছে। না, পারব না, অশিব শক্তির এই চাপা ষড়যন্ত্র আমি বরদাস্ত করব না। এ যেন 'শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি, নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের ধূমাঙ্কিত কালি/ লাভ ক্ষতি টানাটানি অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ কলহ সংশয়/সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।"

আবার উঠে দাঁড়াই প্রভাতকালে। প্রতি প্রভাতে আমি যেন নতুন করে ভূমিষ্ঠ হই। চারিদিকে দেখি সেই প্রাচীন পৃথিবী। যেন আমার সামনে আবার এসে দাঁড়িয়েছে আরেক নবীনের ডাক। গগনের অনন্ত নীলিমার দিকে চেয়ে দেখি, এ বিশ্বের পিছনে কেউ কোথাও এক অদৃশ্য মহাতেজঃ একা দাঁড়িয়ে রয়েছে,—যেন তার মতো আমিও অনন্ত একা।

এমন এক সময় কাশী থেকে হঠাৎ চিঠি এল ঃ যদি পারিস শিগগির চলে আয়। এখানে একটা কাজ জুটে যেতে পারে। ইতি কালী।

এর চেয়ে সুসংবাদ সেদিন আমার পক্ষে আর কিছু ছিল না। তীর্থশ্রেষ্ঠ কাশীতে স্বাবলম্বী হয়ে বাকি জীবন কাটিয়ে দেবো, এই ত আমার একমাত্র উচ্চাভিলাষ।

সেই দিনই আমার দুটি গর্দভ-ছাত্রের টুইশনি ছেড়ে দিলুম।

॥ ১৯ ॥

কাশীবাস করব এবার চিরস্থায়ীভাবে।—না, অন্যদিকে আর মন দেবো না। সর্বপ্রকার অসৎসঙ্গ বর্জন করব, বদ্ অভ্যাসগুলো ছাড়ব, নেশাপত্রের দিকে মন একেবারেই দেবো না। বরং প্রভাতে গঙ্গাস্নান, সূর্যের দিকে চেয়ে পইতে ধরে গায়ত্রী-মন্ত্র জপ, পূজা-অর্চনা, শিবের মাথায় ফুল আর গোটা দুই-চার আলোচালের দানা ফেলে যাওয়া, চন্দনচর্চিত কপাল, সিক্তবস্ত্রে মন্দিরে মন্দিরে মাথা ঠোকা, সংগুরু খুঁজে পাওয়া এবং সৎসঙ্গে বাস—এইটিই তো জীবনের একমাত্র কাম্য। জয় গিরিশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো।

যাবার আয়োজন যখন সম্পূর্ণ করেছি তখন শৈলজানন্দ বলল, আমাকে তোমার সঙ্গে নাও।

মানে?

শৈলজা বলল, না বাঙলাদেশে আর নয়। ওখানে গিয়ে পড়লে অন্তত একটা মাস্টারিও তো জুটবে। আমি, তোমার বউদি আর দিদিমা। না না বেশ থাকব।

মনের মতন সাহিত্য করব, একটু একটু আফিং খাবো—

বললুম, আফিং খাবে ? কেন ?

কিছু বোঝ না তুমি ।—শৈলজা বলল, চলো, কাশী গিয়ে সব কথা হবে ।

অতএব শৈলজা আমার সঙ্গে কাশী যাবার দিনস্থির করে ফেলল, এবং আমি সেই অনুযায়ী কালীকে চিঠি দিলুম, শৈলজা যাচ্ছে আমার সঙ্গে । ওখানে তুই দশ-বারো টাকার মধ্যে ওর জন্যে একখানা বাড়ি ঠিক করে রাখিস । অমুক তারিখে আমরা যাচ্ছি ।

শৈলজা কখনও কাশী যায় নি এবং কালী মাস্টার কোন্ ব্যক্তি তাও সে জানে না । কিন্তু তখন 'কয়লা-কুঠি' সিরিজের গল্পের জন্য শৈলজার খুব নামডাক । সাহিত্যপাঠক মহলে সে সুপরিচিত । কালী তার একজন অনুরাগী পাঠক ।

নির্দিষ্ট দিনে শৈলজানন্দ, তার স্ত্রী ও দিদিমাসহ হাওড়া স্টেশনে আমার সঙ্গে সন্ধ্যাবেলাকার দেরাদুন এক্সপ্রেসে চড়ল । সর্বাবস্থায় যে-ব্যক্তি লেখকসমাজের একান্ত হিতৈষী সেই পবিত্র গাঙ্গুলী স্টেশনে বিদায় জানাতে এসেছিল ।

আমাদের একই গাড়িতে যাচ্ছিল কাশীর তারাকুমার চট্টোপাধ্যায় ওরফে মণিবাবু । ওকে সবাই ডাকে 'তারামণি' বলে । তার সঙ্গে ছিল তার সহোদরা ভগ্নী । তারামণি হল কালী ও কেদারের বন্ধু, এবং ঝাঁসী স্কুলের হেডমাস্টার প্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর । তারামণির বিয়ে আগামীকাল সেইজন্য বোনকে নিয়ে যাচ্ছে কাশীতে । আমাদের মধ্যে বেশ গল্প জমে উঠল ।

পরদিন সকালে বেনারস ছাউনি স্টেশনে দেখি কালী দাঁড়িয়ে, সুতরাং শৈলজার পক্ষে আর কিছু অসুবিধা রইল না । 'আউধগবী' এলাকায় কালী একটি বাড়ি ঠিক করে রেখেছে । একটি টাঙ্গায় আমার মালপত্র সমেত আমি আর কালী, অপর একটি টাঙ্গায় শৈলজারা । তারামণিরা গেল আরেকখানা টাঙ্গায় ।

সোনারপুরার বড়বাড়িতে এসে আমি নামলুম । ওখানে রয়েছেন দিদিমা, মাসী-মারা, সপরিবারে কিশোরদা, প্রভাস, থানকাপড়-পরা দিদি,—দিদির মস্তিষ্ক-বিকার সম্প্রতি কিছু কমেছে । ইতিমধ্যে মেজমাসী যে তাঁর ভূসম্পত্তির একটি অংশ আমার নামে উইল করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এজন্য বোধ হয় কিছু কানাকানি হয়ে থাকবে । ফলে, এবার এ বাড়িতে পা দিয়েই তার একটা প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিলুম । সম্পত্তির ভাগীদার হতে যাওয়া খুবই বিড়ম্বনা ।

আমার জিনিসপত্র বড় ঘরের একটি কোণে গুছিয়ে রেখে আউধগবীতে শৈলজার বসবাসের ব্যবস্থাদি দেখতে গিয়েছিলুম । আমার জন্য এখানে ইণ্ডিয়ান প্রেসের বাংলা ডিপার্টমেণ্টে প্রুফ রীডারের কাজ স্থির হয়েছে । প্রেসের ম্যানেজার অপূর্বকৃষ্ণ বসু —যিনি রবীন্দ্রনাথের বহু গ্রন্থের মুদ্রাকর । আমার মাসিক বেতন পঁচিশ টাকা । এবার আমার সৌভাগ্যের সূচনা । প্রভাস আমাকে বলল, আমার সাইকেলখানা নিয়ে তুই রোজ আপিস যাস ।

ফিরলুম তখন বেলা বারোটা । হাসি-খুশী মুখেই ফিরেছিলুম । আগামী পরশু

থেকে আমার প্রুফ-রীডারের চাকরি আরম্ভ। গৌরীগঞ্জের ওদিক দিয়ে স্টেশনের পথে দু' পা গলির মধ্যে ঢুকলেই সামনে ইণ্ডিয়ান প্রেস। এটি এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের বাংলা শাখা আপিস। এর এখন মালিক হলেন স্বর্গত চিন্তামণি ঘোষের ছেলেরা।

নিচের তলাটা যেন থমথম করছে। ছেনুমাসীর রান্না হয়ে গেছে। বড় ঘরখানা কোনদিন বন্ধ থাকে না, আজ দেখি ঘরে শেকল তোলা। দিদিমা আছেন দোতলায়। দিদি নীরব। যে-দিদি সুস্থ থাকলে বরাবর ছুটে আসে আমার অভ্যর্থনায়, সে কথা বলছে না! আমি গিয়ে বড় ঘরের দরজাটা খুললুম। এ কি, আমার জিনিসপত্র একেবারে ছত্রখান, চারিদিকে ছড়ানো। বিছানাপত্র বাক্স সব ওলোট-পালট। আমি একবার চুপ করে দাঁড়ালুম। তবে কি যা সন্দেহ করছি তাই? তবে কি সম্পত্তির ভাগীদার হতে পারি, সেইজন্যই এই ধরনের ব্যবহার?

প্রভাস বাড়ি নেই। আমি বাইরে এসে ডাকলুম, মাসীমা? কোথায় আপনারা?

আমার গলার আওয়াজটা স্বভাবতই উঁচু। তখনও মাইক বা লাউড স্পীকারের তেমন চলন হয় নি। ওই কণ্ঠস্বর নিয়েই আমি কলকাতার নানা আসরে রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করতুম!

আমার আওয়াজ শুনে ভাঁড়ারঘর থেকে ছেনুমাসীমা এবং ও-ঘর থেকে কিশোরদা বেরিয়ে এলেন। কিশোরদা সব সময়েই আমার প্রতি স্নেহশীল। তিনি বললেন, হ্যাঁ রে, সকালে তুই বেরিয়ে যাবার পরেই এ বাড়িতে একদল পুলিস এসে ঢোকে—!

পুলিস? মানে?

পুলিস বাড়িতে ঢুকে এ-ঘর ও-ঘর খোঁজে, তোর জিনিসপত্র তচনচ করে খানাতল্লাশি চালায়।

কেন? কি অপরাধ?

তুই বোধ হয় খবর পাস নি—কিশোরদা বললেন, এই সেদিন এখানকার গোয়েন্দা পুলিস ইন্সপেক্টর যতীন মুখুজ্জেকে মার্ডার করা হয়। পুলিস চারদিকে জাল ফেলে রুই-কাতলাদের টেনে তুলছে।

হেসে বললুম, আমি তো চুনোপুঁটি।

আমাদের কথা শেষ হয় নি এমন সময় উপর থেকে নেমে এলেন মেজমাসীমা। তিনি গর্বোদ্ধত প্রবল কণ্ঠে আমার মুখের উপর কঠোর ভাষায় বললেন, তোমাকে না ভালো ছেলে, সচ্চরিত্র, সাধু ছেলে ভেবেছিলুম? চোর, ছ্যাঁচড়, ডাকাত, দাগাবাজ গুণ্ডো—এদেরই জন্যে বাড়িতে পুলিস ঢোকে। তোমার জন্যে এ বাড়িতে আমাদের সকলের অপমান—।

প্রথমটা শান্ত হাস্যে আমি বললুম, পুলিস কেন এসেছিল আমার জন্যে, আমি জানিনে। কিন্তু আপনি একটু আস্তে কথা বলুন, কলকাতায় আমার মা আপনার গলাবাজি এখান থেকে শুনতে পাচ্ছেন!

আস্তে বলব?—মেজমাসী সপ্তগ্রামে তুললেন তাঁর কণ্ঠস্বর—কে তুমি? আমার

মুখের ওপর কথা বলবার সাহস কে তোমাকে দিল?

বললুম, ওই আপনার পাথরের নুড়িটা,—ওই যার নাম রেখেছেন শিব!

চিৎকার করলেন মেজমাসীমা,—এত বড় আস্পর্দা তোমার, এত তেজ, এত অহঙ্কার যে, আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে আমার সামনে মাথা তুলে এত বড় কথা? রায়বাহাদুরের বাড়িতে পুলিস ঢুকবে তোমার জন্যে? খুনে, ডাকাত, গুণ্ডো—

এবার আমার বজ্রকণ্ঠ সমস্ত বাড়িকে কাঁপিয়ে তুলল,—থামুন। থামুন বলছি—

উনিও চেঁচালেন, কিশোর, অ কিশোর—?

প্রভাস বাড়ি ছিল না, থাকলে আমার পক্ষে সুবিধা হ'ত। কিশোরদা ঘরে ঢুকেছিলেন, আবার বেরিয়ে এলেন। মেজমাসী দম্ভের সঙ্গে আওয়াজ তুললেন, রায়বাহাদুরের বাড়িতে পুলিস বরদাস্ত করব না।

আমার কঠোর কণ্ঠ নিচু হ'ল না। বললুম, দাঁড়ান, শুনে যান আমার মুখের দুটো কথা!

কিশোরদার উপস্থিতি সত্ত্বেও আমার সাংঘাতিক মেজাজ এতটুকুও যে নরম হ'ল না, এটি লক্ষ্য ক'রে মেজমাসী ঈষৎ থতিয়ে গেলেন। আমি তখন শিশিরবাবুর অভিনয় স্মরণ ক'রে নাটকীয় ভঙ্গীতে গলার আওয়াজ সম্পূর্ণ নামিয়ে বললুম, আপনি ধনবতী, কিন্তু বন্ধ্যা, অর্থাৎ হতভাগিনী। আপনি যতবার আমাকে সম্পত্তির লোভ দেখিয়েছেন, ততবারই আমি মনে মনে হেসেছি। চারিদিকের দারিদ্র্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আপনার ওই আধ পয়সা দামের পাথরের নুড়ির জন্য চার হাজার টাকা খরচ করেছেন, আর পাকা তেঁতুলে নুন মাখিয়ে নিচের তলাকার দরিদ্রদের নাকের ডগায় নাড়ছেন—যাতে ওদের মুখে জল আসে।

এ জীবনে মেজমাসী এমন অপমানজনক কঠিন বাক্য কারও কাছেই কখনও শোনেন নি। তিনি দোতলায় উঠে যাবার আগে শুধু নরম কণ্ঠে ব'লে গেলেন, আচ্ছা, মনে থাকবে—।

কিশোরদা আমাকে সাদরে তাঁর ঘরে নিয়ে এলেন, এবং বড় বউদিদি হাসি মুখে ছুটে এসে সোজা আমার থুতনিটা মুচড়িয়ে দিয়ে বললেন, পেটে পেটে তোমার এত কথা ছিল, কে জানত? একেবারে ঝুঁটি ধ'রে নাড়া দিলে? বেশ করেছ ঠাকুরপো, তুমি আমাদের মান রেখেছ। জুজুবুড়ীর ভয়ে আমরা জন্তু হয়ে দিন কাটাই।

কিশোরদা হাসছিলেন। বললেন, যা, চান ক'রে আয়। আমার কাছে ব'সে খাবি। তোর জন্যে আজ ভাল মাছ এনেছি।

আহারাদির পর কিন্তু কিশোরদার কথাটা রাখতে পারলুম না। সোনারপুরার পিছন দিকের গলিতে এক হিন্দুস্থানীর বাড়ির দোতলায় একটি ঘর ভাড়া নিলুম মাসিক দু' টাকায়। ঘরটি বেশ ভাল। সামনে কুচবিহারের কালীবাড়ি। মামা থাকতেন মেজমাসীর মুখোমুখি এক বাড়ির নীচের তলায়। আমাদের চেঁচামেচি ও পুলিসের খানাতল্লাসের সংবাদ তাঁর কানে উঠেছিল। পরদিন মামা হঠাৎ আমার ওখানে গিয়ে উঠলেন। বিজয়োল্লাসের হাসি হেসে তিনি বললেন, এই ত' চাই—আমার

মান রেখেছিস তুই। একেই বলি বাপের ব্যাটা, তুই যে বাঘের বাচ্চা রে। বেশ, দশটা পাঁচটা চাকরি করবি, আমি তোর ভাতে-ভাব ফ্‌টিয়ে দেবো। এক হাঁড়িতে মামা ভাগ্নে খাবো, আমাকে শ্‌ধ্‌ আফিঙের পয়সাটা দিস, বাবা। তোর মেজমাসী তোকে সম্পত্তির লোভ দেখিয়েছিল শ্‌নল্‌ম? খবরদার, লোভ করবিনে। তোরা ছিলি সান্নিসির গ্‌ন্টি। তোর ঠাকুরদাদা রামকেষ্টপ্‌র ঘাটে আহ্নিক করতে ব'সে দ্বিতীয় পক্ষের মাগীকে সর্বস্ব লিখে দিয়েছিল। রাজারাজড়ার মেজাজ ছিল যে।

ম্‌খ তুলল্‌ম মামার দিকে।

মামা বললেন, হ্যাঁ রে হ্যাঁ, সেই মাগী ছিল বাঁজা, নাম ছিল কাদম্বিনী, তোর নিজ ঠাকুমা গোলাপস্‌ন্দরীর সতীন! গোলাপস্‌ন্দরী নিজের র্‌প দেখে নিজেই পাগল হয়েছিল। তিন বছর একটা ঘরে বন্ধ ছিল, সেই ঘরেই সে মরে। তারই মা'র পেটের ভাই হরিদাস খাঁর ছেলে হ'ল শিশির—ওই যে-ছেলেটা থিয়েটার করে। আর সেই কাদম্বিনী মাগী? মাগী ছিল শঠ। কৈকেয়ী যেমন দশরথকে দিয়ে দিব্যি করিয়ে নিয়েছিল, ঠিক তেমনি। যা চাইবে তাই পাবে। তোর ঠাকুরদাটা ছিল গাধা, মাগীর ফাঁদে পা দিয়েছিল। একদিন গঙ্গার ঘাটে ব'সে জপ করছিল, মাগী সঙ্গে নিয়ে গেল সেইখানে উকিল মোক্তার। সাক্ষীসাব্‌দের সামনে যথাসর্বস্ব মাগী সই করিয়ে নিলে। তোর ঠাকুরদাদার হাতে রইলো শ্‌ধ্‌ পেতলের একটা ঘটি। ফরিদপ্‌র আর পাবনায় তোদের বড় বড় তাল্‌ক, সেসব থাকলে আজ তোদের ভাবনা কি ছিল? তোর ঠাকুরদাদাকে প্‌ড়িয়ে তোর বাপ আমারই সামনে শ্মশান থেকে মাথায় ক'রে নিয়ে এল সেই পেতলের ঘটি। ঘটিটা ছিল ফ্‌টো, তোর বাপের তাইতেই আনন্দ। ওটাই তার পৈতৃক সম্পত্তি।

এবার একটু সঙ্ক্‌চিতভাবে প্রশ্ন করল্‌ম, তিনি কেমন লোক ছিলেন?

মামা বললেন, সে আর তুই কি ক'রে জানবি? লোকটা ছিল দিলদরিয়া, উঁচু মেজাজ, ব্‌কের ছাতি ছিল বড়, মালদার লোক। এদিকে ছিল ডাকাব্‌কো, কারও পরোয়া করত না। তার ভয়ে বাঘে-গর্‌তে এক ঘাটে জল খেতো।

শ্‌নেছি আপনাকে তিনি খ্‌ব ভালবাসতেন?

আমাকে? মিছে কথা।—মামা বললেন, আমি তো তার একটিমাত্তর বড় শালা। একদিন একটু নেশার ঝোঁকে আমার বাপ ফলনা ভটচার্যিকে দ্‌টো কুবাক্য ব'লে ফেলেছিল্‌ম, তোর বাপ রাজেন সে কথা শ্‌নে ক্ষেপে উঠেছিল। একগাছা লাঠি নিয়ে আমাকে তাড়া করল। বলল, শালাকে আজ মেরেই ফেলব।—আমি সেবার গোয়াবাগানের পাঁদাড় পেরিয়ে পায়রাটুনি পালিয়ে বাঁচল্‌ম। লোকটা ভয়ানক বদরাগী ছিল।

মামা ছিলেন একমাস আমার সঙ্গে। একই ঘরে ছিল্‌ম দ্‌'জনে। সেই মামা, সেই দানব—সের হত্যাগ্রহী—যার ছ্‌রি শানাবার আওয়াজ শ্‌নে আমরা বাড়ি ছেড়ে পালাতুম পথে, নয়তো চিলেকোটায়, নয়তো খাটের তলায়; যার হ্‌ঙ্কারে বাড়িতে হাঁড়ি চড়ানো দায় ছিল, যার সামনে কেউ কখনো মাথা তোলে নি; রোগা, লম্বা, কালো,

কাঁচাপাকা দাড়ি, গাঁজা আফিং ও বিভিন্ন মাদকের প্রভাবে যার মুখের উপরে বীভৎস আক্রোশের ছাপ দেখে এসেছি আশৈশব—সেই মামা। সেই মামা আমার জন্য রাঁধেন, আলু-বেগুন কিনে আনেন, আমার বিছানা পেতে রাখেন, আমার জন্য ভাতের থালা সাজিয়ে বসে থাকেন। তাঁর চোখে আমার যা কিছু সব ভালো। একদিন আমার বাড়িওয়ালা সেই হিন্দুস্থানীর এক আঁটসাঁট সোঁদা মেয়ে নাকি আমার দিকে বাঁকা-চোখে চেয়ে হেসেছিল, মামা গিয়েছিলেন একখানা খুন্তি হাতে নিয়ে তেড়ে ওই মেয়ে-টার মাকে খুন করতে। নারীজাতির দিকে তাকিয়ে মামা বলতেন, ওদের গুষ্টি খারাপ।

সেই মামার অন্তিম ঘনিয়ে এসেছিল কাশীতে। তখন তিনি নিঃস্ব, স্বভাবের সেই প্রচণ্ডতা কমে এসেছে, এলাহাবাদ হাইকোর্টে এক নম্বর মামলা ঠোকবার কথাটা প্রায় ভুলতে বসেছেন। আছে কেবল সেকালের সেই ক্ষয়িষ্ণু দেহখানা, আছে উনিশ শতাব্দীর জীর্ণ কঙ্কালের ভগ্নাংশ।

শীতকালে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু অকালের কি ঝড় আর বৃষ্টি সেদিনকার সেই শ্রাদ্ধবাসরে—সমস্তই লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। কলাপাতারা উড়ে পালালো, পুরোহিত পালিয়ে বাঁচল, উনুন নিবে গেল, নিমন্ত্রিতরা গা-ঢাকা দিয়ে প্রাণ বাঁচাল। দিদিমা তখনও বেঁচে। কিন্তু দুর্যোধন সকলের আগেই স্বর্গে গেল। মামা নিজের সত্যে অবিচল ছিলেন।

দেড় বছর পরে দিদিমার শবদেহ ভস্মীভূত হয়েছিল মণিকর্ণিকার মহাশ্মশানে। দিদিমা বলতেন, 'কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখনও নয়।' তাঁর কপালে পুত্রশোক ছিল। আশী বছর বাঁচলে অনেক দুঃখ সইতে হয়। যে মৃত্যু পিছনে কাতর কান্না রেখে যায়, সেই মৃত্যুই গৌরবের।

যাই হোক, একদিন দুপুরে ছুটির দিনে হঠাৎ মেজমাসীর মোতি-ঝিকে সঙ্গে নিয়ে বড় বউদিদি আমার এখানে এসে হাজির। মামা ঘরে নেই, তিনি গিয়েছেন কাছাকাছি কোন্ এক তামাকের আড্ডায়। মোতি-ঝি অনেক পুরনো কালের লোক, আমাকে আবাল্য জানে। ঘরে ঢুকেই সে আমার পায়ের কাছে ব'সে খামকা কাঁদতে লাগল—ছোড়দাদা, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ফিরে চলো।

বউদিদি বললেন, তোমার মেজমাসী আমাকে পাঠালেন। তোমাকে আমরা নিয়ে যেতে এলুম ঠাকুরপো। তাঁর বিশেষ অনুরোধ, তুমি ফিরে চলো।

আমি হাসলুম। বললুম, বাঃ, তাঁর তাড়নায় বাড়ি ছাড়ব, আবার তাঁর কথায় বাড়ি ঢুকব—আমি কি খেলার পুতুল? তা ছাড়া যে সম্পত্তি আমি নিজের পরিশ্রমে অর্জন করি নি, সে আমার কাছে ঘৃণ্য। না, আমি যাব না, বউদিদি।

বউদিদি বললেন, তোমার যখন কোন লোভ নেই, তখন নিজের ওপর বিশ্বাস নেই কেন?

কিন্তু ওঁর ওই নরককুণ্ডে আমি নাই রইলুম?

ওই নরককুণ্ডে যদি শিবের জায়গা হয়, তোমার জায়গা হবে না কেন?—বউদি

আমাকে মৃদু তিরস্কার করলেন।

'ইণ্ডিয়ান প্রেসের পণ্ডিত নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখন যতদূর মনে পড়ে, অষ্টাদশপর্ব মহাভারত সম্পাদনা করছিলেন। আমি ছিলুম তাঁর সহকারী। এই ছাপাখানাটি হ'ল ইণ্ডিয়ান প্রেসের বাংলা বিভাগ। কর্তৃপক্ষের সকলেই থাকেন এলাহাবাদে, এখানে কেবল ম্যানেজার অপূর্বকৃষ্ণ বসু ছাপাখানা পরিচালনা করেন।

পণ্ডিত মশায় সজ্জন ও সাধুপ্রকৃতির লোক, বাঙ্গলা ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। তাঁর বাসস্থান হ'ল গঙ্গামহল এলাকায়, অহল্যাবাঈ ঘাটের গায়ে। তিনি অতিশয় সদাচারী এবং চরিত্রবান। সর্বদা তিনি সদালাপী ও আনন্দময়। এদের মতো ব্যক্তিরাই কাশীকে পুণ্যময় করে রাখেন। তাঁর বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। আমি তাঁর সস্নেহ ব্যবহারের জন্য তাঁর প্রতি খুবই অনুরক্ত হয়েছিলুম।

প্রথম দিকে সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আমি তাঁর পক্ষে অযোগ্য নই। ক্রমশ আমি সব রকমের হরফ চিনলুম, পৃষ্ঠাসজ্জার কৌশল শিখলুম, অলঙ্করণ বুঝলুম, তারকা ও বিভিন্ন প্রকার পৃষ্ঠাদির উদ্ধৃতিগুলিতে রপ্ত করলুম। পাঠকরা বই পড়ে, কিন্তু তারা জানে না সামান্য একটি মাত্র হরফের চাল-বেচালের পিছনে কি অপরিসীম পরিশ্রম লুকিয়ে থাকে। আমার সুবিধা ছিল এই, 'কালিকলম' ও 'কল্লোলে' প্রচুর প্রুফ দেখার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। প্রকৃতপক্ষে লেখক হলেই প্রুফ-রীডার হতে হয়! আমরা নগণ্য ব্যক্তি—রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত বহুকাল অবধি ছাপাখানার সঙ্গে প্রুফ-রিডিংয়ের কাজ করতে হয়েছিল। এককালে তাঁর নিজের লেখার প্রুফ তিনি অন্যের হাতে দিতেন না। একটা 'ভুল' শব্দটির বানানবিধি নিয়ে তাঁর সঙ্গে এক ছাপাখানায় সংঘর্ষ বাধে। তৎকালে 'ভ' অক্ষরটির তলায় 'দীর্ঘ ঊ' লেখা হ'ত। সুতরাং কবির বানান 'হ্রস্ব উ' কেটে দিয়ে তাঁরা 'দীর্ঘ ঊ' বসিয়ে দেন। এতে কবি ক্ষুব্ধ হয়ে ছাপাখানায় লিখে পাঠান, 'আমার ভুল, ভুলই থাক!' দুটোই হ্রস্ব উ।

কাজে আমি ফাঁকি দিই না, অবহেলা করি না এবং কোনও কাজ এড়িয়ে চলি না—এটি পণ্ডিতমশায় লক্ষ্য করেছিলেন। সেই জন্য কাশীর নানাপ্রকার পালা-পার্বণে ও উৎসবের ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে আমার ওপর কাজ ছেড়ে দিয়ে যেতেন। মাঝে মাঝে তিনি কামাই করতেন এবং আমি সানন্দে কাজ চালিয়ে নিতুম। এক মাস কাজ করার পর তাঁর সুপারিশে আমার পাঁচ টাকা মাইনে বেড়েছিল। এখন আমি স্বচ্ছন্দে কলকাতায় মাকে পনেরো টাকা পাঠাতে পারি। এ ছাড়া মামার রাবড়ি ও আফিংয়ের দরুণ মাসে দু টাকা, ছেনুমাসীর ঘরখরচা দশ টাকা। এর পর আমার হাতে থাকে সাত আট টাকা। এই নিয়ে আমি তখন প্রচুর ধনবান, এবং ধনস্রোতে ভাসছিলুম।

ছুটির পর সাইকেল নিয়ে তীরবেগে হিন্দু কলেজের ধার দিয়ে ভেলুপুরা হয়ে আউধগর্বীতে শৈলজানন্দর ওখানে রোজ পৌঁছই। শৈলজা একটু একটু আফিং ধরেছে। উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনার জন্য আফিংয়ের প্রয়োজন আছে কিনা, এটি আমরা ভেবে দেখি নি। ওর সঙ্গে আমিও এক দানা আফিং খাই, তার সঙ্গে এক পেয়ালা চা! গল্প

লিখতে গেলে যদি আফিং দরকার হয়, তবে কবিতা লিখতে গেলে গাঁজা অবশ্যই চাই! আমার কাছে এসব প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। তবে কি কবি বা ঔপন্যাসিক মাত্রই গাঁজা-খোর এবং আফিংখোর? যাই হোক শৈলজা সেই সময় তার 'ডাকপিওন' নামক এক উপন্যাস আরম্ভ করেছিল 'কল্লোলে'।

আমার বিশ্বাস হচ্ছিল আমি আফিংয়ের বশীভূত হয়েছি। ওটা খাবার আগে কি উৎসাহ, এবং খাবার পরে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৃথিবীর চেহারা যেন আরও মধুর হতে থাকে। মদে উত্তেজনা আনে, গাঁজায় বৈরাগ্য আনে, সিদ্ধিতে নিবিড় নিদ্রা ও মিষ্টান্নের প্রতি টান আনে, কোকেনে দুষ্প্রবৃত্তি আনে, আর চরসে সপ্তম স্বর্গের প্রতি আকর্ষণ আনে। কিন্তু আফিং? ওটা খেলে দুধের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। আমি দুধ খাই প্রচুর। কাশীতে তখন খাঁটি দুই টাকায় আট-দশ সের। আফিং খেলে ভণ্ড তপস্বীর আত্মস্থিতি আসে।

মাস দুই পরে হঠাৎ এক রাত্রে আবিষ্কার করলুম, আমি ঘুমোচ্ছিনে, শুধু ঝিমোচ্ছি! পরদিন 'মেটিরিয়া মেডিকা' খুলে দেখি, এইপ্রকার তন্দ্রার নাম ঘুম নয়। এই ঝিমুনির মধ্যে আফিংখোরের মুখের রেখাগুলি অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে বদলিয়ে যায় এবং মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তিতে একপ্রকার দুষ্কৃতকারীর ছাপ পড়তে থাকে। তা ছাড়া আফিংয়ের মতো কোনও নেশা এমন করে মানুষকে ভিতর থেকে কামড়িয়ে ধরে না! সব নেশা ছাড়া যায়, আফিং ছাড়া যায় না। দীর্ঘকাল ধরে আফিং খেলে এর পরিমাণ ক্রমবর্ধমান হয়ে ওঠে, এবং তখন ছাড়তে গেলে মৃত্যুর সম্ভাবনাও থাকে। আফিংখোরকে দেখলে সহজেই চেনা যায়। আফিং সাংঘাতিক বিষ।

বটে! সেইদিনই আমি আফিং খাওয়া ত্যাগ করলুম, এবং হঠাৎ দিন দুই পর থেকে কলেরার মতো ব্যাধিতে আক্রান্ত হলুম। তারপর সুস্থ হয়ে উঠে নিজের কান মললুম। নেশা ছাড়তে জানলে তবেই নেশা করা উচিত।

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তখনও আমার নিজের অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ। আমি তখন শুধু মেয়েদের বাইরের খোসাই দেখেছি, শাঁস দেখি নি। বাইরের মোড়ক রঙীন, সর্বাঙ্গে সুকুমার পেলবতা, তাদের সর্বদেহে পুরুষের বাসনার চিহ্ন থরে থরে সাজানো। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কি আছে আমি জানিনে। তা ছাড়া আরেক কথা। আমার নাবালক বয়সে সেই ন'বছরের স্বাস্থ্যবতী নিত্য-উলঙ্গ মেয়েটা—যার নাম ছিল নন্টু এবং যে কথায় কথায় আমার সঙ্গে কুস্তি-লড়াই করত, তাকে আমি মেয়ে বলি না। পুঁটি-বাগানের সেই ধনবান ঘরের কিশোরী মেয়ে মানু—যে আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় সঙ্গী ছিল, এবং যে-মেয়ে শাড়ি পরামাত্রই আমার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করল, সেদিন কি সত্যই আমার কিশোর বয়সের নিবিড় আকর্ষণ একটি কিশোরীর হাতে অপমানিত হয়েছিল? তারপর অনেক দিন বাদে এল সেই শুলী-মোহান্ত বাবাজীর আশ্রমের সহজিয়া দলের মানদা। আমার চেয়ে কিছু বয়োজ্যেষ্ঠা ছিল সে—হয়তে কুড়ি বাইশ বছর হতে পারে। কিন্তু তবুও আমি তখন সতেরো-আঠারো বছরের তরুণ তো বটে। আমার মান সম্ভ্রম ইজ্জত সমস্ত নষ্ট করে আমার সর্বশরীরে সাবান ঘষে আমাকে

সেই ছায়াচ্ছন্ন কলতলায় মানদা স্নান করিয়েছিল। তারপর থেকে তাঁর আচার-ব্যবহারে আমার মতো 'গুরুঠাকুরের' প্রতি তার যত শ্রদ্ধানুরাগই থাক না কেন, এখন আমার মনে হয় তার অনেকটাই যেন একটু অন্য রকমের। আমি তার কোনও আচরণ ভুলি নি। একদিন সে অত্যন্ত এলোথেলো অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে বলল, ঠাকুর, আমার দিকে চেয়ে দ্যাখো, এ দেহ তোমার নৈবেদ্যের একটি ফুল। এ ফুল তোমারই পায়ে দেবো।

কথাগুলো শুনতে হয়তো ভাল। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে ওর মধ্যে যেন অন্য কথাও ছিল। ওর শরীরের দিকে কোনমতেই মুখ তুলে আমি তাকাতে পারি নি।

তারপর কেষ্টদাসী, জাতবোষ্টমের মেয়ে। আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। আমাকে খাওয়াবে, আমার পরিচর্যা করবে, পুতুলের মতন আদর করবে, কাছে নিয়ে শোবে। আমার মুখের ওপর তার পরলোকগত অকর্মণ্য স্বামীর উৎপীড়নের কাহিনী বর্ণনা করবে, এবং আমি তার বুকের মধ্যে মুখ রেখে চুপ করে তার গল্প শুনব! কেষ্ট-দাসীর কোনও দুরভিসন্ধির কথা বলছিনে, কিন্তু তার প্যাশন্ আমার পক্ষে যেন কতকটা দুশ্চিন্তার কারণ ঘটাচ্ছিল।

এরা সবাই মেয়ে, তবু এরা সঠিক মেয়ে নয়। সর্বসংস্কার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এমন মেয়ে আজ দেখি নি। জায়া, প্রিয়া, জননী, ভগিনী, বারবনিতা, উৎপীড়িতা, —এরা নয়, এদের বাইরে যে-মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আপন সত্য পরিচয় নিয়ে! পুরুষের চোখ দিয়ে মেয়েকে দেখা—সে-দেখায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন থাকে। অনুরূপা দেবী দেখেছেন যে মেয়েকে, সে-মেয়ে আদর্শবাদের বেড়াজালে বন্দিনী। এর পাশে ইথেল ম্যানিন বা ইসাডোরা ডানকান দেখেছেন নিজেদেরকে,—সেজন্য সেই দেখা সত্য হয়ে রয়েছে। পুরুষ মূলত নির্বোধ, মেয়েরা সেটি জানে। পুরুষকে দিয়ে ওরা ঘর বানায়, সংস্থান করায়, নিরাপদ ব্যবস্থা করিয়ে নেয়, আবার ওরই মধ্যে নিজেদের সম্বন্ধে স্তুতিবাদ ও সার্টিফিকেট লিখিয়ে ছাড়ে। বাল্মীকির সপ্তকাণ্ড রামায়ণ সীতার স্তুতিবাদ।

কোন্ কথা বলতে গিয়ে কোথায় এলুম!

কাশীতে গিয়ে শৈলজানন্দ দ্বিতীয়বার বিবাহ করে। মেয়েটির বয়স অল্প এবং মিষ্ট-প্রকৃতি। এই বিবাহের প্রাক্কালে শৈলজার অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে আমাকে দু' একটি অপ্রিয় ও দুঃখদায়ক কাজ করতে হয়েছিল। তার প্রথমা স্ত্রী প্রকৃত সাধ্বী এবং পতিগতপ্রাণা। যাই হোক, এ মেয়েটি বোধ হয় বছর চারেক বেঁচেছিল নিঃসন্তান অবস্থায়। পরে বীরভূমের একটি গ্রামে এ মেয়েটির মৃত্যু ঘটে। এর কিছু দিন আগে আমাদের প্রিয় বন্ধু প্রেমেন্দ্রও দ্বিতীয়বার বিবাহ করে, কিন্তু তার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর। প্রেমেন্দ্র বেহিসাবী ছিল না।

'কল্লোল-কালিকলমের' লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে তখন বিয়ে করার যুগ বা হুজুগ চলছে। নজরুলের বিয়ে নিয়ে সে এক মস্ত কাণ্ডকারখানা। "ধূমকেতু" নামক অর্ধ সাপ্তাহিকের সে ছিল সম্পাদক। বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে সে বেশ বাগিয়ে কলম ধরেছিল। ফলে তাকে কারাগারে যেতে হয়। ইতিমধ্যে সে তার ভাবী স্ত্রীকে

পছন্দ করে। তাই নিয়ে মস্ত অশান্তি। জেলের মধ্যে সে উপবাস আরম্ভ করল, এবার সে না খেয়ে মরবে! তার এই সিদ্ধান্ত শুনে দেশসুদ্ধ তোলপাড়। চারিদিকে হৈহৈ, নানা স্থানে সভাসমিতি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে একটি জনসমাবেশে নজরুলের কারামুক্তির দাবি জানানো হয়। নজরুল তখন বিপ্লববাদী জাতীয়তাবাদের প্রতীক এবং বাঙ্গালীর বড়ই প্রিয়। এই সময়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি জনাব মুজাফ্ফর আহম্মদ নজরুল সম্বন্ধে খুবই তৎপর ছিলেন। যাই হোক, নজরুলের সমস্ত ব্যাপারটার যাঁরা সন্তোষজনকভাবে নিষ্পত্তি করেন তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন নলিনীকান্ত সরকার মহাশয়। নজরুল তখন মাঝে মাঝে নলিনীবাবুর জেলেটোলার বাড়িতে এসে থাকত। তখন হাসি-পরিহাসের দিগ্বিজয়ী নামক 'দা'-ঠাকুর' ওরফে শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় আমাদের সকলের নিকট নমস্য ও প্রিয়পাত্র ছিলেন।

এর পর আগামী কয়েক বছরে একটির পর একটি বিয়ে হয়। অচিন্ত্য, বুদ্ধদেব, হুমায়ুন, কল্লোলের অতি প্রিয় সুধীন্দ্র, দেবীদাস, মণীশ, সরোজ রায় চৌধুরী,—কেউ আর বিশেষ বাদ রইল না! কেউ নিয়ম-নীতি অনুযায়ী, কেউ ভাব-আলাপ বা প্রণয়াসক্ত হয়ে, কেউ বাংলার বাইরে গিয়ে, কেউ বা দেশকর্মী মেয়েকে! যে যেমন পারল এবং যে যেখানে পারল! তখনকার কালে লেখক, শিল্পী, কবি, সাংবাদিক বা ছাপাখানার সঙ্গে সংযুক্ত কোনও যুবককে কোনও লোক মেয়ে দিত না। মেয়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হবে এবং ভাত-কাপড় জুটবে না—যদি উপযুক্ত কোনও যুবকের হাতে মেয়ে না পড়ে, এই ছিল সাধারণ ধারণা! নজরুলের বাজার ভাল ছিল, কিন্তু সে ছিল অমিতব্যয়ী—অভাব-অনটন তার লেগেই থাকত! গ্রামোফোন কোম্পানীতে যোগদান করার পর থেকে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। অন্যান্য লেখকরা—যাদের চাকরি-বাকরি জুটত না—তাদের কপালে ছিল উঞ্ছবৃত্তি।

এই সঙ্গে আমার বিয়ের কথাটাও আসে বইকি। কিছু দিন থেকে রামবাবু নামক এক অমায়িক ভদ্রলোক কাশীর এ বাড়িতে যাওয়া আসা করছিলেন। তাঁর বাড়ি এই কাছেই দেবনাথপুরায়। রামবাবু এ বাড়িতে বিশেষ পরিচিত, তাঁর দুই-তিনটি মেয়ে। লক্ষ্য করেছি উনি প্রথম থেকেই আমার সম্বন্ধে উৎসাহী। একদিন সীমন্-চৌহাট্টার গলির মোড়ে সকাল বেলায় ওঁর সঙ্গে হঠাৎ দেখা। উনি বাজারের পুঁটলি নিয়ে ফিরছিলেন। অত্যন্ত আন্তরিকতা ও স্নেহের সঙ্গে তিনি আমাকে ওঁর বাড়িতে ধরে নিয়ে গেলেন! এক গলি থেকে অন্য গলি, সেই গলি থেকে শাখায়িত আরেক গলি। অবশেষে একটি বাড়ির দরজায় উঠে উনি হাঁক দিলেন। দোতলা থেকে কে যেন শেকল টানল, এবং নিচের তলার দরজা খুলে গেল।

আদর-অভ্যর্থনার পর তাঁর একটি মেয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। রংটা একটু চাপা, মুখশ্রী খুবই সুন্দর। বেশ ছাড়ালো মেয়ে, স্বাস্থ্যের বাঁধুনি হিন্দুস্থানী দেশের সঙ্গে খুবই মানিয়ে গেছে। আমার দু'একটি প্রশ্নের জবাব সে হাসিমুখেই দিল। কণ্ঠস্বরটি ভাল, দাঁতগুলি সুশ্রী। গায়ের রং আরেকটু উজ্জ্বল হ'লে চমৎকার হ'ত।

আমি বেশ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলুম। মেয়েটির নাম অনীতা।

আধ ঘণ্টাখানেক ছিলুম। প্রচুর মিষ্টান্ন খেলুম। আসবার সময় নির্লজ্জের মতো ব'লে এলুম, পাত্রীকে আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। এ বিয়ে হবে। আপনি আজ সন্ধ্যার পর আমাদের ওখানে আসবেন।

প্রভাস কাশীতে টুমটাম কাজকারবার করে। কখনও সে হাতী, কখনও মশা। সে আমার চেয়ে প্রায় বছর চারেকের বড়। সেদিন রবিবার। দুপুর বেলায় প্রভাসকে নিয়ে খেতে বসেছিলুম। ছেনুমাসীমা ছিলেন সামনে। আমি বললুম, মাসীমা, রামবাবুর মেয়েটিকে দেখে এলুম। প্রভাসের সঙ্গে চমৎকার মানাবে!

বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে উলুধ্বনির ভিতর দিয়ে প্রভাসের বিয়ে হয়ে গেল। অনীতা ঘরে এল যেন লক্ষ্মীস্বরূপিণী। মেয়েটি কিছু লেখাপড়া জানে, ক্লাস টেনু অবধি পড়েছে। তার মধুর ব্যবহার ও মিষ্টভাষণে এই বিষাদপুরী যেন ঝলমল করে উঠল। আমার মধ্যে কিঞ্চিৎ অপরাধ-বোধ ছিল বইকি। সুতরাং আমি একটু এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলুম।

দিন কয়েক পরে একদিন খেতে বসে প্রভাসের স্ত্রীকে বললুম, আপনি আমার ছোট বউদিদি হলেন!

অনীতা দেবী সকলের মাঝখানে অসঙ্কোচে বললেন, তোমাকে আমি ঠাকুরপো বলব। কিন্তু আমার চেয়ে তুমি বয়সে বড়। তুমি আমার নাম ধ'রে ডেকো।

উচ্চকণ্ঠে আমি হেসে উঠলুম। বললুম, না, তা পারব না। বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে কেউ নাম ধরে ডাকে না। ওটা শুনতেও খারাপ। বউদিদি আমার কাছে খুব মিষ্টি। বরং আপনি এক কাজ করুন। আপনি সুবাদে বড়, আপনি আমারই নাম ধরে ডাকবেন!

তা পারব না—অনীতা দেবী তাঁর ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা প্রকাশ ক'রে বললেন, তার চেয়ে আপনি আমার অন্য একটা নাম দিন, সেই নামেই আমাকে ডাকবেন।

অনীতার প্রস্তাবটি আমার ভাল লাগে নি। কিন্তু সেদিন থেকে তার নাম রেখেছিলুম দুর্গারানী। আমি ডাকতুম, দুর্গাঠাকরুন।

বিয়ের জল পাওয়া কাকে বলে আমি জানিনে, কিন্তু দিনে দিনে দুর্গা ঠাকরুন গৌরবগর্বিতা ও তেজস্বতী হয়ে উঠলেন। তাঁর শান্ত ভদ্র অথচ দৃঢ় ব্যক্তিত্ব লক্ষ্য করে প্রভাসও যেন সতর্ক থাকত। স্বামী হিসাবে প্রভাস অতি উদার ও মিষ্টস্বভাব। কিন্তু প্রভাসের জীবনযাত্রার ধরনের মধ্যে কিছু অসংলগ্নতা ও জটিলতা থাকার জন্য দুর্গাঠাকরুন মাঝে মাঝে গম্ভীর হয়ে যেতেন। আর আমি সকাল সাড়ে ন'টায় বেরিয়ে বাড়ি ফিরতুম রাত দশটায়। দুর্গারানী আমার জন্য অপেক্ষা করতেন। মাসখানেকের মধ্যে আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুবই মধুর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমার আহারাদি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর একটু-আধটু পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করে আমি অতিশয় লজ্জা পেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে বাঁচতুম।

ইণ্ডিয়ান প্রেসে চাকরি যখন আমার বেশ জমে উঠেছে, সেই সময় জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর গ্রীষ্মের মধ্যে আমার নামে ভারতীয় সৈন্য বিভাগ থেকে একখানা সরকারী চিঠি আসে। আমি যে কলকাতায় হেস্টিংসে পরীক্ষা দিয়েছি অনেকদিন আগে, সে কথা ভুলেই গিয়েছিলুম। চিঠির তাৎপর্য হ'ল: সৈন্য বিভাগে আমার চাকরি হয়েছে এবং আমাকে নিজের খরচে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের যে কোনও তারিখে রাওয়ালপিণ্ডি জেলার অন্তর্গত মারী পাহাড়ে পেঁছে সৈন্য দপ্তরে হাজিরা দিতে হবে। ইতি— নর্দার্ন কমাণ্ড হেড কোয়ার্টার্স, ডগসাই, সিমলা।

চিঠিখানা আমার ভিতরে নিয়ে এল 'ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক, পাঁজরের উপর আছাড় খাওয়া মরণ সাগরের ডাক।' আমার ভিতরে যেন ভিত কেঁপে উঠল, সমস্ত জীবনের শিকড়ের মূল ধরে কে যেন ভয়ানক নাড়া দিল! আমার ভাগ্যবিধাতা যেন বার বার আমার নোঙর ছিঁড়ে দিয়ে ছিনিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে!

নিজের আগাগোড়া ভবিষ্যতের সম্পূর্ণ নকশাটা ভেবে নিতে আমার বরাবরই মিনিট পাঁচেক লাগে। এবারে সম্পূর্ণ একটা রাত্রি নিলুম। পরদিন সকালে চিঠিখানা নিয়ে আপিসে গিয়ে আগে পণ্ডিত মশায়, পরে দোতলায় গিয়ে অপূর্ববাবুকে দেখালুম। আমি যাওয়া স্থির করেছি এবং আজই বিকেলবেলার গাড়িতে কলকাতা যাচ্ছি, তাঁকে জানালুম। তিনি হিসেব ক'রে আমাকে মোট আটাশটি টাকা বার ক'রে দিলেন। আসবার সময় পণ্ডিত মশায় বললেন, আশীর্বাদ করি তোমার উন্নতি হোক, কিন্তু তোমার মতন সুযোগ্য সহকর্মীকে আমি হারালুম! এ দুঃখ আমার অনেকদিন পর্যন্ত থাকবে।

তাঁর চোখ ছলছল ক'রে এল। আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিলুম।

সকলের আগে মা! অন্যের কথা ভাবব অন্য সময়ে। স্টেশনে যাবার আগে প্রভাস আমাকে ব'লে দিল, কিছু ভাবিসনে, আমি সব ম্যানেজ ক'রে দেবো। টাকাকড়ির অভাব যদি ঘটে—আমি ত এখনো মরি নি।

বিকেলবেলাকার দেরাদুন এক্সপ্রেসে আমি কলকাতা রওনা হলুম। কাশী থেকে আমার বাড়ি পর্যন্ত পেঁছতে খরচ হয়েছিল সাড়ে ছয় টাকা। আমার হাতেও কিছু টাকা ছিল। মা'র হাতে পঁচিশটি টাকা দিয়ে আমি আনন্দ পেলুম।

মা'র কাছে এসে দাঁড়ালেই আমি যেন সেইকালের অর্বাচীন শিশুতে পরিণত হই। আমি যে সৈন্যবিভাগে চাকরি নিয়ে বহু দূর দেশে চ'লে যাচ্ছি, একথা শুনে মা বললেন, একলা অতদূরে গিয়ে থাকতে পারবি ত?

আমি খুব হাসলুম। পরে বললুম, কই, তুমি ত জিজ্ঞেস করলে না, বিদেশে বিভুয়ে অসুখ-বিসুখ করলে কে দেখবে?

তোর অসুখ করবে?—মার গলা ধ'রে এল। বললেন, কা'র জন্যে তবে আমার জপ-তপ-আহ্নিক? সে সবই কি মিথ্যে হবে? তুই যা, যেখানে খুশি যা, যতদূরে

যেতে পারিস চ'লে যা! কোনদিন তোর পায়ে একটি কাঁটাও কখনও ফুটবে না।'

মায়ের এই দৈববিশ্বাসের কথা ভেবে সেদিন আমার রোমাঞ্চ হয়েছিল। আমি মাত্র ছয়দিন ছিলুম কলকাতায়। কিন্তু চারদিনের দিন 'ক্যালকাটা বুক ডিপো' নামক প্রকাশকের মালিক আমার প্রথম অপদার্থ বই 'যাযাবর'-এর জন্য আমাকে একশ' টাকা দিলেন। সেই টাকা নিয়ে অপরাহ্নকালে বাড়ি ফিরে মা'র হাতে দিয়ে প্রণাম করলুম। সাহিত্যকর্মে এই আমার প্রথম সর্বোচ্চ পরিমাণ উপার্জন! সেদিন মায়ের চোখে আনন্দের অশ্রু দেখেছিলুম!

একে একে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে আবার কাশীযাত্রা করলুম। তখন জ্যৈষ্ঠ-মাসের প্রায় মাঝামাঝি। কাশীর পথের দুইদিক যেন জ্বলে পু'ড়ে যাচ্ছে। আমার শরীর আবাল্য শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। প্রবল বর্ষায় ছাতা ব্যবহার করিনে, প্রচণ্ড গরমে বাড়িরবাইরে থাকি, প্রবল শীতে শুধু খদ্দরের পাঞ্জাবি। আমি কোনদিন অসুস্থ হইনে, এই আমার অহঙ্কার! শাস্ত্রে বলে, সকল ব্যাধির জন্য অজ্ঞানের থেকে!

আমার যাবার তোড়জোড় নিয়ে তখন আমি ব্যস্ত। কাশীতে কেউ চাকরি করে না। যা ক'রে, সে হ'ল মাস্টারি। কেউ কেউ অধ্যাপক, উকীল, বড়জোর ডাকঘরের লোক। সেদিক থেকে কাশী তখন কলকাতা অপেক্ষা একশ' বছর পিছিয়ে। যাই হোক, আমি একদিন আমার পাঁচসিকে দামের টিনের সুটকেশ, একটি শতরঞ্চি ও বালিশ নিয়ে সেই জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রে রাওয়ালপিণ্ডি রওনা হয়ে গেলুম। কাশী থেকে রাওয়াল-পিণ্ডি কমবেশি এক হাজার মাইল দূর। ট্রেনে যেতে তখন দুদিনের বেশি লাগে। তখন আমার দিল্লী পর্যন্ত জানা পথ। তারপর আম্বালা, লুধিয়ানা, জলন্ধর হয়ে অমৃতসর। দুই রাত্রি পেরিয়ে গেল। কিন্তু অমৃতসর থেকে লাহোর এবং লাহোর থেকে রাওয়ালপিণ্ডি গরমে খুবই কষ্টকর। লাহোর হ'ল ইরাবতী নদীর ধারে। অতঃপর একে একে বিপাশা, চন্দ্রভাগা, শতদ্রু ও বিতস্তা—মোট পাঁচটি নদ পার হয়ে উত্তর পশ্চিমের দিকে বহুদূর পর্যন্ত গেলে তবে রাওয়ালপিণ্ডি। রাওয়ালপিণ্ডি জেলা সিন্ধু নদের পূর্ব প্রান্তে শেষ হয়েছে। ওপারে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, এপারে ভারতবর্ষ। প্রকৃতপক্ষে তখন প্রায় দু'হাজার মাইল লম্বা সিন্ধু নদই তিব্বতের পশ্চিম প্রান্ত থেকে আরম্ভ ক'রে আরব সমুদ্রের উত্তরে করাচির অববাহিকায় শেষ হয়েছে।

রাওয়ালপিণ্ডি জেলা একটি মনোরম উপত্যকা। জলহাওয়া অতিশয় ভালো। এই উপত্যকার উত্তর অঞ্চল শিবালিক পর্বতমালার পশ্চিমপ্রান্ত, এখান থেকে অতি সুন্দর কয়েকটি পথের মধ্যে একটি গিয়েছে হাজারা, চিত্রল এবং গিলগিটের দিকে, আরেকটির নাম ঝিলম ভ্যালি রোড—যেটি 'সানি ব্যাঙ্ক' হয়ে 'কোহালার' দিকে নেমে বিতস্তা বা ঝিলম পেরিয়ে দোমেল, উরি ও বরামুলা ছাড়িয়ে শ্রীনগরে গিয়ে পৌঁছয়। রবীন্দ্রনাথ এই পথে শ্রীনগর গিয়েছিলেন। তিনি 'বান্নাল' বা 'বানিহাল' গিরিসুড়ঙ্গ অতিক্রম করেন নি।

এ অঞ্চলে আমি বহুদিন অতিবাহিত করেছি এবং আমার এই সৈন্য বিভাগের কাজ নিয়ে প্রথম লিখি 'দেশ দেশান্তর' গ্রন্থে, পরে 'দেবতাত্মা হিমালয়ে' এবং 'উত্তর

হিমালয় চরিত' গ্রন্থে। সুতরাং এখানে আর পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই।

শীতের ছয় মাস রাওয়ালপিণ্ডি শহরে ও গরমের ছয় মাস মারী পাহাড়ের সাত হাজার ফুট উচ্চভূমিতে বসবাস—এই ছিল তখন সৈন্য দপ্তরের বিধি-ব্যবস্থা। আমার পরিচয় ছিল 'সৈনিক কেরানী'। আমি কাঁচা-হাতের টাইপিস্ট ছিলুম। উপর-ওয়ালারা খাস ইংরেজ। ক্যাপ্টেন, মেজর, লেফটেনাণ্ট, কর্নেল, ব্রিগেডিয়ার, জেনারেল, কোম্পানী কমাণ্ডার, কমিশনড বা নন্‌কমিশনড—প্রায় সবাই তখন ইংরেজ। আমাদের কপালে হাবিলদার, সুবেদার, লান্সনায়েক ইত্যাদি। আমি বাঙালী একথা ভুলতে হয়েছিল। পরনে ধুতি বা লুঙ্গি দেখলে লোক জমে যেত। আমি ছুটির দিনে পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ করতুম। বাঁশরাগল্লি, চিকা গল্লি, ছাংলা গল্লি, চিপা গল্লি. পিণ্ডি পয়েণ্ট, কাশ্মীর পয়েণ্ট—সবই ঘুরতুম। 'গল্লি' মানে পাহাড়। কো মানে পাহাড়। সুতরাং এ পাহাড়কে বলা হয় কো-মারী।

তখন আমেরিকান জীপগাড়ির জন্ম হয় নি। সাহেবদের জন্য মোটর থাকত। সাধারণের জন্য ঘোড়া। আমি ঘোড়সওয়ার নই, সেজন্য অশ্বরক্ষীকে সঙ্গে নিতে হত। তন্দুরের মোটা রুটি, শুকনো সিদ্ধ মাংস, আপেল-আখরোট-আঙ্গুর—এই সব নিয়ে আমার ঝুলি ভরে থাকত। আঙ্গুর টাকায় দশ সের, এককুড়ি কাশ্মীরী আপেলের দাম আট আনা, খোলাসুদ্ধ আখরোট এক টাকায় এক মণ। 'দুম্বা' ভেড়ার রোস্ট করা মাংস আধ সের ছ পয়সা। কিন্তু পাহাড়ী শহর মাত্রেই দুধের দাম বেশি, সেজন্য তিন আনা সের। ভাত কেউ খায় না, সবাই রুটি খায় খাঁটি ঘিয়ে ডুবিয়ে। এক বাটি ডালের ওপর আধ ইঞ্চি ঘি দাঁড়িয়ে থাকে। তরকারি ঘিয়ে রান্না। সরষের তেলের খবর কেউ রাখে না। পাহাড়ের পাঠান কুলিরা পাঁচ-সাত মণ বোঝা পিঠে নিয়ে হেঁট হয়ে চড়াই ভাঙ্গে!

আমার চেহারা, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনযাত্রা—একে একে সব বদলিয়ে যেতে লাগল। ভুলে গেলুম বহু দূরের বাঙলাদেশ। কাশী আর মনেই পড়ে না! আমি কথা বলি পাঞ্জাবী উর্দুতে, আপিসে ইংরেজি, পাঠানদের সঙ্গে ভাঙ্গা ভাঙ্গা পুস্তুতে। আমার আমূল পরিবর্তন ঘটল!

মাইনে পাই একশ' চার টাকা, কিন্তু বিভিন্ন খাতে আরও পাই পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ। বাসা ভাড়া, খাইখরচ, দুধ, চাকর, জলখাবার, জমাদারনি—সব মিলিয়ে আমার মাসে পড়ে বাইশ-চব্বিশ, বড় জোর পঁচিশ টাকা। আমি টাকায় ভাসছি! মাসে একবার মনে পড়ে মাকে—যখন পঞ্চাশ টাকার মনিঅর্ডার করি, নইলে তুমি কার, কে তোমার? মাকে ভাবব তখন, যখন বেদনায় যন্ত্রণায় দুঃখে দুর্দশায় বুকফাটা আর্তনাদ করব! যখন স্নেহ ভালোবাসা চাইব, সকরুণ সমবেদনার কল্যাণস্পর্শের জন্য যখন আতুর হবো, এ বিশ্বের সকল দিক নৈরাশ্যের অন্ধকারে যখন ছমছম করবে —তখন মা, শুধু মা, শিরা-উপশিরায় অস্থিপঞ্জরে অন্তরতন্ত্রের পাকে-পাকে ঝনঝনিয়ে উঠবে আমার মা!

না, এখন নয়। এখন অন্য কথা, অন্য চিন্তা। এখন ব্লু পাইনের অরণ্যের ভিতর

দিয়ে আমার ঘোড়া চলুক, এখন পেরিয়ে যাই নিরুদ্দেশ পাহাড়ের অজানা সরাই-খানার পাশ কাটিয়ে। এখন আমার সেই মদের ব্রুয়েরীর বন্ধু জনি আর তার বউ রোশন।

লরেন্স কলেজের পথ ধরে কোথায় কোন্ দিকে যেন চলে যেতুম। যেন দূরে দূরে মধ্য-এশিয়ার আভাস। সামনে পাইন বনে ভরা ছাংলা গল্লি, তার তলায় তলায় যেন অমরাবতীর ছায়ামধুর পথ। দূর উত্তর-পূর্ব দিগন্তে দেখতে পাচ্ছি নাঙ্গার চূড়া, আরও উত্তরে অস্পষ্ট কারাকোরম।

আমার সহকর্মীদের সমাজে আমি মিলিয়ে গিয়েছিলুম। বাবু জগদীশচন্দর, আজিজ আহমেদ, রূপলালজী, বাবু লেখরাজ—এঁরা আমাকে সোনার চক্ষে দেখতেন। স্থানীয় এক বৃদ্ধ ডাক্তার বেদী, তিনি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন একটি সেতার এবং আমাকে প্রথম নিয়ে যান দাদা জগদীশের বাসস্থানে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। সেখানে ভাবীজী, মায়া দেবী এবং দাদা জগদীশের কুমারী ভগ্নী সরস্বতী। আমার অপরাধ, সরস্বতীকে আমি দু-চার বার রবীন্দ্রনাথের কবিতা ব্যাখ্যা করে তাকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলুম। পশ্চিম পাঞ্জাবের সম্ভ্রান্ত সমাজে যেমন হয়, সরস্বতী খুবই সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী। তার পরনে থাকত শালোয়ার আর লেসতোলা কামিজের ওপর ঘন বেগুনী জ্যাকেট। পিছন দিকে কৃষ্ণসর্পের মতো ঝুলতো দীর্ঘলম্বিত বেণী। কিন্তু আমার চোখে তখনও বাসনার রং এসে পেঁছয় নি। আমি একপ্রকার নির্বোধ হাসিমুখে ওদের সকলের রূপরাশির দিকে চেয়ে থাকতুম।

ডাঃ বেদী ঘটকালির দিক থেকে একটু যেন বাড়াবাড়ি করে ফেলছিলেন। আমার মনকে ঘুষ খাওয়াবার চেষ্টা চলছে। জগদীশ কাপুর ইচ্ছা করলেই আমার চাকরির উন্নতি করে দেবেন। আমার দুশ' টাকা মাইনে হতে দেরি লাগবে না। ওরাও কাশ্যপ গোত্রের ক্ষত্রী ব্রাহ্মণ। সরস্বতী হ'ল ডা বেদীর ভগ্নিপতি গুর্দাস কাপুরের কন্যা। ফলে হ'ল এই, আমি আর ওঁদের বাড়িতে যেতে পারলুম না, এবং ম্যাল-এ ওঁদেরকে সপরিবারে বেড়াতে দেখলেই আমি মাথা নীচু করে চলে যেতুম—পাছে সরস্বতীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়।

বিয়ে করব? কই না, একথা ভাবি নি ত একবারও? আমি বিবাহিত জীবন চাইছিনে, চাইছি বন্য দুর্বার জীবন। বল্গাহারা বাঁধনহারা সেই জীবনটা ভীষণ হোক, দুর্ধর্ষ হোক, বেপরোয়া হোক—সেখানে মেয়েদের ঠাঁই কোথায়? মেয়ে মানে ত আরামের শয্যা, মেয়ে মানে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুগত্য। না, মিলবে না আমার সঙ্গে, মেলাতে পারব না। আমি চাইছি নিত্য উদ্বেলতা, চাইছি তার সঙ্গে গতি, পৌরুষের অবিশ্রান্ত অধ্যাবসায়। আমি চাইছি জীবন-জোড়া বিপ্লব। অহেতুক বিশ্রাম বা অনড় শান্তি আমি চাইনে।

ডাঃ বেদী এ নিয়ে আরেকদিন আলোচনা তুলেছিলেন। সেদিন আমার মেজাজ ভাল ছিল না। বললুম, আমার যোগ্যতা থাকলে আমার চাকরির উন্নতি ঠিকই হবে। এ নিয়ে আপনারা মাথা ঘামাবেন না। তা ছাড়া দেশে আমার মা আছেন, তাঁর সঙ্গে

মুখোমুখি আমার কথাবার্তা বলা দরকার। আমি নিজেও এসব কথা ভাবিনে।

ওঁদের সমস্যা হ'ল সরস্বতীর নাকি উনিশ বছর বয়স হতে চলল। তা চলুক, ওতে আমার দায়িত্ব কোথায়? একটি মেয়ে ভরা যৌবনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সেই অপরাধে আমার গলায় ফাঁস টানব? না, অত উদারতা আমার নেই।

আমি কনিষ্ঠ কেরানী। ফাই-ফরমাস আমাকেই খাটতে হয়। কয়েক মাস কাজে ঢুকেছি বটে, কিন্তু মাঝে মাঝেই আমার ওপর অর্ডার হচ্ছিল এখানে ওখানে যাবার। আমার কাজ জেনেছি, হাত পেকেছে এবং ফাইলে রপ্ত হয়েছি। এক-একটা ট্রিপ কম নয়। বার বার আমাকে নেমে আসতে হয় মারী থেকে পিণ্ডি। পিণ্ডি থেকেই আমাকে ট্রেনে, টাঙ্গায় বা মিলিটারি ট্রাকে যেতে হয় আমার সঙ্গেকার কাগজপত্র দেখিয়ে। আমি একটু উঁচুদরের বার্তাবাহী বা পিওন—এই আমার পরিচয়। যাই হোক, এইভাবেই গিয়ে পৌঁছই সেই সব সীমান্ত শহরে—যাদের নাম কোহাট, বান্নু, চাকলালা, ওয়াজিরিস্তান, ডেরা ইসমায়েল খান, ডেরা গাজি খান ইত্যাদি। রুক্ষ, ধূসর তৃণলতাশূন্য পাহাড়-প্রান্তর—দূরে দূরে পাঠান-বস্তি, মাঝে মাঝে সরাই—সেখানে প্রবেশ নিষেধ। আমি সৈনিক-কেরানী, কিন্তু সাহেবদের কাছে আমি নগণ্য এক পেয়াদা মাত্র। এটা সীমান্ত অঞ্চল। ইংরেজরা উপজাতীয়দেরকে বিশ্বাস করে না। ওদের অবাধ স্বাধীনতা বৃটিশরা পদে পদে খর্ব করতে চায়—এই ওদের আক্রোশ। ওরা অতিশয় বলবান, দুর্ধর্ষ এবং ভয়হীন জাতি। এই সব কারণে সাহেবদের মতো আমাকেও কাঁটাতারের বেড়াজালের মধ্যে থাকতে হ'ত। ওদের মধ্যে মিলেমিশে আছে বালুচি-পাঠান, খাজুড়ি-পাঠান, হাজারা-পাঠান। এ ছাড়া আছে মালাকান্দি, মার্দানি, তুচি—আরও নানা সম্প্রদায়। আমাকে নানাবিধ নিষেধ মেনে চলতে হ'ত। সবচেয়ে বড় নিষেধ ছিল, সীমানার বাইরে যাওয়া চলবে না। আমি একটা ধূসরঊষর রাজ্যে বিচরণ করছিলুম।

আমার এই যাওয়া এবং আসার জন্য সরকারী হিসাব অনুযায়ী সর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ রাহাখরচ পেতুম, কারণ আমি কনিষ্ঠ কেরানী। কিন্তু এই কম পরিমাণটাও আমার কাছে ছিল প্রচুর। যেখানে কুড়ি-পঁচিশ টাকা সবসুদ্ধ পড়ে সেখানে আমি পেয়ে যেতুম কমবেশি একশ' টাকা। সে-সব টাকা খরচ করার উপায় যে ছিল না তা নয়, কিন্তু আমার সাহসে কুলতো না।

একবার আমাকে পাঠানো হল পেশাওয়ারে। সেই প্রথম পেশাওয়ার। আমি 'এম-টি সেকশনের' লোক। সমস্ত যানবাহনের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করার জন্য আমাকে গাড়ির সঙ্গে ঘুরতে হ'ত। জমরুদ, আলি-মসজিদ, রক্ত-বরণ বিরাট শাগাই দুর্গ, লাণ্ডি কোটাল এবং সেই লাণ্ডিখানা পর্যন্ত আমাকে যেতে হ'ত খাইবার গিরি-সঙ্কটের ভিতর দিয়ে। ওখানকার সুড়ঙ্গ-রেলপথ মাত্র পঁয়ত্রিশ মাইল দীর্ঘ—এই রেলপথটি বাঙ্গালী ইনজিনিয়াররা নির্মাণ করেছেন কমবেশি একশ' সুড়ঙ্গ কেটে—এই পথে আফ্রিদি পাঠানদের সঙ্গে আমার দেখা হ'ত। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাষায় যখন তাদের সঙ্গে কথা বলতুম, তারা কৌতুক বোধ করত, এবং ঝুলির ভিতর থেকে দু-একটা আপেল বের করে

আমাকে উপহার দিত। আমি দেখতুম ওদের সুন্দর সুদর্শন চেহারা, সাংঘাতিক বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ত বড় বড় চোখ, এবং সরল সহাস্য মধুর ব্যবহার। বৃটিশরা ওদের নামে যত কলঙ্ক রটিয়ে বেড়াচ্ছে, তার একটাও ওদের সঙ্গে মিলছে না। আমি জানতে চাইতুম, ওরা রেলগাড়ি চড়ছে যখন-তখন, কিন্তু টিকিট কাটে না কেন। ওরা বলত, ওদের কাছে টিকিট চাইবার সাহস কারও নেই। তা ছাড়া এটা ওদের এলাকা. এখানে 'দুশমনরা' জবর-দখল করে রয়েছে ওদের গোলাগুলির জোরে। ওদের সবচেয়ে বেশি আক্রোশ· পাঞ্জাবী জওয়ানদের ওপর। তাদেরকে ওরা আংরেজকো কুত্তে বলে মনে করে। ওরা ভারত বলে না। বলে, হিন্দুস্তান। যাই হোক, গোরা-ছাউনির বাইরে আমার পক্ষে যাওয়া যদিও ছিল নিষিদ্ধ, তবুও একদিন কয়েক ঘণ্টা ফাঁক পেয়ে গা-ঢাকা দিয়ে গেলুম পেশাওয়ার শহরে। সে-শহর মধ্য-এশিয়ার মধ্যযুগীয় শহর। সেখানে আমিই একমাত্র 'হিন্দুস্তানী'। যত দূর দেখা যায় শুধু বালু পাথর পরিকীর্ণ বস্তি। একটি দুটি অনামা গাছ। সবুজ রং বলতে কোথাও কিছু নেই। প্রতি ব্যক্তির হাতে বা কাঁধে বন্দুক। সঙ্গে একটা ঝোলা, তার মধ্যে থাকে শুধু শুকনো মোটা রুটি, বাছুরের কিংবা দুম্বার শুকনো সিদ্ধ মাংস, ওই সঙ্গে আপেল, বাদাম, আঙুর আর রাশি পরিমাণ বন্দুকের গুলি। পরনে ওদের ছেঁড়া ময়লা শালোয়ার, কামিজের ওপর ছেঁড়া জ্যাকেট, মাথায় স্কাল-ক্যাপ, সর্বাঙ্গে একপ্রকার বন্য দুর্গন্ধ। এ জীবনে ওরা ক'বার স্নান করছে তা আঙুলে গুনতে হয়, সাবান কখনও চোখে দেখেছে কি না সন্দেহ, এবং যদি আমাকে একবারও সন্দেহ করে যে, আমি বৃটিশ পল্টন দপ্তরের লোক, তবে সেইখানেই আমার অনিবার্য অপমৃত্যু—এবং সেই মৃত্যু-সংবাদ কস্মিনকালে আমার আপিসে পেঁছিবে না।· শুধু এই রেকর্ড থাকবে যে, আমি নিরুদ্দেশ।

আমি ভ্রাম্যমাণ এবং ওদের 'মেহমান'—এটা ওরা বিশ্বাস করে নিয়েছিল। ফলে, আমার কপালে সেদিন আতিথেয়তা জুটে গেল। ভেড়ার দুধ মেশানো কফি, এক-গোছা কালো আঙুর, রুটি আর মাংস, তার সঙ্গে বাদাম আর আপেল। গত কয়েক মাসে আমার স্বাস্থ্যের চেহারা সম্পূর্ণ বদলিয়ে গিয়েছে। এখন নিয়মিত একসারসাইজ করি, সহকর্মীদের সঙ্গে আমার পুরনো অভ্যাসমতো পাঞ্জা লড়ি, এবং আমার কব্জির জোর নেহাৎ মন্দ নয়! কিন্তু এখানে এক সমবয়স্ক তরুণ পাঠানের সঙ্গে দুর্মতিবশত পাঞ্জা লড়তে গেলুম, এবং সে বন্দুক ও ঝোলা নামিয়ে হাসিমুখে হাত বাড়ালো। তার সুন্দর, লম্বা ও লৌহকঠিন আঙুলগুলো আমার পাঞ্জা ধরল এবং সেকেণ্ড দশেকের মধ্যে আমার হাত মুচড়িয়ে দিয়ে আমাকে পরাজিত করল! বার বার তিন-বারই আমি হারলুম এবং আমার অহঙ্কার চূর্ণ হ'ল! এই ছেলেটাই আমাদের সেই আড্ডায় বসে যখন গজল ভাঁজতে আরম্ভ করল, তখন দেখি তার একখানা পায়ের নিচের দিকে দরদরিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে! আমি যখন সেদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম, তখন তার মনে পড়ে গেল তার এক বন্ধু রাগের বশে তার পায়ে গুলি মেরেছে! ছেলেটা আমাদের কাফিখানা থেকে একখানা ছুরি নিয়ে নিজের পায়ের সেই অংশটা

একটু চিরে দিয়ে দুটো ছররা বার করে দিল। এসব ওর কাছে যেন বিশেষ কিছু নয়।

দ্বিতীয়বার পেশাওয়ারে এলুম যখন লর্ড সাইমন ও মিঃ এটলি—দু'জনে দলবল নিয়ে ওখানে এসেছিলেন। ওটার নাম দেওয়া হয়েছিল 'সাইমন কমিশন'। ওই কমিশনকে বয়কট করার জন্য তখন ভারতব্যাপী আন্দোলন চলছে। আমি ছিলুম সেদিন সাধারণ নাগরিকের পরিচ্ছদে। সুতরাং আমার পিছনে লেগেছিল বৃটিশ ভারতীয় এক দক্ষিণী গোয়েন্দা। বলা বাহুল্য, আমার পকেটে ছিল আমার নিজস্ব পরিচয়পত্র। প্রথমবারের যাত্রায় এতটা বুঝি নি, কিন্তু এবার এসেছি তক্ষশীলা, ক্যাম্বেলপুর ও অ্যাটক হয়ে। তক্ষশীলা থেকে উত্তরে একটি সুন্দর প্রাকৃতিক শোভা-সম্পন্ন মসৃণ পথ চলে গেছে হাভেলিয়ান-এর দিকে। তারপর থেকে আমার জানা পথ। পার্বত্য এবং পাইন-বনময় পথ ওখান থেকে একদিকে গেছে নাথিয়াগল্লি, এবং আরেক দিকে আব্বটাবাদ হয়ে মুজাফ্ফরাবাদ চলে গেছে। এ অঞ্চলের নাম 'দোমেল', অর্থাৎ দুটি নদীর সঙ্গম। একটি কৃষ্ণগঙ্গা, অন্যটি বেদাস্তা, অর্থাৎ বিতস্তা বা ঝিলম্। এই নদীতটের পথের নামই 'ঝিলম ভ্যালি রোড'। কাশ্মীরে পৌঁছবার তখন সহজ-সাধ্য দ্বিতীয় পথটি হ'ল লাহোর-শিয়ালকোট-সুচেতগড় ও জম্মু। কিন্তু এই পথে 'বাম্নাল' বা বানিহাল গিরি-গহ্বর অতিক্রম করতে হ'ত।

যাই হোক, আমার পথের প্রত্যেকটি স্টেশনই হ'ল তখনকার গোরা ছাউনি। ইংরেজ তৎকালে বিভিন্ন উপজাতিদেরকে কোনও কারণেই বিশ্বাস করে নি। ওদের প্রকৃত শক্তি ও হিংস্রতার চেহারা কি প্রকার এটি সঠিকভাবে জানার জন্য বৃটিশরা মাঝে মাঝে উপজাতিদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলত। এমন ঘটনা সে-সময়ে প্রায়ই শোনা যাচ্ছিল, দুটি বলবান ইংরেজ সৈন্যকে একজন মাত্র পাঠান খেলার পুতুলের মতন বেড়ায় ভিতর থেকে তুলে নিয়ে পালিয়েছে ওদের পার্বত্য বিবরগুলির মধ্যে। সেই বিবরগুলি প্রায় প্রত্যেকটি পাহাড়ে অসংখ্য ছিদ্রের মতো দেখা যায়। আমার মনে হ'ত ওগুলি জন্তুদের গর্ত। এই সুড়ঙ্গ পথগুলি পাহাড়ের অন্তরালে গিয়ে ছোট ছোট বস্তির মধ্যে শেষ হয়। সেখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অতিশয় উঁচু এক-একটি ওয়াচ-টাওয়ার। এই গম্বুজের উপর থেকে ইংরেজ দুশমনদের গতিবিধি ওরা লক্ষ্য করে। জমরুদ দুর্গ থেকে শাগাই দুর্গের দিকে যাবার পথটা যেন একটা নিত্যকার রণক্ষেত্রের মতো থমথমে। শাগাই থেকে লাণ্ডিকোটাল একটি অতি বিস্তীর্ণ উপত্যকা ইংরেজের সীমিত দখলে রয়েছে—যার একদিকে অর্থাৎ পশ্চিমে আফগান সীমান্ত এবং তিনদিকে পাখতুনদের স্বাধীন ভূভাগ। এই অঞ্চলটির নাম 'ডুরাণ্ড' লাইন। এই লাইনের আশেপাশে ইংরেজদের সঙ্গে ওদের সংঘর্ষ লেগেই থাকে। 'উত্তর হিমালয় চরিত' গ্রন্থে এর বিশদ আলোচনা আছে।

অ্যাটক পুল পার হচ্ছিলুম রাত্রে। সেদিন হিমেল জ্যোৎস্না ছিল। এর আগে ক্যাম্বেলপুর স্টেশনে মেয়েছেলে এক-আধজন যদি কেউ ট্রেনে থাকে—তারা নেমে যায়। হোক না কেন তারা অফিসারদের বউ বা মেয়ে—তারা অ্যাটকের পুল পার হয় না।

এটি রাওয়ালপিণ্ডি জেলার শেষ প্রান্ত। এর পরেই উপজাতিদের সীমান্ত—মেয়েছেলের পক্ষে এ ভূভাগ নিষিদ্ধ। তারা ওদিকে নিরাপদ নয়। অ্যাটকের সেতুর নিচে সেই মলিন জ্যোৎস্না ঝিকমিক করছিল সিন্ধুনদ ও কাবুল নদীর ওপর—ও দুটি স্রোত এইখানে মিলেছে। ওই ধূসর জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়ে যে অস্পষ্ট দেশান্তর সেদিন দেখতে পাচ্ছিলুম সেটি আর যাই হোক, আমাদের পরিচিত ভারতীয় পটভূমির চেহারা নয়। প্রেতচ্ছায়ার মতো নগ্নকায় অনুর্বর একটা পার্বত্যালোক, যেটা বালু-পাথরের কর্কশ রুক্ষতা নিয়ে কালের প্রহরীর মতো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার দুই চক্ষে যেন ধরা রইল চিরকালের এক বিস্ময়। আমাদের গাড়িতে সে রাত্রে আমি একা নই—ছিল আর দু'জন উপজাতীয় পাঠান। তারা বেঞ্চে ব'সে রয়েছে কিন্তু আমি দাঁড়ালে তবে তাদের মাথার সমান হই। গাড়ির ভিতরে আলো অতি মৃদু, পরস্পরের মুখ ঠাহর করা যায় না। পাছে এ গাড়ি দস্যুর দ্বারা আক্রান্ত হয়, এ ব্যবস্থা তারই জন্য।

অ্যাটক সেতু পেরিয়ে অপ্রশস্ত কাবুল নদীর ধার দিয়ে আমাদের গাড়িখানা অন্ধকারে মৃদুগতিতে এগোচ্ছে যেন এক অতিকায় এবং কৃষ্ণকায় সরীসৃপের মতো। কিন্তু এ গাড়ি পেশওয়ারের আগে কোথাও থামবে না এটি জানা সত্ত্বেও পূর্বোক্ত দুটি পাঠান হঠাৎ এক সময় উঠে সেই চলন্ত গাড়ি থেকে নেমে গেল। ঠিক সেই সময় আমার গা একটু ছমছম ক'রে উঠেছিল। একেই ত আমি ছাড়া অন্য আর কেউ রইল না এই বৃহৎ কমপার্টমেণ্টে, তার ওপর দরজাটা রইল খোলা।

কিন্তু অজানায় আর অন্ধকারে আমার ভয় পেলে চলবে কেন? আমি পল্টন-দপ্তরের লোক সন্দেহ নেই, কিন্তু সেইটিই কি আমার প্রধান পরিচয়? আমি বেরিয়ে এসেছি বাইরের জীবনের অপ্রতিরোধ্য ডাকে। অদৃশ্য কেউ আমাকে যেন হাতছানি দিয়ে নিরন্তর ইশারায় দূর-দূরান্তরে ডাকছে। আমি সম্মোহনের দ্বারা অভিভূত হয়ে সেই ইশারার পথ ধ'রে চলেছি। সেই ইশারাই কি আমার নিয়তি? সে কি চিরদিন চলেছে আমার সঙ্গে সঙ্গে? তবে কি অশরীরী কেউ আমার হাত ধরে নিয়ে চলেছে এক অজানা থেকে অন্য অজানায়?

পরদিন প্রভাতে সেবার পেশাওয়ারে পেঁছেছিলুম।

এর মধ্যে একবার ডাক এলো ম্যানুভারিং-এ, অর্থাৎ মিলিটারি কলাকৌশল শিক্ষাদানের একটা ব্যবস্থাক্ষেত্রে আমাদের যেতে হবে। এটা বৃহৎ ব্যাপার যুদ্ধের প্রয়োজন ঘটলে তার ঘাঁটি প্রস্তুতের শিক্ষানবীশী। আমরা থাকব 'স্যাপার্স অ্যাণ্ড মাইনার্সে'র' পিছনে। যান্ত্রিক যুদ্ধই হবে আগামীকালের সংগ্রাম-নীতি। পথ পরিষ্কার করবে স্যাপার্স অ্যাণ্ড মাইনার্স, তার পিছনে পিছনে যাবে আর্মার্ড ডিভিশন, আমাদের 'এম-টি' রসদ যোগাতে থাকবে তারও পিছন থেকে। যুদ্ধে রসদ যোগানই যুদ্ধের প্রধান কাজ। সীমান্তের দিকে 'কমব্যাটাণ্ট' সৈন্যদলের মধ্যে ভারতীয় সৈন্য বলতে তখন বোঝাতো পাঞ্জাবী, বশম্বদ পাঠান ও বালুচি এবং শিখ। সেনাপতি বা ব্রিগেডিয়র—সবাই ইংরেজ। এতে পারস্পরিক ঘৃণার মনোভাবটিকে জাগিয়ে রাখা

চলত। পাঞ্জাবের মুসলমানদের সঙ্গে পাখতুনদের বিরোধ বজায় রাখা প্রয়োজন! এই সব কারণে এক একটা রেজিমেণ্ট সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভাগ ক'রে রাখা হত। শিখ, ডোগরা, পাঞ্জাবী, রাজপুত, মারাঠা, ঝাঁসী, গোর্খা, কুমায়ুন—এগুলি সব ছিল পৃথক এবং সূক্ষ্ম বৈতনীতির দ্বারা এদেরকে পরিচালিত করা হত। 'ম্যানুভারিংয়ের' মাঠে মাঠে এই কলা-কৌশলের নীতি আমার চোখে পড়ত। রাজনীতিক আন্দোলন ছাড়া বৃটিশ শাসকরা ভারতের উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চল নিয়ে মাথা ঘামাত না। তাদের সমস্ত সামরিক শক্তি নিয়োজিত থাকত উত্তর-পশ্চিম ভারতে। সেই কারণে আমাদের এই নর্দার্ন কমাণ্ড তখন ছিল সর্বশক্তিমান। তৎকালে জঙ্গীলাট, থাকত নামে মাত্র বড়লাটের অধীন, সেটা শুধু কাগজে-কলমে—আসলে জঙ্গীলাটের উপরেই থাকত ভারতরক্ষার সর্বাঙ্গীণ দায়িত্ব। রাওয়ালপিণ্ডির ক্যাম্পে তখন সদাসর্বদা শুধু পঞ্চাশ হাজার বৃটিশ সৈন্যই মজুত থাকত। ক্যাম্পটির নাম ছিল 'ওয়েস্টরীজ'।

একমাসকাল ধ'রে ম্যানুভারিং চলবে কাশ্মীর এলাকার মধ্যে। আমাদের গাড়ি 'সানি ব্যাঙ্ক' হয়ে কোহালার দিকে নেমে গেল ঝিলম নদীর তীরে। এখানে পুল পার হলেই জম্মু ও কাশ্মীর এলাকা এবং উত্তর-পূর্ব পথ শ্রীনগরের দিকে চলে গেছে। পীর পাঞ্জাল পর্বতমালার নিচে পাহাড়ঘেরা এক অতি বিশাল প্রান্তরে সেনাদলের কুচ-কাওয়াজ, হাইল্যাণ্ডার্সদের বিভিন্ন প্রকারের অনুশীলন, সৈন্যব্যূহ-রচনার কলাকৌশল, কামানের গাড়ির বিভিন্ন নিয়ম নির্দেশ—এই সব একে একে যখন চলছে, তখন সহসা শ্রীনগর থেকে একটি নাটকীয় দুঃসংবাদ এল। কাশ্মীরের মহারাজার তরফ থেকে নর্দার্ন কমাণ্ড হেড-কোয়ার্টার্স জানতে পেরেছেন, গতকাল অমরনাথ তীর্থযাত্রার পথে পঞ্চতর্নীতে ভয়াবহ এক বিশাল অ্যাভালান্স নেমে আসে এবং অগণিত সংখ্যক তীর্থযাত্রী সেই হিমবাহে চাপা পড়ে। তাদের সংখ্যা দু' হাজারের কম নয়। এই মুহূর্তে সর্ব-প্রকার সাহায্য প্রয়োজন।

সেই আমার প্রথম শ্রীনগরে পদার্পণ।

মোটর ট্রাকে রসদ বোঝাইয়ের দায়িত্ব ছিল 'মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট' সেকশনের, অর্থাৎ আমাদের। আমি ওদের দলের মধ্যে একজন নগণ্য সহকারী মাত্র—আছি কেবল হুকুম তামিলের জন্য। সুবিধা ছিল এই, ডোগরা আর পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের লোকরাই ছিল অধিকাংশ। মাঝে মাঝে এক আধজন মেজর বা ক্যাপটেন। তখন আমরা ক্যাম্পে খেয়ে নিতুম রুটি মাংস বা সব্জি। শ্রীনগর থেকে প্রথমেই পাঠানো হল প্রায় দুশ' ঘোড়া তাদের পিঠে কম্বলের বোঝা নিয়ে। ঔষধপত্র, মিলিটারি ডাক্তার, প্রচুর খাদ্য-সম্ভার ও জ্বালানি কাঠ—এরা গিয়ে পৌঁছতে লাগল পহালগাঁওয়ে—শ্রীনগর থেকে ষাট মাইল দূরে। শোনা যাচ্ছে অধিকাংশ তীর্থযাত্রী নিখোঁজ। হিমবাহের আয়তন ছিল নাকি তিন বর্গমাইল, এবং তা'র উচ্চতা ছিল নাকি পঁচিশ ফুট। এই দানবাকার বিশাল একটা তুষারশিলা পিছলিয়ে এসেছিল পঞ্চতর্নীর দিকে। পালাবার পথ ছিল না কারও।

স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে ছিল কয়েকটি সিন্ধি ও পাঞ্জাবী প্রতিষ্ঠান। কিছু কিছু

কাশ্মীরী। আমি ছুটি পেলুম দিন দশেকের। এরপর আবার আমাকে মারী-পাহাড়ের আপিসে রিপোর্ট করতে হবে অমুক তারিখে, অর্থাৎ আমার হাতে সম্পূর্ণ নয়দিন সময় আছে। যদি এখানকার জরুরী অবস্থায় আমি ট্রান্সপোর্ট না পাই, তাহলে ঘোড়া নেবো এবং সেক্ষেত্রে আরও চারদিন আমার ছুটি বাড়বে।

চারিদিকে পাহাড়ঘেরা শ্রীনগরের পথেঘাটে তখন শুধু ঘোড়া। ঝিলমের এপার-ওপার মিলিয়ে তখন শহর। শহর পুরনো এবং দরিদ্র। বস্তিতে, নর্দমায়, সুড়ঙ্গে, দুর্গন্ধে, নোংরায় পুরনো শহর আকীর্ণ, এবং বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে এই সামন্ত রাজ্যের মধ্যযুগীয় চেহারা তুলনা করলে খুবই খারাপ লাগে। নগরের 'পশ' এলাকায় আমাদের পক্ষে যাওয়া নিষিদ্ধ। সেটা কাশ্মীর মহারাজার প্রশাসন কেন্দ্র।

ঘোড়া ও টাঙ্গা এই ছিল আমার যানবাহন। চারিদিকে আমার ভূস্বর্গলোক কাশ্মীর, সেই আমার দেখার ইচ্ছা। তখন আমার দুর্বার কর্মোদ্দীপনা এবং তেজো-চাঞ্চল্য। দেখতে পাচ্ছিলুম অনাদরে অযত্নে ধুলায় রৌদ্রে ঠাণ্ডায় বর্ষায় আমার দেহ-চর্ম ও স্বাস্থ্য তৈরি হয়েছে—রোগভোগের ভয় অতটা আমার নেই। সেই কারণে দুর্গমে ও দুঃসাধ্য পথযাত্রায় আমি ভয় পাইনে। সেদিন সন্ধ্যার সময় ওই তেলের আলোজ্বালা শ্রীনগরের আমীরা-কদলের সামনে লালচৌকে ঘুরে ঘুরে আমি একখানা নতুন টাঙ্গা ও তার সুপুষ্ট ঘোড়াটাকে ঠিক করলুম। প্রতি ঘণ্টায় ছয় আনা দেবো—গাড়োয়ানের সঙ্গে স্থির হল। আমাকে নিয়ে যাবে সোপোর থেকে তেগাঁও, এবং তার-পর গুরেজ, লোলাব, দুধনিয়াল, তারপরে আছে কৃষ্ণগঙ্গা ও মধুমতী। আমি কিছুই জানিনে কোন্ পথ দিয়ে কোন্ পাহাড় ডিঙিয়ে কোন্ নদী পেরিয়ে আমি আমার লক্ষ্যস্থল সরস্বতী শারদাপীঠে পৌঁছব! শুধু এইখানেই জেনেছি, এখান থেকে কম-বেশি একশ' মাইল পথ।

টাঙ্গাওয়ালা শের মহম্মদকে আমি দু' টাকা অগ্রিম দিয়ে রাখলুম। পরদিন সকাল আটটায় আমি যাত্রা করব। স্থির করলুম, আমি 'আমীরা-কদলে'র কাছাকাছি একটা হোটেলে রাত কাটাব—কেননা এখন আমি ছুটিতে আছি।

ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটলে মানুষের সামাজিক ও নৈতিক জীবন ভেঙে পড়ে। ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি মানুষের পাশব প্রবৃত্তিকে খুঁচিয়ে তোলে। রিলিফের তাঁবু পড়েছিল চন্দনওয়ারি আর পহলগাঁওয়ে কিন্তু ওই সব রিলিফের তাঁবু থেকে একটি যুবতী স্ত্রীলোক কেমন ক'রে যেন ছিটকিয়ে আসে শ্রীনগরে। আমার হোটেলের সামনে ফলের বাজারের কাছে দাঁড়িয়ে যখন তাকে কাঁদতে দেখলুম, তখন আমি এগিয়ে গিয়ে তার সামনে দাঁড়ালুম। বয়সে আমার চেয়ে সে একটু বড়ই হবে। জিজ্ঞেসপড়া করে জানলুম, সে সিন্ধুদেশের মেয়ে। গিয়েছিল অমরনাথে। ফিরবার সময় এই বিপত্তি। 'মহাগুনাস'-এর কাছে সে কোনওমতে পাহাড়ের উঁচুতে উঠে একটা গাছের শিকড় আঁকড়িয়ে ধ'রে সেই অবস্থায় দু'দিন কাটায়। তারপর এক পাঞ্জাবী সাধু তাকে উদ্ধার করে। সাধুর সঙ্গেই সে চন্দনবাড়ি এসে পৌঁছয়, কেননা তা'র দলবল ও সঙ্গীসাথী সবাই ওই হিমবাহের আক্রমণে নিখোঁজ

হয়ে গেছে। সাধুই ওকে বাঁচিয়ে সুস্থ করে তোলে। স্ত্রীলোকটি এখন দেশে ফিরতে চায়। ওর কথাবার্তা শুনে আমি ওকে দুটো টাকা দিয়ে চলে গিয়েছিলুম।

কিন্তু ওখানেই শেষ নয়। আমার হোটেলের তেতলার এক টাকা দিয়ে একটি ঘর নিয়ে আমি সারাদিন পরে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলুম। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম মনে নেই। যখন চমক ভাঙল তখন চারদিকের নিশুতি চেহারা দেখে বুঝলুম অনেক রাত। আমার খাওয়া হয় নি এখনও। কিছু খেতে গেলে নিচের তলায় যেতে হবে।

আমি কখনই ভাবি নি এ দৃশ্য আমার চোখে পড়বে। সেই স্ত্রীলোকটি যে তার সিপসিপে গেরুয়াধারী সঙ্গীটির সঙ্গে এই হোটেলের তেতলায় উঠে জায়গা নিয়েছে কে জানত? ওটা ঘর নয়, ছাদের ধারে বারান্দাটা চওড়া হয়েছে মাত্র। ওরা সেই নিশুতি রাত্রে রতিরঙ্গে উম্মত্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু স্থূল রিরংসার বর্ণনায় বক্তার মনোবৃত্তিও কতকটা প্রকাশ পায়। সুতরাং আমার পক্ষে আর কিছু বলার দরকার নেই। শুধু এইটুকু বললেই হবে, এ দৃশ্য আমার জীবনে এই প্রথম! আমার পায়ের শব্দ পেলে পাছে ওই বিবস্ত্রা নারী বিপন্ন বোধ করে, সেজন্য ঘর থেকে আর পা বাড়ালুম না। নিঃশব্দে ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলুম। সেই রাত্রির অন্ধকার ঘরের মধ্যে আমার প্রশ্নগুলো বাদুড় ও চামচিকার মতো ছুটোছুটি করতে লাগল। এই মেয়েটাকে নিয়ে তৎকালে 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রে একটি ছোট গল্প লিখেছিলুম।

ভ্রমণবৃত্তান্ত বলে যাওয়া আমার উদ্দেশ্য নয় এবং এক্ষেত্রে তীর্থযাত্রার বর্ণনা করতেও আমি নারাজ। সে-সব অন্য প্রসঙ্গ।

প্রতিদিন প্রভাতকাল থেকে আমার চোখ খুলছিল নতুন নতুন বিশ্বের দিকে। আমার পুরনো ইতিহাস হারিয়ে গেছে। আমার সেই আগেকার মন বা আগেকার সেই জীবন বিস্মৃতির তলায় মিলিয়ে যাচ্ছে। প্রতি প্রভাতে আমার নবজন্ম ঘটছে। আমি বিচিত্রের আস্বাদ পাচ্ছিলুম প্রতি পদক্ষেপে।

সোপের জনপদ ছাড়িয়ে অনেকটা সমতল পথ ধরে বিরাট উলার হ্রদ পাশে রেখে চলে যাচ্ছিলুম। কিন্তু ঠিক কোন্‌দিকে যাচ্ছি সে আমার ঘোড়াওয়ালা শের মহম্মদ জানে। কাশ্মীরবাসীর সরলতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। ঘোড়াওয়ালাকে আমি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করি। ওর সর্বপ্রকার খাইখরচ আমি দিই। প্রায়ই একই সঙ্গে খাই। ঘোড়ার খাইখরচ ওর নিজের। ওর টাঙ্গা ও ঘোড়া আমাকে অবাক করেছে। ঘোড়াটা বোধ হয় পাহাড়ী বলেই অনায়াসে সে চড়াইপথে উঠে যায়।

'দুধনিয়াল'-এর পর একে একে 'লোধাবন, তেজোবন, জুমাগন্দ, শীতলবন, রঙ্গবতী।' এর পর 'শিরহশীলা', তারপর কৃষ্ণগঙ্গা, ঘোষক্ষেত্র ও মধুমতী। এখান থেকে সোজা উত্তর দিকে নগরাজ নাঙ্গা, পূর্বে হরমহেশ, তারপর তুষারশুভ্র কারাকোরমের শাখাপ্রশাখা—আমি তখন লোলাব উপত্যকার উত্তর প্রান্তে গণেশগিরি বা গণেশঘাটির দিকে চেয়ে রয়েছি। যেন এ বিশ্বের বিস্ময়লোক।

গণেশঘাটির চড়াইপথ সেদিন অনায়াসে অতিক্রম করেছিলুম পায়ে হেঁটে। শের

মহম্মদকে দশটি টাকা দিয়ে পিছনে রেখে গিয়েছিলুম। সে এক বিজন ভীষণ লোক। প্রাণীশূন্য জনশূন্য পার্বত্য পথ চলে গেছে নদীর ধারে ধারে। মানবসভ্যতার কোনও চিহ্ন নেই কোনদিকে। দেবী সরস্বতী-শারদার মন্দির কারা যেন বিনষ্ট করেছে কতকাল আগে। 'সর্গন' নামে কাছাকাছি আছে এক নদী, তারই ভিন্ন নাম সরস্বতী। আছে 'মধুমতী' তারই তীরভুমিতে ব'সে নাকি পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করতে হয়। পাহাড়ের ঠিক নিচে এক বস্তির সংবাদ দিয়েছিল শের মহম্মদ। বস্তির বাসিন্দারা দার্দ সম্প্রদায়ের লোক। এদের বিরুদ্ধে অপবাদ আছে এরা পুরুষ-পরম্পরায় ডাকাতি ক'রে খায়। সে যাই হোক, তখন শারদামাহাত্ম্য, শারদাপীঠের কাহিনী, 'শাদিবোলি' এবং আচার্য শঙ্করের শারদাপীঠে আসার কাহিনী কোনটাই আমার জানা ছিল না। আমি এসেছি এই সুদূর দুঃসাধ্য পথে কেবলমাত্র আমার ভিতরের তাড়নায়।

ওই দার্দ বস্তির ধারে যখন আমি ভয়ে ভয়ে নামছি, তখন কিছু বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা ক'রে ছিল। পাহাড় থেকে নেমেই দেখি সামনে সহাস্যে দাঁড়িয়ে শের মহম্মদ এ কি, তুমি? তুমি এলে কোন্ পথ দিয়ে?

তখন গোধূলি কাল। সূর্যের আলো পাহাড়ের নিচে মিলিয়ে যাচ্ছিল। হাসিমুখে শের মহম্মদ এই কথাই জানাল, সে নিজেও দার্দ, তারও মুলুক 'চিলাস' অঞ্চলে। কিন্তু আমাকে একা এদিকে ছেড়ে দিয়ে সে বিশ্বাস করতে পারেনি! আমি পরদেশী, আমার নিরাপত্তার প্রশ্ন আছে। গাড়ি ও ঘোড়া সে রেখে এসেছে তার চেনালোকের কাছে।

সেই রাত্রে ওই বস্তির একটি পাথরের ঘরে শের মহম্মদ দু'চারজন দার্দের সহায়তা নিয়ে আমার জন্য গরম গরম ভাত-মাংস প্রস্তুত করেছিল।

॥ ২১ ॥

সভ্যতাবিবর্জিত কাশ্মীরী দার্দবস্তির সঙ্গে নিজের মনকে মিলিয়ে নিচ্ছিলুম। বন্য জীবন যাপনের প্রতি আমার স্বাভাবিক ঔৎসুক্য লেগে রয়েছে। চর্বির আলো জ্বালা ঘুপসী পাথরের ঘর, ময়লা হাতের রান্না আধসিদ্ধ তিতিরের মাংস, নোংরা কম্বলের মধ্যে জন্তুর গন্ধ, ভেড়ির দুধ আর ভেলিগুড় দেওয়া ফুটন্ত চা—এসব আমার প্রিয়। আমার নিজের পোশাক ত এক এক সময় মন্দ লাগে না! পাতলা কম্বলের পা-জামা, হাতে-বোনা পশমের লং-কোট, পায়ে চপ্পল ও মাথায় চাঁদ-টুপি—আমার বিচারে অতি সুশ্রী পাহাড়ী পোশাক! ওদের আহারে-বিহারে, কাজে ও কথায় যদি নিজেকে মিলিয়ে নিতে না পারি তবে আমিই বঞ্চিত থেকে যাব। ওরা 'শার্দিবোলিতে' নিজেদের মধ্যে কথা কয়, কিন্তু ভাঙ্গা ভাঙ্গা পাঞ্জাবী উর্দু বোঝে। ওরা ভাত, মাছ, মাংস ও বুনো আপেল খায়। মাঝে মাঝে কুল্‌ফা বা কড়ম শাক, লওাক বা কদুর ঘাট। বলু বা

পাহার আছে এখানে বা ওখানে,—অতি স্বচ্ছ তার পানীয় জল। রোগ-ভোগ ওষুধ-ডাক্তার কিছু নেই। আছে হয়ত টোটকা কিছু বা পাতার রস। যদি কেউ বাগান বানায়, তবে চেরি, আঙ্গুর, আখরোট, রোজবেরি। আহারের পুষ্টির মধ্যেই ওদের ওষুধ মিলিয়ে থাকে।

দার্দবস্তিতে বাস করছি নিঃসঙ্কোচে। শের মহম্মদ এখানে খুবই পরিচিত। আরেকজন ঘুরছে আশেপাশে, তার নাম গুলকাশেম। কালো কাপড় পরা একটা বউ কাজ করছে খামারে—সেখানে গাছে গাছে লাল আপেল ঝুলছে। এখন আপেলের মরসুম চলছে,—তিন আনা সের বেচা যায় যদি কুড়ি মাইল দূরে গিয়ে 'মণ্ডিতে' বেচে আসতে পার। লক্ষ্য করে দেখলুম এদের কমবেশি ষাট-সত্তরটা ভেড়া রয়েছে। গুল কাশেম বলল, ওদের পেটের তলায় রেশমের মতো যে নরম লোম গজায়, সেগুলির নাম পশমিনা। দাম অনেক। পাঁচ সের লোম বেচতে পারলে একটি পরিবারের সারা বছরের খোরপোষ চলে যায়।

দুদিনে চার-পাঁচটি মেয়েছেলে দেখলুম। কালো আলখেল্লা ওদের পোশাক। চেহারায় যেন আদিম আর্যজাতির মেয়ে। অত্যন্ত ফর্সা এবং অতিশয় অপরিচ্ছন্ন। পরনে একই কালো পায়জামা। ওদের সঙ্গে ভারতীয় মেয়ের মিল নেই। ভারতবর্ষ কোন্‌দিকে ওরা জানে না! ওদের কাছে ভয়ের পাত্র শুধু পাঠান উপজাতীয় দস্যুরা।

এ দুদিনের ইতিহাস মনে গাঁথা রইল। গুলকাশেম ওর বউ আর বোনকে ডেকে আনল বিদায় নেবার সময়। আমার হাসির সঙ্গে দার্দ মেয়ের হাসি মিললো। কিন্তু আমি জানিনে ওদের 'বোলি', ওরা বোঝে না আমার ভাষা। কিন্তু হাসিতে যে-ভাষা নিহিত থাকে, পৃথিবীর সবাই সেটি বোঝে। হাসি মানে অভ্যর্থনা, সমাদর, আতিথেয়তা! হাসি মানে বিদায়কালের প্রীতি সম্ভাষণ। ওরা এই প্রথম দেখল কোন্ অজানা এক 'বংগাল মুলুকের' মানুষকে।

সেদিন প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পাহাড়ী পথে হাঁটার পর শের মহম্মদ আমাকে নিয়ে এল পাহাড়তলীর নিচে—যেখানকার বস্তিতে সে রেখে গিয়েছিল তার গাড়ি আর ঘোড়াটা। ওর চেনালোকের কাছে ঘোড়াটা বেশ ভালই ছিল।

আমার ছুটির সাতদিন ফুরিয়ে গেল। এখান থেকে মাইল দশেক গিয়ে কোন্ এক বস্তিতে পৌঁছে আমরা গাড়ি খুলে দেবো, এবং আগামীকাল এমনি সময় আমরা 'গুরেজ্' পৌঁছব। গুরেজ্ থেকে সোপোরের সেই একই পথ। শের মহম্মদ আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল।

আমার আপিসের 'সুপার' অর্থাৎ বড়বাবু সর্দার মোতি সিং আমাকে যেন একটু স্নেহই করেন। তা ছাড়া আমাদের মেজর সাহেবের একটু সুনজরেই আমি ছিলুম। লোকটা বোধহয় আমার চলাফেরা এবং কাজকর্মে কিছু স্মার্টনেসের আভাস পেয়ে থাকবে। আরেকটি কারণ, মারীপাহাড়ে আমার 'সিমেট্রিওয়ের' মেসের পাশে ছিল একটা জংলা ফুলের ডাঙ্গা। সেই ডাঙ্গা থেকে রঙ্গীন ফুলের একটা গোছা সুতো দিয়ে বেঁধে রোজ মেজরের টেবিলে রেখে আসতুম। ওটার মধ্যে মিশে থাকত একটু

তোষামদ। লোকটা আমার ওই তোষামোদের ফাঁদে পা দিয়েছিল। একদিন লাঞ্চে যাবার আগে হঠাৎ পিছন দিকে এসে দাঁড়িয়ে একটু ঝুঁকে আমার কানের পাশে বলল, 'ইয়োর ফ্লাওয়ার্স আর মিসিং টু-ডে!' অর্থাৎ আজ তোমার ফুলের গোছা পাইনি!

লজ্জায় রাঙা হয়ে সেদিন উঠে দাঁড়িয়ে দুঃখ প্রকাশ করলুম। সর্দারজী প্রমুখ সহকর্মীরা সানন্দে হেসে উঠলেন। কিন্তু লাঞ্চের পর ফিরে এসে মেজর সাহেব যখন দেখলেন, ইতিমধ্যে আমি ফুলের তোড়া এনে তাঁর টেবলে রেখেছি, তিনি একটি ছোট্ট কাগজে ধন্যবাদ লিখে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

তোষামোদে ঈশ্বরকে পর্যন্ত পাওয়া যায়, ইংরেজ-সন্তান মেজর ত সামান্য!

সোপোর থেকে বরামুলায় এসে আমি এটি কাজে লাগালুম। ওখানে পুলিস ব্যারাক থেকে এম-টি সেকশনকে ধরলুম টেলিফোনে। বোধহয় রূপলালজী ধরেছিলেন। আমি বললুম, আমার ছুটি বাতিল করছি! এখান থেকে আমি মুজফ্ফরাবাদ, দ্রস, দির ও গিল্গিট হয়ে যাব। আমার পক্ষে ডাইরেক্ট ইন্সপেকসন্ রিপোর্ট দেওয়া সহজ হবে। মেজর সাহেবকে জানিয়ে যদি এখানকার ক্যাম্পে একটা নির্দেশ পাঠান তবে ভাল হয়।

আমার তুঙ্গে তখন বৃহস্পতি। এতদিন পরে ফুলের তোড়াটা কাজে লাগল! ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে এসে পৌঁছল সর্দার মোতি সিংয়ের 'নির্দেশনামা'। তিনি জানালেন, অমুক তারিখে তুমি আপিসে হাজিরা দেবে। তোমার ট্রান্সপোর্ট ও ক্যাম্পিংয়ের ব্যবস্থা করা হল। হিসেব করে দেখলুম, আরও দুটো দিন হাতে এসে গেল। ফুলের তোড়ার গুণ কত!

টাকার স্রোতে তখন আমি ভাসছিলুম। ফিরে গেলে 'ম্যানুভারিং পিরিয়ড' ও রিলিফের কাজের দরুণ একটা গ্রাণ্ট পাবো। সুতরাং শের মহম্মদের প্রাপ্য টাকার অরিরিক্ত দশ টাকা বকশিশ দিয়ে ফেললুম। বড় আনন্দে সে বিদায় নিল। আমি তাকে জড়িয়ে ধরেছিলুম আবেগে ও উচ্ছ্বাসে।

পোশাক আবার বদলিয়ে ঝোলাটায় পুরেছি। পেটভরে খেয়ে নিয়েছি বরামুলার বাজারে। তারপর ডোগরা সেনাবাসে আমার পরিচয়পত্র দেখিয়ে যখন অপেক্ষা করছি তখন ট্রাক এসে থামল। আমি কাগজ দেখিয়ে ড্রাইভারের পাশে উঠে বসলুম। অদৃশ্য নিয়ন্তা আবার আমাকে টেনে নিয়ে চলল অজানা থেকে অজানায়। আমি যাচ্ছিনে, যাচ্ছে যেন আরেকজন—যে আমার বুকের মধ্যে থেকে চোখের জানলা দিয়ে বহির্বিশ্বকে দেখে নিচ্ছে!

আনুপূর্বিক কাহিনী এখানে ফেঁদে বলার দরকার নেই। 'উত্তর হিমালয় চরিত' গ্রন্থে এর সুবিস্তৃত বৃত্তান্ত বলা হয়েছে। যাই হোক, আমি দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছিলুম, কিন্তু যাচ্ছি কোন্ দিকে, সে আমি জানিনে। হাতঘড়িতে দেখছি বেলা আড়াইটে বাজে। দোমেল-এর পরে মুজাফ্ফরাবাদ, তারপর টিথওয়াল—চারিদিকে উত্তুঙ্গ পর্বতমালা। এটা সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ। ঠাণ্ডা হাওয়া উঠেছে সোনার বর্ণ উপত্যকায়। প্রশস্ত পথ, কিন্তু দুখানা গাড়ি যায় না পাশাপাশি। আমরা

'কোরান' থেকে সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে এসে পেঁছেছিলুম মিনিমার্গ-এর একটি অফিসার্স ক্যাম্পে, এটি অক্‌জিলিয়ারি ফোর্সের ক্যাম্প, মহারাজার পল্টনের দল এখানে থাকে। কিন্তু আমি এখন নর্দার্ন কমাণ্ডের লোক, আমার খাতির অন্যরকম।

বাইরে ঠাণ্ডা পড়ছে, কিন্তু বায়ুরুদ্ধ ক্যাম্পের ভিতরটা আরামদায়ক। ময়লা তেলের আগুন জ্বলছে একপাশে, ওখানেই খাবার তৈরি হয়। অন্য অংশে দেশী ও বিলেতী মদের কাউণ্টার,—যেমন সব অফিসারদের ক্যাম্পে,—যার যে পরিমাণ খুশি পান করে। সুতরাং ওই ময়লা তেলের গন্ধের সঙ্গে দেশী ও বিলেতীর ভরভরে গন্ধ মিলিয়ে একটা বিচিত্র আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে।

জনৈক হাবিলদার আমার জন্য নির্দিষ্ট চারপাই ও কম্বল দেখিয়ে দিয়ে যখন চলে যাচ্ছে তখন ওপাশ থেকে একটা গেলাস হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল বচ্চিন্দর সিং। শ্রীনগরে ওর সঙ্গে পাঁচ ছ'দিন আমি কাজ করেছি। ফলে বচ্চিন্দর আমার ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সে ডোগরা পল্টনের লোক। কিন্তু এখন বেশ রঙে থাকার জন্য আমাকে দেখেই সে হই-হল্লা করে উঠল। গেলাসটা এক চুমুকে শেষ করে রেখে আমাকে আনন্দে জড়িয়ে ধরে বলল, চলো ইয়ার, পহলে দো-তিনঠো পেগ চঢ়া লো, ফির ভি কাম্ হ্যায়—

বচ্চিন্দর প্রচণ্ড উৎসাহে আমাকে টেবলে বসালো। মাঝখানে এক পাত্রে রয়েছে আঙ্গুর ও বাদাম রাশি রাশি। কিন্তু আজ সে আমার কোনও কথা শুনল না। আমার অগ্নিগর্ভ তরুণ রক্তে সে বিষ মিশিয়ে দিতে লাগল বার বার। তার সঙ্গে মৌসুমী আঙ্গুরের রস, বাদাম এবং মাংসের কাবাব চলতে লাগল একটির পর একটি। পানাদির পর সে আমাকে টেনে নিয়ে চলল।

সাত হাজার ফুট পাহাড়ের উপরে এলে মিনিমার্গ উপত্যকা—সেখানে উত্তর কাশ্মীরের ভূস্বর্গ চিত্র। কিন্তু এসব অঞ্চলে অশ্বারোহণ ছাড়া যানবাহনের অন্য কোনও সুবিধা না থাকার জন্য সাধারণ পর্যটকরা আসে না। ইংরেজ বা মহারাজার লোকজন অথবা সরকারী কর্মচারী—তাদের কথা আলাদা। এই নিসর্গলোকের ভিতর দিয়ে রাত সাড়ে ন'টার পর অন্ধকার উপত্যকাপথে বচ্চিন্দর সিং যেখানে আমাকে নিয়ে গিয়ে তুললো সেখানে আমার পক্ষে ফুর্তিবাজ ও চটুল হয়ে ওঠা উচিত ছিল। কিন্তু আমার ভিতরের একটা অংশ তখনও জমাট তুষারের মতো কঠিন। অনেক সময় আমি ঠাণ্ডা, হিসেবী, এবং অনেক ক্ষেত্রে নড়িনে বা টলিনে!

ঠিক সেই ঝিলম নদীর তীরে কোহালার মতো পরিস্থিতি—যেখানে সেবার আমার বন্ধু খান্না এবং অন্যান্যরা আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। আমি চাই নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি চাইনে। পুরুষ আর মেয়ে যখন মিলিত হয়, তখন একই রঙ্গ এবং একই রস। পরিস্থিতি ও পটভূমির বৈচিত্র্য ঘটতে পারে, কিন্তু মূল বিষয়টি একই।

অন্ধকারেই সেদিন দেখেছিলুম, বাগান পেরিয়ে আমরা এসে উঠলুম একটি বাংলোয়। এটির চেহারা খুব সুশ্রী, তাই এর চলতি নাম 'কটেজ'। বচ্চিন্দর সোজা ঢুকল ভিতরে, এবং মিনিট দুয়েকের মধ্যেই একটি সুন্দর রক্তনীলবর্ণের শালের জোব্বাপরা তরুণীকে নিয়ে বেরিয়ে এল। হাসিমুখে মেয়েটি আমার করমর্দন করল।

তার উত্তাপটুকু আমার ঠাণ্ডা হাতের মধ্যে অনুভব করলুম। কিন্তু ওইটুকুর মধ্যেই সে তার চপল-চঞ্চল যৌবনের ইশারায় বচ্চিন্দর সিংকে উল্লসিত করে তুললো। বন্ধুবরের অবস্থাটা দেখে আমি যেন একটু দুর্ভাবনায় পড়ছিলুম। ইতিমধ্যেই তার বাঁ হাতখানা মেয়েটির পিঠের দিকে ঘুরেছে। এখানে নাকি সম্ভ্রান্ত ও সহজলভ্য 'কটেজ গার্ল' আরও আছে।

বারান্দায় ঠাণ্ডা, সুতরাং মেয়েটির সমাদর অভ্যর্থনার জন্য আমাকেও ভিতরে যেতে হল। এখানেও সেই ভাষার গণ্ডগোল। পাঞ্জাবীবুলি মেয়েটি কিছু জানে মাত্র। তবে তার হাস্যালাপের মধ্যে কিছু কিছু ইংরেজির ফোড়ন থাকার জন্য আমার পক্ষে সুবিধা ছিল।

হাসিমুখে আমি প্রশ্ন করলুম, মিঃ সিং বলছিল তুমি নাকি নাচগান জানো?

মেয়েটি বলল, সে ত কাশ্মীরী নাচগান,—আপনার কি ভাল লাগবে?

আমি সেই আকর্ষণেই এসেছি!

মেয়েটি উৎসাহিত হয়ে উঠল, এবং নিজেই সে পাশের ছোট ঘরটিতে গিয়ে টেবল সাজাতে লাগল। আমিও আমার আড়ষ্টতা ঘুচিয়ে টেবলের ধারে গিয়ে বসলুম। জলে-ভিজনো বড় শামপেনের বোতল খুলে তিনটি গেলাসে ইতিমধ্যেই ছাপাছাপি ঢালা হয়েছে। আশেপাশে নানা রুচিকর খাদ্যের সমারোহ নানা পাত্রে। মাঝখানে মস্ত ফুলের তোড়া। বচ্চিন্দর সিং হল মেয়েটির হাতের পাঁচ, কিন্তু আমাকে সে মিনিট দশেক পর্যবেক্ষণ করে এক সময় তার জোব্বাটা খুলে ফেলল। পলকের জন্য আমি সেই স্বাস্থ্যবতী জাত-কাশ্মীরী তরুণীর অঙ্গশ্রী এবং ফুলকাটা গেঞ্জির দিকে চেয়ে টেবলের পানাহারের দিকে মনোযোগ দিলুম। গেলাসগুলি পরস্পরের সঙ্গে ছুঁইয়ে 'চীয়ার্স' বলে এক ঢোকেই শেষ।

সাম্রাজ্যবাদী ও কূটনীতিক ইংরেজ পর্যটক, উঁচুদরের ইংরেজ মিলিটারি অফিসার, বড় বড় জাগীরদার ও ধনপতি, মাঝে মাঝে আমীর-ওমরাহ—এরা এদিক দিয়ে গিলগিট বা চিত্রল যাবার পথে এইসব সৌখীন 'কটেজ গার্লদের' ঘরে আসে। এরা ঠিক সুলভ বারবনিতা নয়। এদের অনেকে পায় মুক্তোর মালা বা হীরের আংটি, কেউ কেউ রুবির টায়রা। অনেকে দিয়ে যায় সাচ্চাজরির কাজ করা রেশমের ওড়না। কেউ দিয়ে যায় শাল-দোশালা। খরচ করতে জানে ইংরেজ, জানে মোগল বংশের যারা অবশেষ। কিন্তু কাশ্মীরী মেয়ে সর্বাপেক্ষা ভয় করে উপজাতীয় পাঠানদেরকে। এ মেয়েটি সেই পাঠানদের গল্প করছিল। তারা হাজারা জেলার লোক, মাঝে মাঝে ডাকাতি করে মেয়ে ধরে নিয়ে যায়।

এ মেয়েটি আগেই জানত বচ্চিন্দর সিং আসবে, সে প্রস্তুত হয়েই ছিল। সব রকম আয়োজন রয়েছে ঘরে। উত্তাপের জন্য হল-এর দুদিকে চিমনির নিচে কাঠ ধরানো আছে। সেই সব কাঠ চেনার বা আখরোট গাছের। সেই জ্বলন্ত কাঠের সুগন্ধ ভিন্ন প্রকারের। সব ঘরের মেঝেতে সুদৃশ্য মোটা ও ফুলকাটা কার্পেট পাতা। আখরোট কাঠের ওপর সোনালি পালিশ করা নানাবিধ আসবাব সজ্জা। সেজবাতির অলঙ্করণ

অতি মনোজ্ঞ। মাথার উপরে পরকলা কাঁচসমেত আলোর ঝাড় ঝুলছে। মেয়েটি আমার প্রশ্নের উত্তরে জানাল, এ মহলটি তার নিজের। আরও দুটি মহল আছে আর দুটি মেয়ের। দাই ও খিৎমদগার মিলিয়ে আছে ছয়-সাতজন। বুবু, বুয়া, ভাবী—তারাও আছে।

বড় হলটির এককোণে দেখা যাচ্ছে একটি 'সেলার'। তার ফ্রেমের সামনেটা মোটা সোনালি জাল দিয়ে ঢাকা। ওটার মধ্যে বিভিন্ন বিদেশী মদ সাজানো। লালবর্ণ আঙুরের মদ, হুইস্কি, শেরি, জিন, সাদা শামপেন, পাশে ভামর্ত, ব্র্যাণ্ডি,—আরও যেন কি কি। কোন্ এক নবাব কবে যেন দিয়ে গেছে দেওয়ালে-ঝোলানো একটি 'চাইমিং ক্লক'—তার ভিতরে একটি যান্ত্রিক পাখির মুখের থেকে খাবার পড়ে যাওয়া এবং তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টিকটিক শব্দ হচ্ছে। ঘরের মধ্যে গিল্টি করা চেয়ারগুলি নধর লাল মখমল দিয়ে মোড়া।

বচ্চিন্দর সিংকে যতটা বিপজ্জনক মনে হচ্ছিল, এখন দেখছি ততটা সে নয়। কিন্তু তার পীড়াপীড়িতে মেয়েটি এক সময় নাচের জন্য উঠে দাঁড়াল। শরীরে বিভিন্ন প্রকার বাঁধন থাকলে নাচতে অসুবিধা। সেজন্য সে কাশ্মীরী ঘাঘরা ছাড়ল, রইল সামান্য মিহি চুনোটকরা অন্তর্বাস। গায়ের সেই পশমিনা গেঞ্জি খুলল। অতঃপর তার সর্বাঙ্গে যা রইল, তা লজ্জানিবারণী সঙ্কেতমাত্র। একসময় তার উরুলোক, নাভিলোক এবং বক্ষযুগল লক্ষ্য করতে করতে আমি নিজের চোখ দুটো অনুভব করলুম,—সে দুটো যেন পাথরের গুলী, আর আমার মুখখানা যেন পিতলের তৈরি—যার কোনও ভাষা নেই।

তিন সপ্তাহ হতে চলল কাশ্মীরী মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছি বইকি। ভিখারী ওদের মধ্যে প্রচুর। শ্রমিক মেয়েও কম নয়। মাঠে-খামারে কাজ করে বহু মেয়ে। গ্রামের দিকে গরীব গৃহস্থ ঘরের মেয়েকে ঘরকন্নার পাট করতে দেখেছি। সকলের পরনে পাজামা, মাথায় ফেট্টি বা কাঁধে উড়ানি, গায়ে পুরোহাতা জোব্বা। হাতে রুপোর বালা, গলায় পলার মালা, কালো চোখেও সুর্মা টানা। রঙ খুবই ফর্সা, মাঝে মাঝে মুখশ্রী ভাল। ওদের বুকের ঠিক মাঝখানে রাঙা রাঙা ছোপ। ওরা শীতের সময় আগুনের কাংড়ি পোশাকের মধ্যে নিয়ে বেরোয়। সেই আগুনের আঁচে ওই রাঙা ছোপ পড়ে। এরা সাধারণ মেয়ে। অভিজাত কাশ্মীরী মুসলমান ও পণ্ডিতের পরিবারে প্রকৃত কাশ্মীরী সুন্দরীরা থাকে—যারা কাশ্মীরের গৌরবের পরিচয়। এই মেয়েটি সেই সমাজের, কিন্তু এর জীবনযাত্রা নীতিশুদ্ধ নয়। ঠিক বারবনিতা না হলেও বারবিলাসিনী। এ ধরনের মেয়ে নোংরা ঘাঁটে না, পাঁকে পা দেয় না, এবং পুরুষের কামাসক্তির সঠিক উপকরণও নয়। এদেরকে 'সোসায়েটি গার্ল', বললে বোধহয় অনেকটা মানায়।

মেয়েটি পেশাদার নর্তকী নয়, এবং আমিও নৃত্যকলাবিশারদ্ নই। তবু আমার বিশ্বাস মেয়েটি নাচতে জানে। বচ্চিন্দরের কথা ছেড়ে দিই, তার অন্তস্তন্ত্রের বাঁধন গেছে আলগা হয়ে। সে বেহুঁশের মতো টলটল করছে এবং মাথা দুলিয়ে তাল দিচ্ছে।

আমার পাথরের ডেলার মতো ঠাণ্ডা চোখ দুটো নর্তকীর সর্বাঙ্গে নড়ে বেড়াচ্ছিল। এই চেহারা, এই রঙ, এই উরুলোক, নাভিতল, এমন বুকের গঠন, কটিতট, গুরুনিতম্ব—আগে আমি দেখিনি। এ যেন এক শ্রেষ্ঠ জীবন্ত চিত্রকলা। এর এই হ্লাদিনী শক্তির মধ্যে যেন সমগ্র অলকাপুরী কাশ্মীরের সমস্ত প্রাকৃত শোভা-সৌন্দর্য কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

মিনিট পনেরো-কুড়ি অবধি বিস্ময়াপ্লুত আমি নিঃসাড় হয়েছিলুম।

নাচের মধ্যেই মেয়েটি গুনগুনিয়ে গান ধরেছিল।

আনুপূর্বিক বর্ণনা থেকে বিরত হচ্ছি। যে ধরনের গান ওর কচি ও মধুর কণ্ঠে শুনলুম, ওতে আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল, বাংলার ভাটিয়ালি এবং রাখালিয়া সুর। বোধ হয় ওর গানের সুরে বহুদূরে বাংলার আকাশ বাতাস, নদী প্রান্তর আমার স্মৃতির মধ্যে ফুঁপিয়ে উঠেছিল সেই অজানা জগতের বিবশা রাত্রে।

অনেক রাত হয়েছিল। বাচ্চিন্দর সিং মাঝখানে একটু বেহুঁশ এবং অসতর্ক হয়ে পড়েছিল। আমি হাসিমুখে ওকে যে একটু আগলিয়ে রাখছিলুম, মেয়েটি সেটি লক্ষ্য করেছিল। এর মধ্যে এক ফাঁকে মেয়েটি ছোট এক গ্লাসে 'রেডওয়াইন' খেয়েছিল, আর কিছু নয়। এবার সে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো নির্ভয়ে আমার পাশে এসে বলল। মিষ্ট প্রশ্ন করল, খুশ হোগৈ?

জী!

হঠাৎ মেয়েটি বলে বসল, তুমি খুব শান্ত।—তারপর মুখের কাছে মুখ তুলে বলল, তোমাকে দেখলে ভয় করে না, বিদেশী তুমি!

হাসিমুখে আমি বললুম, এবার আমি যাই।—আচ্ছা, একটা কথা জানতে চাই। তুমি টাকা নেবে ত?

বিদেশীর মুখ-চোখের মধ্যে মেয়েটি কী যেন নিরীক্ষণ করল। কী ভেবে আমার একখানা হাত একবারটি ধরল, আবার ছেড়ে দিল। হয়ত সে ভাবল, আমি নব্যযুবক বটে, কিন্তু এখনও পুরুষ হয়ে উঠিনি। এ বোধ হয় তারও নতুন অভিজ্ঞতা।

এই পর্যন্তই থাক্। বিদায় নেবার সময় পশমের সেই রক্তনীল জোব্বাটা আমিই মেয়েটার গায়ে জড়িয়ে দিলুম! ওটাই সামাজিক ভদ্রতা। মেয়েটি শুধু বলল, টাকার কথা কেন তুলছিলে? তুমি আমার মেহ্‌মান!

বাচ্চিন্দর সিংকে সেদিন ধরে-ধরে ক্যাম্পে যখন আনলুম, রাত তখন বারোটা বেজে গেছে। আসবার সময় মেয়েটা একটি প্রস্তাব করেছিল, সেটি আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। আমার সাহসের অভাব ছিল। এখানে রাত কাটাতে রাজি নই।

রাত সেদিন অতিশয় ঠাণ্ডা। ক্যাম্পের মধ্যে চারপাইতে শুয়ে কম্বল ঢাকা দিলুম। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লুম, না জেগে রইলুম—এতকাল পরে আর মনে নেই। তবে অর্ধতন্দ্রার মধ্যেই একটা অবাস্তব এবং অপ্রাকৃত স্বপ্নাবেশ আমাকে যেন নিস্পন্দ ও অসাড় করে রেখে দিল। এ কাহিনী যেন আমার রক্তে মিশিয়ে রইল।

ডোগরা সুবেদারের জান্ বড় কঠিন। আমার তৈরি হবার আগেই বাচ্চন্দর সিং তার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে বরামূলায় রিপোর্ট করতে। আমি যখন ক্যাম্প থেকে বিদায় নিয়ে মাধো সিংয়ের ট্রাকে উঠলুম, সকাল তখন আটটা। এ গাড়ি গত-কালেরটা নয়, এখানা একটু ছোট। আমার প্রশ্নের জবাবে মাধো সিং বলল, সড়কমে বহুৎ খত্‌রা হ্যায়—

মাধো সিংয়ের হাজিরা খাতায় যথারীতি আমি গাড়ির নম্বর, তারিখ, সময় ও আমার নাম লিখে দিলুম। তারপর গাড়ি ছাড়ল। আজ আমি 'বুর্জিল গিরিসঙ্কট' অতিক্রম করব কিন্তু তার চড়াই অনেক উঁচু। সুতরাং এই ছোট ভ্যান-এর মতো গাড়ি সেই পথের উপযুক্ত।

আমাদের গতি উত্তরে। দুই ধারে মাঝে মাঝে স্বচ্ছসলিল জলাশয়। মাঝে মাঝে তার জলে লাল পদ্মের সমারোহ। চারিদিকে ঘন পাইনের শোভা যেন আকাশপথে চেয়ে কালের প্রহর গণনা করছে। এখানে-ওখানে এক-এক টুকরো চাষী বস্তি, তারই ফাঁকে ফাঁকে লোমশ ভেড়ারা চরে বেড়াচ্ছে। আমাদের উত্তরের পথ আগলিয়ে রয়েছে দেবশাহীর উত্তুঙ্গ পর্বতমালা গগনচুম্বী প্রাকারের মতো। ওর মধ্যে কোথা দিয়ে 'বুর্জিল সঙ্কট' অতিক্রম করব, আমার জানা নেই। প্রকৃতপক্ষে সর্বব্যাপী চারিধারে এই গহন পার্বত্য ভূভাগ আমার অজানা। আমার আর মনে পড়ে না, সমতল পৃথিবী কোথাও আছে কিনা। পার্বত্য অরণ্য, ভয় ভীষণ গিরিখাদ, সর্পাকৃতি মুখরা ও প্রখরা গিরিনির্ঝরিণী জনশূন্য প্রাণীশূন্য এক একটা ভূভাগ এবং চারিদিকের বিশ্ব-প্রকৃতির নির্বিকার নীরবতা—এরা যেন সম্মিলিতভাবে আমার মধ্যে নিঃশব্দে এক মহাকাব্যের জাল বুনে চলেছে। আমার সমস্ত চেতনার মধ্যে থেকে থেকে যেন বেজে উঠছে জলতরঙ্গের মতো একপ্রকার সঙ্গীত—একমাত্র আমিই যার শ্রোতা। কোথায় যেন সঙ্গোপনে আমার অতৃপ্ত বাসনাগুলিকে একে একে সাফল্যমণ্ডিত করছে চারিদিকের এই হিমালয়। যতদূরে চোখ যায়,অপরিসীম অচঞ্চল স্থিরতা, আমি কেবল সেই নিত্য-স্থিরের মাঝখানে চঞ্চল উদ্দাম অস্থির। আমি যেন এই বিশ্বব্রহ্মলোকের থেকে বিচ্ছিন্ন একবিন্দু প্রাণ—যে-প্রাণ প্রতি ফুলে-ফলে-ফসলে গিরিশিরে গুহাগর্ভে জলাশয়ে গিরিনির্ঝরে অরণ্য-বিটপীর রহস্যরন্ধ্রে—ঠিক যেন রঙ্গীন প্রজাপতির মতো ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে।

দীর্ঘবিস্তৃত চড়াই ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে 'বুর্জিল সংকট' অতিক্রম করল। মাধো সিং হাসছিল তার আপন কৃতিত্বে। আমার সামনে আকাশ স্পর্শ করে রয়েছে দেব-শাহী গিরিমালা, অন্যদিকে দানবাকার 'নাঙ্গা'। ছাংলাগাল্লির চড়াইপথ থেকে যে তৃণলতাশূন্য নাঙ্গাকে প্রস্তরতুষার স্তূপ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না, এবার কাছে এসে দেখছি সে যেন উলঙ্গ ফকির! শুধু পাথর, এবং সেই গগনস্পর্শী পাথরের স্তূপের একমাত্র বর্ণ হল ফলসার মতো ফিকে বেগুনী। আমরা দেবশাহী ও নাঙ্গার মধ্যলোকের নালী-উপত্যকা ধ'রে যাচ্ছিলুম প্রচণ্ড ঠাণ্ডার ভিতর দিয়ে।

বিশ্বলোকের সেই বিস্ময় আজও আমার চোখে লেগে রয়েছে। তবু সেই বিস্ময়ের

মধ্যে আমার ভয় নিহিত ছিল। আমার অস্তিত্বের শিকড় উপড়িয়ে হিঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে যেন সম্মোহনী মায়া—কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমি জানিনে। গত রাত্রির কথা ভাবছিলমে। বচ্চিন্দর সিং-এর কাছে শুনেছিলুম মেয়েটার নাম বুঝি 'শমরু'। তা হবে। শমরুর মানে জানিনে! কিন্তু অপরূপ সেই লাবণ্যময়ীর আনগ্ন দেহশ্রী যেন ছড়িয়ে রয়েছে আমার চোখের সামনে। কাশ্মীরের অরণ্যে, প্রজাপতি-পতঙ্গভরা উপত্যকায়, গিরিনির্ঝরিণীর শোভায়, অগণিত সংখ্যক পুষ্পমালঞ্চের সৌন্দর্যে মেয়েটার সেই যৌবনশ্রী সর্বত্রই যেন বিস্ফারিত রয়েছে। সে যাই হোক, এটি ভুলতে পারছিনে, 'রেড ওয়াইন' অনেকটা খেয়ে সম্ভবত মেয়েটা একটু মাত্রাবোধ হারিয়ে ফেলেছিল। ফলে, সে ঠিক বুঝতে পারেনি শ্লীলতার সীমা সে লঙ্ঘন করছিল কিনা। কিছুক্ষণের জন্য বেহুঁশ নাচের মধ্যে সে ভুলে গিয়েছিল সে মেয়ে! বচ্চিন্দর তখন অনড় হয়ে কুশনের ওপর কাৎ হয়ে পড়েছিল এবং আমি প্রমাদ গুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলুম!

তখনও সেই বয়সে ঠিক বুঝিনি, শ্লথচরিত্রা নারী নিষ্ক্রিয় পুরুষের সামনে কিছু সতর্ক হয় কিনা। অশান্তদেরকে নিয়েই তার জীবন, সম্ভবত সেই কারণে আমাকে বলল, 'তুমি শান্ত! তা হবে! আগ্নেয়গিরি যতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে, ততক্ষণ পারিপার্শ্বিক মানব-সমাজ নিরাপদ! আমার তারুণ্যের ঘুম নাই বা ভাঙ্গল! অকালে জ্ঞাতাস্বাদ নাই বা হলুম! নিষিদ্ধ ফল গাছেই ঝুলে থাক না কেন।

ভালবাসা শব্দটি একটি সাধারণ সংজ্ঞা মাত্র। ও-শব্দটার ধার ক্ষয়ে গেছে বহুকাল আগে। প্রেম শব্দটাও বহুচলনের ফলে নিজের অর্থ হারিয়েছে। যৌবনের প্রারম্ভ বা প্রথম তারুণ্যের কাল প্রণয়ের কাল হতে পারে, কিন্তু প্রেমের নয়! প্রকৃতির নিয়মে জৈবিক আকর্ষণ-বিকর্ষণে চোখের জল, ব্যথা-বেদনা, হর্ষ-কম্প-পুলক, নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস, বিনিদ্রা ও দিবাস্বপ্ন—এগুলি ওই জৈব আকর্ষণেরই সঙ্কেত, প্রেমের সঙ্গে এদের কোনও যোগ নেই। প্রণয়কালে যে আকর্ষণে চোখের জল নির্গত হয় সেই একই কারণে প্রণয়ের পাত্র বা পাত্রীর অন্ত্রেতন্ত্রে লালারস নিঃসৃত হয়! প্রাকৃতিক তাড়নায় বা জৈব আকর্ষণে চুম্বন, আলিঙ্গন, দেহ নিপীড়ন—এগুলিতে প্রণয় আছে, কিন্তু প্রেম সেখানে দূরে দাঁড়িয়ে হাসে! শমরু প্রস্তাব করল, তার শয়নকক্ষে বসে রাতটা যেন আমি 'কিসসা-কহানী' করে কাটিয়ে যাই—ওটা তার ভ্রান্ত বুদ্ধি। আনগ্ন নর্তকীর শিথিল দেহবল্লরীকে সামনে রেখে যে তরুণ-পুরুষ সারারাত ধরে শুধু গল্প-গুজব করে যায়, সে নপুংসক। এ কথা শমরুও জানে।

মাধো সিংয়ের গাড়ি 'দাস' জনপদ বহুদূরে পিছনে রেখে 'আসটোরে' এসে পৌঁছল। আমি তখন ক্ষুধার্ত বটে, কিন্তু ঠাণ্ডায় কাঁপছি। পশমের টুপি কানের ওপর আরও টেনে দিলুম। কিন্তু আসটোরের ছোট মণ্ডি ছাড়িয়ে মাধো সিং আবার গহন পার্বত্যলোকের দিকে চলল, এবং এক সময় ঘুরে ঘুরে উৎরাই-পথে ঘণ্টা দেড়েক বাদে সিন্ধুনদের তীরে 'বুনজি' জনপদে এসে দাঁড়াল।

আকাশে মেঘ করে হাওয়া দিয়েছে। এবার নাঙ্গা ও দেবশাহীর উত্তরপ্রান্তে কারাকোরাম গিরিশ্রেণী যেন সামনে আরও এগিয়ে এসেছে। বরফানি বাতাসের

থেকে আত্মরক্ষার জন্য মাধো সিংয়ের সঙ্গে একখানা চালাঘরে গিয়ে উঠলুম। ঘরখানা কাঁচা পাইনের গুঁড়ি আর পাথরের চাংড়া দিয়ে তৈরি। ভিতরটায় বন্য কাশ্মীরী কাঠের গন্ধ।

সিন্ধুনদের পুল পেরিয়ে আরও চল্লিশ মাইল। এখন বেলা দেড়টা। প্রথমেই মাধো সিং গোটাচারেক পীয়র কোথা থেকে এনে আমার হাতে দিয়ে যাবার সময় বলে গেল, খাবার ব্যবস্থা হচ্ছে, এখানে অপেক্ষা করুন।

চার-পাঁচজন লোক কম্বল জড়িয়ে এসে ঢুকল। এদের অনেকটা চিনি—এরা 'দার্দ' বা 'বল্‌বা' নয়। এরা বালতিস্তানী। মুখের চেহারায় মাঙ্গোলীয় ধাঁচ। আমি এদের প্রাদেশিক 'বোলি' এক বর্ণও বুঝিনে। এখানে বৌদ্ধ ও মুসলমান এক সঙ্গে মিলিয়ে থাকে। নামে মুসলমান, ধর্মে বৌদ্ধ—এমন মানুষ অসংখ্য। এখানে এমন বহু মেয়ে আছে, যাদের প্রত্যেকের তিন-চার জন স্বামী! কিন্তু উপজাতীয় পাঠানদের মতো মেয়ে নিয়ে কাড়াকাড়ি বা খুন-জখম নেই।

শুঁটকো সিদ্ধ মাংস ও চাপাটি নিয়ে এল মাধো সিং। গরম বটে, তবে মাংসের গন্ধটা কিছু আপত্তিজনক। কিন্তু মানুষ বা বনমানুষ যা খায়, আমিও তাই খাই। মাংসটা তেমন সিদ্ধ হয় নি, তবে আমার দাঁতের ধারও কম নয়। যদি ঠাণ্ডা জল মুখে দেবার সাহস থাকে তবে যাও হুনজানদীর পাঁতায়, ওখানে পাবে বরফ-গলা জল। যদি তেষ্টা পায়, পীয়র চিবোও—ওতেই কাজ হবে। যদি খেয়ে উঠে হাত ধোওয়ার দরকার হয় তবে রুমাল বার কর, নয়ত কম্বলে হাত মোছ! পাহাড়ে ওসব নিন্দনীয় নয়।

তবে সেদিন বিদায় নেবার আগে মাধো সিং কলাইয়ের মগে ফুটন্ত 'ঘোলা জল' এনে দিয়েছিল! ওটায় চিনি না থাক, কাঁচা চায়ের পাতা ওর মধ্যে ছিল। আমি ওর অনেকটা খেলুম, বাকিটুকুতে মুখ হাত ধুয়ে নিলুম!

সেদিনের শীতার্ত ধূসর গোধূলিকালে গিয়ে পেঁছিলুম গিলগিটে। এটা মহারাজার এলাকা বটে, কিন্তু সে নামে মাত্র। এদিকের সমস্ত ভূখণ্ডটাই বৃটেনের কঠোর শাসনে নিয়ন্ত্রিত। তাই ওটার নাম দিয়েছে 'গিলগিট এজেন্সি'। আমি যেহেতু নর্দার্ন কমাণ্ডের লোক, সেইহেতু আমার মতো মেনি বিড়ালের জায়গাও এখানে মিলবে। এখানকার যে বিশাল পাথরের দুর্গ উত্তরোত্তর কাশ্মীরে পাহারায় নিযুক্ত রয়েছে, আমাদের কাগজপত্র উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়ে তারই মধ্যে প্রবেশ করলুম।

এখানে আমার জন্য একটি ছোট ক্যাম্পের অ্যান্টি রুম আগে থেকে নির্দিষ্ট ছিল।

এটা তখন ভারত ঠিক নয়, এবং এটা প্রকৃত অর্থে ঠিক বোধ হয় কাশ্মীরও নয়—কিন্তু এটা মহারাজারই এলাকা। সেই অর্থে এটি ভারতেরই অঙ্গ। তবু সেটি নামে মাত্র। সমতল ভারত থেকে কেউ কখনও আসে না এদিকে। ইংরেজ কারোকে আসতেও দেয় না। পর্যটক যদি ইংরেজ হয়, তবেই সে ছাড়পত্রাদি দেখিয়ে আসতে পারে। বালুচিস্তানের মতো এটাও একটা এজেন্সি। এখানে অন্যপ্রকার প্রশাসন-ব্যবস্থা, অন্য ধরনের বিধিনিষেধ। এখানে বিচারশালা বা আদালত, পুলিস বা

সমাজরক্ষী—এসব নেই। এখানে ইংরেজের সুকঠোর নিয়ন্ত্রণ সর্বত্র ও সজাগ। এই এলাকার একদিকে সমস্ত উত্তর ভূভাগ জুড়ে রয়েছে তুষারশুভ্র কারাকোরাম তার অগণ্য হিমবাহ নিয়ে, অন্যদিকে হিন্দুকুশের ক্রোড় গিরিলোক—তার নাম হিন্দুরাজ পর্বত-মালা। এই দুই গিরিশ্রেণী—যার নিম্নভূমিতে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি—এরা দুদিক থেকে সাঁড়াশির মতো একটি ফ্রেম নিয়ে ভারতের উত্তর সীমানা নির্দেশ করছে। এখানকার স্থানীয় শাসক বা চীফটেন্সরা ভারত ভূখণ্ডকে বলে 'ইন্দস্তান'।

কিন্তু সিন্ধুনদ পার হলেই মনে হয় ভারতকে পিছনে ফেলে এলুম। এ যেন এসে পড়েছি মধ্য এশিয়ার কোনও বিজন ভীষণ গহন পার্বত্যলোকে। এখানে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের সব চিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেছে। শুধু চারিদিক থেকে নামহারা ও পরিচয়হারা তুষার নদীরা নেমে এসেছে উপত্যকা-পথে।

ইংরেজের বিমানসজ্জা তখন অনুন্নত। বেতার নেই, রেডিয়োগ্রাম, টেলিপ্রিন্টার বা টেলেক্স তখন স্বপ্নবৎ। ফলে, সংবাদ আনাগোনা তখন সমস্যাজর্জরিত। তখন একমাত্র উপায় ছিল টেলিফোন ও টেলিগ্রাম। এই সব কারণে দিল্লী, গিলগিট ও রাওয়ালপিণ্ডির মধ্যে নিস্তব্ধ বিধিব্যবস্থা দেখতে পাচ্ছিলুম। আমি পল্টনদপ্তরের লোক হওয়া সত্ত্বেও গিলগিট দুর্গের বহু অংশ আমাকে দেখতে দেওয়া হয় নি। এর ভিতরকার বৃহৎ বারুদখানা, তোপখানা, বিভিন্ন অস্ত্রশালা, বড় বড় আর্টিলারি কামান, এগুলি সদাসর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকে। ইংরেজ তখন বিশ্বাস করে না আফগানিস্তানকে বা বলশেভিক পার্টির নবগঠিত সোভিয়েট ইউনিয়নকে,—যাদের বিরুদ্ধে অকারণে ইংরেজ শত্রুতা করে যাচ্ছে! এ ছাড়া ইংরেজ কাশ্মীরের মহারাজার সঙ্গেও কথায় কথায় খিটিমিটি বাধিয়ে তোলে। ডোগরা সৈন্যদলকে ইংরেজ এখানে অনেকটাই অকর্জিলিয়ারী করে রেখেছে—হুকুম ছাড়া তারা বন্দুক ধরবে না। এবং ইংরেজ চায় ডোগরাদের ভিতর থেকে কাশ্মীরী ও পাঞ্জাবীদেরকে পৃথক করে রাখতে।

ঘুরে ঘুরে আমি এক হাবিলদারকে সঙ্গে নিয়ে দেখে বেড়াচ্ছিলুম। আমার ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। গতকাল এখান থেকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি মারী পাহাড়ে সর্দারজীর কাছে। যানবাহনের জন্য আমি অপেক্ষা করছিলুম। সকালে গিয়ে এখানকার ট্র্যান্সপোর্টের কর্তা মেজর ম্যাক্লিয়োডকে আমার কাগজপত্র দেখিয়ে আমার পরিস্থিতি জানিয়ে এসেছি। মুশকিল ছিল এই, আমি দুর্গসীমানার বাইরে কোথাও যেতে পারিনে, এবং একটিমাত্র ওয়াচটাওয়ারে উঠে কয়েক মিনিটের জন্য চারিদিকের দৃশ্য দেখে নিতে পারি। তবে হাবিলদার সঙ্গে থাকবে।

তাই সই। আমার বালকোচিত কৌতূহল চিরকালের। কোথায় কী আছে, আমার দেখা দরকার। সমস্তটা আমি যেন গিলে খাচ্ছিলুম। প্রতিটি মুহূর্ত আমার উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু পাছে কেউ আমার এই উদ্দীপনাকে ভুল বোঝে বা সন্দেহ করে, এজন্য আমি সতর্ক ছিলুম। এ দুর্গের সমস্তটাই পাথর ও সিমেন্টের কাজ। পলস্তারা কোথাও নেই। উদ্দেশ্য ছিল এই, ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ বা

উপনিবেশবাদ চিরদিন যেন পাথরের মতো কঠিন ও দুর্ভেদ্য থাকে। যাই হোক, উঁচু-উঁচু পাথরের সিঁড়ি ধরে সেদিন অনেক উঁচু ওয়াচ-টাওয়ারে উঠেছিলুম।

সুন্দর দৃশ্য চারিদিকে। কিন্তু এ আকাশ, এ দিগন্ত অজানা। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলুম, ভারত আর আফগানের সীমানা, সামনের গিরিলোকের ঠিক ওপারে সোভিয়েট ইউনিয়ন, ডানদিকে সিন্‌কিয়াং—যার ভিন্ন নাম তাকলামাকান। এখান থেকে কারাকোরাম অতি নিকটে দেখা যায়। আমার ঠিক দক্ষিণে এখন বিরাট নাঙ্গার শীর্ষলোক। নিচের দিকে অদূরে দুটি তুষারগলা নীলবর্ণ নদী এসে মিলেছে। একটি বেরোচ্ছে কারাকোরামের পশ্চিম এলাকা হুন্‌জা-মুলুকের হিমবাহ থেকে, অন্য নদীটি উত্তর-পশ্চিমের হিন্দুরাজ পর্বতমালা ভেদ করে। হাবিলদার একে একে সব আমাকে দেখাচ্ছিল এবার আমাকে বলল, তোমাকে হিন্দুরাজ পাহাড়ের ভিতর দিয়ে ফিরতে হবে।

যতদূর দৃষ্টি যাচ্ছে তৃণলতাশূন্য সে পৃথিবী। পাহাড়গুলি যেন নগ্নকায়, অরণ্যের অঙ্গসজ্জা নেই তাদের গায়ে। শুধু ছোট বড় নদী এসে মিলছে এখানে ওখানে। আর মাসখানেকের মধ্যে সব নদী জমে গিয়ে তুষার-শয্যা পাতবে।

নেমে এলুম পনেরো মিনিটের মধ্যে।

অপরাহ্ণের দিকে সেদিন আমার পারমিট্ এল। আগামী কাল প্রাতরাশের পর আমি গিলগিট ত্যাগ করে যাব। আমার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। গিলগিট থেকে বেরিয়ে উত্তর পথে কারাকোরামের প্রান্তে 'মিন্‌তাকা' সঙ্কট পেরিয়ে সিন্‌কিয়াং দেখে আসি। কিন্তু ভিন্ন রাষ্ট্রে যাবার অনুমতি ভারতীয়দের পক্ষে নেই। ওর জন্য রয়েছে লাদাখের উত্তরে সেই কারাকোরাম গিরিসঙ্কট। সুতরাং আমাকে 'মাস্তুজ ও চিত্রল' হয়েই ফিরতে হবে। আমি তখন হুকুমের ক্রীতদাস।

মিলিটারি 'কার' আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল। ভিতরে একজন ছিল কোম্পানি-কমাণ্ডার ইংরেজ সেনা, একজন ইংরেজ মেজর ও তৃতীয় জন সুবেদার মেজর। তিনিই গাড়ি চালাচ্ছেন। তাঁর পাশে আমি আড়ষ্ট হয়ে বসেছি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু পার্বত্য পথ। কোথাও উপত্যকা, কোথাও বা গিরি-গর্ভলোক। আমি আড়ষ্ট বটে, কিন্তু মনে ফূর্তি ছিল। আজ সকালে প্রাতরাশে পেয়েছি ফুটন্ত দুধ, কর্নফ্লেক, চিনি, মাখন, হাফ পাউণ্ড পাউরুটি, চারটে সিদ্ধ ডিম, দুখানা মাংসের বড়া এবং এক কেট্‌লি ফুটন্ত চা। একে বলে হেভি ব্রেকফাস্ট। পারমিট্ পাওয়া মানে সমস্ত সুবিধাগুলো মিলিয়ে পাওয়া। এখন আর কথায়-কথায় সেলাম ঠোকা নয়, এখন হ্যাণ্ডশেক। আমার নিজের ব্যক্তি-মূল্য কম, পারমিটের মূল্য অনেক বেশি। আমি এখন অফিসার্স র‍্যাঙ্কে আমার গোঁফ থাকলে চুমরিয়ে নিতুম!

একে একে শেরকিল্লা, গুপিস হয়ে তেরুপাহাড় পার হচ্ছিলুম। হুন্‌জা মুলুকের পরে এটা ইয়াসিন ও ইস্কুমান রাজ্যের দক্ষিণ সীমানা,—যাদের নাম 'আমীর' এলাকা। ওরা ইংরেজের আধিপত্য স্বীকার করে না,—খুন-খারাপি বেধে ওঠে কথায় কথায়।

তেরু পার হয়ে গেলে কাশ্মীর শেষ, তখন আসে চিত্রল রাজ্য। আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল সর্বোচ্চ হিন্দুরাজশৃঙ্গ তিরিচ-মির। গাড়ি এসে পৌঁছল ইয়ারখুন নদীর তীরে 'মাস্তুজের' জনপদে। এটা সোয়াৎ-কোহিস্তানের অন্তর্গত শ্বেতবর্ণ পাঠানদের মুলুক। এরই সঙ্গে কাফিরিস্তান সংযুক্ত—যারা শুধু আর্যজাতিভুক্ত হয়েই রয়ে গেছে। শুনেছি ওদের সঙ্গে ভারতের সর্বশেষ সংযোগ ঘটেছিল সম্রাট পৃথ্বীরাজের আমলে। দিল্লীকে ওরা নজরানা দিয়েছিল।

মাস্তুজ থেকে চিত্রল বোধ হয় সত্তর মাইল। রাজধানী 'চিত্রল' আমীরের অধীনে। কিন্তু ওরা কাশ্মীরকে নজরানা দেয়। চিত্রল কাশ্মীরের মতো প্রাকৃতিক শোভা সম্পদে সমৃদ্ধ। এসব অঞ্চলের সবিস্তার বর্ণনা 'উত্তর হিমালয় চরিত'-গ্রন্থে সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

'চিত্রল' আমাকে সেদিন মুগ্ধ করেছিল। তারপর 'দ্রস' থেকে 'দির' এবং সেখান থেকে হাজারার ভিতর দিয়ে মালাকান্দ,—যেটি বন্যপ্রকৃতি পাঠানদের কেন্দ্র। সাহেব কমাণ্ডার বললেন, এখানে দাঁড়াবার দরকার নেই।

তাঁর নির্দেশের অর্থ আমাদের কাছে পরিষ্কার। সাহেবরা এদেরকে বিশ্বাস করে না।

মর্দানে এসে সেদিন অপরাহ্ণে অফিসার্স ক্যাম্পে লেট-লাঞ্চ করা গেল। চাপাটি, গোস্ত, আলু-পিঁয়াজ সব্জি আর চা। ডালের বদলে ঘিয়ে ডুবিয়ে রুটি খাওয়াতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। শেষকালে এক থালা আঙ্গুর চিবিয়ে উঠে যাওয়া।

অল্প কথায় বলছি বটে, কিন্তু সেই সকাল সাড়ে সাতটার কঠিন ঠাণ্ডার ভিতর দিয়ে এখন পর্যন্ত শত শত মাইল চলে এসেছি। বড় বড় উপত্যকা যখন পার হচ্ছিলুম তখন ঘণ্টায় ষাট থেকে সত্তর মাইল আমাদের গাড়ির গতিবেগ ছিল। আর এক কথা, যদিও আমাদের গাড়িতে দুটো রাইফেল ও দুটো পিস্তল ছিল, তবুও ইংরেজ কমাণ্ডারকে সঙ্গে নিয়ে চলা যথেষ্ট নিরাপদ মনে হয়নি। সীমান্তের পাঠানরা কোনও কালেই ইংরেজের সুহৃদ নয়।

আমাকে যখন ওরা তক্ষশীলার উপর দিয়ে এসে রাওয়ালপিণ্ডির ওয়েষ্টরীজে গোরা ছাউনির কাছে নামাল, বেলা তখন চারটে বেজে গেছে। আমি একখানা টাঙ্গা নিয়ে 'সিটির' দিকে চললুম।

'সিটিতে' পেঁছেই বাজার ছাড়িয়ে এসে বাস-ষ্ট্যাণ্ড। আমার ঝোলাটা নিয়ে উঠে বসলুম। এখানে এখনও গরম, রাতটা হয়ত একটু ঠাণ্ডা হয়। এখন আমার সব চেনা, সমস্ত জানা। ভাষা শিখেছি, তর্ক শিখেছি, পথঘাট চিনেছি, এখন রাওয়ালপিণ্ডি আমার মুঠোর মধ্যে। বাবু মহল্লা, কালীবাড়ি, শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, আশে-পাশে অলিগলি, গাঙ্গুলী আর ভটচার্যিদের বাসা, বাঙ্গালীদের পাড়া, পূর্বোক্ত বাবুমহল্লায় ডাঃ সেনের বাড়ি,—এসব আমার নখদর্পণে। ওঁরা সব বলে রেখেছেন এবার দুর্গাপুজোর কালীবাড়ি স্টেজে যে-থিয়েটার হবে, সেখানে আমাকে 'হিরোর' পার্ট দেবেন। শ্রীমান বটকেষ্টর ভয়ানক উৎসাহ এ বিষয়ে। তার ধারণা বাঙ্গালী

সমাজে আমার মতন 'ফিগার' কারও নেই। ওর বউদিদির ঘরে আমাদের ক্যারম্‌ খেলার আড্ডা বসে যেত। এখন আমি হিরো। আমার উচ্চতা পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি। আমি এবার থেকে হিরো! জীবন-নাটকে এবার থেকে হিরোর পার্টে নামব। 'নকল পাঞ্জাবী'র লেখক উপেনবাবু তখন থাকতেন পিণ্ডিতে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, হিরোর পার্টে মানাবে!

'সানি ব্যাঙ্ক' হয়ে মারী পাহাড়ে পেঁছে যখন কাঁধের ঝোলাটা নিয়ে নামলুম, সন্ধ্যা তখন সাতটা। সন্ধ্যা বটে, তবে আলো জ্বলে নি, সূর্য অস্ত যায় নি এখনও। বাংলোগুলির উত্তুঙ্গ শীর্ষে সূর্যরশ্মি রয়েছে। দূরে আমার নিত্য সহচর সেই নাঙ্গার চূড়া—যার অরণ্যজটার চিহ্নমাত্র নেই।

'সিমেট্রিওয়ে' ধরে কতকটা উৎরাই পথে নেমে এসে বাঁ-হাতি আমার বাংলোর বারান্দায় উঠলুম। হঠাৎ দেখি সামনে দু'জন অপরিচিত বাঙ্গালী ভদ্রলোক সাহেবী পোশাকে উপস্থিত। একজন বসে গড়গড়া টানছেন, অন্যজন পায়চারি করছেন। আমাকে দেখে গড়গড়ার ভদ্রলোক ঈষৎ কাঠিন্যের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, 'হু আর ইউ?'

সন্দেহ নেই, লোকটা দাম্ভিক। বললুম, আপনি কে?

আমার প্রশ্নে স্পর্ধা ছিল। তিনি রুষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'অ্যাম রায় সাহেব এন-সি-গুপ্তা! তুমি কে?'

'ইয়োর মোস্ট ওবিডিয়েণ্ট সার্ভেণ্ট!'—সবিনয়ে বললুম।

পায়চারি করা ভদ্রলোক থমকিয়ে গেলেন। বললেন, আমি ভি-এন-দাস। এখানে ইনসমনিয়া সারাতে এসেছি। মিঃ গুপ্ত আমার বিশেষ বন্ধু।

রায়সাহেব গড়গড়া টেনে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'অ্যাণ্ড আর ইউ এ কংগ্রেস-স্কাউনড্রেল?'

প্রায় এক মাস বাদে ফিরে এ ধরনের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলুম না! অতঃপর জানলুম, রায়সাহেব নর্দার্ন কমাণ্ডের পল্টন দপ্তরে কাজ করেছেন সুদীর্ঘকাল। এখন তিনি খেতাবধারী এবং পেনসনভোগী। ইংরেজ গর্ভর্নমেণ্টকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন। সেই কারণেই জাতীয় কংগ্রেস তাঁর কাছে ঘৃণ্য। দেখে মনে হল উনি যেন আমার মাতুলের এক অপভ্রংশ। কিন্তু তোষামোদে আমার হাত পাকা! রাত্রে অতি যত্নে আমি তাঁকে এক ছিলিম তামাক সেজে খাইয়েছিলুম। পরে শুনলুম, রায়সাহেব এখানকার মিঃ গুপ্তের দাদা। এই বাংলো ওঁরই ভাড়া নেওয়া ছিল।

॥ ২২ ॥

তখন আমার যৌবননিকুঞ্জে যে-পাখিটি কর্কশ কণ্ঠে ডাক দিচ্ছিল সেটি হ'ল পেখম-খোলা ময়ূর। বাইরে তার বর্ণের বাহার, নাচনে তার যৌবনছন্দ, কিন্তু তার দীর্ঘ-

দীর্ণ কণ্ঠরব বনভূমিকে যেন কাঁপিয়ে তুলিতে চায়।

এ আর তোমার ঋতুরাজ বসন্ত নয় যে, বাসন্তী উত্তরীয় উড়িয়ে ফুলে-ফুলে তার সুগন্ধ ছড়িয়ে কোমল-গান্ধারে এগিয়ে আসছে। না, এ অন্য যৌবন। এ যেন দূরে পথ ধরে ছুটে আসছে এক দুর্জয় অশ্বারোহী তার জয়কেতন উড়িয়ে,—পথের ধুলোয় আর ধূসরতায় তাকে ভাল চেনা যাচ্ছে না। তার কোষমুক্ত শাণিত তরবারি প্রখর রৌদ্রে ক্ষণে ক্ষণে ঝলকে ঝলকে ঝলসিয়ে উঠছে। ওকে দেখলে দুর্ভাবনা আসে মনে। ও যেন 'আসে নির্দয় নবযৌবন ভাঙনের মহারথে'!

আমি যেন কস্তুরীমৃগের মতো শিউরে সচেতন হয়ে উঠি আপন যৌবন-গন্ধে! প্রবল পরাক্রান্ত দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য এক দয়াহীন দস্যু যেন আমার সমস্ত বাঁধন ভেঙে দিতে আসছে! আমার যৌবনের প্রাচুর্য ও প্রবলতা লক্ষ্য ক'রে আমি নিজেই আতঙ্কিত হচ্ছিলুম।

আমার অদৃশ্য নিয়তি মস্ত একখানা হাত দিয়ে আমার পুরনো জীবনটাকে যেন মুছে দিয়েছে। এখন আমি নতুন, আমি সতেজ। সামাজিক বা নৈতিক অপরাধ যদি কিছু করে থাকি, সে সাময়িক প্রবৃত্তি বশত—সে আমার মনে নেই। আমাকে স্পর্শ করে না কিছু, আমার প্রবহমান জলস্রোতে কোনও দাগ পড়ে না। আমার জীবনের দণ্ডে দণ্ডে বিপ্লব-বিবর্তনকে দরকার। তাই আমি সাংঘাতিক ভাবেই নতুন। পেখম-খোলা ময়ূরের কর্কশ ও রূক্ষ কেকারব উঠেছে আমার যৌবন-প্রান্তরে।

প্রায় একমাস পরে আবার আপিসে জয়েন্ করেছি। প্রথম দিনটা ছিল কর-মর্দনের পালা। আমার সেক্‌শন্ থেকে আমিই গিয়েছিলুম একা। লেখরাজ, জগদীশচন্দর, আজিজ আহমেদ বা রূপলাল,—ওঁরা সব গৃহস্থ, ঘরকুনো জীব, বউদের আঁচলধরা। গত মাসের ম্যানুভারিংয়ে আমার যান্ত্রিক যানবাহন প্রভৃতির বিন্যাসে আমার যোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এ ছাড়া রিলিফের কাজে আমার অশ্রান্ত অধ্যবসায় এবং কো-অর্ডিনেশনে আমার সর্বাঙ্গীণ তৎপরতা—এ সম্পর্কে ভালো রিপোর্ট এসেছে। চন্দনওয়ারি ও পহলগাঁও ক্যাম্পে আমি যে ডাক্তারদের সহচররূপে চারদিন দিবারাত্র আহত মেয়ে-পুরুষদের সেবা-শুশ্রূষায় লিপ্ত ছিলুম,—এজন্য সার্টিফিকেট পাঠিয়েছেন মিলিটারি আই-এম-এস। এর পর এল অন্য কথা। ইংরেজ সামরিক বিভাগের শৌর্য ও গৌরব না দেখে আমার মতন সৈনিক-কেরানী কেনই বা ফিরে যাবে? আমি ত বৃটিশ ভারত মিলিটারি সার্ভিসে আত্মনিবেদিত প্রাণ! আমি বুক ফুলিয়ে বলতে পারি, আমার মতন লয়াল্ কর্মী আছে কি কেউ এই কো-মারী বা মারী পাহাড়ে? আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মীরা ত কেবলমাত্র চাকুরিজীবী! কিন্তু আমি? হই না কেন আমি কনিষ্ঠ কেরানী টাইপিস্ট—আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার ভবিষ্যৎ নির্ণয় করব। যে কোনও মুহূর্তে আরেকবার আফগান সীমান্ত সংঘর্ষে আমি গিয়ে লড়াইয়ে নামব! প্রাণ দিতে আমার কতটুকু সময় লাগে?

কিন্তু তোমার বাড়ির লোকে কাঁদবে না?—সর্দার মোতি সিং হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন।

গুডনেস্।—আমি সোৎসাহে বললুম, বাড়ির লোক চিরকাল ধরে কাঁদে, সর্দারজী। মা কাঁদে, বোন কাঁদে—সবাই কাঁদে। কিন্তু আমি সৈনিক হয়ে এখানে এসেছি, আপনাদের 'বন্ডে' সই করেছি চোখ বুজে। যতদিন আমি সৈনিক, ততদিন আমি নির্ভয়।

টিফিনের সময় হাসি-পরিহাসের আসর বসেছিল। রূপলালজী বললেন, তুমি মারা গেলে তোমার মালপত্র বা টাকাকড়ি কে পাবে?

আমি হেসে উঠলুম।—কেন, তার আগে যা-কিছু সব বৃটিশ গভর্নমেন্টকে দিয়ে যাব উইল ক'রে! আমার শতরঞ্চি, কম্বল, বালিশ, আমার টিনের বাক্সটা, পোশাক-পরিচ্ছদ—যা কিছু সব। আর টাকাকড়ি? আমাদের চাকর বিশুনলাল কিছুতেই আমার খোলা বাক্স থেকে হাত-সাফাই করতে চায় না। সুতরাং টাকাকড়িও পাবে বৃটিশ গভর্নমেন্ট!

উচ্চরোলে সবাই হেসে উঠল।

জগদীশচন্দর প্রশ্ন করলেন, কিন্তু তোমার মা? তাঁকে কিছু দেবে না?

মা! হঠাৎ যেন বহুকাল পরে বুকের মধ্যে ধাক্কা লাগল। না, মা কিছু চান না! আমি যেন অনেক দূরে কোথায় এই উপ-মহাদেশের পূর্বান্তলোক বাংলায় ছুটে চলে গেলুম সেইক্ষণে। সেখানে আজ বোধ হয় জন্মাষ্টমী। সকল কাজ সেরে বোধ হয় এতক্ষণে মা গঙ্গায় গিয়ে জপে বসেছেন। জননীর সেই প্রিয় দুর্গাস্তব এখানেই যেন শুনতে পাচ্ছিলুম সকল হাসি-তামাসাকে ছাড়িয়ে আমার নিভৃত মনে: অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যেহনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগৃহে ত্বমেকাগতির্দেবী নিস্তার-হেতু নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে—!

নতুন ক'রে আবার আপিসে বসলুম।

গত মাসের মাইনের সঙ্গে যে পরিমাণ ভাতা পেলুম তা আমার পক্ষে সত্যিই অভাবনীয়। টিফিনের সময়ে মা'র নামে বেশ মোটা পরিমাণ টাকা মনি-অর্ডার করলুম। তারপর যা রইল তার থেকে বাসাখরচ দিয়েও যা পুঁজি করলুম, সে টাকা কেমন করে ওড়াবো সে এক সমস্যা। মদভাঙ খেয়ে আর কতটুকু ওড়াতে পারি? তা ছাড়া ওটা একটা মামুলী মনোবৃত্তি, ওতে নতুনত্ব কিছু নেই। আর এক কথা হতে পারে, মেয়েছেলে! কিন্তু সেবার শমরুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে ভাল করে চোখ বুলিয়ে আমার মনে হয়েছিল, মেয়েছেলের শরীরের তিন-চারটি অংশ যে কোনও পুরুষের মনে খানিকটা ঔৎসুক্য জাগায় সন্দেহ নেই, কিন্তু তার জন্য আমার কষ্টার্জিত অর্থের অপচয় কেন? আমার সেই ছোটবেলাকার নাবালিকা বন্ধু, সেই স্বাস্থ্যবতী মেয়ে নন্টু—তার শরীরেও ত ওগুলো স্বল্পপরিণত অবস্থায় ছিল, হয়ত বা এতদিনে তার দেহে নতুন-নতুন চিহ্নগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তা উঠুক, পৃথিবীর সর্বত্র মেয়েদের ওই একই রূপান্তর। মাঝ থেকে আমি খামোকা সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করে তুলি কেন? মেয়েদের ভিতর দিয়ে প্রকৃতি নানা ফাঁদ পেতে রেখেছে, সেই বয়সে এই

ছিল আমার ধারণা।

কয়েকটা সাহেব-সুবোর পাড়া আমি বেড়াবার জন্য বেছে নিয়েছিলুম। ম্যাল-রোডের দুটো সীমান্ত—পিণ্ডি পয়েন্ট আর কাশ্মীর পয়েন্ট আমার কাছে পুরনো হয়ে গিয়েছিল। তাই চলে যেতুম পিনাকল, কনভেণ্ট প্রেস, স্ট্রবেরি, বাঁশরাগলি বা ঘোড়াগলির ওদিকে। একে একে ওদের ছাড়িয়ে যেতুম লরেন্স কলেজ। আমি প্রকৃতিপ্রেমী কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ নই, তবু চারিদিকে পাহাড়ের ওক আর পাইনের ঘন বন আমাকে যেন দূর-দূরান্তরে হিমালয়ের টানে টেনে নিয়ে যেত। আমি কবি শেলীও নই, তবু উড্ডীন পাপিয়ার চকিত মধুর চূর্ণকণ্ঠ আমার বুকের মধ্যে যেন কাঁপন ধরিয়ে দিত। বলা বাহুল্য, অশ্বরক্ষী বরকৎ মিঞার সুন্দর ঘোড়াটা আমার জন্য সংরক্ষিত থাকত। ওটায় চড়ে গেলে আমি নিশ্চিন্ত।

মুয়েরীর মদের ভাটিতে তরুণবয়স্ক এক পাঞ্জাবী দম্পতি চাকরি করত। যুবকটির নাম জনি চৌহান, মেয়েটার নাম রোশন। ওদের ছোট্ট বাগানের বাংলোয় অবসর যাপনের সুবিধা ছিল। কিন্তু জনির মদের মাত্রা বেশি হলে সে কাণ্ডজ্ঞান হারাত। অথচ জনির কণ্ঠে উর্দু গজল শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে যেতুম। ওরা দু'জনেই খৃষ্টান এবং উভয়ের পারিবারিক সম্পর্ক ঠিক বিয়ের পক্ষেও উপযুক্ত নয়! বাড়ি ওদের লাহোরে। কিন্তু ওদের সম্পর্কটা জানাজানি হওয়ার ফলে চার্চের রেভারেণ্ড ওদেব বিয়েতে রাজি হন নি। ওরা চাকরি নিয়ে চলে আসে কো-মারীতে। আমি ওদের জন্য মাঝে মাঝে মাংসের বড়া ভাজিয়ে নিয়ে যেতুম, এবং ওদের কাছে বাংলাদেশের গল্প বলতুম।

আপিসে আমার সতীর্থরা সকলেই আমার চেয়ে বয়সে বড়। কিন্তু ওঁদের মধ্যে আজিজ আহমেদের প্রতি আমি খুবই অনুরক্ত ছিলুম। তিনি শুধু সুদর্শনই নন, তাঁর মতো সুভদ্র, স্নেহশীল, সুশিক্ষিত ও রুচিবান ব্যক্তি খুবই কম দেখেছি। উনি মাঝে মাঝে আমাকে ধরতেন বাংলাদেশের গল্প শোনার জন্য। মাঝে মাঝে ম্যাল-এ দেখতুম, উনি ওঁর বোর্খা-ঢাকা স্ত্রীকে নিয়ে পরিভ্রমণে বেরিয়েছেন। ওঁরাও লাহোরের লোক। লাহোর হ'ল পাঞ্জাবের প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

আজিজ আহমেদের নালিশ ছিল আমি সকলের বাড়িতে যাই, কিন্তু তাঁর এখানে বার বার নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও আমি একবারও যাইনে। এ অন্যায়। আমারও বক্তব্য স্পষ্ট। মারী পাহাড়ে সর্বত্র দেখি বোর্খাপরা মহিলা। যদি কারও বাড়িতে গিয়ে দেখি, বোর্খা ঢাকা মহিলা সামনেও আসেন না, কথাও বলেন না—সেটা হবে আমার পক্ষে বিশেষ সঙ্কোচের কারণ। তাই যাব না।

ধ্যেৎ, ফুলিশ!—আজিজ আহমেদ আমার পিঠে টোকা দিয়ে আমার হাতখানা হিঁচড়িয়ে টেনে বললেন, এখনই তোমাকে যেতে হবে।

দু'দিন খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে পাহাড়ে। গতকাল বড় বড় করোকাপাতের ফলে কয়েকটা লোক জখম হয়েছে। ওটা আমার খেলা ছিল—ওই টেনিস বলের মতো এক একটা শিলা আমি আকাশ থেকে লুফে নিতুম। বৃষ্টির স্থায়িত্ব হ'ত মিনিট পনেরো।

তারপরেই নীলাকাশ, আবার মধুর রৌদ্র। চমৎকার লাগত বৃষ্টি ও রৌদ্রের খেলা।

একটু উৎরাই পথ। সন্ধ্যা তখনও হয় নি। কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। পথ নেমে গিয়ে এক স্থলে ডানহাতি ওঁদের বাংলো। সামনের জানলাগুলোর কাঁচ সব বন্ধ। জানলার নিচে অনেকগুলো ডালিয়া ফুটে রয়েছে। পথ নিরিবিলি।

ভিতরে ঢুকে সামনের ঘরে আমাকে বসিয়ে আহমেদ সাহেব অন্দরমহলে গেলেন। সব জানলা ও দরজায় মোটা রংবাহার পর্দা ঝুলছে। মেঝেতে ভাল কার্পেট পাতা দেওয়ালে কয়েকখানা ছবি—কোনওখানা বিশিষ্ট ব্যক্তির, কোনওখানা বসন্তশোভার, কোনওখানা বা ইরাবতীর তীরে লাহোর নগরী। শেষখানা হ'ল সুদৃশ্য মক্কাতীর্থের ফটো।

আহমেদ সাহেব এবার গরম জোব্বা, সাদা পায়জামা ও মোজাসুদ্ধ চটি পায়ে ফিরে এলেন। প্রায় তাঁর পিছনে পিছনে ভিতর থেকে হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন তাঁর বেগম। আমি উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে নমস্কার জানালুম। ওঁর গায়ে বোর্খা নেই। মহিলা প্রথমেই আমাকে তুমি বলে সম্ভাষণ করলেন তাঁর মধুর কণ্ঠে। উদু ভাষায় বললেন, ম্যালে তোমাকে অনেকবার দেখিছি। আমাদের বোর্খায় যে চোখের সামনে জাল থাকে।

থাকতেই হবে—আমি হেসে বললুম, নইলে ত হোঁচট খাবেন। আজ থেকে আমি আপনাকে 'বউদিদি' বলব।

অতঃপর বউদিদির অর্থটা বুঝিয়ে দিলুম। বাংলাদেশে বড় ভাইয়ের যিনি স্ত্রী, সেই বড় বউদিদি আমাদের চোখে মাতৃতুল্য। আমরা মাতৃজাতির পূজারী, সেইজন্য আমাদের উপাস্য দেবী হলেন—মা! দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, চণ্ডী—সবাই মা! নারীর আদি অন্ত একই রূপ—সে জননী!

বেগম সহাস্যে বললেন, আমি আজ থেকে তোমাকে ছোট ভাই বলব।

মহিলার পরনে ঝলমলে সাটিনের শালোয়ার, মাথায় চুমকি বসানো ফিকে সবুজ ওড়না, গায়ে রক্তনীল বর্ণের মোগল-জ্যাকেট, তার নিচে সাটিনেরই পিরান। পিছন-দিকে মস্ত তাম্রবর্ণ বেণী লম্বিত। হাতের সুন্দর আঙুলগুলি মেহেদীর রঙে রঙীন। ওঁর দুই চোখে সুর্মার রেখা। ওঁর মুখশ্রী আমাকে কতকটা যেন অভিভূত করেছিল। কিন্তু যে-মহিলাকে গুরুস্থানীয়া ব'লে স্বীকার ক'রে নিই, তাঁর দেহসৌন্দর্যের দিকে লক্ষ্য ক'রা আমার রুচিতে বাধে। মহিলার পিত্রালয় হ'ল শেখুপুরায়।

আহমেদ হাসছিলেন। বেগম যতবার চান বাংলাদেশের কথা শুনতে আমি ততই চাই ওঁদের কথা জানতে। বলুন, আপনাদের মধ্যে শ্রেণীবিচার আছে কিনা। কন্যা-দায়ের চেহারা কেমন। ফুলশয্যার নাম কি সোহাগ-কি-রাত, বাঁদি আয়া, দাই আর দাসী—এদের মধ্যে কোথায় কি তফাৎ। শিয়া আর সুন্নির মধ্যে ঝগড়া হয় কিনা, বোর্খা ঢাকা দেবার মূল উদ্দেশ্য কি!—বেগম আমার প্রশ্নগুলি ছাপিয়ে জানতে চাইছিলেন, বাংলাদেশের রাখালরা নাকি বাঁশী বাজায়, নৌকার মাঝিরা নাকি গান গায়, সে দেশে নাকি অনেক রকমের ফল আর সবজি, মাছের নাম নাকি ইলিশ—আরও কত মাছ! তারা নাকি 'কড়ুয়া' তেল দিয়ে রাঁধে। সে দেশে নাকি বড় বড় সাপ আর রয়েল

বেঙ্গল টাইগার। বাঙ্গালী নাকি 'আংরেজকো হটানে চাতে হেঁ!' বাংলাদেশের কোন কোন পাখি নাকি কথা বলে। 'টেগোর' নাকি মহম্মদ ইকবালের মতন 'বয়েদ' লেখেন। সেখানে নাকি থিয়েটার মঞ্চে মেয়েছেলে অভিনয় করে! বিভিন্ন বিচিত্র প্রশ্ন করছিলেন বেগম।

এবার এল গরম-গরম 'সামোসা'-সহ মস্ত এক থালায় ক'রে কিসমিস, আখরোট, রোজবেরি, পিয়ার ও আঙ্গুর। এক বর্ষীয়সী ও সুসজ্জিতা পরিচারিকা দু'হাতে দুটি থালা এনে আমাদের সামনে রেখে গেল।

আহমেদ বললেন, রাত্রে তোমার ভাইকে কী খাওয়াবে, মর্জিনা?

মার্জিনা দেবী হাসিমুখে বললেন, মেরে পর ছোড়, জী!

প্রতিবাদ জানিয়ে বললুম, আমার মেসে যে রান্না হচ্ছে, মিঃ আহমেদ।

আরে, চুপসে বৈঠো ইয়ার—লো সামোসা উঠাও—

না, আমি একা খাব না— আবার প্রতিবাদ জানালুম।

বেগম সহাস্যে যখন তাঁর সরু চুড়িপরা হাত বাড়িয়ে একটি সিঙ্গাড়া তুলে নিলেন, আমি সেই সুন্দর হাতের পেলব লাবণ্য দেখে নর্তকী শমরুর কথা অনেকটা যেন ভুলে গেলুম। যতদিন ধ'রে রয়েছি পাঞ্জাবে অথবা কাশ্মীরে—আমি কোথাও রোগা, কালো কুরূপা, স্বাস্থ্যহীনা—এ ধরনের কোনও মেয়ে দেখি নি! মুখশ্রী হয়ত অনেক সময় ভাল লাগে নি, কিন্তু স্বাস্থ্য ও রংয়ের গৌরব আমাকে মুগ্ধ করত। সর্বাপেক্ষা মূল্যবান খাদ্য এখানে সর্বাপেক্ষা সস্তা। সর্বপ্রকার মেওয়া ও ফল এখানে সাধারণ জলখাবার। দুধ, ঘি, মাংস—এগুলি অনেক নিচের স্তরেও পৌঁছয়। ভিখারীরা পায় ঘি-মাখা মোটা চাপাটি, বাসি রান্না-মাংস, একরাশি আখরোট ইত্যাদি।

মর্জিনা বউদিদি নাকি মস্ত এক জায়গীরদার বংশের মেয়ে—মোগল আমলে ওঁদের কে যেন ছিলেন সুবেদার। বউদিদির দবাজ মন-মেজাজের সঙ্গে আহমেদ সাহেবের মিল ঘটেছে বিদ্যায় ও আভিজাত্যে। আহমেদ দু'বার ইংরেজি ও আরবী সাহিত্যে এম-এ পাস করেছেন। তিনি ধনী পরিবারের সন্তান।

সেদিন আমাদের নৈশভোজের তালিকায় পোলাও, চিকেন, কাবাব ইত্যাদি ছিল। কিন্তু খেতে ব'সে বেগম একটি প্রশ্নে আমাকে বিপন্ন ক'রে তুললেন। তিনি বললেন, জগদীশচন্দরের ভগ্নির সঙ্গে তোমার বিয়ের কথাবার্তা চলছে, একি সত্যি?

আহমেদ হেসে বললেন, ক্যা জবাব, কহিয়ে!

নতমুখে আমি বললুম, জবাব কিছু নেই, কারণ এ নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনে।

মহিলা বললেন, তুমি মরদ ত বটে!

বললুম, মেয়েছেলের ঝুঁকি নেবার মতন মরদ এখনো হই নি, ভাবীজী। তা ছাড়া কি জানেন, আমরা বাঙ্গালী—আমাদের সমাজ, রুচি, অভ্যাস, জীবনযাত্রা, ওঁদের সঙ্গে মিলবে না। আমাদের পরিবারে 'সম্বীতি' হবে বেমানান!

কিন্তু তুমি ত থাকবে নর্দার্ন কমাণ্ডে! তুমি আর সম্বীতি!

আপনারা কি বলতে চান একটি মেয়ের জন্য আমি আমার সবাইকে ছেড়ে বিদেশে

থেকে যাব ?

আহমেদ বললেন, তোমার চাকরিই তোমাকে ছাড়তে বাধ্য করবে! তা ছাড়া তুমি আসবে-যাবে! ছাড়বেই বা কেন? সবাই তোমার থাকবে!

আমি চুপ করে থাচ্ছিলুম।

বোধ হয় স্বামী-স্ত্রী দৃষ্টিবিনিময় করছিলেন। এক সময় আহমেদ সাহেব বললেন, এ নিয়ে আলাপ করব নাকি জগদীশের সঙ্গে ?

এবার আমি হেসে বললুম, মনে হচ্ছে আমি একটা যেন ষড়যন্ত্রে পড়ে গেছি ? শুনুন বউদিদি, আজ এসব কথা থাক। আমার ভবিষ্যতের ছক আমি এখনও তৈরি করি নি। আপাতত আরেকটা কাবাব আমাকে দিন।

কথাটা তখনকার মতো উড়িয়ে দিয়ে সুস্থ বোধ করলুম।

আহারাদির পর সেই রাত্রে বিদায় নেবার কালে মর্জিনা দেবী হঠাৎ জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর ভূমিকায় অবতীর্ণা হলেন। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে আজ আমাদের তিনজনের ভিতরে যে ধরনের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল সেটি খুব সুলভ নয়। সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক, জাতি শ্রেণী সমাজ ধর্ম ও ভাষা—কোনটাই বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। মর্জিনা দেবী আমাকে সস্নেহ তিরস্কার ক'রে বললেন, সুতী শার্ট পরে বেরিয়েছ এই ঠাণ্ডায়, অসুখ-বিসুখের ভয় বুঝি নেই ?

আমার জবাব তিনি শুনলেন না। ছোট ভাইয়ের কথায় তাঁর কান দেবার মতো সময় নেই। তিনি ভিতরে গিয়ে একটি ফুলহাতা সোয়েটার বার ক'রে এনে বললেন, ইনকো পিন লো পহলে, তব নিকলো কোঠিসে। এটি তোমার ভাবীজীর স্নেহোপহার মনে রেখো। যদি বড় বোনের উপহার হাত পেতে নিতে লজ্জা পাও, কাল তোমার দাদার হাতে ফেরৎ পাঠিয়ো।

আমি তাঁর অবাধ্য হ'তে পারলুম না। সোয়েটারটি গায়ে চড়িয়ে সেই রাত্রে বাসায় ফিরলুম। তখন দশটা বেজে গেছে!

পা টিপে টিপে ভিতরে ঢুকলুম। রায়সাহেব ও মিঃ দাস শুয়ে পড়েছেন দেখে স্বস্তিবোধ করলুম। রায়সাহেব আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। অযথা এবং অহেতুক আমাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কটু ও তিক্ত কথা তাঁর বলা চাই। আমাকে হীন প্রতিপন্ন করা, মর্যাদাহানিকর সমালোচনা করা, কথায় কথায় কঠোর বিদ্রূপ বা চোখ-রাঙানো—আমার পক্ষে প্রায়ই অসহ্য হয়ে উঠছিল। কিন্তু এই বাংলোটা মূলত ওঁরই নামে লীজ নেওয়া সে যেন কবে থেকে। সুতরাং তিনি যদি আমাকে তাড়িয়ে দেন তাহলে আমি অন্ধকার দেখব। এ পাহাড়ে অন্য আশ্রয় পাওয়া এখন একেবারেই অসম্ভব।

রাত্রে পিশু পোকার উৎপাতে প্রায়ই জেগে থাকতে হতো। মশা হ'লে মারতে পারা যায়, কিন্তু পিশুকে ধ'রে মারলেও মরে না! যতক্ষণ নখের ঘষায় পুট্ ক'রে একটি আওয়াজ না হয়, ততক্ষণ পিশু জীবিত! রাত্রে ওকে চোখে দেখা যায় না। সুতরাং প্রতি রাত্রে হাজার হাজার পিশুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা অপেক্ষা জেগে থাকা সহজ।

মনের কথা চেঁচিয়ে ভাবতেও ভয় করে। রাত জেগে জেগে সরস্বতীর কথা ভাবছিলুম। ওদের বাড়িতে যাওয়া ইদানীং আমি বন্ধ করেছি। সরস্বতীর বউদি রত্না ও রত্নার ভগ্নি রাজমোতী—এঁরা দুঃখিত আমি জানি। আমি সেতার বাজানো ভাল করে এখনো শিখি নি, কিন্তু ওঁরা আমার আঙুলের টুংটাং আওয়াজ হলেই বাহবা দেন। সরস্বতী এবার খালসা কলেজে থার্ড ইয়ারে ভর্তি হয়েছে। তাকে যখন আমি রবি ঠাকুরের কবিতা বোঝাবার চেষ্টা পাই এবং আমার গলায় যখন কোন কোনও কবিতার ছন্দে, শব্দে ও সুরে আবেগের দোলা লাগে—তখন দেখতে পাই ওই অষ্টাদশী মনোরমার দুই চোখে নিবিড় স্বপ্নাবেশ! কবিতার প্রকৃত ব্যঞ্জনা সরস্বতী কতটুকু বুঝবার চেষ্টা করছে আমি জানিনে, কিন্তু মহাকবির কাব্যের অতলস্পর্শ ভাবনার মধ্যে তলিয়ে আমি যখন আত্মবিস্মৃত হ'তে থাকি তখন সরস্বতী যেন আমার প্রকৃত চেহারাটাকে আবিষ্কার করে! যখন সম্বিৎ ফেরে, চেয়ে দেখি-ঘরে অন্য মহিলা বা জগদীশচন্দর—কেউ নেই, আছে শুধু আমার মুখের সামনে দুটো সম্মোহিত, শান্ত, বড় বড় কালো চোখ! সেই অনুপ্রাণিত দুটি চোখ যেন আমার প্রতি প্রশস্তিতে স্মিত মধুর হয়ে উঠেছে। আমাকে চোখ নামিয়ে নিতে হয়।

সরস্বতীর যেন চমক ভাঙে। সে বলে ওঠে, আপনার কাছে বসা আমার সৌভাগ্য। কবি ইকবাল এসব লিখতে পারেন না। 'অওর বলিয়ে!'—সরস্বতী নিজেই আমার 'চয়নিকার' পাতা উল্টিয়ে দেয়।—

এরপর আবার আসেন মহিলারা—জলখাবারও এসে পেঁছিয়।

এই যে মাঝে মাঝে আমাদের দু'জনকে রেখে চলে যাওয়া—এর প্রকৃত অর্থ অস্পষ্ট নয়। আমরা পরস্পরের প্রতি আসক্ত হই এটি ওঁদের বাসনা। ওঁরা আসক্তি বোঝেন, রোমান্স বোঝেন না। পাঞ্জাবে কোথাও রোমান্স বা রসকল্পনা সহসা চোখে পড়ে না। ওরা আকর্ষণ বোঝে, টানাটানি করা বোঝে, মেয়ের জন্য আত্মবলি দেওয়া বোঝে, দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান বোঝে—বোঝে না শুধু দেহহীন অনুরাগ। ওদের আকর্ষণ বা আসক্তি অতিশয় বস্তুতান্ত্রিক এবং দেহকেন্দ্রিক। বোধহয় এই কারণেই ওদের রস-সাহিত্য বা উচ্চাঙ্গের কাব্য ঐশ্বর্য সম্পদে সহসা সমৃদ্ধ হতে পারে না। সামাজিক জীবনে রোমান্সের অবলুপ্তি ঘটলে রস-সাহিত্যের সর্বনাশ! যে কোনও বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যও রোমান্টিক চেতনায় দাঁড়িয়ে থাকে। পাঞ্জাবে বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথ—এঁদের সন্ধান পাওয়া কঠিন। পঞ্চনদ গিয়েছে মরুপাথরের ভিতর দিয়ে, গঙ্গার ধারা চলে গিয়েছে সুজলায় সুফলায় মলয়জশীতলায়!

সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে এসেছি। হাওয়া নামছে উত্তরের। পাহাড় দিন দিন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে বরাবরের নিয়ম অনুযায়ী আবার আমাদের অফিস নেমে যাবে রাওয়ালপিণ্ডির হেড কোয়ার্টার্সে।

এর মধ্যে একদিন পাহাড়ের পথে দেখি, দূর থেকে আসছে জানি আর রোশন। আমি দুপুরের মধুর রৌদ্রে বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। সেদিন মাসের শেষ শনিবারের ছুটি! আমাকে দেখে রোশন সেখান থেকেই চিৎকার করল, পালিয়ে যান, শিগগির

পালান—জনি আপনাকে খুন করতে যাচ্ছে…ওর হাতে ছোরা—

আমি থমকিয়ে দাঁড়ালুম। জনি আবার মাতাল হয়েছে। মদমত্ত অবস্থায় পাহাড়ের দেওয়াল ঘেঁষে সে এগিয়ে আসছে, তার হাতে লকলকে একখানা ছোরা। কিন্তু টাল সামলাতে পারছে না, রোশন তাকে সামাল দিচ্ছে।

ওখান থেকেই রোশন আবার চেঁচাল—চলে যান, শিগগির পালান—

এবার আমি হাসিমুখে এগিয়ে গেলুম। জনির ক্ষণ-উত্তেজনাকে আমি চিনি। সে তখন জড়িত কণ্ঠে প্রলাপ বকছে—মার ডালেগা, তেরা খুন পিয়েঙ্গে হম্—

রোশন তাকে জাপটে ধরার চেষ্টা করল। সেই অবসরে আমি জনির ছোরাসুদ্ধ হাতখানা কঠিন মুষ্টিতে ধরে ফেললুম। বোধহয় একটু বেশি মোচড় দিয়ে থাকব—ছোরাখানা তার শিথিল হাত থেকে রোশন ছিনিয়ে নিয়ে একেবারে পাহাড়ের খাদের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

জনির প্রলাপ তখনও শেষ হয়নি। তবে এবার ইংরেজীতে বলছে: তুমি আমার জীবনকে ধ্বংস করতে চাও। তুমি শয়তান—তুমি—

সহাস্যে প্রশ্ন করলুম, আমি?

হ্যাঁ তুমি। ইউ বাগার! তুমি আমার স্ত্রীকে বশ করেছো। সে আর আমাকে ভালবাসে না! চাক্কুসে তেরে গর্দান হালাল করেঙ্গে!

জনিকে আমি জড়িয়ে ধরেছিলুম। এবার মিষ্টকণ্ঠে বললুম, ছোটভাইকে তুমি হাত তুলে কেমন করে মারবে? যখন তোমার নেশা কাটবে তখন ত জানবে বিনা দোষে তুমি আমাকে খুন করেছ? তোমার স্ত্রী আমার শ্রদ্ধেয়া ভগ্নির মতন—।

আসল কথাটা ফাঁস করল রোশন। বলল, তুমি অনেকদিন আমাদের বাড়ি যাও নি, তাইতেই ওর সন্দেহ—

সে আবার কি?

বুঝলে না?—রোশন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, ওকে লুকিয়ে আমি নিশ্চয় আসি তোমার খোঁজে—এই ওর সন্দেহ! তুমি যদি রোজ একবার গিয়ে ওর সঙ্গে গলাগলি করতে, তাহলে আমাকে এ জ্বালা সইতে হত না।

রোশনের চোখে জল এল। জনি তখন আমার গলার মধ্যে মুখখানা ঘষে কুকুরের মতো সোহাগ-সমাদর জানাচ্ছিল। গন্ধ শুঁকে বুঝলুম, পেট ভরে জনি-ওয়াকার ঠেসেছে। মদের ঝোঁকে কী না হয়।

সেদিন ওকে কয়েকটা লেবু নিংড়িয়ে খাইয়ে সুস্থ করে একটা দোকানে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলুম ঘণ্টা তিনেক। রোশন বলল, ওর ভীষণ সন্দেহ-বাতিক।

রোশনের মতো মেয়ের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল, এ আমার মনে হত না।

সরস্বতীর মামা ডাঃ বেদী জানতেন আমি অবসর সময়ে লেখাপড়ায় মন দিই। তিনি নিজের খরচে মধ্যে-মাঝে লাহোর থেকে পার্শেলযোগে দামী দামী বই আনিয়ে দিতেন। কখনও পাঠাতেন এক বাক্স কেক, অথবা এক ঠোঙ্গা কিসমিস। আমি নিচের

তল্লাকার একটা ছোট্ট ছেলে হানিফকে ডাকিয়ে এনে দু'জনে মিলে খেতুম। পাঁচ বছরের ছেলেটা আমার আখরোট খাওয়ার সঙ্গী ছিল।

হঠাৎ একদিন প্রবল বেগে আমার জ্বর এল। জ্বর বাড়তে বাড়তে রাত্রের দিকে একেবারে বেঁহুস। এটা বিদেশ, এখানে আপনজন কেউ নেই। বিশুনলাল শুধু রান্না করে দেয়, একটা মেয়ে-ঝাড়ুদার এসে কাজ সেরে যায়। কেউ কারও খোঁজ রাখে না! রায়সাহেব আর দাসমশাইরা থাকেন বারান্দার ওপিঠে। এপিঠে সিঁড়ির পাশের এক কোণে একখানা চারপাইতে আমি বেহুঁস অবস্থায় একা। মনে হচ্ছে আশা-ভরসা আমার কিছু নেই। মারা যাবার পর যখন আমার পচা শবদেহ থেকে দুর্গন্ধ উঠবে, তখন ওরা প্রাণের দায়ে ছুটে এসে আমার সৎকার করবে! তার আগে নয়। আমি এখন মারা গেলে সরস্বতী তার দুর্ভাগ্য থেকে বেঁচে যাবে, রোশন আর জনির ঘরে শান্তি ফিরবে, মর্জিনা বউদিদি সোয়েটারটা ফেরৎ পাবেন, রায়সাহেবের হাড় জুড়োবে, বঙ্গসরস্বতী দায়মুক্ত হবেন, এবং আমার টিনের বাক্সটা পেয়ে শ্রীমান্ বিশুনলাল ধেই ধেই করে নাচবে!

কিন্তু মা?

বেহুঁস জ্বর সত্ত্বেও একবার উঠে বসলুম। বিলোল চক্ষে তাকালুম এধার ওধার। কয়েকটা ভাঙ্গা কাঠের খুরসি, খান দুই ছেঁড়া কম্বল, একটা পরিত্যক্ত ময়লা হারিকেন, গোঠা দুই-চার শিশি-বোতল, ফুটো একটা চটা-ওঠা কলাইয়ের বাটি—এই আমার পারিপার্শ্বিক।

আমার আমি শুয়ে চোখ বুজলুম। ঠিক যেন তলিয়ে গেলুম অচেতন নিদ্রায়।

তখন অনেক রাত। কত রাত আমার ঠাহর নেই। আমার সেই অথই নিদ্রার মধ্যে কে যেন অতি সন্তর্পণে আমার জ্বরতপ্ত কপালে নিবিড় স্নেহভরে একখানা হাত রাখল! ঈষৎ সচেতন হয়ে ভাবলুম স্বপ্ন কি না! না, স্বপ্ন নয়! তবে কি মা? কই না, এ করস্পর্শে সেই সর্বদুঃখহরণের আস্বাদ নেই ত? তবে কি ডাঃ বেদী? সরস্বতী? রোশন? তবে কি ভাবীজী? তবে কি বিশুনলাল? না, কেউ না,—এ অন্য হাত!

চোখ খুলে তাকালুম। স্নেহসিক্ত দুই চোখ মেলে রায়সাহেব আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়েছেন! সেই চোখে অহেতুক বিদ্বেষ, অকারণ আক্রোশ, অযথা ঘৃণা, কিছু নেই। ঘরে প্রখর আলো জ্বলছে। রায়সাহেব মিষ্ট শান্ত কণ্ঠে বললেন, এই ত আমি, আমি রইলুম তোমার কাছে, বাবা। এ হ'ল কড়া জাতের ইনফ্লুয়েঞ্জা,—এ জ্বর থাকবে না। বিশুন, গরম দুধটুকু নিয়ে আয়।

আমি আবার চোখ বুজলুম।

দিন তিনেক পরে দাসমশায় আমাকে বলেছিলেন, রায়সাহেবের একমাত্র সন্তান তোমারই বয়সী একটি ছেলে গত বছর টাইফয়েডে মারা গেছে। উনি সেজন্য কোথাও স্থির থাকতে পারছেন না! একদা 'দেশ-দেশান্তর' গ্রন্থে এই কাহিনীটি লিখেছিলুম।

মারীপাহাড় ছেড়ে নিচে নামবার সময় হয়েছে। অক্টোবরের প্রায় মাঝামাঝি।

পল্টন দপ্তরের থেকে বড় বড় কাঠের সিন্দুক একে একে পিঠে বেঁধে নামছে পাঠান-শ্রমিকরা। চার মণ থেকে ছয় মণ এক একটার ওজন। ওরা বলে, পিঠের সঙ্গে আর কপালের সঙ্গে বাঁধনের কৌশলে সিন্দুকের ওজন যায় কমে,—খানিকটা নাকি শূন্যে ঝোলে! আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকতুম ওদের অপরিসীম শক্তি ও স্বাস্থ্যের দিকে। ওরা ভদ্র ও শান্ত। কিন্তু রাগলে আর রক্ষা নেই।

ম্যালে ঠান্ডা খুব। এরই মধ্যে দোকানপাট কয়েকটা বন্ধ হয়ে গেছে। ওদের প্রধান কেন্দ্র হ'ল রাওয়ালপিণ্ডি, লাহোর বা মুলতান। পশম ও রেশমের প্রধান কেন্দ্র অমৃতসর।

আমাদের পক্ষে কারও কাছে কারোর বিদায় নেবার দরকার নেই। স্থানান্তরের ঝামেলা চুকলেই আবার পরস্পরের সঙ্গে দেখা হবে। এই উপলক্ষে ছুটি পাব দিন তিনেকের। যাই হোক, জনি আর রোশনের কাছে গিয়ে আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে আসতে হল। ওরা থাকবে এখানে। তুষারপাত হবে পাহাড়ে-পাহাড়ে, সাদা হয়ে যাবে পাইনের বন, বরফানি ঝড় বইতে থাকবে মারীতে, আগুন জ্বালিয়ে থাকবে এখানকার পাহাড়ীরা, নিঃসাড় হয়ে যাবে এখানকার জীবন। শুধু ডিসেম্বরের শেষে ইংরেজ সাহেবেরা এদিকে স্কী খেলতে আসবে।

এখন আমি বিবাহিত হলে আমার পক্ষে আর্থিক সুবিধা ঘটত! অর্থাৎ মাত্র চল্লিশ মাইল পথ সস্ত্রীক মালপত্র নিয়ে রাওয়ালপিণ্ডির বাসায় গিয়ে ওঠার খরচ বাবদ ভাতা পাওয়া যেত পৌনে দু'শ টাকা। বউ থাকলে রামরাজত্ব! কিন্তু আমি একে আইবুড়ো, তায় কনিষ্ঠ কেরানী। আমার কপালে আটাশ টাকা। মনে মনে অবশ্য জানি, খরচা আমার মাত্র টাকা তিনেক। বাসভাড়া দু'টাকা, টাঙ্গা আট আনা, কুলি চার আনা, আর পকেট খরচা আনা চারেক। প্রতি মাসেই আমার বেশ মোটা অঙ্ক জমছে, এই পঞ্চাশ টাকা তার ওপর বাড়বে। কিন্তু এ বছর আমার আরেকটু চোখ ফুটেছে। এবার থেকে সিনেমা, সার্কাস, কার্নিভ্যালে জুয়া, বন্ধুবান্ধবসহ বন-ভোজন, টাঙ্গায় চড়ে ঘুরে বেড়ানো, নতুন নতুন পোশাক। না, নেশাভাঙ নয়, জনি সেবার আমাকে সমুচিত শিক্ষা দিয়েছে!

নেমে আসার সময় আবার সেই রক্তবরণ সুন্দর পথ। পাহাড়তলীর উপত্যকায় ওক-পাইন আর শাল-সেগুনের বনে বনে রঙ্গীন পাখিদের কলকণ্ঠ। আশেপাশে ছোট বড় পদ্ম সরোবর। এদেরই ভিতর দিয়ে গাড়ি এসে আমাকে পৌঁছিয়ে দিল রাওয়ালপিণ্ডির বাস-স্ট্যান্ডে। একখানা টাঙ্গা নিয়ে আমার চেনা পথ ধরে বাবুমহল্লার প্রান্তে একস্থলে গিয়ে নামলুম।

একতলা পুরনো বাড়ি। এক প্রবীণা শিখ মহিলা হাসিমুখে বেরিয়ে এসে বললেন, সাবাস, লড়কা আ'গে। ব্যস, মেরে রোটি বন্ চুকা। আও বয়ঠ যাও, বেটা।

প্রবীণা মহিলার অত্যুৎসাহ লক্ষ্য করে হাসলুম। অতঃপর কুশল প্রশ্নাদির পর আমি বাক্স আর বিছানা নিয়ে ছাদে উঠে একপ্রান্তে আমার পরিচিত ঘরটিতে উঠলুম। এটির মাসিক ভাড়া পাঁচ টাকা। ঘরে ঢুকে দেখি, একপাশে আমার চারপাইয়ের ওপর

তোশক, চাদর ও বালিশ পরিচ্ছন্ন ভাবে পাতা। একখানা চেয়ার রেখেছেন মাতাজী টেবিলের সামনে। অন্য একটি কোণে আঙ্গোটি, কাঠকয়লা রাখার একটি কাঠের বাক্স, ছোট হাঁড়ি-কড়াই আর একটি থালা। তাওয়া আর চিমটা ঠিকই আছে। গোটা দুই কটোরা ও একটি সিসা-গিলাস। তাকের ওপর নুন-মশলার জন্য গোটা চারেক হরলিক্স্-এর খালি বোতল।

মাতাজীর কাছে বসে খানচারেক ঘিয়ে ডোবানো রোটি আর সব্জির ঘাট গোগ্রাসে গিলে উঠলুম। তারপর ওঁর হাতে দিলুম পাঁচ আর পাঁচ—দশ টাকা। আটা, ঘি, পেশোয়ারী আতপ চাওল, নিমক-মশালা, জ্বলাহুয়া লকড়ি, আলু-গোবি-পিঁয়াজ, আণ্ডা অওর কালি-মির্চ, চানা-কে দাল, ভিণ্ডি দো-চার মিলে ত বহুৎ আচ্ছি। মোট টাকা চারেক হয়ত লাগতে পারে। ঝাড়ুদার উয় জমাদারকে লিয়ে এক রুপ্যা।

আমার যৌবনে তখন উঠেছে জলতরঙ্গ। পা-জামার সঙ্গে মিহি আদ্দির পাঞ্জাবি চড়ালুম যার ডান কাঁধের দিকটা কাটা। বেলদার সুতি বোতাম। আমার অতিশয় চওড়া বুকের ছাতি সম্বন্ধে আমি সচেতন। আমার মাথায় থাকত পেশোয়ারী বাবরি চুলের ঝাঁক—যার রং ছিল ফলসার মতো এবং যেগুলো ইচ্ছাকৃত অযত্নের এলোমেলো চিহ্ন বহন করত।

রাস্তাঘাটের লোক অল্প-স্বল্প গরম পোশাক ধরেছে। পিণ্ডির রৌদ্র এখনও বেশ তপ্ত। তা ছাড়া আমি নেমেছি সাত হাজার ফুট উপর থেকে। আমার দেহে ঘাম দেখা দিচ্ছে, রৌদ্রে নেমে আমি রাঙ্গা হচ্ছি। আমার এখন তিন দিনের অহোরাত্র ছুটি। এই বিশাল সমতল শহরে এখন আর কেউ কারও খোঁজ রাখবে না। ডাঃ বেদীর মুরুব্বিআনা নেই, রায়সাহেবের নাটকীয় বাৎসল্যের উচ্ছ্বাস নেই, সরস্বতী-রোশন-জগদীশ-জনি-মর্জিনা-মায়া দেবী-শেঠী—এদের সকলের পারিবারিক ছোঁয়াচ থেকে এখন আমি মুক্ত—এখন শুধু 'নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি/বক্ষ তোর ওঠে রণরণি/নাহি জানে কেউ/রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ/কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা'—

পথ দিয়ে ছুটে চলে গেলুম বাবুমহল্লার দিকে। সেখানে হেম, বটু ও তার বউদিদি। ওখানে মস্ত ক্যারমের আড্ডা। প্রথম দেখাতেই হইচই। ক্রমশ আরও এসে পেঁছিল—হয়ে উঠলুম আমরা পাঁচ-সাত জন। ডবল বোর্ড—চার জন। বউদিদির নতুন বিয়ে হয়েছে আন্দাজ বছর দুই। তিনিও হইচইতে কম যান না! তাঁকে নিয়ে বসে গেলুম চারজন। ব্যস্, আর কথা নেই। উত্তেজনা এল খেলার মধ্যে। আমার স্ট্রাইক্, মানে আমারই বোর্ড। চান্স দেবো না কারোকে। বউদিদি শুধু বসে থাকুন। আর কি, এক স্ট্রাইকে শেষ। নয় আর পাঁচে চোদ্দ। আবার সাজাও।

বিকেল পর্যন্ত খেলা। চলো বেরোই এবার। হেম বটু অসিত—সবাই তৈরি। চলো, টাঙ্গা নেবো। টাঙ্গা নিয়ে আমরা চললুম যেখানে খুশি। এখন আর পাহাড়ের সেই চড়াই-উৎরাইয়ের ধীরগতি নয়, এখন সমতল—উদ্দাম গতিবেগ। বন্ধুরা

উপলক্ষ, কিন্তু আমার চাই চঞ্চলতা, দ্রুততা। টগবগ করে ফুটছে আমার মন, আমি শৃঙ্খলচ্ছিন্ন হতে চাই। আমার প্রাণশক্তি, আমার জীবন-প্রাচুর্য, আমার প্রবল উদ্দীপনা,—যে কোনও উপায়ে খরচ হোক। আমার আগ্নেয় প্রকৃতির মধ্যে জমেছে বিস্ফোরক, জমে উঠেছে অসহনীয় যৌবনের এক প্রকার বিষাক্ত শোণিত।

হঠাৎ কোচম্যানের হাত থেকে ঘোড়ার রাশ ধরে নিলুম নিজের হাতে। তারপর ছিপটি নিয়ে সপাং করে মারলুম ঘোড়াটার পিছনে। এবার সে দৌড়ল প্রবল বেগে। রাস্তা চওড়া। এবার বাঁ হাতে রাশ ধরে ডান হাতে ছিপটি। বন্ধুরা আড়ষ্ট। রাস্তার দুপাশে সবাই অবাক। তা বলে আর থামে কে? 'শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও/উদ্দাম উধাও/ফিরে নাহি চাও/যা কিছু তোমার সব ফেলে ফেলে যাও—'

এক সময় আবার রাশ হাতে নিল কোচম্যান। আমি শান্ত হলুম। তখন নিশ্চিন্ত বন্ধুদলের মধ্যে হাসির ফোয়ারা উঠল।

একটি খাবার হোটেলের সামনে এসে গাড়ি থামল। কোচম্যান্ চাইল দেড় টাকা, —আমি ঝনাৎ করে ফেলে দিলুম দু'টাকা।

পিণ্ডিতে শিখদের তখন আধিপত্য বেশি। দোকান, বাজার, ব্যবসায়, বড় বড় সম্পত্তি—সর্বত্র পাঞ্জাবী শিখ আর হিন্দু 'বেওপারি'। বিরাট একেকটা প্রতিষ্ঠান তাদের। আমরা বড় এক শিখ হোটেলে ঢুকলুম। মাংস, শুধু মাংস খাওয়া চাই আমাদের। চপ, শিককাবাব, কাটলেট্—এসব চাই। বটু অসিত হেম—ওরা ক্ষীণ-জীবী, ভয়ভীরু, দুবলো-পাতলা—ওরা পেট ভরে খাক্। দাঁড়াও আসছি—

ছুটে বইরে এলুম। কিনলুম কয়েকটা আপেল, একসের আঙ্গুর, একরাশি চেরি। এক হাতে মাংস অন্য হাতে মেওয়া। যত খুশি খাও।

বটু বলল, এসব করছেন কি? কত খাবো আমরা?

খেতেই হবে। খাওয়া মানে প্রাণ।—আমি প্রবল হাস্যোচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললুম, খাওয়া মানে শুধু প্রাণধারণ নয়, প্রাণশক্তির জাগরণ!

॥ ২৩ ॥

পোশাক মানুষের পরিচয়। ইংরেজ মিলিটারি, বা পুলিস সার্জেন্ট—এদের পোশাক দেখতে দেখতে গা সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু আমার চাই কাবুলী পাঠানের পোশাক। পায়ে ঘণ্টিবাঁধা জুতো, চুরিদার জরি-বর্ডার দেওয়া শালোয়ার—যেটা দুই পায়ের দিকে পাকানো। গায়ে বহুৎ লম্বা হাঁটু পর্যন্ত পিরান—দু' হাতে কব্জি বাঁধা, উপর দিকে মখমলের জ্যাকেট, মাথায় চুমকি বসানো মস্ত টার্বান বা পাগড়ি। চোখে ঈষৎ সুর্মা থাক। পিছনে ঘাড়ের দিকে পাগড়ির নিচে আমার লম্বা চুলের ঝালর ঝুলে পড়ুক। আমার নতুন পরিচয় হোক।

সব শ্রেণীর মধ্যে আমি ঢুকতে চাই, সব সম্প্রদায় আমার নিজের। হিন্দী, হিন্দুস্তানী, পানজাবী বা গুরুমুখী, পুস্তু—একটু একটু শিখেছি ওগুলো—যাতে কাজ চলে যায়। ওসব আমারই ভাষা, আমারই দেশের। আমি দৈবাৎ বাঙ্গালী, কিন্তু আমি সর্বভারতের। আমি যেন আমাকেই দেখছি সর্বত্র! এ আমার ভয়ানক শখ, সকলের মধ্যেই শুধু আমি নয়, আমারই মধ্যে সবাই!

লেখরাজ আমার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে সানন্দে বললেন, বড়ি সুরৎ—! সৌখিয়া কি বাৎ না হ্যায়?

—য্যায়সা সমঝো—! হাসিমুখে জবাব দিলুম।

ঠাণ্ডা পড়ছিল রাওয়ালপিণ্ডিতে। গোরাছাউনির দিকটায় বেশি ঠাণ্ডা। উত্তর আর পশ্চিম দিক থেকে হাওয়াব সঙ্গে ঠাণ্ডা আসছে। মাঝে মাঝে মেঘ ঘনিয়ে উঠছে। গরম কোট-প্যাণ্ট মোজা-জুতো ছাড়া এখন আর চলে না। আমার আপিসের সাজ ফিট সাহেবী।

ওই পূর্বোক্ত পোশাক নিয়েই ঘুরছিলুম পিণ্ডি শহরে। পথ চিনে চিনে গিয়ে উপস্থিত হলুম সেন-কোম্পানির ডাক্তারখানায়। এঁরা কাশীর লোক, কিন্তু দুই পুরুষ ধরে আছেন পিণ্ডিতে। একদা এঁদেরই কাছে এক রাত্রির জন্য আতিথ্য নিয়েছিলুম। কিন্তু এঁরা সেদিন আমাকে বিশ্বাস করতে পারেননি। হয়ত ভেবেছিলেন আমি এক পলাতক বাঙ্গালী বিপ্লবী—পালাচ্ছিলুম নাকি কাশ্মীরের ভিতর দিয়ে মধ্য এশিয়ায়! ফলে, ওঁরা আমাকে সেই রাত্রে ওষুধের আড়তের মধ্যে শুইয়ে রেখেছিলেন। আমি সেই শ্বাসরোধী ঘরের ওষধিগন্ধের মধ্যে রাত কাটাতে বাধ্য হয়েছিলুম। সেই অসহনীয় অবস্থার মধ্যে আমার মনে বিপ্লবের আগুন ধক ধক করে জ্বলেছিল!

ওঁদের সামনে দাঁড়িয়ে পাগড়িটা খুলে বাংলায় সম্ভাষণ করলুম, কিন্তু ওঁরা আমার চেহারা দেখে বা কথা শুনে চিনতেই পারলেন না! আমি অনেকগুলো কথা একে একে মনে করিয়ে দিলুম, কিন্তু ওঁরা বললেন, ওঁদের জীবনে আমার মতো এই চেহারার বাঙ্গালী কোনদিনই দেখেননি! কানাকানিতে শুনলুম, আমি নাকি ছদ্মবেশী এক মুলতানী! বাঙ্গালী হতেই পারে না! আমার পোশাকই আমার পূর্বপরিচয়কে মুছে দিল।

অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে আমি চলে এসেছিলুম।

পিণ্ডিতে ঘুরে ঘুরে আমি দেখতে পাচ্ছিলুম অন্য একটা জনস্রোত। ওরা উত্তর দেশ থেকে দলে দলে নেমে আসছে দক্ষিণে। দক্ষিণ মানে ভারত। ভারতের সমতল নাকি গ্রীষ্মপ্রধান। ওদের চেহারা বিচিত্র। মাথায় বড় বড় চুলের বেণী, গোঁফ এবং দাঁড়িতে কয়েক গাছা করে তামাটে চুল, গলায় অনেকের হাড় ও পলার মালা, পরনে জোব্বা বা আলখেল্লা শতছিন্ন, পায়ে মোটা মোটা হাতে-তৈরি ভেড়ার লোমের জুতো আর মোজা—কাঁধে ঝোলা—ওরা নাকি সিনকিয়াংয়ের উরুমচি ও ইয়ারকন্দের লোক। জাতিতে তিব্বতী ও মঙ্গোলীয়। ওদেরই সঙ্গে সঙ্গে বোঝা নিয়ে আসছে

শত শত গাধা, অশ্বতর, কুকুর, লোমশ ছাগল ও ভেড়া। কোন দল খোতানি, চান্-থানি, বালতিস্তানি বা লাদাখি। বহু মেয়ে-পুরুষের কোলে ভেড়ার বাচ্চা। জল-স্রোতের মতো প্রতিদিন ওরা দলে দলে নেমে এসে জড়ো হচ্ছে। ওদের জন্য সরাইখানা আছে, সরকারী তাঁবু আছে এবং হাজার হাজার মানুষের জন্য সংরক্ষিত প্রান্তর আছে। শীতকালের পাঁচ-ছয় মাস অবধি ওদের দেশ তুষার বা বরফে চাপা পড়ে, খাদ্যসামগ্রী মেলে না, পানীয় জল বরফে পরিণত হয়, পালিত পশুরা মরতে থাকে ঠাণ্ডায় আর অনাহারে। সুতরাং বাঁচবার মতো একটু উত্তাপ ওদের পক্ষে দরকার। সরাই বা তাঁবুর মধ্যে যখন আশ্রয় নিয়ে ওরা বসে, তখন দেখি ওদের এলানো পুঁটলির ভিতর থেকে গরু বা চণ্ডরের শুকনো পাঁজরা, বাছুর বা ছাগলের ঠ্যাং, পোড়া-পোড়া মোটা জবের চাপাটি, ময়লা নুন এবং চামড়ার বোতলে জব-পচানো পাঁচনের মতো এক প্রকার 'সরাব'। সন্ধ্যায় দেখি মোটা চর্বির ডেলায় লোমের ফাঁস লাগিয়ে প্রদীপ জ্বালে এবং কাঠকুটোয় আগুন ধরিয়ে মাংস পোড়ায়। অনেকবার তারই অসহনীয় দুর্গন্ধ আমাকে ওদের কাছ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। ওদেরই তাঁবু থেকে পিণ্ডির বড় বড় 'বেওপারিয়া' ভেড়া-ছাগলের লোম কিনতে আসে। কুকুরগুলো ওদের পালিত পশুদের পাহারায় থাকে।

ওরা আমার মনে অনেক রকমের বিস্ময় আনে। ওদের কাছে আছে যেন কোন্ অজানা জগতের সংবাদ। কোথায় তাক্‌লা-মাকান, মঙ্গোলিয়া আর সেই গোবি মরু-লোক, কোথায় বা সেই আশ্চর্য ভূখণ্ড তুর্কিস্তান আর তাজাকিস্তানের ফারগানা— ওরা সবাই যেন তাদের খবর এনেছে। আমার অবাধ্য কৌতূহল আমাকে একদিন সন্ধ্যায় ওদের মাঠের এক তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে হাজির করল। ধূসর দিগন্তলোকে তখন সবেমাত্র সূর্যাস্ত হয়েছে। ওদের পোড়া মাংস, জবের চাপাটি এবং ওই ময়লা সরাব-এর প্রতি আমি মোহগ্রস্ত হয়েছিলুম। ওদের মতন মাথার বিনুনি আমার বড় বড় চুল দিয়ে বানাতে চাই। ওদের ওই শতছিন্ন জোব্বা পরলে কে আমায় নিন্দে করবে? ওদের ওই জুতো আর মোজার প্রতি আমার যে ভয়ানক লোভ! আমি চাইছি ওদেরই মতো বন্য বিশৃঙ্খল যাযাবরের জীবন!

এক একটা ছোট তাঁবুর বাইরেই অনেকে ব'সে রয়েছে। আবছা অন্ধকারে চেনা যায় না কোন্‌টা পুরুষ আর কোন্‌টা স্ত্রীলোক। তবে এক-এক স্ত্রীলোকের মাথায় চূড়ার মতো উঁচু টুপি, সে-টুপির দু'দিকটা মোড়া—তারা হ'ল লাদাখি মেয়ে। আমি অমনি একটা গোলাকার মঙ্গোলীয় তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়ালুম। ওখানে আগুন জ্বালা হয়েছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে আরও দু পা যখন এগিয়েছি, তখন হঠাৎ একটা কালো লোমশ কুকুর কোথা থেকে ফুঁসিয়ে তেড়ে এল। হিংস্র কুকুরের সেই আকস্মিক তাড়না কেমন ক'রে সামলাবো—এটি পলকের মধ্যে বিবেচনা ক'রে একটি লোকের গায়ে-গায়ে ব'সে পড়তে বাধ্য হলুম। লোকটা এক প্রকার শিস দিল। কুকুরটা থামল। আমার বুক তখনও ধড়ফড় করছে।

লোকটা আমার দিকে তাকাল। হাসল একটু। ঘাড় নেড়ে বলল, ইন্দস্তান?

আমি ঘাড় নেড়ে সহাস্যে সায় দিয়ে জানালুম, হ্যাঁ, আমি ইন্দস্‌্তানের লোক। কুকুরটা এতক্ষণে বোধ হয় বিশ্বাস করল আমি ভেড়া-ছাগল চুরি করতে আসিনি। লোকটা এবার আমার পিঠের ওপর হাত চাপড়ালো। অর্থাৎ যেন ভয় না পাই।

কেউ কারও ভাষা জানিনে, শুধু ইশারা আর ইঙ্গিতে চালাচ্ছি। ওই ইঙ্গিতেই এক সময় ধূমপানের সরঞ্জাম নিয়ে এল একটা মেয়েছেলে। অতঃপর লম্বা একটা কলকের মধ্যে মসলা পুরলো। লোকটা বলল, বুররা।

আমি হাসিমুখে দেখছিলুম। আগুনের ডেলা হাতে করে নিয়ে লোকটা কলকেটার মধ্যে ফেলে টানতে লাগল। অন্ধকার প্রান্তর তখন ঠাণ্ডা হয়েছে। কাশীস্থানে একদা প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, না, এ জীবনে মাদক সেবন আর নয়! কিন্তু মঙ্গোল বংশজাত এই ব্যক্তি আমার মুখে চোখে বোধ হয় একাগ্র আসক্তির ছবি দেখে থাকবে। সুতরাং এক সময় সে কলকেটা আমার দিকে বাড়ালো। আমি তৎক্ষণাৎ সেটি গ্রহণ ক'রে দু'হাতে মুখে ধরলুম এবং আমার বহুদিনের আত্মনিগ্রহের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বোধ হয় একটু বেশি দমেই টেনে থাকব—ফলে, লম্বা কলকের ভিতরটা প্রদীপের মতো জ্বলে উঠল! ওটা নাকি 'বুররা'—কিন্তু মিনিট খানেকের মধ্যেই উপলব্ধি করলুম, ওটা একালের 'হাসিস'। এরা তুর্কিস্তানের মঙ্গোল।

মেয়েছেলেটা আগুনের মধ্যে কাঁচা মাংস পোড়াচ্ছিল দেখে আমি পকেট থেকে একটা টাকা বার ক'রে লোকটার দিকে বাড়িয়ে বললুম, গোস্ত…গোস্ত-রোটি!—মুখে হাত দিয়ে আমার খাবার ইচ্ছাটা জানালুম।

লোকটা যেন লুফে নিল সপ্তম এডোয়ার্ড মার্কা রুপোর টাকাটা। টাকাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এপিঠ ওপিঠ খুঁটিয়ে দেখল। আমার তখন পরনে ছিল মুসলমানদের মতো চাঁদি ক্যাপ এবং আধময়লা পায়জামার উপর কমিজ। চাঁদি ক্যাপটি মাথা তুলে আমি সহাস্যে লোকটার মাথায় পরিয়ে দিলুম।

কুকুরটা এবার সামনে থেকে উঠে অন্যত্র চলে গেল।

একপ্রকার বীভৎস বোটকা গন্ধ উঠছিল ওই আগুন থেকে। কিন্তু ওতেই আমার লোভ। মেয়েছেলেটা চিমটে দিয়ে পোড়া মাংসখণ্ডটা উলটিয়ে আগুনে রেখে এবার উঠল এবং সে যখন মাথা নিচু ক'রে তাঁবুর মধ্যে ঢুকতে গেল, তখন দেখি ভিতরের ঝোলাঝুলির পাশের মস্ত এক ঈগল পাখি লোমপাকানো দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় ব'সে রয়েছে।

স্ত্রীলোকটি আবার বাইরে এল, দেখি তার হাতে ফাঁস দেওয়া বড় একটা চামড়ার বগলি। ওই বাঁধা বগলির সঙ্গে সুকৌশলে চামড়ারই নল লাগানো। ওরা জল খায় না, খাদ্যের সঙ্গে 'জাঁড়' খায়—ওটাই ওদের 'সরাব'।

এবার আমি বেশ গুছিয়ে সানন্দে চেপে বসলুম। ওদের মনোহরণ করার পক্ষে একটা টাকা আর ওই ছয় আনার টুপিটা খুব কাজে লেগেছে।

সেদিন আমার বাসায় কত রাত্রে ফিরেছিলুম, আসবার পথে ক'বার বমি করে-

ছিলুম এবং একতলার ছাদে ওঠবার কালে সিঁড়িতে একবারের বেশি হোঁচট খেয়েছিলুম কিনা—এসব কথা এতকাল পরে আর সুস্পষ্ট মনে পড়ছে না। তবে আমার শিখ-মাতাজি আমাকে হুঁশিয়ার ক'রে দিয়ে বলেছিলেন, মেরে লাল বেটা, সরাব পিওগে ত' আংরেজি সরাব পিও—জাড় পিনেসে জাইদি হুজুর আতি হে'—মেরে অওর লড়কা দোনো বহুৎ হুঁশিয়ার আদমি হ্যায়—

উনি জানিয়ে দিলেন ওঁদের ঘরে দেশী সরাব ঢোকে না।

না, বিদেশ-বিভূঁয়ে এসব আচরণ ভালো নয়। আমার প্রবৃত্তি আর কৌতূহল আমাকে অসৎপথে নিয়ে যাচ্ছে! জীবনের পাঠ থেকে এইরূপ জ্ঞানার্জনের বাসনা আমার সর্বনাশ করতে উদ্যত। না, আর নয়। আমার এখন বাইশ বছর বয়স উত্তীর্ণ। তেইশে পড়েছি। আমার পক্ষে সংযম, কঠোর ব্রহ্মচর্য, অনাসক্তি, নিষ্কাম কর্মযোগ—এগুলি একান্তই দরকার। স্বামী বিবেকানন্দর পাড়ার আমি মানুষ, তাঁর সব বাণী ও রচনা আমার মুখস্থ—এ সব কি আমার শোভা পায়? শুধু স্বামীজী কেন? আমাদের বাড়ির চারিদিকে যাদের বসবাস ছিল বা আছে, তাঁরা ত' সবাই প্রাতঃস্মরণীয়! বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগর, তাঁর কোলের কাছে জগদীশ বসু আর আনন্দমোহন বসু, ওপাশে কেশব সেন, এপাশে রাজা রামমোহন, বাড়ির গায়ে ডি এল রায়, দক্ষিণে দীনবন্ধু মিত্র, পশ্চিমে রবীন্দ্রনাথ, গোয়াবাগানে শরৎকুমারীর বাবা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—তাঁর নাতি যামিনী আমার সহপাঠী, সামনে ডি-এল-রায়ের শ্বশুর ডাঃ প্রতাপ মজুমদার—আর ক'জনার নাম করব? এঁদের প্রভাবের মধ্যে থেকেও আমার এই অধঃপতন? ধিক আমাকে।

প্রভাতে উঠে স্নান করলুম ঠাণ্ডা জলে। পৈতাটা বাক্স থেকে বার করে গলায় চাড়িয়ে দশবার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করলুম। স্নানাদির পর ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল। কিন্তু অন্তর্যামীকে জানালুম, না, এখন নয়। যখন রান্নাবান্না শেষ করব, তখন খেয়ো! এখন থেকে খাই-খাই করো না!

আজ রবিবার—অনেক কাজ। খবরের কাগজ 'ট্রিবিউন' ক'খানা একবার উলটিয়ে নেব, চিঠিগুলোর জবাব দেবো। বিশেষ করে 'কালিকলম'-এর সম্পাদক মুরলীধর বসুর চিঠিখানা পড়ে রয়েছে—ওটার জবাব দেওয়াই চাই। পবিত্র গাঙ্গুলীর তাগাদায় পর-পর দুটো গল্প পাঠিয়েছি 'কল্লোল'-এ। শৈলজার চিঠিখানা এখনও খুলিনি। প্রভাসের স্ত্রীর চিঠির জবাব আজও দেওয়া হয়নি। মায়ের নামে মনিঅর্ডার করেছি, তার রসিদ এখনও ফেরত আসেনি।

মুরলীদা তাঁর চিঠিতে নানা কথার পর লিখেছেন, 'ভারতবর্ষ', এতদিন পরে কল্লোল-কালিকলমের লেখকদের আমন্ত্রণ করতে বাধ্য হয়েছে। সংপ্রতি ইন্দোরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতি জলধর সেন প্রবাসী বাঙ্গালী লেখকদের নামোল্লেখ করতে গিয়ে তোমার কথাও বলেছেন। তুমি যে রাওয়ালপিণ্ডিতে রয়েছ তা তিনি জানেন। কিছুদিন আগে উনি 'ভারতবর্ষে' লেখার জন্য তোমাকে একখানা ভাল চিঠি দিয়েছেন শৈলজার হাতে। শৈলজা সে চিঠি কি তোমার কাছে এখনও পাঠায়নি? এবার থেকে তুমি ভারতবর্ষে'ও লিখো। ওরা পারিশ্রমিক দেবে।

অতঃপর কাশী থেকে লেখা শৈলজার চিঠিখানা পড়লুম। তলার দিকে প্রেমেন্দ্র লিখেছে কয়েক লাইন। তাহলে দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু এখন কাশীবাস করছে; খবরটা পড়ে খুবই উদ্দীপনা বোধ করলুম। কিন্তু চিঠিখানার মধ্যে জলধর সেনের চিঠির উল্লেখ মাত্র নেই।

নিজের রান্নাবান্না নিজেই আমি করি। শিখ-মাতাজি সর্বপ্রকার উপকরণ আমার ঘরে পাঠিয়ে দেন, আমি টাকা ধরে দিই। ভোরে উঠে সর্বাগ্রে চা, দুপিস ডবল-রোটি এবং আন্ডা-ফ্রাই। কাঠ-কয়লার উনুন, অসুবিধা নেই। অতঃপর লেখাপড়া ঘণ্টা দেড়েক। তারপর ভাত চড়িয়ে স্নানে যাই। পিন্ডিতে ভাত খাবার সুবিধা পাই। মারীতে সব সময় চাপাটি। এখানে রাত্রের দিকে মাংস। আপিস থেকে ফিরি 'দুম্বা' ভেড়ার মাংস নিয়ে—ওটার দাম অত্যন্ত বেশি, আট আনা সের দর। ওটায় হাড় বিশেষ থাকে না এবং সিদ্ধ হতে সময় নেয় না।

পেশাওয়ারি আতপ চালের ভাতে শ্রেষ্ঠ খাঁটি ঘি ঢেলে দিই। তার সঙ্গে আলু, ডিম, গোবি, এক আধটা ভিণ্ডি, দু'একটা সব্জি—সব মিলিয়ে এক পাক। মাছ বা 'কড়ুয়া' তেল ভুলে গেছি। ভাতের মধ্যেই খানিকটা সৈন্ধব নুন ও লাল লঙ্কার গুঁড়ো ফেলে দিই। অতি উপাদেয় লাগে! আপিস এখান থেকে দেড় মাইলেরও বেশি। যখন গিয়ে পৌঁছই, তখন আটটা পঁয়তাল্লিশ! তিন চার মিনিট এদিক ওদিক হয়ে গেলে জবাবদিহি করতে হয়। ওরা সবাই স্নানাদি সেরে ব্রেক-ফাস্ট করে বেরিয়ে আসে, সুতরাং সময় পায়। কিন্তু আমি ঘরদোর পরিষ্কার করি, বিছানা গোছাই, ভোরের চায়ের সঙ্গে ট্রিবিউন পড়ি, লেখাপড়া করি এবং রান্না চড়াই। তারপর দাড়ি কামানো, স্নানাহার, ফিটফাট সাহেবী পোশাক চড়ানো। অতঃপর হাঁটতে হাঁটতে অথবা ছুটতে ছুটতে আপিস যাওয়া—কোথাও যান-বাহন নেই! যতদিন না বুড়ো হবো, যতদিন না কর্মক্ষমতা শেষ হয়, যতদিন না পেনসন পাই—ততদিন এইভাবে চলতে হবে! মাস দেড়েক আগে হঠাৎ একদিন কামাই করেছিলুম ক্যারম খেলার নেশায়। পরদিন সর্দার মোতি সিং চোখ রাঙালেন। বললেন, এটা দপ্তর, 'মুখোল-খানা' নয়। তুমি সরকারের চব্বিশ ঘণ্টার 'নোকর'। তোমার এই গাফিলাতি কেউ বরদাস্ত করবে না।

একদিন কামাই হ'লে কি খুব অন্যায় হয়, সর্দারজী?

আলবৎ হয়!—মোতি সিং ফুঁসিয়ে উঠলেন—আমার চোখের ওপর চোখ রেখে কথা বলো না! তুমি ডিসিপ্লিন ভেঙেছ। এটা পল্টন দপ্তর! তুমি সপ্তাহে দেড়-দিন ছুটি পাও, মাসের শেষে দুদিন। মনে রেখো, তুমি এখনো 'প্রবেশনারি পিরিয়ডে' আছ!

অর্থাৎ তিনি আমাকে তিরস্কার সহ সতর্ক ক'রে দিলেন। তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় অভিযোগ, আমার জিম্মায় কনফিডেন্সিয়াল রেকর্ডগুলি থাকে, তার চাবি আমিই রাখি। গতকাল এতে আপিসের কাজকর্ম ব্যাহত হয়েছে।

ওই গোপনীয় দলিলপত্রের সিন্দুকে আফগানরাজ আমানুল্লাকে গদিচ্যুত করার

পক্ষে বৃটিশ ষড়যন্ত্রের কতকগুলি নকশা ছিল। কর্নেল ওগুলি একবার পরীক্ষা করতে চেয়ে পাননি। সর্দারজীর উষ্মার কারণ হ'ল এই।

আমার মধ্যে অশান্ত বিপ্লব জেগে উঠেছিল কিছুদিন থেকে। মনে হচ্ছিল অন্য কোনও পরিচয় থাকতে পারে না। বাঁধা ছকের মধ্যে আমাকে থাকতে হবে, প্রতিদিনের প্রতিক্ষণের নিয়মবাঁধা জীবন যাপন না করলে আমার অন্য উপায় নেই। "ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী/মোর ডানা নাই আছি এক ঠাঁই/ সে কথা যে যাই পাসরি।"

এক ঠাঁইতেই আছি, ছোট্ট একটি ঘরে। চিড়িয়াখানার পশুরাজ সিংহের জন্য যে খাঁচা থাকে, তার চলাফেরার জন্য সেটা প্রশস্ত হওয়া চাই। সে বন্দী, কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব নেই। আমি আমার বর্তমান জীবন-ব্যবস্থার খাঁচায় বন্দী, আমার পালাবার পথ নেই।

নভেম্বরের বৃষ্টি নেমেছে রাওয়ালপিণ্ডিতে, ডিসেম্বরের দেরি নেই। সেই বৃষ্টির সঙ্গে বরফানি ঝড়ো হাওয়া, এ চলছিল দিনের পর দিন। মাতাজি আমার প্রতি স্নেহশীল, তিনি আমার স্নানের জন্য সকাল সাতটায় গরম জল পাঠাচ্ছিলেন। সেই জল আমি ফেলে দিয়ে 'কালাপানিতেই' স্নান করছিলুম। ছাদের ঠাণ্ডায় ঘুরলে শীতে দাঁতি লেগে যায়। আপিস যাবার পথে সবাই ছাতা মাথায় দিচ্ছে—আমি ছাড়া। পৌনে নটায় আপিসে যখন পেঁছিই তখন কোট প্যাণ্ট মোজা জুতো ভিজে থকথক করছে। মাথা থেকে জল পড়ছে, হাত দুখানা নীল হয়ে যাচ্ছে ঠাণ্ডায়। এমনি দিনের পর দিন। সেই মেঘ আর বৃষ্টিতে ধূসর পাহাড় শ্রেণীর দিকে তাকিয়ে আমি কামনা করতুম, অন্তত আমার নিউমোনিয়া একবারটি হোক, আমি কিছুদিন এই প্রাত্যাহিক রুটিন থেকে নিষ্কৃতি পাই এবং আমার এই সর্বনেশে স্বাস্থ্য কিছু কৃশতা লাভ করুক! কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, নিউমোনিয়া-ব্রঙ্কাইটিস দূরের কথা, আমার মাথাটি পর্যন্ত ধরে না! বরং ছোট আয়নাটা ধ'রে মাঝে মাঝে নিজের মুখখানায় দেখি, ঠাণ্ডায় গাল দুটো পাঞ্জাবী মেয়েদের মতো রাঙা। আমার গা ঘিন ঘিন ক'রে উঠত।

খবরের কাগজে দেখছিলুম সমস্ত ভারতে ইংরেজ বিদ্বেষ ঘন হয়ে উঠেছে। সাইমণ কমিশন সর্বত্র ধিকৃত। বড়লাট লর্ড রেডিং চলে যাচ্ছেন, আসছেন লর্ড আরুইন। বাংলায় স্ট্যানলি জ্যাকসনের রাজত্ব চলছে! পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্ট কলকাতায় কর্মতৎপর। বিদ্রোহী বাংলা সুভাস বসুর করতলগত। পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু সুভাষকে সমর্থন জানাবেন কিনা ভাবছেন। এবার কলকাতায় কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন। মূল সভাপতি পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু।

সন্দেহ নেই, আমি অস্বস্তিবোধ করছি কিছুকাল থেকে। আমার স্বাধীন ও বন্ধনহীন জীবন নয়, এই আমার অস্বস্তি। নিত্য দ্বন্দ্বে দোলায়মান নই, অশান্ত সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ নেই—আমি যেন নির্জীব, আমি যেন ছককাটা ছাঁচে ঢালা নিরুপায় একটা প্রাণী তলিয়ে যাচ্ছি লক্ষ লক্ষের জনস্রোতে। আমার চারিদিকে আর দারিদ্র্যে-

দৈন্য নেই, অন্ন খ্টে খাবার সংগ্রাম নেই, নিত্য জীবনরক্ষার প্রাণান্তকর গ্লানি খ্জিয়ে উঠছে না—এ কেমন? যারা সতীর্থ, তা'রা বলছে, তুমি খ্ব ভালো, তুমি সুযোগ্য, তুমি অধ্যবসায়ী ও অক্লান্ত। তা'রা দেখতে পাচ্ছে না আমার চিত্তলোকের বিদ্রোহ, দেখতে পাচ্ছে না আমার মধ্যে লকলকে বিদ্রোহের শিখা! এখন আমার অজস্র অর্থ, প্রচুর বিভব, সুখে ও সুখাদ্যে আমি গরীয়ান। কিন্তু এখন আর আমি সুখ চাইনে, দ্ঃখও চাইনে—আমি চাই যন্ত্রণা! কোথায় সেই দৈবযন্ত্রণা—যা আমাকে দিশাহারা করবে? অন্নে র্চি থাকবে না, অর্থে আসক্তি থাকবে না, নিদ্রা থাকবে না রাত্রে, স্প্হা থাকবে না সম্ভোগে—সেই মহৎ যন্ত্রণা কোথায়? আমি যেন আমারই প্রতি বির্প হয়ে উঠছিল্ম।

এমনি একটা মানসিক অবস্থা যখন চলছে তখন একদিন মাসের শেষ শনিবার সকালে ডাঃ বেদী হঠাৎ এসে উপস্থিত। সেটা ছ্টির দিন। অত্যন্ত শীতেও রৌদ্র ঝলমল করছিল। আমি স্নানাদি ও জলযোগ সেরে লেখাপড়ায় মনোযোগ দিয়ে-ছিল্ম। বৃদ্ধ সোজা এসে ঘরে ঢুকে সম্ভাষণ জানালেন। বললেন, ইয়ং ম্যান, এমন চমৎকার দিনে পথেঘাটে ছ্টোছ্টি না ক'রে ঘরে বসে আছ? বাতে ধরবে যে?

হাসিম্খে উঠে ওঁকে বসাল্ম। বলল্ম, বাতে ধরলে তখন আপনাকেই ডাকব।

অর্থাৎ এখন ডাকছ না!—বেদী বললেন, অর্থাৎ আমাকে ডাকার দরকার হবে না! অর্থাৎ এখন যে এসেছি, এটা তুমি চাইছ না! এই বলতে চাইছ ত?

আমি হাসছিল্ম।

বেদী বললেন, না, এ আমি হ'তে দেবো না। তোমাকে আমরা সবাই মিলে সামাজিক ক'রে তুলব। আমি লক্ষ্য করেছি, একলা থাকলেই তোমার মনে ভ্যাম্-পায়ারের উৎপাত বাড়বে। আমি ডাক্তার, আমি জানি তুমি ডিপ্রেসনে ভুগবে! চলো আমার সঙ্গে।

আপনার সঙ্গে? কোথায়?

যেখানে যেদিকে খ্শি—বেদী বললেন, নিচে আমার গাড়ি আছে। যদি ফার্স্ট করতে চাও, আমি রাজি। যদি ট্যাক্সিলার ওদিকে যেতে চাও, আমি তাতেও রাজি। তবে একটা কথা নিশ্চয় জেনো, আজ তোমাকে আমি হাত প্ড়িয়ে রাঁধতে দেবো না। নাও, তৈরি হও—আমার ওখানে খাবে।

বৃদ্ধ কোনও অজ্হাত শ্নলেন না। গাড়িতে আমাকে তুলে নিয়ে সোজা চললেন জনবহ্ল শহরের দিকে। পিণ্ডির বাজারের ধার দিয়ে শহরের বড় নহর পেরিয়ে খালসা কলেজ ছাড়িয়ে তিনি এলেন এক সম্ভ্রান্ত পল্লীতে। সেখানে বড় বড় বাড়ি, কোলে-কোলে বাগান, নিরিবিলি সুন্দর পথ। এ যেন একটা 'পশ' অঞ্চল। উচ্চ অবস্থাপন্ন শিখ এবং হিন্দ্রা এদিকে গায়ে গায়ে থাকে।

বেদী নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। আমাকে এক বাগানবাড়ির ফটকের সামনে এনে নামালেন। অতঃপর গাড়িখানা পাশের গ্যারাজে ঢুকিয়ে রেখে বাঁ হাতখানা সাদরে আমার কোমরে জড়িয়ে ভিতরে নিয়ে চললেন।

ধবধবে শাদা লোশপাড় একখানা শাড়ির ওপর একটি ফিকে নীল রংয়ের ফ্লানেল জ্যাকেট-কোট পরে ডাঃ বেদীর বৃদ্ধা স্ত্রী বেরিয়ে এলেন। বয়সের আন্দাজে মাথার চুল বেশি শাদা। আমি ওঁর পরিচিত। নিচু হ'য়ে আমি সহাস্যে প্রণাম জানালুম বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীকে।

বেটা, কুশল হো ?

জি।

হাসিমুখে বৃদ্ধা বললেন, দিমাক বিগড়ে হুয়ে ক্যা ?

হঠাৎ হেসে ফেললুম। বললুম, না মাতাজি, আমি খুব আনন্দে আছি।

এমন সময় বেদী ধ'রে নিয়ে-এলেন আরেক সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় ভদ্রলোককে। এঁকে চিনিনে, কিন্তু ইনিই আমার হাত ধ'রে সামনের মস্ত ঘরে নিয়ে গিয়ে সমাদরের সঙ্গে বসালেন। ইনিই গুরুদাস কাপুর—জগদীশচন্দর ও সরস্বতীর পিতা এবং বেদীর ভগ্নিপতি। আমি অনুমান করতে পারি কেন এখানে আমাকে আনা হয়েছে। কাপুর-সাহেব আমার সঙ্গে আলাপ করতে বসলেন। বাবু জগদীশের কাছে ইনি আমার সম্বন্ধে অনেক শুনেছেন বুঝলাম।

আমি বিব্রত বোধ করি বাইরের সৌজন্য ও শালীনতা দেখে, কিন্তু আমার মনের সিদ্ধান্ত কোনক্রমেই অস্পষ্ট নয়। ওখানে ধোঁয়া রাখিনে।

এ বাড়িরই একটা অংশে থাকেন ডাঃ বেদী, অন্য অংশটায় কাপুরসাহেব। কাপুর সাহেবের কাকার গোষ্ঠী হলেন শিখ, এবং তাঁর কাকার বড় ছেলে মহিন্দর সিং কাঁচা পাকা দাড়ি ও মস্ত পাগড়ি সমেত এসে আমার সঙ্গে আলাপ করতে বসলেন। একই পরিবারের একটা অংশ শিখ এমন উদাহরণ শত সহস্র। 'বাপ হিন্দু, ছেলে শিখ— যেখানে সেখানে। এটা হ'ল জাতি, ওটা হ'ল গোষ্ঠী। শিখ জামাই, হিন্দু শ্বশুর। গাছটা হিন্দু, তার একটা ডাল শিখ। যেমন আমাদের কাশীর সুধীন রায়। তার মাথা ন্যাড়া, পরনে দশ-টুকরো সেলাই করা গেরুয়া কাপড়, সে নাকি বৌদ্ধ। সে থাকে 'ভিক্ষুর' বেশে।

এখন দেখছি আমাকে এখানে ধরে আনা হবে, এটি আগে থেকে সবাই জানতেন। আমি সুদূর বাংলাদেশের ছেলে, কিন্তু পাঞ্জাবের প্রান্তে এসে আমি নাকি তলিয়ে গেছি পাঞ্জাবী সমাজে। আমার নাকি সব বদলিয়ে গেছে। আমার আহার্যের উপকরণ, রীতি-প্রকৃতি, মুখের ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আলাপের ভঙ্গী, জীবনযাত্রার চেহারা, ইয়ার-বক্সি,—সবই নাকি এখন পাঞ্জাবী। ওঁরা নাকি আমাকে এখন ওঁদের নিজের লোক বলে দাবি করতে পারেন। আমার 'অ্যাডাপটেবিলিটি' নাকি অসাধারণ। এখন আমাকে কথায়-কথায় আর ইংরেজী বলতে হয় না, আমি গুরুমুখী ও পুস্তুতে রপ্ত।

গল্পগুজবে আমিও মেতে উঠেছিলুম ওঁদের সকলের সঙ্গে। এতক্ষণ পরে এসে দেখা দিলেন বাবু জগদীশচন্দর। তিনি সদ্যস্নাত। তাঁর চেহারা, রং ও স্বাস্থ্য খুবই সুন্দর। উনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, তিরিশ-বত্রিশ হবেন। ওঁর মধুর

ব্যবহারের প্রতি আমি খুবই অনুরক্ত। আমার সহকর্মীদের মধ্যে উনিই সিনিয়র এবং সর্দার মোতি সিংয়ের ঠিক নিচে। আমি সকলের নিচে শুধু আমার নিচে হল পেয়াদা, চাপরাসী, ড্রাইভার ইত্যাদি। ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থাদি আমি দেখিশুনি।

এর মধ্যে একে একে এসে পেঁছেছেন আমাদেরই বন্ধু, সহকর্মী ও পরিচিতরা। সদানন্দ, নাসির আহমেদ, অমর সিং, রূপলালজী এবং আরও আজ এখানে সকলেই আহারাদি করবেন। ডাঃ বেদী হলেন 'লালজি' অর্থাৎ লালা লজপৎ রায়ের বন্ধু। সুতরাং প্রসঙ্গক্রমে রাজনীতির আলোচনা উঠল। কেউ কেউ শুনেছেন এর পরের বছরে নাকি লাহোরে কংগ্রেস বসবে। কিন্তু সবই নাকি মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছা। এখন সকলের চোখ কলকাতায়।

ঘরের বাইরে থেকে মেয়েরা জগদীশচন্দরকে ইশারা করছিলেন। ওঁদের সঙ্গে মারী পাহাড়ে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। বিশেষ করে রম্ভা, রাজমোতী, মায়া শেঠী প্রভৃতি। কিন্তু আমার গা কেঁপে উঠল যখন বাবু জগদীশ আমাকে বললেন, চলো ফিরু, অন্দরমে আ যাইয়ো—

তিনি নিজেই উঠলেন এবং আমাকে ডেকে নিয়ে ভিতরে চললেন। গুর্দাসজি অলক্ষ্যে আমার দিকে তাকালেন। আমি তখন যেন 'নবমীর পাঁঠা',—হাড়িকাঠের দিকে যেন আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে! কিন্তু অত ভয়ই বা কিসের? জোর ক'রে কি আমাকে দিয়ে কেউ গলায় মালা দেওয়াবে?

জগদীশ আমাকে দোতলায় তুলে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ওইটুকুর মধ্যেই আমার ছোট-বেলার একটি ঘটনা মনে এল। চাটুয্যেদের বড় বউ একদিন এক ঠ্যাং-খোঁড়া তরুণ সন্ন্যাসীকে দুপুরবেলা রাস্তা থেকে ডেকে পাঠালেন। সন্ন্যাসীর নাম সত্যনারায়ণ ঠাকুর। বড় বউ তাকে প্রশ্ন করে জানলেন, তা'র এখনও মধ্যাহ্নভোজন হয়নি। ছেলেটা আধখুটে। বলল, আমি ভিক্ষে করে খাই। বড় বউ তাকে চর্ব্যচুষ্য করে খাওয়ালেন। পরে বললেন, তোমাকে আমি পাঁচটা টাকা দেবো, তুমি আমার একটা কাজ করে দেবে! ঠাকুর এক কথাতেই রাজি। বড় বউ তখন নবনির্মিত শ্রীমানী বাজার থেকে এক ছড়া গাঁদাফুলের মালা আনালেন। ঘরে ছিল তাঁর চীনা সিঁদুর। তারপর ও-ঘর থেকে ডেকে আনলেন তাঁতীদের সেই ডাগর মেয়েটাকে। মেয়েটা কুণ্ঠিত লজ্জায় সত্যনারায়ণের সামনে এসে দাঁড়াল। বড় বউ বললেন, এই মালাগাছটা যমুনির গলায় পরিয়ে দাও, সিঁদুর দিয়ে দাও ওর সিঁথিতে।

পাঁচ টাকার লোভে সত্যনারায়ণ তৎক্ষণাৎ বড় বউর নির্দেশ পালন করল। কিন্তু পরে সে আবদার ধরে বলল, নতুন বউকে নিয়ে থাকব না আজ রাত্তিরে?

রাত্তিরে থাকবে?—বড় বউ বললেন, তা হলে ও-পাঁচ টাকা নতুন বউকে দিয়ে যেতে হবে।

সত্যনারায়ণ অনেকক্ষণ ভাবল। ভেবেচিন্তে দেখল, তার এই নতুন কনে-বৌ অপেক্ষা পাঁচটা টাকার দাম অনেক বেশি। সুতরাং সে যাত্রায় সত্যনারায়ণ পালিয়ে বাঁচল। বহুকাল পরে শুনেছিলুম, যমুনি ছিল চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা। সমস্ত

ঘটনাটা ঘটে গিয়েছিল ঘণ্টাখানেকের মধ্যে।

উপরতলায় উঠে লাউঞ্জ-এ ঢুকতেই মহিলারা হাস্যরোলে কলরব ক'রে উঠলেন। আমারও মেজাজ শরিফ ছিল। আমিও উচ্চকণ্ঠে উল্লাসে ওঁদের সঙ্গে যোগ দিলুম। বাবু জগদীশ জানালেন, 'সানিয়ালা' এতক্ষণ বুড়োদের মজলিসে জমে গিয়েছিল! লো বয়ঠো, টেগোরকা এক পোয়েম্ রিসাইট্ করো!

ওরই মধ্যে একটিবার দেখে নিয়েছি সরস্বতীকে অর্থাৎ আমার ভাবী বধূকে! ভাবী কিংবা অবশ্যম্ভাবী এখনও ঠিক বুঝতে পারছিনে। তবে উনি সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে আনম্র নমস্কার বিনিময় করেছেন! ওর পরনে আজ কমলাবর্ণ শালোয়ার, গায়ে আসমানী রংয়ের বেলদার ফ্লানেলের জোব্বা, মাথার বেণীবন্ধে দুটি রক্ত গোলাপ। রৌদ্রের আভায় সুন্দরী কুমারীর ভরা যৌবন ঝলমল করছে!

জগদীশের স্ত্রী রম্ভা নিয়ে এলেন বাদাম আর কিসমিস, আনলেন ক্ষীরের মিষ্টান্ন। জগদীশের মা এলেন। রাজমোতীর পাশে এসে বসলেন ডাঃ বেদীর স্ত্রী। জানলার ধারে দাঁড়ালেন মায়া দেবী, সরস্বতী এবং তার কলেজের এক সহপাঠিনী,—তার নাম এখনও শুনিনি।

হাতের কাছে বই নেই। তবু মহাকবির 'বোধন' কবিতাটি আমার মুখস্থ ছিল। আমি সেটি আবৃত্তি আরম্ভ ক'রে, দেবার আগে ওদেরকে বুঝিয়ে দিলুম, দক্ষিণায়ন থেকে উত্তরায়ণের পথ পরিক্রমায় অগ্রসর হয়েছেন সূর্যদেব! সেই চিরকালীন বার্তা এসে পৌঁছেছে বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরলোক। বিদায় নিচ্ছে শীতের অঙ্গসজ্জা, ঋতুরাজ বসন্ত আসছেন তাঁর বাসন্তী উত্তরীয় উড়িয়ে। না, আমার চোখ যেন সরস্বতী আকুলিত মুগ্ধ দৃষ্টির উপর না পড়ে। 'বোধন' কবিতাটির অংশবিশেষ আমি ধরে নিলুম:

"বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন তাহার, সৃষ্টি তাহার খেলা/দস্যুর মতো ভেঙেচুরে দেয় চিরাভ্যাসের মেলা/মূল্যহীনেরে সোনা করিবার পরশ পাথর হাতে আছে তার/তাইত প্রাচীন সঞ্চিত ধনে উদ্ধত অবহেলা!

"বলো জয় জয়, বলো নাহি ভয়—কালের প্রয়াণ পথে আসে নির্দয় নবযৌবন ভাঙনের মহারথে।/চিরন্তনের চঞ্চলতায় কাঁপন লাগুক লতায়-লতায়/থর থর করি উঠুক পরাণ প্রান্তরে পর্বতে।"

বলতে বলতে এক সময় ওদেরকেই বোঝাবার জন্য অনুপ্রাণিত কণ্ঠে ইংরেজিতে চেঁচিয়ে উঠলুম, and yonder, in the dales and meadows and mountains, the new abundance of life is sprouting forth!

"বার্তা ব্যাপিল পাতায় পাতায়, করো ত্বরা, করো ত্বরা!/সাজাক পলাশ আরতি-পাত্র রক্ত-প্রদীপে ভরা। দাড়িম্ব বন প্রচুর পরাগে হোক প্রগল্‌ভ রক্তিম রাগে মাধবিকা হোক সুরভিসোহাগে মধুপের মনোহরা!"

আবৃত্তির কালে আমি ঈষৎ আত্মবিস্মৃত হই। আমার দেহ, মন, চক্ষু ও কণ্ঠ কাঁপে। আমি যেন সেই প্রকৃতি, আমিই ঋতুরাজ,—আমার সামনে থেকে সরে যায়

সাম্প্রতের আবরণ। আমার পাঁজরের মধ্যে সেই ১৯০৫-এর জন্মলগ্নে আষাঢ়ের ঝিল্লী-ঝনক রাত্রের মতো রক্তের কোলাহলের মধ্যে আনে "ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক, পাঁজরের উপর আছাড় খাওয়া মরণ-সাগরের ডাক—"

এবার আমি চুপ ক'রে গেলুম। মিনিট দুয়েক সবাই স্তব্ধ। আবেগ-উদ্দীপনায় আমার কান দুটো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। মুখ তুললুম সরস্বতীর দিকে। সেইক্ষণে একবারটি আমার মনে হয়েছিল, আমাদের দু'জনের চারটে চোখ ছাড়া এই বৃহৎ লাউঞ্জে এবং এর বাইরে সমগ্র বিশ্বলোকে জীবন-স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেছে। এম সময় একা সরস্বতী নতমুখে বাইরে চলে গেল।

মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন হয়েছে পাশের ডাইনিং হলে। সেখানে মেঝের উপর প্রায় ঘরজোড়া গদি পাতা। গদির উপর বসে সবাই খাবে। ঠাণ্ডার কালে অনেক গৃহস্থের এইটিই রেওয়াজ। জুতো ছেড়ে ওই গদির একপাশে জায়গা নেবার আগে জগদীশকে এধারে ডেকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলুম, আজ সবাইকে ডেকেছেন, কোনও উৎসব আছে বুঝি?

বাবু জগদীশচন্দর উল্লসিত হাসি হেসে বললেন, তুমি বড়ই চতুর, আমাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে চাও যে, তোমাকে দেখার জন্য সবাই এসেছেন।

সহকর্মী এবং অতি ভদ্রচিত্ত রূপলালজি আমাকে তিরস্কার করছিলেন। এবার বললেন, বাবু সানিয়ালা, মনে রেখো তুমি খুবই সৌভাগ্যবান।

থালার উপর গরম গরম চাপাটি! পাশে এক বাটি গালানো ঘি। ডালের বাটির উপর ঘি দাঁড়িয়ে। মসলাদার গোবি। ভিণ্ডিকা-রসা। তরিতরি আলু পিঁয়াজ। পাঁপড়। ইমলি-অদরক-কি-খাট্টা। সিনুয়া, কালাকন্দ, দহিবড়ে, বাদাম আওর কিসমিস!

থই থই করছে উপাদেয় সুভোজ্য। যেন লোভ সাজনো রয়েছে থরে থরে। কিন্তু আহারে আমার রুচি চলে গিয়েছিল!

অপরাহ্নকালে একে একে সবাই বিদায় নিচ্ছেলেন। আমি যাব কালীবাড়ির দিকে বটুদের ওখানে। সেখানে ক্যারম্ খেলার সঙ্গী জুটবে। ডাঃ বেদী ওঁর গাড়িতেই ওখানে আমায় পেঁাছিয়ে দেবেন।

রূপলালজি বিদায় নেবার পর আমি মহিলাগণের কাছে আপাতত বিদায়নিচ্ছিলুম। শ্রীমতী সরস্বতী আরক্তিম লজ্জায় সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি কিছু গাম্ভীর্য রক্ষা করছিলুম।

নিচের তলাকার হল্ পেরিয়ে যখন বাগানে নেমেছি, বাবু জগদীশ আমাকে একান্তে ডাকলেন। বললেন, তোমার সার্ভিস রেকর্ড কর্নেলের খুব পছন্দ এ তুমি নিশ্চয় জানো। সামনের চব্বিশ তারিখে উনি তোমার 'প্রবেশনারি পিরিয়ড' শেষ করে দিতে চান্। তুমি পার্মানেণ্ট হয়ে যাচ্ছো। একশ পঁচিশ টাকায় তোমার স্টার্টিং হচ্ছে।

বাবু জগদীশচন্দর আমার হাতখানা টেনে সহাস্যে হ্যাণ্ডশেক করলেন।

সামরিক দপ্তরে আমার চাকরি স্থায়ী হচ্ছে পাঁচজনের আশীর্বাদে এবং প্রতি মাসের পয়লা তারিখে হার্ড ক্যাশ একশ' পঁচিশ টাকা আমার হাতে আসবে, এটা রোমাঞ্চকর! কো-মারীতে থাকতে প্রতি মাসে মাইনে পেয়ে পাহাড়তলীর একান্তে গিয়ে মাইনের টাকাটা বার বার গুনতুম। গুনে গুনে যেন ফুরোয় না! সেই মাছের কারবারের পর আর কবে দেখেছি একশ' চার টাকা একসঙ্গে? যদি বা দেখে থাকি, সে টাকা নিজের বলে জেনেছি কখনো? তাই মাঝে মাঝে মনে হ'ত আমি টাকায় ভাসছি! উপার্জনের এক-চতুর্থাংশও যখন খরচ হত না, তখন ভয়ে-ভয়ে ভাবতুম, এত টাকা নিয়ে কী করব, কোথায় রাখব!

এই চাকরি এবার পার্মানেন্ট হচ্ছে। একুশ টাকা মাইনে বাড়ছে। যদি বশম্বদ হয়ে থাকতে পারি, তবে এ-চাকরি আগুনে পুড়বে না, জলেও ডুববে না! অতঃপর উন্নতির পর উন্নতি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি—এবং সেই বৃদ্ধি আমার পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কোন্ শিখরে গিয়ে পেঁাছবে—ভাবলে গা ডোল হয়ে আসে! নিজে সম্পূর্ণ একটা ফ্ল্যাট নেবো, চার হাজার টাকায় বিলেতী একখানা বেবি-অস্টিন কিনে ড্রাইভিং শিখবো, পাশে বসিয়ে নেবো সরস্বতীকে—পরনে থাকবে তার ওই নীলাভ সার্টিনের শালোয়ার, গায়ে রক্তনীল বর্ণের মোগলাই জ্যাকেট, আতাম্র তার বেণীবন্ধে প্রিমরোজের গন্ধ, নম্রমধুর হাস্যে মিলিয়ে থাকবে অপরাজেয় লাবণ্যের মাধুর্য। তারপর না হয় দূর থেকে দূরে চলে যেতুম দুজনে! শুধু তুমি আর আমি! "কপোত-কপোতী যথা থাকে উচ্চ বৃক্ষচূড়ে—"

কিন্তু আমার জন্মলগ্নে ছিল বোধ হয় শনি!

যথারীতি চব্বিশ তারিখে সকাল পোনে ন'টার মিনিট দুই আগেই আমি আপিসে গিয়ে হাজির হলুম। আমার হাতে ছিলো গোলাপ ও সূর্যমুখীর একটা গুচ্ছ রেশমী লাল সুতোয় বাঁধা। আমাকে দেখামাত্রই আজ অফিস-সুপার সর্দার মোতি সিং সানন্দে একখানা হাত বাড়িয়ে করমর্দন ও অভিনন্দিত করলেন! তারপর একে একে বাবু জগদীশ, আজিজ আহমেদ, রূপলাল ও লেখরাজ। সককের মুখে হাসি ও শুভেচ্ছা। ওঁরা জানেন আমি ফুলের তোড়া এনেছি কার জন্য!

সর্দারজির অনুমতি নিয়ে করিডর পেরিয়ে আমি 'ডি-ডি-এস-টি'র কক্ষে ঢুকলুম। পক্বকেশ কর্নেল কোলিন্স মগ্ন টেবলের সামনে ব'সে কাগজপত্র দেখছিলেন।

'মে আই কাম ইন্ স্যার?'

'ও ইয়েস—'

'গুড মর্নিং—'। কয়েক পা এগিয়ে আমি ফুলের তোড়াটা তাঁর হাতে দিলুম এবং তিনি সহাস্য ধন্যবাদের সঙ্গে সেটি গ্রহণ করলেন। আবার বলি তোষামোদে আমি বরাবরই সিদ্ধহস্ত।

হিয়ার্স এ গুড নিউজ ফর ইউ, মিঃ সানিয়াল।—কর্নেল কোলিন্স ড্রয়ার থেকে একটা ফাইল বার করে উপরের প্রথম কাগজখানা সামনে ধরলেন। মোটা কাগজখানার উপর দিকে সরকারী সিল্ করা—'অন্ হিজ্ ম্যাজেস্টিজ্ সার্ভিস'। বাঁ-দিকে একটি রাজকীয় প্রতীক-চিহ্ন। কাগজখানা সুন্দরভাবে টাইপ করা। কিন্তু তলার দিকে দস্তখৎ ছিল না। এবার সেখানায় সই করে কর্নেল প্রসন্নমুখে বললেন, একটু আগেভাগেই তোমাকে পার্মানেন্ট করা হচ্ছে। তোমার সার্ভিস রেকর্ড ভাল। বি হ্যাপি, মিঃ সানিয়াল।

কাগজখানা উনি আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ যেমন বছর দশেক আগে ভারতবাসীকে 'রাউলাট্ অ্যাক্টের রিফর্ম' দিতে চেয়েছিল।

আমি নতমুখে পিছন দিকে হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কাগজখানা নিলুম না। ওই শনিগ্রহই আমার আচরণে কঠিন প্রতিজ্ঞা যুগিয়ে আমাকে শান্ত ও অবিচল করে রেখেছিল।

'হোয়াট্স্ দি ম্যাটার ?'

আমি অধোবদন।

'হোয়াটস্ রং উইথ ইউ, সানিয়াল ? টেল্ মি ইফ আই ক্যান্ হেল্প ইউ ?'

কয়েক সেকেন্ড মাত্র। তারপর মুখ তুললুম। নম্রকণ্ঠে বললুম, স্যার, এ-চাকরি আমি ছেড়ে দেবো স্থির করেছি। আমি চলে যেতে চাই!

কোলিন্স কতক্ষণ স্তব্ধ চক্ষে আমার চোখের দিকে তাকালেন। পরে তিনি আমার কাগজখানার প্রতি আরেকবার চোখ বুলিয়ে বললেন, পুয়োর ফেলো,—আচ্ছা, বাইরে গিয়ে বসোগে।

ওঁকে নত নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিলুম।

আমার স্বচ্ছন্দ হাসিমুখ দেখে সর্দারজি ও সহকর্মীরা যখন প্রফুল্লমনে আমাকে আরেকবার সমাদর জানাচ্ছিলেন, তখন ভিতর থেকে বেল্ বাজলো। সর্দারজি তৎক্ষণাৎ আসন ছেড়ে উঠে কর্নেলের ঘরের দিকে ছুটলেন। আমি রেমিংটন মেসিনে আমার নিজের মৃত্যুর পরোয়ানা অর্থাৎ ইস্তফা-পত্র টাইপ করতে বসে গেলুম।

সুদীর্ঘ মিনিট পাঁচেক, তারপর হতবুদ্ধির মতো সর্দারজি এ ঘরে ফিরে এলেন। যিনি একটা আমার মাত্র একটি দিনের কামাইয়ের জন্য কঠোর তিরস্কার করে বলেছিলেন, 'এটা সরকারী দপ্তর, আড্ডাখানা নয়,'—আজ তাঁর মুখের চেহারা অন্যরূপ। মুখে চোখে যেন তাঁর পরাজয়ের গ্লানি।

এরপর আমাদের ওই সেকশনে যে অশান্ত একটা কলরব উঠল, সেটার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। শুধু শনি নয়, আমাকে যেন ভূতে পেয়েছিল! রাজার চাকরি কেউ বিনা কারণে হাসিমুখে ছাড়ে, এটা অবিশ্বাস্য। এ কেমন ছেলে যে বেকার অবস্থার ভয় পায় না, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে, যে-ডালে বসে সেই ডাল কাটে, নিশ্চিন্ত সুখী জীবনের প্রতি যার মোহ নেই,—এ ছেলে কেমন ? এ ছেলে অপরিণামদর্শী, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, অগ্রপশ্চাৎ-বিবেচনাহীন, অস্থির-মূর্তি। এ ছেলে চটলপ্রকৃতি, বিশ্বাসহন্তা,

শুণমর্জি'—এ শুধু নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছে! 'বঙ্গালিকো বিশওয়াস নেহি করনা চাই।'

অদূরে দেখছিলুম বাবু জগদীশ মাথা হেঁট করে পেন্সিল দিয়ে কি যেন হিজি-বিজি কাটছিলেন। বোধ হয় ওই আঁকিজুঁকির মধ্যে তিনি আপন সহোদরা 'সম্বতির' ভবিষ্যৎ নকশা এঁকে যাচ্ছেন। ওঁর প্রতি আমার একান্ত অনুরাগ উনি জানেন।

সেদিন টিফিনের কালে এক সময় সর্দারজি কয়েক পা এগিয়ে এসে হঠাৎ উষ্ণ কণ্ঠে বললেন, কাল তোমার কোর্ট মার্শালে বিচার হবে তা জানো?

ওঁদের সকলের এই প্রকার মনশ্চাঞ্চল্য আমার পক্ষে কৌতুকের কারণ হয়েছিল। আমি বিনীত সৌজন্যের সঙ্গে বললুম, কোর্ট মার্শালের পর কি আমার পাওনাটা চুকিয়ে দেবেন, সর্দারজি?

উনি বোধ হয় আমাকে একটু ভয় দেখাবার জন্যই বললেন, কর্নেল সাব তোমার বিচার করবেন। তোমার মাথায় লাল ক্যাপ পরানো হবে এবং এগারো জন সৈন্য বেয়নেট-রাইফেল নিয়ে তোমাকে তাগ্ করবে!

আমি অত্যন্ত ভীরু, তাই গলা শুকিয়ে উঠল। তবু হাসিমুখে বললুম, কোর্ট মার্শাল আগে কখনো দেখিনি। এ আমার নতুন অভিজ্ঞতা হবে, সর্দারজি।

মনে করেছিলুম আপিসের ছুটির পর গা ঢাকা দিয়ে কেটে পড়ব। কিন্তু তা হ'ল না, ওরা সবাই ওৎ পেতে ছিল। সবাই এসে আমাকে ঘিরে ধরল, এবং নাস্তানুবুদ করে ছাড়ল। আজিজ আহমেদ বললেন, তোমাকে চ্যাংদোলা করে আমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আটকিয়ে রাখব! 'অ্যায়সা বদ্‌কাম নেহি বরদাস্ত করেঙ্গে।' বাবু জগদীশ আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, তোমার রত্নভাবীজি কত মন খারাপ করবেন তুমি কি ভাবছ না? একবারও কি তুমি ভাবছ না একটা ফ্যামিলির সবাই তোমার দিকে চেয়ে রয়েছে? কেন চলে যাচ্ছ তুমি?

আমার মধ্যে কিছু আবেগের স্পর্শ লেগে থাকবে। বাবু জগদীশকে আমি জড়িয়ে ধরলুম। তাঁর গলার কাছে মুখ রেখে বললুম, নিয়তি আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ভাবীজি যেন আমাকে ক্ষমা ক'রেন।

উনি আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন একান্তে। একটু চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি সম্বতীর ওপর কোনও কারণে রাগ করে এ বিয়ে নাকচ করছ?

অবাক কাণ্ড! আমি হেসে উঠলুম।—এ-সব মনেও আনবেন না দাদা জগদীশ। এ-সব আমার পক্ষে অভাবনীয়।

একে একে বাঁধন কাটতে সময় কিছু লাগল। কোর্ট মার্শালে বিচার আমার হয়নি, কেননা আমি রেগুলার স্টাফের কেউ নই এবং এখন কোনও জরুরী প'রিস্থিতিও নয়। প্রায় একশ' তিরিশ টাকা আমি বাকি বকেয়া সমেত পেয়ে গেলুম। বটু আর হেমদের কাছে বিদায় নিলুম। ওদের বৌদিদি আমাকে 'ডানপিটে' বলে গালি পাড়লেন। 'নকল পাঞ্জাবী'র লেখক উপেন ঘোষকে বিদায় সম্ভাষণ জানালুম।

শিখ-মাতাজি আমার কাছে টাকা নিতে চান না। কিন্তু তিনি আমার জন্য

অনেক করেছেন। জোর করে তাঁকে পঁচিশটি টাকা গছালুম। আমার তহবিলে দীর্ঘকাল ধরে তখন অনেক টাকা জমেছে। একবার ভাবলুম ছুটে যাই আমার নিত্য-কল্যাণকামী ডাঃ বেদীর ওখানে, দেখা করে আসি গুর্দাস কাপুর মহাশয়ের ওখানে। কিন্তু ভাবলুম আমার মধ্যে কি সরস্বতীর জন্য কোনও দুর্বলতা আছে? তবে কি যাবার আগে তাকে শুনিয়ে যেতে চাই, "ভয় রাখিয়ো না তুমি মনে/তোমার বিকচ ফুল-বনে দেরি করিব না মিছে/ফিরে চাহিব না পিছে/দিন শেষে বিদায়ের ক্ষণে—"

না, যাব না!

পরদিন গোধূলিকালের দিকে আমি 'ফ্রনটিয়ার মেল' ট্রেনের একটি থার্ড ক্লাস কামরায় উঠলুম। আমার পোশাকপত্র কিছু বেড়েছে, আমি পরিচ্ছদ-বিলাসী হয়ে উঠেছি। আমার ঢিলা-হাতা শীতের গাউন, তিন-চারটে গরম স্যুট, গোটা দুই লং কোট, পাগড়ি-শালোয়ার-জ্যাকেট-টুপি ও ক্যাপ সব মিলিয়ে অনেকগুলো জঞ্জাল! তিন চার জোড়া জুতো, আট-দশ জোড়া মোজা, হ্যাণ্ডব্যাগ, পোর্টম্যাণ্টো, ভদ্র কিছু বিছানা ও কম্বল, কিছু শৌখীন প্রসাধন সামগ্রী, এক্সারসাইজের জন্য চেষ্ট-একস্প্যাণ্ডার—আগাগোড়া অপব্যয়ের পরিচয়! এরা আমার বাঁধন, এদের থেকে মুক্তি পাওয়া চাই। আমি একদা এই দূর বিদেশে এসেছিলুম দরিদ্রের সজ্জায়, সেই চেহারাতেই আমি ফিরে যাব। আমি পাঠ নিয়েছি বিশেষ একটা জীবনে, অভিজ্ঞতা আহরণ করেছি অপরিচিত একটা জগতে বিচরণ করে—সেই আমার সঞ্চয়। আমি যেন থেমে যেতে বসেছিলুম একটা সম্পদ-সৌভাগ্যের চক্রান্তে। এবার আমি আরেকবার গতিলাভ করলুম। আমাকে যেতে হবে জীবনের পথ ধরে অনেক দূরে, দূর থেকেও দূরে! আমার অশ্রান্ত গতিকে আমি থামতে দেবো না। আমার পথ কোনও দিন শেষ হবে না।

নিরবচ্ছিন্ন একা। কিন্তু অদ্ভুত লাগছে আজ নিজের নিঃসঙ্গতা। পিছনে ফেলে যাচ্ছি এমন একটা জীবন যেটা আগাগোড়া অবাঙ্গালী। জনি আর রোশন পড়ে রইল দূর পিছনে। ওরা জেনে রইল আবার আমি ওদের সামনে গিয়ে হাজির হব আসছে বছরে— যখন ওক, আখরোট আর শিশমের বনে প্রজাপতিরা রঙীন পাখায় ঘুরবে। সেই শারদাপীঠের উপত্যকাপথে মধুমতীর পাশ দিয়ে আমি আর শের মহম্মদ! মিনি-মার্গের বচ্চিন্দর সিং এবং সেই স্মরণীয় রাত্রে শমরুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা! বন্ধুবর থাম্বার সঙ্গে সেই সানিব্যাঙ্ক থেকে কোহালায় গিয়ে সেই কটেজ গার্ল-এর ঘর ওদের সেই নেশাভাঙের হুড়োহুড়ি! পহলগাঁওয়ের পাইন বনের নিচে সেই সেবাকর্মের ক্যাম্প। আমার চোখের সামনে দিয়ে সরে যাচ্ছে ছবির পর ছবি।

রেলপথের দুদিকে ধূসর অন্ধকারের ছায়ার ভিতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলুম আমারই ভবিষ্য জীবনের ভৌতিক একটা চিত্র। এ তুই কী করলি রে? এ যে সর্বনাশা হঠকারিতা, এ যে চরম আত্মনাশের পথ ধরেছিস! মাথা ঠাণ্ডা হ'লে দেখবি, সোনালী ধানভরা সোনার তরীকে নিজের হাতে তুই ডুবিয়ে দিয়ে এলি! স্বাস্থ্য তোকে উজ্জ্বল করেছিল, সাচ্ছল্য ও সৌভাগ্য তোর গৌরব এনেছিল, ভবিষ্যতের সর্বপ্রকার নিরাপত্তা

—সব তোর ঘুচল। এখনও সময় আছে, এখনও নিশ্চয়ই কোলিন্সের চিঠিখানা তাঁর ফাইলে ধরা রয়েছে—এখনও ফিরে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে বসে যা যদি নিজের ভালো চাস!

—আমি হাসলুম।

সেদিন অনেক রাত্রে তন্দ্রার মধ্যে অনুভব করছিলুম, আমার মস্তিষ্কের মধ্যে ঢুকে এক শীতার্ত ও ক্ষুধার্ত নেড়ি কুকুরের ছানা অবিশ্রান্ত কেঁউ কেঁউ করছে। সে নালিশ জানাচ্ছে, প্রতিবাদ করছে, কথায়-কথায় তর্ক তুলছে। অন্যদিকে আমারই বুকের মধ্যে কোনও এক সঙ্গোপন কোণে আশ্রয় নিয়েছে যে-জন, সে হরিণনয়না! সেই শ্মরত দুই নিবিড় চোখ জলে ভরো-ভরো। সে যেন রাজেন্দ্রাণী, শিবতপস্বিনী। সে যেন আমারই কানে কানে আমারই প্রিয় কবিতার চরণ ধরে গুনগুন করছে তার কোমল মধুর কণ্ঠে: "আমি দাঁড়াব যেথায় বাতায়ন কোণে/সে চাবে না সেথা জানি তাহা মনে/ফেলিতে নিমেষ দেখা হয়ে শেষ, যাবে সে সুদূর পুরে—/শুধু সঙ্গের বাঁশি কোন্ মাঠ হতে বাজিবে ব্যাকুল সুরে।" আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছিলুম, গুর্দাসজির বাড়িতে রাত শেষ হতে চলল। তাঁদের সেই অন্ধকার ঘরের বিছানায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে চোখের জল ফেলছে সরস্বতী। মিসেস কাপুর আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি ডাকলেন, এত কাঁদছিস কেন রে?

সরস্বতী যেন সাড়া দিল না। বড় বড় দুই চোখে অন্ধকারকে সে ধরে রইল।

সমস্ত রোমাণ্টিক ছবিটি দেখতে দেখতে কখন আমি ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিলুম।

ঘুম ভাঙলো এক সময়। কে যেন পায়ের উপর চাপ দিল। উঠে বসে দেখি সকালে গাড়ি থেমেছে "ঝিলম" স্টেশনে। একটি সুশ্রী যুবক আমার পায়ের দিকে জায়গা নিয়েছে। জানলা দিয়ে দেখি ঝিলমের পুল। নদীর ওপারে মস্ত এক মন্দির, আশেপাশে দেবস্থান। ঘাটে ঘাটে স্নানার্থীদের জনতা। যুবকটিকে প্রশ্ন করে জানলুম, এটি হিন্দুতীর্থ, সামনে রঘুনাথজি অর্থাৎ শিবের মন্দির। জম্মু পাহাড়ের মীরপুর এলাকা ছেড়ে ঝিলম নদী প্রথম নামছে পাঞ্জাবের সমতলভাগে। যেমন হৃষী-কেশের নীলধারা হরিদ্বারে এসে হয়েছে গঙ্গাবতরণ। আমি পিণ্ডি যাবার পথে একদা ঝিলম হয়ে গিয়েছিলুম, কিন্তু সে রাত্রের দিকে।

ছেলেটার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। সে আমারই সমবয়সী। নাম গোলাম মনসুর! ওদের বাড়ি ল্যাহোরে। ওরা পশমের ব্যবসায়ী। ওদের এজেন্সি আছে জম্মু, খারিওয়াল, লুধিয়ানা, অমৃতসর, মিঞাবালি প্রভৃতি শহরে। আমি বললুম, মিঞাবালি, দাউদখেল, দরিয়াখাঁ, ডেরা ইসমায়েল খাঁ, ডেরা গাজি খাঁ, মুলতান—ওসব আমার বেশ পরিচিত। আমি চাকলালা, কোহাট, বান্নু, রজমাক—যখন-তখন যাই। সিন্ধু সাগর দোওব, রেচনা দোওব,—বারি দোওব—এসব অঞ্চল আমার খুবই পরিচিত।

কথায় কথায় মনসুরের সঙ্গে বন্ধুত্ব জমে উঠল। আমার আলাপচারি শুনে ওর ধারণা হ'ল আমি পাঞ্জাবী। আমি যে বাঙ্গালী এবং বিদেশ-বিঁভুয়ে গিয়ে বাঙ্গালীর ছেলে যেমন চালিয়াতি করে, আমিও তার ব্যতিক্রম নই। ওকে জানালুম, আমি পল্টন

দপ্তরের লোক, আমি যাচ্ছি অমৃতসরে। মনসুর জানালো ওর আব্বা গিয়েছেন হজ করতে, এখনও ফেরেননি। ওর মা মারা গেছেন বছর দুই আগে যখন মনসুর বি-এ পড়ে। আব্বা ওকে কারবারে বসিয়ে দিয়েছেন, এম-এ পড়তে দেননি।

শিখ-মাতাজি আমার সঙ্গে একরাশ খাবার দিয়েছিলেন, সেগুলো হ্যাণ্ডব্যাগের মধ্যে থেকেই গেছে। এবার মনে পড়ে গিয়ে সেগুলো বার করলুম এবং মনসুরকে জবরদস্তি করে আমার সঙ্গে খেতে বসালুম। সবগুলো একদম ঠাণ্ডা। তা হোক। ভালো ঘিয়ের পুরি, মাংসের বড়া, সিদ্ধ ডিম, এক থালা আঙুর, মনক্কা, বাদাম, আপেল, বড় লঙ্কার আচার ইত্যাদি। মনসুর এই শর্তে খেতে বসল যে, আমি লাহোরে ওর বাড়িতে নামব। আমি রাজি হয়ে গেলুম। তরুণ বয়সে বন্ধুত্ব পাতাতে দেরি লাগে না। ওটা যৌবনপ্রাচুর্যের অন্যতম লক্ষণ।

ঝিলম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব পথে মোটামুটি মাইল পঞ্চাশেক এলে গুজরাট শহর। এটা জম্মুর দক্ষিণ অঞ্চল পাঞ্জাবের মধ্যে। এখান থেকে শিয়ালকোট কাছে—আমার বন্ধু পণ্ডিত সদানন্দের বাড়ি। গুজরাট থেকে আরও পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে গুজরান-ওয়ালা। এ অঞ্চলের নাম রেচনা দোওব। সামনেই চন্দ্রভাগার শাখা।

লাহোর গোরা ছাউনি স্টেশনে যখন এসে পেঁছিলুম তখন প্রায় মধ্যাহ্ন। এবারে পেলুম ইরাবতী। এই বিরাট শহরের ভিতর দিয়ে টাঙ্গায় চড়িয়ে মনসুর আমাকে নিয়ে চলল ওদের বাড়িতে। মাঝখানে 'মণ্ডির' কাছে রয়েছে অনেক উঁচু এক টাওয়ার ক্লক। দিল্লীর মতো এখানেও নগর রক্ষার প্রাচীর, তার একেকটি গেট হ'ল প্রবেশ ও প্রস্থান পথ। সেই জনবহুল বাজার-অঞ্চলের ভিতর কোথা দিয়ে কোথায় গিয়ে পড়লুম এখন আর মনে পড়ে না। প্রচুর শীত পড়েছে এখন লাহোরে।

মনসুরের মা বেঁচে থাকতেই ওর আব্বা আরেকবার বিবাহ করেন। সেই মহিলা আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। মস্ত বড় বাড়ি, কিন্তু সামনের অংশটায় কাজ-কারবার এবং নানা লোকের চলাফেরা। ওঁরা থাকেন ভিতর মহলে। মহিলা আমাকে 'বেটা' বলে সম্বোধন করলেন এবং আমি তাঁকে 'আম্মাজি বললুম। তিনি আমাকে সস্নেহে নিয়ে গেলেন ভিতর দিককার মহলে। মনসুর এক খিৎমদগারকে দিয়ে আমার জিনিস-পত্র তুলে নিয়ে গেল। গাড়িভাড়া কিছুতেই সে নিল না।

চারিদিকে অবস্থাপন্ন পরিবারের পরিচয় সুস্পষ্ট। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। চেয়ে দেখছি সামনে নিজামের মস্ত অয়েলপেণ্টিং ছবি। মনসুর বলছিল ওরা মির্জাদের গোষ্ঠী। নবাব ওদের সরকারী টাইটেল। আমি বলেছি এই কাছেই শেখুপুরায় আমার মর্জিনা বউদিদির পিত্রালয়, তাঁর বাবাও নবাব বংশের।

ওঁদের এজেন্টরা আসেন নানা অঞ্চল থেকে, তাঁদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা। তাঁদের জন্য ঘরদোর, গোসলখানা, রসই-বনানা,—সব আলাদা। কিন্তু আমি এজেন্ট নই, সুতরাং আম্মাজি দোতলায় যে ঘরটিতে আমাকে বসালেন সেটি পারিবারিক অতিথির জন্য নির্দিষ্ট। আমি মনসুরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

দুই বন্ধু মধ্যাহ্নভোজনে বসেছি এমন সময় সামনে এল মনসুরের সহোদরা।

হাসিমুখে নমস্কার জানালো 'বন্দেগি'। আমি বললুম, 'আদাব'। আমি হঠাৎ চমকে উঠেছিলুম। গায়ে চুমকি বসানো ফিকে সবুজ ওড়না, কিন্তু মেয়েটি যেন আরেক সরস্বতী! ওর নাম মেহেরবানু। বি-এ পড়ছে লাহোরের উইমেনস্ কলেজে। আজ 'পহলা হিজরি, জিলকাইদের'—তাই আজ কলেজের ছুটি। আমার চিত্তবিকলনের জন্য সহসা মুখ তুলে ওর দিকে তাকাতে পারলুম না। মেয়েটা আমাদের সামনেই টেবলে খেতে বসল। আম্মাজি বসলেন তার পাশে। আমাদের গল্পগুজব আরম্ভ হয়ে গেল।

মনসুর ধরে বসল, আমাকে অন্তত দিন তিনেকের জন্য এখানে 'মেহমান' হয়ে থাকতে হবে। লাহোরে আমি নতুন, সুতরাং আমাকে নিয়ে ওরা এখানে-ওখানে যাবে। শালিমারবাগ, হ্যাংগিং গার্ডেনস, শাহী মসজিদ, বিশ্ববিদ্যালয়, শিসমহল,—আরও কি কি যেন ঘোরাবে। মেহেরবানু বলল, আমাদের কলেজে তোমাকে নিয়ে যাব। আজ জুম্মাবার, ইতোয়ারো সকালবেলা আমরা পিকনিক করতে যাব তোমাকে নিয়ে! আমাদের বন্ধুবান্ধব, আম্মা, সবাই যাবে। মণ্টগোমেরির 'দরিয়া-কিনারে' আমাদের বাংলো আছে। আমরা মোটরে যাব—সড়ক বহুৎ আচ্ছি হেঁ।

ইতিমধ্যে আমি হাসির স্রোত বইয়ে দিয়েছিলুম। এই প্রথম জানালুম আমি বাঙালী। বংগালি? ওরা অবাক! আমি বললুম, হ্যাঁ, বংগাল মেরে 'বোলি'। ওরা বলল, বংগালিকো হিম্মৎ বহুৎ জায়দি হ্যায়। আজাদিকে লিয়ে বহৎ লড়াই করতে হেঁ। সুভায় বোসভি বংগালি!

দু দিন আমাকে লাহোরে থাকতে হয়েছিল। মণ্টগোমেরি এ-যাত্রায় স্থগিত রয়ে গেল। আবার আমি আসব। কবে—তা এখন বলা সম্ভব নয়। কিন্তু মনসুর ও মেহেরবানুর সঙ্গে প্রীতির বন্ধন পাকা হয়ে গেল। এরা উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবার। এদের মোটর আছে দুখানা। লক্ষ্য করলুম এদের বাবা মির্জা মহম্মদ ফয়েজকে বহু লোক চেনে ও সম্মান করে।

তৃতীয় দিন সকালে আমরা সবাই এতই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলুম যে, মনসুরকে আমি একটা সম্পূর্ণ গরম স্যুট উপহার দিলুম এবং মেহেরার গায়ে নিজের হাতে আমার কল্কাদার ফ্লানেল গাউনটি পরিয়ে দিলুম। ওরা ধনী, কিন্তু গরীবের হাত থেকে প্রীতি উপহার নেওয়াটাই ত কালচার! ওরা চেঁচামেচি করতে লাগল। শেষকালে মেহেরা আমাকে টেনে নিয়ে গেল ওদের শোবার ঘরে এবং মনোহারির আলমারি খুলে বলল, আপনা মর্জিসে জো সামান্ খুশি ওঠা লো।

কী নেবো? আমি দিতে চাই, নিতে চাইনে। মেহেরা একটি মুক্তো-বসানো ছোট কৌটো বার করে একটি মীনা-করা সোনার আংটি আমার কড়ে আঙুলে পরিয়ে তবে ছাড়ল এবং কৌটোটা আমার পকেটে পুরে দিল।

সেদিন পরম আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে দিয়ে এসে ভাই-বোন দুজনে আমাকে ডাক-গাড়িতে তুলে দিয়ে গেল এবং আমি দু ঘণ্টার মধ্যেই সোজা এসে অমৃতসরে নামলুম।

এটিও পিণ্ডির মতো শিখপ্রধান শহর। রেশমকুঠীর বাজারের ভিতরে ঢুকে এক হোটেলে জায়গা নিলুম—যার খাবারের দোকানটা নিচে। আমার মাত্র দুটি আকর্ষণ—সরোবরের মাঝখানে স্বর্ণমন্দির এবং জালিয়ানওয়ালাবাগ। তখন জালিয়ানের রাস্তাটা এক সঙ্কীর্ণ গলিপথ, দুখানা গাড়ি পাশাপাশি যেতে চায় না। সেই গলির এক স্থলে একটি ডাকঘর, নাম 'জালিয়ানওয়ালাবাগ'। ডাকঘরের পাশেই সরু পথ ভিতরে ঢুকবার। আন্দাজ কুড়ি-পঁচিশ গজ এগোলে একটি ছোট মাঠ—যার চারিদিকে বাড়ি, এবং প্রায় সব বাড়িরই পিছন দিক। বলা বাহুল্য, চারিদিক স্বভাবত পাঁচিল-ঘেরা—চোর-ছ্যাচড়ের পথ আটকাবার জন্য। একটু পেরিয়ে বাঁ দিকে এক ইঁদারা। ডাকঘরের ওই গলির মুখ আগলিয়ে যদি এই মাঠে পুলিস বা মিলিটারি জনসমাবেশের উপর গুলি চালায় তবে একজন মাত্র ব্যক্তিরও পালাবার পথ থাকে না? সেইজন্য সেই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের দিন অদূরবর্তী ওই কুয়ার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে অনেক প্রাণ বাঁচাতে গিয়েছিল, কিন্তু কেউ বাঁচেনি! সমস্ত মাঠটা মৃত ও আহতে ভরে গিয়েছিল। যারা টিকটিকির মতো দেওয়াল বেয়ে ওঠবার চেষ্টা পেয়েছিল, গুলির আঘাত খেয়ে তাদের মৃতদেহ শিউলিফুলের মতো ঝরে পড়েছে। এই ব্যাপক মৃত্যুর থেকে গান্ধীজীর নেতৃত্ব মাথা তুলেছিল!

হোটেলের কাছ থেকে একটি সোজা পথ গেছে স্বর্ণমন্দিরের দিকে। মন্দির হল সরোবরের মধ্যে। তীর থেকে একটি প্রশস্ত মার্বেল পাথরের পথ ধরে মন্দিরে ঢুকতে হয়। সেখানে গ্রন্থসাহেব পড়ছিলেন শিখ পুরোহিতরা। মন্দির এলাকা বিশাল এবং চারিদিক অতি রমণীয়।

আমি যেন যন্ত্রচালিত। কী করছি, কী দেখছি মনে নেই। পিছন পথে যা ফেলে এলুম, সেটা চাকরি ঠিক নয়, সে যেন একটা বিশেষ জীবনের দীপ্তোজ্জ্বল টুকরো, একটা নিবিড় অনুভূতির কাল। এবার যেন ছিটকিয়ে এলুম সেই পরিচিত রূঢ় বাস্তবে—একটা সুখের স্বপ্ন যেন ফেটে বুদবুদের মতো মিলিয়ে গেল।

পর দিন সকাল আটটার পর ট্রেনে উঠলুম। এ গাড়ি হাওড়া যাবে।

দেশের দিকে ফিরছি যেন যুগান্তকাল পরে। যেন গত জন্মের পথঘাট ঠাওর করতে করতে যাচ্ছি এই নতুন জন্মে। জলন্ধর, লুধিয়ানা, আম্বালা—এ সব চিনতে দেরি হচ্ছে। এ যেন নতুন নতুন আবিষ্কার। অতি পরিচিতরা যেন অপরিচয়ের অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিল। আমি পেরিয়ে যাচ্ছিলুম স্বপ্নলোকের ভিতর দিয়ে। সেই পুরনো আমিকে আর খুঁজে পাচ্ছিনে।

কাশীতে এসে পৌঁছলুম পরদিন অপরাহ্ণকালে।—

আমি আগেই জানতুম মা আছেন কাশীতে। কিন্তু তিনি জানেন না, আমি ফিরে যাচ্ছি আমার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে। তিনি আশাও করেন না, আমি সেই সুদূর সীমান্তলোক থেকে অন্তত পাঁচ বছরের মধ্যে ছুটি নিয়ে একবার সবাইকে দেখে যাব!

লটবহর নিয়ে যখন সোনারপুরোর বড় বাড়িতে এসে ঢুকলুম তখন বিকাল। শীতের রোদ গাছের ডগায় উঠেছে। গাড়ি ভাড়া চুকিয়ে মালপত্র বারান্দায় নামিয়ে যখন সিঁড়ির দরজায় উঠেছি, দেখি মা ও প্রভাসের স্ত্রী অদূরে বসে বিশ্রম্ভালাপ করছেন।

মা ? মা আমি—

মা চমকিয়ে উঠে আমার দিকে তাকালেন, ঈষৎ নিরীক্ষণ করলেন, এবং চক্ষের পলকে উঠে ভিতর দিকে চলে গেলেন। প্রভাসের বউ মাথায় ঘোমটা টেনে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। আমি হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললুম, বৌদিদি, সবাই ভুলে গেছেন আমাকে ?

হঠাৎ যেন আঁতকিয়ে উঠলেন দুর্গাঠাকরুণ, তারপর ছুটে ভিতরে গিয়ে চেঁচালেন, ছোট মাসিমা, ও ছোট মাসিমা, ও যে ঠাকুরপো—আপনি বোধ হয় চিনতে পারেননি···

বাড়িতে হইচই উঠল। ছুটোছুটি পড়ে গেল। মা আবার ঠিক সেইভাবেই হন-হনিয়ে বেরিয়ে এলেন বটে, কিন্তু আমার দিকে চেয়ে একটু অবাক হয়ে সকলের পিছনে দাঁড়ালেন। মা যেন কী খুঁজেছিলেন আমার চেহারায়।

সেদিন রাত্রে আহারাদির কালে মা আমাকে বার বার অলক্ষ্যে নিরীক্ষণ করছিলেন। তারপর হাত ধুয়ে এসে যখন তাঁর সামনে দাঁড়ালুম, তিনি বললেন, হ্যাঁ রে, অমন ছাড়ালো ঢ্যাঙ্গা হলি কেমন করে ?

সমস্ত নিচের তলাটা কাঁপিয়ে আমি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলুম।

মাকে বোধ হয় একটু সস্নেহ কৌতুকবুদ্ধি পেয়ে বসেছিল। রাত্রে যখন গেঞ্জিটা গায়ে দিয়ে বিছানায় উঠেছি, তখন মা এসে বললেন, মুখপোড়া, তুই দেখছি বংশের ধারা পেয়েছিস—

কেন মা ?

তোর মাথার চুলের ঝাঁকা, মুখ সমস্ত গা—অত রাঙ্গা হল কোত্থেকে ? তুই বুঝি মদ খেয়েছিস ?

প্রভাস দুর্গাঠাকরুণ, দিদি ও আমি—সবাই মিলে হেসে লুটোপুটি। বললুম, মদ খেলে যদি রাঙ্গা চেহারা হয়, তাহলে বলো মদ খেতে কোনও দিন মানা করবে না ?

আবার হাসির হট্টগোল।

পরদিন বেরোবার আগে মা'র কাছে আমার টাকাগুলো গচ্ছিত করলুম, এবং সে টাকার পরিমাণ কম নয়। তারপর একরাশ বাজার এনে হাজির করলুম। মামা রয়েছেন এক প্রকার শেষ শয্যায়, তাঁকে দেখতে গেলুম কিছু পথ্যাদি নিয়ে। দিদিমা রয়েছেন এ-বাড়িতেই। শেষের দিন গুনছেন।

আমি জানতুম শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র কাশীতে রয়েছে। সুতরাং আমি গিয়ে 'আউধগর্বি'র' বাড়িতে কড়া নাড়লুম। প্রথমে সাড়া দিল না কেউ। পরে উপর থেকে এক ভদ্রলোক জানালেন, তাঁরা এ বাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন। কোথায় গিয়েছেন তাঁরা বলতে পারেন না! পুরনো দুই প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে বহুদিন পরে, সুতরাং আমার সেদিনকার উদ্দীপনা অবর্ণনীয়!

হরিশচন্দ্রের ওদিক থেকে সোজা কেদারঘাটের পথ ধরে সোনারপুরা এবং বাঙালী-টোলার ভিতর দিয়ে পেরিয়ে গণেশ মহল্লায় গিয়ে কালী মাস্টারের ওখানে উঠলুম। উল্লসিত অভ্যর্থনার পালা শেষ হবার পর প্রশ্ন করে জানলুম, শৈলজার এখন ইস্কুল-মাস্টারি নেই, সে এখন তার দুইজন স্ত্রীসহ দেবনাথপুরার সেই পেভমেণ্ট-করা গলির এক বাড়িতে ভাড়া আছে। তার অবস্থা খারাপ। প্রেমেন কলকাতায় চলে গেছে।

কাশীতে এবার মোট চার-পাঁচ দিন থাকব, তারপর মাকে নিয়ে ফিরব। সুতরাং এ-ক'দিন বন্ধুদের নিয়ে ঢালাও আড্ডা দেওয়া চলবে। সুধাদা নেই, অতএব হর-কুমারের দোকান, তাঁর ফরিদপুরার বাড়ি, অহল্যাবাঈর ঘাটের সেই শেষ বুরুজ—সবই ফাঁকা। তিনি মধ্যমণি। তাঁর জুড়ি কেউ নেই। রবীন্দ্রনাথের কবি-ভাগ্যও ভাল যে, তাঁর জীবদ্দশায় এত বড় একজন রবীন্দ্র-ভাষ্যকার দেশের মধ্যে রয়েছেন। সুধাদার অভাবে আমাদের বৈঠক কোথাও প্রাণবন্ত হয় না।

সেইকাল পর্যন্ত লেখকদের স্বভাবপ্রকৃতি সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ। তবু ওর মধ্যে আমার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী ছিল শৈলজানন্দ। তার প্রকৃতি ছিল মিষ্ট ও বন্ধুত্বপূর্ণ, অন্তরঙ্গ হতে সে জানে। একটা নিরভিমান মানবিকতা ওর মধ্যে দেখতে পেতুম—যেটার স্বাদ ছিল অনেকের কাছে প্রিয়। শৈলজা ঠিক কাকে সর্বাপেক্ষা পছন্দ করে বলা কঠিন কিন্তু সে প্রীতি অর্জন করতে জানে। তাকে কখনও ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত, স্পষ্টবাদী, অপ্রিয় সত্যভাষী—এ সব হতে দেখিনি। মুখোমুখি সে কখনো কারোকে আঘাত করে না এবং নিজের কোনও দুর্বলতার দিকে তার চোখও পড়ে না। মাদকাদি সেবনের ব্যাপারে তাকে কখনো বেহুশ হতে দেখা যায়নি। শৈলজা আমার খুবই প্রিয়। বীরভূঁয়ের একটি গ্রাম রূপসীপুরে তার 'মাঠকোটা' বাড়ি, সেই বাড়িতে আমি গিয়েছি ও থেকেছি দু-চার দিন। শৈলজার সেই দিনকার আতিথেয়তা স্মরণীয়। তার জন্য একাধিক প্রকাশকের সঙ্গে আমি লড়াই করেছি।

পাঁড়ে হাউলি ছাড়িয়ে দেবনাথপুরায় ঢোকবার মুখে এক জলের কলের গায়ে ইঁট-বাঁধানো গলিতে সে বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। আমি তাকে ডাকলুম, কিন্তু তার গলার সাড়ায় কোনও উল্লাস নেই। আগে সে নিচে দাঁড়াতে বলল, পরে সে উপরে ডাকল। অন্দর মহল থেকে কয়েক হাত দূরে সে আমাকে ডেকে বসালো। তাকে এতকাল পরে দেখে আমি আনন্দে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিলুম।

কেমন আছ, শৈলজা?

ওই এক রকম।

আমাকে দেখে যে-ব্যক্তি বরাবর প্রফুল্ল হয়ে ওঠে, তার মুখে-চোখে একপ্রকার বিমর্ষতা দেখে আমি দুঃখিত হলুম। শৈলজা পুনরায় বলল, মাষ্টারিটা নেই, নিত্য অভাব। পাওনা টাকা কেউ পাঠায় না। পবিত্রকে লিখেছি যদি কিছু টাকা যোগাড় করে পাঠায়।

শৈলজার প্রথমা স্ত্রীকে আমি বৌদিদি বলি, এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীকে 'ননদ' বলে সম্ভাষণ করি। এবার বললুম, এঁরা কোথা গেলেন?

শৈলজার অতটা গায়ে মাখল না। বলল, ঘরেই আছে। যাবে আর কোথায়?

আমার একটু ধোঁকা লাগল। কিন্তু কথা বাড়ালুম না। অন্য কথায় ফিরে গিয়ে বললুম, প্রেমেন চলে গেছে শুনলুম। আশা করেছিলুম এখানে তার সঙ্গে দেখা হবে।

শৈলজা চুপ করে রইল। কিন্তু তার গাম্ভীর্য আমাকেও যেন কতকটা বিমর্ষ করে তুলল। তার সেই উল্লাস, উচ্ছ্বসিত প্রীতি—আজ কিছুই যেন চোখে পড়ছে না। যাই হোক, এক সময় সে এমন ধরণের কথা তুলল যেগুলি শুনে আমি একেবারে হত-বুদ্ধি। প্রেমেন্দ্র সম্বন্ধে কতকগুলি অবাস্তব অভিযোগ সে তৈরি করেছে যেগুলি অশ্রদ্ধেয় এবং ভিত্তিহীন। এর সঙ্গে টাকা পয়সার কোনও যোগ আছে কিনা আমি জানিনে। কিন্তু এগুলি শোনার জন্য আমার মন প্রস্তুত ছিল না। কারণ বন্ধুত্বের লয়ালটি আমি মেনে চলার চেষ্টা পাই। সুতরাং অনুপস্থিত প্রেমেন্দ্রর প্রতি এ ধরণের মন্তব্য আমার পক্ষে বরদাস্ত করা সেদিন কঠিন ছিল।

আমার কাশীতে আসার আনন্দ, উৎসাহ এবং উদ্দীপনা সেদিন যেন এক ফুৎকারে নিভে গিয়েছিল।

কলকাতায় তখন কংগ্রেস অধিবেশনের বিরাট তোড়জোড় চলেছে, যেটি আমি রাওয়ালপিণ্ডি ও লাহোরে শুনতে শুনতে এসেছি। এবারে মূল সভাপতি হচ্ছেন পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু। গান্ধীজী কলকাতা অধিবেশনে থাকছেন তার সহকর্মী-দের নিয়ে। এই সূত্রে বড় বড় নাম শোনা যাচ্ছে। লালা লজপৎ রায়, কে এফ নরীম্যান, গোপবন্ধু দাস, হাকিম আজমল খাঁ, এম এ আনসারী, সরোজিনী নাইডু, বল্লভভাই প্যাটেল, পট্টভি সীতারামাইয়া, সত্যমূর্তি ইত্যাদি। সুভাষচন্দ্র তখন জওয়াহরলাল নেহরুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে নতুন ভারত গড়তে চান, সেজন্য গান্ধীবাদী রক্ষণশীল কংগ্রেসের সম্মুখে নতুন কর্মসূচী হাজির করছেন। পূর্ব কলকাতার প্রান্তে অধিবেশন বসছে। সেখানে বিরাট এক ময়দান অনুন্নত অবস্থায় রয়েছে। পরবর্তী-কালে সেই অঞ্চলের উন্নতি ঘটে, এবং নাম হয় 'পার্ক সার্কাস'।

কলকাতার এই কংগ্রেস অধিবেশনকালে কংগ্রেসের ইতিহাসে এই প্রথম দুটি বিরাট স্বেচ্ছাসেবক ও সেবিকাবাহিনী গড়ে তোলেন বাঙলার তদানীন্তন তারুণ্যের প্রতীক সুভাষচন্দ্র। এই দুই সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হন তিনি নিজে, অর্থাৎ জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং। নারী-বাহিনীর অফিসার কমাণ্ডিং নির্বাচিত হন তৎ-কালীন সর্ব পরিচিতা তরুণী নেত্রী সুদর্শনা শ্রীমতী লতিকা বসু। সেদিন হাওড়া স্টেশন থেকে পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুকে যে বিরাট ও সুপরিচালিত শোভাযাত্রাসহ অধিবেশন ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কংগ্রেসের ইতিহাসে সেটি নিত্য স্মরণীয়। সামরিক পোশাকে সেদিন মোটর ট্রাকের উপর গম্ভীরানন সুভাষচন্দ্রের যে রূপচ্ছটা দিব্যরূপ ধারণ করেছিল, তারই পরিণতরূপ দেশবাসী দেখেছিল পনেরো বছর পরে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়করূপে! বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে পৃথিবীর অপর কোনও জননেতা বাঙালীর রসকল্পনাকে এমন করে উদ্দীপ্ত করেনি!

বাঙলায় তখন 'বিগ ফাইভ' রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাঁরা হলেন শরৎচন্দ্র বসু, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, নলিনীরঞ্জন সরকার, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও তুলসীচন্দ্র গোস্বামী। এঁদের মুখপত্র আগে ছিল 'ফরোয়ার্ড' (ইংরেজি) ও 'বাঙলার কথা'। পরে 'বেলুড় ট্রেন দুর্ঘটনার' মামলায় জড়িয়ে এ দুটি কাগজ নাম বদলিয়ে হয় 'লিবার্টি' ও 'বঙ্গবাণী'। এ দুটি কাগজে যাঁরা কাজ করতেন তাঁরা প্রায় সকলেই আমাদের বন্ধু। কেউ সম্পাদক, কেউ বা সহ-সম্পাদক। যেমন সত্যরঞ্জন বক্সী, নীহাররঞ্জন রায়, প্রমোদ সেন, সত্যেন বসু, জানকীজীবন ঘোষ, বিজন সেনগুপ্ত, গোপাললাল সান্যাল, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিজয় দাশগুপ্ত, শশাঙ্ক চৌধুরী, শচীন সেন, অগ্নিহোত্রী উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, গল্প-লেখক সরোজ রায়চৌধুরী এবং আরও কেউ কেউ।

ওরই মধ্যে একদিন 'কল্লোল'-এ বেশ আড্ডা জমে উঠেছে, এমন সময় হঠাৎ নরেন্দ্র দেব ভিতরে ঢুকলেন। তিনি সজ্জন, অমায়িক ও সব দলের বন্ধু। তিনি আমাকে দেখামাত্রই অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন,—তুই চাকরি ছেড়ে চলে এসেছিস? সাহিত্য করে কারো ভাত জোটে? খেতে না পেয়ে পথে পথে ঘুরবি, লেখকদের দুর্দশা দেখতে পাচ্ছিসনে চারদিকে? তোরা ত সামান্য, রবিঠাকুরের বই কখানা বিক্রি হয় বাজারে?

আমরা সবাই নতমুখ।

নরেন্দ্র দেবের তিরস্কারটি অনেকদিন মাথার মধ্যে ঘুরেছিল। আমরা প্রায় সবাই এখন বেকার। শৈলজা শীঘ্রই আবার কাশী থেকে ফিরবে বেকার হয়ে, দেরি নেই। নৃপেন, পবিত্র, অজিত সেন, ঢাকাকেন্দ্রিক বুদ্ধদেব ও অজিত দত্ত, অচিন্ত্য, দীনেশ-রঞ্জন ওরফে 'ডি আর',—প্রায় সকলেই বেকার।

লক্ষ্য করছিলুম, তরুণ লেখকরা সর্বত্র তখন নিন্দিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য, শক্তিমান লেখকরাই সমকালীন সমালোচকদের কাছে বেশি গালি খায়। 'শনিবারের চিঠি' তখন খুললেই দেখতে পাই, সজনীকান্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছে প্রধানত নজরুলকে অচিন্ত্যকে, প্রগতি সম্পাদক বুদ্ধদেবকে এবং আমাদের মুখচোরা ও মিষ্টভাষী বন্ধু জীবনানন্দ দাশগুপ্তকে।

'শনিবারের চিঠি' শত্রুভাবে সকলকে ভজনা করেছিল।

॥ ২৫ ॥

প্রথম মহাযুদ্ধ, হোমরুল আন্দোলন, রুশ বিপ্লব, রাশিয়ায় প্রথম সোস্যালিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা—ক্ষুধাতুর সর্বহারা অপমানিত এক মানবগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, গান্ধীর অভ্যুত্থান, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথের নাইট-হুড

পরিত্যাগ, ইংরেজিতে অনুবাদ করা কনটিনেণ্টাল সাহিত্য, বাংলায় বিপ্লবী দলের সঙ্গোপন কর্মতৎপরতা—এগুলি সব একত্র মিলে একটি অপ্রত্যক্ষ প্রভাব করতে চেয়েছিল একদল লেখকের মনে। তাঁরা বার করেছিলেন 'আত্মশক্তি' ও 'বিজলী'। দুটোই সাপ্তাহিক। অন্য দিকে ছিল দেশবন্ধুর দ্বারা প্রতিপালিত 'নারায়ণ'। এগুলি সবই জাতীয়তাবাদী সাময়িক পত্র। এই তিনটি কাগজে যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উপেন বাঁড়ুজ্যে, বারীন ঘোষ, শচীন সেনগুপ্ত, নলিনীকান্ত সরকার, নজরুল ইসলাম, শিবরাম চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম আগে মনে আসে। এর মধ্যে চেরী প্রেস থেকে ছাপা হত 'বিজলী'। বহুবাজার স্ট্রীটে এই প্রেসেরই একফালি বারান্দায় যে অজ্ঞাতকুলশীল কৃষ্ণকায় যুবকটি কোনও মতে আশ্রয় নিয়ে সারাদিন বইয়ের পোটলা সাইকেলে বেঁধে ফিরি করে বেড়াত, সেই ব্যক্তি আপন অধ্যবসায়ের গুণে পরবর্তীকালে হয়ে ওঠেন ডি-এম লাইব্রেরীর মালিক গোপাল মজুমদার। কিন্তু গোপালবাবু তাঁর প্রাক্তন আশ্রয়দাতাগণের হৃদয়বত্তার কথা ভোলেননি। নানাবিধভাবে তাঁদেরকে সাহায্য করেছেন।

যা বলছিলুম। পূর্বোক্ত কাগজগুলি একে একে বন্ধ হয়ে গেল। শুধু টিমটিম করতে লাগল 'নারায়ণ' কিছুকাল অবধি। বারীন ঘোষ চলে গেলেন পণ্ডিচেরী, উপেন বাঁড়ুয্যে পারিবারিক জীবনে ঢুকে কিছু কিছু লেখা লিখতে লাগলেন। তাঁর 'নির্বাসিতের আত্মকথা' ও 'উনপঞ্চাশী'—এ দুটি গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে মণিরত্নের মতো উজ্জ্বল ও জীবন্ত হয়ে রইল। নলিনীকান্ত সরকার একজন সঙ্গীতবিদ্, তিনি গানের মাস্টারি নিয়ে রইলেন। শচীন সেনগুপ্ত তথৈবচ। ওঁদেরই ভিতর থেকে উঠে এল তৎকালীন তরুণ বাংলার প্রিয় কবি নজরুল। সে যেন ছুটে এসে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কতকাংশ স্মরণ করিয়ে দিল—"বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র কলোচ্ছ্বাসে বিদ্রোহী নবীন বীর/স্থবিরের শাসন নাশন/বারে বারে দেখা দিবে/আমি রচি তারই সিংহাসন তারই সম্ভাষণ।"

নজরুল কোথায় যেন এক জায়গায় লিখেছিল, "আমি যুগের না হই, হুজুগের কবি—

এরপর তরুণ বাংলার সাহিত্যে এল আরেক নতুন তরঙ্গ। এরা কেউ মার্কামারা জাতীয়তাবাদী নয়। রাজনীতিকদের সঙ্গে এদের যোগ নেই, সাহিত্যে রাজনীতি এরা আনতে চায় না। এরা জীবনরসিক এবং সাহিত্যরঙ্গপ্রিয়। এদের অভিভাবক হয়ে যাঁরা সামনে এগিয়ে এলেন তাঁদের মধ্যে দীনেশরঞ্জন দাশ, গোকুলচন্দ্র নাগ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরাই একটি মাসিকপত্র বার করেন, তার নাম দেওয়া হয় 'কল্লোল'। এরা এদের অগ্রগামী 'ভারতীয়' লেখকগোষ্ঠীর মতো অবস্থাপন্ন বা রবীন্দ্রস্নেহপুষ্ট লেখকগোষ্ঠী ছিল না। এরা ছিল দরিদ্র, নিম্নমধ্যবিত্ত বা স্বল্পবিত্ত শ্রেণীর কয়েকজন কাঁচা তরুণ। এরা অন্নের জন্য ছোঁক ছোঁক করে, কর্মসংস্থানের জন্য পথে পথে ঘোরে। কিন্তু এদের মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছিল একশ্রেণীর শক্তিমান লেখককে—যারা পূর্বতন সাহিত্যের ঐতিহ্য বহন করে

না। এরা সাহিত্যের আভিজাত্য বোঝে না, চলতি সমাজের অনুশাসন স্বীকার করে না এবং রবীন্দ্রনাথের স্তাবকদলের তালিকায় নিজেদের নাম লেখাতে চায় না। এরা সমাজদ্রোহী, গৃহবিদ্রোহ, এবং এরা জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চায়।

শরৎচন্দ্র কতকটা নিম্নমধ্যবিত্তের স্তরে নেমে সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু এরা যারা কল্লোল কালিকলম প্রগতি-ধূপছায়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—এরা নামতে চাইল আরো অনেক নিচে—যেখানে শ্রমিক চাষী মজুর ধোবা নাপিত এবং বস্তিবাসীদের সেই অসহনীয় দুর্গত জীবনে। এরা বেছে নিল নৈরাশ্যবাদী তরুণ সম্প্রদায়কে, ওই সঙ্গে দরিদ্র দুঃস্থ হতভাগ্য বঞ্চিত ও উৎপীড়িতকে। বেছে নিল বেশ্যা, মাতাল, গাঁটকাটা, গাঁজাখোর, জুয়াড়ি, অন্ধ, খঞ্জ, নুলো, ভিখারী ও কাঙ্গালের দলকে। এদের নিয়েও দেশ। এরাও আসুক সাহিত্যে। এই নতুন চেতনা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে সেই প্রথম এল 'বামপন্থা'। কিন্তু ওদের কোনও রচনাতেই রাজনীতিক প্রচারকার্যের শস্তা বুলি থাকত না। ওরা মর্মান্তিক ছবি তুলে ধরত, কিন্তু নীতিকথা আওড়াতো না। ওদের লেখাগুলো হত কাঁচা, কিন্তু আপন প্রচণ্ডতায় নতুন। অনেক ক্ষেত্রেই অনেক লেখা অক্ষম, কিন্তু তীব্রভাবেই অনন্য। ওরা অশ্লীল লেখা ঠিক লেখে না, লেখে তার চেয়েও যা মারাত্মক—অর্থাৎ দুর্নীতিবাদ। ওরা ভাঙতে চাইছিল রক্ষণশীলতাকে, ওরা মেয়েদের ঘোমটা খসিয়ে তাদেরকে পথে বার করতে চাইছিল, চলতি সমাজকে ওরা জাহান্নামে পাঠাচ্ছিল, ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাকে তছনছ করে দিচ্ছিল। ওরা ধর্মের বুলি শুনতে চায় না, শস্তা উপদেশ ওদের দুচক্ষের বিষ, নীতিকথায় ওদের মন ভোলে না। ওরা চাইছিল এমন একটা জীবন যার স্পষ্ট ছবি ওদের নিজেদের কাছেও নেই!

এই ভাঙনের আওয়াজে ঘুম ভেঙেছিল রক্ষণশীল পাঠক সমাজের। তাদের মুখ্যমোড়ল হল সজনীকান্ত দাস—আমার প্রথম লেখক জীবনের বন্ধু। তৎকালীন 'শনিবারের চিঠি'র চেষ্টা ছিল, 'কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি-ধূপছায়ার' অতিআধুনিক লেখকগোষ্ঠীর কেউ যেন ভদ্রসমাজে জায়গা না পায়! শনিবারের চিঠির 'মণিমুক্তা' সংগ্রহের উদ্দেশ্যও তাই ছিল।

সাহিত্যে এই বামপন্থা অনুসরণের কালে আমাদের তৎকালীন শ্রদ্ধের সাংবাদিক জনাব মুজাফফর আহমেদ নিঃশব্দে 'ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি' প্রতিষ্ঠা করেন। এক সময় এই পার্টির সকল বিশিষ্ট কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সেই মামলার নাম দেওয়া হয় 'মীরাট কনসপিরেসি কেস'। সেই মামলার উদ্বোধনকালে এক ইংরেজ ব্যারিস্টার মিঃ নর্টন জোন্স মহামান্য ইংরেজ বিচারককে সম্বোধন করে চিৎকার করেছিলেন, "My Lord, they are anti-god, anti-national, anti-society, anti-everything."

কল্লোল-কালিকলমের তরুণ লেখকরা এ কথাগুলি শুনে খুবই পুলকিত হয়। যাই হোক, অতঃপর এই মামলায় 'পর্বত মূষিক প্রসব' করে। ষড়যন্ত্রের বিশেষ কোনও প্রমাণ না পাওয়ায় ব্রিটিশ শাসকরা বছর তিনেক পরে আসামীদের ছেড়ে

দেন। এই আসামীদের অন্যতম শ্রীযুক্ত শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার বন্ধু হয়ে ওঠেন। ওই হাস্যকর মামলা চলাকালে আসামীদের অবসর বিনোদনের জন্য আমি কিছু কিছু সাহিত্যগ্রন্থ পাঠাতুম।

এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের কথা বলছি। নব্য বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনে ভাবনার তরঙ্গ তোলেন যে কয়জন, তাঁদের মধ্যে নাট্যজগতে শিশিরকুমার, সঙ্গীতে দিলীপকুমার রায়, রাজনীতিতে যতীন্দ্রমোহন ও সুভাষচন্দ্র, কাব্যে ও গানে নজরুল, নৃত্যকলায় উদয়শঙ্কর ও তাঁর সঙ্গিনী ফরাসী মেয়ে শ্রীমতী সিমকী। আবার ঠিক এই একই সময়ে দুখানা বিশিষ্ট মাসিক সাহিত্যপত্র দেখা দেয়—'পরিচয়' ও 'বিচিত্রা'। 'পরিচয়' নাকি 'অভিজাত' সাহিত্য বিতরণ করবে! সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—অ্যাটর্নী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এবার থেকে নাকি রবীন্দ্রনাথ ওই কাগজে 'পুস্তক সমালোচনা' লিখতে আরম্ভ করছেন। ওদিকে 'বিচিত্রা'র সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে লেখাচ্ছেন 'তিনপুরুষ' বা 'যোগাযোগ', শরৎচন্দ্রকে দিয়ে 'শ্রীকান্ত'র চতুর্থ পর্ব বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে 'পথের পাঁচালী' এবং তরুণ আই. সি. এস. অন্নদাশঙ্করকে দিয়ে 'পথে-প্রবাসে'। কিছুকালের মধ্যে হঠাৎ অচিন্ত্য গিয়ে 'বিচিত্রা'র চাকরি নিল। মাইনে পাবে মাসিক পঞ্চাশ টাকা। 'কল্লোলের' সর্বাগ্রগণ্য লেখক অচিন্ত্য ছিল সর্বাপেক্ষা 'নিন্দিত'। এবার সে গিয়ে উঠল অভিজাত সাহিত্যমঞ্চের একটা উঁচু আসনে। আমরা নিচের দিকে মুখ তুলে ঈর্ষান্বিত চক্ষে তাকালুম। অতঃপর অচিন্ত্যর নামের পাশে ছাপা হতে লাগল—এম-এ, বি-এল'।

কল্লোলের যখন মরণদশা ঘটছে সেই সময় লাভপুর বীরভূম থেকে জনৈক লেখক দুটি গল্প পাঠালেন, 'রাইকমল' অথবা 'রসকলি' ও 'হারানো সুর'—লেখক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। আপন অসাধারণত্বে এ-দুটি বৈষ্ণব রসাশ্রিত ছোট গল্প, অতি উজ্জ্বল। জাতশিল্পী এই লেখকের রচনাভঙ্গীর সুনিপুণ দক্ষতা লক্ষ্য করে আমরা চমৎকৃত হয়েছিলুম। লাভপুরের নাট্যকার নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেউ কি হবে এই লেখক? সাহিত্যের কোন্ কারখানায় এমন কারিগর তৈরি হয়েছে? কিন্তু তারপর এই লেখকের আর কোন উচ্চবাচ্য শোনা গেল না।

কল্লোলের আড্ডায় আসছিল পবিত্র, জলধর সেনের ছেলে অজিত, সুধীন্দ্র, মধ্যে-মাঝে ঢাকা থেকে বুদ্ধদেব ও অজিত দত্ত, যখন-তখন নৃপেন, কালেভদ্রে কাজী, কখনো কখনো কবিযশোপ্রার্থী প্যান্ট-পরা হুমায়ুন কবির ও গিরিজা মুখুজ্যে। গিরিজার মধুর প্রকৃতি ও তার ছোট ছোট সনেট্ অনেকের প্রিয় ছিল। কিন্তু তখন কল্লোলে ভাঙন ধরেছে। সম্পাদক দীনেশরঞ্জনকে প্রায়ই ধরে নিয়ে যাচ্ছেন চিত্রনির্মাণেচ্ছু দেবকী বসু। মাত্র ছয় বছরেই 'কল্লোল' মরতে বসেছে। লেখকরা যে যার পথ খুঁজে নিচ্ছে। তারা বাইরে বাইরে লিখে পারিশ্রমিক পেতে আরম্ভ করেছে। একটা ছোট-গল্প গুছিয়ে লিখতে পারলে পনেরো টাকাও পাওয়া যায়।

বন্ধুমহলের পারস্পরিক আচরণের ফলে এই সময় একপ্রকার বিষাক্ত বাষ্প ঘুলিয়ে

উঠছিল। কিন্তু একে ঠিক অপরাধ বা স্বভাব প্রকৃতির দোষ বলা চলে না। এর মূলে রয়েছে দারিদ্র্য এবং প্রতিষ্ঠালাভের লালসা। প্রত্যেক লেখকের যেটুকু অংশ তার প্রতিভা—সেটুকু বাদে বাকি বৃহৎ অংশটা অনেক সময় বীভৎস। এই বীভৎসতা মাঝে মাঝে শ্বাসরোধী হয়ে উঠছিল।

এই সময়টায় আমি অত্যন্ত উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করছিলাম। আমার বাঁধন নেই, আগল নেই, শাসন নেই, সংযম নেই, এবং মানসিক প্রশান্তিও নেই। আমার স্বাস্থ্যের বাঁধন কঠিন, সাংঘাতিক, কণ্ঠে আমার পশুরাজের মতো গর্জন, আমার যৌবনের প্রবলতা অনেকের পক্ষে ভীতির কারণ। কোনও সময়েই আমার মস্তিষ্ক এবং শরীরের অস্ত্রতন্ত্র স্থির থাকছে না,—আমি বেপরোয়া, দুর্দান্ত এবং অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম যেখানে সেখানে। এর একটা কারণ আমি জানতুম। আমি মিলিটারি সার্ভিস ছেড়েছি এবং তার সঙ্গে জগদীশচন্দরের ভগ্নী সরস্বতীকে একটা বিসদৃশ অবহেলার সঙ্গে ত্যাগ করে এসেছি, এর জন্য মনে-মনে একটা প্রতিক্রিয়া ছিল। আমি যেন নিজেকে কোনমতেই ক্ষমা করতে পারছিলুম না। কেমন একটা ধ্বংসাত্মক শক্তি আমাকে পেয়ে বসেছিল।

পাপ এবং দুর্নীতির পথ নাকি খুব পিচ্ছিল—পা যদি একবার হড়কিয়ে যায় তবে একেবারে অতল তলে তলিয়ে যাও। সুতরাং বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে যখন সেই অতল পিচ্ছিল গহ্বরের মধ্যে নেমে যাচ্ছিলুম তখন আনন্দ-কৌতুকে নিজেই হাসছিলুম। এ যেন নাগরদোলায় চড়েছি! কখনো যাচ্ছি তলিয়ে, কখনো হুস করে আবার উপর দিকে উঠে আসছি! এত আনন্দ যে পদস্খলনের এ-কথা কি আগে জানতুম? এক-এক সময় খবর পাই অমুক-অমুক পল্লীতে আমাদের পক্ষে চরিত্র নষ্ট করার সুবিধা। চলো যাই সব বন্ধু মিলে সেই দিকে। তুমি এসো, হ্যাঁ, তুমিও এসো! আর তুমিই বা থাকবে কেন পিছিয়ে—এসো, চলে এসো। সন্ধ্যার পর তুমি-একা, সেই আমরা আদিম গুহাবাসী মানবেতর জানোয়ার। আমরা দুষ্কর্মব্রতী, আমরা ভ্রষ্টনীতি, পাপাচারী—ক্ষুধায় লোলুপতায় অপকর্মে দুষ্প্রবৃত্তিতে আমরা যেন নিখুঁৎ নষ্টচরিত্র হতে পারি। আমরা চোর নই, কিন্তু চোরের মতো। আমরা সমাজবিরোধী কোনও কাজ করিনে, কিন্তু আমরা সমাজের প্রবলতম শত্রু! যদি গাঁটকাটা হতুম' রাহাজানি করতুম, ডাকাতি করে বেড়াতুম, প্রতারণায় যদি হাত পাকাতুম—সে ভাল ছিল। সেখানে অন্যায়ের শাস্তি ছিল, কিন্তু বৃহত্তর সমাজ-মন সেখানে অসুস্থ বোধ করত না!

কিন্তু এখন ও-সব নীতিকথা থাক। এখন সবাই এসো আমরা সঙ্গোপন-চারণের পথে মিলি। আমরা অন্ধকার থেকে আবছায়ার মধ্যে যাই চলো। না, পিছনে চেয়ো না, ভয় পেয়ো না, অস্বস্তি রেখো না মনে, সঙ্কোচে কুণ্ঠিত হয়ো না—ওগুলো বলবান পুরুষের পরিচয় নয়! নিজের মধ্যে সত্য হও, নির্ভীক হও, উদার হও—নচেৎ ভবিষ্যৎকাল তোমাদের ক্ষমা করবে না। তোমরা সবাই এখনও ছোট ছোট প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ, এখনও তোমরা মাত্র লেখক—এখনও শিল্পী হয়ে ওঠোনি! তোমাদের পদস্খলন-এর পরিচয় ইতিহাসে যেন সগৌরবে স্থান পায়। তোমরা ক্ষুদ্রে, তুচ্ছে,

নীচতায়, মূঢ়তায়, মালিন্যে যেন কীটের মতো কিলবিল করো না। তোমরা কেবল পুরুষ নয়, তোমাদের মধ্যে রয়েছে অশরীরী পুরুষোত্তম—যে স্রষ্টা, যে জীবনকে নির্মাণ করে, যে নিত্য ছবি এঁকে চলে বিশ্বের পটে-পটে।

এই নিশাচর জীবন-সন্ধানীর দল যখন পথে-বিপথে, নোংরায়, খানায়, বস্তির আশেপাশে ঘুরে বেড়াত, তখন আমি চেয়ে দেখতুম এক অদৃশ্য নিয়ন্তা একটি বিশেষ যুগের নক্সা আমাদের সামনে এঁকে ধরছে—যে-যুগটি ১৯২৩ থেকে ১৯৩৫-এর মধ্যে সীমিত। আজ যে সকল ছোট ছোট বুভুক্ষু প্রতিভা সর্বহারার মতো রাত্রির ছায়ার মধ্যে আপন আপন প্রাণের তাড়নায় নৈশ অভিযানে চলেছে—তাদের ভিতরে রয়েছে ভবিষ্যৎকালের অধ্যাপক, রাজনীতিবিদ্, আইনজীবী, নৃত্যশিল্পী, বিচারক, চিকিৎসক, চিত্রনির্মাতা, কবি, নাট্যকার, ঐতিহাসিক, কথাশিল্পী, ঔপন্যাসিক, সম্পাদক, বিজ্ঞানী প্রভৃতি। এদের মধ্যে কেউ কেউ সাহিত্য, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও ললিতকলার ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক সম্মানলাভও করেছিল। আজ এরা শাবক, ভবিষ্যতে এরাই হয়ে উঠবে পাখি। এদের প্রতিভার পাখায় আসবে বেগের চাঞ্চল্য, এদের আকাশ হবে অনেক বড়। এদের মধ্যে যারা সাহিত্যকর্মী, নতুন কালের ভাবনায় যারা অনুপ্রাণিত, যারা বর্তমান যুগকে ছাড়িয়ে যুগান্তরকে প্রভাবিত করার প্রতিশ্রুতি এনেছে—তাদের নিত্যকার কৌতূহল, ঔৎসুক্য, জানার আগ্রহ, অভিজ্ঞানলাভের পিপাসা,—তাদেরকে এই কালে একটি দুর্লভ বৈশিষ্ট্য দান করেছিল। এরাই পরবর্তীকালে পুরনো ঐতিহ্যকে ভেঙে নতুন দিগন্তের দ্বার খুলেছে, প্রচলনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নতুন চিন্তাধারার পথ কেটেছে, নারীসমাজের বন্ধনমুক্তির চেতনা এনেছে এবং বিচিত্র জীবনের স্বাদ এনেছে কথায়-কথায়। সেদিন এদের সাহিত্যসাধনা ধূলিধূসর পথে নেমেছিল।

সে যাই হোক, কথায়-কথায় চরিত্র নষ্ট করার সেদিন সুযোগ ছিল কম। মূল কারণ অর্থাভাব। যদি সংযমী হও, ব্রহ্মচর্যব্রতী হও, নীতিধর্মে যদি তোমার মতি থাকে—তা হলে তোমার কোনও খরচ নেই! কিন্তু যদি শ্লথচরিত্র হতে চাও, যদি ছক-কাটা জীবনের বাইরে গিয়ে কিছু দেখে আসতে সাধ হয়—তবে তার খরচ অনেক। সুতরাং চরিত্র-নষ্টের উদ্দাম প্রচেষ্টাকে অনেক সময় থামিয়ে রাখতে হত, এবং আমরা নিজেদের সংযম ও অনাসক্তির জন্য কষ্ট পেতুম!

মনে মনে ভাবতুম কালের বিচারে সমকালীন লেখকদের কারও প্রতিভা এখনও স্বীকৃত হয়নি। কেউ ঈষৎ চিকচিক করছে, কেউ কিছু দানা বাঁধছে। শক্তির সেই অনন্য স্ফুরণ কারও মধ্যে এখনও স্পষ্ট নয়। কারও কুঁড়ি ধরেছে, কুঁড়ির মধ্যে গন্ধ জমেছে—সে-কুঁড়ি অকালে ঝরে না গেলে ফুল আসবে! ফুলের পর ফল ধরবে। সেই ফলে রসের সঞ্চার হবে। অতঃপর সেই রস হবে মধুর ও সুস্বাদ। সুতরাং এখনও অনেক দেরি। এখনও অনেক বছর।

সম্প্রতি কয়েকজন প্রবীণ লেখকের সংস্পর্শে এসেছিলুম। কবিশেখর কালিদাস

রায়, বিশ্বপতি চৌধুরী, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার ও হেমেন্দ্রলাল রায়, রায়বাহাদুর জলধর সেন ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র, মোহিতলাল মজুমদার, শচীন সেনগুপ্ত প্রভৃতি। তখন শচীনবাবুর সম্পাদনায় 'ফরওয়ার্ড' অফিস থেকে 'নবশক্তি' নামক সাপ্তাহিক কাগজ ছাপা হত। তখন 'নবশক্তি'র খুব নাম। সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্র। এই পত্রে 'শতকরা নিরানব্বই নামক আমার একটি ছোটগল্প ছাপা হবার ফলে একটা সোরগোল ওঠে। গল্পটি নাকি অশ্লীল। এ নিয়ে নবশক্তির মালিক শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের সঙ্গে শচীনবাবুর কিছু বচসা বাধে। শচীনবাবু ছিলেন নির্ভীক এবং অতিশয় স্পষ্টবাদী। তিনি বলেন, দায়িত্বশীল সম্পাদকের বিচারই শেষ বিচার। এ গল্প আমি ভেবেচিন্তেই ছেপেছি। এ ব্যাপারে যদি কেউ আমার উপরে প্রভুত্ব করতে আসে, আমি চাকরি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত।

কথাটা ওখানেই চাপা পড়ে। শচীনবাবু খুবই বেপরোয়া ছিলেন।

এই আবহাওয়ার মধ্যেই লিখে যাচ্ছে সবাই। মাসিকের পৃষ্ঠা ভরাবার জন্য ছোটগল্প চাই—তার জন্য কোথাও কোথাও দশ-পনেরো টাকা মেলে। নজরুলের কবিতার আর্থিক দাম আছে, অন্য কারও নেই। কবিতা লিখে পারিশ্রমিক পাওয়া তখন স্বপ্নাতীত। প্রবন্ধাদি লিখতে গেলে কিছু পাণ্ডিত্য লাগে। সে-দিকে কেউ হাঁটে না। উপন্যাস কেউ চায় না, কারণ কেউই তখন ঔপন্যাসিক হয়ে ওঠেনি। এই সময় আমি একখানা ছোট উপন্যাস লিখে এক বটতলার প্রকাশকের কাছে নিয়ে যাই। দিন তিনেক পরে খবর নিতে গেলুম। তিনি বললেন, আজকাল বই ছাপতে খরচ অনেক। তবে হ্যাঁ, ছাপা যেতে পারে! ফর্মা পিছু দু আনা দাম ধরতে হবে, নইলে খরচ উঠবে না। আমি বইটির জন্য পঁচিশটি টাকা চেয়েছিলুম। তিনি তৎক্ষণাৎ পাণ্ডুলিপিটি বের করে ফেরত দিলেন। মনে করেছিলুম ছিঁড়ে ফেলে দেবো। মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কারণ যেমন তেমন করে ওই কাঁচা অপদার্থ উপন্যাসটি রাত্রির পর রাত্রি জেগে শেষ করেছিলুম, কেবলমাত্র কিছু পাব আশা করে। আমার দারিদ্র্য প্রায় চরমে উঠেছিল।

এর প্রায় ষোলা বছর পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে যখন প্রবল মুদ্রাস্ফীতি ঘটে, সেই সময় জেলেটোলার পাড়া থেকে এক নব্য প্রকাশক আমার কাছে একখানি নতুন উপন্যাস চান। পূর্বোক্ত উপন্যাসটি আমি বের করলুম। সেটিতে এখন পোকা ধরেছে, ড্যাম্পের ছোপ পড়েছে, কাগজগুলোয় গর্ত-গর্ত হয়েছে। কিন্তু আমি ছিলুম একটু জেদী। যে-বইটিতে একদা পঁচিশটি টাকাও পাইনি, সেই বইটির দুটি সংস্করণের দরুণ পঁচিশ শ' টাকা দাবী করলুম। নব্য প্রকাশক দ্বিরুক্তি করলেন না। সেদিন মনে হয়েছিল, পথ থেকে আড়াই হাজার টাকা যেন কুড়িয়ে পেলুম।

ওদিকে ভারতের রাজনীতিক দিগন্তে আবার দেখা দিল কালো মেঘ। বাঙলায় বিপ্লববাদ বেশ নিঃশব্দে দানা বেঁধে উঠছিল। বড়লাট লর্ড রেডিং উৎপীড়নের নীতি

গ্রহণ করেছিলেন। এখন এসেছেন দুর্মুখো লর্ড আরউইন। বিপ্লব-নেতা ভগৎ সিং, সুখদেব, রাজগুরু আর বটুকেশ্বর দত্তর বিচার শেষ হচ্ছে। লাহোর জেলে তরুণ যতীন দাস আমরণ উপবাসের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে।

ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে শাণিত তরবারির ফলকের মতো বিজলীর ঝলক থেকে থেকে থেকে ঝলসিয়ে উঠছিল। ওই লাহোরে এবার জওয়াহরলাল নেহেরু কংগ্রেস সভাপতি হয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষণা করবেন। সুভাষচন্দ্র জ্বালাময়ী বক্তৃতার দ্বারা বিশাল ভারতকে চঞ্চল করে তুলেছেন।

এই দশকে একে একে যাঁদের শবযাত্রার সঙ্গী হয়েছিলুম, তাঁরা হলেন স্যার আশুতোষ, স্যার সুরেন্দ্রনাথ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। এবার আসছে যতীন দাসের মৃতদেহ। জেলের মধ্যে সে চৌষট্টি দিন নির্জলা উপবাস করেছিল। সেই মুমূর্ষু যতীনকে বলপূর্বক নাক দিয়ে ও গলা দিয়ে খাওয়াবার চেষ্টা করা হয়। সেই সাংঘাতিক উৎপীড়নের মধ্যে মৃতকল্প হয়েও বাঙলার কেশরী সেই বিপ্লববাদী তরুণ আপন সঙ্কল্পচ্যুত হয়নি। পৃথিবীর বিপ্লববাদীদের ইতিহাসে যতীন হয়ে উঠল দ্বিতীয় ম্যাকসুইনি। সেদিন সমগ্র কলকাতা কাঁদতে কাঁদতে ছুটেছিল হাওড়া স্টেশনে। যতীনের মৃতদেহ সঙ্গে নিয়ে আসছে ওর ছোট ভাই কিরণ দাস।

বাঙালী সেদিন অহিংসা-মন্ত্রে আরেকবার বিশ্বাস হারিয়েছিল। যাই হোক, সেই থেকে কিরণদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়।

কিন্তু আর নয়, এবার আসি ব্যক্তিগত কথায়।

আমি বেরিয়ে পড়েছিলুম ভ্রমণে। এর মধ্যে 'বাপির হাঁড়িতে কিছু পান্তাভাত' জমেছিল। অর্থাৎ ঘরে পান্তা থাকলে বাপি আর কাজ করতে চায় না। সেইরূপ আমার সাহিত্যকর্মের বকশিশ মাঝে মাঝে কিছু জমে যেত। তখন আর ছোটখাটো কথা নয়—একেবারে সোজা হিমালয়। তখন মারি ত গণ্ডার; লুটি ত ভাণ্ডার! হিমালয়ের এখানে ওখানে বৃষ্টিতে ভিজে, রোদ্রে পুড়ে, ঠাণ্ডায় কেঁপে, আধপেটা রুটি খেয়ে ক্লান্ত হয়ে একদিন গিয়ে বসতুম হরিদ্বারে। কেউ তখন জানত না আমি কোথায়। অবশেষে একদিন একখানা কম্বল আর পুঁটলি নিয়ে নামতুম কাশীতে।

বেশ গুছিয়ে কদিন কাশীতে বসেছি এবং ধীরে ধীরে বেশ আড্ডাটা জমে উঠেছে এমন সময় একদিন হেমন্তবাবুর ওখান থেকে এক আমন্ত্রণ পেলুম। রাস-পূর্ণিমা তিথিতে ওঁদের ওখানে সত্যনারায়ণের ব্রতপূজা। ওঁরা কয়েকজনকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ করেছেন। আমি নাকি এবার হেমন্তবাবুর বিশিষ্ট অতিথি।

আমি রাজী হয়ে গেলুম। হেমন্তবাবু আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু। কাশীতে তিনি অধ্যাপনা করেন। সম্প্রতি তিনি ন্যায়রত্ন উপাধি পেয়েছেন।

কার্তিকী পূর্ণিমার দিন সত্যনারায়ণ ব্রতপালন। পূজা, ব্রতকথা, হরির লুট ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক ঝঞ্ঝাট পেরিয়ে একটু রাত করেই আমরা মদনপুরার কাছেই এক বাড়িতে গিয়ে ঢুকলুম। নিচের তলাটা খুবই অন্ধকার। উপর থেকে কে যেন আলো ধরল সিঁড়ির দিকে। আমি এবার অনেকদিন পরে এসেছি, সুতরাং অভ্যর্থনার কিছু

সমারোহ ছিল। হেমন্তবাবু আগে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। ঘরে তাঁর মা, স্ত্রী এবং আরেকজন অল্পবয়স্কা ফর্সা বিধবা কে যেন। এর আগে প্রসাদ বিতরণ হয়ে গেছে। এবার আমরাই শুধু খেতে বসব।

হেমন্তবাবুকে নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ গল্পে জমে গেছি, এমন সময়ে সেই বিধবা মহিলা মুখ বাড়িয়ে আমাদের ডাকলেন, আপনারা এসে খেতে বসুন।

উটকো জায়গায় আমি সাধারণত একটু লাজুক এবং নতমুখ। সেজন্য উত্তরার সুরেশের মতো আনন্দমুখর বা ননীর মতো পারিহাসরসিক কোনটাই হতে পারিনে। আমি খেতে এসেছি, হাসিমুখে দুটো আলাপ করে খেয়ে চলে যাব—এর বাইরে আমার অন্য কাজ নেই। ঘর-গৃহস্থ সম্বন্ধে আমি নির্বিকার।

গাওয়া ঘিয়ের লুচির সঙ্গে ফুলকপির তরকারি। পায়স, মোহনভোগ, রাবড়ি। দইয়ের সঙ্গে দরবেশ আর ক্ষীরের খোয়া—অর্থাৎ তখনকার দিনে নৈবেদ্যলোভী নারায়ণ জাগ্রত দেবতা ছিল। প্রচুর পরিমাণ আহারাদি সেরে একে একে সবাই হাত ধুতে উঠল। হেমন্তবাবু আগে উঠে হাত ধুয়ে নিজের ঘরে গেলেন। পরে একে একে সকলের হাতে জল ঢেলে দিচ্ছিলেন ওই বিধবা মহিলা। সব শেষে আমি একপ্রান্তে এগিয়ে ঠিক নলের মুখে হাতখানা যখন বাড়িয়েছি, তখন হঠাৎ ওই মহিলা আমার এঁটো হাতখানা নিজের ডান হাতে টিপে ধরে বাঁ হাতের ঘটির জলে কচলিয়ে ধুইয়ে দিতে লাগলেন, এবং অতি সঙ্গোপনে প্রায় আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, আমাকে ভুলে গেছেন?

ইলেকট্রিকের শক্! আমার সর্বাঙ্গ অসাড় ও অচেতন হয়ে গিয়েছিল। আমার কিছু বলবার আগেই তিনি পুনরায় বললেন, কাল বেলা এগারোটায় ঘোড়াঘাটে হাঁড়ির দোকানের কাছে দাঁড়াবেন,—একটু কথা আছে!

সমস্ত ব্যাপারটা আধ মিনিটেরও অনেক কম। মহিলা ওঁর থান কাপড়ের আঁচল দিয়ে পলকের মধ্যে আমার হাতখানা মুছে নিলেন। আমি সেখান থেকে সরে এলুম।

উত্তেজনায় থর থর করে আমি কাঁপছিলুম। গত একঘণ্টা কালের মধ্যেও মুখ তুলে যাঁর দিকে একটিবারও তাকাইনি, তাঁর এবম্বিধ আচরণ আমাকে বিমূঢ় করেছিল। হেমন্তবাবুর ঘরে ঢুকে একটা পান মুখে দিয়ে সকলের আগেই আমি অন্ধকার সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালুম।

সেই রাত্রে আমার ঘুম হয়নি। কুচবিহারের কালীবাড়িতে রোশনচৌকির সঙ্গীত আরম্ভ হয় শেষ রাত্রে,—তখনও আমি জেগে। মনে হচ্ছিল জীবনে এই প্রথম একজন আমার নিদ্রাহরণ করেছে। ওই প্রকার হাত টিপে ধরার মধ্যে কী ছিল আমি জানি। কিন্তু আমি কখনই কল্পনা করিনি, ভদ্রসমাজের এক বিধবা জনৈক পুরুষের হাত এভাবে ধরবেন! এতকাল ধরে জেনে এসেছিলুম মেয়েদের পিছনে পুরুষ ছোটে, কিন্তু এখানে তার ব্যতিক্রম দেখে নিজেই নির্বোধ বনে গেছি। প্রণয় ইত্যাদি ব্যাপারে আমি কেবল অনভিজ্ঞই নয়, আমি অকৃতী ও অপদার্থ,—অন্তত এখন পর্যন্ত এইটিই

প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কিন্তু আমি মূলত রোমাণ্টিক, স্বপ্নাশী, রসকল্পী—আমি সেণ্টিমেণ্টাল্। আমি বহু পরিবারের সঙ্গে লিপ্ত, বহু অন্দরমহলে আমার আনা-গোনা, কিন্তু অদ্যাবধি আমার নৈতিক চরিত্র নিয়ে কোথাও কোনও কথা ওঠেনি। এসব ব্যাপারে আমি অযোগ্যও বটে, উদাসীনও বটে।

নতুন ও মধুর ঠাণ্ডা পড়েছে কাশীতে। পুজোর ভীড় ক্রমে ক্রমে শেষ হচ্ছে, পালপার্বণ এখন কিছুকাল কমই থাকবে। ঘাটগুলোয় গতকাল জনতা ছিল প্রচুর, আজ অনেকটা ফাঁকা। বাঙ্গালীটোলার গলিতে জনস্রোত কিছু মন্দা। আমি ওরই ভেতর দিয়ে এগোচ্ছিলুম। আমার পায়ের সঙ্গে মনও কাঁপছিল উত্তেজনায়। আমি যাচ্ছিনে, আমাকে যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে! সমস্ত ব্যাপারটার পিছনে রয়েছে একটা গোপনীয়তা, সেটা আমাকে যেন একপ্রকার চৌর্যবৃত্তিতে উস্কানি দিচ্ছে। না, এটা রোমান্স নয়, এটা স্বপ্ন বেশ নয়, এর মধ্যে কাব্যের বা সঙ্গীতের কোন সুরমূর্ছনা নেই, —এ যেন স্থূল একটা যৌবন-বিহ্বলতার ডাক।

দশাশ্বমেধ ঘাটে নেমে প্রয়াগ ঘাটের তলা দিয়ে আমি ঘোড়াঘাটের সিঁড়ি ধরলুম। উঠতে উঠতেই উপর দিকে বাঁহাতি লক্ষ্য করলুম, যাঁর জন্য এসেছি তিনি আগে-ভাগেই এসে হাঁড়ির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দরাদরি করছেন। ওঁর গায়ে মটকার একখানা চাদর জড়ানো। মাথায় একটু ঘোমটা। পায়ে একজোড়া চটি। গত রাত্রে যাঁকে আচমকা চিনতে পারিনি, আজ তাঁকে চিনলুম। তিনি শাস্ত্রী মশায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী শীলা।

কাছাকাছি এসে আমি হাসলুম। আমার হাসিতে সাদর অভ্যর্থনা ছিল।

শীলা দেবী বললেন, এবার আমি দেখলুম আপনাকে বছর তিনেক পরে। কিন্তু কই, আমি ত ভুলিনি?

বললুম, বাঃ আপনাকে ভাল করে দেখলুম কবে? শাস্ত্রীমশায়ের কাছে বই আনতে যেতুম, আগের বই ফেরত দিয়ে চলে আসতুম। হয়ত এক-আধবার আপনাকে দেখে থাকব। এখন কি কথা আছে বলুন।

চলুন, এখানে নয়। যেতে যেতে বলব।—শীলা দেবী নিজেই এগোলেন এবং আমি তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে দশাশ্বমেধ বোর্ডিংয়ের পিছনের গলিটায় দুটো সিঁড়ি পেরিয়ে চললুম।

শীলা দেবী বললেন, আমি কিন্তু এ গলিতে কখনো হাঁটিনি। আপনি এ পথ চেনেন?

বিলক্ষণ, সবাই চেনে।

বড্ড লোকজন গিজগিজ করছে। চলুন না একটু নিরিবিলিতে? বসবার জায়গা নেই কোথাও?

চলুন দেখি।—

এখন আর আমরা কোনও অপরিচয়ের মধ্যে নেই। উনি আমাদের বড়বাড়ির সবাইকে জানেন। শাস্ত্রীমহাশয়ের সঙ্গে প্রভাসের শ্বশুরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। অনীতা

ওরকে দুর্গাঠাকরুণ আমার বৌদিদি—এটি ওঁর জানা। আমার ভাগ্নী বুলি যে কিশোর বয়স থেকে বিধবা সে খবর উনি রাখেন।

কথা বলতে বলতে আমরা এক সময় ডানদিকে বেঁকে নেপালী মন্দিরে এসে নামলুম। এটি গাছের ছায়াঢাকা নিভৃত পশুপতিনাথের মন্দির। অনেক নিচে-গঙ্গা মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে ঝিকমিক করছে। পাশ দিয়ে নেমে গেছে ঘাটের সিঁড়ি। এ মন্দির শহরের জনকোলাহল থেকে একটু দূরে, সেজন্য বড় একটা কেউ এদিকে আসে না। সব মিলিয়ে মন্দিরটি খুব বড় নয়।

জলের দিক ঘেঁষে আমরা শান-পাথরের এক জায়গায় এসে বসলুম।

মেয়ের পক্ষে অপমান—যদি সে মনে করে তার গরজই বেশি। সুতরাং গরজ আমারও আছে, এই তাকে বোঝানো দরকার। শীলা দেবী বললেন, অবাক কাণ্ড! আপনার চেহারা এত বদলে গেছে যে, আমি প্রথমটা বিশ্বাসই করতে পারিনি। সেদিন মাস্টারমশায়ের সঙ্গে আপনি মদনপুরা দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি দেখলুম জানলা দিয়ে। আমি যে হেমন্তবাবুর বউয়ের কাছে শেলাই শিখতে আসি!

এবার বললুম, আপনার স্বামী মারা গেছেন কদ্দিন আগে?

না, আমাকে 'আপনি' না,—তুমি! কই, আমার ত বাধে না তুমি বলতে?—শীলা বললেন, এতদিন ধরে আমি একমনে তোমাকে ভেবে এসেছি, আর আজ তুমি আমাকে আপনি-আজ্ঞে বলে দূরে সরাতে চাও? থাক্ স্বামীর কথা! কবে ঘর করলুম তার সঙ্গে যে তার কথা তুলব? কখ্খনো তার কথা আর বলো না!

আমি আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিলুম। এ মেয়ে কোন্ কথায় কোথায় আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে? আমি ছোট গল্প লিখি, উপন্যাস লেখবারও চেষ্টা পাই। কিন্তু সে ত প্রত্যক্ষ জীবনে নিয়ে কারবার করা নয়—সে যে আমার প্রগলভ কল্পনা। সেখানে আমারই মনের দুই রসের ধারা দুই কল্পিত নায়ক নায়িকার মুখ দিয়ে আমারই পছন্দ মতো কথা নয় কি? কিন্তু এখানে? এ যে কাঁচা জীবন! একে ত দেখিনি বা বুঝিনি কোনদিন? আজ কী জবাব দেবো সামান্য সাধারণ মেয়ের প্রশ্নের?

ওর ওই দু'একটা কথায় আমি যেন খেলো হয়ে যাচ্ছিলুম। কিন্তু এবার আমি মুখ খুললুম,—কাল রাত্রে লুকিয়ে হঠাৎ আমার হাতখানা ধরেছিলে কেন বলো ত? কথাই বা কি আছে আমার সঙ্গে?

এ আবার কী বলছ তুমি?—শীলা বলল, আমি ত এই জন্যেই তোমাকে ডেকে আনলুম। তিন বছর ধরে দিনরাত যার কথা ভাবছি, তার হাত আর আমার হাত মিলে-মিশেই ত আছে। ছুঁয়েছি এই না হয় প্রথম। তুমি বুঝি খুব রাগ করেছিলে?

আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। আমি অন্য কথা ভেবেছিলুম!

শীলা এবার মুখ টিপে হাসল। বলল, আমার মতন মন্দ মেয়ে আগে কখনো দেখেছ? জোর করে পুরুষমানুষের হাত ধরল, গলা টিপে এতদূর নিয়ে এল, কাছে বসিয়ে মনে-মনে ফুল-বেলপাতা দিয়ে পুজো করছে,—এ মেয়ে মন্দ শুধু নয়, এ নষ্ট দুষ্টু! তাই না ভেবেছিলে?

কি জানি,—আমিও হেসে ফেললুম, আমি বোধ হয় কোনও মেয়েকেই স্পষ্ট করে কোনদিন দেখিনি। তুমি নতুন আমার কাছে।

আমার হাসিতে শীলাও যোগ দিল। পরে বলল, আমি নতুন তোমার চোখে, তুমি আমার কাছে কিন্তু নতুন নও। এই যে এতক্ষণ কথা বলছি, তুমিও মাথা নিচু করে শুনছ,—কিন্তু কই, মুখ তোলোনি ত? নিজের মুখে সব কথা কেন বলব? মানুষ ত চোখ দিয়েও বলে, হাসি-কান্না দিয়েও ত বলে। তুমি কি কিছু শেখোনি?

এবার আমি মুখ তুললুম। স্পষ্ট করে তাকালুম শীলার দুই চোখের দিকে। কিছু বললুম না, হাসলুম। শীলার দুই চোখের বড় বড় দুটো কালো তারা বড় বড় কালো পল্লবে যেন ছায়াঢাকা। গায়ের রঙে যেন কাশীর ভরা গঙ্গার আভাস পাওয়া যায়। আমি নাবালক নই। কী সে বলতে চায় আমি জানি। কিন্তু রবি-ঠাকুর হয়ত একদা এমনি দুটো চোখ কোথাও দেখে লিখে থাকবেন, "দেখেছি কালো চোখের পক্ষ্মরেখায় জলের আভাস/দেখেছি কম্পিত অধরে নিমীলিত বাণীর বেদনা—"

এবার গা ঝাড়া দিয়ে বললুম, বলো ত শীলা, কী আছে তোমার মধ্যে?

শীলা এক ঝলক হেসে উঠে দাঁড়াল। আরেকবার মট্‌কার চাদরখানা গুছিয়ে গায়ে জড়িয়ে বলল, আমার মধ্যে? আমার মধ্যে একটি ছোট্ট কথা আছে লুকিয়ে। অনেক খোসা ছাড়ালেও সেটি খুঁজে পাবে না কোনদিন। চলো, এবার যাই। তোমাকে ডেকে এনেছিলুম এই কথা বলতে যে, সে কথা তুমি শুনবে না কোনদিন।

আমি এখন যাব না।

তাহলে আমিই চলে যাব তোমাকে ফেলে! শীলা বলল, তাহলে তুমি দাঁড়িয়ে থাকো এই মন্দিরে, নিচে গঙ্গা বয়ে চলুক! থাকো এখানে শিবের গায়ে-গায়ে—যত-কাল ধরে গঙ্গার স্রোত ছুটবে কাশীর পায়ের তলা দিয়ে! পারবে দাঁড়িয়ে থাকতে ততকাল? চলো, আর না—। তুমি শুনতে চাওনি, কিন্তু আমার কথা বলা হয়ে গেছে!

তা হলে এখানেই সব শেষ করে দিতে চাইছ?

শীলা ফিরে দাঁড়িয়ে আমার একখানা হাত ধরে বলল, এসো। না, এখানে শেষ নয় এখানে আরম্ভ। ঠিক জায়গায় গিয়ে ঠিক সময়টিতে শেষ হবে। চলো—।

শীলা সেদিন ধরে এনেছিল ওদের বাড়িতে। চৌষট্টির গলি ছাড়িয়ে হাতী-ফট্‌কা পেরিয়ে দেবনাথপুরায় ঢুকে দুটো গলি পেরোলেই ওদের বাড়ি। নিচের তলাটা ঝরঝরে, খটখটে—দুদিক থেকে আলো-যাওয়া আসে। দক্ষিণে বেশ চওড়া বারান্দা —শীতের দিন রোদ পাবার সুবিধা। এ বাড়ি আমার খুবই চেনা। এ বাড়িতে আমার বহুদিনের যাতায়াত।

শাস্ত্রীমশায়ের সামনে আমাকে নিয়ে হাজির করল শীলা। বলল, জ্যেঠামশাই, এই দেখুন আপনার পুরনো ছাত্র এসেছেন।

কে? আরে তুমি? এসো বাবা, এসো—

আমি দু'পা এগিয়ে ও'র পায়ের ধুলো নিলুম। শাস্ত্রীমশায় বললেন, কিশোরের মুখে শুনেছি তুমি পাঞ্জাব থেকে ফিরে এসেছ। ভালই করেছ। কদ্দিন আছ?

বললুম, দশ-বারো দিন হল এসেছি, দু-চারদিনের মধ্যেই ফিরব। আমি আপনার এখানেই আসছিলুম, শীলা দেবীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কালীতলায়।

উনি বললেন, হ্যাঁ কাল গেছে রাস, আজ পারণ। ওর পিসিমার পুজোটা দিতে গিয়েছিল কালীতলায়। যাই হোক, তোমার চেহারাটা এবার একটু ডাকাবুকো হয়েছে যেন। অনেক দিন পরে দেখছি ত?

আমি খুব হেসে উঠলুম। শীলা গা-ঢাকা দিয়েছিল।

দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বৃদ্ধা পিসিমা। আমি গিয়ে তার পায়ের ধুলো নিলুম। তিনি আমাকে আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন, তা কেন বলছ, বৈকুণ্ঠ? ওই বয়সে কিশোরের চেহারাটা ভাবো দেখি? সেও ছিল মউরছাড়া কার্তিক। সাণ্ডেলগুষ্টির ধরনটাই ওই।

শীলা এবার ফিরে এলো। পিসিমার পিছনে দাঁড়িয়ে আমার চোখে সে চোখ রাখল। পরে বলল, জ্যোঠামশাই, কাল ও'র বউদিদিরা যাচ্ছেন বিশ্বনাথের শয়নারতি দেখতে। ও'দের সঙ্গে আমি যাব জ্যেঠামশাই?

স্নানের সময় হয়েছিল শাস্ত্রীমশায়ের। তিনি উঠছিলেন। বললেন, শয়নারতি? তা মন্দ কি? রাজবেশ দেখতে ভালই লাগে। বেশ, যেয়ো মা। কাল সন্ধ্যায় তাহলে উপনিষৎ পড়াটা স্থগিত রেখো?

পিসিমা বললেন, ফিরতে যে অনেক রাত হবে, শীলা?

হোক না পিসিমা—শীলা বলল, বড় বউদিদিকে বলব আমাদের দরজা অবধি যেন পেঁছিয়ে দিয়ে যান।

শাস্ত্রীমশায় আমার মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে স্নানে গেলেন। পিসিমা আমাকে একটু মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছাড়বেন না। তারই এক ফাঁকে চাপাগলায় শীলা আমাকে জানিয়ে দিল, কাল সন্ধ্যে ঠিক সাড়ে সাতটায় কালীতলায়—। মাথার দিব্যি রইল কিন্তু। ঠিক আসা চাই।

কপটতায় আমি সেদিনও সিদ্ধহস্ত হইনি। কিন্তু নিঃসঙ্কোচ ও বিনা দ্বিধায় সেদিন শীলা তার শান্ত ও নম্রহাস্যে পিসিমা ও জ্যেঠামশায়কে এমন এক পরিস্থিতিতে প্রতারিত করল যেটি লক্ষ্য করে আমার সর্বাঙ্গে একটা কাঁপন ধরে গেল। আমি সম্মোহিত, বিমূঢ়—আমি যেন পক্ষাঘাতে অচেতন। জনৈকা বিধবা যুবতীর পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ, নৈতিক শুচিতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা—সমস্তই যে এই প্রতারণার ফলে বিপন্ন হতে পারে, শীলা সেটি ভাবল না। আমি ওর মুখের দিকে হতবাক হয়ে চেয়ে ছিলুম।

সেদিন পিসিমার হাতের মিষ্টি খেতে গিয়ে ক্ষণে ক্ষণে আমার গা ঘুলিয়ে উঠছিল।

[প্রথম পর্ব, প্রথম খণ্ড সমাপ্ত]

বনস্পতির বৈঠক

[প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় খণ্ড]

সন্ধ্যার পর পা টিপে-টিপে বাঙ্গালীটোলার গলির ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলুম। সোনারপুরার গলিপথ দিয়ে বেরিয়ে মান-সরোবরের গলিটা ছাড়িয়ে বাঁ দিকে পাঁড়ে-হাউলি। সুবিধা ছিল, গলিঘুঁজির মধ্যে তখনও ইলেকট্রিক হয়নি। রাজ-রাজেশ্বরীর গলিটাও অন্ধকার। ওটা এড়িয়ে উত্তরে চ'লে যাচ্ছিলুম। আমি অলক্ষ্য এক সরীসৃপের মতো গুটিগুটি অগ্রসর হচ্ছিলুম।

ভাবছিলুম অন্ধকারে পথ যেন তাড়াতাড়ি না ফুরোয়! বেশ কড়া ঠাণ্ডা পড়েছে—যেটি আমার পক্ষে সুবিধাজনক। মোটা গরম র‍্যাপারখানায় সর্বাঙ্গ ঢেকেছি। মাথাটাও ঢেকে নিয়েছি—যা কখনও ঢাকিনে। আমাকে কেউ চিনতে না পারে, কেউ দেখতে না পায়! পাপ আছে নিজের মনে, সেই মন যদি পরিচিত কারও কাছে হঠাৎ ধরা পড়ে? কে জানে আচমকা হয়ত অভয় লাহিড়ীমশায় হাতী-ফট্কা থেকে হাঁক দিয়ে ডাকবেন! হয়ত পাঁচু স্যাকরা গলা বাড়িয়ে বলবে, ছোড়দা যে? মুড়ি দিয়ে চললেন কোথা? হয়ত মোতি-ঝি মাসিমার জন্য মালাই-রাবড়ি নিয়ে ফিরছে। কে জানে হয়ত বা কিশোরদাদারই মুখোমুখি!

না, দরকার নেই। কাপড়ের দোকানের গায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে খালিসপুরার মধ্যে ঢুকে পড়ে বাঁচলুম। আমি একটা যে ঘোরতর নৈতিক অপরাধ করতে এগিয়ে যাচ্ছি, কেউ লক্ষ্য করছে কি আমাকে? কেউ কি সন্দেহ করছে না, আমি যাচ্ছি এক শুচিশুদ্ধা নিষ্ঠাবতী ব্রহ্মচারিণীর অপরিণামদর্শী মায়াজালের ফাঁদে ধরা দিতে? আমি পুরুষ,—অজ্ঞান অবলাকে সর্ববিধ আপদ থেকে রক্ষা করার সর্বাঙ্গীণ দায়িত্ব আমার। আমি শ্লথপ্রাণ নই, আপন চিত্তদৌর্বল্যকে সংবরণ করার যথেষ্ট শক্তি আমার থাকা দরকার। কিন্তু আজ আমি সম্মোহিত, মহামায়ার মায়ায় আমি আচ্ছন্ন।

এ-গলির ঘন অন্ধকারে কালভৈরবের প্রেতচ্ছায়ার মতো অনির্দেশ্যভাবে কিছুক্ষণ ঘুরে গণেশমহল্লা দিয়ে অন্য পথ ধরলুম। আমার বিবেচনাশক্তি কম, এ আমি স্বীকার করিনে, কিন্তু আজ আমি যেন নিরুপায়! এ যেন অপমৃত্যুর একটা অচ্ছেদ্য টান—এ টানে যেন আমাকে যেতেই হবে। এ শুধু মায়াজাল নয়, মহামায়ার ইন্দ্রজাল! কেউ কোথাও থেকে আমাকে দেখছে না, কিন্তু নিজেকে আমি দেখছিলুম! আমারই এই বুকের বৃন্দাবনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলুম, আমারই পঞ্জরাস্থি ভেদ করে শ্রীরাধিকা যেন চ'লেছেন অভিসারে—পিছনে রয়েছে তাঁর সমাজ, গুরুজন, নিন্দুক, পথে-পথে তাঁর গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা, চারিদিকে শত্রুভয়,—রাত্রি ঘন অন্ধকার!

উল্টোপথে নেমে এলুম ভুতেশ্বরের গলিতে। গলির মুখে এলে সামনে কালীতলার মন্দির, তার পাশে মস্ত ফুলের দোকান। গলির এই কোণে সেই মিষ্টপ্রকৃতি হিন্দুস্থানী বউটার মালাই-রাবড়ির দোকান কালীমন্দিরের মুখোমুখি।

ঘন বেগুনী একখানা পশমের চাদর গায়ে জড়িয়ে শীলা বোধ হয় ফুল কিনছিল। দু'একবার সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। হঠাৎ পিছন দিকে চেয়ে সে আমাকে দেখল। দুই চোখ তার ওই মন্দিরের আলোয় যেন জ্ব'লে উঠল।—আমি সেই কখন থেকে

দাঁড়িয়ে তোমার জন্যে ! ও কি, মাথায় মুড়ি দিলে কেন ? এখন ত তেমন শীত পড়েনি !

তার নিঃসঙ্কোচ সহজ কণ্ঠ যেন আমাকে চাবুক মারল। তৎক্ষণাৎ আমি মাথা থেকে র‍্যাপার সরিয়ে নিলুম। বললুম, অত ফুল কিনলে যে ?

—বারে, খালি হাতে যাব শয়নারতি দেখতে ?—শীলা গলগলিয়ে উঠল, বিশ্বনাথ রাজবেশ ধারণ করবেন, আর আমার এই সামান্য গাঁদার মালা তিনি নেবেন না ? এদিকে এস—

কয়েক পা সরে এসে মন্দিরের মুখে দাঁড়িয়ে শীলা ভিতরের দিকে চেয়ে বলল, ঠাকুরমশাই, এই দেখুন, ইনিও একজন ঠাকুর, জপতপ পুজো আহ্নিক সব করেন। ওঁর কপালে একটু রক্তচন্দন মাখিয়ে দিন তো ? আমারও হাতে একটু দিন—

প্রবীণ ভট্টাচার্য মশায় আমার কপাল জুড়ে শ্বেত ও রক্তচন্দন লেপন করে দিলেন। সেই চন্দনের পাত্র থেকে শীলা খানিকটা নিজের হাতে নিল এবং প্রণামী-স্বরূপ দুটি বড় রক্তজবা ও দু আনা পয়সা নিবেদন করে প্রণাম করল হেঁট হয়ে। আমি মন্দিরের মধ্যে দেখছিলুম করালী মহাকালীর দুই উজ্জ্বল চক্ষুর নিচে আরক্তিম লোল জিহ্বা লকলক করছে যেন রক্তের ক্ষুধায় !

ওখান থেকে আমরা সড়কে গিয়ে দাঁড়ালুম। শীলা তার হাতের ছোট পুঁটলিটি চাদরের মধ্যে নিয়ে এক হাতের চন্দন দু হাতে মেখে নিল।

এখান থেকে বিশ্বনাথের গলি দিয়ে মন্দিরে পেঁছতে মিনিট দশেক লাগবে বইকি। তবু আমি বললুম, শয়নারতির এখনও অনেক দেরি। এখনই যাবে ?

হেসে উঠল শীলা—কে যাচ্ছে শয়নারতি দেখতে ? তুমিও যেমন !

অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললুম, এ কি বলছ ? যাবে না তুমি ?

শীলা আমাকে তিরস্কার করল,—বড্ড সরল তুমি, তোমাকে সব কথা বোঝানো যায় না। তিন বছর শিবপুজো করে যাকে কাছে টেনে এনেছি, তাকে ফেলে যাব পাথরের নুড়ির কাছে ? কেন, কোন্ দুঃখে ? আজ আমার ছুটি, বুঝেছ ?

এদিক ওদিক আমি তাকাচ্ছিলুম। তখনও আমার আড়ষ্টতা ঘোচেনি। আমি বললুম, কিসের ছুটি তোমার ?

—চল বলছি—শীলা ঘাটের দিকে পা বাড়াল। এখন শীতের সন্ধ্যারাত্রে ঘাটের দিকটা ফাঁকা। শীলার সঙ্গে সঙ্গে ঘাটের সিঁড়ির কাছাকাছি এসে বড় গাছটার তলায় দাঁড়ালুম। গঙ্গার ওপারে পূর্ব দিগন্তে কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ উঠছিল। সে প্রায় পূর্ণিমারই মতো। দুই কলা ক্ষয় হয়েছে।

শীলা বলল, ছুটি কিসের শুনবে ? সকল কাজকর্ম থেকে ছুটি, সমস্ত শাসন থেকে ছুটি। বেদ-উপনিষদের সব ভাষ্য আজ শিকেয় তুলে এসেছি। আজ আমাকে তুমি একটু বেড়িয়ে আনবে চল।

—রাত্রে কোথায় বেড়াবে কাশী শহরে ?—একটু অনুযোগ জানিয়ে বললুম, একায় তোমাকে নিয়ে ওঠা যাবে না, আর টাঙ্গায় চড়ে কতদূরেই বা যাওয়া সম্ভব ? এত রাত্রে

সারনাথের দিকেও যাওয়া চলবে না। তাছাড়া আরেক কথা। লোকেই বা বলবে কি?

শীলা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, লোকে কি বলবে এই ভয় পাও? লোক ত তোমার মনের ভুত! যত পাপ মনে, ন্যায় অন্যায় সবই মনে। তাহলে থাকু, কোথাও যেয়ো না! বরং তার চেয়ে এক কাজ কর। আমাকে একটু নৌকোয় চড়াও না কেন? আমার বড্ড সাধ একটু নৌকোয় চড়ি!

—এই রাত্তিরে?

—হোক না রাত্তির! ওই ত চাঁদ উঠছে একটু একটু! চল—

দুজনে নেমে এলুম প্রয়াগ ঘাটের নিচে। মাঝিরা বোধ হয় ওৎ পেতে ছিল কয়েক-জন ছুটে এল, এবং তাদের মধ্যেই একজন বুড়ো কাছে এসে বলল, আরে দাদা, কব আয়ে হুয়ে?

আমি বললুম, এই যে রামলোচন, তোমাকেই খুঁজছি। এই কদিন হল এসেছি যাও তোমার নৌকো নিয়ে এস, এই আমরা দুজন। আমাদের যেন তাড়া দিয়ো না, যতক্ষণ খুশি থাকব। ঘণ্টা হিসাবে কত নেবে?

—আরে দাদা, যো মর্জি দেনা—

রামলোচন জলের ধারে নেমে নৌকো প্রস্তুত করতে গেল। শীলা বলল, আমার কাছে গোটা চারেক টাকা আছে বলে রাখলুম। এ আমার নৈবেদ্যর খরচ।

নৌকায় উঠলুম দুজনে। রাত প্রায় আটটা। ঠাণ্ডা নেমেছে গঙ্গায় গলা বাড়িয়ে রামলোচনকে বলে দিলুম, আদিকেশবের দিকে চল—

রামলোচন হালটা ধরে নৌকার ডগায় বসে খইনি টিপতে লাগল। তার এক সহ-চর দাঁড় ঠেলে নৌকা ছেড়ে দিল। গঙ্গা উত্তরবাহিনী। আমরা উত্তরে চললুম।

ছইয়ের নিচে ছোটখাটো ঘরটি অন্ধকার। মেঝের উপর চাটাই বিছানো সেখানে বেশ গুছিয়ে বসল শীলা, এবং আমাকে তার গায়ে-গায়ে বসাল। বসলুম বটে কিন্তু আমরা পরস্পরের থেকে অনেক দূরে। কতটুকু পরিচয় হয়েছে আমাদের কতটুকু সময়ের মধ্যে? গতকাল ধর ঘণ্টা দুয়েকের অন্তরঙ্গতা? তার আগের রাত্রে শীলা আচমকা আমার হাতখানা ধরে আঁচিয়ে দিয়েছিল, তার চেয়ে বেশি কিছু নয় ত? এইটুকুতেই যদি কেউ বলে প্রণয় প্রসঙ্গ বা প্রেমের কাহিনী, তা হলে আমি মানব না। মন জানা-জানি হল প্রণয়ের সূত্র। কিন্তু এখন পর্যন্ত কে কাকে কতটুকু জানি? আমরা দুজনেই ত দুজনের অজানা! আমার মধ্যে অনেক অযোগ্যতা, অনেক অক্ষমতা, অনেক ফাঁকি আর মেকি রয়েছে। কিন্তু এটি নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই জানি আমি প্রেমিক পুরুষ নই, আমার ভিতরে কোনও প্রণয়ীর চিহ্নমাত্র নেই! আমি যেন সেই চির-কালের নিষ্ঠুর ও নিরাসক্ত পর্যবেক্ষক, যারা চিরন্তনকালের শিল্পী বংশপরম্পরায় দয়া-হীন উত্তরাধিকারী—আমি তাদেরই বংশের এক অতি ক্ষুদ্র মানবক মাত্র। আমি সেই অনাদি-অনন্ত কালের রাজ-সম্রাট নীরো—যার সামনে শুধু রোমনগরী নয়, সমগ্র দ্যুলোক-ভূলোক যদি দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে তবু সে আপন বাঁশীটি বাজিয়ে যাবে রসাবেশের নিগূঢ় তন্ময়তায়!

—কি বলো শীলা, এ কি সত্যি নয় ?

শীলা ফিরে তাকালো আমার দিকে। আমার একখানা হাত সে ধরেছিল। তার কালো পল্লব ঢাকা দুই টুকরো অন্ধকার চোখ আমার চোখের উপরে রেখে শুধু বলল, সত্যি! তুমি যা ভাবছ সব সত্যি। আমার কিন্তু চমৎকার লাগছে।

অন্ধকার গঙ্গায় ধীরে ধীরে ভেসে যাচ্ছিলুম দুজনে। বাইরে উদার দিগন্তের সকল দ্বার খোলা। গগনে-গগনে যোগ-তপস্বিনী রাত্রি যেন কান পেতে শুনছিল দুই পথভ্রষ্ট নীতিভ্রষ্ট স্খলিতপদ তরুণ-তরুণীর মৃদুগুঞ্জন।

শান্ত ও স্থির হয়ে শীলা যেন এক নিবিড় রসে তন্ময় হয়ে বসে ছিল। কিন্তু আমি ঈষৎ চাঞ্চল্যবোধ করছিলুম। এক সময় বললুম, শীলা, একটু খোলাখুলিভাবে যদি দু-একটা কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করি, তুমি কি শুনবে ?

—নিশ্চয় শুনব—শীলা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল।

—শোনো, এসব ব্যাপারে আমার আজ পর্যন্ত কোনও অভিজ্ঞতা নেই। আচ্ছা, তোমার আমার এটা কি ভালবাসা ? সত্যি বলব, আমি মেয়েদের মন জানিনে। আচ্ছা তুমি বলতে পারো, এরই নাম কি প্রণয়চর্চা ? এই সবই কি প্রেম ইত্যাদির পূর্বাভাস ?

—না, তাও না।—অকপটে শীলা স্বীকারোক্তি করল।

—তবে ? তবে কি ? মনে রেখো শীলা, তুমি ব্রাহ্মণকন্যা,—কাশীর গঙ্গার বুকের ওপরে তুমি বসে আছ! তোমার আসনের নিচে জাহ্নবীর গভীর ধারায় হাজার হাজার বছরের ভারতীয় সংস্কৃতি জপের মন্ত্র পাঠ করে চলেছে! আমাকে স্পষ্ট করে বলো—এটা কি তবে আমাদের স্থূল যৌনসম্ভোগের তাড়না ?

শীলার চোখের প্রশান্ত সহজ চাহনি এতটুকু চঞ্চল হল না। সে আমাকে দেখছিল। বোধ হয় আর কোনও মেয়ে আর কোনদিন এমন করে আমার দিকে চেয়ে থাকেনি! একসময়ে সে মিহি মৃদুহাসি হাসল। শুধু বলল, তোমার জ্ঞান, বুদ্ধি বিবেচনা—কিচ্ছু হয়নি! তোমার চোখ খোলেনি, নিজের মন চেনোনি! একদম কাঁচা তুমি। তুমি যা বলছ তার মানেও জানো না, স্বাদও জানো না।

আমি চুপ করে গেলুম। তৎকালে আমার বইপড়া বিদ্যা, লোকের মুখে ঝাল-খাওয়া। আমি তখন হুজুগের ক্রীড়নক, ফ্যাশনের ক্রীতদাস, রবি ঠাকুরের রোমাণ্টিক কাব্যরূপকের সেই অর্বাচীন কচি ও কাঁচা! আমার মুখে চলতি কাগের কয়েকটা ধারকরা বুলি, সময়-অসময়ে মদের পাত্রে দুটো চুমুক, দু'চারবার নোংরা বস্তির আনাচে-কানাচে ছোঁক ছোঁক করে বেড়ানো এবং সাহিত্যের বিচারসভায় আদর্শহীন বুদ্ধিবৃত্তির বহিঃপ্রকাশের ভয়ে কুঁকড়িয়ে একপাশে বসে থাকা—আর আমাদের চারিদিকে "মিথ্যা খ্যাতি বেড়ে ওঠে কথায় কথায়—"। আজ যখন সাধারণ মেয়ে সহজ প্রশ্নের জবাব চাইছে, তখন আমার মুখ ফুটছে না।

শীলা বলল, জ্যেঠামশায়ের কাছে অনুগত শিষ্যের মতন যখন-তখন তুমি যাতায়াত করে এসেছ। আমার পায়ের শব্দ শুনেছ, আনাগোনা জেনেছ। কিন্তু একবারও

কি তোমার মনে হয়নি যে, তিন-চার বছর ধরে আমি শুধু তোমাকেই নিয়ে আছি? এ কি জেনেছ একবারও যে, তোমার মধ্যে আমিই বাস করছিলুম? এ কখনো ভেবেছ, আমার ঘরকন্নায় তুমি ছাড়া অন্য কেউ ছিল না? তাই তুমি শুধু মনে রেখেছ হাতখানা ধরা আর ঘণ্টাদুয়েকের বাকবিতণ্ডা? বাঃ ধন্যি তুমি!

এবার আমি প্রতিবাদ জানালুম, তোমার কথা এক বর্ণও বুঝতে পারছিনে, শীলা! তুমি যে এতদিন ধরে আমার খবর রেখে এসেছ—

—খবর?—শীলা যেন গর্জিয়ে উঠল, পুতুলের মতন তোমায় নিয়ে খেলেছি, সে কি জানো? অশুদ্ধ ছিল দেহ-মন, তাই দীক্ষা নিয়েছি—তোমারই জন্যে। তোমার কৌমার্য আজও কেউ হরণ করেনি, সে যে আমারই শিবপুজোর ফল! কে তোমাকে নিরাপদে সেই মিলিটারি দেশ থেকে ফিরিয়ে আনল,—সে কি আমি নই? শুধু যৌন-সম্ভোগের তাড়নার কথা শিখে রেখেছ, কিন্তু তার উপলক্ষ্য যে মেয়ে, —সেই মেয়ের নিগূঢ় চৈতন্যের পাকে-পাকে জীবন-দেবতার যে আসন, তার খোঁজ কি একবারও পাওনি?

আমি চুপ করে গেলুম। এ যেন বাতুলের প্রলাপ। শীলার আগাগোড়া কথা-বার্তায় আমি কোনও অর্থসঙ্গতি খুঁজে পাচ্ছিলুম না। আচার-অনুষ্ঠানের অন্ধ সংস্কার থেকে তার কি এই দৈব বিশ্বাসের জন্ম? তার কথাগুলো একে একে শুনে আমি যেন হতবুদ্ধির মতো বসে রইলুম।

শীলা নিঃশব্দে আমার দ্বিতীয় হাতখানা টেনে নিয়ে তার নিজের দুখানা হাতের শুকনো রাঙা চন্দন আমার দু'হাতে ঘষে দিতে লাগল। তারপর মিষ্ট নম্রকণ্ঠে বলল, তুমি দেখে নিয়ো আমার শিবপুজো মিথ্যে হবে না। কোনও দিন তোমার পায়ে একটি কাঁটাও ফুটবে না, কোনও বিপদে কখনো তুমি ভেঙে পড়বে না। পাপ তোমাকে কখনও ছোঁবে না। তুমি শিবকল্প, শিবময় তুমি!

শীলার হাতখানা যেন উত্তেজনায় আমার হাতের মধ্যে কাঁপছিল। এবার আমি তামাশাচ্ছলে বললুম, সবই বলছ বটে শীলা, কিন্তু আমার দুষ্প্রবৃত্তির রাশ যে বড় আলগা! তোমার শিবকে জানিয়ে আমার একটু সংযম আনিয়ে দাও! আমি কলকাতায় বাস করি, চারদিক থেকে লোভের হাতছানি—সুতরাং সংযম আমার যখন-তখন দরকার।

—তোমার ত এতটুকু অসংযম নেই।

—আছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ না, শীলা। সাংবাতিক অসংযম আমার মনে।

শীলা বলল, তবু ওই মন তোমার চিরদিন নির্মল থাকবে, দেখে নিয়ো।—এই বলে সে বাইরের দিকে যেমন নিমেষনিহত চক্ষে চেয়ে বসে ছিল, তেমনিই রইল।

পূর্ব দিগন্তে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষতচন্দ্র উঠে দাঁড়াচ্ছিল। ওপারে ধুধু করছিল মরু-বেলার জনশূন্য প্রান্তর। শীলার মুখে জ্যোৎস্নার আভা পড়ে যেন ঝলমল করছিল। তাই দেখে অত্যন্ত নাবালকের মত বলে ফেললুম, শীলা, তোমার অঙ্গে অঙ্গে গঙ্গার শোভা, সর্বাঙ্গে তোমার চন্দনের গন্ধ! তুমি দেববতী, বড় সুন্দর তুমি!

কণ্বমুনির তপোবনে দাঁড়িয়ে শকুন্তলা যেমন বাঁকা নয়নে তাকিয়েছিল নবাগত দুষ্মন্তের প্রতি, তেমনি করে আমার দিকে চেয়ে শীলা বলল, আমি সুন্দর, কেমন করে জানলে ? দেখেছ কখনো আমাকে ?

—দেখছিই ত শীলা—

শীলা হাসল। বলল, ও দেখা কতটুকু সত্যি ? চল না, একবারটি ওপারে, দেখব দুজনে দুজনকে ? ওপারটা কেমন, কখনো দেখিনি। যাবে ?

বললুম, আমিও কখনো যাইনি ওপারে। এত রাতে যেতে ভয় করে ওই শূন্যে !

—তোমাকে না বলেছি এ জীবনে কোনদিন তোমার পায়ে একটি কাঁটাও ফুটবে না ! আমার শিবকে তুমি মিথ্যে করতে চাও ? চলো যাই একবারটি—

শীলা একপ্রকার হুকুম করল।

রাত নটা বেজে গেছে। আমি রামলোচনকে ছইয়ের দরজার কাছে ডাকলুম। ডেকে বুঝিয়ে বললুম, ওপারে বালুতে আমরা কখনও পা রাখিনি। দূরের থেকেই এতকাল দেখে এসেছি দীর্ঘ বিস্তীর্ণ বালুচড়া, কাছে যাইনি কোনদিন। এবার তুমি মাঝনদীতে নৌকো ঘুরিয়ে নাও রামলোচন।

রামলোচন বলল, সর্দি বহুৎ হোগি, দাদা—

—হোক না, আমাদের বেশ গরম চাদর আছে সঙ্গে।

রামলোচন আর তার দাঁড়ি—দুজনে মাথায় পাগড়ি পাকিয়ে নিল।

প্রাণীশূন্য শব্দশূন্য যেন এক বিচ্ছিন্ন আদিম ভূখণ্ড। এ যেন বিশ্বপৃথিবীর অতীত কোন্ এক পরপার ধূসর ঊষর চন্দ্রলোকের মতো।

ঘাট নেই কোথাও। ওরই মধ্যে এক আঘাটায় নৌকা এসে ভিড়ল। আগে আমি নামলুম নরম মাটির পাঁতায়, তারপর শীলার একখানা হাত ধরে নামিয়ে নিলুম। রামলোচন সতর্ক করে দিল, বেশিদূর যেয়ো না দাদা, রাস্তার ঠিক পাবে না।

কিন্তু আমরা ত জানিনে আমরা কতটুকু দূরে কোথায় যাব, অথবা আমাদের লক্ষ্য কি ? শীলা বলল, তা হোক, তবু চলো। যতটা যাবো, ততটাই ত জানব ?

—বেশ চলো।—আমার মনে রোমাণ্টিক কাব্য এসে পড়ল—আমাদের পায়ের চিহ্ন রেখে যাবো বালুবেলায়,—ধূসর অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার আগে মৃত্যু যেমন রেখে যায় তার শেষ পদচিহ্ন ! এ যেন মানুষের প্রথম পায়ের দাগ আমরা বালির উপরে বসিয়ে বসিয়ে যাচ্ছি। যাচ্ছিলুম অনেক দূরে চন্দ্রমণ্ডলের দিকে। মনে হচ্ছে চারিদিকে সৃষ্টির প্রারম্ভকাল। আমরা এসেছি প্রথম মানব মানবী 'অনাদিকালের হৃদয় উৎস হতে'।

বালুর বড় বড় ঢিবি। কোথাও অনেক উঁচু, কোথাও বা তলিয়েছে কতকটা নিচে। চারিদিকে বালুর পাড়, মাঝখানে বড় বড় এক-একটা গহ্বর। সব মিলিয়ে যেন এক মায়াচ্ছন্নলোক। আমরা জীবসৃষ্টির প্রথম পর্বে উত্তীর্ণ।

আমাকে ধরে-ধরে আসছিল শীলা। এই মলিন ছায়াময় জ্যোৎস্নায় সে যেন

আমার চোখে হয়ে উঠল এক অপার্থিব দেবকন্যা—বিশ্বপ্রকৃতির প্রতীক। কেউ নেই এ ত্রিভুবনে—শুধু আমরা দুটি ছোট্ট জীব-চেতনা!

শীলা একটি অগভীর গহ্বরে নেমে তার গায়ের চাদরখানা পাতলো। তারপর আমাকে ডাকল, এখানে এসো।

আমি সজাগ হলুম,—আমি পুরুষ! ভাববিহ্বলতা আমাকে পেয়ে না বসে। কিন্তু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ওখান থেকেই দেখলুম, শীলা যেন একরাশি ললিতলাবণ্য! দেখতে লাগলুম মরুপ্রান্তরের এই চন্দ্রশোভায় বেদবতী মহাশ্বেতা যেন তপস্বিনী উমায় রূপান্তরিত। নিবিড় রসে আমার মুগ্ধ দৃষ্টি নিমীলিত হয়ে এলো।

—কই এস?

—সাহস হচ্ছে না, শীলা—

শীলা কয়েক পা উঠে এল। আমার মুখের কাছে মুখ তুলে সে বলল, সাহস আমি দেবো শক্তিও দেবো। কিন্তু আগে কথা দাও, আমি যাই করি, তুমি নিজের হাত দিয়ে আমাকে স্পর্শ করবে না?

—কথা দিচ্ছি—

—এস তবে।—শীলা আমার হাত ধরে চাদরখানার উপরে এনে আগে নিজে বসল, পরে বলল, নাও বস চুপটি করে। আমি যা বলব তার অবাধ্য হবে না। আমার তিন বছরের বড় সাধ, আমার হাতে তোমার শয়নারতি হবে!

আমার শয়নারতি! অদ্ভুত বটে। এ মেয়ে ছিটবায়ুগ্রস্ত কিনা আমাকে আবার ভেবে দেখতে হচ্ছে। চন্দ্রীয় অর্থে 'লুনার', উন্মাদনার অপর নাম 'লুনাসি'। শীলাকে নিশ্চয় 'চাঁদে' পেয়েছে! তার যা কিছু বাসনা, যা কিছু অবরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা —সমস্তটা যেন এই অপ্রাকৃত জ্যোৎস্নার মত গলগলিয়ে আমাকে ভাসিয়ে দিচ্ছে। তার আচরণে দেখতে পাচ্ছি, আমি এক পুতুল ছাড়া তার কাছে আর কিছু না। আমার মধ্যে যে ষড়রিপুর দল রয়েছে, আগ্নেয়গিরির প্রবল বিস্ফোরণ যে আমার মধ্যে ঘটতে পারে, আমি যে দানবের মত দাঁড়িয়ে উঠে ছারখার করে দিতে পারি আমার এই শয়নারতির কুসুমসজ্জা—এ সম্বন্ধে তার তিলমাত্র উৎকণ্ঠা দেখা যাচ্ছে না। সে শান্ত, তার মুখে প্রসন্ন স্মিতহাস্য যেন পটে আঁকা।

—আঃ, নড়ো না বলছি—

আবার স্থির হলুম। ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার শুকনো চুল উড়ছিল। তার মাথার খোঁপা ভেঙে পড়েছে তার কাঁধে ও কোলে। এবার সে তার ছোট পুঁটলিটি এলিয়ে ফুল-বেলপাতা-তুলসীর সঙ্গে যে জলকণাগুলি ধরা থাকে, তাই দিয়ে সে আমার কপালের শুকনো রাঙা চন্দনকে নরম করে বেলপাতার কাঠি দিয়ে বরচন্দন আঁকল। জ্যোৎস্নায় দুজনেই আমরা উদ্ভাসিত হচ্ছিলুম।

—এটা কি খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে না, শীলা?

—আঃ, কথা বলো না! পাথরের নুড়ি কথা বললে সাজানো যায় না!

—আমি পাথর?

—পাথর না হলে তোমার সঙ্গে নৌকোয় উঠত কে ?—শীলা স্বচ্ছকণ্ঠে বলল, তুমি শিব না হলে কোন্ মেয়ের সাধ্য এমন আদর করে কোলের কাছে টেনে আনে ?

উত্তেজিত হয়ে বললুম, শীলা, তুমি আমাকে যা ভাবছ আমি তা নই। আমার চরিত্র মোটেই সৎ আর সাধু নয়। আমি অনেক ঘাটের জল খেয়ে বেড়িয়েছি—

—আবার কথা বলছ ? একটু চুপ করে থাকতে পারো না ? অনেক ঘাটের জল খেয়েছ, বেশ করেছ। গঙ্গার কাদা গঙ্গাজলেই ধুয়ে যাবে !

শীলা তার পুঁটলি থেকে বেল ও তুলসীপাতা গুছিয়ে তার সঙ্গে গোলাপ, কুন্দ ও জবা মিলিয়ে পুঁটলির ফালি দিয়ে আমার মাথা সাজাল। পরে গাঁদার মালাটা পরালো আমার গলায়। তার নিজের গলার রুদ্রাক্ষের মালাটা খুলে আমার গলায় পরিয়ে দিল।

চোখ পাকিয়ে বললুম, জবা আর রক্তচন্দন শিবের পুজোয় লাগে না তা জানো ?

শীলা হাসিমুখে বলল, আবার সেই অজ্ঞানের কথা ! শিবের সঙ্গে শক্তি নইলে আমার পাশে তুমি কেন ? তুমি যে প্রকাশ পাচ্ছ আমার মধ্যে ? তখন যে আমাকে সুন্দর বলছিলে, সে তো তোমারই দীপ্তি। তোমারই আভা পড়েছে আমার ওপর। শিবপুজো আমার সার্থক।

—তোমার শিব কি রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা দিয়ে গড়া ?

—হ্যাঁ, আমি তাই দিয়েই গড়েছি তোমাকে,—বছরের পর বছর দিয়ে গড়েছি ! আজ সম্পূর্ণ নিখুঁত আকারে তাকে পেলুম। তুমি আমারই সৃষ্টি !

আমার কণ্ঠে আবার উত্তেজনা এল। বললুম, এগুলো আলগা এলোমেলো কথা। শুনতে এগুলো ভালই লাগে। কিন্তু এর কোন শাঁস নেই। আচ্ছা, বল তো শীলা, এসব ভাল ভাল কথা তুমি পেলে কোত্থেকে ?

শীলা বলল, কেউ শেখায়নি, কিন্তু জীবন দিয়ে শেখা ! আট বছর ধরে জেঠামশাই পিদিমের আলোর সামনে আমাকে বসিয়ে বেদ-উপনিষদ-গীতার ভাষ্য বলে যাচ্ছেন ! একদিনও কি তিনি জেনেছেন যে, তাঁর ছাত্রী তাঁর একটি ব্যাখ্যাও মন দিয়ে শোনেনি ?

—তাহলে ?

—সেই ছাত্রীর উপবাসী মন পৃথিবীর সবখানে হাহাকার করে শুধু ঘুরেছে। শুধু কেঁদে কেঁদে ফিরেছে ! জেঠামশাই কি জানতেন আমার সেই আমিকে ? যে-আমি ছড়িয়ে আছি সৃষ্টি-স্থিতি-রসাতলে ?—থাক্ জানতে চেয়ো না কিছু। সেই আমি যে আজ দানা বেঁধেছি তোমার মধ্যে ! তুমি আমারই পুতুল গো। একই শক্তি, দুটো আধার !

—এবার আমাকে উঠতে দাও শীলা।

শীলা আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে বলল, না, আরেকটু থাক। কোল জুড়ে, দেহ জুড়ে, মন জুড়ে আরেকটু থাক ! কখনও যদি তোমাকে কাছে ডাকি সে-ডাক তোমার কানে উঠবে না, যদি কখনও ভাবতে বসি, তুমি জানবে না ! আমাকে তাই কাঁদতে দাও

একবারটি—বুক ভরে আমাকে শুধু কাঁদতে দাও!

শীলা সর্বশরীর দিয়ে আমার উপর ঝুঁকে পড়ে সত্যি সত্যি এবার ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ওরই মধ্যে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, না, না গো না—তুমি প্রিয় নয়, তুমি পূজ্য। তুমি আমার পূজোয় ধরা দিয়েছ! আমি পাথরের ডেলাকে বুকের মধ্যে ধরতে চাই, রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা চাইনে! তুমি থাক দূরে, অনেক দূরে। আমার জপের মধ্যে পাব তোমাকে, তোমাকে পাব আমার একেকটি রুদ্রাক্ষের দানায়! না, ধরো না আমাকে, ছুঁয়ো না—নিজকে অপবিত্র করো না—আমি নরকের দ্বার—তুমি কথা দিয়েছিলে—

—কিন্তু এদিকে তোমার শিবের যে দমবন্ধ হয়ে এলো!

শীলা মাথা তুলল। এবার আমি তেড়েফুঁড়ে উঠে দাঁড়ালুম। কিন্তু শীলা শান্ত অবিচল। সে মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। ঘন জ্যোৎস্নার আলোয় দেখলুম, তার চোখের জল নেমেছে। আমার দিকে নিমীলিত চক্ষে তাকিয়ে সে ভাঙা-ভাঙা কণ্ঠে আবৃত্তি করতে লাগল, "বেদাহমেতম্ পুরুষম্ মহান্তমাদিত্যবর্ণম্ তমসো পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়—"

আমার হাত ধরে শীলা এবার উঠে দাঁড়াল। অতঃপর আর বাধা নেই। শয়নারতি শেষ হয়েছে। আমি তার গরম চাদরখানা তুলে ঝেড়ে তার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বললুম, চলো—

চন্দ্রবরণা রাত্রি সেদিন সাঁ সাঁ করছিল। এগারোটা বেজে গেছে। সেই রাত্রে ফিরতি নৌকা যখন আমাদেরকে দশাশ্বমেধের ঘাটে এসে নামিয়ে দিল এবং আমাকে প্রবলভাবে বাধা দিয়ে শীলা তার আঁচল থেকে চারটি টাকা রামলোচনের হাতে দিল, তখন দেখলুম ওই জনশূন্য ঘাটের সিঁড়িপথে শীলার আচরণে ও আলাপে আমার জন্য আরেক বিস্ময় অপেক্ষা করে ছিল।

আমি আবার বলছি আমি এক অপদার্থ পুরুষ, তবু আমার মধ্যে কিছু অতৃপ্ত ছিল বইকি। শীলা যখন বলছিল, শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা,—তখন আমিও ত অমৃতের পুত্র! কিন্তু অমৃতের এক পাত্র যদি মুখের সামনে এসেও দূরে সরে যায় তবে মন ক্ষুব্ধ হয় বইকি। অমৃতের পুত্র তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার কেনই বা হারাবে?

কালীতলার পাশ দিয়ে বাঙ্গালীটোলার নিশুতি গলিপথে হাটতে-হাটতে আমি বললুম, শীলা, মাত্র একদিনে আমার মন উঠল না। আবার কবে দেখা হচ্ছে বলো! কাল? পরশু? পরের দিন?

শীলা থমকিয়ে দাঁড়িয়ে সস্নেহে আমার হাত ধরল। বলল, না।

তার দিকে তাকালুম।

শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে শীলা বলল, কাল না, পরশু না—কোনদিনই না—

—তবে?

—এ জীবনেও না!

—সেকি?—আমি বললুম, এসব কি বলছ? তবে কি এসব মিথ্যে? কই, আমার

পাওনা তো আমি এখনও পাইনি ?

শীলা অন্ধকারে হাসল। বলল, তোমার পাওনা হল পুজো, সেই পুজো তুমি পেয়েছ! আমার পাওনা বন্ধুজরা আনন্দ, সে আমি পেয়ে গেলুম। দেহের টান ? ওটা ভয়ানক মিথ্যে! মিথ্যের পেছনে ছুটো না।—আচ্ছা, তোমাকে আর আসতে হবে না। আমি এবার একাই চলে যেতে পারব।

শীলা আমার হাত ছেড়ে চলে গেল, একবারও পিছন ফিরল না। দেবনাথপুরার অন্ধকার গলির বাঁকে রহস্যময়ী অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমার মাথাটা পরিষ্কার হতে দিন তিনেক লেগেছিল।—

দেখতে দেখতে নভেম্বর শেষ হতে চলল, এবার ফিরতে হয় কলকাতায়। পুজোর ঠিক আগে পর্যন্ত সাহিত্যে একপ্রকার ফসল ফলে, সেটা পুজোর পর অনেকদিন পর্যন্ত পুজো-সাহিত্য নামে চলে। মাসিক প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, সাপ্তাহিক নবশক্তি, সোনার বাংলা, দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা,—এরা তো আছেই! এরা ছাড়া কাশীর 'উত্তরা', চট্টগ্রামের 'স্বাধীনতা', এখানকার 'গল্পলহরী', 'কুন্তলীন পুরস্কার ও নিরুপমা' পুরস্কারের বিশেষ দুটি সংখ্যা—এবং এদিক-ওদিক আরও কয়েকটি। এই সবগুলি বিশেষ পুজোসংখ্যার মধ্যে 'আনন্দবাজার' ছিল সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ও লোভনীয়। প্রবাসী, নবশক্তি ও আনন্দবাজার—এ তিনটিতে লেখা প্রকাশিত হওয়ার অর্থ সাহিত্যক্ষেত্রে স্বীকৃতিলাভ।

'কল্লোল-কালিকলমে'র লেখকরা অল্পকালের মধ্যেই সেই স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

যাই হোক, 'পুজোসাহিত্য' থেকে যে ফসল তুলে পকেটে পুরেছিলুম, সে প্রায় নিঃশেষ হতে চলল। এবার ডিসেম্বরে সেই লেখাগুলো একত্র করে পুস্তকাকারে ছাপাবার চেষ্টা হবে। কিন্তু ছাপছে কোন্ প্রকাশক ? সমস্যা হল সেইখানে। গল্প ছাপা হয় সম্পাদকের অনুরোধে, সেখানে সকলের লেখা মিলিয়ে একখানা বিশেষ সংখ্যা সম্পূর্ণ হয়। সেখানে বহুজাতের লেখককে একই কাগজে পাবার একটা আকর্ষণ থাকে। থাকে কৌতুক, রঙ্গ-রস, থাকে হাসিকান্না, থাকে মজাদার সব আনন্দের খোরাক। এদের সঙ্গে থাকে ঝাল, টক, নোনতা, অম্ল, মিষ্ট, তিক্ত ও কসায়, বীর ও করুণ রস। সব মিলিয়ে একটা ওজন। পুজোসংখ্যা অনেক সময় ওজনে কাটে।

কিন্তু ছোট গল্পের নিজস্ব ওজন কোথায় ? সে যখন একক, তখন সে সে মূল্যহীন। সে যদি করুণ রসের হয়, তবে সে কাঁদে একান্তে—কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় না! পুজোর সময় রঙীন মলাটের ঘাগরা পরিয়ে সম্পাদকরা তাকে নাচের আসরে নামিয়েছিল, তার বর্ণচ্ছটায় হয়ত কিছু কিছু হাততালিও কুড়িয়েছিল। কিন্তু তারপর দর্শকরা যে যার পথে চলে গেছে! এখন সে আবার সেই ঘুঁটে-কুড়ানিতে পরিণত। আর কবিতা ? কবিতা ছাপিয়ে কোন্ সম্পাদক কাগজের পৃষ্ঠা নষ্ট করবে ? কবিতা মানেই ত সেই পুরনো হা-হুতাশ ? তবে হ্যাঁ, ওর মধ্যে কোথাও কোথাও চিকচিক করে হয়ত জীবনানন্দ, হয়ত প্রেমেন্দ্র, হয়ত বা বুদ্ধদেবও। কিন্তু

বুদ্ধদেব তখন ত জাতিচ্যুত। সে তখন একঘরে।

উপন্যাসের বাজারে শরৎচন্দ্রকে বাদ দিলে তখন 'ভারতী গোষ্ঠী'র লেখকদেরই প্রতিষ্ঠা। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্র রায়, সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নারায়ণ ভট্টাচার্য, দীনেন্দ্র রায়, সুরেন ভট্টাচার্য, ফণীন্দ্র ও যতীন্দ্র পাল। মেয়েদের মধ্যে রয়েছেন অনুরূপা, ইন্দিরা, নিরুপমা, সীতা ও শান্তা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া। সুতরাং এঁদেরকে বাদ দিয়ে উপন্যাসের বাজারে নতুন লেখকদের বাজার-মূল্য কম। আমাদের মধ্যে তখন শৈলজানন্দর উপন্যাস 'ঝড়ো হাওয়া' ছাপা হয়েছে।

.এই সব কথা নিয়ে যখন তোলাপাড়া করছি, কলকাতার খবর তখন ভাল ঠেকছে না। লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি জওয়াহরলালের হুঙ্কার, বিশাল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

পূর্ণ স্বাধীনতা ব্রিটিশ শাসকের হাত থেকে? সে আবার কি বস্তু? কেমন তার চেহারা? ইংরেজ থাকবে না ভারতে, সে-ভারত কি প্রকার? নেহরুর পিছনে আসল 'ডাইনামো' হলেন গান্ধীজী। তিনি সুস্থ আছেন ত? যাই হোক, এই সাংঘাতিক সিদ্ধান্তের ফলে লাহোর তাকাচ্ছে মাদ্রাজের দিকে, কলকাতা লক্ষ্য করছে বোম্বাইকে, করাচির চোখ দিল্লীর দিকে,—এবং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ বর্মা, মালয়, সিঙ্গাপুর ও সিংহল—এরা ভাবছে নিজেদের ভবিষ্যৎ। নেপালের মনে উদ্বেগ নেই। তার প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধ শমসের জঙ বাহাদুর রাণা হলেন মহারাজা —তিনি ব্রিটেনের বশংবদ। তাঁর হারেমে সাড়ে তিনশ 'কেটী' বা বাঁদী—যেমন আমাদের ভারতে উদয়পুর জয়পুর ইত্যাদি মহারাজাদের হারেমের বাঁদীরা! নেপালের যিনি প্রকৃত রাজা—হিজ্ ম্যাজেস্টি—সেই ত্রিভুবনবিক্রমসিংদেব থাকেন লোকচক্ষের অন্তরালে। তাঁর নিজস্ব পূজা-পার্বণ, জপ তপ ও হারেম!

দিল্লীতে বড়লাটের বদল হয়েছে। এখন লর্ড রেডিংয়ের বদলে লর্ড আরউইন। তিনি এসেছেন নতুন ছদ্মবেশে, তাঁর স্বভাব নাকি মৃদু, তিনি নাকি গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, অর্থাৎ অধিকতর কূটনীতিজ্ঞ।

লাহোরের প্রস্তাব, কিন্তু কলকাতা চঞ্চল। কলকাতার নাড়িতে-নাড়িতে যদি রনরনি ওঠে, তবে ভারতবর্ষ স্থির থাকে না। কাশীতে বসেই কানাকানি শুনলুম, বাঙলার দুটি গুপ্ত বিপ্লবী দল—যুগান্তর আর অনুশীলন—ভিতরে ভিতরে কর্ম-তৎপর হয়ে উঠেছে। যুক্তপ্রদেশে যারা হিন্দুস্থান রিপাবলিকান্ বিপ্লবী দল— কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার যারা আসামী—শচীন সান্যাল, যোগেশ চাটুয্যে, মন্মথ গুপ্ত, যশপাল, —এরা জেলে। আমাদের এখানকার জিতেনদার ছোট ভাই রাজেন লাহিড়ীর ফাঁসি হয়ে গেছে। বন্ধুবর শচীন বক্সি পলাতক। প্রতুল গাঙ্গুলীর খোঁজ পাইনি। ওদিকে পাঞ্জাবে সুভাষচন্দ্র হিন্দুস্থান সেবাদলকে নতুন করে গড়ে তুলেছেন।

এখানে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা যোগজীবন ঘোষ মহাশয় তাঁর বন্ধু সুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে কিছুকাল থেকে আসা-যাওয়া ও গল্পগুজব করছিলেন। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে তিনি গঙ্গার ঘাটে-ঘাটে সুর্য-

নিরীক্ষণ করে ফিরছেন। দেখতে দেখতে তিনি তথাকথিত ভদ্রবেশ পরিত্যাগ করবেন। গায়ের জামা, পায়ের জুতো—একে একে ছাড়লেন। তাঁর মাথার চুল ও দাড়ি জঙ্গল হয়ে উঠল। সূর্যের মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে তিনি উন্মাদের মতো এক-খানা ছোট ময়লা ছেঁড়া কাপড়ে যেখানে সেখানে ফিরছিলেন। অবশেষে একদিন দেখা গেল, বিশ্বনাথের গলির সামনে দশাশ্বমেধ রোডের কোণের এক উঁচু রোয়াকে তিনি বসে আছেন এক জটাধারী নগ্নকান্ত বিশালকায় মৌনী সাধুর পাশে। উভয়েই মৌন, উভয়েই পড়ে থাকেন ওই রোয়াকে। পরবর্তীকালে ওই মৌনী সাধু হয়ে ওঠেন 'খিচুড়িবাবা' এবং তাঁর দেহত্যাগের পর সেখানে একটি খিচুড়িবাবার ছোট্ট মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। সে মন্দির এখন সবাই দেখে যায়।

কিন্তু যোগজীবনের কথা আবার যখন তুললুম, তখন তাঁর প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করি। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল। বর্মার পতন ঘটেছে। ইংরেজ পালাচ্ছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ছেড়ে জাপানের ভয়ে। রেঙ্গুন, মালয়, সিঙ্গাপুর ডুবেছে। জাপানী আতঙ্কে কলকাতা ছেড়ে প্রায় কুড়ি লক্ষ লোক পালিয়েছে। কলকাত্যর রাজপথগুলি প্রায় শ্মশান। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বাণী পাঠিয়ে বলেছেন কোথাও পালিয়ো না, পালিয়ে গিয়ে বাঁচবে না! ঈশ্বরই একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়। ওদিকে গান্ধীজীর ব্রিটিশ বিরোধী 'ভারত ছাড়' আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। প্রায় পাঁচশ' পুলিসের থানা ধ্বংস করেছে হিংস্র জনসাধারণ। ইংরেজ সম্প্রদায় সাহেবটোলার ওদিকে 'নেটিভ'দের দ্বারা কথায়-কথায় লাঞ্ছিত হচ্ছে—যখন-তখন চড়চাপড় খাচ্ছে। সমস্ত ভারতে সেদিন অরাজকতা ও হানাহানি চলছে। সেটি ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ। সন্ধ্যা থেকে ব্ল্যাক-আউটের ফলে সমগ্র বাঙলা দেশ, পূর্ব ভারত মহানগরী কলকাতা ঘোর অন্ধকার।

ওই অন্ধকারের মধ্যেই গিয়েছিলুম ঝাড়গ্রামে দিন তিনেকের জন্য। ফিরবার পথে আমার এক বন্ধু তার মোটরে আমাকে পেঁছিয়ে দিয়ে গেলেন খড়্গপুর স্টেশনে। রাত তখনও একটা বাজেনি। আমার অস্ত্রেতন্ত্রে ও মস্তিষ্কে কিছু বিকার ছিল।

খড়্গপুরের সুদীর্ঘ স্টেশন ও ওয়েটিং রুম অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কলকাতার গাড়ি আসবে ঘণ্টা দুই পরে। বন্ধুবর আমাকে ওয়েটিং রুমের একখানা চেয়ারে বসিয়ে রেখে আবার ঝাড়গ্রামে ফিরে গেল।

আমার চোখ দুটো জড়িয়ে যাচ্ছে আবিল তন্দ্রায়—মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গিয়েও আবার উঠে আসছিমুম। ভয় ছিল পাছে বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি, পাছে সেই ঘুমের মধ্যে গাড়িখানা বেরিয়ে যায়। হলের এক কোণে টিমটিম করে কেরোসিনের সেজবাতি জ্বলছে।

ঠিক এমনি অবস্থায় এক প্রেতচ্ছায়ার নিঃশব্দ পদসঞ্চার ঘটল আমার ঠিক সামনে। এক কৃষ্ণকায় ছিন্নভিন্নবস্ত্র সর্বহারা ভিখারী, মাথায় ঝাঁকড়া জটাজুট। মুখখানা ঠিক দেখতে পাচ্ছিনে, কিন্তু বীভৎস ও বিকৃত। তা'র ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে দুটো শাদা চোখের তারা। লোকটা এক-এক পায়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে শীর্ণ একখানা হাত বাড়িয়ে ধরল।

আমি প্রায় আঁতকিয়ে উঠেছিলুম তার হাত বাড়ানো দেখে। কিন্তু তখনই আমি উঠে দাঁড়ালুম।—কে? কী চাও?

অত্যন্ত চাপা ও ভগ্ন মৃদু কণ্ঠে লোকটা বলল, চুপ—!

হঠাৎ সেই মুহূর্তে আমি যেন আর্তনাদ ক'রে উঠলুম, একি যোগজীবনদা, আপনি? আপনি কোত্থেকে?

চুপ!—প্রেতকায় যোগজীবনদা বললেন, ভিক্ষে দে, চাঁদা দে!

আমি ছট্‌ফট ক'রে উঠেছিলুম প্রবল উত্তেজনায়। কিন্তু তখনই সংযত করলুম নিজেকে।

রেলের টিকিটখানা রেখে পকেটে যা কিছু ছিল, যোগজীবনদাকে দিয়ে দিলুম, তিনি তেমনি নিঃশব্দে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মেদিনীপুরে তখন অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় 'সরকার' প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা বৃটিশ পুলিসের গুলির সামনে বুক পেতে দিয়েছেন।

॥ ২৭ ॥

১৯২৯ সালের কথা বলছিলুম।—

গান্ধীজী তাঁর কম্বুকণ্ঠে ডাক দিচ্ছিলেন দেশের মেয়েমহলকে। ভারতের জনসংখ্যার আধাআধি হ'ল মেয়ে। মেয়ে সমাজের ভিতরে ভিতরে এসে গেছে চাঞ্চল্য, এবারে তার দেশব্যাপী বিস্ফোরণ ঘটুক। সামাজিক উৎপীড়নে, শাসনের শৃঙ্খলে, কুসংস্কারের অন্ধতায়, অজ্ঞানের অশিক্ষায় এবং সতীত্ব-সংস্কারের বেড়াজালে মেয়েরা বন্দিনী। রাজনৈতিক সংগ্রামকে উপলক্ষ্য করে মেয়েরা বাইরে এসে সমাজ বিপ্লবকে ডাক দিক। গান্ধীজী সংগ্রাম ও বিপ্লবকে একই সঙ্গে ধারণ করেছেন।

তাঁরই আহ্বানে দেশের বৃহত্তর নারীসমাজ তাদের গার্হস্থ্য জীবনের পঙ্গুতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এর আগে মূলে মন্ত্র পাঠ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মেয়েরা তাদের 'দুর্বল লজ্জার আচ্ছাদন' ফেলে দিচ্ছিল।

বাংলার তখন সৌম্যদর্শন ও সুভদ্রচিত্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের 'রাজত্বকাল'। দেশবন্ধুর মৃত্যুর বছর থেকেই তিনি বার বার কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র পদে অভিষিক্ত হচ্ছেন। দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ্য দলের অবিসম্বাদী নেতা তিনি এবং তিনি বাঙ্গলার কংগ্রেসের সর্বাধিনায়ক। সুভাষচন্দ্র অপেক্ষা তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ এবং তিনি একান্তভাবে গান্ধীপন্থী। সকল বিষয়ে তাঁর নেতৃত্ব সর্বজনস্বীকৃত। ইংরেজকন্যা শ্রীমতি নেলী গ্রেকে তিনি বিবাহ করেন। সেই মহিলা স্বামীর দেশকর্মের সকল আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। যতীন্দ্রমোহনের ব্যক্তিত্বের প্রতি জাতির অবিচলিত সম্মানবোধ তখন যে কোনও নেতার পক্ষেই দুর্লভ ছিল। তিনি কৌটিল্যের রাজনীতি

অপেক্ষা আন্তরিকতা এবং আত্মোৎসর্গে অধিকতর বিশ্বাসী ছিলেন। কৌটিল্যের প্রতীক্ ছিলেন বিদগ্ধচিত্ত ও সুরসিক কিরণশঙ্কর রায় মহাশয়।

কিন্তু এসব প্রসঙ্গ অপেক্ষা আমার কাছে তখন কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দোতলার আকর্ষণটা কিছু বেশি ছিল। এখানে বরদা এজেন্সির দোকানে ছিল 'কালি কলম'-এর আপিস। 'কালি কলম' বন্ধ হয়ে গেছে প্রণয়সের অভাবে, এবং মুরলীধর বসু পালিয়ে বেঁচেছেন। 'বরদা এজেন্সির' গায়ে রয়েছে 'আর্য পাবলিশিং হাউস' এবং তার ম্যানেজার শশাঙ্ক চৌধুরী। 'আর্য পাবলিশিং' হল শ্রীঅরবিন্দের প্রায় সকল গ্রন্থের প্রকাশক এবং এ-দোকানের মালিক নাগবংশীয়রা। রতিকান্ত নাগ মহাশয় তাঁর সৌজন্য ও সদ্ব্যবহারের জন্য আমাদের কাছে বিশেষ শ্রদ্ধেয় ছিলেন। ম্যানেজার শশাঙ্ক সময়ে-অসময়ে কবিতা লিখত, সারা সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত দোকান দেখত এবং বিকাল তিনটের সময় বৃটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রীটে চলে যেত 'বাঙলার কথা' ও পরবর্তী 'বঙ্গবাণী' আপিসে। সে ওই কাগজের অন্যতম সহ-সম্পাদক। শশাঙ্ক বইয়ের দোকানেই রাত কাটাতো এবং মাস-দুই বাদ-বাদ নদীয়া জেলার মেহেরপুর সার্বডিভিসনের এক গ্রামে দু'চারদিন বিশ্রাম নিয়ে ফিরে আসত। তার গ্রামের বাড়িতে পিতা-মাতা, স্ত্রীপুত্র ইত্যাদি সবাই ছিল। শশাঙ্ক আমার বয়োজ্যেষ্ঠ। আমি নিজে জনৈক তরুণ লেখক, এবং মধ্যে মাঝে একটু-আধটু অশ্লীল ও দুর্নীতিমূলক লেখা লিখে ফেলি—সেজন্য শশাঙ্ক আমাকে প্রথম-প্রথম দু'চক্ষে দেখতে পারত না। কিন্তু কালক্রমিক ঘনিষ্ঠতার ফলে আমি ছাড়া অপর কারও সঙ্গে তার আর অন্তরঙ্গতা রইল না। আমি একপ্রকার তার সকল সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে গেলুম। তখন বুঝতে পারিনি সে আমাকে চাটনি হিসাবে ব্যবহার করে মাত্র, তার অনেক দুঃসময়েও সে আমাকে ডাকে, কিন্তু তার মানস-ভোজ্য প্রস্তুত হয় অন্যত্র।

শশাঙ্কের আরেক আকর্ষণ ছিল। সংবাদপত্রে চাকরি করার ফলে কতকগুলি বিষয়ে সাংবাদিকের 'মোহভঙ্গ' হয়। রাজনীতিতে ও সমাজ জীবনে যাঁরা প্রসিদ্ধ ও খ্যাতিমান, যাঁদের নাম বড় বড় অক্ষরে দৈনিক কাগজে ছাপা হয়, তাঁদের চারিত্রিক, পারিবারিক, নৈতিক ও সামাজিক বহু ত্রুটির সংবাদ কোনও কাগজে প্রকাশিত হয় না। কিন্তু শশাঙ্কের স্মৃতিশক্তি সেগুলিকে সযত্নে সংগ্রহ করে রাখে। কর্পোরেশনের ভিতরকার কেচ্ছা, 'বিগ ফাইভ' ও কংগ্রেসের ভিতর মহলের কানাকানি, বিশ্ববিদ্যালয় বার-লাইব্রেরী ব্যারিস্টার মহল এবং নামজাদা নেতাদের বিভিন্ন গোপনীয় সংবাদ—শশাঙ্কর কাছেই পাওয়া যেত। আমরা বলতুম 'আসল' খবরের মালিক হল শশাঙ্ক।

বৃহস্পতিবারে থাকত শশাঙ্কর ছুটি। ওর ওই ছুটিকে কেন্দ্র করে দুপুর ও বিকালের দিক থেকে 'আর্য পাবলিশিং হাউসে' ঢালাও আড্ডা বসে যেত। সেই আড্ডায় আসতেন প্রমথ চৌধুরী, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, নলিনীকান্ত সরকার, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেসিডেন্সির অধ্যাপক মহেন্দ্র সরকার, অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি। নবীন কালের প্রায় সবাই। নজরুল, শৈলজা, অচিন্ত্য, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, পবিত্র গাঙ্গুলি, বিবেকানন্দ মুখুজ্যে, 'উত্তরা' মাসিক পত্রের সুরেশ চক্রবর্তী, বঙ্গবাণীর গিরিজা, কবি

জসীমউদ্দীন, আবদুল কাদের, সবোজ রায় চৌধুরী, বিনয়েন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদ সেন, বিজয় দাশগুপ্ত, বিজন সেনগুপ্ত, জানকীজীবন ঘোষ, সত্যেন বসু, নীহাররঞ্জন রায় এবং আরও অনেকে। হাসি আর গল্পের হাট বসত। যত কেচ্ছা, যত অবাস্তব কাহিনী, যত রকমের তামাসা-পরিহাস, যত উড়ো গল্প যেখানে যত আছে গোপনীয় চারিত্রিক সংবাদ—কোনটাই বাদ পড়ত না। ঠাকুরবাড়ির বিভিন্ন রূপক, শরৎ চাটুয্যের নৈতিক চরিত্র, নজরুল ও নৃপেনের সর্বশেষ রোমান্স অভিযান, শিশির ভাদুড়ির মদ্যপান, দিলীপ রায়ের সন্ন্যাস সজ্জা এবং তার ফলে মহিলা সমাজের উচাটন, সুভাষচন্দ্রের গাম্ভীর্য ও ব্রহ্মচর্য, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মারকুট্টেপনা—সবগুলো চলত একসঙ্গে। ওর মধ্যে ফোড়ন ছিল তরুণ সাহিত্যের। কে কি লিখল, কার কোথায় গল্প বা কবিতা বেরোল, 'শনিবারের চিঠি'র 'মণিমুক্তা'য় কার কার লেখার অশ্লীল টুকরো তুলে ধরা হল, কার কি বই এখন ছাপা হচ্ছে, এসবও আলোচ্য বিষয় ছিল। প্রমথ চৌধুরী মশায় এলে আমরা চুপ হয়ে যেতুম। তিনি ল' কলেজে অধ্যাপনা সেরে আর্য পাবলিশিংয়ে ঘণ্টা-দুই কাটিয়ে বাড়ি ফিরতেন। সুরেশ মজুমদার মশায় আসতেন আনন্দবাজার পত্রিকার আর্য পাবলিশিংয়ের বিজ্ঞাপন ছাপার ব্যাপারে টাকা সংগ্রহ করতে। কপালের ঘাম মুছে গল্পগুজব করে একটু ধূমপান সেরে নিয়ে তিনি উঠে পড়তেন। তখন তাঁর আপিস ছিল মির্জাপুর স্ট্রীটে। তার সঙ্গে তখন থেকে আমার আলাপ।

হঠাৎ একদা ছেদ পড়ল আমাদের আড্ডাবাজিতে। আর্য পাবলিশিংয়ে এসে উঠলেন এর অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীবিজয় নাগ, রতিকান্ত নাগের কনিষ্ঠ সহোদর। সৌম্যদর্শন পুরুষ, গম্ভীর, সামান্য একটু দাড়ি আছে, গায়ে খাটো জামার উপরে উত্তরীয়, রাশভারি মানুষ। তিনি এই দোকানেরই ভিতর দিকে এক কোণে বসবাস করবেন এইটি স্থির হয়ে গেছে। এ-ব্যক্তি একদা মুরারিপুকুর বোমা তৈরির আড্ডায় বারীন ঘোষের সঙ্গে পুলিসে ধরা পড়েন। অতঃপর শ্রীঅরবিন্দ যখন ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বাঙলা ত্যাগ করে পণ্ডিচেরী চলে যান তখন তাঁর সঙ্গীদের অন্যতম ছিলেন এই বিজয় নাগ মহাশয়। কিন্তু ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে যখন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর আশ্রম ভবনের মধ্যেই নিঃসঙ্গ বাস শুরু করেন, তখন থেকেই কারও কারও মনে বিক্ষোভ দেখা দেয়। সম্ভবত সেই বিক্ষোভেই বিজয়বাবু পণ্ডিচেরী ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন। যিনি প্রকৃত ধ্যানী তাঁর কাছে পণ্ডিচেরীর আশ্রম আর কোলাহলমুখর কলেজ স্ট্রীট মার্কেট একই কথা। নাগ মহাশয় তাঁর তপস্যার জন্য দোকানঘরের পশ্চিম অংশের নিভৃত কোণ বেছে নিলেন, এবং এই দোকানের ভিতরে কোনও বাজে গল্প, আড্ডা, বিশ্রম্ভালাপ বা চা-খাওয়াখাওয়ি না হয়—তার জন্য একটির পর একটি অনুশাসন লিখিতভাবে প্রবর্তন করলেন। বইয়ের ওই দোকানকে তিনি ধূপ, ধুনো, ফুলচন্দন ও পূজার আয়োজনে সাজিয়ে একপ্রকার মন্দির বানিয়ে তুললেন। আমরা অবাক বিস্ময়ে তাকালুম।

গ্রাজুয়েট শশাঙ্ক তাঁর বেতনভোগী কর্মচারী। বিজয়বাবুর সম্পর্কে সকল সংবাদ শশাঙ্কই বলে। সেই শশাঙ্কর বন্ধুবান্ধব আমরা, অর্থাৎ আমরা তার কর্মচারীর

সঙ্গী। কতটুকু দাম আমাদের? কী বা আমাদের পরিচয়? তাঁর অনুশাসনগুলি ছিল এইরূপ: ভিতরে বসিয়া ধূমপান বা চা-পান করিবেন না। বাজে গল্প বা অনাবশ্যক আলাপচারিতে বিরত থাকিবেন। নিঃশব্দে আসিয়া কাজ সারিয়া চলিয়া যাইবেন। গলার আওয়াজ করিবেন না।

একদিন সন্ধ্যায় তিনি প্রথম চৌধুরী মশায়ের মুখের ওপরেই বললেন, দয়া করে আপনি বারান্দায় বসে সিগারেট খান গে!

ভদ্রলোকের এই প্রকার নির্দেশে সমগ্র বন্ধু সমাজ সেদিন বিরক্ত হয়েছিল। কিন্তু বেশি দিন নয়, বোধ হয় কয়েক মাস মাত্র। শশাঙ্কই খবর দিল, বিজয় নাগ মশায়ের মৃত্যু ঘটেছে।

শ্রীঅরবিন্দের যৌগিক পরিবেশ বোধ করি কারও কারও ধাতে সয় না। বিশেষ বিশেষ পাত্রে যদি তাঁর দৈবজীবনের স্পর্শসঞ্চার ঘটে, তবে সেই পাত্র সম্ভবত বিস্ফোরণের হাত থেকে রক্ষা পায় না! অতঃপর আর্য পাবলিশিং হাউসের ঘরে দ্বিতীয় বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করে ছিল। কিছু দিন পরে যেদিন ওই দোকানে গিয়ে দাঁড়ালুম, দেখি এক কৃশকায় প্রবীণ ব্যক্তি। চোখে চশমা, তামাটে গায়ের রং, মেয়েদের মতো বড় বড় চুল পিছন দিকে পিঠ পর্যন্ত আঁচড়িয়ে ঝোলানো, গায়ে মটকার পাঞ্জাবি, মুখে মোটা গোঁফ ও দাড়ি কামানো, পায়ে একজোড়া খড়ম। শশাঙ্ক আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। চেয়ে দেখি আমার সামনে বসে রয়েছেন আমার আবাল্যের স্বপ্ন, বিপ্লবী যুগের অগ্নিঋষি বারীন ঘোষ!

আমি স্তব্ধ, নিমেষনিহত, হতবুদ্ধি!

কিন্তু আমার আচ্ছন্ন অবস্থাটা কেটে গেল হাস্যালাপী বারীন ঘোষেরই সাদর ও সস্নেহ অভ্যর্থনায়। আমার কিছু কিছু রচনার সঙ্গে তিনি পরিচিত। আমি সাহিত্য ছাড়া অন্য কাজ কি করি, কোথায় থাকি, সাংসারিক দায়ধাক্কা কতটা—এগুলি সব অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো তিনি জেনে নিচ্ছিলেন। প্রথম লক্ষ্য করলুম তিনি নিরভিমান, তাঁর কথাবার্তার পরিবেশের মধ্যে তাঁর প্রাচীন কীর্তি কলাপের দরুন তিলমাত্র আত্মাভিমান প্রকাশ পাচ্ছে না। মুরারিপুকুরের বোমার আড্ডা, ক্ষুদিরামের ফাঁসি, প্রফুল্ল চাকীর আত্মনাশ, দেওঘরের নিকট দিঘেরিয়া পাহাড়ের বনমধ্যে বোমা তৈরি কারখানা, মোজাফরপুরের ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যার ষড়যন্ত্র, আলীপুর বোমার মামলা, ফাঁসির আসামী বারীন ঘোষ, বিলাতের পার্লামেন্টের বিতর্কিত বারীন ঘোষ, আন্দামান সেলুলার জেলের দ্বীপান্তরিত বারীন ঘোষ, সখারাম গণেশ দেউস্করের অন্তরঙ্গ বারীন ঘোষ, ভারতের হিংস্র বিপ্লববাদের মন্ত্রগুরু বারীন ঘোষ, ঝড়ঝঞ্ঝাময় ইংলিশ চ্যানেল সমুদ্রে জাহাজের ক্যাবিনে জীবন-মৃত্যুর দোলার মধ্যে উন্মাদিনী স্বর্ণলতার প্রসব বেদনা ওঠে যাঁর জন্মকালে, সেই বারীন ঘোষ—এবং যিনি পৃথিবীর অধ্যাত্ম ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোগীপুরুষ, সেই শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ সহোদর বারীন ঘোষ! আমি জানিনে সেদিন অদৃশ্য কোন্ ভাগ্যনিয়ন্তার ইশারায় আমার সঙ্গে বারীনদার আত্মিক বন্ধনীতে গ্রন্থির পর গ্রন্থি যুক্ত হয়ে গেল! আধ-ঘণ্টাখানেক

আলাপ করার পর এই বিশ্বাস নিয়ে সেদিন ফিরে গেলুম যে, আমার বর্তমান জীবনে বারীনদা ছাড়া অপর কোনও শুভানুধ্যায়ীই নেই। অর্থাৎ আমার মরণলোভী নৌকা কূলে আর ভিড়ল না, এবার থেকে আবার সেই নৌকা অকূলের দিকেই ভেসে চলল।

অগ্নির স্পর্শে ছাইও যেমন রাঙা হয়ে ওঠে তেমনি আমিও রাঙা হয়ে উঠলুম দিন দিন। বারীনদা আমার আপাদমস্তক তাকিয়ে বললেন, তুমি ডাকাত দলের সর্দার হলে মানিয়ে যেত। তুমি লেখক হলে কেমন করে? তোমাকে দেখলে ভয় করে।

আমিও হাসলুম, বারীনদা, আপনার মতন 'তালপাত সিংকে' মাথায় তুলে নাচব, তাই আমার এই ডাকাবুকো চেহারা! ১৯০৫-এ আপনার অগ্নিবিপ্লব কালেই আমার জন্ম।' বিপ্লব আমি সঙ্গেই এনেছি!

আত্মায়-আত্মায় আমাদের মিল ঘটেছিল।

কিন্তু আমার প্রকৃতিগত নিত্য অস্থিরতা আমার মধ্যে কথায় কথায় আনত আত্ম-তাড়না। তখন বন্ধুবান্ধব, সাহিত্যকর্ম, কলকাতার পরিবেশ, ব্যক্তিগত অভাব-অনটন, পারিপার্শ্বিক কর্তব্যচিন্তা—সব তুচ্ছ। তখন আমি একক, তখন নিজের উপর আমার প্রভুত্ব। আমি তখন সম্রাট। তখন আমার টান বৃহত্তর দেশের দিকে। বিভিন্ন প্রদেশ, বিভিন্ন সমাজ, বিভিন্ন ভাষাভাষী ও সম্প্রদায়, এরা আমাকে টানত। তখন আমার জুড়ি কেউ নেই, একজন লেখকও না—কেননা তাদের কারো কারো দৌড় কাশী পর্যন্তই। তারা বাঙালী হয়ে বাইরে যায়, বাঙালীর মধ্যে ঘোরে, বাঙালী হয়ে ফিরে আসে। আমি দৈবাৎ বাঙালী, কিন্তু আমি সর্বভারতীয়। আমার ভিতর থেকে তখন প্রায় সকল প্রদেশের স্মৃতি উচ্ছ্বসিত হতে থাকে একে একে। রাজস্থানে, গুর্জরে, পাঞ্জাব সীমান্তে, কাশ্মীরে, মহারাষ্ট্রে, মহীশূরে, তামিলে আর ওড়িশায়। উত্তরপ্রদেশের সবখানে, শহরে ও গ্রামে, আমার মন ঘুরে বেড়ায়।

আমার সকল কর্মনাশা কৌতূহল এবারও আমাকে স্থির থাকতে দিল না। এলাহাবাদের ত্রিবেণীসঙ্গমে মহাকুম্ভের মেলা বসছে ছত্রিশ বছর পরে। সেদিন বাড়ি ফিরে মাকে বললুম, মা চলো, তোমার সঙ্গে মহাকুম্ভমেলা দেখে আসি।

মায়ের সঙ্গে বোম্বাই মেলের থার্ড ক্লাসে উঠেছিলুম—

কুম্ভমেলার যাত্রী এবার অনেক। ভিড় হয়েছিল ট্রেনে। মাকে যা হোক করে বসিয়েছি, আমি জায়গা পাচ্ছিলুম না। এমন সময় চোখ পড়ল একটি যুবকের প্রতি শ্যামবর্ণ, মুখশ্রী ভাল, আমার চেয়ে কিছু বড়ই হবে। সে পান খাচ্ছিল। আমাকে সে হাতছানি দিয়ে ডাকল। দু'খানা বেঞ্চ পেরিয়ে আমি তার কাছে গেলুম। সে তার পাশে আমার বসবার জায়গা করে দিয়ে বলল, 'ভাইব্রেশন!'

—ভাইব্রেশন? সে আবার কি?

উনি বললেন, বুঝলেন না? একই কাঁপন দু'জনের মধ্যে! একজনের দরকার আরেকজনকে! বন্ধুত্বের ভাইব্রেশন।

সুতরাং বন্ধুত্ব হতে দেরি লাগেনি। বন্ধুর নাম শঙ্কর দত্ত, সে জুয়েলারি বিক্রি করে। হাওড়া স্টেশনে গাড়িতে তার পাশে আমাকে বসিয়ে শঙ্কর প্রথম 'আপনি' বলে সম্ভাষণ করেছিল, মধ্যরাত্রে গয়া স্টেশনে 'তুমি', মোগলসরাইতে প্রত্যুষে চা-খাবার সময় বলল 'তুই' এবং সকাল আটটার পর এলাহাবাদ স্টেশনে গাড়ি এসে থামতেই সে আমার মাথায় চাঁটা দিয়ে বলল, তুই আগে নাম···মা আছেন সঙ্গে।

শঙ্কর মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, আমার মা নেই, প্রয়াগে এসে মাকে ফিরে পেলুম!

মা হাসিমুখে শঙ্করকে আশীর্বাদ করলেন।

আমি তখন পর্যন্ত আমার জীবনে এ ধরনের বিশাল জনসমারোহ দেখিনি। সেটি মাঘী অমাবস্যা তিথি। ১৯৩০ সালের জানুয়ারী। শুনেছিলুম সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে নব্বই লক্ষ নরনারী যোগ দিয়েছিল সেদিন এই মেলায়। তাদের মধ্যে ষাট হাজার ছিল সন্ন্যাসী। নাগা সন্ন্যাসী ছিল পনেরো হাজার এবং নগ্নকায়া ভস্ম-মাখা মেয়ে-নাগা ছিল কম-বেশি দু' হাজার। এরা এসেছিল হাতীতে, উটের পিঠে, ঘোড়ায় ও সুসজ্জিত বৃষবাহনে। সেদিন সেই জটাজুটধারিণী বিভূতিভূষণা শত শত উলঙ্গ রমণী যখন মহাসমারোহে ত্রিবেণীসঙ্গমের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন সম্ভবত স্বর্গ-বাসিনী অপ্সরাদের কপোল পর্যন্ত ঈর্ষা ও লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠেছিল।

সেদিন ওই ত্রিবেণীর ক্রোড়ভূমিতে নব্বই লক্ষ জনতার ঠিক মাথার উপর পাঁচ বর্গ-মাইলব্যাপী একটি ধুলোবালির চন্দ্রাতপ আকাশকে ঢেকে বর্ষার মেঘের মতো স্থির হয়েছিল। কিন্তু এবারের এই কুম্ভমেলার কাহিনী আমি বহুকাল আগে লিখেছি। এখানে তার পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই।

পুণ্যপ্রয়াগে স্নান সেরে মাকে নিয়ে শহরের এক বাঙ্গালী হোটেল-বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলুম। ঘরের পাশে ছিল একটি ছোট শিবমন্দির। মন্দিরের ঠিক দরজার সামনে একটি ক্ষুদ্রাকার 'নন্দী'। এই দেখে মা এখানে হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করতে রাজি হলেন। আমরা তার যোগাড় করে দিয়ে একটু গায়ে হাওয়া লাগাবার জন্য স্টেশনের দিকে পায়ে পায়ে এসে পড়লুম।

হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে নরনারী—সব সমাজের, সব প্রদেশের। ওই ভিড়ের মধ্যেই এক স্থলে দেখতে পেলুম চেঁচামেচি আর কান্নাকাটি। একটি বাঙ্গালী দলের সমস্ত মালপত্র মাথায় নিয়ে জনতিনেক কুলি কোথায় অদৃশ্য হয়েছে, তাদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। একজন বৃদ্ধ ও তাঁর স্ত্রী, দুইজন প্রবীণা সধবা, একজন বর্ষীয়সী বিধবা এবং—সর্বপ্রথম যাঁর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল তিনি গেরুয়া-বসন পরিহিতা সুশ্রী এক তরুণী। সন্দেহ নেই, উনি যৌবনেই যোগিনী। আমাদের কাছে ওই ছয় জনের দলটি করুণ আবেদন জানিয়ে সাহায্য ভিক্ষা চাইল। তাঁরা এখানে ঘণ্টা-তিনেক ধরে নিরুপায় অবস্থায় বসে রয়েছেন। তাঁদের টাকাকড়ি, কাপড়-চোপড়, বিছানা কম্বল, বাসনপত্র—সমস্ত নিয়ে কুলিরা গা ঢাকা দিয়েছে। তাঁরা

এখন সর্বস্বান্ত।

ওঁদের মধ্যে প্রবীণা বিধবা যিনি, তাঁর নাম হেমন্ত-মা, তিনিই উদ্যোগী হয়ে কথা-বার্তা বলছিলেন। তরুণী সন্ন্যাসিনী কিছু কৃশকায়, ছিপছিপে। তাঁর মাথার চুলের রাশি পিছন দিকে বব-করা, গলায় রুদ্রাক্ষ ও তুলসীর মালা, চোখদুটি ভাবপ্রসন্ন। হেমন্ত-মা বললেন, উনি হলেন চিন্ময়ী ব্রহ্মচারিণী! দু'বছর ধরে হিমালয়ে যোগ-সাধনা করে ফিরে এসে উনি জামতাড়ায় আশ্রম নির্মাণ করেছেন। আমরা সকলে ওঁরই শিষ্যসেবক, বাবা।

শঙ্কর অনুপ্রাণিত হয়েছিল। সে বলল, আমাদেরও মা আছেন সঙ্গে। আপনারা চলুন সেখানে। আমরা যা হয় কিছু করব।

ওই দলটিকে নিয়ে সেদিন মায়ের কাছে এনেছিলুম। ভিতর মহলের দর-দালানে ওঁরা আশ্রয় নিলেন। শঙ্কর হল ধনবান, তাকে কিছু বলার আগেই সে বাজারের দিকে ছুটল এবং ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে সে বিছানাপত্র, কাপড়চোপড়, শতরঞ্চি, বালিশ ও প্রচুর কাঁচা ও পাকা খাদ্যসামগ্রী এনে একেবারে ভাসিয়ে দিল। ওঁরা কোনও পথ-ঘাট চেনেন না। সুতরাং আমাকে সঙ্গে নিয়ে ওঁরা চললেন সঙ্গম স্নানে। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি সর্বস্ব খুইয়ে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি এবং অপর এক সধবা মহিলা আমরা মায়ের কাছাকাছি রইলেন। আমি ওঁদের নিয়ে সঙ্গমের দিকে চললুম।

হাজার হাজার নৌকার ভিড়ের ভিতরে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর মিল ঘটেছে কোথায় সেটি জানা দুঃসাধ্য। সুতরাং মাঝিমাল্লার সাহায্যে প্রতিবার নৌকো ফাঁক করে কোনমতে ডুব দিয়ে উঠে আসা। হেমন্ত-মা চিন্ময়ীর সম্পর্কে সতর্ক। তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন ব্রহ্মচারিণীকে স্নান করিয়ে আনতে।

সন্ন্যাসিনীর কোনও ওজন নেই, কিন্তু প্রাণভয় রয়েছে সম্পূর্ণ। দুই নৌকার মাঝখানে কত জল, কেউই জানিনে। সুতরাং আমি তাঁর দুখানা হাত ধরে ঝুলিয়ে জলের মধ্যে চুবিয়ে দিলুম। তিনি একখানা হাত ছাড়িয়ে নিলেন, নইলে লজ্জা নিবারণ করা যায় না। পর পর তিনটে ডুব দিয়ে তিনি থামলেন। আবার তাঁকে দু হাত ধরে তুলে নিয়ে আমি নৌকার উপরে দাঁড় করিয়ে দিলুম। পলকের মধ্যে চোখে পড়ল, যেন মাসিক বসুমতীতে ছাপা হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের তিনরঙা সিক্ত-বসনার ছবি!

সকলকে নিয়ে আবার ফিরে এলুম বাসায়। জহুরী শঙ্কর বহু টাকাকড়ি খরচ করেছিল ওঁদের জন্য। ত্রিরাত্রি বাসের পর বিদায় নেবার কালে শঙ্কর ওদের সকল প্রকার খরচপত্র বহন করেছিল।

কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। হেমন্ত-মা তাঁদের আশ্রমের প্রচারকার্যের জন্য বহুদিন অবধি আমার বাসস্থানে আনাগোনা করেছিলেন। তাঁর সবিশেষ অনুরোধ আমি জামতাড়ায় গিয়ে পশ্চিমের প্রান্তর পেরিয়ে একদা চিন্ময়ী ব্রহ্মচারিণীর আশ্রমে পৌঁছে-ছিলুম। সেখানে দেখেছিলুম এক-এক ঘরে মৃৎ-প্রতিমার পুজো চলছে। আশ্রমিক গৃহস্থরা রয়েছে আশেপাশে দু'চারটি ঘরে। হেমন্ত-মা ছিলেন সকল কর্মে। ঠিক

মনে পড়ছে না, বোধ হয় দিন দুই ধরে এই তপস্বিনীকে পর্যবেক্ষণ করেছিলুম। বলা বাহুল্য, তরুণী ব্রহ্মচারিণীর আতিথেয়তা ও পরিচর্যা আমার পক্ষে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

এর পর 'উত্তরা' মাসিকপত্রের পরিচালক এবং আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুরেশ চক্রবর্তীর ফরমাস আমাকে খাটাতেই হবে, কথা দিয়ে রেখেছি। 'উত্তরা' হল প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ও প্রবাসী বাঙ্গালীদের মুখপত্র। তখন কবি ও ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় 'উত্তরা'র সম্পাদক, সুরেশ তাঁর কর্মকর্তা,—সর্বপ্রকার দায়িত্বই সুরেশের। কিন্তু তৎকালীন সকল খ্যাতিমান লেখকই সুরেশের হাতধরা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপ-কুমার রায়—এবং কে নয়? আমরা তখন কতটুকু সুরেশের কাছে? কেউ আমরা তার বিচারে তখনও পাকাপাকি লেখক হয়ে উঠিনি। কাশী শহরে সে সর্বদা ব্যস্ত, কর্মচঞ্চল। সেইজন্য বন্ধুসমাজে 'চটপটি' নামে সে পরিচিত। সে নিজের হাতে বাজার করে, শ্রেষ্ঠ সামগ্রীসহ মধ্যাহ্নভোজনে বসে, তার বাড়িতে এক রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী এবং অতুলপ্রসাদ ছাড়া লেখকমাত্রই আতিথ্য নেয়। সম্প্রতি কবি যতীন্দ্র-মোহন বাগচী কাশী আসছেন, সুরেশের ওখানেই উঠবেন। সুরেশ টাকা আনতে যায় উত্তর-পশ্চিম লক্ষ্ণৌতে গিয়ে এবং বিজ্ঞাপন ইত্যাদি আনতে যায় দক্ষিণ-পূর্ব কলকাতায়। ওই সঙ্গেই নিয়ে আসে রবীন্দ্রনাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে দু'একটি কবিতা। অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ 'উত্তরা'র জন্য ছবি এঁকে দেন। সুরেশ অনেক উচ্চ চূড়ায় বাস করে। সে সুনাম-দুর্নামের অতীত। তাকে নিয়ে হাসি-পরিহাস করো, সেও তা'তে যোগ দেবে। সুরেশকে নিয়ে আরেকখানা অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত লেখা চলে।

সুরেশ আমাকে 'উত্তরা'র ক্যানভাসার নিযুক্ত করল। কথা রইল আমি উত্তর-বিহারে সব অঞ্চল ঘুরে 'উত্তরা'র বার্ষিক গ্রাহক সংগ্রহ করব। 'উত্তরা'র বার্ষিক চাঁদা সাড়ে তিন টাকা। প্রতি সাড়ে তিন টাকায় আমি পাব চৌদ্দ আনা। ট্রেন ভাড়া ও ভাতা দেবে সুরেশ। আমার পক্ষে 'ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে।'

শ্রমের মর্যাদা হল আমার মন্ত্র। নিজের জুতো সেলাইতে অনেকটা আমি রপ্ত। রান্নাবান্না জানি। ঝাড়ুদারের কাজ আনন্দদায়ক। নৌকা চালনায় আমি বেশ পটু। ধোপার ইস্তিরি সবাই জানে। ইণ্ডিয়ান প্রেসের কল্যাণে ছাপাখানায় হরফ বেশ সাজাতে পারি। সাপ্তাহিক কাগজ 'বিচিত্রা' একদা নিজেই ফিরি ক'রে বেড়িয়েছি। সুতরাং 'উত্তরা'র ক্যানভাসার হতে আমার তিলমাত্র সঙ্কোচ নেই।

ছোট রেলপথে কাশী থেকে বেরিয়ে পড়েছিলুম। ছাপরা টাউন থেকে আরম্ভ। আমি রথ দেখছি এবং কলা বেচছি। আমার কাজ শিক্ষিত বাঙ্গালী মহলকে এক-এক স্থলে খুঁজে বার করা এবং সাড়ে তিনটি টাকা বাগিয়ে নেওয়া। একে-একে মোজাফর-পুর, সমস্তিপুর, বরৌনি, লাহেরিয়া সরাই, দ্বারভাঙ্গা, সহর্ষ,—আমার শ্রান্তি-ক্লান্তি নেই। আমার আনন্দ ভ্রমণের। ধরেছিলুম সেই সারণ আর চম্পারণ দুই জেলা

থেকে, শেষ করলুম পূর্ণিয়া কাটিহার ও কিষণগঞ্জ হয়ে ভাগলপুরে। লাভের মধ্যে হয়েছিল এই, পূর্ণিয়াতে গিয়ে দাদামশায় ওরফে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে আতিথ্য নিয়েছিলুম। পরিহাস-সাহিত্যে তখন দাদামশায়ের খুব নাম। ভারতবর্ষ ও বসুমতী মাসিকপত্রে তাঁর ধারাবাহিক রচনা প্রকাশিত হচ্ছিল। তিনি আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র।

ভাগলপুরে উঠেছিলুম আমার পিসিমার বাড়িতে। তিনি জজের স্ত্রী। জজ মারা গেছেন। শূন্য অক্ষরটার বাঁ দিকে "১" থাকলে তবে দশ হয়। ওই "১"টি সরে গেলে থাকে শূন্য। সুতরাং এ বাড়ির সব পরিচয় হারিয়ে গেছে। কেবল পিসতুতো দাদা এখন মুন্সেফ মাত্র। যাই হোক পিসিমার ওখানে দিন তিনেক কাটিয়ে প্রায় মাসখানেক পর যখন কাশীতে এসে নামলুম, সুরেশ আমার কাছ থেকে কাজের তালিকা ও অর্থাদির নির্ভুল হিসাব পেয়ে অভিনন্দন জানালো। আমি 'উত্তরা'র কমবেশি আড়াইশ গ্রাহক সংগ্রহ করেছিলুম। যাই হোক, সে যাত্রায় পিসিমা যেন আমাকে দেখার জন্যই বেঁচেছিলেন। এর পর মাস-দুয়েকের মধ্যেই তিনি মারা যান।

কলকাতায় ফিরে শুনলুম বারীনদা আমার খোঁজ করছেন। তিনি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে পণ্ডিচেরীর আশ্রম ত্যাগ করে কলকাতায় এসেছেন। অজ্ঞাতবাসের কালে ক্ষাত্রিয়ের বাহু অনেককাল অবধি নিষ্ক্রিয় ছিল, এবার তিনি পুনরায় রাজনীতিতে নামবেন। পুরনো বিপ্লবীদের সঙ্গে একে একে তাঁর দেখা হচ্ছিল। হেম ঘোষ, মধু ঘোষ, উপেন বাঁড়ুয্যে, অমর চাটুয্যে, উল্লাসকর দত্ত, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল প্রভৃতি অনেকের সঙ্গেই তাঁর দেখাশুনো হচ্ছে। শরৎ বসু, বিধান রায়, সুভাষ বসু—এদের সঙ্গে বারীনদার প্রায়ই কথাবার্তা চলছে। এর মধ্যে মেয়র ও বাঙ্গালা কংগ্রেসের অধিনায়ক যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। বারীন ঘোষ সর্বত্র শ্রদ্ধেয় এবং সম্মানিত। পরম্পরায় শুনলুম বাঙ্গলার গভর্নর ও চীফ সেক্রেটারি তাঁর গতিবিধি এবং ক্রিয়াকলাপের খবর রাখছেন। এর কারণ ছিল। বাঙ্গলার বিপ্লবী-দের বিভিন্ন গোপন কর্মতৎপরতার খবর বৃটিশ কর্তৃপক্ষ যখন সংগ্রহ করছিলেন, ঠিক সেই সময় অগ্নিযুগের নেতা বারীন ঘোষ হঠাৎ কলকাতায় আবির্ভূত হয়েছেন, এটি কর্তৃপক্ষ ভাল চোখে দেখেননি, এবং সেজন্য তাঁরা গোয়েন্দা বিভাগকে সচেতন ক'রে দিয়েছেন। তৎকালে নলিনী মজুমদার ছিলেন গোয়েন্দা বিভাগের অধিকর্তা। তাঁর প্রধান দপ্তর ইলিসিয়ম রো-তে। তাঁর নামে বাঘে গরুতে একসঙ্গে জল খেত। তখন কলকাতা নগরী "রাজচক্রবর্তী" ছিলেন পুলিস কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্ট। বালাসোরে বুড়ি-বালামের তীরে বাঘা যতীন মুখার্জি ও তাঁর দলবলের সঙ্গে টেগার্টের পুলিস দলের যে ঐতিহাসিক সংঘর্ষ হয়, তার থেকেই টেগার্টের খ্যাতি রটে। টেগার্ট ছিলেন দুর্ধর্ষ ও অপরাজেয়।

বারীনদার সঙ্গে আমি দেখা করলুম। এই নিরভিমান দেশবরেণ্য ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে গেলে ছাড়পত্র লাগে না, সুপারিশের প্রয়োজন হয় না, তিনি সর্বাপেক্ষা

সহজলভ্য। আমাকে দেখেই তিনি উল্লসিত হাসি হাসলেন— উপোস করতে পারবে ?

বললুম, উপোস করাই ত লেখকদের নিয়তি। বলুন, কি করতে হবে!

কাগজ বার করছি, এবার কোমর বাঁধো।

আমি হাসলুম। বললুম কী কাগজ ? কী নাম হচ্ছে ?

বারীনদা বললেন, সেই আগেকার নাম, সাপ্তাহিক 'বিজলী'।

আমি তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলুম।

অতঃপর 'বিজলী'র প্রস্তুতিপর্ব আরম্ভ হয়ে গেল। ১৯২০ সালের সেই 'বিজলী'র মৃত্যুর পর বছর পাঁচেকের মধ্যে দ্বিতীয় বার 'বিজলী' বেরোয় প্রধানত সাহিত্যপত্র হিসাবে। তার যোথ সম্পাদক ছিলেন সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও সুবোধ রায়। সেই কাগজে আমি 'মাধুরী দেবী'—এই ছদ্মনামে প্রবন্ধ লিখতুম। এবার তৃতীয় পর্যায়ের 'বিজলী' আমার বেরোচ্ছে ১৯৩০ সালে। দশ বছর আগে গান্ধীর অহিংসাবাদ দেশে দানা বাঁধেনি, তাই সেই প্রথম 'বিজলী'র মারফৎ আন্দামান প্রত্যাগত বিপ্লবী দলের নেতাদের মুখে গান্ধী-বিরোধী বক্রোক্তি ও পরিহাস পাঠক সমাজ ও দেশবাসী উপভোগ করেছিল। কিন্তু আজ ১৯৩০-এ ? পুরনো দিনের অহিংস আন্দোলন ফেল্ মেরেছে! স্বরাজ্য পার্টির শেষ পরিণাম জুৎসই হচ্ছে না! দেশবন্ধু পরলোকগত, মোতিলাল নেহরু অসুস্থ, গান্ধীজী সাসুন্ হাসপাতালে চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে 'হরিজন' সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি স্বীকারোক্তি করেছেন, তাঁর হিমালয়ান্ ব্লাণ্ডার! ভারতবাসীর মনে তাঁর সম্বন্ধে নূতনতর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়েছে।

এমন সময় দুম্ ক'রে একটা আওয়াজ হল ডালহাউসী স্কোয়ারে! মোটরবিহারী টেগার্টকে বোমার আঘাতে মারতে গিয়েছিল দীনেশ মজুমদার। চারদিকে হইচই, ধোঁয়ায় সব অন্ধকার। ছুটোছুটি প'ড়ে গেল লালদীঘির সর্বত্র। কিন্তু সেখান থেকে অদৃশ্য হল দু'জন—টেগার্ট সাহেব ও দীনেশ। দীনেশের সহকারী অনুজা সেন ওইখানেই আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

আরেকবার প্রচণ্ড আওয়াজ হল চৌরঙ্গীতে। টেগার্ট বলে যাকে মনে হয়েছিল সেই ব্যক্তির নাম আর্নেস্ট ডে। টেগার্টের কপালে অপমৃত্যু নেই। ধরা পড়ে গেল গোপীনাথ সাহা। অল্পকালের মধ্যে তার ফাঁসি হয়ে গেল। ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘের মতো বৃটিশ কর্তৃপক্ষ কলকাতায় ধরপাকড় আরম্ভ ক'রে দিল এবং অসংখ্য ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে ইলিসিয়ম্ রো-র কক্ষে কক্ষে তাদের দেহের উপর নরখাদকের মতো উৎপীড়ন চালাতে লাগল।

এই নতুন কালের রক্তবিপ্লববাদীদের সঙ্গে বারীনদার পরিচয় নেই। তাঁর আজীবনের স্বপ্ন রূপায়িত হচ্ছে কিনা তিনি প্রহর গণনা করছিলেন। আমি ভক্ত হনুমানের মতো প্রায় করজোড়ে বসে তাঁকে নিরীক্ষণ করছিলুম। বারুদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে বাঙলার প্রায় সর্বত্র! দেশের জন্য ছেলেদের একে একে প্রাণ বিসর্জনের সংবাদ—বারীনদাকে চঞ্চল করে না। তিনি এতে অভ্যস্ত। ছেলেরা যাচ্ছে পুলিশ লক-আপে,

তারা উৎপীড়ন আর প্রহারে জর্জরিত হচ্ছে, জেলে ঢুকছে, দীপান্তর যাচ্ছে, ফাঁসির মঞ্চ থেকে তাদের মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ছে,— বারীনদা শান্ত, অবিচল। তিনি তাঁর ধ্যান-দৃষ্টিতে দেখছেন স্বাধীন সার্বভৌম ভারত। ষড়ৈশ্বর্যশালিনী রাজরাজেশ্বরী জননী ভারতমাতা। বারীনদা প্রতি প্রত্যুষে উঠে স্নানাদি সেরে ধ্যানে বসেন। পরে চা, টোস্ট, অমলেট্ খেয়ে সংবাদপত্র ও প্রবন্ধ রচনা নিয়ে বসে যান।

শ্যামবাজারে মোহনলাল স্ট্রীটের দক্ষিণ ফুটপাথে বারীনদা একখানা তিনতলা বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন দেড়শ' টাকায়। সে-বাড়িতে তিন-তিরিক্কে নয়খানা শোবার ঘর। পূব দক্ষিণে বেশ বড় উঠোন। সেই বাড়ির তিনতলায় দক্ষিণমুখী ঘরে থাকেন বারীনদা, পাশের ঘরে তাঁর দিদি চিরকুমারী সরোজিনী ঘোষ, তৃতীয় ঘরখানা হরি-ঘোষের গোয়াল। দোতলায় বারীনদার ঠিক নিচের ঘরখানায় এসে উঠেছেন এক প্রবীণা বিধবা তাঁর সাবালক ছেলেকে নিয়ে। মাঝে মাঝে তাঁর ঘরে এসে ঢোকে একটি বয়স্থা ও সুদেহা কুমারী, নাম ভক্তি। মেয়েটি কোথায় যেন চাকরি করে এবং মধ্যে মাঝে ওই ঘরটিতেই রাত কাটিয়ে যায়। ছেলেটিও যেন কাজ করে কোথায়। প্রথমটায় অনুমান করা গিয়েছিল ওরা দুটি ভাই বোন। পরে জানা গেল কিছু অন্যরকম।

আমার বাসস্থান এখান থেকে প্রায় মিনিট দশেকের পথ। আর-জি-কর হাস-পাতাল তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। আমার বাসস্থান তারই পাশের রাস্তা নীলমনি মিত্র রো-তে ২৮/১ নম্বর বাড়ির ভিতরের অংশে। কিন্তু আমি সম্প্রতি সেখানে বেমানান। কেননা আমার ছোড়দার চাকরি হাইকোর্টে। তিনি বললেন, বারীন ঘোষের দলে ও ভিড়েছে। ওর পেছনে গোয়েন্দা পুলিস ঘুরছে। ওর সঙ্গে এক-বাড়িতে থাকলে আমাদের দুই ভাইয়েরই চাকরি যাবে। বাড়ি সুদ্ধ না খেয়ে মরবে।

কথাটা যুক্তিসঙ্গত। মা চোখের জল মুছে বললেন, ভয় কি তোর? পায়ে তোর একটি কাঁটাও কোনদিন ফুটবে না। আমি আছি তোর সঙ্গে সঙ্গে।

সেইদিনই গৃহত্যাগ করে বারীনদার ওখানে গিয়ে উঠলুম। সঙ্গে ভাঙ্গা টিনের সুটকেস আর বিছানার পুঁটলি। কিছু ভাবিনে, সেই চিরদিনের মা আমার সঙ্গে-সঙ্গে।

অনন্তহরি মিত্র পুরীতে পলাতক অবস্থায় ধরা পড়ল। তার ফাঁসি হয়ে গেল। বাঙ্গলাদেশে বারুদের গন্ধ উঠেছে শুধু কলকাতায় নয়। ঢাকায়, কুমিল্লায়, চট্টগ্রামে, মেদিনীপুরে, খুলনায়, রাজশাহীতে এবং নানা জেলায়। পাঞ্জাবে ভগৎ সিংয়ের ফাঁসী হবে—তার জন্য তোলপাড় হচ্ছে উত্তর ভারত। ওদিকে বোম্বাই থেকে গান্ধীজী তাঁর রণঘোষণা পাঠ করছেন—সেই উদাত্ত কণ্ঠ ছুটে চলেছে দিক্‌বিদিকে। এবারে তাঁর মরণপণ সংগ্রাম। আইন অমান্য আন্দোলন। এবার জাতির সর্বাপেক্ষা প্রয়ো-জনীয় সামগ্রী যে লবণ, তার উপর থেকে নির্ধারিত ট্যাক্স অপসারণের জন্য এই আইন অমান্য আন্দোলন। একশ্রেণীর দেশবাসী ভাবল, সামান্য এই লবণকর নিয়ে গান্ধীজীর এই অভিযান, এ সে শিশুসুলভ। গান্ধীজী ঘোষণা করলেন, তাঁর বাছা-বাছা স্বেচ্ছা-সেবকরা এই অভিযান-পথে তালগাছ কাটতে কাটতে যাবে। কেননা তালের তাড়ি প্রস্তুত ও তার ওপর ধার্য কর আদায় বন্ধ হবে, এবং আমার অহিংস স্বেচ্ছাসেবকেরা আপন-

আপন ইচ্ছায় সমুদ্রের জল নিয়ে লবণ প্রস্তুত করবে।

আগাগোড়া হাস্যকর! নেংটিপরা লোকটা নিছক বাতুল! লোকটার ষাট বছর পেরোতেই বাহাত্তুরে ধরেছে! ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে নিয়ে এই ছেলেখেলার পর ওই বাতুলই আবার বলে বেড়াবে, 'হিমালয়ান্ ব্লাণ্ডার'!

বারীনদা খুব হাসছিলেন। বললেন, বুঝেছ? ওই গান্ধী আর অহিংসার ভূতকে দেশ থেকে তাড়াতে হবে. নইলে মুক্তি নেই। সমস্ত দেশটাকে ও লোকটা আফিং খাইয়ে বন্দ ক'রে রেখেছে। আমাদের কাজ ও লোকটার মুখোশ খুলে দেওয়া!

'বিজলী' যথাসময়ে বেরোবে স্থির হয়েছে। বারীনদা টাকাকড়ি যোগাড়ে সিদ্ধ-হস্ত। সম্পাদক হবেন মোট পাঁচজন। বারীনদা প্রধান হবেন। সঙ্গে থাকবেন নলিনীকান্ত সরকার, বারীনদার ভ্রাতুষ্পুত্রী ও নবীনা মহিলা নেত্রী লতিকা বসু, থাকবে শশাঙ্কমোহন চৌধুরী এবং ওদের সঙ্গে থাকবে এই অপরিণামদর্শী নির্বোধ—যে ঘর ছেড়েছে, স্নেহের আশ্রয় ও পরিচিত সমাজ ত্যাগ করেছে, জীবনের সমস্ত উচ্চা-কাঙ্ক্ষা একদম বিসর্জন দিয়েছে,—এই 'প্রভুপদ রক্ষিত'কে এবার কাজে লাগাও! বারীনদা আমার দিকে ফিরে সহাস্যে বললেন, দুবেলা দুটি শুকনো ভাত শুধু খেয়ো। কুড়িটি করে টাকা মাসে-মাসে নিয়ো। 'বিজলী' চালাবার ভার তোমার হাতে দিলুম। ক্ষীরোদের হাতে রইল বিজ্ঞাপন আর বিজনেস্। কিন্তু ক্ষীরোদ সম্বন্ধে একটু সাবধানে থেকো। ও একটু বিপজ্জনক।

কেন, বারীনদা?

ও যে আমার মতন শেষ রাত্রে উঠে যোগে বসে!

ঘর সুদ্ধ সবাই হেসে উঠল। উপেন বাঁড়ুয্যে, অমর চাটুয্যে, বন্ধুবর কাজী নজরুল, নলিনী সরকার, সরোজিনী, লতিকা ও তাঁর সুরূপা ভগ্নী মৃণালিনী রতিকান্ত পান্ডিত, মেটফাক প্রেসের রমেশ বসু, অনিল ভট্টাচার্য এবং আর যাঁরা উপস্থিত ছিল সেদিন।

এটা স্থির হয়ে গেল কেবলমাত্র সম্পাদকীয় লিখবেন বারীনদা, নলিনীদা লিখবে চ্যাটিম-চাটিম, নজরুল নিয়মিত লিখবে কবিতা, উপেনদা ও লতিকা লিখবেন প্রবন্ধ, শশাঙ্ক কি লিখবে জানিনে, আমি লিখব যা খুশি! এইটি আরেকবার স্থির করা হল, লতিকা ইংরেজিতে তাঁর ইচ্ছামতো লিখবেন, আমি সেগুলি অনুবাদ ক'রে নেবো। কুড়ি টাকায় আমি চব্বিশ ঘণ্টার ক্রীতদাস হয়ে রইলুম! এর ওপর মাসে দুটো, নিদেনপক্ষে একটা ছোট গল্প ঈষৎ গরম মসলা মিশানো—অন্তত পনেরো টাকা। বছরে একখানা ছোট গল্পের বই এবং একখানা দেড় টাকা দামের উপন্যাস,—দুই মিলিয়ে কমপক্ষে তিনশ'। বারো পঁচিশং তিনশ'। অর্থাৎ ছোট গল্প, 'বিজলী' ও উপন্যাস। পনেরো, কুড়ি আর পঁচিশ—এই ষাট টাকা মাসিক উপার্জন। আবার আমি টাকায় ভাসবো।

আমি সেইদিনই আমার অসময়ের বন্ধু ও প্রতিবেশী সুধীন নিয়োগীর কাছে দশটি

টাকা ধার করে একজোড়া শ্রেষ্ঠ ঢাকেশ্বরী ধুতি, একজোড়া আদ্দির পাঞ্জাবি, দুটো গেঞ্জি ও একজোড়া স্যাণ্ডাল কিনে ফেললুম। গৌরী ভাণ্ডার থেকে এক ডজন সাদা রুমাল কিনে নিলুম বারো আনায়। আমি বরাবরই ফিটবাবু, চকচকে ধোপ-দস্ত পোশাকপত্র ছাড়া আমার চলে না। নিজের চেহারা আমি কখনও মলিন হতে দিই না।

মোহনলাল স্ট্রীট ও রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটের মোড়ের বাড়িটায় যে গোয়েন্দা পুলিসের একটা বড় আড্ডা এই প্রথম জানলুম। আমাদের এ বাড়ি থেকে ওটা বোধ হয় একশ' গজেরও কম। আমি আপিস বসালুম নিচের তলায় সদর দরজার ঘরে। রাত্রে এই ঘরেই পড়ে থাকব একখানা কাঠের তক্তায়। বারীনদা আনিয়ে দিলেন একখানা টেবিল আর খান দুই চেয়ার। এই ঘরেই আসছে যখন-তখন উটকো অচেনা লোক। তারা বারীনদার সম্বন্ধে অনর্গল শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে নানা প্রশ্ন ফেঁদে বসে। এরা যে গোয়েন্দা পুলিসের ইনফরমার, এটি অনুমান করতে আমার দেরি হয় না। আমার সম্বন্ধে ওদের অসীম কৌতূহল মাঝে মাঝে আমাকে বিরক্ত করে তোলে।

'বিজলী' লাল মলাটে ছাপা হবে। ডবল ডিমাই চার পেজী সাইজে চব্বিশ পৃষ্ঠা এবং চার পেজ মলাট। মোট আটাশ পৃষ্ঠার কাগজ। নগদ মূল্য এক আনা। বারীন ঘোষের 'বিজলী' নব কলেবরে এতকাল পরে আবার দেখা দিচ্ছে, এটি মস্ত সংবাদ। সুতরাং কোন-কোনও সংবাদপত্রে এ খবরটি ছাপা হল।

গান্ধীজীর আসন্ন ডাণ্ডি অভিযান, লবণ সত্যাগ্রহ এবং আইন অমান্য আন্দোলনের ঘোষণায় ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশ তখন উদ্দীপ্ত ও আলোড়িত হয়ে উঠেছে। আগামী ১২ মার্চ তিনি এই সত্যাগ্রহের পুরোধা হয়ে এক ঐতিহাসিক অভিযান করবেন। তাঁর সঙ্গে থাকবে মোট উনআশীজন স্বেচ্ছাসেবক। তারা হবে ভয়হীন, বন্ধনহীন, মনে-প্রাণে অহিংস, স্বার্থলেশশূন্য এবং দেশকর্মে আত্মনিবেদিতপ্রাণ। তারা আরব সমুদ্রতীরের পথে-পথে লবণ তৈরি করবে ও তালগাছ কাটতে কাটতে যাবে। কাশী থেকে খবর পেলুম ভারতব্যাপী এই আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে থাকছে আমাদের তরুণ বেপরোয়া বন্ধু প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী। সে ইতিমধ্যেই বোম্বাই রওনা হয়ে গেছে। যারবেদার কারাগার তাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল।

গান্ধীজী তাঁর বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, "হম অব যাত্রা শুরু করেঙ্গে, সারে হিন্দুস্থান উথল যায়েগা।"

বারীনদা বললেন, 'বিজলী'র প্রথম সংখ্যা বার করে দাও ১২ মার্চ।

তথাস্তু। মেটকাফ প্রেসের রমেশবাবুকে নিয়ে আমি কোমর বেঁধে কাজে নামলুম। বারীনদা সম্পাদকীয় রচনা নিয়ে বসলেন। এদিকে আমার হাতে নজরুল ত আছেই। এ ছাড়া ডাকলুম অচিন্ত্য ও শৈলজানন্দকে, বুদ্ধদেব ও মহেন্দ্র রায়কে, জীবনানন্দ সুবোধ রায় জসীমকে। খবর পাঠালুম ছাত্রদলের তরুণ নেতা বন্ধুবর গিরিজা মুখোপাধ্যায়কে। ডাকলুম জগদীশ গুপ্তকে। ওদেরই সঙ্গে ডাকলুম আমার সহপাঠী গিরিজা সেনের দিদি জ্যোতির্ময়ী দেবীকে।

গান্ধীজীর বাক্য মিথ্যা হয়নি। ১২ মার্চ তারিখে আবার সাগরের সঙ্গে ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গভঙ্গে উত্তাল ও উদ্দাম হয়ে উঠল। ভারতের পুরুষের সঙ্গে নারীসমাজ বেরিয়ে এলো পথে পথে।

'বিজলী'ও সেদিন প্রকাশিত হল। তার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল, 'তালকাটা আন্দোলন'। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রায় পাঁচ হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেল।

॥ ২৮ ॥

প্রতি প্রত্যুষে খড়মের শব্দে আমার ঘুম ভাঙে। বারীন ঘোষ এক পেয়ালা গরম চা হাতে নিয়ে তেতলা থেকে নেমে আসছেন। আমি নিচের ঘরে ন্যাড়া তক্তাখানার উপর সারারাত পড়ে থাকি। এটা আমার আপিস-ঘর। দরজাটা খুললেই মোহনলাল স্ট্রীট।

চায়ের পেয়ালা হাতে দিয়ে বারীনদা পরিহাস করেন, রাত জেগে কোন্ উর্বশী-মেনকার কথা ভাবছিলে?

ভোরবেলা হাসির ঝড় তুলে বারীনদা আবার ওপরে উঠে যান। এরই মধ্যে তাঁর স্নান, যোগধ্যান ইত্যাদি সবই সারা হয়ে গেছে। বারীনদার দিদি সরোজিনীরও তাই। তিনিই রান্নাবান্না করেন, বারীনদাও প্রায়ই নিজের হাতে টোস্ট, অমলেট ও চা প্রস্তুত করে নেন। প্রাতরাশের পর বারীনদা সংবাদপত্র ও পড়াশুনো নিয়ে বসেন। বেলা সাড়ে দশটার মধ্যে তাঁদের আহারাদি শেষ হয়ে যায়। বেলা বারোটা পর্যন্ত বারীনদার বিশ্রাম। তারপর লেখাপড়া নিয়ে আবার বসে যাওয়া। তখন আবার চা।

এখন 'বিজলী'র চাকাটা কিছু ঘুরেছে। পাঁচজন সম্পাদকের মধ্যে দুজন উদাসীন, শুধু নলিনী সরকার লেখেন একটা ফীচার, নাম—'চাটিম চাটিম'। সেই-টুকু লিখেই তিনি খালাস। আমি মরেছি! সমস্ত কাগজখানাই আমার হাতে,— আমি যা করি। বারনদা ছোট ছোট পুস্তিকা ও 'আত্মকথা' লেখা নিয়ে ব্যস্ত, মাঝে মাঝে সম্পাদকীয় লেখাও লিখতে সময় পান না। ফলে একাধারে আমি হয়ে উঠলুম 'বিজলী'র সম্পাদক, প্রুফ রীডার, পত্রলেখক, কেরানী—সবই। লোকে জানছিল বারীনদা যোগতপস্বী এবং রাজনীতিক নেতা, আর আমি হলুম 'বিজলী'র সর্বেসর্বা! সব চিঠি, সব লেখা, সকল দর্শনার্থী, সকলের সলা-পরামর্শ শুধু আমাকেই ঘিরে। আমার মাসিক বেতন কুড়ি টাকা, চার সপ্তাহে নাকি এক মাস, সুতরাং ক্ষীরোদবাবু প্রতি সপ্তাহে শনিবারে আমার হাতে পাঁচটি করে টাকা দেন।

আমি শ্যামবাজারের ভিতর মহলে এক পাইস্-হোটেলে মধ্যাহ্ন-ভোজন সারি। এক আউন্স কাগজমোড়া খাঁটি মাখন এক আনা, এবং দশ পয়সার মধ্যে ভাত, ডাল, ভাজা, ছ্যাঁচড়া, মাছের ঝোল, দাগা মাছের বা ডিমের কালিয়া। পাতি লেবু ও চাটনি

ফাউ। আমার বাঁধা বাজেট চৌদ্দ পয়সা। আমার সঙ্গে বসতো বাজারের ফড়ে, আলুওলা, মনোহারী দোকানের চাকর, বাস ও ট্রামের ড্রাইভার ও কনডাকটর, পুরোনো কাগজ বিক্রির লোক, পান বিড়িওলা, আর ইজ কর হাসপাতালের মজুর, মদের দোকানের বিক্রেতা, জেলে দু-চারজন, উল্টোডিঙ্গির নৌকার মাঝি-মাল্লা ইত্যাদি নানা লোক। ভোজের আসর নানা গল্পে মশগুল হয়ে উঠত। ওরই মধ্যে এক-আধ দিন আমার ঘাড় ভেঙে খেতে বসে যেত নজরুল আর শৈলজানন্দ আর ভবানী মুখুজ্যে এবং আমার সহবাসী রতিকান্ত আর অনিল ভটচার্য। সেদিন আমার সর্বনাশ! আমার বাজেট মেলাতে প্রাণান্ত।

'বিজলী'তে তখন নিয়মিত বেরোচ্ছিল নজরুলের রাজনীতিক ও সামাজিক হাসির কবিতা। পরে এই কবিতাগুলি একত্র করে 'চন্দ্রবিন্দু' নামে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া বেরোচ্ছিল অচিন্ত্যর 'বিবাহের চেয়ে বড়', শৈলজানন্দর 'সেবাদাসী', বুদ্ধদেবের কবিতা ও নাটিকা একটির পর একটি।

অচিন্ত্য তার বিয়ের আগেই উপরোক্ত ধারাবাহিক উপন্যাসটির নাম দিয়েছিল 'বিবাহের চেয়ে বড়'। সে এনেছিল 'কল্লোল-সাহিত্যে নতুন ঢং। নতুন এবং মৌলিক ছাড়া তার অন্য চিন্তা নেই। সে পুরনো সাহিত্যের নবতন ঐতিহ্যবাহী নয়, সে আনকোরা নতুন। শব্দচয়নে, বাকভঙ্গিতে, বিশুদ্ধ ব্যাকরণিক ভাষা প্রয়োগে, অভিনব প্রকাশভঙ্গিতে—সে আগাগোড়া মৌলিক। 'বিবাহের চেয়ে বড়' রসিক পাঠকসমাজে খুবই সমাদৃত হচ্ছিল।

'বিজলী' বাড়ির নিচের তলায় আমার আপিসের পাশের ঘরে থাকেন বারীনদার রাঙা-মা। ইনি অপরিসীম রূপলাবণ্যময়ী এক বৃদ্ধা। মুখে দু পাটি দাঁতই নেই, চোখে মোটা আতস কাঁচের চশমা। বারীনদা ও সরোজিনী যখন তাঁদের পাগলিনী জননী স্বর্ণলতার উৎপীড়নে প্রায় আধমরা—তখন বারীনদার বয়স বছর দশেক এবং দুটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে স্বর্ণলতা যখন দেওঘরের 'রোহিণী' অঞ্চলে বায়ুগ্রস্ত অবস্থায় প্রায় নির্জনবাস করছেন, সেই সময় খুলনার এক তালুকদার চিন্তামণি ভঞ্জ চৌধুরী রোহিণীতে গিয়ে কয়েকজন স্থানীয় গুণ্ডার সহায়তায় বালক বারীনদাকে হিঁচড়িয়ে টানতে টানতে এক আমবাগানে নিয়ে আসেন, এবং পূর্বব্যবস্থা মতো এক পালকিতে চড়িয়ে ও পরে ট্রেনযোগে কলকাতায় এনে যে তরুণী বালবিধবার কাছে গচ্ছিত করেন, তিনিই এই রাঙা-মা! রোহিণীতে বারীনদাকে অপহরণের কালে স্বর্ণলতাকে ভুলিয়ে রাখার জন্য এক গোছা ফুল উপহার দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরমুহূর্তেই পুত্র অপহরণের দৃশ্য দেখে উন্মত্ত হয়ে তিনি ঘরের ভিতর থেকে মস্ত ছোড়া নিয়ে গুণ্ডার দলকে তাড়া করে ছোটেন। সেটা বোধ করি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ।

যাই হোক, সমস্ত ব্যবস্থাটা ছিল পূর্বকল্পিত। তৎকালে বিলাতফেরত এম-ডি পাস করা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন খুলনার সিভিল সার্জেন। তিনি ছিলেন খাস সাহেব। বিলাতের বহু ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাঁর তিনটি ছেলে—বিনয়ভূষণ, মনোমোহন ও অরবিন্দ তখন বিলাতে পড়াশুনো করে। কৃষ্ণধন

যোগের স্ত্রী স্বর্ণলতা সন্তান প্রসবের প্রাক্কাল থেকেই মস্তিষ্ক-বিকারে প্রায়ই ভুগতে থাকেন। সেই অবস্থাতেই একেকটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। সর্বশেষ সন্তান বারীন ঘোষের জন্মকালে লণ্ডনের পথে ইংলিশ চ্যানেলে প্রবল ঝড়ের সময় জাহাজের মধ্যে উন্মাদিনী স্বর্ণলতায় প্রসববেদনা দেখা দেয়, সেই কারণে নবজাত সন্তানের নাম রাখা হয় বারীন্দ্রকুমার। বারীনদা ভূমিষ্ঠ হন লণ্ডনের উপকণ্ঠে নরউডে। অতঃপর স্বর্ণলতা আপন খেয়াল অনুযায়ী ক্রয়ডনের বার্থ রেজিস্ট্রেশন আপিসে বারীনদার নতুন নামকরণ মুদ্রিত করেন—'ইম্যানুয়েল ম্যাথিউ ঘোষ।'

সেই দেশবিশ্রুত সিভিল সার্জেন ডাঃ কে ডি ঘোষের উপপত্নী হলেন এই বাল-বিধবা রাঙ্গা-মা। দশ বছর বয়সে বারীনদাকে এই রাঙ্গা-মার কাছে এনে দেন পূর্বোক্ত চিন্তামণি ভঞ্জ, আড়াল থেকে সহায়তা করেন পিতা কে ডি ঘোষ। এই রাঙ্গা-মার সম্বন্ধে বারীনদা তাঁর 'আত্মকথা' গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছেন, "নিচে ছুটে এসে আমায় কোলে তুলে নিলেন। এতক্ষণের রহস্যঘেরা রাঙ্গামা···দীর্ঘছন্দ সবল বলিষ্ঠ দেহ, অপূর্ব রূপ সারা যৌবনস্তঠাম অঙ্গ বেয়ে ঝরে পড়ছে। বয়স আন্দাজ আঠারো-উনিশ···কলকাতায় বাবা থাকার সময়ে তাঁর সঙ্গে আমরা যেতুম গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে খোলা ফিটনে বসে বসে! আমার বাবা টিপ-টপ সাহেব। তাঁর পাশে রাঙ্গা-মা বসতেন বুক-খোলা গাউন পরে নানা ফুল-ফলে ভরা লেডিজ হ্যাট মাথায় দিয়ে রুমাল হাতে···রূপসী মা ইডেন গার্ডেন আলো করে চলতেন তাঁর সম্রাজ্ঞীর বাড়া লাবণ্যে ও শ্রী-গরিমায়···এই মা আমার বাবার শূন্য জীবন সুখের প্লাবনে ভরে দিয়ে তাঁর ভাঙ্গা সংসার আবার গড়ে তুলেছিলেন—"

রাঙ্গা-মাকে কোথা থেকে যেন বারীনদা এনে তুলেছেন এই ঘরে। আমি তাঁর ঘরে ঢুকে দেখি মেঝে থেকে প্রায় কড়িকাঠ পর্যন্ত বই আর কাগজপত্রে ঠাসা—এমনই ঠাসা যে ওই বৃদ্ধার পক্ষে বাকি জায়গাটুকুতে রান্না করা ও রাত্রিবাস একপ্রকার অসম্ভব। উনি সমস্ত দিনমান ও মধ্যরাত্রি পর্যন্ত একমনে বাঙলা, সংস্কৃত ও ইংরেজি বই, কাগজ ও সাময়িক পত্রাদি তন্ময়তার সঙ্গে পাঠ করেন। শুনলুম, বিগত দেড়শ' বছরে যত মূল্যবান বাংলা বই ও কাগজ বেরিয়েছে ওঁর ভাঁড়ারে সব মজুত।

আমি দিনে দু-তিনবার রাঙ্গা-মার পান ছেঁচে দিতুম, এবং তাঁর রান্নাবান্নার জন্য টুকিটাকি এটা ওটা কিনে আনতুম। রাঙ্গা-মার মুখে নিত্যপ্রসন্ন হাস্য যেন ঝলমল করত। উনি কিশোরী জীবনে দেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা দেবীকে এবং স্বামী বিবেকানন্দর সকল খবর উনি রাখতেন। সকল ঘটনাই ওঁর মনে আছে।

বারীনদা যে কয়টি কারণে পণ্ডিচেরী ছেড়ে চলে এসেছেন, তার অন্যতম হল তাঁর এই রাঙ্গা-মার শেষ জীবনের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা। নিজের জননী নয়, কিন্তু তাঁর পিতার এই নিঃসন্তান উপপত্নীর নিকট তিনি সেই দুর্লভ মাতৃস্নেহ লাভ করেন। অথচ একই বাড়িতে তিনতলার উপরে থেকেও বারীনদার দিদি সরোজিনী এই বৃদ্ধার প্রতি বিরূপ ছিলেন। দিদির প্রতি আমি খুবই শ্রদ্ধাশীল, ভক্তিমান এবং অনুরক্ত। তিনি যখন তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধু, পরিচিত, আপন-পর ইত্যাদি সকলের

সমালোচনায় মুখর হতেন, আমি হাস্যমুখে সেগুলির থেকে রস পেতুম। তিনি একদা প্রতাপ নামক এক যুবকের সহিত প্রণয়ে আসক্ত হয়েছিলেন এবং সেই যুবক অবশেষে কীভাবে তাঁর প্রতি অসৎ আচরণ করে এটি আমাকে আনুপূর্বিক শুনতে হয়েছিল। দিদি এক সময়ে তাঁর সেজদা শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে কিছুকাল ছিলেন। কিন্তু পণ্ডিচেরী ত্যাগ করার সময়ে তিনি শ্রীমা-র প্রতি অপ্রসন্ন মন নিয়ে ফিরে আসেন!

আমি একপ্রকার অমায়িক সৌজন্যের সঙ্গে নিরিবিলি এক-এক সময়ে তাঁর কাছে বসতুম। আমার চেয়ে তিনি হয়ত তিরিশ বছরেরও বেশী বড়। কিন্তু আলাপচারীতে বয়সের পার্থক্য ভুলে তিনি অন্তরঙ্গের মতো কথা বলতেন। তিনি যাঁদের কথা বলতেন, তাঁদের অনেকেরই নাম আমার শোনা। বাঙ্গলার সমাজ জীবনে তাঁরা নিতান্ত অপরিচিত নন। কেউ তাঁদের মধ্যে আজও বেঁচে আছেন কেউ বা নেই।

আমি প্রায়ই লক্ষ্য করতুম, আমাকে এগুলো বলবার জন্য দিদি অবসর খুঁজে ফিরতেন এবং আমি প্রায়ই তাঁকে এড়িয়ে চলতুম। তাঁর হাতে এবং ঠোঁটে একটু শ্বেতী রোগ ছিল। বারীনদারও পায়ের দিকে ছিল এই রোগের চিহ্ন। এঁদের বংশে ও গোষ্ঠীতে একদিকে যেমন হাঁপানি, যক্ষ্মা, শ্বেতী, মস্তিষ্কবিকার, পাগল বা অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যাধি—তেমনি অন্য দিকে দেখি পাণ্ডিত্য, মনীষা, কাব্য ও সাহিত্যপ্রীতি, চিন্তাশীলতা, জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রীতি, সমাজচিন্তা ইত্যাদি। এই একই পরিবারে কবি, সাহিত্যকর্মী, দার্শনিক, দেশসংস্কারক, জনহিতব্রতী, বিপ্লববাদী, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক ইত্যাদি বহু দেখা যায়। শিশির ভাদুড়ীর এত বড় নাট্যপ্রতিভা, কিন্তু একই রক্তধারায় তাঁর পিসি হয়েছিলেন বদ্ধ উন্মাদ, পিসির মেয়ে আদমবাউড়ো—আরও কত কি! বারীনদাকে দেখছি স্নেহের কাঙ্গাল হয়ে জন্মেছিলেন। শিশুর মতো তিনি সরল, স্নেহশীলা নারীর মতো তিনি স্বভাব-কোমল। কিন্তু তিনি কবি হয়ে জন্মেছিলেন! গোলাপের মতো সুগন্ধী তাঁর মন। তিনি শুধু ভালবাসতে চেয়েছিলেন, ভালবাসা পেতে চেষ্টা করেছিলেন। নিজেই তিনি বলেছেন, তিনি মনেপ্রাণে অহিংস, তিনি মানবপ্রেমিক। ইংরাজ রাজশক্তির উপর রাগ করে তিনি নিরপরাধ এক-একজন ইংরেজকে হত্যা করতে একেবারেই নারাজ!

তবু তিনি হয়ে উঠলেন ভারতের প্রথম বোমার স্রষ্টা। হয়ে উঠলেন এই শতাব্দীর প্রারম্ভকালের রক্তবিপ্লববাদীদের অবিসম্বাদী নেতা! বাল্যে স্নেহপিপাসু, কৈশোরে কাব্যপিপাসু, তারুণ্যে প্রেমপিপাসু, যৌবনে অগ্নিপিপাসু।

পণ্ডিচেরী ছেড়ে আসার আগে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর যৌগিক দৃষ্টি দ্বারা বারীনদাকে পর্যবেক্ষণ ক'রে বলেছিলেন, তুমি ফিরে যেয়ো না, এখানেই তোমার চিত্তের প্রশান্তিলাভ ঘটবে, তুমি এখানেই থাকো, বারীন।

শ্রীমা তাঁর যোগবলে বারীনদার চিত্তশুদ্ধির জন্য বহুতর ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় বারীনদাকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা পান। কিন্তু অদৃশ্যে নিয়তি বারীনদাকে অস্থির ক'রে তুলছিল। একদা নিঃসম্বল অবস্থায় তিনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন পণ্ডিচেরী থেকে সোজা কলকাতার দিকে!

'বিজলী' নিয়মিতই বেরোচ্ছে, আমি তার কর্ণধার। এমন সময় একদিন শিলং থেকে কবি রাধারাণী একখানা কালো বাঁধানো খাতা রেজেস্টারি করে পাঠিয়ে লিখলেন, এর মধ্যে কবিতাগুলি আমার এক বান্ধবী 'অপরাজিতা দেবী'র লেখা। এর থেকে একটি কবিতা 'ভারতবর্ষ'-এ পাঠিয়ে দেবেন।

সেই প্রথম অপরাজিতা দেবী! কয়েকটি কবিতা পড়ে আমার তাক লেগে গেল। শুধু সেদিন আমারই তাক লাগেনি, বারীনদাও চঞ্চল হয়ে উঠলেন, এবং লেখক সমাজেও একটা কলরব দেখা দিল। 'বিজলী' ও ভারতবর্ষ'-এর সম্পাদক রায়বাহাদুর জলধর সেনের কাছে অনুসন্ধিৎসু চিঠির পর চিঠি। কে এই মেয়েকবি? নামটা তো খুব ইনট্রিগিং? থাকে কোথায়? স্বামী আছে কি? বয়স কত? এমন সুন্দর ছন্দে মেয়েদের মনের মধুর প্রণয়-রসাস্বাদ আর কোন্ মেয়ে কবে লিখেছে কবিতায়? এ মেয়ে যে প্রায় প্রতি কবিতায় নিজের শয়নকক্ষের শূন্য শয্যার দিকে ইঙ্গিত করে! কে এই রসভাষিণী মধুরহ্লাদিনী?

পরে শুনলুম স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত একটু নড়ে বসেছেন! অতঃপর লক্ষ্য করলুম, কবি নরেন্দ্র দেব মহাশয় অপরাজিতা দেবীর 'বুকের বীণা' বইটির ছাপা নিয়ে গুরুদাসে আনাগোনা করছেন।

আমার কোনও প্রকার উদ্বেগ বা কৌতূহল ছিল না। আমার কাছে কোনও প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা এলে আমি সোজা শিলংয়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিতুম। পরে শুনলুম কবি রাধারাণী ও কবি অপরাজিতা—উভয়েই নাকি হরিহরেরর মতো একাত্ম। শিলংয়ের নিভৃত পাইনবনকুঞ্জে কৃষ্ণ হয়েছেন কালী, শ্যাম হয়ে উঠেছেন শ্যামা! দুই মিলে এক, একাঙ্গিনী।

আইন অমান্য আন্দোলন উপলক্ষে যেমন সমগ্র ভারতবর্ষে, তেমনি কলকাতার পূর্ব উপকণ্ঠে লবণহ্রদের অন্তর্গত মহিষবাথানে লবণ সত্যাগ্রহ চলছে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সামনে নতুন সমস্যা উপস্থিত। চারিদিক থেকে পিলপিল করে এই প্রথম মেয়ে সত্যাগ্রহী বেরিয়ে পড়েছে। তারা পথে পথে, দোকানে ও বাজারে, ভবানীপুরে আর কালীঘাটে, সাহেব পাড়ায় আর লালদীঘিতে, কলেজ স্ট্রীটে আর বড়বাজার অঞ্চলে —বাঙলার জেলায়-জেলায় পুরুষের পাশে পাশে তারা। এ দৃশ্য নতুন। দিদিমা থেকে দিদিমণি, বালিকাকিশোরী থেকে কোলের খুকীটি পর্যন্ত। পুলিস যদি ওদের ধমকায় তা হলে 'দেশী' খবরের কাগজে বেরোবে—মারতে এল! মারতে এলে ছাপা হবে মারলো! আর যদি বা দু-এক ঘা বসিয়ে দেয় তবে আর রক্ষা নেই—বোলতার চাকে ঘা! সুতরাং মেয়েদের পিকেটিং, গ্রেপ্তার ও মারমুখী পুলিসের কর্মতৎপরতা দেখার জন্য সর্বত্র জনারণ্য!

ঠিক এমনি সময় ১৮ এপ্রিল সমস্ত ভারতবর্ষকে উচ্চকিত করে একটি যুগান্তকারী সংবাদ এল, "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন!" এই আক্রমণের পিছনে প্রকৃত নেতা ছিলেন সূর্যসেন, কিন্তু এর প্রকাশ্য অধিনায়ক ছিলেন অনন্ত সিং, তার সঙ্গে লোকনাথ বল,

গণেশ ঘোষ প্রভৃতি বহু অসমসাহসিক তরুণ। তারা চট্টগ্রাম স্টেশনের অস্ত্রাগার লুট করেছে, প্রহরীকে খুন করেছে, কোষাগার ভেঙেছে, এবং পুলিসের নাকের উপর পাঞ্জা পাঠিয়ে জালালাবাদ পাহাড়ের বনপথে আত্মগোপন করেছে। বাঙলার গভর্নর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন হুকুম জারী করলেন, কলিকাতার পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্ট এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবেন। চারিদিকে প্রবল জনরব ও আন্দোলন মাথা তুলল।

খবরটা যখন ঠিক বাসি হয়নি সেই সময় একদিন সকালে দুইজন মহিলা বুঝি বারীনদার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে উপর থেকে নেমে গলির দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। বোধ হয় ওরই মধ্যে বারীনদার জনৈক সহচর অমূল্য আমার কথা ওঁদেরকে বলে থাকবে। আমার নামটা যেন একটু বুড়ো-হাবড়ার বয়সের ইঙ্গিত করে। 'উত্তরা'র ক্যানভাসার হয়ে যখন ভাগলপুরে গিয়েছিলুম তখন শরৎ চাটুজ্যের এক মামা গিরীন গাঙ্গুলী আমাকে দেখে সচকিত হয়ে বলেছিলেন, এ কি, আপনার নাম শুনে আমি ভাবতাম আপনার বয়স অন্তত পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ হবে! • মাত্র সাড়ে চব্বিশ। অবাক করলেন আপনি!

যাই হোক, অমূল্যর সংকেত মহিলা দুজন আমার ঘরে হঠাৎ ঢুকলেন এবং সেই মুহূর্তেই আমার ভাগ্যনিয়ন্তা আমার জীবনে আরেকটি মোচড় দিলেন!

আমার পরনে ছিল ধুতি ও হাত-কাটা বেনিয়ান। অন্তত আমার গায়ে পাঞ্জাবিটা থাকা উচিত ছিল। ওঁরা দুজন মাতা ও কন্যা, দুজনেই সুশ্রী। জননীর বয়স আমার মা অপেক্ষা অনেক কম এবং কন্যাটিও বোধ করি আমার বয়স অপেক্ষা কিছু কম। আমি সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে ওঁদেরকে নমস্কার করলুম। শুকনো আপিস ঘরটা যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠল।

আমার নামটি ওঁদের পরিচিত, কিন্তু আমাকে আগে ওঁরা দেখেননি। বোধ হয় আমাকে দেখে প্রথমটা ওঁরা একটু থতিয়েই গিয়ে থাকবেন। ওই ফাঁকেই দেখে নিলুম বিধবা ভদ্রমহিলার নধর মুখশ্রীর উপর একজোড়া চশমা—তার ভিতরে দুটি আয়ত কালো চোখ। পরনে ধবধবে মোটা খদ্দরের শাদা থান এবং গলায় বৈষ্ণবদের মতো কণ্ঠী। কন্যার মুখে সহজ পরিচ্ছন্ন হাসি। কপালের সিঁথিতে সিঁদুরের চিহ্ন নেই। ধবধব করছে রং। হাতে সামান্য দু-গাছি সরু সোনার চুড়ি ছাড়া সর্বাঙ্গ অলঙ্কারশূন্য। পরনে কোমল বাসন্তী রংয়ের মোটা রাঙা-পাড় খদ্দরের শাড়ি। আধুনিক টয়লেটের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। মাথার রেশমী চুল পিছন দিকে টানা খোঁপায় বাঁধা।

কন্যার কণ্ঠ নির্ভয়, নিঃসঙ্কোচ ও স্বচ্ছ। বললেন, আপনার লেখাগুলো পড়ে মনেই হয় না আপনি এত লাজুক। ইনি আমার মা লাবণ্যপ্রভা দত্ত।

লাবণ্যপ্রভা বললেন, এ আমার ছোট মেয়ে শোভা। আমাদের দলের সব মেয়ে মহিষবাথানে কাজে নেমেছে, আবার ভবানীপুরের ওদিকে পিকেটিং করছে। গ্রেপ্তার হয়েছে অনেক মেয়ে।

শোভা বললেন, আপনারা বিজলীতে যে গান্ধীবাদ আর অহিংসার বিরুদ্ধে

লিখছেন, এতে আমরা খুব দুঃখিত নয়। আমাদের কাছে এই আইন অমান্য আন্দোলন একটা মুখোশ।

এতক্ষণ পর মুখ তুললুম। বললুম, কেন ?

—আপনি নিজেই বুঝবেন একদিন। শুনুন—শোভা বললেন, মা আমাদের গ্রুপকে পরিচালনা করছেন, কেননা উনি গান্ধীজীর ভক্ত। কিন্তু আমাদের কাজকর্ম একটু অন্য রকম। বারীনদার কাছে সেই জন্যেই এসেছিলুম।

—কী বললেন বারীনদা ?

লাবণ্যপ্রভা হাসলেন। শোভা কিন্তু উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে বললেন, এখন সেকালের সেই বারীন ঘোষের বয়স হয়েছে! খোলে আর বারুদ নেই।

লাবণ্যপ্রভা সেদিন আমাকে ওঁদের বাড়িতে যাবার জন্য আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানালেন এবং শোভা বললেন, আসছে কালই আসুন না ? দুপুরে আমাদের ওখানে খাবেন ? আপনি দেখছি বড্ড মুখচোরা !

ওঁরা আমাকে হাজরা রোডের একটা ঠিকানা দিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন এবং সৌজন্যবশত আমি ওঁদের পিছনে পিছনে চললুম। কয়েক পা এসে শোভা বললেন, আমার সঙ্গে হাঁটবেন না, গোয়েন্দার চোখ আছে আমার ওপর। আচ্ছা এবার যাই, কাল আবার দেখা হবে।

বিষধর জাত-গোখরো যেন লীলায়িত ভঙ্গীতে জননীর পিছু-পিছু এগিয়ে চলল, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম পিছন থেকে।

"কাননে যত কুসুম ছিল
ফুটিল তব পায়ে—"

ঘরে এসে একবারটি দাঁড়ালুম। সেদিন ভোর থেকে একটা ছেটগল্প লিখতে আরম্ভ করেছিলুম। পাতা তিনেক প্রায় লেখা হয়েছিল। বোধ হয় গল্পটা প্রণয় কাহিনীর দিকেই ঘেঁষতো। কিন্তু আর না এগোয়! এ জীবনে যে ব্যক্তি এখনও কোনও মেয়েকে ভালবাসতে শেখেনি, সে লিখবে প্রেমের গল্প ?

ননসেন্স! খাতাখানা থেকে তিনটে পাতা তুলে নিয়ে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে মোহনলাল স্ট্রীটের ফুটপাথে উড়িয়ে দিলুম—"কাননে যত কুসুম ছিল—"

সমস্ত সকালটা কী নিয়ে যে কাটল বুঝতে পারলুম না। 'বিজলী'র জন্য কি যেন একটা লেখা লিখতে গেলুম, কিন্তু সব লেখাই মনে হচ্ছিল হিজিবিজি! না, আমি লেখক নই, লিখতে আমি জানিনে। এযাবৎ যা কিছু লিখেছি সব বাজে, ফাঁকি, রাবিশ। জীবনের সত্য উপলব্ধির সঙ্গে ওগুলোর কোনও যোগ নেই। আমার মধ্যে রয়েছে সাংঘাতিক অতৃপ্তি আর অসন্তোষ। যাদের জীবনে বার বার নৌকা ডুবেছে, হাল ভেঙ্গেছে, পাল ছিঁড়েছে, অকূলে ভেসেছে—কই তারা আমার লেখায় ? আশাহত, ভাগ্যহত, নিরন্ন, আতুর, পথহারা, সকল পরিচয়হারা—কোথায় তাদেরকে আমি হারিয়ে ফেলছি ? কিন্তু ওসব থাক এখন।

দুপুরবেলা পাইস-হোটেল থেকে ফিরে একটু জিরিয়ে বেরোবার জন্য তৈরি

হচ্ছিলুম। ও-ঘর থেকে হঠাৎ বারীনদা আমার ওপর আক্রমণ করে এগিয়ে এসে হাসছিলেন। বললেন, ও, এবার বুঝি সেজেগুজে যাচ্ছ সেই জমাদারনীর ওখানে ?

জমাদারনী! বারীনদার বাকভঙ্গিতে আমার দুর্বলতার প্রতি ইশারা ছিল। আমি হাসিমুখে থমকিয়ে বললুম, জমাদারনী আবার কে ? কী যা-তা বলছেন!

—বটে! আমাকে ক্ষেপাবার জন্য বারীনদা হাসিমুখে বললেন, ওই যে জমাদারনী তোমাকে দেখবার জন্যে সকালে ছুটে এসেছিল ; ওর মা ছিল সঙ্গে, তাই বেকায়দায় পড়েছিলে, কি বলো ?

—ছিঃ বারীনদা, আপনি একদম উচ্ছন্নে গেছেন!

রক্তবিপ্লবের অগ্নিঋষি তাঁর পরিচ্ছন্ন দাঁতের পাটিতে হাসলেন। দু' পা কাছে এসে তেমনি হাসিমুখেই বারীনদা বললেন, তুমি তো নজরুল নও, তুমি বুঝবে কতটুকু ? পুরুষের কাম টেনে বার করে কামিনীকে। বিশ্বসৃষ্টির সবচেয়ে বড় সংবাদ সেইটি।

বারীনদা হাসছিলেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত নির্বোধ, বিশ্বাসভাজন, নির্ভরযোগ্য এবং কোন-কোনও বিষয়ে অপদার্থ মনে করতেন! আমার মুখের উপরকার নির্বিকার চাতুরীকে তিনি অমায়িক সরলতা বলে ভাবতেন।

আমি হাসিমুখে তেতলা থেকে নেমে গেলুম।

ভবানীপুরে স্যার আশুতোষের বাড়ির গায়ে তিনতলা বাড়িটা যেমন সরু তেমনি উঁচু—কংগ্রেস নেতা সুবোধ বসুর চেহারার মতো ছিপছিপে ও লম্বা। তিনি রাজনারায়ণ বসুর সম্পর্কে ভাইপো। লতিকা হলেন রাজনারায়ণের দৌহিত্র কবি মনোমোহন ঘোষের ছোট মেয়ে। বড় মেয়ে মৃণালিনী। লন্ডনে ছাত্রী অবস্থায় সুবোধ বসুর সঙ্গে লতিকার বিবাহ হয়। উভয়ের সম্পর্ক নাতনী ও দাদামশায়। এই বিবাহের কিছুকাল পর থেকে সুবোধ বসুর বিভিন্ন দুর্বলতা লক্ষ্য করে লতিকার মনে স্বামীর সম্বন্ধে অসন্তোষ ও বিতৃষ্ণা দেখা দেয়। ওঁদের সন্তানাদি হয়নি। কালক্রমে কলকাতায় ফিরে লতিকা বসু স্বামীর নিকট নানাবিধ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবিচার সহ্য করতে থাকেন। ১৯৩৫-এ তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে।

এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে লতিকা বসু যখন রাজনীতিক্ষেত্রে ঝলমল করছিলেন, তখন আমরা তাঁকে দেখছিলুম কলকাতার নানা সমাজকর্মে, জনপ্রতিষ্ঠানে 'ফরোয়ার্ড' অপিসে এবং স্কুল-কলেজে। নব্য বাঙলার এই প্রথম যুবনেত্রীকে কেউ কোথাও পথে-ঘাটে হঠাৎ দেখেছে—এটি ছিল সেদিনের সংবাদের মতো। মাঝে মাঝে আমাদের কল্লোল ও কালি-কলমের অপিস এবং আর্য পাবলিশিং হাউস এই বিদুষী মহিলার সম্পর্কে সম্ভব-অসম্ভব, বাস্তব ও অবাস্তব নানাবিধ কল্পিত কাহিনী নিয়ে প্রমত্ত কোলাহলে মুখর হয়ে উঠত।

১৯২৮-এর শেষপ্রান্তে কলিকাতা কংগ্রেসের কালে—শোভাযাত্রার সর্বাধিনায়ক হিসাবে চিরতরুণ সুভাষচন্দ্র যখন সামরিক পোশাকে এক বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর পুরোধারূপে কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুকে হাওড়া স্টেশন থেকে সভামণ্ডপের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সেই বাহিনীর পিছনে বিশাল

এক নারী স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর সর্বাধিনায়িকা রূপে অগ্রসর হচ্ছিলেন লতিকা বসু। সেদিনের সেই এক মাইল লম্বা বিরাট শোভাযাত্রায় মূর্তিমান অ্যাপলোর মতো পরম সুন্দর সুভাষচন্দ্র এবং অপরূপ লাবণ্যে ও গরিমায় শ্রীমতী লতিকা বসু—এঁদের দুজনকে নিয়ে সেদিন লক্ষ লক্ষ বাঙালী পরিবার নানা রসকল্পনায় মেতে উঠেছিল। কলকাতার এই কংগ্রেস অধিবেশনের প্রায় দেড় বছর পরে আমি লতিকা বসুর সংস্পর্শে এসেছিলুম। আমার চেয়ে বয়সে তিনি বছর তিনেকের বড়। বাঙলা ভাষায় তিনি কিছু অপটু ছিলেন এবং বারম্বার আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে ইংরেজিতে বলে যেতেন তাঁর বক্তব্যপূর্ণ রচনা, আর আমি টুকে নিতুম। তাঁর উচ্ছল প্রাণবন্যার সঙ্গে এমন একটি সংযম ও শালীনতার মাধুর্য দেখতুম যেটি আমাকে বার বার আকর্ষণ করে তাঁর কাছে নিয়ে যেত। যেহেতু আমি তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠ সেজন্য তিনি কোনও বিষয়ে দ্বিধা ও সংকোচ রাখতেন না, এবং আমারও কোন আড়ষ্টতা ছিল না। তাঁর ওখানেই জনবরেণ্য চিত্রশিল্পী লক্ষ্ণৌয়ের অসিত কুমার হালদারের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষও লতিকার বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিলেন।

শ্রীমতী লতিকা রাজনীতিক নেত্রী হয়ে জন্মগ্রহণ করেননি। তিনি কবিকন্যা, উচ্চশিক্ষিতা, পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতি তাঁর চিত্তের উৎকর্ষ এনে থাকবে। তিনি শিক্ষাজগতের মানুষ রুচিশীলতা তাঁর সহজাত। সম্ভবত শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর অনুরোধে ডাঃ বিধানচন্দ্র লতিকার বিবিধ গুণপনা লক্ষ্য করে তাঁকে ভিক্টোরিয়া ইন্স্টিট্যুশনের প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত করেন, এবং সুবোধ বসুর নানাবিধ বিরূপ আচরণের থেকে লতিকাকে মুক্ত রাখার জন্য চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের নার্স কোয়ার্টারে তাঁর থাকার বন্দোবস্ত করে দেন। প্রকৃতপক্ষে ডাঃ রায় শ্রীমতী লতিকার সর্বপ্রকার নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ জীবনযাপনের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

তারপর আমরা দেখলুম লতিকা বসু নামলেন রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্রের সহকারিণীরূপে।

এই সময়ের আনুপূর্বিক ঘটনা সম্পূর্ণ না জানার জন্য আমি শ্রীযুক্তা লতিকার বাসস্থানে গিয়ে তাঁর মুখ থেকেই তাঁর জীবনকাহিনী শুনেছিলুম। একসময় তিনি হাসিমুখে বললেন, হ্যাঁ, আমার মধ্যে বোধ হয় বারুদ ছিল, উনিই ত আমার মধ্যে ছিটিয়ে দিলেন আগুনের ফিনকি। আমি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলুম। কোথায় ছিলেন ছোটকাকা বারীন ঘোষ, কোথায় ছিলেন পিসি সরোজিনী আর কোথায়ই বা রইল দক্ষিণ কলকতা কংগ্রেসের সুবোধ বসু। আমি ঝাঁপ দিলুম আগুনে, সুভাষের রাজনীতিতে।

—সুভাষবাবু বোধহয় আপনার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়?

—হ্যাঁ, তা হবে—লতিকা বললেন, কিন্তু যাঁর সামনে এসে দাঁড়ালুম তিনি ত তপস্বী, কঠোরপ্রকৃতি এক ব্রহ্মচারী, চিরকৌমার্য ব্রতধারী—। আমি ভয়ে দুর্ভাবনায় সঙ্কোচে জড়োসড়ো।

—তারপর?

হাসছিলেন লতিকা। বললেন, পেতলের হাঁড়ির মতন মুখ করে সুভাষচন্দ্র আমার দিকে চেয়ে শুধু বললেন, আপনার সঙ্গে কাজ করতে পারি শুধু দুটি শর্তে—।

—কি বলুন ?

সুভাষচন্দ্র বললেন, প্রথম শর্ত—আমি আমার অপিসে যখন একলা বসে কাজ করব, আপনি আমার ঘরে ঢুকবেন না। আমার মেজবউদির (শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের স্ত্রী বিভাবতী) ওখানে যাবেন, সেখানেই আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলব।

—দ্বিতীয় শর্তটা কি ?

—সেটি হল এই, কোনও সভা সমিতিতে বা সম্মেলনে যদি আপনি এবং আমি উভয়ে একই সঙ্গে উপস্থিত হতে বাধ্য হই, তাহলে আমরা যেন কেউ কারও সঙ্গে বাক্যালাপ না করি কাছাকাছি না আসি, একত্র কেউ যেন আমাদের ছবি না তোলে, এবং আমরা কেউ কারোকে যেন না চিনতে পারি!

—মেনে নিলেন দুটো শর্ত ?—আমি হেসে উঠলুম।

লতিকা বললেন, নিশ্চয়! আমার মধ্যে এসেছিল জোয়ার, ভাবের বন্যা! আমার নিজের কী পরিচয় ? নানা কারণে আমার মন তখন ক্ষতবিক্ষত! আমি সুভাষের সকল নির্দেশের ক্রীতদাসী হয়ে গেলুম সেইদিন থেকে! সেদিন থেকে আমার আর কোনও ভয় রইল না। রাজভয় শত্রুভয় সমাজভয় নিন্দা রটনার ভয়—সব ঘুচে গেল। ডাঃ রায় আমার জীবন-ব্যবস্থার সব দায়িত্বই তুলে নিয়েছিলেন সেদিন, এবং একটি মাত্র নির্দেশ দিয়েছিলেন—আমি যেন কখনো কারোকে আমার হাতের লেখা চিঠি বা কোনও লিখিত নোট না দিই। সাবধান, পুলিসের খানাতল্লাসিতে তোমার হাতের কোন চিহ্ন যেন ধরা না পড়ে! —ডাঃ রায়ের এই নির্দেশ ছিল।

এদিকে শ্রীমতী লতিকার জেঠতুতো ভগ্নী বুলারাণীর সঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায়ের বিবাহ দেওয়া যায় কিনা, এ নিয়ে বারীনদা আমার সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। কিন্তু দৌত্যগিরি বা ঘটকালি—এ দুটোতেই আমি কাঁচা। অতএব চিঠিখানা বারীনদাই লিখলেন। সেই চিঠির জবাবে অন্নদাশঙ্কর জানালেন, আমি রায় বটে, তবে আসলে 'ঘোষ'। এক গোত্রে আমি বিবাহ করব না।

॥ ২৯ ॥

'বিজলী'তে বারীনদা যে লেখাগুলি লিখছিলেন সেগুলি সময়কালের পরিপ্রেক্ষিতে অপদার্থ এবং অন্তঃসারশূন্য। লেখা যদি সুপাঠ্য এবং মনোজ্ঞ হয় তবে সেগুলি গান্ধীবাদ বিরোধী হলেও সুখপাঠ্য। বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, বারীনদার নতুন কোনও বক্তব্য নেই, দেশকর্মের নতুন নির্দেশ কিছু নেই। দাহ্যসামগ্রীর অবশেষ যতক্ষণ থাকে, আগুন ততক্ষণ জ্বলে। যখন সবই ছাই হয়ে যাচ্ছে, তখন কেবলমাত্র ফুঁ দিয়ে আগুন

জীইয়ে রাখা যায় না। বিজলীর দীপ্তি কমে আসছিল। শোভা ব'লে গেছেন, বারীনদার খোলে আর বারুদ নেই।

বারীনদা কোথা থেকে টাকা যোগাড় করে এনে বিজলীতে ঢালছেন বা ম্যানেজার ক্ষিরোদ কীভাবে আয়-ব্যয় চালাচ্ছেন আমি জানিনে। তবে মেটকাফ প্রেসের রমেশ বোস বারীনদার অতিশয় ভক্ত। তিনি ছাপা ও কাগজের সব দায়িত্ব নিয়েছেন—সপ্তাহে যার খরচের পরিমাণ হয়ত টাকা পঞ্চাশেক। আমি পাই সপ্তাহে পাঁচ টাকা, ওতেই আমার খাইখরচ চলে যায়। দিনের বেলা চর্বাচুষ্য খাই পাইস-হোটেলে, আর রাত্রের দিকে খাই শ্যামবাজারে মোড়ের কাছে দ্বারিক ঘোষের দোকানে। আধপোয়া ওজনের খাঁটি ঘিয়ের লুচি—দু'খানা ফাউ—এগারো পয়সা, একখানা লম্বা বেগুন-ভাজা এক পয়সা। মাটির গেলাসের এক গেলাস ঘন ছোলার ডাল, এবং এতখানি একথাবা আলু-কুমড়োর ছক্কা—এ দুটি সামগ্রী বিনামূল্যে।—শেষপাতে দুটো ভাল সন্দেশ আর রসগোল্লা—এক আনা। মোট খরচ চার আনা। প্রতি রাত্রে আমি এক কোণে ব'সে নিয়মিত খাই, সেজন্য আমার প্রতি দোকানীর কিছু পক্ষপাতিত্বও ছিল। দু'চারখানা লুচি ফাউ দিতে তাদের কোনাও দ্বিধা দেখা যেত না। আমার পাঞ্জাবির গলার কাছে পৈতার গোছাটা বার করে রাখতুম। ওরা ব্রাহ্মণ-ভোজনের পুণ্যঅর্জন করত!

কিছুদিনের মধ্যেই বারীনদা অমূল্যকে ধরে কয়েক শত টাকা ধার নিয়ে বেহালার ওদিকে এক পুরনো বাগানবাড়ি লীজ নিলেন। সম্ভবত ওটা অমূল্যর নামেই নেওয়া হ'ল। সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য ক'রে আমার মধ্যে চাপা অসন্তোষ জমছিল, এবং তার সঙ্গে কতকটা নৈরাশ্য। অদূর ভবিষ্যতের চেহারা আমি ভাল দেখছিনে।

অমূল্য রোগা, কালো, সিপসিপে এবং তার মুখশ্রী ভাল না। সে বিয়ে-থা করেনি। অগ্নিঋষি বারীনদার সান্নিধ্য পেয়ে সে ধন্য হয়েছিল বটে, কিন্তু এসেছিল এক নিগূঢ় আকর্ষণে। এইটি স্থির হ'ল, বেহালার বাগানবাড়িতে বারীনদা তপশ্চর্যা করবেন, এবং তাঁর সঙ্গে জনৈকা নির্মলা দেবী, তাঁর কন্যা শ্রীমতী কনক ও অমূল্য—এরা থাকবে। মাঝে মাঝে বারীনদা তাঁর বউদিদি ও বুলারানীকে নিয়ে যাবেন। আমি যদি মধ্যে মাঝে যাই তবে বারীনদা হাতে চাঁদ পাবেন।

আমি গিয়েছিলুম একদিন বিকালের দিকে।

বেহালার বড় রাস্তার ধারে জোড়া শিবমন্দিরের কোলের যে-রাস্তা গেছে পশ্চিমে ওই রাস্তায় আমার আনাগোনা অনেক দিনের। ওই পথটা ধ'রেই যাই ভবানী মুখুজ্যের বাড়ি 'কমল কুটির'-এ। বয়ঃকনিষ্ঠ ভবানীকে না পেলে তখন সাহিত্যের আড্ডা জমতো না। যাই হোক, ওই রাস্তায় কয়েক পা এগিয়ে বাঁ হাতি এক পুরনো ভুতুড়ে বাড়ি বারীনদা দখল করেছেন। নিচের তলাটা খাঁ খাঁ করছে ছমছমে অন্ধকারে। পুরনো ইমারতের ভিতরে সোঁটকা এক প্রকার প্রাচীন বন্য গন্ধ, এখানে-ওখানে ঝোপঝাড়া জঙ্গল জটলা, গুহা-গহ্বরের মতো এক-একখানা শূন্য ঘর-চুন-সুরকি-পেটাই মেঝে, পুরনো জরাজীর্ণ দোতলার সিঁড়ি,—সমস্তটা মিলিয়ে বারীনদার এক আজগুবী

পরিকল্পনার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

দোতলায় উঠে এলুম। বারীনদা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মধুর ও সহাস্য আপ্যায়নের দ্বারা আমাকে ধ'রে নিয়ে এক মস্ত টেবিলের সামনে বসালেন। বললেন, এই ত চাই, এই হ'ল তোমার আসল জায়গা। এখানে বসে গাঁজা খাও, গুলি খাও,—যা ইচ্ছে তোমার। ওই তোমার জন্যে ওখানে কাঁথা-মাদুর রেখেছি, আজকের মতন গড়িয়ে পড়ো!

মোহনলাল স্ট্রীটের বিজলীর বাড়ি কি করবেন?

কেন, তোমার আপিসটা থাকবে, রাঙা-মা থাকবেন তোমার পাশে! আর দিদি থাকবে দোতলায়। বাকি ছ'খানা ঘরে ভাড়া চলবে! কিছু ভাবতে হবে না, অমূল্য সব করে দেবে।—বারীনদা আমাকে নিশ্চিন্ত করবার চেষ্টা পেলেন।

ওঘরের ওদিকে এতক্ষণ হাস্যকলরবের মধ্যে নির্মলা, কনক, অমূল্য ও বুলারানী টের পায়নি যে আমি এসে উপস্থিত হয়েছি। এবার ওরা সবাই ছুটে এল এবং নরক গুলজার হয়ে উঠল। অমূল্যর সঙ্গে আমার খুবই হৃদ্যতা, কিন্তু মনে-মনে বুঝি আমার এখানে আসা-যাওয়া ওর পছন্দ নয়।

গল্পগুজবের মাঝখানে আমি বললুম, বারীনদা, আজ আপনার কাছে আমাকে আসতেই হল একটা কারণে। ক্ষিরোদবাবু পর-পর দু' সপ্তাহ আমাকে টাকা দেননি। উনি বলেন, বিজ্ঞাপনের টাকা আদায় হচ্ছে না।

বুলারানী বলল, ছোটকা, আপনি সব ফেলে চলে এসেছেন, উনি কেমন করে চালাবেন?

বারীনদা স্নেহশীল। বললেন, না না, ফেলে আসিনি। দাঁড়াও, আমি এখুনি ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। অমূল্য, তোমার পকেটে আছে কিছু?

—আছে বই কি, বারীনদা—কত চাই?

—বেশি নয়, দশ পনেরো টাকা।

অমূল্য তার সোনার বোতাম পরানো সিল্কের পাঞ্জাবি থেকে মনিব্যাগটা বার ক'রে বুলারাণীর হাতে দিল। বুলা আমাকে ক্ষতক্ষণ নিরীক্ষণ করে বলল, না, এ টাকা আপনাকে নিতে হবে না!

মনিব্যাগটা বুলা অমূল্যর দিকে সরিয়ে দিল। আমি হাসিমুখে বললুম, টাকা না পেলে আমার চলবে কি করে? আট আনা দশ আনা রোজ আমার খাইখরচ। আমি না খেয়ে মরতে বসেছি!

বুলারাণী বলল, ওই কি আপনার না-খাওয়ার চেহারা? সব আপনার মিথ্যে কথা!

বারীনদা, কনক অমূল্য, নির্মলা—সবাই হাসছিল। আমি বললুম, বুলা, তোমার লেখাপড়া কামাই হচ্ছে না?

বুলারাণী বলল, ছোটকা বলে, পাস করে বিদ্যেবুদ্ধি হয় না!

আমি এবারও হাসলুম। বুঝতেই পাচ্ছিলুম, এরা সব বারীনদার বিপ্লববাদের

পাল্লায় পড়ে গেছে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে সকলে ছুটছে।

ঘণ্টা দুই সেদিন আমি ছিলুম। এদের সমস্তটাই পর্যবেক্ষণ করছিলুম। আমি 'নিহিলিস্ট' এখনও হইনি, অথবা এখনও 'পেগানিজম' বরণ করিনি। সুতরাং সেদিন ওদের বেপরোয়া, শৃংখলাবিহীন ও অদ্ভুত ধরনের পারস্পরিক আচরণ লক্ষ্য করে আমার গালের নিচে চোয়াল দুটো মাঝে মাঝে একটু কঠিন হচ্ছিল!

এক সময় আমি নাছোড়বান্দার মতো উঠে পড়লুম। ওদের কারও অনুরোধ আমার ভাল লাগেনি। আসবার সময় বারীনদা বলে দিলেন, আগামীকাল বেলা দশটার মধ্যে তিনি 'বিজলী' আপিসে যাবেন। আমি বেরিয়ে পড়লুম!

আমার আর্থিক অবস্থা যতটা মন্দ বলে বর্ণনা করলুম, ততটা ঠিক নয়। প্রতি মাসে আমি দু'তিনটে গল্প লিখি এবং কমপক্ষে গোটা পঞ্চাশেক টাকা তার জন্য পাই। সম্প্রতি 'বিচিত্রা' মাসিকপত্রের সম্পাদক এবং শরৎচন্দ্রের মামা সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আমার কাছে আনাগোনা করছিলেন। তিনি এই কাছাকাছি কোথাও থাকেন। তাঁর কাগজের জন্য 'প্রেতিনী' নামক একটি ছোট গল্প লিখে দিলুম। গল্পটা পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছিল। অতঃপর 'প্রেতিনী' এখানে ওখানে পুনর্মুদ্রিত হয়, এবং পরবর্তীকালে সিগনেট প্রেসের কর্ত্রী নীলিমা দেবী এটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

'বিজলী'তে আমি দুজন বিশিষ্ট লেখিকাকে পেয়েছিলুম। একজন শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবী, যিনি আমার সহপাঠী গিরিজা সেনের দিদি এবং জয়পুরের মহারাজার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সংসারচন্দ্র সেনের পৌত্রী। জ্যোতির্ময়ী দেবী অল্প বয়সে তিন-চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে বিধবা হন। ওদের মধ্যে অরুণ এবং অশোকার বয়স তখন খুবই কম। মেয়ে-লেখকদের মধ্যে এমন ক্ষুরধার সমাজ ও সাহিত্য-চেতনা খুব কম লেখিকার মধ্যেই সেদিন দেখেছি। তাঁকে অনেক তাগাদা দিয়ে 'বিজলী'তেই বোধ করি তাঁর প্রথম লেখা ছাপি। তাঁকে আমি দিদি বলতুম এবং তিনি তাঁর জীবনের ছোট ছোট কাহিনী অনেকটা যেন স্বীকারোক্তির মতোই আমাকে ব'লে যেতেন। আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ ও শ্রদ্ধেয় বন্ধু কবি কান্তি ঘোষ—যিনি প্রথম ওমর খৈয়ামের 'রুবাই' বা ছন্দকাব্য বাঙলায় অনুবাদ করেন তাঁর সঙ্গে জ্যোতির্ময়ী দেবীর পরিচয় ছিল। পরবর্তীকালে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্সকে ধরাধরি করে জ্যোতির্ময়ী দেবীর একখানি গল্প-সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করি। তিনি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ ও ছোটগল্প লিখতেন। কিন্তু লিখতেন কম। আমার চেষ্টা ছিল, তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করুন।

আমার দ্বিতীয় দিদি হলেন কবি প্রিয়ম্বদা দেবী। তিনি স্যার আশুতোষ চৌধুরী ও প্রমথ চৌধুরীর ভগ্নী শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ীর কন্যা। আমার বয়স যখন চব্বিশ, প্রিয়দিদির বয়স তখন চৌষট্টি, এবং প্রসন্নময়ী তখন আশী পেরিয়েছেন। প্রিয়ম্বদা ছিলেন স্বভাবকবি। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে প্রিয়দিদি একটি শিশুপুত্রকে নিয়ে বিধবা হন এবং শিশুর নাম হয় অংশু। কিন্তু অংশুরও এক সময় মৃত্যু ঘটে। সেই শিশুর

নামেই প্রিয়দিদির প্রথম ছোট একটি কবিতার বই 'অংশু' নাম দিয়ে প্রকাশিত হয়। বইটির শেষ দু'কপির একখানি প্রিয়দিদি আমাকে উপহার দেন।

একটি পোস্টকার্ড কিংবা বাবুর্চি মারফৎ ছোট্ট দু'লাইনের চিঠি, ব্যস—আমি তখনই দৌড়তুম ঝাউতলায় প্রিয়দিদির বাড়িতে। বাড়ির নাম ছিল 'তারাবাস'। প্রিয়দিদির স্বামীর নাম ছিল বোধ করি তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন পার্কসার্কাস অঞ্চল এবং প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড সবেমাত্র নির্মাণ করা চলছে।

প্রসন্নময়ী ও প্রিয়ম্বদা দেবীর কাছে এলেই আমার মনে হত আমি যেন উনিশ শতাব্দীর কোন প্রাচীন বৃক্ষছায়ার নিচে এসে বসে তার স্নিগ্ধ মধুর হাওয়ায় কপালের ঘাম মুছছি। প্রিয়দিদির বাড়ির দুদিকেই মস্ত বাগান—আম জাম তাল সুপারি নারিকেল প্রভৃতি নানা গাছ এবং কোলে-কোলে অজস্র ফুলের সমারোহ। বাগান-বাড়িটি উত্তরে ও দক্ষিণে সুলম্বিত এবং দক্ষিণ অংশে গিয়ে এই বাগান সংকীর্ণ হয়েছে। বাড়ির পূর্ব ও পশ্চিমে বড় রাস্তা। এ বাড়িতে মাতা ও কন্যা ছাড়া আরও থাকে তিন-চারজন—চাকরবাকর ঝি ও বাবুর্চি। আমি গেলেই আউট-হাউসের রান্নাঘরে কিছু চাঞ্চল্য দেখা দিত। ও'রা যথেষ্ট ধনসম্পত্তির মালিক ছিলেন।

প্রিয়ম্বদা আমার আবৃত্তি পছন্দ করতেন। তৎকালে রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা আমার মুখস্থ ছিল এবং আমি নানা সভা সমিতি ও সম্মেলনে আবৃত্তি করার জন্য আমন্ত্রিত হতুম। অনেক সময় মনে হত রবীন্দ্রনাথের অগণিত সংখ্যক কবিতা যেন আমারই রচিত এবং সেগুলি আবৃত্তি করার কালে বহু শ্রোতা ভাবতো, ওগুলি আমারই বুকের বিদারণ ও বিস্ফারণ! প্রিয়দিদির কাছে বসে আমি তাঁর 'অংশু' থেকে যে কোনও কবিতা কেবলমাত্র সেদিনের জন্য আবৃত্তি করতুম। আবৃত্তির পর দেখতুম তাঁর দুই চোখ অনুপ্রাণনায় টসটস করছে। একসময় তিনি বলতেন, এ কি আমারই লেখা? কবে লিখলুম! এ কবিতা যে নতুন করে জন্মাল তোমার মুখে। অংশু নেই, কিন্তু সে যেন বইয়ের ভিতর থেকে উঠে আমার সামনে দাঁড়াচ্ছে। আচ্ছা, তুমিই বলো ত?

আমি প্রিয়দিদির মুখের দিকে তাকাতুম।

—বলো ত, সেদিন কে ছিল আমার? মামারা আমাকে ছোটর থেকে ক্ষেপাতেন, আমি নাকি সুন্দরী, আমি নাকি মেমসাহেব!—প্রিয়দিদি বলছিলেন, কিন্তু সব ত শেষ হয়ে গেল যখন চব্বিশ বছরে পা ফেললুম। কেউ ছিল না আমার সামনে সেদিন। ছিল শুধু অংশু আর আমার কবিতা লেখার বাতিক।

—সেই শোকসন্তাপের দিনে যখন চারিদিক মরুভূমির মতন খাঁ খাঁ করছিল, কোন দিকে কোনও আশা-প্রত্যাশা নেই—সেই সময়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন এক দীর্ঘকায় বিরাট পুরুষ—

প্রিয়দিদি নারকেল গাছের শীর্ষের দিকে একবার তাকালেন, পরে বললেন, হ্যাঁ, সেই প্রথম দেখলুম গোদাবরী তীরের বিশাল শাল্মলীতরু! ভেবে দ্যাখো তুমি, আমার বয়স মাত্র চব্বিশ, রবীন্দ্রনাথের তখন তিরিশ বছরও হয়নি! তিনি আমাকে

সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, প্রিয়, মৃত্যু অনেক বড়, কিন্তু জীবন তার চেয়েও বড়। তুমি উঠে দাঁড়াও, তোমার চোখের জল তোমার কবিতার মধ্যে মিলিয়ে দাও। সেদিন রবিদা যেন অহল্যা পাষাণীকে উদ্ধার করেছিলেন। উনি আমাদের দূর আত্মীয়, কিন্তু ঘনিষ্ঠ। একদিন হাসিমুখে বলেছিলুম, রবিদা, তোমার কবিতার মধ্যে আমার কবিতা যে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। যাই হোক, তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করেছিলে, রবিদার 'লেখন' কবিতার বইটিতে ভুল করে আমার কয়েকটি কবিতা ভেবে ওই বইতে যোগ করে দেন?

আমি খুব হাসলুম। বললুম, 'লেখন' এবং আপনার কবিতার সম্বন্ধে ওঁর বিবৃতিটি বড়ই মধুর।

প্রিয়দিদি বললেন, সত্যি, তোমাকে ঠিকই বলছি। ওঁর কথা ভাবলে আমার অন্য ভাবনা থাকত না। আমি কবিতা লিখতুম একমনে। কিন্তু সে মন ওঁরই মন। আমার হাত দিয়ে রবিদা যেন ওঁর নিজের কবিতাই লিখিয়ে নিতেন। 'লেখন' বইটাতে বিভ্রাট ঘটল এই কারণেই। কার কবিতা কোনটা ধরাই গেল না। আনন্দের কথা এই, সেই রবিদা আজও তেমনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

আমার জন্য তখন খাবারের আয়োজন হয়েছে।

এরপর অনেকদিন পর্যন্ত প্রিয়ম্বদা বেঁচে ছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি তাঁর সম্পর্কের এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে পাঠান আমাকে ধ'রে নিয়ে যেতে। আমাকে তাঁর কী প্রয়োজন ছিল আমি জানিনে। তখন আমি সুদূর গহন হিমালয়ের মধ্যে বিচরণ করে ফিরছিলুম। ফিরে এসে সংবাদপত্রে একদা দেখেছিলুম, কবি প্রিয়ম্বদা দেবী মৃত্যুর আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রিশ হাজার টাকার একটি 'এনডাউমেণ্ট' করে যান।

সাহিত্য জগতে আমার তৃতীয় দিদি যিনি—তিনি আমার খুব কাছাকাছি। আমার সমবয়স্ক সহপাঠী নবকৃষ্ণ ঘোষ—যার সঙ্গে প্রতি পরীক্ষায় আমার 'টাই' হ'তো ইতিহাস ও ভূগোলে,—দুজনের মধ্যে কে ফার্স্ট হয়, তারই পিঠোপিঠি বড় বোন শ্রীমতী রাধারাণী আমার চেয়ে প্রায় দু বছরের বড়। ওদের বাবা ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এবং তিনি অবসর গ্রহণের পর আমাদের পাড়ায় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের বাড়ির ঠিক উত্তরে দীনবন্ধু লেনে থাকতেন। মনে আছে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র বলে নবকৃষ্ণকে আমরা কজন 'বাঙ্গাল' বলে ক্ষেপাতুম। যাই হোক, রাধারাণীর প্রথম বিবাহ হয় যখন তাঁর মাত্র তেরো বছর বয়স। রোহিলাখণ্ডের জনৈক ইঞ্জিনিয়ার মিঃ দত্তর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই বছরেই ভদ্রলোকের মৃত্যু ঘটে এবং কিশোরী রাধারাণী প্রাপ্তবয়স্ক হবার আগেই বিধবার সজ্জায় দেখা দেন। তখন রক্ষণশীল সমাজের নৈতিক অনুশাসন প্রবল। রাধারাণী সেই সজ্জা নিয়ে পড়াশুনো এবং সাহিত্য চর্চায় মন দেন। 'কল্লোল'-এ যখন রস-কাল্পনিক কবিতা পড়ে 'কল্লোল-কালিকলম' গোষ্ঠীর মধ্যে সাড়া পড়ে যায় এবং নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে। রাধারাণী তখন অধিকাংশ কাল থাকেন ভবানীপুরে চন্দ্র চাটুয্যের লেনে তাঁর

সুপ্রসিদ্ধ মামাশ্বশুর সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক সি-আই-ই মহাশয়ের বাড়িতে। এই সময়ে তাঁর দূরসম্পর্কীয় ভাই-সুবাদে বহুজনপ্রিয় সাহিত্যকর্মী, কবি ও কৌমার্যব্রতধারী নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে নানা অছিলায় তাঁর রোমান্স ঘনীভূত হয়। নরেন্দ্র দেব ছিলেন লেখক সমাজের দল-ছাড়া গোত্রছাড়া। অর্থাৎ 'ভারতী গোষ্ঠী ও 'কল্লোল-কালিকলম' গোষ্ঠীর সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ হয়েও তিনি আপন চরিত্রের নিষ্কলুষ শুচিতা বজায় রাখতে জানতেন। কাজী নজরুল তাঁকে অনেক ক্ষেপাতো, কিন্তু নরেন্দ্র দেব তাঁর জীবনেও একটি অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করেননি। তিনি কলকাতার এক বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান এবং ঠনঠনে কালীর মন্দিরের মুখোমুখি ছিল তাঁর নিজ বাড়ি। তিনি 'জে-টমাস' কোম্পানীতে চাকরি করতেন। অনেকেই তৎকালে জানত, নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে রাধারাণীর একটা অনির্দিষ্ট ও অনির্ণেয় সম্পর্ক এবং নরেনদা তখন রাধারাণীকে 'অনুজা' বলে উল্লেখ করতেন। অনুজার অর্থ কনিষ্ঠা ভগ্নী। বিবাহের পূর্বকাল পর্যন্ত এই সংজ্ঞাটি পরিচিত সমাজে বজায় রেখে চলাটা নরেন্দ্র দেবের সুরুচি, সৎ-প্রকৃতি ও শালীনতার কথাই বলে।

এর পরের বছরে রাধারাণী ও নরেন্দ্র দেব রক্ষণশীল সমাজনীতির শাসনকে এড়িয়ে পূর্বকল্পিত ব্যবস্থা মতো সঙ্গোপনে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে উভয়ে গৃহত্যাগ করেন এবং হাওড়ার অন্তর্গত লিলুয়ার এক রেল-কলোনির বাড়িতে উঠে সমারোহ সহকারে উভয়ের বিবাহ হয়। সেই বিবাহ বাসরে আমি নিমন্ত্রিত হয়েছিলুম।

অতঃপর রাধারাণী দেবীর সঙ্গে যখন আমার প্রকৃত ঘনিষ্ঠতা হয় তখন তাঁকে দেখলুম মুখরা, চতুরা, প্রখরা—কিন্তু মধুরা! তাঁকে আমি 'রানুদি' বলে সম্ভাষণ করেছিলুম। তিনি চৌদ্দ বছর বিধবার সজ্জায় থেকে—সাতাশ বছরের পরিণত যৌবনে এসে সিঁথিতে সিঁদুর ও রাঙ্গাপাড় শাড়ি পরিধান করলেন এবং হিন্দুস্থান পার্কে তাঁদের 'ভালো-বাসা' নামক বাড়িতে এসে উঠলেন। এই বাড়ির নম্বর হল, ৭২, সেই কারণে আমি এ-বাড়ির নাম দিয়েছিলুম, 'বাহাত্তুরে ভালবাসা'। যাই হোক রাধারাণী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়, এবং ওই 'ভালো-বাসা'য় প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যের বহু দিকপাল ওই কবি-দম্পতির আকর্ষণে এসে মজলিস জমিয়ে তুলতেন। আমাদের অনেকের বন্ধু শরৎ-স্তাবক ও 'বাতায়ন' নামক সাপ্তাহিকের সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষালের মুখে শুনতুম, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রাধারাণী ও নরেন্দ্র দেবের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতায় ও অন্তরঙ্গতায় খুব মধুর ছিল।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে রাধারাণীর কথা নিয়ে যখন তোলাপাড়া করছি তখন একদিন সকালে ভারতপ্রসিদ্ধ দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁর কন্যা শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে 'বিজলী' আপিসে এলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য বিপ্লবের অগ্নিঋষি বারীন ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা। সেখানে আমার উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল না এবং তাঁদের কথাবার্তাও আমি শুনিনি। কিন্তু সেই সূত্রে ষোড়শবর্ষীয়া মৈত্রেয়ীকে দেখে আমি চমৎকৃত হয়েছিলুম। এই বালিকার কমনীয় মুখশ্রী এবং শান্ত-

মধুর লাবণ্য, পরে শুনেছি, রবীন্দ্রনাথকেও অভিভূত করেছিল।

বিজলীতে সমালোচনার জন্য মৈত্রেয়ী তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উদিতা' বইটি রেখে যান। কিন্তু পরে সেই সমালোচনায় কাব্য অপেক্ষা কবি প্রশস্তির পরিমাণ বেশী ছিল কি না, এখন আর অতটা মনে নেই। তবে 'উদিতা' বইটির সুদীর্ঘ একটি ভূমিকা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে। কাব্যসমীক্ষার দিক থেকে সেই ভূমিকাটি ছিল অনবদ্য।

এই সময় বিজলী সম্পাদকের নিকট দু'জন মহিলা নিয়মিত চিঠি লিখতেন এবং প্রায়ই গল্প, কবিতা ও কথিকা পাঠাতেন। একজন লিখতেন রাঁচির অন্তর্গত 'হিনু' অঞ্চল থেকে—তিনি নীলিমা চট্টোপাধ্যায়। অন্য জনের নাম রমলা রায়—লিখতেন মালদহ থেকে। তাঁদের রচনা বা চিঠি বারীনদার কাছেই আসত এবং বারীনদাই হয়ত মধ্যে মাঝে প্রাপ্তি-স্বীকার করতেন তাঁদের এক আধটা লেখা ছাপা হ'ত, নইলে বাকি লেখাগুলো জঞ্জালের ঝুড়িতেই চলে যেত।

হঠাৎ এক সময় দেখলুম ওঁদের চিঠি বা লেখা আমার নামে আসতে আরম্ভ করল এবং আমি খোঁজ নিয়ে জানলুম, বারীনদাই চিঠি দিয়ে ওদেরকে এই রূপেই নির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ চিঠিপত্রের জবাব দেবার দায় থেকে বারীনদা নিজে নিষ্কৃতি পেতে চান। কিন্তু তাঁর এই নির্দেশের ফলস্বরূপ এই দুই অজানা ও অচেনা লেখিকা, বিশেষ করে ওঁদের মধ্যে একজন—তাঁর কালক্রমিক আচরণের পরিণামে আমার জীবনে যে বিড়ম্বনা ঘটিয়ে তোলেন সেটি যথাসময়ে বলব।

সে যাই হোক, 'বিজলী'তে তখন তিনটি উপন্যাস এক সঙ্গে বেরোচ্ছে, তার মধ্যে 'কাজল-লতা' উপন্যাসটি আমার লেখা। নলিনী সরকারের 'চাটিম চাটিম' বেশ নাম করেছে। নজরুলের পরিহাস সরস কবিতা বেরোচ্ছে একটির পর একটি। নজরুল তখন ডি-এম লাইব্রেরির গোপালদাস মজুমদারের সঙ্গে দাবা খেলা নিয়ে পাগল। সম্প্রতি সে চার না পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বেগুনি রংয়ের একখানা নতুন মোটরগাড়ি কিনেছে। গাড়িখানা তার পক্ষে কেনা একান্তই দরকার ছিল কিনা, সে নিজেই জানে না। কিন্তু গাড়িখানা দিনরাত্রির অধিকাংশ সময় ডি এম লাইব্রেরির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে এবং কাজী দোকানের ভিতরে অথবা পাশের মেসবাড়ির দোতলায় একখানা ঘরে গোপাল মজুমদারের সঙ্গে অবিশ্রান্ত দাবা খেলাতে হাস্যমুখর হয়। সে খেলা এমনি যে, শনিবারে বসে মঙ্গলবারে ওঠে!

নজরুলকে আমরা কাজী বলতুম এবং তাকে কোনও শাসন, বাঁধন, অথবা সাংসারিক দায়িত্বে ধরা যেত না! জাতশিল্পীর সকল প্রকার গুণপনা ছিল তার মধ্যে। কাণ্ড-জ্ঞানহীন বেপরোয়া আড্ডাবাজি ছিল তার স্বভাবসিদ্ধ। কে তাকে কখন কোথায় ডেকে নিয়ে গেল, অনেক সময় তার খোঁজ পাওয়া হেত না। গান গাইতে আরম্ভ করলে কেউ তাকে ছাড়ত না। তার ডাক পড়ত মেয়েমহলে যখন-তখন। এর মধ্যে একবার কবে যেন সে ঢাকায় গিয়ে কি সব কাণ্ডকারখানা বাধিয়ে এসেছে। সে বাঙ্গালী-মাত্রেরই প্রিয়, সকলের চোখের মণি, লেখক বা সাহিত্যকর্মী-সমাজ তার প্রতি ভাল-

বাসায় উচ্ছ্বসিত, তার যৌবনচ্ছটা ও প্রাণশক্তির প্রবলতা সকলকে সম্মোহিত করে—সেই কারণে তার কোনও প্রকার অপযশ রটলে কলকাতার সাংবাদিকরা সেগুলি কাগজে ছাপতেন না। যাই হোক, এই সময়টায় কাজী থাকত বাহির সিমলার সীতানাথ রোডে, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ও বিবেকানন্দ রোডের জংশনের কাছাকাছি—ডি এম লাইব্রেরী থেকে পাঁচ ছয় মিনিটের হাঁটাপথ। এই পাড়ায় নজরুলের বসবাসের পক্ষে কতকগুলি সুবিধা'ও ছিল। সে যখন আত্মহারা আড্ডায় বা দাবাখেলায় মশগুল হয়ে থাকত, তখন তার বাড়ির বাজার হাটের খোঁজখবর রাখত ডি এম লাইব্রেরীর অতি ভদ্র-প্রকৃতি এবং 'ওমর খৈয়াম'-এর দ্বিতীয় অনুবাদক সতীশ মিত্র, সুখদুঃখের খবর রাখত চিরনিরীহ ও অজাতশত্রু পবিত্র গাঙ্গুলী এবং আরও কেউ কেউ। টাকাকড়ি যোগাতেন গোপালদাস মজুমদার এবং ডি-এম থেকে নজরুলের একটির পর একটি বই বেরোত। বলা বাহুল্য, গোপালে-নজরুলে ঘনিষ্ঠতা ছিল আন্তরিক, সেই কারণে টাকাকড়ি নেবার আগে ও পরে নজরুল চোখ বুজে সই করে দিত যে কোনও দলিলে। এর পরিণাম কি হয়েছিল সঠিক আমার জানা নেই।

এই সময় 'কল্লোল-কালিকলম'-এর প্রত্যেকটি লেখকের ঘোরতর দারিদ্র্যের যুগ চলছে। তাদের অনেকের একটু আধটু খ্যাতিও হয়েছে, এবং প্রত্যেকের এক-আধখানা বইও বেরোচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেক লেখকই কয়েকখানা করে 'কমপ্লিমেণ্টারি' কপি পান। সেইসব বইয়ের অনেকগুলি সঙ্গোপনে আসতো ডি এম লাইব্রেরীতে। পনেরো টাকার বই এনে দিতে পারলে গোপালদা তখনই পাঁচ-সাত টাকা বার ক'রে দিতেন। এতে লেখকরা কৃতার্থ বোধ করত। এটা উঞ্ছবৃত্তি, এতে দারিদ্র্য ঘোচে না, কিন্তু দরিদ্র ও ভাগ্যহত লেখকরা এতে উপকৃত হত।

গোপালবাবুর সঙ্গে তৎকালীন নব্য লেখকদের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। তাঁর দোকান ছিল কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট আর মানিকতলার মোড়ের কাছাকাছি সরু ফালি পশ্চিমমুখো ঘরে। তিনি একজন জাতীয়তাবাদী, মোটা খদ্দর ছাড়া তিনি অন্য কিছু পরেন না এবং সেই খদ্দর তাঁর কৃষ্ণ কটিতটে গেরো বাঁধাও থাকতে চায় না। তিনি শ্যামবর্ণ। একদা তিনি বারীন ঘোষ, উপেন বাঁড়ুয্যে প্রভৃতির সেবক ছিলেন এবং ১৯২০ সালের আমলে বহুবাজারের বিজলী আপিসের বারান্দায় জনৈক মিঃ দে-কে নিয়ে প্রথম ডি এম লাইব্রেরীর পত্তন করেন। তিনি একদা সাইকেলে বইয়ের বাণ্ডিল বেঁধে কমিশনে বিক্রি ক'রে বেড়াতেন। কষ্ট ও পরিশ্রম করেছেন তিনি অনেক। গোপালবাবু সেই যুগে নজরুলের সংস্পর্শে আসেন, এবং বারীন ঘোষ প্রভৃতির বই ছেপে প্রকাশক হয়ে ওঠেন। ক্রমে তিনি নতুন বই বা উপন্যাসের দরুন লেখকদেরকে অসময়ে টাকা দাদন দিতে থাকেন কিন্তু লেখকরা পূর্বতন সংস্করণের হিসাব চাইলে তিনি দুঃখিত হন। এইভাবে তাঁকে ঘিরে একটি উর্ণনাভের জাল সৃষ্টি হয় এবং ওই জালে এক-একটি মক্ষিকা এসে যেন আটকিয়ে যায়! এই মক্ষিকারা হল নজরুল, অন্নদাশঙ্কর, অচিন্ত্য-কুমার, বুদ্ধদেব, শৈলজানন্দ, তারাশঙ্কর, মানিক, শিবরাম, বনফুল, প্রেমেন্দ্র প্রভৃতি। ওঁর ওই অর্থনীতিক উদারতার ফাঁদে আমিও পা দিয়েছি বার বার। একবারও আমাকে

উনি ঠকাননি, বরং বহুবার অসময়ে সাহায্য করেছেন। কিন্তু তবু ওঁর প্রতিষ্ঠান থেকে মুক্তিলাভের কামনায় বার বার অনেকের মতো আমারও নাভিশ্বাস উঠেছে! এক সময়ে গোপালবাবু লেখকদেরকে সন্দেশ-রসগোল্লা খাওয়াতেন প্রচুর। কিন্তু সেই রসগোল্লা ঠাসাঠাসি করে খেতে-খেতে গলায় আটকিয়ে আমাদের অনেকের চোখ দুটোও রসগোল্লার মতো টসটসে হয়ে বেরিয়ে আসত!

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের কাল রাজনীতিক ও সামাজিক বিপ্লবের বছর। এই বছরে মেয়েদের মধ্যে প্রথম ব্যাপক উত্তেজনা আসে এবং তারা হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে আইন অমান্য আন্দোলন উপলক্ষ্য করে পথে নেমে আসে। অবরুদ্ধ জল-স্রোত যেন বাঁধ ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিল। যারা ছিল অসূর্যম্পশ্যা তারাও ঘরের কোণে থাকেনি। যারা উৎপীড়িতা, শাসনভয়ভীতা, প্রবঞ্চিতা, স্বামী-পরিত্যক্তা, কুরূপা, অরক্ষণীয়া, অকাল-বিধবা—তারাও পিল-পিল ক'রে বেরিয়ে এল। অন্যদিকে রক্তবিপ্লববাদীদের কর্মতৎপরতা এ বছর থেকে আরও ঘনীভূত হল, এবং তার সংবাদ পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের পথে ঘাটে, শহরে-বাজারে গ্রামে গঞ্জে—সর্বত্র সবিস্তারে রটে যাচ্ছিল। ফাঁসী যাওয়ায় ছেলেরা ভয় পাচ্ছে না, গোয়েন্দাদের কেন্দ্রে দৈহিক উৎ-পীড়নকে তারা গ্রাহ্য করছে না, তারা যেন মরীয়া। কলকাতায় মিটিং আর মিছিল, পিকেটিং আর ল্যাঠিচার্জ, ধরপাকড় আর কারাগার—এসব নিয়ে মেয়েরাও মেতে উঠেছে। কোলে-কাঁকালে শিশু নিয়ে মেয়েরা গিয়ে ঢুকছে সেণ্ট্রাল আর প্রেসিডেন্সি জেলে। এরই ভিতর দিয়ে দু'জন তরুণী নেত্রী মহিলা সত্যাগ্রহীদেরকে পরিচালনা করছিলেন। তাঁদের একজন হলেন শান্তি দাস, অন্যজন জ্যোৎস্না মিত্র। এই সময়কার রাজনীতিক উদ্দীপনার মধ্যে যে কয়েকজন গণনেতার আবির্ভাব ঘটেছিল, তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কারাবরণ করেছিলেন। যাই হোক পরবর্তীকালে বন্ধুবর হুমায়ুন কবির বিবাহ করেন শ্রীমতী শান্তি দাসকে, এবং তৎকালের দৈনিক 'বঙ্গবাণী'র সম্পাদক বন্ধুবর গোপাললাল সান্যাল বিবাহ করেন শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্রকে। গোপাললালের বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়ে আমার নতুন জুতোজোড়াটা হারিয়ে গিয়েছিল। তবে সেই আসরে উপস্থিত পরি-হাসরসিক নলিনীকান্ত সরকারের মুখে "প্রলয় নাচন নাচলে যখন হে নটরাজ (তোমার) জটার বাঁধন পড়ল খুলে—"এই গানটির আনন্দদায়ক প্যারডি শুনে হেসে লুটোপুটি খেয়েছিলুম। গানটি অবশ্য তিনি গলা নামিয়ে চুপি চুপি গেয়েছিলেন এবং ওতেই আমার জুতো চুরির ক্ষতিপূরণ হয়ে গিয়েছিল! অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্রের পুত্র বিনয়েন্দ্র আর্য পাবলিশিং হাউসে ছাত্রাবস্থায় এসে আমাদের সঙ্গে গল্প-গুজব করতেন। তখন তিনি বোধ হয় এম-এ দিচ্ছেন। মেধাবী ছাত্র ছিলেন তিনি।

এই বছরেই 'কল্লোল' বন্ধ হয়ে আসছিল।

আমাদের অনেকের ঘনিষ্ঠ আড্ডাটাও ভেঙ্গে যাবার যোগাড় হচ্ছে। তখন আমরা ছোট ছোট দলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। অচিন্ত্যর নিত্য সহচর ছিল বয়ঃকনিষ্ঠ ছাত্র শ্রীমান বিষ্ণু দে আর ভবানী মুখুজ্যে। বিকাল বেলায় যেখানেই অচিন্ত্য, সেখানেই

বিষ্ণু। বিষ্ণু ছিল মনোযোগী ছাত্র, বিদেশী সাহিত্যের পোকা। আড়ালে-আবডালে সে তখন এক-আধটুকরো কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছে।

অবিবাহিত অচিন্ত্য যখন 'বিজলী'তে লিখছে 'বিবাহের চেয়ে বড়' নামক উপন্যাসটি তখন একদা অচিন্ত্যর বিয়ে হয়ে গেল। ওর দেবতুল্য বড় ভাই জিতেনবাবু মেয়ে দেখাদেখি ক'রে এই বিবাহ স্থির করলেন। অনেকের সঙ্গে নজরুলও গেল বরযাত্রী হয়ে। আমি ছিলুম বউভাতে। অচিন্ত্য তখন থাকত গিরিশ মুখার্জী রোডে এবং ওদের বাড়িওয়ালা ছিল আমাদের এক বন্ধু নৃপেন্দ্রগোপাল মিত্র। সে ডাকাবুকো লোক। তখন তার আরেক বাড়ি ছিল মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামের থেকে একটু দূরে জোয়ালভাঙ্গা গ্রামে। সে ছিল মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের হর্তাকর্তা। ওই জেলা বোর্ডেরই এক সভায় মেদিনীপুরের তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডগলাসকে গুলি করে হত্যা করেছিল প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য। প্রদ্যোৎ যখন গুলি করে পালাচ্ছিল সেই সময় নৃপেন ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলে। প্রদ্যোতের ফাঁসি হয়, কিন্তু নৃপেন 'রায় সাহেব' খেতাব পায়। মেদিনীপুরে পর পর তিনজন ম্যাজিস্ট্রেটকে বিপ্লবীরা হত্যা করে। তাঁরা হলেন পেডী, বার্জ ও ডগলাস।

প্রতি মঙ্গল এবং বুধবার 'বিজলী'র কাজ নিয়ে আমার সারাদিন মেটকাফ প্রেসে কেটে যেত। ওই কাজের ভিড়ের মধ্যেই এক-একদিন এসে দাঁড়াত আমার প্রিয় বন্ধু ও সুলেখক আবদুল কাদের। সে 'জয়ন্তী' নামে একখানি সুপাঠ্য মাসিকপত্র প্রকাশ করত। সে আসত আমার লেখা চাইতে। যাই হোক এই দুদিন অবিশ্রান্ত খেটেখুটে বৃহস্পতিবার দুপুরে 'বিজলী' বার করে দিতুম এবং দু'খানা কাগজ হাতে নিয়ে চলে যেতুম সোজা আর্য পাবলিশিং হাউসে। সেখানে সেই দুপুরে প্রতি সপ্তাহে আসতেন শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু। ইনি 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে'র সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ বসুর স্ত্রী এবং রাজনারায়ণ বসুর জামাতা কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের কন্যা। কুমুদিনী বারীনদার আপন মাসির মেয়ে।

আমার দুর্ভাগ্য কুমুদিনীর হাতে এই কাগজখানি স্বহস্তে দিতে হ'ত, এবং সেই কাগজটি নিয়ে এই বর্ষীয়সী মহিলা গম্ভীর মুখে চলে যেতেন। ওঁদের বাড়ি এই কাছাকাছি গোলদীঘি অঞ্চলে। ওঁর গাম্ভীর্যের কারণ, বিজলীতে বারীনদা ধারাবাহিকভাবে তাঁর 'আত্মকথা' লিখে যাচ্ছেন। দেশপ্রসিদ্ধ অগ্নিযুগের নেতা তাঁর কৈশোর থেকে সমগ্র যৌবনকাল অবধি কি প্রকার অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে সর্বত্র ঘুরেছেন, 'বিজলী'তে তারই ইতিবৃত্ত ছাপা হচ্ছিল। কুমুদিনীর সহিত বারীনদার তরুণ বয়সের সংসর্গের ছবি এই ইতিবৃত্তের অন্যতম উপজীব্য। রক্ষণশীল বাঙালী সমাজের অন্যতম প্রধান নেতা, যিনি রবীন্দ্রনাথকেও নানা প্রকারে লাঞ্ছনা করতে কসুর করেন নি, সেই কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের কন্যা তাঁর প্রবীণ স্বামীর নিকট এ-ব্যাপারে কি প্রকার কৈফিয়ত দিচ্ছিলেন, সেটি অবশ্য জানা যায়নি। কিন্তু বারীনদাকে বহু অনুরোধ করেও তাঁর এই 'আত্মকথা' আমি থামাতে পারিনি। আমার প্রতি সন্দেহবশত তিনি নিজেই এ লেখার ফাইন্যাল প্রুফ দেখে দিতেন।

অমনি একটা বুধবারে বেলা তিনটে নাগাদ যখন আমি মেটকাফ প্রেসে অতিশয় কাজে ব্যস্ত, তখন হঠাৎ চমকিয়ে উঠে মুখ তুলে দেখি শ্রীমতী বুলারানী আমার পাশে দাঁড়িয়ে। মুখে চোখে তার প্রবল উত্তেজনা। রুদ্ধ আবেগের সঙ্গে সে আমার হাত ঠেলে দিয়ে বলল, চলুন, এখনই চলুন আমার সঙ্গে—

সে যেন কান্না চাপছিল। বললুম কোথায় যাব? কি হয়েছে?

বুলা বলল, আপনাকে আমি নিতে এসেছি। যেখানে আপনি নিয়ে যাবেন সেখানেই আমি যাব। চলুন—উঠুন—

আমি উঠে দাঁড়িয়ে সভয়ে এদিক ওদিক তাকালুম। ছাপাখানার চার পাঁচজন 'ভূতকে' নিয়ে আমি কাজে মেতেছিলুম। বুলার কথায় শুধু আমার বুকের মধ্যেই কাঁপন ধরল না, আমার পা দুখানাও ঠক ঠক করছিল। আমি বললুম, এ ছাপাখানায় তোমার ছুটে আসা উচিত হয়নি, বুলা। তুমি নাবালিকা নও, তোমার বদনাম রটতে পারে। বাড়িতে কি তুমি ঝগড়া করে এসেছ?

হ্যাঁ—বুলা বলল, মা'র সঙ্গে আমার কিছুতেই বনিবনা হবে না।

আচ্ছা, চুপ করো, এখানে নয়—এই বলে আমি ভিতর-বাড়িব দরজায় এগিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলুম রমেশবাবুকে। তিনি মধ্যাহ্নভোজনের পর দোতলায় গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমার ডাকে নেমে এলেন। বুলাকে তিনি ভালই চেনেন। আমি বললুম, একে আপনি দোতলায় নিয়ে যান মেয়েদের কাছে।

বুলা বলল, কখন আপনার কাজ শেষ হবে?

অন্তত দেড় কি দু ঘণ্টা,—আজ যে বুধবার! যাও, তুমি ওর সঙ্গে ওপরে গিয়ে অপেক্ষা করো। আমি ডেকে পাঠাবো ঠিক সময়!

রমেশবাবু বুলাকে সসম্মানে ভিতর মহলে নিয়ে গেলেন। আমি এসে আবার প্রুফ দেখতে বসলুম।

শ্রীমতী বুলার এই হঠকারিতা ও মন-উচাটনের পিছনে আমার পরম শ্রদ্ধেয় বারীনদার কিছু অসঙ্গত ও যুক্তিহীন অনুপ্রেরণা ছিল। বুঝতে পারা যাচ্ছে আমার চোখের আড়ালে এবং অজ্ঞাতে বারীনদা তাঁর এই ভাইঝিটিকে নানাভাবে তাতিয়ে তুলেছিলেন। বুলার দোষ নেই। বুলা সরল, মিষ্টপ্রকৃতি, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সে হয়ে উঠেছে অপরিণামদর্শী। ওর সম্বন্ধে শুধু এইটুকু শুনেছিলুম, নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় ওকে গান শেখাচ্ছিলেন। নলিনীদা তখন কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। যাই হোক, মনে মনে স্থির করলুম, আজ বারীনদার সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে একটা হেস্তনেস্ত করব। এতে আমার 'বিজলী'র চাকরি থাকুক আর যাক্।

চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনুর মোড়ে এসে আমি বুলাকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলুম। নির্দেশ দিলুম চলো বেহালায়। বুলার উত্তেজনা তখন কিছু কমেছে। কিন্তু সে মূলত ছেলেমানুষ এবং অজ্ঞান। তার কথাবার্তা, ভাবালাপ এবং আমার সম্বন্ধে তার আজগুবী কল্পনা আমাকে বিব্রত করে তুলছিল। ট্যাক্সিখানা যখন চৌরঙ্গী, হাজরা রোড ও জাজেস কোর্ট রোড ধরে ডায়মন্ডহারবার রোডে গিয়ে পড়েছে, ততক্ষণে সে

আমাকে খামোকা 'তুমি' বলে সম্ভাষণ আরম্ভ করেছে।

বেলা পাঁচটা। বেহালার সেই ভুতুড়ে বাড়ির দরজার কাছে এসে তৎকালীন মিটার অনুযায়ী প্রায় সাড়ে তিন টাকা দিয়ে ট্যাক্সিকে বিদায় দিলুম। নিচের তলায় ছমছমে ছায়ায় সেই চাকরটা তার সঙ্গীকে নিয়ে বসে গল্প করছিল। তাদের পাশ কাটিয়ে আমরা দু'জন দোতলায় উঠে গেলুম।

দোতলায় ভোঁ-ভোঁ। কেউ কোথাও নেই। এ-ঘর ও-ঘর সে-ঘর সব শূন্য। না বারীনদা না নির্মলা, না অমূল্য, না বা শ্রীমতী কনক। বুলা নিচের তলায় গিয়ে চাকরটার কাছে জেনে এল, ওরা দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে একসঙ্গে বেরিয়েছে—ফিরতে রাত হবে। আমার মেজাজটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। এই বৃহৎ প্রাচীন ইমারতের নিশ্চুতি শূন্যতাটা চারদিকে যেন খাঁ খাঁ করছে। ফস করে আমি বললুম, এ আমার ভাল লাগছে না, বুলা। মনে হচ্ছে আমি যেন একটা ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়ে গেছি। চলো, তোমাকে সিকদার বাগানের বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি—

না, আমি যাব না, কক্ষনো না—অমন মায়ের মুখ আমি দেখব না—বলতে বলতে সে টেবলের সামনে বসে হঠাৎ কেঁদে ফেলল।

যাই হোক, সেদিন ঘণ্টা দেড়েক ধরে তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে শান্ত করে যখন তাকে নিয়ে ভবানীপুরে সুবোধ বসুর বাড়ির তেতলায় উঠলুম এবং শ্রীমতী লতিকা বসুর কাছে তাকে গচ্ছিত করলুম, তখনও বুলার মুখে অসন্তোষের ছায়া রয়েছে। ওঁরা দুজন খুড়তুতো-জেঠতুতো ভগ্নী।

॥ ৩০

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাতনামা ছিলেন। শুনেছি তাঁর স্বামী ছিলেন ব্যারিস্টার। কিন্তু তিনি দুটি নাবালিকা কন্যাকে নিয়ে একদা বিধবা হন। সেই অবস্থায় তিনি থাকতেন পুরীর কোন্ এক আশ্রমে। তাঁর ভাসুর ছিলেন বোধ হয় কলকাতায় অথবা অন্যত্র একজন ম্যাজিস্ট্রেট, তাঁর বোধ করি পাঁচটি ছেলে। তিনিও এক সময় গত হন।

লাবণ্যপ্রভার দুই কন্যা শ্রীমতী উষা ও শোভা কালক্রমে সাবালিকা হয়ে ওঠেন। অতঃপর জনৈক ধীরেন ডাক্তার এই পরিবারটির বিশেষ সাহায্যকারী হন, এবং শ্রীমতী উষার বিবাহ ঘটে জনৈক সৌরেন বসুর সঙ্গে। শ্রীমতী শোভার সিঁথিতে সিঁদুর বা এয়োতির চিহ্ন না দেখে আমি ধ'রে নিয়েছিলুম তাঁর বিবাহ হয়নি। তৎকালে বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ের বিবাহ হয়নি, এটি আমার পক্ষে একটু নতুন মনে হয়েছিল।

শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ও তাঁর ছোট মেয়ে শোভার আন্তরিক আমন্ত্রণে যখন তাঁদের হাজরা রোডের বাড়িতে প্রথম গিয়ে দাঁড়ালুম, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চার অধ্যায়' নামক উপন্যাসটি লেখেননি। তা যদি লিখতেন তাহলে আমি শ্রীমতী শোভার দিকে

সেই চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে তাকিয়ে 'অন্তু' যেমন 'এলালতাকে' বলেছিল, তেমনি বলতে পারতুম, "প্রহরশেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস তোমার চোখে দেখেছিলেম আমার সর্বনাশ।"

এর আগে লাবণ্যপ্রভার নাম কখনও শুনিনি এবং আমি কাগজের লোক হয়েও তাঁর নাম কোনও কাগজে ছাপা হতে দেখিনি। তিনি ভবানীপুরের মহিলা-সত্যাগ্রহীর দলের সঙ্গে দু'একবার ছোট মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে মহিষবাথানে গিয়ে লবণ সত্যাগ্রহ দেখে এসেছিলেন মাত্র। ওঁরা 'বিজলী' পড়ছেন নিয়মিত। আমি কোনও এক সংখ্যায় আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহের আলোচনায় লাবণ্যপ্রভা ও শোভার নামোল্লেখ করেছিলুম। বলা বাহুল্য, সেই অংশটুকু ছিল স্তুতিবাদ, এবং সেই প্রথম ওঁরা দেখলেন কাগজে ওঁদের নামোল্লেখ। ওঁদের বাড়িতে আমি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলুম এবং আমার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছিল প্রায় নিত্য নিয়মিত। আমি এখন অনেকটা যেন ওঁদের পরিবারভুক্ত। ওঁরা জানতেন আনন্দবাজার, বঙ্গবাণী, লিবার্টি প্রভৃতি কয়েকখানি কাগজের সম্পাদক মহলের সঙ্গে আমি সুপরিচিত এবং আমার বহু অন্তরঙ্গ বন্ধু হলেন সাংবাদিক। ওঁরা বোধ হয় এক-আধবার কোনো কোনো কাগজে দেখে থাকবেন আমি কলকাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করার জন্য আমন্ত্রিত হই এবং সেনেটে, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে, দ্বারভাঙ্গা হলে, আশুতোষ বিল্ডিংয়ে, রবীন্দ্র জন্মতিথিতে ও নানা সাহিত্য সভায় বা সম্মেলনে আবৃত্তি করে থাকি। শিশির ভাদুড়ী বা নির্মলেন্দু লাহিড়ীর সমকালে আমি ছিলুম তখন তরুণ ঝাঁঝালো আবৃত্তিকার। শ্রীমতী শোভা সেজন্য আমাকে একান্তে নিয়ে গিয়ে আবৃত্তি করাতেন এবং রবীন্দ্রনাথের 'সুপ্রভাত' কবিতা আবৃত্তিকালে যখন আমার বিদীর্ণ কণ্ঠে রসরক্তধারা ছুটত, তখন তাঁর দুই কপোল ঘনরক্তিম বর্ণ ধারণ করত। তাঁর দুই নিবিড় চক্ষু আমার অনুপ্রেরণার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। উনি আমাকে 'পূরবী' ও নবপ্রকাশিত 'মহুয়া' ও 'শেষের কবিতা'—এই তিনটি বই উপহার দিয়েছিলেন এবং আমি ওঁকে দিয়েছিলুম টলস্টয়ের সেই 'ক্রুৎজার সোনাটা'র ইংরেজি অনুবাদ। তখন আমি রুশ-সাহিত্যের বিশেষ অনুরক্ত।

শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা তখন জপতপ পুজো-আহ্নিক নিয়ে থাকতেন। তাঁর নামের সঙ্গে চেহারার হুবহু মিল ছিল, এবং আমি তাঁকে মা বলতুম—যদিও আমার জননী অপেক্ষা বয়সে তিনি অনেক ছোট ছিলেন। আমি তাঁর জন্য পিয়ারীমোহন সরকারের ফার্স্ট বুক অফ ইংলিশ রীডার এবং বাঙলার কয়েকখানি সহজপাঠ্য বই এনে দিয়েছিলুম। তিনি খাতা ও পেন্সিল নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার অনুশীলন করতেন। আমার চেষ্টা ছিল তিনি তাঁর স্বকীয়তা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নির্মাণ করে তুলুন নিজের শিক্ষার সাহায্যে। আমি বিকালের দিকে মধ্যে মাঝে তাঁর কাছে বসতুম। আমাকে তিনি তাঁর পুত্রসন্তান বলে গ্রহণ করেছিলেন।

লাবণ্যপ্রভার বড় মেয়ের বয়স তিরিশের কিছু কম। তাঁর ছেলেমেয়ে তিন চারটি। এমন হাসিখুশী ও মিষ্ট প্রকৃতির মহিলা আমি কমই দেখেছি। আমি তাঁকে 'দিদি'

বলতুম। প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই বাড়ির গৃহিণী। তাঁর স্বামী সোরেনবাবুকে আমরা সবাই ডাকি জামাইবাবু। তিনিও সদাশিব এবং অতি মধুর প্রকৃতি। তিনি সকাল নটায় আপিসে বেরোন,—সন্ধ্যার পরে ফেরেন। তখনকার দিনে শ্যালক-শ্যালিকারা বড় ভগ্নীপতিকে জামাইবাবু বলত,—অতুলদা, প্রতুলদা, নীরেনদা ইত্যাদির রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু মেয়েছেলেরা নিজেদের মধ্যে ওটার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। অর্থাৎ দুই মহিলা একত্র দেখাশোনা হলে পরস্পরকে 'দি' বলে সম্ভাষণ করত। যেমন তরুদি শোভনাদি, শেফালিদি ইত্যাদি। দি-অর্থে এখানে দিদি নয়। পুরুষের বেলায় 'দি' হয়ে ওঠে 'বাবু'।

এ বাড়িতে হেরম্ব মুখুজ্যে আসে। সে আমার চেয়ে সামান্য বড়। হেরম্ব ছাত্রনেতা। সে সিটি কলেজে সরস্বতী পুজো প্রবর্তন করতে গিয়ে কলকাতাকে বোধ হয় বছর দুই আগে তোলপাড় করে তোলে। ব্রাহ্মদের কলেজে প্রতিমা পুজা মঞ্জুর করা হয় না। কিন্তু হুজুগপ্রিয় বাঙ্গালী যুব সমাজ নিয়ম শৃংখলা ভাঙ্গতে সিদ্ধহস্ত। সুতরাং সরস্বতী পুজা নিয়ে হেরম্ব ব্যাপক আন্দোলন চালায় এবং সুভাষচন্দ্র এসে হেরম্বকে সমর্থন করেন। অতঃপর এটি একটি ব্যাপক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। এই প্রকার একটা কৃত্রিম আন্দোলনের চাপে সিটি কলেজকে যখন নতিস্বীকার করাবার চেষ্টা চলছে, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি বিবৃতিতে এই সাম্প্রদায়িক ও পৌত্তলিক রাজনীতির বিশেষ নিন্দা করেন। এ ব্যাপারটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন। অবশেষে 'মহাজাতি সদন'-এর প্রতিষ্ঠা উৎসবের কালে বাঙলার চিত্তবিজয়ী সুভাষচন্দ্র মহাকবির নিকটে গিয়ে তাঁর পাদ্যঅর্ঘ দিয়ে তাঁকে আমন্ত্রণ করে আনেন।

হেরম্বর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা সেই উপলক্ষে। হেরম্ব আমার বিশেষ বন্ধু, তার ব্যবহার অতি মিষ্ট, সে নম্র ও শান্ত স্বভাব।

লাবণ্যপ্রভার পাঁচটি ভাসুরপোর মধ্যে চারটি এখানে থাকে। বড় ভাই সপরিবারে থাকেন অন্যত্র। মেজভাইয়ের স্ত্রী এখানে থাকেন, তাঁকে আমরা মেজবউদি বলি। থাকেন সোরেনবাবুর আর দুই ভাই। তাঁদের একজন বিবাহিত, তাঁর স্ত্রীর নাম সুধা। সুধা হ'ল কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম প্রধান পলাতক আসামী এবং আমার কাশীর বন্ধু শচীন্দ্রনাথ বক্সীর ভাইঝি। শচীন ধরা পড়লে তার ফাঁসি হবে, সবাই জানে। কিন্তু কাকোরি স্টেশনের থেকে কিছু দূরে ট্রেন ডাকাতি ও খুনের ঘটনার উনিশ মাস পরে শচীন ধরা পড়ে এবং তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ওই ষড়যন্ত্র ও ডাকাতির সঙ্গে যারা লিপ্ত ছিল তাদের মধ্যে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ছিলেন নেতা। এ ছাড়া ছিলেন রাজেন লাহিড়ি, মন্মথ গুপ্ত, যশপাল, যোগেশ চাটুয্যে, প্রতুল গাঙ্গুলি প্রভৃতি। ওদের মধ্যে রাজেন ও যোগেশ চাটুয্যে ছাড়া সকলের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। ওদের মধ্যে প্রথমেই রাজেনের ফাঁসী হয়ে যায়, কিন্তু তার অন্যান্য ভাইরা আমার বন্ধু ও কুটুম্ব। পরবর্তীকালে 'বন্দীজীবন'-এর লেখক শচীন্দ্রনাথ সান্যাল কারাগার থেকে আমাকে দু'তিনখানি চিঠি লেখেন এবং তাঁর

মুক্তিলাভের পর কাশীতে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়।

যাই হোক, এ বাড়িতে যখনই আমি আসি, তখনই হাজরার মোড়ের পানের দোকান থেকে একটা সিগারেট কিনে ধূমপান করতে আসি। এ'দের গলির মধ্যে ঢুকে কয়েক পা এগিয়ে নিচের তলায় ঢোকবার সময় পোড়া সিগারেটের অংশ ফেলে দিই এবং দেশলাইটা লুকিয়ে রেখে ওপরে উঠে আসি। তখন বিলেতী সিগারেট বয়কটের কাল। আমাকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হ'ত। গান্ধীমার্কা সিগারেট বেরিয়েছে, সেটা আবার চন্দনগন্ধী। সুতরাং অপেয় ও অপাংক্তেয়।

এ বাড়ির প্রকাশ্য জগতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কালক্রমে খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কিন্তু আরেকটা জগৎ এ বাড়িতে আছে সেটা আমার কাছে যেন অনেকটাই ছায়াঢাকা। সেই ছায়ার মধ্যে শ্রীমতী শোভা নিঃশব্দে এবং অলক্ষ্যে আনাগোনা করেন। রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্নে ও নিশাযোগে এ বাড়িতে যারা আসে, কথা কয় এবং চলে যায়, তাদের নিয়ে আমার মনে একটা রহস্যজাল সৃষ্টি হয়। আমি তখন এ বাড়ির মক্ষীরানী শোভাকে দেখি অন্য চোখে। হঠাৎ কোন তরুণী কিংবা কোনও যুবক শোভার ঘরে ঢুকল, কিংবা এসে ঢুকলেন ধীরেন ডাক্তার, অমনি সে-ঘরের দরজা-জানালা ইন্দিছিন্দি বন্ধ হয়ে গেল। যুবকদের অনেককেই আমি চিনিনে, কিন্তু তরুণীদের মধ্যে থাকতেন বেণীমাধব দাসের কন্যা কল্যাণী দাস, আর নয়ত শ্রীমতী সুলতা কর—যাঁর স্বামী প্রেসিডেন্সির প্রফেসর। এ বাড়িতে এসেছে আরেকটি যুবতী মেয়ে বোধ হয় নবদ্বীপ থেকে। মেয়েটি বিধবা, পরনে খদ্দরের থান ও জামা, গলায় কণ্ঠী, নাকটি খড়্গাকার, সুন্দর স্বাস্থ্য, নধর দুই চোখ, শোভারই প্রায় সমবয়সী। নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি বললুম, বিষ্ণু মাথায় থাকুন, ওঁর নাম থাক শুধু প্রিয়া। প্রিয়া সকল কর্মে শোভার দোসর হ'লেন। প্রিয়ার অভিভাবক হলেন তাঁর বৃদ্ধ ভাসুর। ওঁরা আইন অমান্য আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে কলকাতায় এসে উঠেছেন অপূর্ব মিত্র রোডের পশ্চিম কোণের একতলা বাড়িতে। সেখানে দুটি ঘরভাড়া নিয়েছেন ও'র ভাসুর পণ্ডিত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয়। তিনি পূজাপার্বণে পুরোহিতের কাজও করেন। শুদ্ধাচারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।

এ বাড়ি হয়ে উঠল নারীরাজ্য। মা, দিদি, শোভা, সুধা, দিদির তিনটি ছোট ছোট মেয়ে,—বড়টির নাম কমলা, মেজবউদি,—এবার এলেন প্রিয়া। প্রিয়া সকলেরই প্রিয়। আমার বিশেষ প্রিয় এই কারণে যে, আমাকে প্রায়ই ও'কে সঙ্গে নিয়ে হাজরা রোড ছেড়ে সতীশ মুখুজ্যের রোড ধরে সোজা দক্ষিণে গিয়ে কালীঘাট পার্কের বিপরীত দিকে অপূর্ব মিত্র রোডে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসতে হয়। ও পথ দিয়ে তখন বেশি রাত্রে যাওয়া-আসাটা খুব যুক্তিসঙ্গত নয়। ওদিকে আবছা আলো ছায়াপথে নৈশনারীরা ঘোরাফেরা করে এবং পুরুষমানুষেরা ওই পাড়ায় ইশারা-ইঙ্গিতে মেয়েদেরকে ডেকে নিয়ে যায়। পশ্চিম হাজরা রোড, কালীঘাটের ঘনবসতিপূর্ণ পাড়া, সতীশ মুখার্জি রোড, মনোহরপুকুর রোড ল্যান্সডাউন রোডের দক্ষিণাঞ্চল, নবকল্পিত লেক-এর অন্ধকার আশপাশ,—তখন নৈশনারী ও পুরুষদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। দিনের

আলোর চলাফেরায় গাড়ি-ঘোড়ায় কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকে সমস্তটাই যেন রহস্যাচ্ছন্ন হতে থাকে।

একদিন প্রতিবাদ জানালুম,—আমিই বা কেন এ-মেয়ে ও-মেয়ে সে-মেয়েকে পৌঁছিয়ে দিতে যাব? আমার কী দায়?

মক্ষীরানী হাসলেন। বললেন, তার কারণ আপনাকে কেউ পুরুষ মানুষ মনে করে না!

শোভা কিয়ৎক্ষণ আমার উত্তেজিত মুখের দিকে তাকালেন, তারপর খপ করে আমার একখানা হাত ধরে হিড়্হিড়িয়ে টেনে নিয়ে গেলেন দিদির কাছে। দিদি গল্প করছিলেন হেরম্বর সঙ্গে। আমার হাতের কব্জিটা দিদির সামনে বাড়িয়ে ধ'রে শোভা বললেন, আচ্ছা দিদি, দেখো ত—এ কি পুরুষ মানুষের আঙ্গুল। সব আঙ্গুল মোটা থেকে একেবারে সরু হয়ে এসেছে,—দেখলে ঘেন্না করে। কে বলবে পুরুষ মানুষ।

দিদি আবার ফোড়ন দিলেন,—আপনি একবারটি পুরুষ হন্ ত? এই দেখুন পুরুষ আমার পাশে বসা।

হেরম্বর দিকে চেয়ে আমরা সবাই হেসে উঠলুম।

একদিন আমাকে নিরিবিলিতে পশ্চিমের ছোট ঘরখানায় নিয়ে গিয়ে শোভা বললেন, 'মহুয়া'র সেই কবিতাটা আরেকবার আবৃত্তি করুন ত?

কোন্‌টা?

সেই যে "শরৎ আকাশ হেরো ম্লান হয়ে আসে/বাষ্প আভাসে দিগন্ত ছলো ছলো।"

আমি ও'র মুখের দিকে তাকালুম। সোজা নির্লজ্জের মতো তাকিয়ে রইলুম এই বিপ্রবাদিনীর চোখের দিকে। সে যেন ক্ষণকালের মধ্যেই অনন্তকাল। কী ছিল আমার সেই চাহনির মধ্যে আমি জানিনে, কিন্তু শোভা ক্ষিপ্ত হয়ে এক সময় বলে উঠলেন, ফাজলামি হচ্ছে, না? আমি কিন্তু উঠে চলে যাব।

বেশ ত, যান?

উনি যেতে পারলেন না। নড়তেও চাইলেন না। তখন আমি নরম গলায় একটু চাপা আবেগের সঙ্গে আমার কয়েকটি মুখস্থ কবিতা একটির পর একটি আবৃত্তি করে গেলুম।

একদিন শোভা বললেন, আচ্ছা, আপনি কি শুনেছেন, আমার একটা ভয়ানক অসুখ আছে?

অসুখ? সে কি? ফুলবাগানে সাপ?

আঃ, আবার আপনার তামাশা!—মনে রাখবেন এ অসুখ কারো সারে না। দেখছেন না ডাক্তারমামা এর চিকিৎসে করছেন?

বললুম, কি অসুখ?

বোধ হয় যক্ষ্মা! আমার কাছাকাছি যেন আসবেন না কোনদিন!

আমি এবার হেসে উঠলুম। বললুম, এবার যেন মনে হচ্ছে আপনিই ফাজলামি করছেন?

শোভা হেসে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। শ্রীমতী শোভাকে আমি বরাবরই আপনি বলে সম্ভাষণ করি—যদিও তিনি আমার চেয়ে বছর তিনেকের ছোট। এখানে সন্তারসের কথায় বলা চলত, আগুন আর ঘি। কিন্তু সমস্ত বছর ধরে দেখা গেল, আগুনও জ্বললো না, এবং ঘিও গললো না। প্রকৃতপক্ষে এই তরুণী নারীর মধ্যে দেখতে পেয়েছিলুম অনন্যসাধারণ চরিত্রবত্তা, শুচিশুদ্ধ সংযমের কাঠিন্য, শান্ত ও অবিচল দেশানুরাগ এবং বৈপ্লবিক আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা। এ মেয়ে আগে দেখিনি। ওঁদের সঙ্গে ১৯৩০ এইভাবেই কাটছিল।

কেন জানিনে, সমকালীন কোন কোন লেখকের প্রতি আমার মন বিরূপ হচ্ছিল। ওরা যেটুকু লেখক সেইটুকুই মানুষ, বাকিটুকু অন্যরকম। ওদের আচরণ কথায় কথায় বিরক্তিকে ঘুলিয়ে তোলে। সাহিত্য-বৃক্ষের এ ডাল থেকে ও ডালে লেখকরা তখন লাফালাফি করছিল। এটা কিন্তু লেখকদের অপরাধ নয়। এর মূলে ঘোরতর দারিদ্র। ওদের পক্ষে দু বেলা দু মুঠো খেয়ে বেঁচে থাকার প্রশ্ন। তখনকার দিনে লেখকরা হয়ত কোন-কোনও দৈনিক কাগজে দু'একটা কাজ জোটাতে পারত, কিন্তু তখন না ছিল রেডিও, না সিনেমায় কোনও ব্যবস্থা, না বা অধিক সংখ্যক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। তখন গুরুদাস, বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ডি-এম এবং বড়জোর শ্রীগুরু। কিন্তু শ্রীগুরু তখন বেচতো কমিশনে কতগুলি অপাঠ্য ধর্মগ্রন্থের জঞ্জাল। অথচ ওই জঞ্জালগুলি শরৎ চাটুয্যের বইয়ের চেয়ে বেশি বিক্রি হ'ত। রবীন্দ্রনাথ তখন বিশ্বকবি, কিন্তু তাঁর তখন বাজার-মূল্য খুবই কম। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' লুকিয়ে কিছু বিক্রি হচ্ছে, কিন্তু চার টাকা দামের 'গৃহদাহ'র এডিশন্ পাঁচ সাত বছরেও ফুরোয় না। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' ডি-এম বার করেছে তিন টাকায়—লাল মলাটের বই। কিন্তু কে কত কিনছে? বিভূতিভূষণও তখন এখানে ওখানে ঘুরছেন ফ্যা ফ্যা করে। কলকাতার পথে-পথে তাঁর সম্বল হ'ল দু' পয়সার চানাচুর ও ছোলাভাজা আর তাঁর বন্ধু ব্যারিস্টার নিরোদ দাশগুপ্ত বা 'বিচিত্রা'র কর্তা সুশীল মিত্তর ওখানে নিমন্ত্রণ পেলে ভাল মন্দ খাওয়া-দাওয়া! বিভূতিভূষণ তখন থাকতেন মির্জাপুর স্ট্রীটের এক মেস। তাঁর সম্বল ছিল একখানা কাঠির মাদুর, ময়লা একটা বালিশ আর একটা পুঁটুলি। কিন্তু সমগ্র লেখক সমাজে এমন শুদ্ধচিত্ত এবং মধুর চরিত্রের মানুষ আমি আর দেখিনি। তাঁর কথা পরে বলব।

গুরুদাসে তখনও আধুনিক কোনও লেখক ঢোকেনি, কেবল 'ভারতবর্ষ' মাসিকে আমাদের কয়েকজনের দু-একটা করে ছোট গল্প ছাপা হয়েছে। ডি এম লাইব্রেরীতে বই দিতে গেলে অল্পবিত্তর অনেককেই মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে হয়। বরেন্দ্র লাইব্রেরী ফর্মা গুণে তবে দাম কষে। কমলিনী সাহিত্য মন্দিরে তখন নারায়ণ ভট্টাচার্য, সুরেন ভট্টাচার্য, নরেশ সেনগুপ্ত এবং 'ভারতী' গ্রুপের খাতির বেশি। কিন্তু আমরা যাব কোন্ চুলোয় এবং কোন্ প্রকাশকের তাড়া খেতে? সুতরাং লেখকরা চেয়ে থাকত পুজো সংখ্যা সাময়িক পত্রিকাগুলির দিকে। ছোট গল্পের সমাদর সাময়িক পত্রিকায়,

কারণ ছোট এবং গল্প, এ দুটোতে পাঠকরা খুশি। কিন্তু এক গোছা ছোট গল্প নিয়ে যদি বই আকারে কোন প্রকাশককে ছাপতে অনুরোধ করো তবে ওই ডি এম লাইব্রেরীর কৃষ্ণকর্তার মতো দোকানে বসতেও বলবে না অথবা এক পেয়ালা চা অফারও করবে না। বরং যে দরজা দিয়ে তুমি দুঃসাহসের সঙ্গে ঢুকেছ সেই দরজাটার দিকেই তিনি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

এই সব কারণে নতুন লেখকদের পক্ষে তখন 'টিকে ধরাতে জামিন' লাগত। কোনও তরুণ লেখক বা কবি বা সাহিত্যকর্মী তখনও সামাজিক বা সাংস্কৃতিক স্বীকৃতিলাভ করেনি। সাহিত্য সম্মেলনে তাদেরকে কেউ ডাকে না, তারা কেউ গাড়ি-চাপা পড়লে কেউ খোঁজ করে না, মারা গেলে কোনও কাগজে সংবাদ ছাপা হয় না, অন্নসংস্থানের জন্য ঘুরে বেড়ালে কেউ ডাকে না! অমন যে অচিন্ত্য, বাঙলা সাহিত্যে যে-ছেলে এনেছে অভিনব লিখন ভঙ্গী তার কোনও কদর নেই প্রকাশক সভায়। অমন যে শক্তিমান লেখক প্রেমেন, তার ছোট গল্প আর কবিতার তারিফ কি বন্ধুমহলে কিছু কম? কিন্তু তার কোনও বাজার নেই! শৈলজানন্দ—যে কয়লাকুঠি আর গরীবদের গল্প লিখে একপ্রকার যুগান্তর আনল তার অভাব-অভিযোগ লেগেই রয়েছে। অমন যে বুদ্ধদেব—ইংরেজী এম-এ পরীক্ষায় যে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, যার জুড়ি নেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, যে তার 'বন্দীর বন্দনা' লিখে নতুন কাব্যযুগের প্রবর্তন করল, তার না আছে বাজার, না যোগ্য সমাদর। এর ওপর আবার 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে'। প্রতি সাহিত্য সম্মেলনে এবং বাৎসরিক 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে' 'কল্লোল-কালিকলম' গোষ্ঠীর তরুণ লেখকদেরকে গালাগালি দিয়ে আসা! অর্থাৎ এরা সব 'মায়ে-তাড়ানে বাপে খেদানে' লেখকগোষ্ঠী। সম্প্রতি মুজাফফরপুরের এক সাহিত্য সভায় 'মা' উপন্যাসের লেখিকা শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী থামোকা আমাকে গালি দিয়ে বলেছেন তিনি আমার মা হলে আঁতুড়েই আমাকে নুন খাইয়ে মারতেন! এর উত্তরে আমি কোনও একটি কাগজে মন্তব্য করলুম, সেই মা কী প্রকার, যে-মা তাঁর সদ্যোজাত সন্তানকে নুন খাইয়ে মারতে বাধ্য হন?

এই মন্তব্যটি প্রকাশ করা আমার পক্ষে উচিত হয়নি। কিন্তু তখন আমার তরুণ রক্তে কিছু অগ্নির প্রবাহ ছিল। ঔপন্যাসিক সৌরীন মুখুজ্জে মশায় এই নিয়ে বসুমতীতে আমার বিরুদ্ধে লেখেন।

'কল্লোল'-এর মৌচাক তখন ভেঙ্গে যাচ্ছিল। মৌমাছিরা তখন জোড়ায় জোড়ায় মধুর লোভে ফিরছিল। গুপ্ত ফ্রেন্ডস-এর প্রকাশক হাস্যরসিক আশু ঘোষের দোকানের সামনে দিয়ে লেখকরা যখন জুড়ি বেঁধে যায়, আশু তাদের ডেকে চা খাওয়ায় এবং হাসি পরিহাসের সঙ্গে গালি দেয়। ওই পরিহাসের ভয়ে কবি জসীমউদ্দীন ওপাড়া মাড়ায় না, সে তখন 'পল্লীকবি' হয়ে উঠছে!

আমি তখন 'বিজলী' আর হাজরা রোড নিয়ে মেতে আছি। তরুণ-বয়স্ক বিপ্লব-বাদী ছেলে আর মেয়েদের কর্মপদ্ধতি নিয়ে মাথা ঘামাই। ওরা কোথায় যায় সঙ্গোপনে, কার কাছে কে 'মেসেজ' নিয়ে যাচ্ছে কীভাবে, দীনেশ মজুমদারকে কোথায় কিভাবে

রাখা হয়েছে, সতীন সেন সঙ্গোপনে কোথায় এসে উঠেছেন, লুল্টুবার সাংকেতিক নাম কে কি ভাবে ব্যবহার করছে এবং সূর্য সেন পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে কোথায় কি ভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন—এই সব খোঁজখবরের মধ্যে আমি থাকি। এদিকে আমি অতিশয় ভীরু,—পুলিস 'একবার ছুঁলে আঠারো ঘা'—এটি মর্মে মর্মে বুঝি। একদিকে বারীন ঘোষের সঙ্গে মাখামাখি, অন্য দিকে হাজরা রোডের বাড়িতে নিত্য নিয়মিত আনাগোনা—সুতরাং আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে আসছে! ওদেরই ফাঁকে ফাঁকে যাই নাট্যমন্দিরে, নয়ত যাই বাওয়ার কিংবা টাওয়ার ক্যানটন হোটেলে—নতুন গল্প লেখার দরুন টাকাটা ফুঁকে দিয়ে রাত এগারোটায় 'বিজলী'র ডেরায় এসে উঠি। গোয়েন্দারা বোধ হয় বিশ্বাস করে আমি কাপুরুষ, কিন্তু আমার ধারণা আমি কুপুরুষ! যাই হোক, এরই ফাঁকে যদি অবসর পাই তখন হিজিবিজি নিজের লেখা লিখি। আর্থিক অবস্থা মধ্যে-মাঝে বেশ সচ্ছল হয়ে ওঠে। অনেক দিন হয়ে গেল আমি বাড়ি ছাড়া। তবে মাঝে মাঝে মা এসে দেখে যান।

এরই মধ্যে একদিন একটি ছোট্ট ঘটনা ঘটল। আমার পক্ষে অবিশ্বাস্য ছিল, কোনও বয়স্ক যুবক কোনও তরুণী যুবতীর পায়ের ধুলো নেয় ভক্তিগদগদ হয়ে, বিশেষ করে উভয়ের মধ্যে যদি কোনও আত্মীয়-কুটুম্বিতার সূত্র না থাকে। হাজরা রোডের বাড়িতে একদিন ভরা দুপুরে জনৈক সুশ্রী, বলবান ও পেশীবহুল স্বাস্থ্য নিয়ে একটি আমার বয়সী যুবক সোজা উপরে উঠে এসে শ্রীমতী শোভার ঘরে ঢুকল এবং শ্রীমতী তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ করে দিলেন ভিতর থেকে। আমি একটু অবাক হলুম বই কি। আমি ক্ষুদ্রচিত্ত, আমার পাপ মন। যাই হোক, আমি ওঘরে গিয়ে দিদির কাছে বসে গেলুম এবং আমার দিন-তিনেক এ বাড়িতে না আসার জন্য দিদি তাঁর ছোট ভাইকে পাঠিয়ে ছিলেন 'বিজলী' আপিসে—তাই নিয়ে হাসি-তর্ক আরম্ভ হয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে দরজা খুলে আমাদেরই চোখের সামনে দিয়ে সেই অতি রূপবান ও স্বাস্থ্যবান যুবকটি নতমস্তকে বেরিয়ে নিচে নেমে গেল। বোধ হয় মিনিট দুই। তারপরেই শ্রীমতী শোভা এসে আমার হাতখানা ধরে তুলে সেই পশ্চিমের ছোট ঘরে নিয়ে গেলেন এবং ওই অল্পকালের স্পর্শের মধ্যেই উপলব্ধি করলুম, তাঁর হাতখানা কাঁপছিল! ঘরে যখন নিয়ে এলেন তখন তাঁর সেই চেহারা এর আগে দেখিনি। এ যেন দশমহাবিদ্যার সেই আরক্তিম চণ্ডীর রূপ! বোধ হয় কেঁদে ছিলেন একটু আগে। দুই রাঙা চোখ রগড়িয়ে ঘষে মোছা। কিন্তু তিনি অবরুদ্ধ উত্তেজনাটা দমিয়ে রেখে শুধু ভাঙা গলায় বললেন, সেই কবিতাটা আরেকবার বলুন ত? সেই যে সেই "জীবন সঁপিয়া জীবনেশ্বর পেতে হবে তব পরিচয়/তোমার—"

না, আমি পারব না, আমি মেসিন নই। দম দিলেই আমি ঘুরিনে! আমি বেঁকে বসলুম।

উনি হঠাৎ দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে যা উনি কোনদিনই করেন না, তাই ওঁকে করতে দেখলুম। আমি একেবারে অবাক। উনি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে

ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু এবার ত কাপুরুষের পালা! আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গেলেই ত মেলোড্রামা! সে আমি পারব না। বরং ঈষৎ কঠিন কণ্ঠে বললুম, ও ভদ্রলোক কে তখন এসেছিলেন? আপনি ত বেশ সহজ ছিলেন দু' ঘণ্টা আগে!

ও আর আসবে না কোনদিন!

শ্রীমতীর কথায় তৎক্ষণাৎ মূল কথাটা বুঝে নিলুম। সেই চিরকালের পুরনো গল্প! বললুম, ও এই! বেশ ত, তার জন্য ওই কবিতাটা কেন, বরং 'মহুয়া'র একটা কবিতা—'

না, না—ওই কবিতাটাই বলুন—অধীর আবেগে শ্রীমতী শোভা বললেন আপনার গলার ভেতর দিয়ে আমার বুকের রক্ত উঠে আসুক! ও আমার ছোট ভাই নির্মল সেন, ও আর ফিরবে না কোনদিন!

আমি তৎক্ষণাৎ আবেগের সঙ্গে ওখান থেকেই কবিতাটার শেষাংশ ধরে নিলুম, "জীবন সঁপিয়া জীবনেশ্বর পেতে হবে তব পরিচয়/তোমার ডঙ্কা হবে যে বাজাতে সকল শঙ্কা করি জয়/ভালোই হয়েছে ঝঞ্ঝার বায়ে প্রলয়ের জটা পড়েছে ছড়ায়ে/ভালোই হয়েছে প্রভাত এসেছে মেঘের সিংহবাহনে/মিলন যজ্ঞে অগ্নি জ্বালাবে বজ্রশিখার দাহনে।"

এই সামান্য ঘটনাটুকুর অল্প কিছুকালের মধ্যে চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইংরেজ পুলিস ও সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে নির্মল সেন নিহত হন। এবং এরও কিছুদিন পরে চট্টগ্রাম পাহাড়তলীর ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ করেন শ্রীমতী প্রীতিলতা ওয়াদেদার। তিনি ধরা পড়ার আগেই বিষ খেয়ে আত্মনাশ করেন। সমগ্র ভারত এই দুই তরুণ তরুণীর প্রতি প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে। সেদিন আরেকবার আমরা বিপ্লব নেতা সূর্য সেন বা মাস্টারদার উদ্দেশে নমস্কার জানালুম। যাই হোক, বোমা নিক্ষেপ ও গুলী বিনিময়ের ফলে বহু ইংরেজ রাজপুরুষ হতাহত হন। কিন্তু এই দুই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ তরুণ-তরুণীকে নিয়ে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোট উপন্যাস, 'চার অধ্যায়' লিখেছিলেন কিনা সে আমার জানা নেই।

এই সময়টায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কর্তৃপক্ষের মধ্যে ছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় বিপ্লবীকর্মী মাখনলাল সেন মহাশয়। ওঁদের কেউ কেউ অনুযোগ করেন নব্যকালের লেখকরা দেশের এই রাজনীতিক ঘনঘটার মধ্যে সময়োপযোগী সাহিত্য রচনার প্রয়াস পাচ্ছে না কেন? তারা কোথায়? কী করছে তারা?

তাঁদের অনুযোগটি আমার মনে ছিল।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় যখন প্রবল আন্দোলন চলছে, যখন বয়কট, পিকেটিং, মিছিল, ধরপাকড়, লাঠি চার্জ ইত্যাদি ঘনীভূত হচ্ছে সেই সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে অনেকগুলিকে গ্রেপ্তার করে পুলিসের ট্রাকে তুলে গাড়ি চালানো হয়। কিন্তু সেই ট্রাকের ওপরেই জনৈক শ্বেতচর্মী সার্জেণ্ট একটি ছেলেকে মারধর করতে থাকে এবং ধাক্কাধাক্কির ফলে ছেলেটি চলন্ত ট্রাক থেকে ট্রামলাইনের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে যায় এবং তার মাথা ফাটে। আমি সেদিন সন্ধ্যারাত্রে যখন হাজরা রোডের বাড়িতে উপস্থিত, তখন একটি শীর্ণকায় মহিলা আহত ওই তরুণ যুবককে সঙ্গে নিয়ে ওখানে

হাজির হন। দেখলুম ছেলেটির মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা এবং সর্বাঙ্গে কালশিরার দাগ। ছেলেটির নাম মাখন আর মহিলার নাম বোধ হয় মলিনা। উভয়ে সহোদর ভাই-বোন। ওরা বড়ই গরীব। ভাইটিই হল বড় বোনের একমাত্র সম্বল। কিন্তু মলিনার বোধ হয় একটু মাথায় ছিট ছিল। তিনি চিৎকার করে এই অত্যাচারের প্রতিকার দাবি করলেন। প্রতিকার? শ্রীমতী শোভা আমার দিকে চেয়ে শুধু হাসলেন!

এই ঘটনারই বছর দুই পরে কাশীতে একদিন সকালে হরিশ্চন্দ্র ঘাটের কাছে একটি মেয়েছেলে হঠাৎ আমাকে চিনলো। চেয়ে দেখি সেই মলিনা। পরনে ছিন্নভিন্ন জীর্ণ একখানা শাড়ি, ওতে লজ্জানিবারণ হয় না। চেহারা কর্কশ, চাহনি বন্য।

মনে পড়ছে আমাকে?

বললুম, হ্যাঁ, মাখন কোথায়?

মাখন? আসুন আমার সঙ্গে।—মলিনা আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

শিবালার ওদিকে এক সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে একটি পুরনো বাড়ির নিচের তলায় একটি খুপরি ঘরে সে আমাকে এনে তুললো। ঘরে কেবল সরু একখানা নড়বড়ে তক্তা, উপরে ময়লা বিছানা পাতা। একধারে দু-তিনটে হাঁড়িকুড়ি, একটা তোলা উনুন, সামান্য রান্নাখাওয়ার সরঞ্জাম। মলিনা বলল, আমি হয় কেদার নয়ত বিশ্বনাথের গলিতে গিয়ে বসি। যে যা ভিক্ষে দেয়।

বলতে বলতে সে উবু হয়ে বসে তক্তার তলা থেকে একটা হাঁড়ি টেনে বার করল, তার মধ্যে দেখলুম, একটা মড়ার মাথার খুলি! বড় বড় দুটো চোখের গহ্বর, মুখের ও দাঁতের বীভৎস দৃশ্য!

এই আমার ছোট ভাই মাখন! গত বছরের গোড়ায় সে এক সার্জেণ্ট খুনের ঘটনায় জড়িয়ে আমাকে নিয়ে লুকিয়ে কাশীতে আসে। এখানকার পুলিস খবর পায়। যখন ওরা বাড়ি ঘেরাও করে তখন সে পিছলিয়ে ঘাটের দিকে পালায়। সেদিন খুব বর্ষা, বিকেল বেলার দিকে অন্ধকার। মাখন সাঁতার কেটে ওপারে পালাতে চেয়েছিল। পুলিস সেই জলের মধ্যেই গুলী চালায়। দু' ঘণ্টার মধ্যে মাখনের মড়া ভেসে উঠে কেদারঘাটে আটকিয়ে পড়ে। সেদিন শেষ রাত্তিরে ওই গঙ্গায় মাখনের মড়া বুকে নিয়ে কেঁদে বলেছিলুম, যতদিন দেশ স্বাধীন না হয় ততদিন মাখনের মাথার খুলি আমি রেখে দেবো!

এই পাগলিনীকে নিয়ে তৎকালে আমি একটি ছোট গল্প লিখেছিলুম। নাম দিয়েছিলুম 'অপর্ণা'। গল্পটি আনন্দবাজারের একটি বিশেষ সংখ্যায় ছাপা হয়। পরে শুনেছি ওটি কর্তৃপক্ষের ভালই লেগেছিল।

এদিকে বারীনদার কল্যাণে 'বিজলী'র নাভিশ্বাস দেখা দিচ্ছিল এবং আমি তার অন্তিমকালে অক্সিজেন প্রয়োগ করছিলুম। বারীনদার 'আত্মকথা' জনসমাজে কতকটা তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করছিল। তাছাড়া ইংরেজ শাসকবর্গের অন্যতম মুখপত্র দৈনিক স্টেটসম্যানে তিনি লিখতে আরম্ভ করায় তাঁর দুর্নাম ও অপযশ রটছিল প্রচুর। এ ছাড়াও তাঁর আইন অমান্য আন্দোলনবিরোধী রচনাগুলো এবং গান্ধীজীর প্রতি

শ্লেষোক্তি কেউ বরদাস্ত করতে পারছিল না। আমার ভবিষ্যৎ আবার অনিশ্চিত হয়ে উঠল।

॥ ৩১ ॥

যতদূর মনে পড়ছে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বারীন ঘোষ মহাশয় তাঁর 'বিজলী' সাপ্তাহিকখানি হস্তান্তরিত করলেন। যাঁদের হাতে দেওয়া হ'লো, তাঁরা দু'জনেই আমার তরুণ বন্ধু—দেবজ্যোতি বর্মন ও বীরেশ মজুমদার। দেবজ্যোতি তখন বার দুই মাত্র দুটি বিষয়ে এম-এ পাস করেছে এবং সে একজন সাংবাদিক হয়ে উঠছে। 'বিজলী' হাত ছাড়া হবার পর আমি বাঁচলুম। সোজা কাশী গিয়ে দু'চারদিন ধ'রে কেদারঘাটে ডুব দিলুম, ভাঙের সরবৎ-সহ খোয়াক্ষীরের নাড়ু ও কালীতলার রাবড়ি মনের আনন্দে চেটে খেলুম এবং কয়েকদিন সুধাদার ঘরে বসে কাব্য সাহিত্য ইতিহাস দর্শনের সহিত বেদান্তের ব্যাখ্যা শুনতে বসলুম। সুধাদা আমাদের কাছে কোনদিন পুরনো হননি। আমরা রসবোধের দিক থেকে তাঁর মধ্যে নতুন-নতুন আকর্ষণের উপকরণ খুঁজে পেতুম। এই সময় আমার মাসতুতো ভাই প্রভাসের স্ত্রী শ্রীমতী অনিতা ওরফে দুর্গাঠাকরুন কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তাঁর পিত্রালয় দেবনাথপুরায় চলে যান।

তৎকালে কাশীতে খ্যাতনামা কীর্তনবিশারদ রামকমল ভট্টাচার্য মশায় কীর্তন গান করতেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শ্রাদ্ধবাসরে কীর্তন গান করার ফলে রামকমলের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই কীর্তন গান ধরেছিলেন দেশবন্ধু ও বাসন্তী দেবীর কন্যা শ্রীমতী অপর্ণা রায় ও এই সব আসরে ব'সে তৎকালে পাখোয়াজ ও খোল বাজাতেন নাটোরের মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায়। ভবানীপুরের সেই কীর্তনের আসর কলকাতার মস্ত আকর্ষণের বিষয় ছিল। পরবর্তীকালে যোগীনবাবুর সঙ্গে আমার বিশেষ হৃদ্যতা ঘটে।

সেবার কলকাতায় ফিরে খবর পেলুম, জনৈক বৈদ্যনাথ বিশ্বাস আমার খোঁজ-খবরের জন্য ছুটোছুটি করছেন। আমাকে তাঁর অত্যন্ত দরকার। কে তিনি আমি জানিনে, তবে তিনি তাঁর সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাড়ির ঠিকানা রেখে গেছেন। আমি যেন ফিরেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি। সুতরাং তাঁকে আমি চিঠি দিলুম।

একদিন দেখলুম একখানা মোটর গাড়ি এসে আমাদের গলির মুখে দাঁড়ালো এবং তাঁর টুপিওলা ড্রাইভার আমাকে ডেকে নিয়ে তার গাড়িতে তুললো। গাড়িখানা দেখে ভাবলুম, দরিদ্র এক লেখক হিসেবে এর তলায় আমার চাপা পড়ার কথা ছিল, দৈবাৎ এর ভিতর চড়ে বসলুম। দামী গাড়িতে চড়ে যাবার কালে কোনও চেনা লোক আমাকে দেখলে বড়ই পুলকিত হই। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সেই দুপুরে কারও চোখেই পড়লুম না। গাড়িখানা যখন বহুবাজারে এসে লালবাজারের দিকে যাচ্ছে, তখন একবারটি সন্দেহ হচ্ছিল, পুলিসে নিয়ে যাচ্ছে নাকি? কিন্তু প্রায় বেণ্টিক স্ট্রীটের মোড়ের কাছাকাছি গাড়িখানা বাঁ দিকে থামল, এবং ড্রাইভার আমাকে বল্লে

দিন উল্টো দিকের তেতলা বাড়িতে উঠে যান, ওখানে দোতলার আপিসে আপনার জন্য ওঁরা অপেক্ষা করে রয়েছেন। সামনেই সিঁড়ি। হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ অ্যাসুরেন্স লিঃ। ৩০৯, বহুবাজার স্ট্রীট। দক্ষিণ-মুখো বাড়িখানার দোতলায় উঠে গিয়ে দেখি মস্ত আপিস। সামনে বসে আছেন সৌম্যদর্শন প্রবীণ এক ভদ্রলোক, এপাশে আরেক-জন যেমন-তেমন ব্যক্তি। ওঁরা বুঝেই নিলেন আমি কে। যেমন-তেমন লোকটির নাম বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, আর ওই যিনি রাশভারী—ওঁর নাম পূর্ণচন্দ্র রায়।

যথারীতি অভ্যর্থনার পর ওঁরা বললেন, আমার পরিচালিত 'বিজলী' নিয়মিত পড়ে ওঁরা খুব আনন্দিত এবং উৎসাহিত। এখানেই 'উপাসনা' মাসিক পত্রের আপিস। কিন্তু 'উপাসনা'র সম্পাদক সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এখন আর নেই। সুতরাং আমি উপাসনায় যোগদান করতে পারি কিনা। দ্বিতীয়, বৈদ্যনাথ বিশ্বাস আরেকখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করতে চান এবং আমি তার সম্পাদকীয় দায়িত্ব নিলে তিনি সুখী হবেন। আপাতত আমাকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা করে দেওয়া হবে।

ভেবে দেখলুম কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতি ধূপছায়া—একে একে সব কাগজ বন্ধ হয়ে গেছে। বিজলীরও ভরাডুবি ঘটল বারীনদার কল্যাণে। আমার তত্ত্বাবধানে 'দুন্দুভি' নামক সাপ্তাহিকেরও ভরসা কম। নজরুল আমাকে পরিহাস করার জন্য 'দুন্দুভি' নামটা বিকৃত করে একটি অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করে। ও কাগজে আমি 'শাদা চোখে' নাম দিয়ে সম্পাদকীয় লিখি—যেমন লিখতুম 'বিজলী'তে। কিন্তু এবার আমি আর নিজের কথা ভাবব না। অনেক ভেবেচিন্তে আমি বললুম, আপনাদের প্রস্তাব আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারি শুধু একটি শর্তে, আপনারা লেখকদের লেখার জন্য পারিশ্রমিক দেবেন এবং তার পরিমাণ আমি স্থির করব। শুধু আমার নিজের লেখার জন্য আমি পারিশ্রমিক নেবো না। যদি রাজি থাকেন আমাকে নিয়োগ-পত্র দিন। ওঁরা তখনই রাজি হলেন এবং আমাকে চিঠি দিলেন। এইরূপ স্থির হ'ল, ছোট গল্প বা ভাল প্রবন্ধের জন্য দশ টাকা এবং কবিতার জন্য পাঁচ টাকা দেওয়া হবে। তবে নজরুলের কবিতার জন্য দশ টাকা দেওয়া চাই। ওঁদের ইচ্ছা, সামনের বৈশাখেই যেন কাগজ বেরোয় এবং সেই মাসিকপত্রের নামকরণ আমিই যেন করে দিই।

আমি নাম রাখলুম 'স্বদেশ'।

কথাবার্তার পর বৈদ্যনাথবাবু আমাকে তেতলায় নিয়ে গেলেন তাঁর আপিসে। এটা মস্ত বড় একটা হ'ল। একধারে আমার আপিস হবে, এবং আপাতত আমার সহকারী হবে দু'জন। একজনের নাম ভোলানাথ বিশ্বাস, অন্যজন কি যেন—নাম ভুলে গেছি। এটি লক্ষ্য করলুম, মাইনে মাত্র পঞ্চাশ টাকা হলেও ওঁরা আমাকে একটা উঁচু পজিশন দিতে চান।

কোথা থেকে কোথায় এসে দাঁড়ালুম এটি তলিয়ে বুঝবার আগে একটির পর একটি ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল! দিন আষ্টেক পরে আবার এসে দেখি, আমার আপিস একেবারে সুসজ্জিত। লম্বা-চওড়া এক দেরাজওলা টেবিল, খান আষ্টেক চেয়ার, গোটা চারেক র‍্যাক, মস্ত দুটো কাঠের আলমারি, তার পাশে ছোট টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম,

আমার বড় টেবিলের ওপর কাচের দোয়াতদান, পেতলের কয়েকটা পেপারওয়েট, অ্যাশ-ট্রে, চিঠিপত্রের জন্য কাঠের বাক্স, টেবিলের পাশে মেঝেতে নতুন ওয়েস্টপেপার বাস্কেট, হাতের কাছে টেলিফোন,—এবং কী নেই? শুধু কি তাই? সবাই আমাকে দেখে একেবারে জোড়হাত! কাচের পার্টিশনের পাশে আমার সহকারী কৃষ্ণকান্ত, ভোলানাথ আর সুধীর মিস্তির। একটা ছোকরা বেয়ারা হুকুমের অপেক্ষায় বশম্বদ। আমাকে আর প্রুফ দেখতে হবে না, ছাপাখানায় ছোটবার দরকার নেই, ধার দেনা নিয়ে অন্য লোক ভাববে, বিজ্ঞাপন আসবে অজস্র। আমি কেবল লেখা ও লেখকদের নিয়ে থাকব এবং কেবল হুকুম করে যাব। যখন খুশি চা, পান ও সিগারেটের অর্ডার দেবো। আমার মাথার ওপর পাখা ঘুরছে, এবং আমার মুখের সামনে দামী টেবল ল্যাম্প জ্বলছে। 'বিজলী'তে ছিলুম 'মধো', এখানে আমি 'মধুসূদন'।

এইখানে বসেই আমি স্থির করলুম, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, পরিচয়, বিচিত্রা, উদয়ন—এইসব মাসিক পত্রগুলির উপর আমি টেক্কা দেবো এবং বাঙ্গলার প্রত্যেক আধুনিক লেখককে 'স্বদেশ'-এর সঙ্গে বেঁধে রাখব। যে লিখবে সেই পারিশ্রমিক পাবে। এবার থেকে কবিতার জন্য পারিশ্রমিক দেবো—যা নজরুল ছাড়া কেউ কোনদিন পায়নি। কল্লোল-কালি-কলমের পর নতুন করে আবার দল বাঁধব, আবার নতুন এক গোষ্ঠী তৈরি করব। কাঠবিড়ালী হয়ে সাগর বাঁধব!

প্রগতির বুদ্ধদেব, কল্লোল এর অচিন্ত্য, ধূপছায়ার পাঁচুগোপাল, প্রণব রায় আর সুনীল ধর, বঙ্গবাণীর বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, লিবার্টির প্রমোদ সেন, সত্যেন বসু, নীহাররঞ্জন রায়, নতুন উঠতি লেখক মানিক—এদের সবাইকে ডাকলুম। হাতের তাস ছিল বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, জসীমউদ্দীন, মন্মথ রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, আবদুল কাদের, বন্দে আলী মিঞা, শৈলজানন্দ, মহেন্দ্র রায় প্রভৃতি। রংয়ের গোলাম ছিল নজরুল। দেখি যদি রবি ঠাকুরের দু'একটা আশীর্বাদী কবিতা আনতে পারি। না, শরৎ চাটুয্যেকে বাগানো যাবে না। সেবার নলিনীকান্ত সরকারের মুখে শুনেছিলুম, কবে যেন তিনি শরৎবাবুকে চা খাওয়াবার লোভ দেখিয়ে একটা ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়েছিলেন। অতঃপর চেঁচামেচি হই-চই। অবশেষে জানলায় মুখ রেখে বাইরে থেকে নলিনীদা বললেন, দাদা, আমার কাগজটির জন্য একটি ছোটখাটো লেখা না লিখলে আপনার মুক্তি নেই। ওই ওখানে রয়েছে দোয়াত-কলম আর কাগজ। জানলা গলিয়ে চা দেবো যত খুশি খান।

শরৎবাবু একটা প্রবন্ধ লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন।

যাই হোক, 'স্বদেশ' নামক নতুন মাসিকপত্র বেরোচ্ছে এবং কুখ্যাত অতি-আধুনিক লেখকরা আবার জোট বেঁধে কাগজে যা খুশি লিখবে, এজন্য একটা সাড়া পড়ে গেল। আমি গেলুম আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন মজুমদার ও তাঁর সহকারী তরুণ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অরুণ মিত্রের কাছে। সত্যেনদা রক্ষণশীল সমাজ মনের প্রতি খড়্গহস্ত ছিলেন, এবং বিবেকানন্দ অতি আধুনিকদেরই একজন উদীয়-মান কবি ও সাংবাদিক—সত্যেনদার উপযুক্ত সাকরেদ। অরুণ ছিল মিষ্ট-মধুর

প্রকৃতি এবং সত্যেনদার মানসপুত্রের মতো। তখনও পর্যন্ত সত্যেনদাকে নিয়ে সাংবাদিক মহলে একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসি পরিহাস ছিল। ঘটনাটি বোধ হয় ১৯২৩ কি ২৪ খ্রীষ্টাব্দের। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মফঃস্বলের এক রাজনীতিক সম্মেলনে গিয়েছেন। ফিরবার পথে ঘোড়ার গাড়িতে তিনি ফিরছিলেন। ওই গাড়িতেই উঠেছিলেন তৎকালীন মহিলা নেত্রী সন্তোষকুমারী গুপ্তা। এই নিয়ে সত্যেন মজুমদার আনন্দবাজারে ঈষৎ পরিহাস করেছিলেন। সেই পরিহাস শ্রীমতী গুপ্তা বরদাস্ত করেন নি। তিনি কলকাতা ফিরে কয়েক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে সোজা মির্জাপুর স্ট্রীটে আনন্দবাজার আপিসে গিয়ে সত্যেনদার গালে একটা না দুটো চড় বসিয়ে দেন! এ নিয়ে চারদিকে হই-চই পড়ে যায়।

অতঃপর একে একে গেলুম লিবার্টি, বঙ্গবাণী, নবশক্তি, অ্যাডভান্স ইত্যাদির আপিসে। এঁদের প্রত্যেকের সম্পাদকীয় দপ্তরে আমাদের বহু বন্ধু-বান্ধব ছিলেন। সুতরাং 'স্বদেশ' পত্রিকার প্রচারকার্যের পক্ষে কোনও অসুবিধা ছিল না। আমি কোমর বেঁধে কাজে লেগেছিলুম।

আমার প্রাত্যহিক কর্মে, কথাবার্তায় ও সহায়তায় তখন এসে পড়েছিল সাহিত্যিক-বন্ধু ভবানী মুখোপাধ্যায়। সে রেল আপিসের কর্মী, স্বভাবমধুর এবং সুখ-দুঃখের সহচর। তাকে সময়মতো না পেলে অনেক কাজই অসমাপ্ত থাকে। এরই মধ্যে একদিন 'স্বদেশ' আপিসে এসে একখানা চিঠি পেলুম, লিখে রেখে গেছেন শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। লিখেছেন আজ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম। বিশেষ দরকার ছিল। আসছে কাল আবার আসব।

সেটা ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ। সেই প্রথম তারাশঙ্করের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। তখন কলকাতায় কারও সঙ্গে তার পরিচয় নেই। তার দু'টো ছোটগল্প 'রাইকমল' বা 'রসকলি' আর 'হারানো সুর' স্বল্প প্রচারিত কল্লোলে প্রকাশিত হবার পর থেকে সে নিরুদ্দেশ হয়। কলকাতায় সে কচিৎ কখনো আসে। এখানে তার কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই। লেখক বলে তাকে কেউ চেনে না। সে আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ,—শৈলজা ও নজরুলের সমবয়সী। অনেকদিন পরে তারাশঙ্কর বরানগরে একটি ছোট্ট পুরনো বাড়ি সস্তায় কেনে এবং সেখানেই থাকতে আরম্ভ করে। অতঃপর সে একে একে সরোজ রায় চৌধুরী, কিরণকুমার রায়, পবিত্র, শিবরাম ও সজনীকান্তর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়। সজনী তার প্রতিষ্ঠালাভের ক্ষেত্রে অনেকটা সহায়তা করে। তারাশঙ্কর কতকটা নীতিপরায়ণ, আদর্শান্বেষী ও জাতীয়তাবাদে একনিষ্ঠ ছিল। আমাদের মতোই অভাব-অনটনে তার জীবন বিপর্যস্ত হ'ত।

যাই হোক, ফিরে আসি অন্য প্রসঙ্গে। ১৯৩১-এর এই বছরে ২৬ জানুয়ারী তারিখটি 'প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতা দিবস'রূপে পালন করার জন্য দেশব্যাপী আয়োজন চলছিল। সেদিন লক্ষ লক্ষ লোকের জনতায় সমগ্র এসপ্ল্যানেড কার্জন পার্ক হোয়াইটওয়েলেড-ল'র নিচের চৌমাথা মনুমেন্টের তলার মাঠ,—সমস্ত ভরে যায়। চারিদিকে ঘন ঘন আকাশ-বাতাস মুখরিত হচ্ছে 'বন-দে-মাতরম' ধ্বনিতে। অহিংস রণসজ্জায়

অগ্রসর হয়ে বাঙালী জাতি সেদিন কমিশনার টেগার্টের সশস্ত্র পুলিস বাহিনীর ১৪৪ ধারার ব্যূহ ভেদ করার জন্য এগিয়ে চলেছে। পুলিসের শত শত লাল পাগড়ি যেন শত শত রক্তবিন্দু! ওদের পাশে রয়েছে অগণিত সংখ্যক কালো কালো কয়েদীর গাড়ি। অন্য দিকে কর্ডন করে রয়েছে অসংখ্য শ্বেতাঙ্গ সার্জেণ্ট—যাদের পিতামহ বা প্রপিতামহরা সেই নীলচাষের আমলে বাঙ্গালী ঘরের বউ-ঝিদের গুণ্ডা লেলিয়ে ধরে নিয়ে যেত আপন আপন কুকর্মের জন্য। তাদের উদ্ভূত বংশীয়রা ইংরেজ অফিসারদের সঙ্গে মিলিয়ে রয়েছে এই সার্জেণ্ট বাহিনীর মধ্যে সাহেবী পোশাকে। চেয়ে দেখছিলুম, এই বিশাল রণক্ষেত্রের একদিকে রক্তমাখা খড়্গহস্তা মহাকরালীর সাধক বাঙ্গালী আজ অহিংস, অন্যদিকে আপন সাম্রাজ্যরক্ষক সশস্ত্র বৃটিশরাজ। নাটকটা বিয়োগান্ত হবে কিনা এখনও ঠিক জানা যাচ্ছে না।

ঠিক এমনি সময়টায় শীতের সেই অপরাহ্নে সহসা চারিদিক থেকে যেন মহা-জীবনের এক মহারোল উঠল, বন্দে-মাতরম। কে যেন আসছে এক মহান নেতা এগিয়ে,—আসছে তার সঙ্গে সমগ্র মিলিটাণ্ট বাঙ্গালী জাতি তার পিছু-পিছু। সে অপরাজেয় সে সর্বভয়বাধাহীন, সে বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলার দুরন্ত তারুণ্যের প্রতীক —সে আসছে, যার ভয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূলভিত্তি থরথরিয়ে কাঁপে। কিন্তু ততক্ষণে দিগ্দিগন্ত মুখরিত করে চিৎকার উঠেছে, 'সুভাষ বোস কি জয়!'

দেখতে দেখতে পুলিসের কঠিন ব্যূহভেদ করলেন সুভাষচন্দ্র এবং ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। পুলিস লাঠি চার্জ করল। পুলিস আগেই লাঠি বসালো ক্ষিতীশ-প্রসাদের ওপর। তাঁকে রক্ষা করতে গিয়ে লাঠির ঘা পড়ল সুভাষচন্দ্রের একখানা হাতের তালুতে—হাতখানা ফেটে গেল! সেই মুহূর্তে আমার নিত্যসঙ্গী সুধীন্দ্র নিয়োগী সুভাষচন্দ্রকে বাঁচাতে গিয়ে কপালের উপরে লাঠির আঘাত খেয়ে মাটিতে পড়ল এবং তার চশমাখানা ছিটকিয়ে কোথায় গেল। অবশেষে প্রবীণা মহিলা নেত্রী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী সুভাষচন্দ্রকে যেন আপন সন্তানের মতো দুই হাত দিয়ে আগলিয়ে ধরলেন। টেগার্টের নির্দেশ ছিল, মেয়েছেলের উপর লাঠির ঘা না পড়ে—ওতে দেশী কাগজগুলো বড়ই ঝামেলা বাধায়।

সুভাষচন্দ্রকে রক্তাক্ত অবস্থায় পুলিস ধরে নিয়ে যায় লালবাজারে। তাঁকে ছয়-মাসের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সুধীন্দ্রকে সেই মাথাফাটা অবস্থায় কারা যেন হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এই ঘটনার চৌদ্দ বছর পরে জনবরেণ্যা নেত্রী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের কালে আমেরিকান মিলিটারী ট্রাকের ধাক্কায় আহত হয়ে মারা যান।

যাই হোক, সুভাষচন্দ্রের উপরে এই লাঠির আঘাত নিয়ে বাঙ্গলায় এবং ভারতের সর্বত্র যখন ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ধিক্কার চলছে, তখন কলকাতার একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্দরমহলে শান্তশিষ্ট এক তরুণী গ্রাজুয়েটের মনে তার স্বভাববিরোধী এক প্রতিহিংসা সম্ভবত তাকে স্থির থাকতে দেয়নি। তখন বাঙ্গলার গভর্নর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক কনভোকেশন উপলক্ষে

চান্সেলর হিসেবে সেনেট হলে উপস্থিত ছিলেন। হাসান সুহরাবর্দি তখন ভাইস-চ্যান্সেলর। এই সুযোগ। খুন-কে বদলা খুন। হঠাৎ পর পর পিস্তলের দুটি গুলী ছুটে গেল জ্যাকসনের দিকে। কিন্তু চিরনিরীহ মেয়েটির হাত বোধ হয় কেঁপেছিল—লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। সুরাবর্দি সাহেব ছুটে গিয়ে জাপটিয়ে মেয়েটাকে ধরে ফেললেন।

আমার পক্ষে সেদিন অবিশ্বাস্য ছিল, এ মেয়েটি আমাদেরই সুপরিচিতা শ্রীমতী কল্যাণী দাসের কনিষ্ঠা সহোদরা শ্রীমতী বীণা দাস। বীণা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

কিন্তু তখন অপর একটি ঘটনায় দেশবাসীর মন শোকাচ্ছন্ন। যে দুই বিরাট ব্যক্তিত্ব একদা উত্তর ভারতে গান্ধীজীর নেতৃত্ব ও প্রতিষ্ঠাকে সুদৃঢ় করেছিল তাঁরা দু'জন হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু। এঁরা দু'জনেই ছিলেন অতুল বৈভবের অধিকারী এবং এঁদের ভোগবিলাসের নানা কাহিনী আমরা এক কালে শুনতুম। কিন্তু এঁরা উভয়েই দেশের ও জাতির কল্যাণের জন্য যথা-সর্বস্ব দান করে পথে এসে দাঁড়ান। দেশবন্ধুর মৃত্যু ঘটে জুন, ১৯২৫-এ। এবার পণ্ডিত মোতিলালের মৃত্যু ঘটল ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১-এ।

'স্বদেশ'-এর প্রথম সংখ্যা বেরোল সগৌরবে। প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় নজরুলের কবিতা ছাপা হল। নাম, স্বদেশ। প্রত্যেক পৃষ্ঠা ওল্টালেই একে একে পরিচিত নাম। কাগজের মোটা মলাট, লাল আর সবুজে ছাপা। সামনেই আমার নাম সম্পাদক হিসাবে মুদ্রিত। ইমিটেশন আর্ট পেপারে সমস্ত কাগজ ছাপা এবং লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চির পৃথিবী-প্রসিদ্ধ একটি ছবি ইতালীয়ান আর্ট পেপারে খুব সুন্দরভাবে মুদ্রিত। এক মাসের মধ্যে এই কাগজের খ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত হয়। বৈদ্যনাথ বিশ্বাস খরচপত্রের ব্যাপারে কিছুমাত্র কৃপণতা করেননি এবং প্রথম সংখ্যাটি দেখিয়ে তিনি প্রচুর বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি নিজে বীমা কোম্পানীর অন্যতম পরিচালক।

লেখকদের তালিকায় যারা ছিল তাদের অনেকেই পারিশ্রমিক পেল। বুদ্ধদেব লিখতে লাগল গল্প ও কবিতা দুইই। আর একটি ধারাবাহিক লেখা আরম্ভ করল, নাম দিল, 'এরা ওরা এবং আরো অনেকে'। তার লেখার প্রচুর নাম হল। প্রেমেন লিখল তিনটে কবিতা, মজুরি পেল পনেরো টাকা। তার সাহিত্য জীবনে কবিতার জন্য সেই প্রথম পারিশ্রমিক পেল। 'স্বদেশ' সম্বন্ধে তার উৎসাহ এখন প্রচুর এবং সে এখন এখানে প্রায়ই আসে। গ্রন্থ-সমালোচনা লেখবার জন্য সে ছদ্মনাম নিয়েছে 'কৃত্তিবাস ভদ্র'। অচিন্ত্য নাম নিয়েছে 'অভিনব গুপ্ত'। আমি নিজে কিছুদিন থেকে 'কীর্তনীয়া'—এই ছদ্মনামে লিখছি নানা কাগজে। স্বদেশেও ওই নামে কিছু কিছু লিখতে আরম্ভ করলুম। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে ওই ছদ্মনামে একটি প্রবন্ধ লিখে-ছিলুম কোন কাগজে যেন। সেটির রচনাভঙ্গীতে বোধ হয় কিছু নতুনত্ব ছিল, তাই

তিন-চারটি কাগজে ওটি পুনর্মুদ্রিত হয় এবং একই 'মুরগি' বার বার 'জবাই করার ফলে বেশ কিছু অর্থপ্রাপ্তিও ঘটে।

যাই হোক, এই সময়ে আমার কিছু খ্যাতি বেড়ে উঠেছিল নানা লোকের কথায় কথায়। আমি তার সুযোগ নিয়েছিলুম একদিন অপরিসীম দুঃসাহসের সঙ্গে। হঠাৎ গিয়ে গুরুদাস চ্যাটার্জি অ্যান্ড সন্সের দোকানে ঢুকলুম। অতি বৃহদাকার ওদের প্রতিষ্ঠান। ওঁদের ওই অট্টালিকার নিচে তলাকার দক্ষিণ-পূর্বাংশটা হল ছাপাখানা। ওঁরা তখন কলকাতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাহিত্য প্রকাশক এবং শরৎচন্দ্রের বই ছাড়া পরবর্তী-কালের কোনও লেখকের বই ওঁরা অদ্যাবধি বিশেষ ছাপেননি। ডি-এল-রায় প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ' মাসিকের ওঁরাই মালিক। ভারতবর্ষে তখন আমরা সবাই গল্প লিখতুম, কিন্তু ওঁদের বইয়ের দোকানে ঢোকার সাহস কারও ছিল না। ওঁদের আভিজাত্যের আত্মাভিমান ছিল প্রবল। লেখকদের পরিচয় সেখানে সামান্যই। যাই হোক, ওঁরা দু' ভাই—হরিদাস ও সুধাংশুশেখর, স্বর্গত গুরুদাসের দুই পুত্র। ওঁদেরই প্রথম ছাপাখানা 'বেঙ্গল প্রেস' ছিল আমার দিদিমার বাড়িতে মদন মিত্র লেনে। তখন আমার শৈশবকাল।

সামনেই বসেছিলেন সুধাংশু চট্টোপাধ্যায়। সুশ্রী, সিপসিপে, চোখে চশমা—পরিণত যুবা। আমি 'ভারতবর্ষ'-এ মধ্যে মাঝে ছোট গল্প লিখি, তিনি জানেন বই কি। এখন আমি যে একখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রস্তুত করেছি এবং সেটির জন্যই তাঁর কাছে সসঙ্কোচে এসেছি এটি শোনামাত্রই তিনি বইটি প্রকাশ করতে রাজি হলেন। পরদিন ওই একই সময়ে যখন পাণ্ডুলিপিটি এনে তাঁর হাতে দিলুম তখন তিনি বেশ সাগ্রহেই সেই বইয়ের গ্রন্থস্বত্ব বা কপিরাইট কিনে নিলেন আড়াই শ' টাকায়। তখনকার দিনে সর্বস্বত্ব কেবল গ্রন্থস্বত্বকেই বোঝাতো। তখন না ছিল সিনেমা, না বেতার, না নাটক, না ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ, না বা অন্য কিছু। সর্বস্বত্ব মানেই গ্রন্থস্বত্ব!

আড়াই শ' টাকা! এক সঙ্গে পঁচিশখানা করকরে দশ টাকার নোট! সেদিনকার দুপুর বেলাটা আমার চোখে মনে হয়েছিল এক জ্যোতির্ময় প্রভাত! আমি ছুটে চলে গিয়েছিলুম বাড়িতে। তখন আমার বড়দার কন্যার সঙ্গে এক ইস্কুল মাস্টারের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। আমি মায়ের হাতে সমস্ত টাকা দিয়ে বললুম, রুমার বিয়ের জন্য চাঁদা দিলুম।

আমার কাছে এই 'যুগান্তকারী' সংবাদ পেয়ে অচিন্ত্য আমাকে ধরে বসল, আমার একখানা বই গছাতে পারিস? বইখানা বেশ মোটা হবে।

দু' দিনের মধ্যেই অচিন্ত্যকে নিয়ে হাজির হলুম সুধাংশুবাবুর কাছে! একে-বারে সঙ্গে সঙ্গে, তিনি যেন মুখিয়েই ছিলেন! আমার মত অচিন্ত্যও বেচলো কপি-রাইট—নগদ দুশ' পঁচাত্তর! আমার চেয়ে তার বই বড়। অচিন্ত্যর জীবনেও এই প্রথম 'বিপুল' পরিমাণ সাহিত্যকর্মের মজুরি। তার বইয়ের নাম হল 'কাকজ্যোৎস্না', আমার উপন্যাসের নাম 'দুই আর দুয়ে চার।'

এরপর একে একে আমি সুধাংশুর কাছে 'নিশিপদ্ম' আর 'কলরব' দিলুম। ওগুলো তখন শুধু এডিশন বিক্রি। প্রত্যেকখানা একশ পঁচিশ টাকা। কথা রইল, আমার বই আমি সুন্দর করে ছাপবো। প্রসাধন ও প্রচ্ছদপট আমার রুচি অনুযায়ী, এবং বিলেতী বইয়ের মতো 'র‍্যাপার' জড়ানো হবে। ওঁরা ওতেই রাজি। বাঙ্গলা বইতে সেই প্রথম 'র‍্যাপার' জড়াবার রেওয়াজ শুরু হয়।

অচিন্ত আর আমার কথাবার্তা ছিল নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি কিন্তু কে-মাছের মতো কথাও কানে হাঁটে! সুতরাং আমাদের ওই যুগান্তকারী সংবাদ হাঁটতে হাঁটতে এখানে-ওখানে ঘুরে-ফিরে আদিগঙ্গার পোনাঘাটে গিয়ে পেঁছল।

প্রেমেন একদিন চলল আমার সঙ্গে। তার ছোট গল্পের বই 'পুতুল ও প্রতিমা' নিল সুধাংশু। মোট একশ পঁচিশ টাকা সে পেয়ে গেল।

পাঠক সমাজ তখন 'স্বদেশ'কে বিশেষ সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করছে। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু লিবার্টি'র সত্যেন বসু ও প্রমোদ সেন, ভবানী মুখুজ্জে ও অবনী রায়— এরা লেখা পাঠাচ্ছে নিয়মিত। নজরুল, অচিন্ত্য, বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র, জসীম, অখিল নিয়োগী—সবাই লিখছে। তখন ইউরোপে প্রথম যুদ্ধের ফলশ্রুতিস্বরূপ একটা রাজনীতিক ডামাডোল চলছে। জার্মানীর প্রেসিডেণ্ট হিনডেনবুর্গ জার্মানীকে বাগ মানাতে পারছেন না। এখানে ওখানে কম্যুনিস্টদের কর্মতৎপরতা চলছে। সেই সময় একজন জার্মান আন্দোলনকারী একটা নতুন রাজনীতিক ধুয়ো তোলে, তার নাম 'ন্যাশনাল সোস্যালিজম'। তার বক্তৃতা নাকি জ্বালাময়ী এবং ইঙ্গ-ফরাসী বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। পরাজিত জাতি যদি বিজেতাদের বিরুদ্ধে ঘৃণার কথা শোনে, তবে পরাজয়ের জ্বালা ইন্ধন পেয়ে আরও জ্বলে! সুতরাং সমগ্র জার্মানী ওই আন্দোলনকারীর বক্তৃতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে এবং হাততালি দেয়। সকল দেশের ও সকল কালের জনসাধারণ রাজনীতিকদের হাতের ক্রীড়নকমাত্র। যাই হোক, 'স্বদেশ'-এর লেখক সুনীল ধর একদিন কোন একখানা বিলেতী কাগজের একটা কাটিং আমার কাছে নিয়ে এল। দেখলুম, ওই জার্মান 'এজিটেটরের' একখানা ছবি ও তার কর্মতৎপরতার পরিচয় সংযুক্ত রয়েছে। লোকটার নাম অ্যাডলফ হিটলার। বাঙ্গলায় তখন তার নাম জানে না কেউ। সুনীলকে বললুম, ওই কাটিং থেকে একটা প্রবন্ধ বানিয়ে দাও। সেই প্রথম হিটলারের ছবি ও পরিচয় এলো বাঙ্গলায়। কেউ কেউ বলল, কোথাকার কে একটা লোক তার জন্য স্বদেশের তিনটে পৃষ্ঠা নষ্ট হল। সবাই জানে, হিটলার ক্ষমতায় আসেন ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর ডিক্টেটর হয়ে। তিনি যথাসময়ে প্রেসিডেণ্ট হিনডেনবুর্গকে তাড়িয়ে দেন এবং নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ফন প্যাপেনকে নিষ্ক্রিয় করেন।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী কল্যাণী দাসের আত্মীয়রা 'পুণ্যাশ্রম' নামক একটি মহিলা প্রতিষ্ঠান নতুন করে গড়ে তোলেন। এর সঙ্গে শ্রীমতী শোভারও কিছু সম্পর্ক ছিল। সুতরাং 'পুণ্যাশ্রমে'র প্রথম আলোচনা আমার সঙ্গে। হিন্দুস্থান রোড আর গড়িয়াহাটের মোড়ের দিকটা তখনও বনবাগানে ঘেরা অনুন্নত ও জনবিরল। তখনও

গড়িয়াহাট মার্কেট স্বপ্নাতীত। না আছে গুরুদাস ম্যানসন, না যশোদা ভবন। সাদার্ন অ্যাভেন্যু তৈরি হয়নি। ট্রাম-লাইন ছাড়লেই লেক অঞ্চল বনবাদাড়ে অগম্য। সুন্দরবন যেন গায়ে গায়ে। তখন লোকে ওদিককার গোবিন্দপুর এবং রাজা সুবোধ মল্লিকের যাদবপুর আর যোধপুর ক্লাবের নাম জানত, আর জানত নলিনীরঞ্জন সরকারের হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স স্কীমের ভবিষ্য নতুন বালিগঞ্জের নকশা। সে যাই হোক, ওই পাড়াতেই একটি পুরনো বাড়ির নিচের তলাকার তিন-চারটে ঘর নিয়ে 'পুণ্যাশ্রম' বসল। তখন ওটার বিশেষ দরকার হয়েছিল। যেসব মেয়ে তাদের বাপ দাদা বা স্বামীর অবাধ্য হয়ে আইন অমান্য আন্দোলনে নেমেছিল, মফঃস্বল থেকে এসে দুরবস্থায় পড়েছিল, অথবা জেল থেকে বেরিয়ে আর ঘরে ফিরতে চাইছিল না, তাদের উপায়? কোথা যাবে তারা? কে তাদের খাওয়া-পরা যোগাবে? কে তাদের আগলিয়ে রাখবে? এসব নিয়ে মেয়েমহলে মস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছিল।

শ্রীমতী শোভা পুণ্যাশ্রমের জন্য আমার কাছে একদিন হাত পাতলেন। সুতরাং আমি দিন তিনেক ধরে সাত হাত মাটি খুঁড়ে মোট একশ' টাকা এনে তাঁর হাতে দিলুম। টাকাটা তিনি এমনভাবেই নিলেন যেন এ তাঁর প্রাপ্য। না ধন্যবাদ, না দুটো মিষ্টি কথা, না বা কিছু। তাঁর বিশ্বাস তাঁর অঙ্গুলি হেলনে আমি সমুদ্র মন্থন করতে পারতুম!

আমার আরেক কাজ এ বাড়ির মাতাঠাকুরাণী শ্রীযুক্ত লাবণ্যপ্রভা দত্তর সভানেত্রীত্বে একটি প্রতিষ্ঠান আমি গড়ে তুলছি যার নামকরণ আমিই করেছি 'আনন্দমঠ'। এই আনন্দমঠের জন্য শ্রীমতী শোভা একটি ঘরভাড়া নিয়েছেন ভবানীপুরে ট্রাম রাস্তা পেরিয়ে দেবেন্দ্র ঘোষ রোডে ঢুকেই বাঁহাতি একটি বাড়ির দোতলায়। ঘরটি উত্তরমুখী এবং দক্ষিণে লম্বা। সিঁড়ি ভিতরের দিকে। আমাদের উদ্দেশ্য, সামনের দিকে একটি পাঠাগার—সেখানে থাকবে নানা রকমের বই এবং পড়াশুনোর সুবিধা। ঘরখানা আলমারি দিয়ে পার্টিশান করা হবে! ভিতরের দিকে থাকবে শুধু একখানা বড় তক্তাপোষ, সেখানে আনন্দমঠের 'সন্তানরা' অর্থাৎ বিপ্লবীরা গোপনে এসে মিলিত হবে। এই আইডিয়াটা পাওয়া গিয়েছিল 'সিমলা ব্যায়াম সমিতির' কল্যাণে। সামনের দিকে বাৎসরিক বারোয়ারি দুর্গাপুজো, ভিতর দিকে সকল দলের বিপ্লবীদের সঙ্গোপন সম্মেলন!

পাছে আনন্দমঠের উদ্বোধন অনুষ্ঠান গোয়েন্দা পুলিসের সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেজন্য আমরা স্থির করলাম এর উদ্বোধন করা হবে হাজরা রোডের বাড়িরই নিচের তলায়। এখানে উঠোন ছিল প্রশস্ত যেটি সমাবেশের পক্ষে সুবিধাজনক। আমি নিজে গিয়ে কাজী নজরুল, নলিনীকান্ত সরকার এবং কাকে কাকে যেন নিমন্ত্রণ করে এলুম। আমাদের মূল উদ্দেশ্য যে পাঠাগার নয় এটি ইষ্টমন্ত্রের মতো সকলের কাছেই চেপে রাখতে হল। এটি একটি মহিলা প্রতিষ্ঠান এবং সমাজসেবা কেন্দ্র—এইটিই প্রচারিত থাক। নলিনীদা ও নজরুল আমাকে অবিশ্বাস করেননি।

আগের দিন রাত জেগে আমি সভানেত্রীর অভিভাষণটি লিখে প্রস্তুত করলুম।

কারণ এটি লাবণ্যপ্রভার ছবি সহ 'স্বদেশ'-এর আগামী সংখ্যায় আমি প্রকাশ করব।

'আনন্দমঠ'-এর উদ্বোধনের দিন বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদেরকে আনিয়েছিলুম। দক্ষিণ কলিকাতার বহু নেত্রীস্থানীয়া মহিলা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। উদ্বোধন সঙ্গীত গাইল নজরুল তার অনবদ্য কণ্ঠে। এই উপলক্ষে সে একটি গান রচনা করেছিল, 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা জাগো পদদলিতা—' ইত্যাদি। অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছিল এবং সভার সম্পূর্ণ বিবরণটি ছাপা হয়েছিল কোনও কোনও কোনও সংবাদপত্রে। লাবণ্যপ্রভা দক্ষিণ কলিকাতার অন্যতম নেত্রী হিসেবে সেই প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

আমি নিজে ভারবাহী জন্তু। আর-জি-কর হাসপাতালের পাশে নীলমণি মিত্র রো-র বাড়ি থেকে ভবানীপুরের দেবেন্দ্র ঘোষ রোডের বাড়ি ক' মাইল? আমি সেই দূর পথ হাঁটতে হাঁটতে সঙ্গে ঠেলাগাড়ি করে প্রায় দেড় হাজার বই—তৎকাল পর্যন্ত আমার যা কিছু বাংলা আর ইংরেজী সংগ্রহ, যা কিছু প্রাচীন আর নবীন—সব এনে জড়ো করেছিলুম 'আনন্দমঠে', পরোক্ষে সেই মঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর চরণকমলে।

॥ ৫২ ॥

ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি রদ করাবার জন্য গান্ধীজী প্রচুর চেষ্টা-চরিত্র ও আবেদন নিবেদন করেছিলেন। তাঁর রাজনীতিক নীতিধর্ম অহিংসা, কিন্তু বিপ্লবীরা কোন-দিনই তাঁর অপ্রিয় ছিল না। তারা হয়ত অহিংসাবাদের বিরোধী, কিন্তু দেশের শত্রু নয়।

সুভাষচন্দ্রের মধ্যে এসব নীতি-বিশ্লেষণ ছিল না। তাঁর কথা সোজা। যে দুষ্কৃতকারী স্রেফ গায়ের জোরে আমাদের ওপর চেপে বসেছে সেই 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী,' সুতরাং তার প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করা দরকার। যদি ভগৎ সিংয়ের ফাঁসি হয়, তাহলে মনে রেখো, লক্ষ লক্ষ ভগৎ সিং মাথা তুলবে। আমাদের দেশে প্রতিটি ইংরেজকে এর উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে!

সুভাষবাবুর চোখ দুটো চশমার ভিতর দিয়েও দেখা যাচ্ছে টসটসে রাঙ্গা। কী সুন্দর মুখশ্রী, বলবান স্বাস্থ্যের উপর ঝলমল করছে তারুণ্য! উনি চমৎকার হিন্দুস্থানী ভাষায় বক্তৃতা করছিলেন গ্যাড়াতলার ময়দানে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার মানুষের সামনে। ওই ময়দানটা ছিল একটু উঁচু, ওর চারদিকে ছিল অবাঙ্গালী মুসলমানদের খোলাখাপরার বস্তি। ও-অঞ্চলে রাত্রের দিকে ভয়ে কেউ হাঁটাচলা করত না। পরে কবে যেন ওই উঁচু মাঠটার চারদিকে পাঁচিল দিয়ে ওর নামকরণ করল 'মহম্মদ আলি পার্ক'। গান্ধীজীর আমলে অনেকগুলো মহম্মদ আলির মধ্যে এই মহম্মদ আলি ছিলেন প্রধান। ওঁর সহোদর ভাইয়ের নাম ছিল সৌকত আলি। দু'জনেই মোটা, দু'জনেরই মস্ত ভুঁড়ি এবং দু'জনেই ঘাড়ে-গর্দানে এক। ওঁদের সঙ্গে শীর্ণকায় গান্ধীজীর ভাব হয়েছিল অসহযোগ আন্দোলনের কালে। ওঁরা দু'জন মধ্যপ্রাচ্যের

কোন্ খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে গান্ধীজীর নাম জড়িয়ে রেখেছিলেন, এবং এই সূত্র ধরেই বুঝি কিছুকাল পরে ওঁরা দুই ভাই গান্ধীজীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজী তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন কিনা সেটি ইতিহাসই জানে। তবে তাঁর বড় ছেলে হীরালাল একদা কল্‌মা পড়েন, ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেন্ এবং 'আবদুল্লা' গান্ধী নামে পরিচিত হন।

শোনা যায়, এই ধর্মান্তরিত হবার জন্য পুরস্কারস্বরূপ হীরালালজী হাজার পঞ্চাশেক টাকা 'ইনাম্' গ্রহণ করেন। আবদুল্লা গান্ধীর সঙ্গে আমাদের শ্রদ্ধেয় সুধাদার বন্ধুত্ব ছিল। হীরালাল কলকাতার এক বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন এবং বাঙ্গলায় কথা বলতেন। তাঁর প্রকৃতি ছিল উচ্ছৃঙ্খল, তাই বোধ করি ব্যবসার গণেশ উল্‌টিয়ে যায়।

তখন বারুদের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে বাঙ্গলায়। বাঙ্গলা দেশ মনে-প্রাণে অহিংসাবাদকে গ্রহণ করেনি, বোধ হয় করবেও না। বাঙ্গালী একটুখানি রক্তের ভক্ত। কালীঘাটে পাঁঠা বলি দিয়ে তার রক্তের টিপ কপালে তুলে নেয় বাঙ্গালী। মাথায় সিঁদুর, কপালে রাঙ্গা টিপ, ঠোঁটে রাঙ্গা পানের রস, পরনে রাঙ্গাপাড় শাড়ি, হাতে রাঙ্গা শাঁখা পায়ে রাঙ্গা আল্‌তা—এই হ'ল বাঙ্গালী মেয়ে! এ মেয়ে সর্বাপেক্ষা উৎপীড়িতা ও নির্যাতিতা, সর্বাপেক্ষা কোমলা, দুর্বলা, অবলা; এ মেয়ে রোগে দুঃখ-দারিদ্র্যে অভাব-অনটনে বিশীর্ণা--কিন্তু এই মেয়েরই জঠরে জন্মায় দিগ্বিজয়ী বড় বড় প্রতিভা। প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়, নন্দকুমার, রানী ভবানী, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, শ্রীরামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, আচার্য জগদীশ,—কে আসেনি ওই জঠরে? শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ কবি ও দার্শনিক, শ্রেষ্ঠ শিল্পী, শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক, শ্রেষ্ঠ সাধক—কে নয়?

১৯৩০ থেকে বেশ কোমর বেঁধে সাম্রাজ্যরক্ষী ইংরেজের সঙ্গে বিপ্লববাদী বাঙ্গালীর 'ক্রিকেট' খেলা আরম্ভ হয়েছিল। আমরা চারিদিকে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম কে কাকে আউট্ করে এবং কার কত রান্ হয়। বিপ্লবীরা যদি একটা ইংরেজকে মারে, ইংরেজ অমনি দুটোকে ফাঁসিতে লট্‌কিয়ে দেয়। পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্ট ছিল ইংরেজ পক্ষের নাটের গুরু, কিন্তু ওই লোকটিকে কোনমতেই বাগে পাওয়া যাচ্ছে না, এই দুঃখ। লোকটা আবার নাকি বিভিন্ন ছদ্মবেশে এখানে-ওখানে যখন-তখন ঘুরে বেড়ায় এবং ঘরের শত্রু বিভীষণদের রাখে সামনে ও পিছনে। লোকটার চেষ্টা ছিল, যেখানে যত গহ্বর ও গর্ত আছে, সেগুলোর মধ্যে খোঁচাখুঁচি করে বিপ্লবীদের খুঁজে বার করা। সন্দেহ নেই, লোকটা ছিল অসমসাহসিক!

আমি 'স্বদেশ'-এর সম্পাদকীয় লিখতুম বেশ উগ্র মেজাজ নিয়ে। কিন্তু আমার চেষ্টা কাগজখানা যেন বাঁচে। সন্ন্যাসী সাধুখাঁ নামক হাওড়ার এক লেখককে দিয়ে জগৎ-প্রসিদ্ধ নর্তকী ইসাডোরা ডানকানের সদ্য প্রকাশিত 'মাই লাইফ'-এর অনুবাদ করাচ্ছিলুম। রবীন্দ্রনাথ তখন ছিলেন দার্জিলিংয়ে, নজরুলও তখন সেখানে। দুই কবির দেখা-সাক্ষাৎ ও উভয়ের আলাপ-আলোচনার বিবরণ 'স্বদেশ'-এ ছাপছিলুম। অন্নদাশঙ্কর তখন ম্যাজিস্ট্রেট, এখানে ওখানে তাঁর পোস্টিং হয়। কিন্তু নিজের নাম

তিনি তাঁর কোনও রচনায় কোনও সাময়িকপত্রে ছাপাতে পারতেন না। ইংরেজ আমলে কারণটা সুস্পষ্ট। তখনকার কালে আরেকজন জাতীয়তাবাদী আই সি এসের নাম শুনতুম, তিনি শৈবাল গুপ্তা। তাঁর আবার এমনই দুঃসাহস, তিনি নাকি খদ্দরও ব্যবহার করতেন। পরবর্তীকালে আমার জ্যোতিদি ওরফে সুলেখিকা জ্যোতির্ময়ী দেবীর কন্যা শ্রীমতী অশোকার সঙ্গে মিঃ গুপ্তর বিবাহ হয়। যাই হোক, অন্নদাশঙ্কর একটি ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন, 'লীলাময় রায়'। সবাইকে লুকিয়ে চুপিচুপি নিজের হাতের লেখাটি পর্যন্ত অন্যাকে দিয়ে নকল করিয়ে তবে লেখা ছাড়েন সাময়িক পত্রে! সেই সব লেখা কিন্তু সাহিত্যেরই লেখা, তাতে রাজনীতির গন্ধও নেই—কিন্তু তবু বৃটিশ আমলের আতঙ্ক ও নিষেধ অন্নদাশঙ্করকে সতর্ক করে রাখত।

এমনি একটা সময়ে একটি সাহিত্যোৎসাহী ও সুশ্রী তরুণী লেখক সমাজের মধ্যে কোথা থেকে যেন ছটকিয়ে আসে। মেয়েটির দেহলাবণ্য ও নবীন তারুণ্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওর মিষ্ট মুখশ্রী, মধুর হাসি, ভদ্র ব্যবহার এবং প্রত্যেক লেখক-লেখিকার প্রতি ওর আন্তরিক অনুরাগ—ওকে অল্পকালের মধ্যে সকলের প্রিয় ক'রে তোলে। মেয়েটির নাম জাহানারা বেগম চৌধুরী। সাংবাদিক আলতাফ চৌধুরী ওর ভাই কিনা আমি জানিনে, এবং ওই চৌধুরী পদবীটি বগুড়ার প্রাক্তন নবাব, নবাব আলী চৌধুরীর থেকে নেমে এসেছিল কিনা তাও আমার অবিদিত। জাহানারার জননীও সুদর্শনা, এবং হিন্দু বাঙ্গালীর কন্যা বলে শুনেছি। জাহানারার সর্বাপেক্ষা যে অন্তরঙ্গ বন্ধু ও হিতৈষী ছিল, সেও আমাদের বন্ধু দেবু চৌধুরী। দেবু বিশেষ অমায়িক ও সজ্জন। যাই হোক, জাহানারার বয়স তখন আর কত হবে? বছর ষোল সতেরো!

শ্রীমতী জাহানারা ছোট বড় মাঝারি প্রবীণ—সব লেখক, কবি, শিল্পী সমালোচক, সাংবাদিক এবং বিজ্ঞাপন-দাতাদের সঙ্গে তার এই সুন্দর যৌবনশ্রী, মিষ্ট ভাষণ ও অত্যাধুনিক প্রসাধন সজ্জা নিয়ে একখানা নতুন মোটরে চড়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কেননা সে তার নতুন এক সাহিত্যপত্র প্রকাশ করবে। কাগজের নাম রেখেছে 'বর্ষবাণী'। এই বর্ষবাণীর জাল ফেলে সে যেমন গভীর জল থেকে চিতল-বোয়াল, রুই-কাতলা তুলবে, তেমনি আমাদের কয়েকজনের মতন অল্প জলের শফরিকেও বাদ দেবে না। ও-মেয়ের চেহারায় রয়েছে "কিছু পলাশের নেশা, কিছু বা চাঁপায় মেশা।" সুতরাং ও-মেয়ে যে রবিঠাকুরের কাছে যাবে না, এ কি কখনও হয়? তা ছাড়া কিশোরী কবি মৈত্রেয়ী দেবী যদি কবি সম্রাটের কাছে প্রশ্রয় পেয়ে থাকেন, জাহানারা কি দোষ করল?

অল্পকালের মধ্যে কবি ও লেখক মহলে জাহানারা ঝড় তুলল। অনেক লেখকের বউ ঈর্ষা ও সন্দেহে জরজর হতে লাগল, এবং ওই বালিকা জাহানারা অবশ্যই জানত, প্রতি লেখক সম্বন্ধে তার শরসন্ধান ব্যর্থ যাবে না। জাহানারা প্রচুর খ্যাতি অর্জন করল। আমি ওর খ্যাতি লক্ষ্য করে প্রথমটা কুঁকড়িয়ে গিয়েছিলুম। কেননা তখন-কার দিনে খ্যাতনামা কোনও সুন্দরীর সঙ্গে ভাব-আলাপ বা ঘন পরিচয় ঘটলে খুব

সহজেই কানাকানি রটে! এইটি মনে রেখে আমি খুবই সতর্ক থাকতুম। দেবুর সামনেই একদিন আমি জাহানারাকে বলতে বাধ্য হয়েছিলুম, দেখো, আমার নামের পাশে শুধু 'দা' বসিয়ো না, বলবে 'দাদা'। লেখা নেবে, পারিশ্রমিক দেবে। নইলে তোমার 'ঘরের ওই আলমারি থেকে খানকয়েক শাড়ি নিয়ে সরে পড়ব! সাবধান বলছি—

জাহানারা হেসে অস্থির হয়েছিল। মেয়েটা নাকি শুনেছিল, কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তর ছয়শ'খানা ধুতি ছিল, সুতরাং তাকেও অন্ততপক্ষে ছয়শ'খানা শাড়ি জমাতেই হবে!

যে-কয়জন ব্যক্তি জাহানারার প্রিয় ছিল, তাদের মধ্যে দেবু, নজরুল ও কালিকা প্রেসের মনোরঞ্জন চক্রবর্তীর নাম মনে পড়ছে। এরা এদের ভদ্র ব্যবহার ও মিষ্ট প্রকৃতির জন্য জাহানারার সকল কর্মে সহায়ক হয়েছিল। যাই হোক, পরবর্তী তিরিশ বছরেরও বেশি কাল অবধি সে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব রেখেছিল। তার দু'তিনটি বিবাহ, এবং বিভিন্ন দুর্দশা ও দুর্গতি, এবং তার অবস্থার বিলম্বিত পরিণতি—কিন্তু এসব সত্বেও সকল সময়েই সে আমাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছে। বোধ হয় আমার ওই কথাটা সে মনে রাখত, আমি নির্মোহ।

১৯৩০ থেকেই মেয়েরা বহু ক্ষেত্রে গার্হস্থ্য জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ করেছিল। ঘরে বন্দিনীর জীবন তারা চাইছে না, কিন্তু বাইরে বেরিয়ে কোনও কাজও খুঁজে পাচ্ছে না। মেয়েদের লেখাপড়া করাটা তখনও আবশ্যিক হয়ে ওঠেনি। মধ্যবিত্ত বা স্বল্পবিত্ত সমাজে তখনও নারী শিক্ষার যথেষ্ট প্রচলন হয়নি। আবার যেসব মেয়ে সুশিক্ষিত, তারা উপযুক্ত কাজ না পেয়ে বিয়ে করে বসে যাচ্ছে। অন্যদিকে আবার উচ্চশিক্ষিত মেয়েকে চট ক'রে ঘরে আনতেও গৃহস্থরা ভয় পাচ্ছিল। গত বছর 'বিজলী'তে যখন ছিলুম, তখন শ্যামবাজারের কাপড়পটির এক গলিতে ছিল 'হিন্দু অবলা আশ্রম'। এই আশ্রমের পরিচালক ছিলেন পদমরাজ জৈন। একজন ব্যবসায়ী হয়ে ইনি হঠাৎ 'অবলা আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করতে গেলেন কেন, আমি জানিনে। বিজলী আপিস থেকে এই আশ্রম' বোধ হয় মিনিট তিনেকের পথ। এক একদিন ভর-দুপুরে এই আশ্রম থেকে একটি অথবা দুটি, কখনও বা তিনটি যুবতী মেয়ে বিজলী আপিসের তিনতলায় সোজা উঠে যেতো আমাদের ঘরে—যেখানে অনিল ভটচার্য রতিকান্ত পালিত ও আমি আড্ডায় মশগুল থাকতুম। ঘরের মধ্যে হঠাৎ মেয়েছেলের আবির্ভাব—আমরা আড়ষ্ট হতুম। জনতিনেক মেয়ে এলে একজন ওদের মধ্যে থাকত বর্ষীয়সী। ওরা কাজ চাইত—যে কোনও কাজ। আশ্রয় চাইত—যে কোনও শর্তে। শুধু তাই নয়, যেটা ওদের মুখে চোখে আভাসে ইঙ্গিতে অনুভব করতুম, সেটি কিছু অন্য প্রকার! আমার ধারণা, একটা কোনও অছিলায় ওদেরকে আমাদের কাছে পাঠানো হ'ত! আমার তৎকালীন বন্ধু ধ্যানেন্দ্র মিত্র বলেছিলেন, ১৯৩০ সালে করাচিতে কংগ্রেসের এক বৈঠকের কালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং সেই সময়ে কতগুলি বাঙ্গালী হিন্দু মেয়ে রামানন্দবাবুর কাছে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে বলে,

কলকাতার 'অবলা আশ্রম'-এ তাদেরকে নানা আশ্বাস দিয়ে গ্রামাঞ্চল থেকে এনে এখন করাচী থেকে তাদেরকে আরব দেশে দলে দলে পাঠিয়ে দিচ্ছে। তা'রা বাঙ্গলাদেশে ফিরে যেতে চায়! মেয়েরা কান্নাকাটি করতে থাকে।

রামানন্দবাবু মেয়েদের এই করুণ আবেদন শুনে কি প্রকার প্রতিকারের চেষ্টা করেছিলেন আমার মনে নেই। তবে এ নিয়ে মস্ত এক আন্দোলন হয়েছিল। এর মধ্যে নাকি লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন ছিল।

এ ছাড়া রাজনীতিক নেতারা পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, শহরে, গ্রামে ও গঞ্জে বক্তৃতা দিয়ে ফিরেছেন এবং ছেলেমেয়েদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন। অতঃপর ১৯৩১-এর মার্চের প্রথমে যখন গান্ধী-আরউইন প্যাক্টের ফলে সাময়িক কালের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন থামল, তখন কলিকাতার এই নবাগত ছেলেমেয়েরা নিরাশ্রয় বোধ করেছিল। তাদের অনেকেই দেশে ফিরে যেতে চায়নি। ওদের মধ্যে এমন শত শত ছেলে ও মেয়ে ছিল, যারা কারাবরণ করতে পারলে খুশী হ'ত—কারণ তাদের সামনে ছিল অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয় সমস্যা।

পূর্বোক্ত 'আনন্দমঠ' সম্বন্ধে আলোচনার জন্য শ্রীমতী শোভা একদা আমাকে পাঠালেন শ্রীমতী বিমলপ্রতিভা দেবীর কাছে। তখন রাসবিহারী অ্যাভেনু তৈরী হয়েছে কিন্তু ওই চওড়া রাস্তার দুই পাশে মাঝে মাঝে দু'চারখানা বাড়ি সবেমাত্র তৈরি হচ্ছিল। যেগুলো দুদিকের সাইড স্ট্রীট, সেগুলোর ভিতরে-ভিতরে ফাঁকা মাঠ। লেক-এর দিক সন্ধ্যার থেকে ঘন অন্ধকার। মনোহরপুকুর পল্লীতে তখনও আশ-সেওড়ার জঙ্গল। ওরই একস্থলের নাম দেওয়া হয়েছে বুঝি হিন্দুস্থান পার্ক—অর্থাৎ নলিনীরঞ্জন সরকার ও সুরেন ঠাকুরের সেই হিন্দুস্থান লাইফ ইনস্যুরেন্সের নামানুসারে। ওইখানেই জমি কিনেছেন নরেন্দ্র দেব এবং বাড়ি করেছেন কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী। ওঁর ওখানে মাঝে মাঝে আসতুম বউদিদির হাতের চানাচুর আর চায়ের লোভে, আর যতীনদা সেই সুযোগে ওঁর কবিতা আমার মুখ দিয়ে আবৃত্তি করিয়ে নিতেন! তখন সন্ধ্যার পর সমগ্র নতুন বালীগঞ্জ অন্ধকারে আর ঝিঁঝিঁর ডাকে থমথম করত।

কিন্তু বিমল প্রতিভার বাড়ি ছিল লেক মার্কেটের এদিকে দক্ষিণ ফুটপাথে। ওঁর স্বামী হলেন ডাঃ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বামী স্ত্রী দুজনেই দেশকর্মী এবং খুবই ভদ্র ও মধুরভাষী। কিন্তু শ্রীমতী শোভা আমাকে পুরুষ অপেক্ষা যেহেতু স্ত্রীলোক বলে কল্পনা করতেন, সেই হেতু আমি যে-কোনও বাড়ির কর্তা অপেক্ষা গৃহিণীদের নিকট বেশি অন্তরঙ্গ ছিলুম!

শ্রীমতী বিমলপ্রতিভা তখন তরুণী নেত্রী হিসাবে খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর একখানা মোটরকার ছিল। আর্থিক অবস্থা তাঁদের ভাল। তিনি বোধ করি তখন লতিকা বসুরই সমবয়সী। বিমলপ্রতিভা যখন আমাদের আমন্ত্রণে সভায় এসে উপস্থিত হতেন এবং যখন তাঁর অতি মূল্যবান ও মিহি খদ্দরের রাঙ্গাপাড় শাড়ির সঙ্গে চিত্তাকর্ষক প্রসাধন পারিপাট্য দেখতুম, তখন অনেকের মতো আমারও ভাবান্তর ঘটত। এঁদের অনেকের চেহারার জন্য এঁদের দেশকর্মের খ্যাতি সহজেই ছড়িয়ে পড়ত এবং

সংবাদপত্রে এঁদের ছবি ছাপা হ'ত। শ্রীমতী শোভার নির্দেশক্রমে আমিই ওঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ ক'রে 'আনন্দমঠ'-এ টেনে এনেছিলুম। কিন্তু তার পরে যে ঘটনা ঘটেছিল সে কথা পরে বলব।

'স্বদেশ' মাসিকপত্র নিয়ে আমি তখন ডুবে রয়েছি। সম্প্রতি হিন্দু মিউচুয়াল বীমা কোম্পানির শ্রদ্ধেয় পূর্ণচন্দ্র রায় মহাশয় যিনি আধুনিক লেখিকা শ্রীমতী বাণী রায়ের পিতা, তিনি আমাকে 'উপাসনা' মাসিকপত্রটিও দেখাশোনা করার জন্য অনুরোধ করেছেন। এ ব্যাপারে আমি খুব সতর্ক। কারণ আমার বয়োজ্যেষ্ঠ প্রিয়বন্ধু সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের কতটুকু স্বার্থ এখনও পর্যন্ত এই 'উপাসনা'র সঙ্গে জড়িত, সেটুকু আমার দেখার দরকার ছিল। কিন্তু কালের গতির সঙ্গে সাময়িক পত্রের প্রকৃতি যদি গতিশীল না হয়, তবে সেই কাগজের অপমৃত্যু অনিবার্য। সাবিত্রীপ্রসন্ন মূলত কবি এবং সাহিত্যরসের কারবারী। তিনি ভদ্র, বন্ধুবৎসল, সুলেখক—কিন্তু সাপ্তাহিক বা মাসিকপত্রের পরিচালনা অন্য জিনিস। সেখানে ভিন্ন প্রকার যোগ্যতার কথা থাকে। প্রতি মাসিক সংখ্যায় পাঠকদের মনকে নাড়া দিতে হয়, ঘুম ভাঙ্গাতে হয়, উত্তেজিত ও অনুপ্রাণিত করতে হয়, নতুন চিন্তাধারার চাবুক মারতে হয়। সাবিত্রীপ্রসন্ন হয়ত সে বিষয়ে কতকটা অসতর্ক ছিলেন। যে রোগী আধপেটা খেয়ে মরতে বসেছে, যার এ জীবনে পুষ্টিকর খাদ্য জোটেনি, তা'কে মরণকালে যতই আংগুর-বেদানা, ফলমূল বা দুধ-মাখন গোগ্রাসে গেলাও, তা'র মরানাড়িতে কোনটাই ধরবে না! তার মৃত্যু ঘটে দুরারোগ্য ব্যধিতে। 'উপাসনা'কে বাঁচাবার সাধ্য আমার নেই। পাঠক সমাজ 'উপাসনা'কে আর চায় না।

দোতলায় যখন উপাসনার মৃত্যু ঘটছে এবং খাবি খাচ্ছে ও তারই শিয়রে বসে প্রবীণ ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পূর্ণচন্দ্র রায় মহাশয় যখন তারকব্রহ্মনাম জপ করছেন, তখন তিনতলার 'স্বদেশ' তার প্রচণ্ড প্রাণশক্তি নিয়ে সমগ্র পাঠক সমাজে প্রবল ঝড় তুলেছে! প্রতি মাসে উদ্‌গ্রীব পাঠকসাধারণ নতুন একটা জীবনের স্বাদ পাচ্ছে, নতুন সাহিত্যের প্রবল চেতনায় তারা অনুপ্রাণিত হচ্ছে। দুর্ধর্ষ কবিতা লিখছে নজরুল, দুঃসাহসিক উপন্যাস লিখছে বুদ্ধদেব, অচিন্ত্যর গল্পে এবং কবিতায় নতুন নতুন চিন্তার উদ্দীপনা, —আর প্রেমেন? সে এক মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষক কবিতা রচনা করেছে, "অগ্নি আখরে আকাশে যাহারা লিখিছে আপন নাম, চেনো কি তাদের ভাই? দুই তুরঙ্গ জীবন ও মৃত্যু জুড়ে তারা উদ্দাম/দুয়েরেই বল্গা নাই।" কবিতাটি পরে আমরা চমৎকৃত হয়েছিলুম।

নিচের তলায় তখন উনিশ শতাব্দীর মৃত্যু ঘটেছে, আর তিনতলার উপরে বিশ শতাব্দীর "প্রাণবন্যায় উঠিল ফেনায়ে মাধুরীর মঞ্জরী—"। এর কিছু আগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তাঁর অনন্যসাধারণ একটি উপন্যাস 'শেষের কবিতা'। প্রমাণিত হয়েছে আধুনিকতায় তিনি তাঁর সত্তর বছর বয়সেও সর্বাগণ্য। 'শেষের কবিতা'কে তার স্বভাব-সৌন্দর্যের জন্য একটি মহৎ কাব্যোপন্যাস বলা চলে। সেই সময়ে

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ভারত-প্রসিদ্ধ দার্শনিক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় ছিলেন বাঙ্গালোরে। তিনি রবীন্দ্রনাথের বন্ধু। রবীন্দ্রনাথ সেই সময় ১৯২৮-এ মাদ্রাজ ও কলম্বো হয়ে পণ্ডিচেরীতে যান শ্রীঅরবিন্দের আমন্ত্রণে। অতঃপর কবি সাগ্রহে বাঙ্গালোরে যান শীল মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সেখানে ব্রজেন্দ্রনাথের উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শেষের কবিতা'র সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি তাঁকে পড়ে শোনান।

এটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ রবীন্দ্র জয়ন্তীর বৎসর—১৯৩১। মহাকবির বয়স এখন পূর্ণ সত্তর। এটির জন্য সমগ্র বাংলার সর্বজনবিদিত শ্রেষ্ঠ মনীষীদের নিয়ে এক বিরাট কমিটি গঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে একখানি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হবে, তার নাম দেওয়া হচ্ছে "গোল্ডেন বুক অফ টেগোর"। সম্পাদনা করবেন 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক—যিনি দেশের সকল সম্পাদকেরই নমস্য—সেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁর জামাতা ডাঃ কালিদাস নাগ ও মিউনিসিপাল গেজেটের সম্পাদক সৌম্যদর্শন অমল হোম—এঁরা দুজনে এই উৎসবে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তখন বাংলায় মনীষী ও প্রতিভাবান ব্যক্তির সংখ্যা এত বেশি এবং কমিটির সুদীর্ঘ তালিকায প্রবীণ লেখক, কবি, ঔপন্যাসিক, শিল্পী, দার্শনিক, অধ্যাপক, জজ, ব্যারিস্টার ইত্যাদির নাম এত বেশি জুড়ে রয়েছে যে, আমাদের মতো নবীন লেখকদের কোথাও ঠাঁই নেই, এবং কেউ আমাদের পোঁছে না। তাছাড়া আমরা তখন 'বস্তি সাহিত্যের লেখক', আমাদের নাম দিয়েছে 'ছাগ-সাহিত্যিক'—অমল হোম নাম রেখেছেন 'অতি আধুনিক'। আমাদের নাম উচ্চারণ করলে তখন ভাতের হাঁড়ি ফাটে, আমাদের মুখ দেখে বেবোলে তখন অযাত্রা, ভদ্র সমাজে আমাদের প্রবেশ ঘটলে আশেপাশে আতঙ্ক, সভাসমিতিতে গেলে 'ভদ্রলোকেরা' সভা ছেড়ে চলে যান। সুতরাং আমাদের কারোকে ওই কমিটিতে ঢুকতে দেবার কথাই ওঠে না!

আমি নিজে তখন স্বদেশের, উপাসনার, বিজলীর বা দুন্দুভির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পাদক হলে কি হবে আমার মূল্য কানাকড়িও নয়। অতএব আমি যথাসময়ে গিয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তী দেখার জন্য একখানা পাঁচ টাকার টিকিট কিনলুম। এমনি একটা সময়ে বক্সা দুর্গের অন্তরীণ বন্দীরা রবীন্দ্রনাথকে তাদের কারাগার থেকে একটি অভিনন্দন পাঠান। রবীন্দ্রনাথ তখন দার্জিলিংয়ে। তিনি এই অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে যে প্রত্যভিনন্দন কবিতাটি বক্সা দুর্গের রাজবন্দীদের নিকট পাঠিয়ে দেন সেটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ। সেই কবিতাটি হাতে পেয়ে ছুটে গিয়ে শ্রীমতী শোভার কাছে প্রথম আবৃত্তি করেছিলুম—"নিশীথের লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন/পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা সংগীত না মানিল বন্ধন—" ইত্যাদি। কবিতাটি শুনে শোভার চোখে জল পড়েছিল।

বৃহত্তর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীরা রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন গোল্ডেন বুক অফ টেগোর গ্রন্থে। সম্পাদক রামানন্দবাবু অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের সঙ্গে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের কাছেও একটি চিঠি দিয়ে একটি লেখা

চেয়েছিলেন। সম্ভবত রামানন্দবাবু তাঁর চিঠিতে শরৎচন্দ্রকে এই প্রকার লিখে থাকবেন, 'গোল্ডেন বুক অফ টেগোর' গ্রন্থে সব লেখাই থাকবে ইংরেজিতে বা বিদেশী ভাষায়। আপনার বাংলা লেখা পেলে আমরা ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে নেবো।

একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ। ব্রাহ্ম সমাজ খুশি ছিল না শরৎচন্দ্রের 'দুর্নীতি পূর্ণ' সাহিত্যের জন্য এবং শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাস 'দত্তা' লিখে হয়ত তার প্রতিশোধ নেন। ওদিকে 'প্রবাসী' মাসিকপত্র শরৎচন্দ্রের কোনও লেখাও ছাপে না। সুতরাং শরৎচন্দ্রের মনে একটা অভিমান বা আক্রোশ ছিল। এমন সময় রামানন্দবাবুর এই চিঠি সেই অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিল। চিঠির মধ্যে এই গন্ধ পাওয়া গেল যে শরৎচন্দ্র ইংরেজি ভাষা রচনায় অপটু অর্থাৎ তিনি উচ্চ-'শিক্ষিত' নন। শরৎচন্দ্র ক্রুদ্ধকণ্ঠে বন্ধু মহলে বললেন, রামানন্দবাবু কি জানেন যে আমি বাংলার চেয়ে ইংরেজিতে ভাল লিখতে পারি? স্পেন্সারের লেখা আমার আগাগোড়া মুখস্থ, তিনি কি তার খোঁজ রাখেন?

অনিলা 'দেবী'—এই ছদ্মনামে শরৎচন্দ্র 'নারীর মূল্য' নামক একখানা ছোট প্রবন্ধের বই লিখেছিলেন। ওই বইটিতে মাঝে মাঝে দু-চার ছত্র ইংরেজি কোটেশন থাকার জন্য পাঠক সমাজে প্রথম জেনেছিল যে, শরৎচন্দ্র ইংরেজি বেশ ভাল জানেন! তাছাড়া তিনি চাকরি করতেন রেংগুনে, এবং সম্প্রতি তিনি হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির এক বিশিষ্ট পরামর্শদাতা। ইংরেজি কিছু না জানলে তাঁর চলবে কেন?

যাই হোক 'গোল্ডেন বুক অফ টেগোর'-এ শরৎচন্দ্রের লেখা ছাপা হয়নি। কিন্তু এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যাঁদের শ্রদ্ধা, অনুরাগ, সম্মান ও প্রীতির বাণী ছাপা হয়েছিল, তাঁরা সকলে তখন জগৎসভায় অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। কয়েকজনের নাম এখানে আমি উল্লেখ করতে পারি। যেমন রোমাঁ রোলাঁ, আইনস্টাইন, কাউন্ট কাইজার-লিঙস্টেলা ক্রামরিশ, হ্যারল্ড ল্যাস্কি, এইচ জি ওয়েলস, মরিস মেটারলিঙ্ক, বার্নার্ড শ, নুট হামসুন, বার্ট্রান্ড রাসেল, যোহান বোয়ার, সোয়েন হেডিন, জুলিয়ন হাক্সলি, আপটন সিনক্লেয়ার, হেলেন কেলার, কবি নোগুচি, ট্রুচি হ্যাভেলকে এলিস, কবি ইয়েটস, কোচে, জন গলসওয়ার্দি, অধ্যাপক পিনকেভিচ (মস্কো) নিকলাস রোয়েরিথ, সি এফ এণ্ডরুজ প্রভৃতি। এছাড়া চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, জাভা, শিয়াম, ব্রহ্মদেশ, পারস্য, আরব, মধ্যপ্রাচ্য, সোভিয়েট ইউনিয়ন, সমস্ত ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা কানাডা আফ্রিকা—সর্বদেশের বিপুল অভিনন্দন বাণী গ্রন্থে ছাপা হয়েছিল। ভারতবর্ষের পক্ষে গান্ধীজী, শ্রীঅরবিন্দ, রাধাকৃষ্ণণ, আচার্য জগদীশ, সি. ভি. রমন, জওয়াহরলাল নেহরু, স্যার অতুলচন্দ্র, ভাণ্ডারকর, আনন্দ কুমারস্বামী, মেঘনাদ সাহা, সুরেন দাশগুপ্ত—এবং আর কত নাম করব? বর্তমান শতাব্দীকালে 'গোল্ডেন বুক অফ টেগোর'-এর মতো বিরাট বাণী-সংগ্রহ গ্রন্থ আর কখনও ছাপা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবী জয় করেছিলেন, এবং শোনা যায় কমবেশি আড়াইশটি ভাষায় তাঁর সাহিত্য ও কাব্যের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

আমার পাঁচ টাকার টিকিট, তাও অমল হোম আর প্রবোধ চাটুয্যেকে ধরে কেঁদে-

কেটে যোগাড় করেছি। আমার নৈতিক অধিকার ছিল টিকিট পাবার। কেননা তখন কোথাও রবীন্দ্র-কবিতার আবৃত্তির আসর বসলে প্রথমে আমার ডাক পড়ে।

গভর্নমেণ্ট হাউসের পশ্চিম পাঁচিল থেকে স্ট্রাণ্ড রোড পর্যন্ত—এই বিরাট অবকাশের মধ্যে 'রবীন্দ্র জয়ন্তীর' উৎসব অনুষ্ঠান বসছে। উত্তরের ফুটপাথে অ্যাকাউণ্টাণ্ট জেনারেল অফ বেঙ্গলের আপিস থেকে আরম্ভ করে টাউন হল, টেম্পল চেম্বার্স, হাইকোর্ট ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কোণ পর্যন্ত প্রায় দুই লক্ষ চেয়ার দেওয়া হয়েছে। এটি জনসমুদ্র নয়, এটি ছিল সেদিন জগজ্জয়ীপ্রতিভাধর ও মনীষীদের এক মহাসাগর সঙ্গম। সেদিন পৃথিবীর ছয়টি মহাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্বজ্জন ও মনীষী-দের একত্র সমাবেশ ঘটেছিল কলকাতায়,—ভারত ইতিহাসে এই শতাব্দীতে এত বড় একত্রিত সম্মেলন আর কখনও ঘটেনি। কেবলমাত্র ভারতীয় সামন্ত নরপতিগণের সংখ্যা ছিল চারশ'রও বেশি। এ'দের বাইরেও ছিলেন তুর্কী বংশীয় হায়দারাবাদের নিজাম, নেপালের সম্রাট ও প্রধানমন্ত্রী, শিয়ামের সম্রাট, ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা, মিসরের ফারুক, অযোধ্যা ও মুর্শিদাবাদের নবাব, কাশ্মীরের মহারাজা, কাশী-নরেশ ইত্যাদি।

তখন বর্তমান বিধানসভার অট্টালিকা নির্মিত হয়েছিল কিনা মনে পড়ছে না। বোধ হয় হয়নি। ওরই সীমানায় এক অতি উচ্চ সালঙ্কার মঞ্চ তৈরি হয়েছে। তারই চূড়ায় সিংহাসনে বসবেন বিশ্বকবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ। সেই মঞ্চটা এত উঁচু যে, মনে হচ্ছে উপর দিককার সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র ছাড়িয়ে মহাকবির শ্বেতশুভ্র ললাট গগন চুম্বন করবে।

তাই হল। মহাকবি সিঁড়ি দিয়ে উঠেছিলেন। পরনে তাঁর গরদের ধুতি, পাঞ্জাবি ও কাঁধে চাদর। তাঁকে একদিকে ধরে আছেন অমল হোম এবং অন্যদিকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। আচার্য তাঁর পুরনো অভ্যাসবশত বার দুই মহাকবির পিঠ চাপড়িয়ে নিলেন! আচার্য কবি প্রায় সমবয়সী।

আর কিছু নয়, সেদিনকার ওই সমাবেশের কালে পৃথিবী ও ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদেরকে মহাকবির তুলনায় অত্যন্ত সামান্য ও নগণ্য মনে হয়েছিল।

কিন্তু রবীন্দ্র জয়ন্তীর ওই বিরাট উৎসবের কালে চারিদিকে যখন 'মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ' তখন সেই উৎসবের দিন প্রভাতকালে কলকাতার সংবাদপত্র জগতে এক প্রচণ্ড বোমা বিস্ফোরণ ঘটল। সেই সাংঘাতিক বোমাটি আচমকা ওই শুভ সমারোহের উপর নিক্ষেপ করল আমাদের শিবরাম চক্রবর্তী। তার ওই জয়ন্তী বিরোধী প্রবন্ধটি প্রকাশিত হল 'নবশক্তি'তে। প্রচুর পরিমাণ মিষ্টান্ন খেয়ে সকলের গলার মধ্যে যখন কিটকিট করছে সেই সময়ে শিবরামের এই চাটনি নিন্দারসিক বাঙালীর পক্ষে বড়ই উপাদেয় লাগল! সকাল থেকে 'নবশক্তি' সাপ্তাহিক পত্রিকাটি পথে-ঘাটে হাটে-বাজারে হাজার-হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেল। শিবরামের এই প্রবন্ধ রঙ্গে ব্যঙ্গে বিদ্রুপে উপহাসে বক্রোক্তিতে একদিকে ছিল যেমন প্রখরভাবে রবীন্দ্র-বিরোধী অন্যদিকে তেমনি ছিল ক্ষুরধার, সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক। এই প্রবন্ধে শিবরাম হয়ে উঠেছিল 'পরশুরাম'!

শোনা যায় আগের দিন মধ্যরাত্রে কোন কোনও লোক এই লেখাটার খবর পেয়ে শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের কাছে ছুটে যায় যাতে তিনি এই লেখাটার প্রকাশ বন্ধ করে দেন, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। শরৎবাবু চেষ্টা করেও ওটা বন্ধ করতে সমর্থ হননি। কারণ, ফর্মাগুলো তখন হাতের বাইরে চলে গেছে।

'মহিলা' শব্দটি তৎকালে সবেমাত্র এখানে ওখানে অল্পস্বল্প ব্যবহার করা চলছে। যতদূর মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির রচনায় ওই শব্দটি তখনও ব্যাপকভাবে ব্যাবহৃত হচ্ছে না। নারী, মেয়ে, স্ত্রীলোক, মেয়েছেলে, স্ত্রী-কবি, নারী-লেখিকা—এইগুলি প্রচলিত ছিল। কিন্তু রেলগাড়ির কামরায়, থিয়েটারের প্রবেশ-পথে, সরকারী স্নানাগারে, প্লাটফরমের প্রান্তিক বাথরুমে শুধু লেখা থাকত 'ফিমেল'। ফিমেল অর্থে মহিলা নয়, পুরুষের বিপরীত লিঙ্গ মাত্র। সেই কারণে এর আগে এসেছিল ইংরেজিতে 'লেডি'। যাঁরা ইংরেজের কাছে সমাদর পেয়ে নাইটহুড লাভ করতেন তাঁদের স্ত্রীরাই হতেন 'লেডি'। যেমন লেডি প্রতিমা মিত্র, লেডি সরকার, লেডি রাণু ইত্যাদি। এই লেডি শব্দটাই ক্রমশ 'মহিলা' শব্দে পরিণত হল।

যাই হোক, এমনি একজন তরুণী মহিলা শ্রীমতী চৌধুরী 'বিজলী' আপিসে মাঝে মাঝে বারীন ঘোষের কাছে আনাগোনা করছিলেন। খ্যাতিমান ব্যক্তিদের পক্ষে এ-গুলো প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক। শুধু মেয়ে নয়, পুরুষও আসে। অনেকে এদেরকে বলে 'সেলেব্রিটি হানটার'। বারীনদা তখন একটি ছোট বই প্রকাশ করেছেন। নাম 'নতুন সমাজের ইঙ্গিত'। এই হৃষ্টপুষ্ট তরুণী মহিলাটি সেই বইটি নিয়ে প্রায়ই আলোচনা করতে আসেন। ক্রমশ এই মহিলার নাম শুনলুম অণিমা এবং ইনি এম এ-তে ইকনমিকসে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছেন। সম্প্রতি উনি কোন্ এক নতুন গার্লস স্কুলে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর দায়িত্বভার নিয়েছেন, এবং শীঘ্রই নাকি দক্ষিণ কলকাতায় একটি উইমেনস কলেজের প্রফেসারি পাচ্ছেন। মহিলার বয়স চব্বিশ-পঁচিশ হতে পারে। তা হোক। আমার নিজের বিদ্যেবুদ্ধি কম। ইকনমিকস এর অ-আ-ক-খ তখন জানিনে। সুতরাং কি বেফাঁস বলে বসব—আমি ভয়ে-ভয়ে দূরেই থাকি।

শ্রীমতী চৌধুরী যখন দিনের পর দিন বারীনদার সঙ্গে 'নতুন সমাজের ইঙ্গিত' নিয়ে আলোচনা করছেন, তখন আমরা তিনজন—রতিকান্ত পালিত, অনিল ভট্টাচার্য এবং আমি দিনমান ও সন্ধ্যারাত্রির অনেকটা অংশ 'চিত্রমন্দির'এ অতিবাহিত করি। এটি রতিবাবুর ফটোগ্রাফীর দোকান, এবং ট্রামরাস্তার ধারে ও 'চিত্রা' সিনেমার গায়ে এই মস্ত বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটটি তিনি ভাড়া নিয়েছেন। আমাদের মধ্যে অনিল শুধু বিবাহিত। সে বিজলীর বাড়িতে থাকে, ইণ্ডিয়ান সিল্ক হোমের তসর-গরদ ক্যানভাস করে এবং অবসরকালে এই চিত্র-মন্দিরে আড্ডা দেয়। সে আমার অত্যন্ত প্রিয়, এবং সে যখন আমাকে না জানিয়ে আমার পকেট থেকে পয়সা নিয়ে খরচ করে, অথবা যখন হাতে-নাতে ধরা পড়ে, তখন আমার দিকে চেয়ে মিষ্ট হাস্যে শুধু বলে, লজ্জা করে না বলতে?

আমার পকেট সে মারছে অথচ 'চোর' ধরলে আমারই লজ্জা—এটি শুনে আমরা সবাই হেসে গড়িয়ে পড়তুম। আমরা তখন পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দের যোগাশ্রম নিয়ে আলাপ আলোচনা করি এবং এক-এক সময় চোখে পড়ে অনিল কেমন একটা ভাব-সমাধিতে বসে বসেই নিস্তব্ধ হয়ে যায়। তার মিষ্ট স্বভাব, মধুর ব্যবহার এবং এক প্রকার অদ্ভুত ধরণের নিরাসক্তি লক্ষ্য করে আমিও উন্মনা হয়ে যেতুম। এই চিত্র মন্দিরে প্রায়ই আসতেন বারীনদা, নির্মলা, কনক, অমূল্য, শশাঙ্ক চৌধুরী, পণ্ডিচেরীর নলিনী গুপ্ত মহাশয়ের স্ত্রী ইন্দুলেখা দেবী, নলিনীকান্ত সরকার ইত্যাদি। এই চিত্রমন্দিরের দোতলা পরবর্তীকালে গুপ্ত বিপ্লবীদের একটি যোগাযোগ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। সে-কথা পরে বলব।

এই চিত্রমন্দিরের দোতলায় হঠাৎ একদিন বারীনদার দলবলের সঙ্গে শ্রীমতী চৌধুরী এসে উপস্থিত হন। বেলা আন্দাজ এগারোটা। আমি তখন সবেমাত্র অনিলের সঙ্গে বসে চা পান করছি এবং খবরের কাগজখানা ওলটাচ্ছি, সেই সময় বারীনদা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসের সঙ্গে বললেন, 'ওই যে পেয়ারেলাল' ওই নাও—এখানেই পেয়ে গেলে তো?

বারীনদা আমাকে গান্ধীর চেলা ঠাউরিয়ে মধ্যে-মাঝে 'পেয়ারেলাল' বলে তামাশা করতেন। পেয়ারেলাল গান্ধীজীর অন্যতম সেক্রেটারী। বারীনদা বললেন, অণিমা ধরেছে তোমার সব দিগ্বিজয়ের গল্প শুনবে! তোমার কাশ্মীরের কাহিনী, তোমার মিলিটারী লাইফ, পাঠানদের নিয়ে তোমার ঘরকন্না—সব ওকে বলো দেখি একে একে—।

শ্রীমতী চৌধুরী হাসিমুখে পাশে বসলেন। বললেন, এতদিন ধরে বিজলী আপিসে আপনাকে দেখে চলে যাচ্ছি, আপনি আমলই দেন না—

নির্মলাদের নিয়ে বারীনদা চলে গেলেন বেহালার দিকে। থাকবেন সেখানে দু'-চারদিন। রতিবাবু ডার্করুমে ছবি ডেভেলপ করতে ব্যস্ত। অনিল তৈরি হয়ে যাচ্ছিল সিক হোমে। আমি একটু অসহায় বোধ করে বললুম, গল্প শুনতে চাইলেই গল্প আসে না, বোঝেন তো?

সে আমি জানি। বলুন তবে কবে আসব?

ওঁর ওই চাহনি আর ঔৎসুক্য আমার মনে বিকলন ঘটিয়ে দিল। মনে হল গল্প শোনাই ওর একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। শুধু মুখে বললুম, আমার গল্প শুনে কি হবে আপনার? তাছাড়া আপনার সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই!

আছে, আপনি ধরতেই পারেন নি—অণিমা বললেন, বারীনবাবু কি ভাবছেন তাঁর বই নিয়ে আমি যখন তখন আলোচনা করতে আসি? ওটা তাঁর ভুল। আমি মোহন লাল স্ট্রীটে আসি ওঁর জন্যে নয়, ও'র বইয়ের জন্যেও না—

এমন সময়ে ডার্করুম থেকে বেরিয়ে এলেন রতি পালিত। হাসি মুখে তিনি এগিয়ে এলেন। বললেন, একটু চা চলবে নাকি?

বললুম, উনি রতিকান্ত পালিত, এখানকার মালিক। না রতিবাবু—চা আর

আনাবেন না। সকাল থেকে সাত আট পেয়ালা হয়ে গেল। এবার বাড়ি যাব! ইনি হলেন অণিমা চৌধুরী—

উভয়ে নমস্কার বিনিময় হল বটে কিন্তু পলকের মধ্যে লক্ষ্য করলুম শ্রীমতী চৌধুরী তৃতীয় ব্যক্তির গায়ে-পড়া আবির্ভাবে খুশী হননি। ঈষৎ বিমর্ষ মুখে তিনি আমার দিকে তাকালেন এবং আমি তখনই উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, ক্ষমা করবেন, এবার আমি যাই। রতিবাবু চমৎকার লোক, ওর সঙ্গে দুদণ্ড আলাপ করে যান।

শ্রীমতী চৌধুরী আমার নিরুৎসাহের চেহারাটা ভাল করেই অনুধাবন করলেন। আমি তাঁর চোখের উপর দিয়েই নিচে নেমে গেলুম। আমি ভয় পেয়েছিলুম।

আমার মনে হচ্ছিল বারীনদা বোধ হয় আমার সম্বন্ধে একটা কিছু প্ল্যান ভাবছিলেন। নইলে শিকদার বাগানে তার বড় দাদা বিনয়ভূষণবাবুর বাড়িতে যখন একটা আনন্দ সম্মেলনের মাঝখানে এসেছিলুম, এবং নজরুলের গানের স্বরলহরীতে সবাই যখন তন্ময়, তখন হঠাৎ শ্রীমতী অণিমা কোথা থেকে এসে হাজির হলেন সেই সন্ধ্যা? তিনি আমারই খোঁজে এসেছেন! সকলের মাঝখান থেকে একটু বিব্রতভাবেই বাইরে এসে ওঁকে নমস্কার জানিয়ে বললুম, আসুন না ভেতরে, অনেকেই আছেন। চমৎকার গান হচ্ছে নজরুলের—

উনি বললেন, না এখানেই দু মিনিট বসে চলে যাব। আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এলুম।

যাতায়াতের পথে একখানা বেঞ্চি পাতা ছিল জানলার ধারে। তার ওপর বসে তিনি আমাকে পাশে বসতে বললেন। কেমন করে তিনি এ বাড়ির ঠিকানা পেলেন আমার এ-প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন রতিকান্তবাবুর কাছ থেকে পেয়েছেন। সেদিন এটি আমার পক্ষে নূতন অভিজ্ঞতা যে একজন স্বল্পপরিচিতা মহিলা দু'চারটি কথাবার্তা বলার পর একখানা হাতে আমার পিঠের দিক বেষ্টন করে আমার চেহারার সুখ্যাতি করতে লাগলেন। অধ্যাপিকা চৌধুরী প্রায় আমার সমবয়স্ক মহিলা, কিন্তু তিনি বোধহয় ধরেই নিয়েছিলেন আমি অজ্ঞ এবং অর্বাচীন। আমাকে এইভাবে বেষ্টন করাটা তাঁর পক্ষে নিছক স্নেহের সরলতা নয় এটি তিনি জানেন, এবং তাঁর হাতের ভাষায় কী অর্থ রয়েছে, সেটি আমিও উপলব্ধি করতে পারি।

আমি অস্বস্তি বোধ করাতে তিনি হাতখানা সরিয়ে নিলেন। তখন আমি বললুম, আপনাকে একদিন গল্প বলতে হবে, এই তো? আপনার যখন এত আগ্রহ গল্প শোনার জন্য তাহলে আপনি বারীনদার আত্মকাহিনী পড়ুন না? আমি তো সামান্য।

মুগ্ধচক্ষু চিনবার মতো চোখ আমার হয়েছে। আমি স্পষ্টই যেন দেখতে পাচ্ছি সেই চোখের নিবিড় উন্মুখতা। আমি নাবালক নই।

শ্রীমতী বললেন, আপনি সামান্য কিনা আমি বুঝব। গল্প আপনি বলবেন, আমি শুনব—আর কেউ থাকবে না সেখানে। শুধু আপনি আর আমি। বলুন সে কবে? আমি কি আবার আসব?

ওঁর আগ্রহ যত বাড়ে আমার বুকে ততই কাঁপন ধরে। আসলে আমি ভীরু।

আমার চেহারাটা ডাকাবুকো হলে কি হবে, আসলে আমার মধ্যে জমে রয়েছে সেই পুরনো কালের রক্ষণশীল সংস্কার। সেই হতভাগ্য ব্রাহ্মণ খানিকটা নীতিবিদ্, কতকটা নিষ্ঠাবান, বাকিটা কাপুরুষ। আমার গলায় কী যেন আটকিয়ে যাচ্ছিল, আমি থতিয়ে একটা জবাব দিলুম—আপনাকে আর আসতে হবে না। আমিই যাব।

—বেশ তো আপনিই আসবেন! কবে আসবেন বলুন?—অণিমা বললেন, তার চেয়ে আমিই বরং বিজলী আপিস থেকে আপনাকে নিয়ে যাব সামনের শনিবার? ঠিক কখন আসব বলুন? আমাদের বাড়িতে গেলে আপনার কোন অসুবিধা হবে না। আমরা দিনাজপুরের লোক। আমাদের ওখানে থাকেন আমার দিদির বিধবা জা—তাঁর অনেক বয়েস এবং বাতের ব্যামো। তাঁর ঘরে তিনি শুয়েই থাকেন। আপনার কোনও সঙ্কোচের কারণ নেই। বলুন ক'টার সময় আসব? আজ কিন্তু বুধবার, আপনার মনে থাকবে তো?

বললুম, চারটের সময় আসবেন!—আমার কান দুটো ঝাঁঝাঁ করছিল।

শ্রীমতী চৌধুরী তখনই উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আসুন আমাকে গলির মোড়ে পেঁছে দিন একটু—।

আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে শিকদার বাগান স্ট্রীটের কতকটা পশ্চিমে এগিয়ে চললুম। প্রায় উনি আমার কাঁধ ছাড়িয়ে উঁচু। দীর্ঘাঙ্গ ও সুন্দর স্বাস্থ্যে যেন গরীয়সী। এবার মাথায় তিনি সামান্য ঘোমটা তুললেন। কিন্তু কথাবার্তার মধ্যে লক্ষ্য করেছি উনি যে একজন উচ্চশিক্ষিতা অধ্যাপিকা, একথা ওঁর মনেই থাকে না! ডাঃ ব্রহ্মচারীর বাড়ির কোণে দাঁড়িয়ে আমি প্রশ্ন করলুম, আমি যে আপনাদের বাড়িতে যাব আপনার স্বামীর অনুমতি আছে তো?

স্বামী! স্বামী কোথায়?—স্বচ্ছ সুন্দর হাসি হেসে শ্রীমতী চৌধুরী বললেন, এতদিন ধরে আপনার সামনে আসছি, আমার মাথায় কি সিঁদুর দেখেছেন?

একখানা ট্রাম এসে থামল, তিনি আমার একখানা হাত একটু টিপে দিয়ে হাসিমুখে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। কিন্তু আমার হাতখানা অবশ হয়ে গিয়েছিল।

পরবর্তী শনিবার মোহনলাল স্ট্রীটের বাড়ি থেকে ইচ্ছে করেই আমি অদৃশ্য হয়েছিলুম। তার অন্যতম কারণ ও-বাড়ি অপেক্ষা 'স্বদেশ' আপিসের দিকে আমার মন পড়ে থাকত। তখন আমি স্বদেশ-এর শরৎচন্দ্র জন্মতিথি সংখ্যার আয়োজন নিয়ে খুবই ছুটোছুটি করছি। আমাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করছে আমাদের ভবানী মুখুজ্যে।

হঠাৎ সেদিন অণিমা চৌধুরী এসে উপস্থিত। মধ্যাহ্নকাল। আমি একা। বলা বাহুল্য, তাঁর প্রথম অনুযোগ শনিবারে তিনি আমাকে খুঁজে পাননি। আমি হাসিমুখে তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসালুম। তিনি বললেন, আমি নাকি বড্ড ভীতু! আমি বললুম, আমার ভয়ের সঙ্গে একটা বিবেচনা থাকে। আপনি উচ্চশিক্ষিতা মহিলা অধ্যাপিকা, আমার ভয় আর বিবেচনা নিশ্চয় বুঝবেন আপনি। আমার দিকে শান্ত স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে অণিমা বললেন, ভয় আর বিবেচনা—এ দুটো মেয়েদের ভাগেই

পড়ে। সুতরাং আপনি নির্ভয়ে থাকুন? হাসিমুখে আমি বললুম, কিন্তু আপনার সঙ্গে গল্পে-গল্পে যদি রাত কাবার হয়ে যায়? উনিও হাসিমুখে বললেন, শনিবারে গেলে দু রাতও কাবার হতে পারত!

মহিলার দিকে আমি এবার স্পষ্ট চোখে তাকালুম। ওঁর মাথার উপরে পাখা ঘুরছে। কিন্তু ঘামের ফোঁটা নামছে ওঁর কপালের চুলের ঝালরের ভিতর দিয়ে। সেই ঘন চুলের বনাঞ্চলে আমি যেন দেখতে পাচ্ছিলুম, বাঘিনীর টসটসে দুটো বড় বড় চোখ শিকারেব দিকে নিবন্ধ হয়ে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। অধ্যাপিকা নয়, ইকনমিকসের এম-এ নয়, উচ্চশিক্ষার আভিজাত্যও নয়। উনি শুধু যুবতী মেয়ে। অস্ফুট জড়িত স্বরে উনি শুধু আমার চোখের দিকে চেয়ে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, আজ আপনাকে নিতে এসেছি। চলুন—

॥ ৩৩ ॥

'স্বদেশে'-এর নাম হয়েছে খুব। যে কখানা মাসিক ও সাপ্তাহিক এতদিন ধরে তরুণ লেখকদের হাতে ছিল সেগুলো একে একে টাকা, বিজ্ঞাপন ও সুপরিচালনার অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। প্রবাসী ও ভারতবর্ষ এখন মামুলী হলেও তারা আপন সম্পদে গরীয়ান। তবে কিনা লেখকরা তাদের অনুগ্রহের পাত্র। ভারতবর্ষের সম্পাদক রায়-বাহাদুর জলধর সেন হলেও মূল পরিচালক হরিদাস ও সুধাংশু চট্টোপাধ্যায়। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। জলধরদার চেহারাটা আমাদের ঠাকুরদাদার মতন। শান্ত, নিরীহ, ভদ্র ও স্নেহশীল বৃদ্ধ। তাঁর প্রধান কাজ ছিল শিবপুর অথবা সামতাবেড় গ্রামে গিয়ে লেখা পাবার জন্য শরৎচন্দ্রের কাছে ধরনা দেওয়া। 'বক্স-অফিস' হলেন তখন শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ নন। রবীন্দ্রনাথের বই তেমন বিক্রি হয় না—কেঁদে-ককিয়ে দু' বছরে বড়জোর একটা এগারশো'র এডিশন কাটে। শরৎচন্দ্র বাজারে পড়তে-না-পড়তে হট-কেকের মতন বিক্রি! যখন-তখন একটার পর একটা এডিশন। একদল শরৎভক্ত কবে যেন শরৎবাবুকে বলতে গিয়েছিল, আজ্ঞে, দেখুন দাদা—আপনার সব লেখা আমরা খুব সহজে বুঝতে পারি, সেই জন্যে এত ভাল লাগে। কিন্তু বিশ্বকবির লেখা আমরা বুঝতে পারি নে।

কেমন করে পারবে?—শরৎচন্দ্র জবাব দিয়েছিলেন, আমি যা কিছু লিখি সেসব তোমাদের জন্য! বিশ্বকবি যা লেখেন সেসব আমাদের জন্য!

ভক্তরা ভোঁতা মুখে ফিরে এসেছিল।

শরৎচন্দ্রের পরিহাসবোধের আরেকটি কাহিনী বলি। 'মৌচাকে'র সম্পাদক সুধীর সরকার মশায়ের ওখানে আসতেন কবি গিরিজাকুমার বসু। তিনি বয়সে তখন ষাট থেকে পঁয়ষট্টি। অত্যন্ত সরল মিষ্ট আমুদে লোক। তিনি রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের

খুবই ভক্ত এবং উভয়েরই খুব প্রিয়পাত্র। তিনি বলিষ্ঠ খর্বকায় ও স্থূলকায়। গল্পটা তাঁরই মুখে শোনা :

"শরৎবাবু একদিন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কয়েকজন ভক্তর কাছে বলছিলেন, আমিও তো লেখক, কিন্তু রবিঠাকুর অত ভালো কী করে লেখেন বল ত! শুধু ভাবি, কেন ওঁর মতন কিছুতেই আমি লিখতে পারি নে। রাগে-আক্রোশে আমার হাতখানা যেন নিসপিস করে! আমি এর প্রতিশোধ নিতে চাই! হঁ্যা, নিলুম সেই প্রতিশোধ একদিন! বিশ্বকবির ওই শান্তিনিকেতনে এক দাগা ষাঁড় লেলিয়ে দিলুম।"

"ষাঁড়? বিশ্বকবির পিছনে ষাঁড় লেলিয়ে দিলেন? মানে?"

"হ্যাঁ গো, ওই তোমার গিরিজাকে পাঠিয়ে দিলুম কবির কাছে! বুঝলে না?"

গল্পটা বলতে বলতে গিরিজাদা নিজেই হেসে কুটোকুটি। তিনি তাঁর মধুর ও সরল আলাপচারীর জন্য বন্ধু মহলে খুবই প্রিয় ছিলেন।

আমি স্থির করেছিলুম, এবার শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি উপলক্ষে 'শরৎ-জয়ন্তী-সংখ্যা' বের করব 'স্বদেশ'-এর। সেজন্য তোড়জোড় করছিলুম। স্থির করলুম, আমার সমকালীন লেখক-লেখিকাদের লেখাই ছাপব, বড়দের কাছে যাব না। শরৎচন্দ্রকে তখন গালি দিচ্ছেন ব্রাহ্মসমাজের সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রায় বাহাদুর যতীন্দ্র-মোহন সিংহ, অবতার' সাপ্তাহিকের অমরেন্দ্র রায়—আর কে কে যেন। 'অবতার'-এর দাম ছিল এক পয়সা। ওটা ঝেড়ে গালাগাল দিত শিশির ভাদুড়ি আর শরৎ চাটুয্যেকে। কাগজখানা বোধহয় বৃহস্পতিবারে বেরোত। সেদিন একখানা টাটকা কাগজ নিয়ে কয়েকটি হুল্লোড়বাজ বাঙালী তরুণ উঠেছে পটলডাঙ্গার মোড় থেকে এক ডবলডেকার বাসে। 'অবতার'খানা হাতে নিয়ে চোখ বুলিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে সোল্লাসে চেঁচামেচি করছিল, এবং তাদের ভাষাটা ছিল এইরূপ—দেখেছিস মাইরি, দেখেছিস—সু-সালা সরৎ চাটুয্যেকে কি রকম জুতিয়েছে, দেখেছিস্-স?"

ছেলেরা জানত না তাদের সামনেই শরৎচন্দ্র এক ঠোঙ্গা কচুরি ও সিঙ্গাড়া নিয়ে এক সীটে বসেছিলেন। তিনি শ্যামবাজার থেকে ভবানীপুর যাচ্ছিলেন। শ্যামবাজারে দ্বারিকের দোকানের নোনতা খাবার তাঁর প্রিয় ছিল। এ গল্পটি তিনি নিজেই বলে-ছিলেন কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'রসচক্রে' বসে।

লেখকদের মধ্যে নজরুল প্রমুখ সকলে তো আমার হাতের পাঁচ। লেখিকাদের মধ্যে জ্যোতির্ময়ী, রাধারাণী—আর কে? একজন রয়েছেন, তাঁর নাম কনকলতা ঘোষ। আরেক জন দীপালি। আরও আছেন জন দুই, তাঁরা একটু-আধটু লিখতেও পারেন! একজনের নাম নীলিমা চট্টোপাধ্যায়, অন্যজন রমলা দেবী। মুশকিল এই, এঁরা ছোট ছোট প্রবন্ধ এবং কথিকা লিখে পাঠান যত, চিঠিপত্র লেখেন তার চেয়ে অনেক বেশি। গত বছর বারীনদা ওঁদের সব চিঠিগুলো আমার ঘাড়ে চাপাতেন, চিঠির জবাব দেবার দায় নাকি আমার বেশি। খানপাঁচেক চিঠি একজনে লিখলে অন্তত একখানারও জবাব দিতে হয়, নইলে ভদ্রতা থাকে না। নীলিমা চট্টোপাধ্যায় থাকেন রাঁচীর হিনু অঞ্চলে। বোধ হয় তাঁদের অবস্থা ভাল, চিঠির সঙ্গে

অনেকগুলো ডাকটিকিট থাকে। উনি আবার নামের পাশে লেখেন বি-এ। একে মেয়ে তায় বি-এ, সুতরাং সাবধানে জবাব দিতে হয়। কনকলতা, রাধারাণী, জ্যোতির্ময়ী এঁদের নিয়ে অসুবিধা নেই। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী তখন উঠছেন, তবে তিনি এখন জলধরদার 'কপিরাইট'। আমার পুঁজি হচ্ছেন কবি প্রিয়ম্বদা দেবী। মালদা থেকে আমার নিজের কোন কোন লেখার স্তুতিবাদ। ওটায় আমি অসুবিধা বোধ করি। হঠাৎ একবার একখানা চিঠিতে তিনি লিখলেন, আমার একখানা ছবি নাকি কোন্ কাগজে বেরিয়েছে, তিনি সেখানি কেটে যত্ন করে রেখে দিয়েছেন! উপরন্তু আবার প্রশ্ন করেছেন, এ কাজ কি আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছে? দাও, এবার জবাব দাও! আমার পদ্ধতি হচ্ছে, 'শতং বদ বা লিখ।' অত চিঠিপত্র লেখা আমার আসে না, ওতে আমি বিরক্ত হই। পুরুষ হোক বা মহিলাই হোক—সামনে এসে দাঁড়াও, কাজের কথা বলো, লেখা দেবার থাকে দিয়ে যাও, তারপর ভেগে পড়ো! ইনিয়ে-বিনিয়ে চিঠির জবাব দেবার সময় সম্পাদকদের নেই। ছেঁড়া-কাগজের ঝুড়িতে কত অপদার্থ লেখা ফেলে দিয়েছি, তার খবর তুমি নিতে চাও চিঠি লিখে-লিখে! অত মাথা ঘামাবার সময় কোথায়? তখন আমার 'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল।' এর ওপর আবার রমলা দেবী লিখছেন, কলকাতায় গেলে আমি কোনও কাজ পেতে পারি কিনা! আমি হাতের কাজ, সূচীশিল্প, মেয়ে-ইস্কুলে মাস্টারি, আমসত্ত্ব তৈরী, পশমের সোয়েটার বোনা, হাসপাতালে নার্সিং—এসব পারব। আপনি যদি এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করেন, আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

আমার সম্পূর্ণ অক্ষমতা জানিয়ে সেই দিনই দু' লাইন চিঠি পাঠিয়ে দিলুম। এক সপ্তাহের মধ্যে আবার সেই চিঠির জবাব এল: আপনার চিঠির জন্য অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু আমার বাক্সর ভিতর থেকে আপনার ছবিটি আরেকবার বার করে দেখলাম আপনার দু' লাইনের কঠোর ভাষার সঙ্গে আপনার ছবিটির কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমার এই চিঠির সঙ্গে বারীন ঘোষ মহাশয়কে একখানা চিঠি দিচ্ছি, দয়া করে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আমি যেমন করেই হোক নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই।

চিঠিখানা ছিঁড়ে ছেঁড়া-কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিলুম। খবর পেয়েছি বারীনদা যাচ্ছেন কাশীতে নির্মলাকে সঙ্গে নিয়ে। অমূল্য টাকাকড়ি দিচ্ছে। আমি এর মধ্যে কবে যেন বেহালায় গিয়ে বারীনদার সঙ্গে বচসা করে এসেছি।—আপনি নিজের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার সর্বনাশ করছেন, তা ছাড়া আপনার জন্য বাঙলার বিপ্লবীরা তাদের সম্মান হারাবে! আপনার নানা আচরণের মধ্যে আর সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, বারীনদা—

চিরদিনের সেই স্নেহশীল বারীনদা, আজন্মের থেকে পঞ্চাশ বছর অবধি যিনি নারীর স্নেহ ভালবাসার থেকে বঞ্চিত, তেরো বছর বয়স অবধি যিনি আপন উন্মাদিনী জননীর কাছে নিত্য-উৎপীড়িত, সেই বারীনদা আমার দিকে চেয়ে মধুর হাসি হাসছিলেন। পরে বললেন, নির্মলার বাইরেটা দেখলে তুমি ভেতরটার দিকে চোখ পড়ল

না? 'পেয়ারেলাল' তুমি চটেছ দেখছি! কিন্তু আমার দরকার নির্মলাকে।

আমাকে দেখলেই বারীনদা আর উপেন বাঁড়ুয্যের মুখ চুলকোয়। ও'দের মুখে কিছু আটকায় না। একই আড্ডায় যদি বসেন আনন্দবাজারের সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, পরলোকগত দেশবন্ধুর প্রিয়পাত্র ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন হেমন্তকুমার সরকার, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ওরফে আমাদের সর্ব-প্রণম্য দা'-ঠাকুর, নলিনী-কান্ত সরকার, নজরুল ইসলাম, 'ঊনপঞ্চাশীর' লেখক অগ্নিহোত্রী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় এবং আরও দু-একজন—তাহলে আর রক্ষা থাকত না! ভাগ্যি সেখানে কোনও যুবতী মহিলা উপস্থিত থাকতেন না, তাই রক্ষে। আমরা কয়েকজন আশে-পাশে থাকতুম সে কেবল হেসে হেসে গাড়াগড়ি দেবার জন্য। একবার বাজি রাখা হল, এই আসরে সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য অশ্লীল কে বলতে পারে? একে একে একে সকলের পালা এল। নজরুল ছিল সেদিন সবশেষে। সে তখন কবি-খ্যাতিতে দেশে জাজ্বল্য-মান। মিনিট খানেকের মধ্যে সে মুখে মুখে একটি পয়ার ত্রিপদীতে কবিতা আওড়িয়ে দিল! তার ফলে সেদিন সকলে কানে আঙ্গুল দিয়ে এই কবিতার থেকে আত্মরক্ষা করে চলে গিয়েছিলেন! নজরুল ফার্স্ট হয়েছিল। আমরা নজরুলের গর্বে গর্বিত। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়, নজরুল সেই সময় শ্যামাসঙ্গীত রচনা করে সমগ্র বাঙ্গলাকে মুগ্ধ করে তুলেছিল। সাধক রামপ্রসাদের পরে নজরুলের মতো এমন শ্যামাসঙ্গীত বোধ হয় আর কেউ লেখেনি।

যাই হোক, সেই বছর কাশী গিয়ে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি মাঠের ধারে দেখলুম, বারীনদার এক চায়ের দোকানের তাঁবু পড়েছে। অমূল্য হিসাব মেলাচ্ছে, নির্মলা চা বানাচ্ছে, বারীনদা ছাত্রদের মাঝখানে গিয়ে চা সার্ভ করছেন, এবং উচ্ছিষ্ট পেয়ালাগুলি একে একে এনে গরম জলে ধুয়ে গুছিয়ে রাখছেন। ছেলেরা কেউ জানে না, ইনি জগৎপ্রসিদ্ধ অগ্নিবিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—যিনি মাত্র পঁচিশ বছর আগে ব্রিটিশ ভারত সাম্রাজ্যের ভিতের তলায় ভূমিকম্প এনেছিলেন এবং যিনি ভারত-আত্মার অবিনশ্বর বাণীমূর্তি শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ সহোদর।

স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বারীনদা বললেন, এখানেও তাড়া করে এসেছ? বসো, চা খাও। এই তো বেশ স্বাধীন ব্যবসা—বেশ আছি এখানে। ওই বেঞ্চিতে বসো। ছেলেরা এখানে খুব ভদ্র।

নির্মলা ও অমূল্য আমাকে বাগে পেয়ে খুব হাসি পরিহাস করতে লাগল। ওঁরা সব কাশীবাসই করবেন এবং এই প্রকার দোকান দিয়েই চালাবেন। এই ধরণের চায়ের দোকান দেওয়া বারীনদার পক্ষে নতুন নয়। ও'র যৌবনকালে পাটনাতে এমনি এক দোকান দিয়েছিলেন! নাম ছিল, 'বি-ঘোষের টী-স্টল।' সেখানে তিনি তাঁর রাঙ্গা-মাকে সঙ্গে রাখেন। তারপর সেখানে বসন্তরোগের মহামারীর কালে দোকান ফেলে ছোটেন বরোদায় টাকার জন্য! সেখানে তখন ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। অতঃপর সে অনেক কাহিনী। পাটনার সেই চায়ের দোকান ইতিহাসের অতল তলে তলিয়ে যায়।

সন বা তারিখ আমার মনে পড়ছে না। তবে কাশীর এই চায়ের দোকান দেখে যাবার পর বোধ হয় বছর খানেকের মধ্যে বারীনদা বিবাহ করেন। এই বিবাহে যে কয়েকজন বাধা দিয়েছিলেন আমি তাঁদের অন্যতম। তবে কিনা বারীনদাকে সাগ্রহে যিনি বিবাহ করেন, তাঁর নাম শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরী। পটলডাঙ্গাবাসিনী এক বিধবা, দুটি পুত্রের জননী। বড় ছেলেটির বয়স তখন সতেরো-আঠারো! ছোটটির বছর ষোল। এই বিবাহের ফলে বারীনদার শেষ জীবন কিছু স্থিতিলাভ করেছিল। অতঃপর শ্রীমান অমূল্য, শ্রীমতী নির্মলা ও তার কন্যা কনক এরা কোথায় হারিয়ে গেছে আমি আর খোঁজ করিনি। সে যাই হোক, মহাপুরুষের বংশ বিশেষ থাকে না, বারীনদারও নেই।

আসবার সময় বারীনদা হাসিমুখে বললেন, তোমার সেই মালদার রমলা ঠিকানা খুঁজে আমার কাছে এসেছিল যে। বেশ ভাল মেয়ে হে। আমি তোমার নাম করে বললুম, সেই হল নাটের গুরু! সে সব পারে। তৈরি হয়ে থেকো, সে গিয়ে তোমার ওপর চড়াও হবে।

দূরের থেকে লক্ষ্য করলুম, ওই চায়ের দোকানের তাঁবুর আশেপাশে জনবসতি বিশেষ কোথাও নেই। এটি ক্যাম্পাসের ঠিক বাইরে মাঠের একান্তে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু ছেলেরা তখনও ডিম মাছ বা মাংস খেতে শেখেনি! খাচ্ছে চা বিস্কুট, টোস্ট বা চানাচুর। দোকানে নানা রকমের কেক্ সাজানো রয়েছে। জানি বারীনদার এ তাঁবুও উঠে যাবে একদিন। জানি একদিন প্লাবন 'এসে নিয়ে যাবে সর্বনাশার কূলে।' এ-খেলাঘরও বারীনদা একদিন ভেঙ্গে পালাবেন।

'স্বদেশ' মাসিক পত্রিকার শ্রেষ্ঠ সংখ্যা বোধ করি শরৎ-সংখ্যা। একটি চেয়ারেবসা শরৎচন্দ্রের ছবি 'পিয়োর ইতালিয়ান আর্ট পেপারে' ছাপা হয়েছিল প্রথমারম্ভে। এর আগে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে কেউ কোথাও বিশেষ-সংখ্যা প্রকাশ করেনি। 'স্বদেশ'ই প্রথম। পাঠকরা আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। শরৎচন্দ্রের বয়স তখন বোধ হয় তিপ্পান্ন-চুয়ান্ন। সেটি ১৯৩১।

এই সংখ্যাতেই বেরিয়েছিল লীলাময় রায় ওরফে অন্নদাশঙ্কর রায়ের একটি কড়া সমালোচনামূলক প্রবন্ধ 'শেষ প্রশ্ন'। এই প্রবন্ধটি তখনকার তরুণ ছাত্র বিষ্ণু দের কাছে অন্নদা স্বদেশের জন্য পাঠিয়েছিলেন। বিষ্ণুকে আমি কথা দিলুম, প্রবন্ধটির নকল কপিটি আমি সরিয়ে রাখব। কেননা ব্রিটিশ আমলে দেশী এস-এর লেখা সাময়িকপত্রে ছাপা নীতিবিরুদ্ধ। যাই হোক, এই প্রবন্ধে অন্নদা শরৎবাবু ও 'শেষ-প্রশ্ন'কে একেবারে তুলোধোনা করেছেন। বলেছেন, এ উপন্যাসই হয়নি, এ বই হল অসংগত 'এক বাণ্ডিল তর্ক'।'

তখন শরৎবাবুর স্তাবকমণ্ডলীতে দেশ ভরপুর। সেই কালে এই ধরনের শরৎ-বিরোধী লেখা এবং সেই লেখা তরুণদের 'স্বদেশ'-এ ছাপানো অত্যন্ত দুঃসাহসের পরিচয়। অন্নদা কেটে পড়লেন তাঁর ছদ্মনামের আড়াল দিয়ে। আমার মাথায় ইঁট-

পাটকেল পড়তে লাগল।

এই সময় ১নং গারস্টিন প্লেসে নৃপেন মজুমদার মশায় ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করে বেশ চালাচ্ছিলেন। ওখানে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই আমাদের বন্ধু। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অন্তরঙ্গ হলেন নলিনীকান্ত সরকার, বীরেন ভদ্র, বাণীকুমার প্রভৃতি। প্রসঙ্গত বলা চলে, ভারতবর্ষে বেতার কেন্দ্র প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার ও দমদমায় প্রথম বিমানঘাটি তৈরী হয় বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের উদ্যোগে। এই প্রতিষ্ঠান তৎকালে সাহেবদের দ্বারায় পরিচালিত হলেও বাঙ্গালীরা ছিল এর প্রাণশক্তি। তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী, তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, জে পি গাঙ্গুলী ও বেহালার তরুণ জমিদারপুত্র বীরেন রায়—যিনি আমাদের ভবানী মুখুজ্যের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পরবর্তীকালে ইংরেজরা বিদায় নেবার পর বীরেন রায় বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের সর্বাধিনায়ক হন এবং এঁরই তত্ত্বাবধানে ভারতের প্রথম মেয়ে-পাইলট হন যিনি, তিনিও বাঙ্গালী মেয়ে। তিনি কোচবিহার মহারাজার কন্যা প্রিন্সেস শ্রীমতী ইলা। এঁরই ভগ্নী বর্তমানে রাজস্থানের অন্যতমা সুন্দরী-প্রধানা মহারাণী গায়ত্রী দেবী। প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে, কোচবিহারের একখানি মুখপত্র ছিল, নাম 'পরিচারিকা।' সেই কাগজে আমার কি কি লেখা ছাপা হয়েছিল এখন আর মনে নেই, তবে গান্ধীশিষ্য বিনোবা ভাবের পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে কাজল-নয়না রাণী নিরুপমার সঙ্গে পরবর্তীকালে আমার চিঠিপত্রের আদান-প্রদান ঘটে। আমি দুঃখিত যে, লেডি রাণু মুখার্জির দিদি শ্রীমতী আশা আর্যনায়কমের বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও আমি শ্রীযুক্ত বিনোবা ভাবের 'গ্রামদান' আন্দোলনের অলীক ভাবোচ্ছ্বাসকে সমর্থন করতে পারিনি, বিনোবাবাজীর সামনেই আমার সুস্পষ্ট মনোভাব ব্যক্ত করার ফলে সেবার ভাবোচ্ছ্বাসী তারাশঙ্কর সেই সভা ছেড়ে পালিয়েছিল। অত বড় লেখক তারাশঙ্কর, এমন জনপ্রিয়—কিন্তু অনেক সময় তার বেহিসাবী ছেলেমানুষী নিজের সত্যদৃষ্টি হারাতো। যুক্তিবাদী পশ্চিমবঙ্গে শ্রীযুক্ত বিনোবাজী ঠাঁই পাননি। তাঁর আন্দোলন গ্রাম্য সরলতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে ভাল হয়!

ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন শরৎ বন্দনার আয়োজন করেছেন অনেককে নিয়ে। আমি তাঁদের মধ্যে একজন। এই সূত্রে আমি এমন একটি লেখা লিখেছিলুম যেটি ঠিক প্রবন্ধ নয়, শরৎবাবুর একটা রেখাচিত্র বা স্কেচ। সেই ছবি তার সাহিত্যের সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে একটি নাট্যরূপ। অনেক লেখক বা রচনাকার বেতারে প্রবন্ধ পড়তে যান। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, অধ্যাপক, সম্পাদক, সমাজনেতা, রাজনীতিক ইত্যাদি অনেকেই যান। কিন্তু বেতারের মূলনীতি 'রীডিং' নয়, 'টকিং'। শ্রোতাদের আমি প্রবন্ধ শোনাতে যাইনি, তাদের কানে কয়েকটা কথা বলে এলুম মাত্র! আমার ওই লেখাটা 'কীর্তনীয়া' নাম দিয়ে পাঁচ-ছয়বার নানা কাগজে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

যাই হোক, আমার পড়াটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পিছন দিক থেকে এগিয়ে এসে শরৎচন্দ্র আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, একটু আড়ালে এসো ভাই দুটো কথা আছে

তোমার সঙ্গে—

তখন গারস্টিন প্লেসের দোতলায় কোনও পার্টিশন-করা ছোট ছোট ঘর হয়নি এবং ইংরেজিয়ানা ঢোকেনি। কথায় কথায় ঘণ্টা বাজে না এবং চাপরাসী ছোটে না। চারদিকে দেশী ব্যবস্থা। নিয়মনীতির কড়াকড়ি নেই। তখন ওর মধ্যে চলছে পারস্পরিক ভালবাসার যুগ, বোঝাপড়ার যুগ নয়। নৃপেন মজুমদার মশায় সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

যাই হোক, শরৎচন্দ্র আমাকে নিয়ে গেলেন সেই বড় হলের এক কোণে যেখানে আলো নেই। এক জায়গায় দুজনে বসলুম। প্রথমে উনি আমার 'টক'টির সুখ্যাতি করে' বললেন, এমন করে ওঁর সম্বন্ধে আর কেউ বলেনি। তোমারটি চমৎকার হয়েছে। কিন্তু এ তুমি কি করলে? তোমার 'স্বদেশে' এমন অপমানজনক লেখা তুমি কেমন করে ছাপলে?

আমি ও'র মুখের দিকে তাকালুম। উনি লীলাময় রায় ওরফে অন্নদার লেখাটার কথা বলছিলেন।

শরৎবাবুর মুখে যে বিরক্তি ও আক্রোশ সেটি তাঁর প্রতি কথায় যেন প্রকাশ পাচ্ছিল। অতঃপর সুদীর্ঘ পনেরো মিনিটকাল অবধি তিনি যে উষ্মা প্রকাশ করে গেলেন, তার সব কথাগুলি এখন আর আমার মনে নেই।

আমি শুধু বলেছিলুম, 'স্বদেশ' সব রকম ভাল লেখাই ছেপে যাচ্ছে। লেখা সুলিখিত কিনা আগে দেখব। সাহিত্যের আলোচনা-সমালোচনায় নিন্দা-সুখ্যাতি দুই আছে। আপনার মতো বড় লেখক এ সবের ঊর্ধ্বে।

আমার নিজের কথাগুলোও সব মনে নেই। একটুকু মনে পড়ে, শরৎচন্দ্র আমার কথায় সুখী হননি। তিনি আমার সম্বন্ধে কেমন একটা সন্দেহ নিয়ে সেদিন বাড়ি ফিরেছিলেন।

তৎকালে হিংসাবাদীদের রাজনীতিক মামলা চলছে অনেকগুলি। এক চট্টগ্রামেরই তিনটি। আসানুল্লা হত্যা, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, চট্টগ্রাম রেলওয়ে ইনস্টিট্যুট ইত্যাদি। আগে বলেছি আমার সন্ তারিখ অতটা মনে থাকে না। আমি লেখার কালে পাঁজিও ঘাঁটছি নে, ইতিহাসও পড়ছি নে। শুধুমাত্র টুকরো টুকরো স্মৃতিচারণ করে যাচ্ছি। এই সময়ে অনন্ত সিংয়ের দিদি ইন্দুমতী একবার আসেন শ্রীমতী শোভার ওখানে। ইন্দুমতী নিজেও ছিলেন বিপ্লববাদিনী। তিনিও সূর্য সেনের সংগে যুক্ত। উভয় মহিলার মধ্যে কি কথা হল আমি জানিনে। এর পরেই দুটি কিশোরী মেয়ে শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী কুমিল্লায় গিয়ে তৎকালীন কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্টিভেন্স-এর নিকট চাঁদা চাইবার অছিলায় সামনে গিয়ে তাঁকে পিস্তল বা রিভল-ভারের সাহায্যে হত্যা করে। মেয়ে দুটি পালাতে পারেনি। কিন্তু এই ঘটনার কিছু-দিনের মধ্যেই শ্রীমতী ইন্দুমতীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সত্য মিথ্যা জানিনে ইন্দু-মতীকে নাকি বিভিন্ন প্রকার শারীরিক শাস্তি দেওয়া হয়। ব্রিটিশ প্রশাসন অতঃপর

স্থির করেন, সূর্য সেনকে গ্রেপ্তার না করলে এর প্রতিকার হবে না। সুতরাং তাঁরা একটির পর একটি গ্রাম ঘেরাও করছিলেন সূর্য সেনের জন্য—কখনও চট্টগ্রামে, কখনও নোয়াখালি বা বরিশালে, কখনও বা ঢাকায়। খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে পুলিসের দল বার করল এক গরুর গাড়ির গাড়োয়ানকে। সে 'মাস্টারদা'র খবর বেশ ভালই জানত। সেই গাড়োয়ান ওদেরকে সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিল। মাস্টারদার ঠিকানা কি, নিয়মিত কখন তিনি কোথায় আসেন বা থাকেন, কত রাত্রে কোথায় ফেরেন—আনুপূর্বিক সমস্ত গোপন সংবাদ দেওয়ার ফলে গাড়োয়ান বুঝি পেয়ে গেল টাকা দশেক বকশিশ। কিন্তু ওই পাগড়ি-পরা অর্ধনগ্ন ব্যক্তিটি কে এবং খড়বোঝাই গাড়ি নিয়ে সে ভাটিয়ালি সুর ধরে কোন্ মাঠ পেরিয়ে কোন্ দিকে গিয়ে অদৃশ্য হল—সে খবর পুলিস একেবারেই নিল না! এইভাবেই সূর্য সেন পালিয়ে পালিয়ে ছদ্মবেশে ঘুরছিলেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি ধরা পড়েন এবং বিচার-শেষে তাঁর ফাঁসি হয়।

ঢাকায় খুন হল দুটো, চট্টগ্রামে একটি। যথাক্রমে কামাখ্যা সেন, মিঃ লোমান এবং মিঃ আসানুল্লা। লোমান মস্ত বড় ইংরেজ প্রশাসক— বিনয় বসু তাকে হত্যা করে ফেরার হল। এইভাবেই রক্তবিপ্লব চলছে, এবং জীবন দিচ্ছে একের পর এক। মেদিনীপুর মার খাচ্ছে সব চেয়ে বেশী। জবাবও দিচ্ছিল তেমনি। ওই মেদিনীপুরেই তিনজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে একে একে হত্যা করা হল—মিঃ পেডি, বার্জ ও ডগলাস। মেদিনীপুর ফার্স্ট হয়ে গেল!

কুমিল্লায় কিংবা নোয়াখালিতে ঠিক মনে পড়ছে না, একজন পুলিস ইন্সপেক্টর তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়কে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করা হল।' দুর্ভাগ্যের বিষয়, হত্যাকারী ধরা পড়ে গেল এবং তার নাম বলল, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস। ছেলেটার বয়স বছর বাইশ। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আমার জীবনের যে একটা অংশ জড়িয়ে যাবে এটা সেদিন স্বপ্নেও ভাবিনি! পরে বলছি সে কথা।

ইতিমধ্যে নিমতলা ঘাট স্ট্রীটের এক ধনী পাট ব্যবসায়ীর সুদর্শন তরুণ পুত্র বরেন্দ্রসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। সে এক সাপ্তাহিক বার করে। কী যেন তার নাম। ওর বন্ধুরা হল প্রণব রায়, 'চুল' পাল, ওরফে ফণীন্দ্র পাল, পাঁচুগোপাল, সুনীল ধর—এরা। খামোকা আমাকে দিয়ে ওরা সম্পাদকীয় লেখা লেখাতে গেল। তখন চারিদিকে হিংসা, হানাহানি ও ব্রিটিশ শাসনের অমানুষিক উৎপীড়ন চলছে। কেনেও ছেলে মার খেয়ে পাগল হচ্ছে, কেউ পুলিস লক-আপেই মারা যাচ্ছে, কেউ যাচ্ছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে, কেউ বা 'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে (যারা) গেল জীবনের জয়গান।' আমি তখন বেশ কলম শানিয়ে বিপ্লবীদের বন্দনা লিখে যাচ্ছিলুম তিন-চারখানা মাসিকপত্রের সম্পাদকীয় হিসাবে। আমি তখন কেউ-কেটা!

আমাদের বন্ধু সত্যেন বসু ছিল খুবই সুশ্রী যুবক, আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড়। সে ছিল লিবার্টির সাব এডিটর। স্বভাবমধুর ব্যক্তি। কিন্তু তার পরনে থাকত ধবধবে মিহি খদ্দরের পাঞ্জাবি, তার সঙ্গে সোনার বোতাম। ওর দেখাদেখি আমিও সেই পরিচ্ছদ তৈরি করালুম। চেনসুদ্ধ খাঁটি গিনি সোনার এক ভরি ওজনের বোতাম—

মজুরিসুদ্ধ প্রায় আটাশ-ত্রিশ টাকা বেরিয়ে গেল। পায়ে আমার রাশিয়ান উইলো কাফ চামড়ার গ্রীসিয়ান স্লিপার জুতো। পকেটে সুগন্ধী রুমাল। মাথায় 'ক্যালিফর্নিয়া পপি মার্কা' সুগন্ধী তেল। মাথায় আমার ঘন চুলের ঝাঁক। বাঁ হাতের আঙুলে নীলা বসানো আংটি। অর্থাৎ গলায় একগাছা জুঁই ফুলের গোড়ে মালা দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে কারও ঘরে টেনে তুললেই হয়! না, একবর্ণও বাড়িয়ে বলছিনে। রাস্তার ফুটপাথে চলবার সময়ে লোকে আমার দিকে চেয়ে কী দেখত জানিনে, কিন্তু সুধীন নিয়োগী আর শশাঙ্ক চৌধুরী কথায় কথায় আমাকে খোঁটা দিত। আমার শরীর স্বাস্থ্য বন্ধুমহলে ঈর্ষার কারণ ঘটাতো।

এই পরিচ্ছদেই সেদিন 'স্বদেশ' আপিসে আসছিলুম। সেদিন কী যেন এক মারাত্মক রাজনীতিক ঘটনার ফলে কলকাতার রাজনীতিক নাড়ি ছিল চঞ্চল। বহুবাজারের ট্রামে চড়ে আসছিলুম লালদীঘির দিকে। ট্রাম থামল লালবাজারের আগের স্টপে। কয়েক পা পশ্চিম দিকে হাঁটতে-না-হাঁটতেই দেখি, ৩০৯ ও ৩১০ দুটো বাড়ির নিচে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লালপাগড়ি পরা পাহারওয়ালা, দশ বারো জন সশস্ত্র শ্বেতচর্মী বৃটিশ সার্জেণ্ট, খাকি জামাপরা জনকয়েক জমাদার ও হেড কনস্টেবল— ওই বাড়িকে সব দিক থেকে ঘেরাও করেছে। আমার আপিস ৩০৯ নম্বরের তেতলায়। কিন্তু কড়া পুলিস পাহারায় তার প্রবেশ-পথ বন্ধ। চারিদিক লোকে লোকারণ্য! ওই ভিড়ের মধ্যে কানাকানি শুনলুম, এখানে এক হত্যাকারী ও দাগী বিপ্লবী লুকিয়ে রয়েছে, তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য এই তোড়জোড়।

আমি ছিলুম দক্ষিণ ফুটপাথে। ট্রাম লাইন পেরোলে তবে আমার আপিস। আপিসে আমি 'বড়বাবু'। সুতরাং দুপুর একটা থেকেই আমার জন্য সবাই অপেক্ষা করে। 'স্বদেশ'-এর মালিক বৈদ্যনাথ বিশ্বাস আসেন সকাল সাড়ে দশটায়। তাঁর ইনস্যুরেন্সের কাজ। আমি আসি গদাই-লসকরি চালে। পঞ্চাশ টাকা মাত্র মাইনেতে এমন সর্বব্যাপী প্রভুত্ব আর কোনদিন পাইনি। সবাই সেলাম ঠুকে আমার পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়। আর আমি শুধু মনে মনে ভাবি "নিজেরে করিতে গৌরব দান/ নিজেরে না যেন করি অপমান—।"

আমার তখন পান জর্দা খাবার সামান্য একটু অভ্যাস চলছে। আমার জামায় একটু-আধটু ফরাসী এসেন্স-এর গন্ধ ও মুখে বদলরাম লছমীনারায়ণের জর্দার খুসবু থাকার জন্য শ্রীমতী শোভা প্রায়ই আমাকে তাড়না করতেন। যাইহোক মোড়ের মাথায় পানের দোকান থেকে পান কিনে জর্দা মুখে দিয়ে ওই পুলিস-বেষ্টনী ভেদ করে যখন প্রবেশ পথে ঢুকছি, জনৈক সার্জেণ্ট এগিয়ে এসে আমাকে ধরে নানা প্রশ্ন করে আমার জামার পকেট, কোমর ইত্যাদি টিপে সার্চ করল। তখনও কিছু বুঝিনি। এটা আপিস বাড়ি, কিন্তু সিঁড়ি ধরে যতদূর উঠি ততদূরে পর্যন্ত দল দল লালপাগড়ি ও জমাদারের জনতা। তেতলায় আমার বড় হলে ঢুকে দেখি সশস্ত্র পুলিস অফিসাররা গিজগিজ করছে। রাস্তা থেকে এই তেতলা পর্যন্ত দেড়শ দুশ পুলিস।

ব্যাপার কি?

বৈদ্যনাথ বিশ্বাস মশায় এগিয়ে এসে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটার ডেপ্রটি প্রলিস কমি-শনার প্রবীণ বয়স্ক মদনমোহন চক্রবর্তীর সংগে আমার পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া মাত্রই আমাকে বলা হল, "ইউ আর ইন ট্রাবল—"

বিশ্বাস মশায় সহাস্যে যুগিয়ে দিলেন, "আপনাকে গ্রেপ্তার করার জন্যই ও'রা সবাই এসেছেন। ওদের ধারণা এটা বিপ্লবীদের আড্ডা—আপনি নাটের গ্রর্!"

প্রথমটা মিনিট দুই আমার গলার মধ্যে পান সুপারি ও জর্দা সব কিছ্র শ্রকিয়ে গিয়েছিল। পরে বললুম, মশা মারতে কামান দাগতে গেলেন কেন? আমি এসেছি আমার অফিসে, এখানে অনেক কাজ আমার। আপনারা আমাকে টেলিফোন করলে আমি লালবাজারে গিয়ে ধরা দিতুম। ওয়ারেণ্ট কই, দেখান?

মদন চক্রবর্তী প্রবীণ অফিসার। তিনি ওয়ারেণ্ট বা'র করলেন। আমার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের জন্য ১২৪ক ধারা এবং তারই সংগে ৩০২/১১৭ ধারা যোগ হয়ে আমি খুনের মামলার এক আসামী,—'এডিং অ্যাণ্ড অ্যাবেটিং'। অর্থাৎ মামলা শুধু পুলিস কোর্টেই নয়, হাইকোর্ট পর্যন্ত যাবে।

খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই আমার! আমি লেখক আর সম্পাদক। আমি যাব খুন-খারাপির কাজে? ছ্ব'চো মেরে হাতে গন্ধ? আসুন মিঃ চক্রবর্তী, একটু চা খান্—। আপনি ত নিশ্চয়ই জানেন, পুলিসের টিকটিকি আমার সব গতিবিধি জানে!

ওরা সবাই আপিস তোলপাড় করে খানাতল্লাসী চালালো। আমার টেবল, আলমারি, র‍্যাক, চিঠিপত্র, ছে'ড়া কাগজের ঝুড়ি, কিছ্র বাদ দিল না। ও'রা বললেন, আমি নাকি অনেক বিপ্লবীর বন্ধু। বারীন ঘোষের সঙ্গে আমার গলায়-গলায় ভাল-বাসা! উপেন বাঁড়ুয্যেরা আমার গ্রর্স্থানীয়, সুতরাং আমি একজন বিপ্লবী!

যাঁদের নাম করলেন, তাঁরা এখন বারুদের খোল, ভিতরে বারুদ নেই। আর আমি? পাঁজি খুলে দেখুনগে আমার জন্মের দিন থেকে বাংলায় বিপ্লববাদ আরম্ভ—দেখুনগে ৭ জুলাই, ১৯০৫! যতদিন আমি বাঁচব, ততদিন অবধি আমি বিপ্লবী থাকব। ইংরেজ, ফরাসী, পর্তুগীজ—এরা যদি কখনও তাড়া খেয়ে পালায়, তার পরেও দেখবেন, আমি নিজের দেশের সর্বপ্রকার সামাজিক ও নৈতিক পুরনো ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে এক বিপ্লবী!

মদন চক্রবর্তীর এক অধস্তন কর্মচারী আমার কথাগুলো দ্রুতহস্তে টুকে নিচ্ছিলেন।

আমি খুনী নই, কিন্তু আপনাদের বিরুদ্ধে আমি বিষবাষ্প তৈরি করি! আমি লেখক, সাহিত্যকর্মী। আমার কলমই আমার তরোয়াল। রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসীর পূর্ব রাত্রে যিনি সকল বিপ্লবীর শিরচুম্বন করে যান, সেই উৎপীড়িতা আলুলায়িত-কুন্তলা দেশজননী রামকৃষ্ণকেও চোখের জলের সঙ্গে আশীর্বাদ করে গেছেন—'স্বদেশ'-এর সম্পাদকীয়তে আমি এই কথাগুলিই গুছিয়ে লিখেছি। ওটা যদি রাজদ্রোহ হয় হোক। আর খুনের মামলা? সে যদি হাইকোর্টে আসে আসুক! 'নেংটার নেই বাটপাড়ের ভয়!'

মদন চক্রবর্তীকে সেদিন সমাদরের সঙ্গে চা খাওয়ালুম, এবং বৈদ্যনাথ বিশ্বাস মশায়

ওখানেই আমার জন্য কী একখানা কাগজে সই-সাবুদ করলেন। ওই প্রথম, কি জানি কেন, বিশ্বাস মশায়ের সম্বন্ধে আমার মনে একপ্রকার সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছিল। তাঁর সঠিক পরিচয় তখনও আমি যথেষ্ট পরিমাণ জানিনে। আমার এই গ্রেপ্তারের ব্যাপারটা তাঁর যেন আগে থেকেই জানা ছিল!

এধারে এসে দেখি, প্রেমেন্দ্র আগেভাগে এসে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সে তার লেখার দরুণ আজ কয়েকটা টাকা পাবে, এইরূপ কথা ছিল। ভাদ্র-আশ্বিনের রোদ মাথায় নিয়ে বেচারীকে আসতে হয়েছে সেই কালীঘাট থেকে বহুবাজার। এ ছাড়া ঢাকা থেকে বুদ্ধদেব তাগাদা দিচ্ছে, তার দুটো গল্প ও একটি কবিতার জন্য মোট পঁচিশ টাকা অবিলম্বে পাঠাতে। প্রেমেন্দ্র আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, ভয় পাসনে। পুলিস কোর্টে গিয়ে আমি তোর জামিন দাঁড়াব, তুই নিশ্চিন্ত থাক্। যাই হোক, সেদিনকার থানাতল্লাসীর অন্যতম সাক্ষীস্বরূপ প্রেমেন্দ্র ওয়ারেণ্টে সই করে দিল।

অতঃপর সেদিন বেলা প্রায় সাড়ে তিনটের সময় যখন রাস্তায় নেমে এলুম, দেখি, দৈনিক 'বঙ্গবাণী'র একখানা টেলিগ্রাম বেরিয়েছে, এবং তার শেষ স্তম্ভের মাঝামাঝি আমার গ্রেপ্তারের খবরটিও ফলাও করে ছাপা হয়েছে। এক পয়সায় একখানা 'বঙ্গবাণী' কিনে পকেটে পুরে চললুম এবার হাজরা রোডের দিকে। শ্রীমতী শোভার কাছে এখনই না পেঁছিলে আমার চলবে না।

নির্দিষ্ট দিনে পুলিস কোর্টে গিয়ে দেখি, 'আনন্দবাজার'-এর সুরেশচন্দ্র মজুমদার মশায় উপস্থিত রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধেও রাজদ্রোহের মামলা। তিনি আমার সঙ্গে কোর্টের উকীল জ্ঞানশঙ্কর সেনগুপ্ত মহাশয়ের আলাপ করিয়ে দিলেন। তখনকার দিনে রাজদ্রোহের মামলা সহসা কেউ নিতে চাইত না, পাছে সেই উকীল রাজরোষে পড়ে। জ্ঞানবাবু অতি মিষ্টপ্রকৃতির মানুষ। তিনি শুধু এ ধরনের মামলায় দক্ষ ছিলেন তাই নয়, তিনি তাঁর প্রাপ্য ফী নিতেও নারাজ ছিলেন। আমার কেস তিনি বিনা পারিশ্রমিকেই করবেন। আমার মামলা উঠেছিল টি-আহমেদের এজলাসে।

নিজের চেম্বার থেকে বেরিয়ে কোর্টে যাচ্ছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটার তারকনাথ সাধু মহাশয়। মোটা পরকলা কাঁচের চশমা তাঁর চোখে। বয়সে প্রবীণ, দাড়িগোঁফ কামানো। তিনি তখন অতিশয় ক্ষমতাবান সরকারী কর্মচারী, বাঙ্গলায় যাকে বলে 'নগর কোতোয়াল' এবং তিনি ওই দুর্ধর্ষ পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্টের বিশেষ ব্যক্তি। তাঁকে নিয়ে দাঁঠাকুরের একটি গানের কলি রসিক সমাজে চালু আছে।

তাঁর চেম্বার থেকে তিনি বেরিয়ে কয়েক পা এগোতেই জ্ঞানবাবু তাঁকে ধরলেন। সেদিন আমার কেস উঠছে আদালতে, সুতরাং জামিন একটা লাগবে। প্রেমেন্দ্র কথা দিয়ে রেখেছে, সে এসে জামিন দাঁড়াবে। সুতরাং আমি নিশ্চিন্ত। যাই হোক, মাঝ-পথে জ্ঞানবাবু ধরলেন পাবলিক প্রসিকিউটারকে। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং আমি নিতান্ত অকিঞ্চনের মতো নতবিনয়ে তাঁকে নমস্কার জানালুম। সহসা ভদ্রলোক আমার প্রতি ক্রুদ্ধ কটাক্ষে বললেন, তুমিই না সেই বিজলীতে চ্যাটাং-চ্যাটাং

কথা লিখতে? সব জমা আছে আমার কাছে। আমার সময় নেই কথা বলবার। তোমার আস্পর্দা চরমে উঠেছে। 'স্বদেশ'-এর এ-কেস সিরিয়স্‌। বাঙলাদেশ থেকে তোমাকে আমি তাড়াবো।

দাঁড়ান্‌—আমি আগুন হয়ে তাঁকে থামালুম—আমার কথাটাও শুনে যান। আপনি না সেই চোরবাগানের তারক সাধু? বাঙলাদেশ থেকে আপনি আমাকে তাড়াবেন? আমাকে তাড়ালে আপনি থাকবেন কি?

আচ্ছা দেখা যাবে।—তারক সাধু চলে গেলেন।

জ্ঞানবাবু বললেন, এ তুমি কী করলে ভাই? সব যে ভেস্তে গেল!

বললুম, ভয় পাবেন না জ্ঞানদা, মরার বাড়া গাল নেই।

এমন সময় এসে দাঁড়ালো আমার অসময়ের বন্ধু লেখক ভবানী মুখুজ্যে। যখন যে কাগজেই থাকি, ভবানী আমার দক্ষিণ হস্ত। বিনা স্বার্থে, বিনা দ্বিধায় হাসি-মুখে সে কাজ করে দেয়। এখন সে এল রেল-আপিস থেকে—যেটি এই কোর্টের পাশেই। সে আজকের মতো ছুটি নিয়ে এসেছে।

টিফিনের পর আমার কেস উঠল কোর্টে। তারক সাধু কেসটি তুললেন। যতদূর মনে পড়ছে, তিনি কেসটির মধ্যে যোগ করলেন আমার বিরুদ্ধে ৫০২/১১৭ ধারার অভিযোগটি অর্থাৎ আমি খুনে-ফাঁসুড়ে! এ ব্যাপারটায় নাকি অভিযুক্ত হয়েছে আমাদের প্রিয় কবি বন্ধু প্রণব রায়, এবং তার সতীর্থ বরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোথায় যেন পালিয়ে গেছে!

জ্ঞানবাবু সেদিন কেস মুলতুবি হবার আগে আমার জামিন কে হবে, সেজন্য অপেক্ষা করে রইলেন। ভবানী আর আমি প্রেমেন্দ্রর পথের দিকে চেয়ে বসে রয়েছি। সুরেশ মজুমদার মশায়ের কেস চলছে। একবারটি এসেছেন প্রফুল্ল সরকার মশায়। ওঁরা দুজন প্রীতিবন্ধ ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

বেলা গড়িয়ে যায়, প্রেমেন্দ্র আসে না! গতকাল রাত্রেও সে কথা দিয়ে রেখেছে! এর মধ্যে বার দুই আমাদের চা খাওয়াও হয়ে গেছে। বেলা চারটে বাজতে চলল। জ্ঞানবাবু কোনও মতে জামিন ঠেকিয়ে রেখেছেন। আমার পকেটে টাকা এনেছিলুম প্রেমেন্দ্রকে আজ ইম্পিরিয়ল রেস্তোরাঁয় পেট ভরে খাওয়াব বলে।

না, সে আসবে না মনে হচ্ছে। আমি তার পথের দিকে চেয়েছিলুম। আমার খুব রাগ হচ্ছিল। কিন্তু এটা আমারই নির্বুদ্ধিতা। আমার পক্ষে ভেবে রাখা উচিত ছিল, আমার প্রতি যতই ভালবাসা থাক্‌, তার 'সিয়োরিটি' দেবার পক্ষে অসুবিধা আছে। তবু সারাদিন গেল আশার ছলনায়। অবশেষে বেলা প্রায় পাঁচটার সময় ভবানী কোমর বাঁধল। সে ভারত গভর্ণমেণ্টের কর্মচারী, মস্ত এক সম্পত্তির মালিক। ভবানী সেদিন সর্বপ্রকার ঝুঁকি নিল, এবং প্রায় গোধূলিকালে আমার জন্য জামিন দাঁড়িয়ে আমাকে ছাড়িয়ে আনল। ততক্ষণে প্রেসিডেন্সী জেলের গাড়ি এসে অপেক্ষা করছিল, আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে যাবার জন্য। ভবানী সেদিনকার বিপদে প্রকৃত বন্ধু ছিল।

জ্ঞানবাবুর চেষ্টায় আমার বিরুদ্ধে কোনও মামলাই টেকেনি। ম্যাজিস্ট্রেট শুধু

সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, 'ডোণ্ট্ ড্যাবল্ ইন্ পলিটিক্স।' রাজনীতির ব্যাপারে মাখামাখি করো না! খবরটা নিয়ে শ্রীমতী শোভার কাছে গিয়েছিলুম। তিনি সব শুনে বললেন, বেড়ালের ভাগ্যে এবারেও শিকে ছিঁড়ল না।

সেদিন তিনি আমার জন্য লুচিমোণ্ডার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু বিনামূল্যে নয়। রাত্রে খাবার আগে ঘরের দরজা বন্ধ করে আমাকে জানলার ধারে বসিয়ে হুকুম করলেন, বক্সাদুর্গের বন্দীদের ওপর রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা আরেকবার আবৃত্তি করুন।

বললুম, আগে পাঁচটা টাকা ফেলুন।

পাঁচ টাকা? কেন?

আজকাল রেডিয়োতে আবৃত্তি করে পাঁচ টাকা রোজগার করি। শুনেছি মহাকবিও নাকি আমার আবৃত্তি শোনেন—।

ফাজলামি রাখুন। বলুন—শোভা গুছিয়ে বসলেন।

সন্দেহ নেই, সেই রাওয়ালপিণ্ডি-মারীর জগদীশচন্দ্রের ভগ্নী সরস্বতীর পর শোভার মতো এমন আবৃত্তির আন্তরিক শ্রোতা আর পাইনি। অনেক সময় দেখেছি এই বিপ্লববাদিনীর শিরায় রক্তের মধ্যে মহাকবির কবিতা কী যেন একটা অমোঘ মন্ত্রের মতো কাজ করে যেতো। শ্রীমতী শোভা ছিলেন বস্তুতান্ত্রিক, অতিশয় হিসাবী, সর্বদা চড়াসুরে বাঁধা, শাসনে-তিরস্কারে-ঘরকন্নার পরিচালনে,—তিনি খুবই কঠোর। তিনি একেবারেই বুঝতে দেন না তাঁর কোনও সেণ্টিমেণ্ট আছে। একটির পর একটি ছেলের ফাঁসী হয়েছে তাঁর সামনে দিয়ে; লাঠির ঘায়ে তাঁর পরিচিত অনেকে চিরকালের জন্য পঙ্গু হয়েছে; 'থার্ড ডিগ্রি' উৎপীড়নের ফলে কত ছেলে পাগল হয়েছে—এ সব শুনেও তিনি অবিচল! মাত্র কয়েকদিন আগে তিনি নিজে কয়েক দিনের জন্য পুলিস লক-আপে যান। আমাদের মনে হয়েছিল তাঁকে সম্ভবত আর্সেনিক বা অমনি কিছু একটা খাইয়ে তাঁর মানসিক পঙ্গুতা আনার চেষ্টা হচ্ছে! তাঁকে আলমোড়া জেলে নিয়ে গিয়েও অনেক উৎপীড়ন করা হয়েছিল।

সেই রাত্রে ঝঙ্কার-ঝঞ্জনায় কেঁপে উঠেছিল আমার দীর্ঘকণ্ঠ মহাকবির সেই কবিতায় "নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন/পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সঙ্গীত না মানিল বন্ধন/ফোয়ারার রন্ধ্র হতে উন্মুখর ঊর্ধ্ব স্রোতে বন্দী বারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন!

"অমৃতের পুত্র মোরা'—কাহারা জানালো সুনিশ্চয়/আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কি জিনিল অক্ষয়/ভৈরবের আনন্দেরে দুঃখেতে জিনিল কে রে/বন্দীর শৃঙ্খলছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়।"

এই কবিতাটি তৎকালীন বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বারংবার অনুবাদ করিয়েও এর প্রকৃত মর্মার্থ তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেননি। সেই কারণেই তাঁদের সেন্সর বোর্ড এটি মঞ্জুর করে বক্সাদুর্গের বন্দীদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

বাঙালী বন্দীরা এই কবিতাটি পেয়ে আনন্দাশ্রুর সঙ্গে মহাকবিকে প্রণাম জানিয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে বড়লাট লর্ড রেডিংয়ের আমলে দমননীতি যেমন প্রবল হয়, বিপ্লবীদের কর্মতৎপরতাও তেমনি বাড়তে থাকে। ১৯২৯-এর সেপ্টেম্বরে যতীন দাস অনাহারে মৃত্যুবরণ করার পর ছেলেরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তখন প্রতিরোধ আর প্রতিশোধের পালা আরম্ভ। কে কাকে মারবে এবং কোন্ পক্ষে কত মরবে, এর হিসেবনিকেশ চলছে বছরের পর বছর।

এ বছর ১৯৩১-এর সেপ্টেম্বর একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল হিজলী জেলে। সম্প্রতি খড়্গপুর থেকে প্রায় মাইল দুই দূরে অন্তরীণ বন্দীদের জন্য এই জেলটি নির্মাণ করা হয়েছিল এবং রেলগাড়ী ওদিক দিয়ে পেরিয়ে যাবার সময় বন্দীরা দূরে থেকে রুমাল নেড়ে যাত্রীদেরকে ইশারা করত। ও-অঞ্চলটার জল-হাওয়া মন্দ নয়।

ঘটনাটা ঘটল বোধ হয় সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। বন্দীদের পক্ষে নানাপ্রকার যুক্তিপূর্ণ অভিযোগ ছিল। বিনা বিচারে অকারণে যাদেরকে আটক করা হয়েছে তাদের নানা ন্যায়সঙ্গত দাবিদাওয়া আছে বইকি। সুতরাং জেলের মধ্যে তারা একটা হাঙ্গামা বাধিয়েছিল। তখন বাঙলার গভর্নর বোধ হয় স্টানলি জ্যাকসন। এক-একজন নামে পৃথক, কিন্তু বস্তু হিসাবে সেই একই ইংরেজ! কারও হয়ত বা একটু মুখমিষ্টি, কেউ বা কিছু কুটনীতিক, কারও বা চক্ষু লাল। আসলে কমিশনার টেগার্ট এবং ইংরেজ চীফ সেক্রেটারি—এরাই এক রকম রাজ্যপাট চালিয়ে যায়।

সেদিন গভীর রাত্রে হিজলী জেলের কর্তৃপক্ষই হোক আর কলিকাতার সর্বময় কর্তাই হোক, হুকুম জারী করল—জেলের চারিদিক বন্ধ করে ভিতরে গুলী চালাও! গুলী চালালো গোর্খা সিপাহীরা, তারা হুকুমের চাকর। সেই ঘন অন্ধকার রাত্রে রক্তাক্ত অবস্থায় ২৯ জন বন্দী ধরাশায়ী হল এবং দুজনে ওই ঘটনাস্থলেই মারা গেল! তাদের নাম তারকেশ্বর সেন ও সন্তোষ মিত্র। ওটা ছিল প্রায় ১৯১৯-এর জালিয়ান-ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের মতো বেঁধে মার দেওয়া! এর ফলে সমগ্র বাঙলা তোলপাড় হয়ে উঠল।

এই তোলপাড় যখন সুদীর্ঘকাল ধরে চলছে, সেই সময় শীতকালে রবীন্দ্রনাথ 'প্রশ্ন' নাম দিয়ে একটি কবিতা লিখলেন। সেই কবিতাটি পড়ামাত্রই আমি ধরে নিয়েছিলুম, এটি হিজলী গুলীচালনার ওপর লেখা। ওরই মধ্যে একদিন ইউনিভার্সিটি ইন্-স্টিট্যুটে আমার ডাক পড়ল কি এক রাজনীতিক সমাবেশ উপলক্ষ্যে। বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত। সভাপতি তুলসীচন্দ্র গোস্বামী। ওই কবিতাটি ছাপা হয়েছিল প্রবাসীতে, এবং তার পাঠকসংখ্যাও সীমাবদ্ধ। আবৃত্তি করার আগে ভূমিকাস্বরূপ আমার অনুমানের কথাটা নিয়ে মিনিট দুই বক্তৃতা করে নিলুম। আমি জোর দিয়েছিলুম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্ট্যানজায়। শেষের দিকে যখন বুকফাটা

আর্তনাদের সঙ্গে গনগনিয়ে উঠলুম, "যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো/তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ?"

তিন চার হাজার লোকের সভা। তারা বিমূঢ় হতবাক। তখন মাইক ছিল না, আমার কণ্ঠস্বর ছিল একাই একশ'। তুলসী গোঁসাই মহাশয় অবাক বিস্ময়ে আমাকে নিরীক্ষণ করছিলেন।

দুটো মামলা থেকেই আমি ছাড়া পেয়েছিলুম। হাইকোর্টের জজ তখন বোধ হয় মিঃ কস্টেলো। জাতভদ্র ইংরেজ। তিনি কবি প্রণব রায়ের কাগজপত্র পরীক্ষা করে বললেন, এ মামলা টেঁকে না, আসামী বেকসুর। যারা এ কাগজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তারাও মুক্ত।

এই প্রকারে মুক্তিলাভের পর আমি 'স্বদেশ' আপিসে বৈদ্যনাথ বিশ্বাসের কাছে চিঠি দিয়ে 'স্বদেশ' সম্পাদক-পদে ইস্তফা দিলুম। দিন চারেক পরে বিশ্বাসমশায় একখানা গাড়ি নিয়ে সকালের দিকে আমার বাসস্থানে এসে উপস্থিত। তিনি অতিশয় চতুর, এবং আমি অতিশয় রগচটা ও বেপরোয়া। প্রথমেই বললুম, আপনি অতিশয় ধূর্ত। আপনার প্রত্যেক আচরণে প্রমাণ পেয়ে এসেছি আপনি ইলিসিয়ম রো এবং লালবাজারের সঙ্গে সংযুক্ত।

আমাকে কিছু বলতে দিন।

না, একটা কথাও আমি শুনব না আপনার। আপনি আমাকে দিয়ে আপনার পাবলিসিটি করিয়ে আমাকে জেলে পাঠাতে চান। আপনার কাগজে তিন সংখ্যা 'আঁকা-বাঁকা লিখেছি, এ সংখ্যায় বন্ধ করে দিলুম। যান আপনি—

আমি নিজেই ভিতরে চলে গেলুম।

এবার বহুদিন পরে আমি মুক্ত বিহঙ্গ। গুরুদাস থেকে আমার 'দুই আর দুয়ে চার' বেরিয়েছে। এবার একে একে বেরোবে 'নিশিপদ্ম' আর 'কলরব'। আর আমি কোনও কাগজের মধ্যে ঢুকব না। অনেক শিক্ষা হয়েছে। চুলোয় যাক 'স্বদেশ'।

এমনি সময় কাশী থেকে মাসতুতো ভাই প্রভাস চিঠি লিখল, তোর বউদি সেই থেকে ভুগছিল, এখন বোধ হয় আর বাঁচার আশা করে না। তোকে দেখতে চাইছে, যদি পারিস চলে আয়।

পরদিন আমি কাশী গিয়ে পেঁছিলুম।

একদা বউদির নাম বদলিয়ে আমি রেখেছিলুম দুর্গাঠাকরুণ। বলিষ্ঠ, সুন্দর চেহারা, স্বাস্থ্য ঝলমল করত। এখন ওর বয়স হয়ত বা বছর বাইশেক। আমি সেই অভিশপ্ত বড় বাড়িতেই উঠেছিলুম। সবাই বিমর্ষ। প্রভাস বলল, এখনই দেবনাথ-পুরায় চলে যা, ওখানেই আছে।

আমি ছুটলুম। এ-গলি ও-গলির ভিতর দিয়ে আমি বউদির বাপের বাড়িতে এসে উঠলুম। ছোট ছোট ভাই বোন—সকলের মনেই বিষাদের ছায়া। বউদির কবে যেন একটি মেয়ে হয়েছিল, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই বাচ্চাটা মারা যায়।

অতি সন্তর্পণে ঘরের মধ্যে ঢুকলুম। খাট-পালঙ্ক নয়, মেঝের উপরেই বিছানাটা পাতা। জানালাটা ঠিক মাথার কাছে। এ বাড়িতে তিন চারবার আমি অপরাধীর বেশেই এসেছি। আমার অতীত আচরণের দরুণ এঁরা আমার প্রতি তুষ্ট নন।

রোগিণী বড় বড় চোখে জেগে রয়েছেন। তিনি সজ্ঞান। পড়ে রয়েছেন বিশীর্ণ রক্তহীন একখানা কঙ্কাল। কানাকানিতে শুনলুম, ডাক্তারের পক্ষে আর কিছু করার নেই। প্রভাসের ওদিক থেকে খরচপত্র অনেকদিন অবধি আর আসে না, এঁরাও আর পেরে উঠছেন না। রোগিণী আর উঠে বসেন না। অর্থাৎ আর দেরি নেই। তবে কিনা যক্ষ্মার অন্তিম অবস্থা, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টনটনে জ্ঞান থাকে। ওই ভয়াবহ ভগ্নাবশেষের উপরে শুকতারার মতো জ্বলজ্বল করছে দুটো চোখ আমার নিমেষ-নিহত দুটো চোখের উপর! কে কাকে বেশি দেখছে। উনি না আমি! ওঁর ওই চোখের ভিতর দিয়ে আমি যেন দেখতে পাচ্ছিলুম আরেক মেয়েকে। যে-মেয়ে নিজের সেই সুন্দর ছবিটির ওপর ফুলের মালাটা ঝুলিয়ে একদা আমাকে বলেছিল, মিলিটারির চাকরি নিয়ে যাচ্ছ যাও, কিন্তু এ মালা শুকোবার আগে চাকরি ছেড়ে চলে এসো, ঠাকুরপো।

শান্ত কণ্ঠে এবার প্রশ্ন করলুম, প্রভাস আসা-যাওয়া করছে তো?

না,—রোগিণী জবাব দিল অতি ক্ষীণ কণ্ঠে,—তাকে আসতে মানা করে দিয়েছি! তুমি এলে কেন?

ওঁর বাঁকা চোখ দেখে আমি ভয়ে কাঠ হয়ে গেলুম। কিন্তু ধীরে ধীরে পকেট থেকে পঞ্চাশটি টাকা বার করে রোগিণীর বালিশের কাছে রেখে বললুম, প্রভাস খুব ভেঙ্গে পড়েছে। আমার হাত দিয়ে এই টাকা কটা পাঠিয়ে দিল।

হঠাৎ দুর্গাঠাকরুণ নড়ে উঠলেন। যেন লকলক করে উঠল আগুন। বললেন, মিছে কথা বলতে ছুটে এসেছ কাশীতে? ও টাকা তোমার। তুলে নাও…তুলে নাও বলছি? কাকে ভোলাতে চাও টাকা দিয়ে?

সভয়ে আমি টাকা তুলে নিলুম। রোগিণীর উত্তেজনা আমি দেখতে চাইনে। কিন্তু তখনই ওঁর ছোট বোন একটি মিষ্টান্নের রেকাব এনে আমার সামনে রেখে জল এনে দিল। যেহেতু যক্ষ্মা রোগীর ঘর, গৃহস্থের পক্ষে এ ঘরের হাওয়া খারাপ—সেজন্য ওঁর বোন দরজাটা বাইরের থেকে টেনে দিয়ে গেল। মৃত্যুপথীর পাশে যেন আমি একা পড়ে গেলুম।

লৌকিক সৌজন্যবশত আমি মিষ্টান্নের রেকাবটা কাছে টেনে নিতে যাচ্ছিলুম। বউদি বাধা দিলেন। তিনি প্রথমে মাথা তোলবার চেষ্টা করলেন, তারপর সরু একখানা হাড়ের বাঁকারির মতো হাত বার করে থালার মিষ্টান্নগুলো নিয়ে জানালা গলিয়ে ফেলে দিলেন নীচের গলিতে। তারপর চুপ করে কতক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম।

বউদির গায়ে কোনও অলঙ্কার আভরণের লেশমাত্র নেই। মাথার সিঁদুরের চিহ্ন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। সমস্ত দেহটা ফ্যাকাশে একখানা কাগজ। এগুলো আমার পক্ষে

অবিশ্বাস্য ছিল। কিন্তু আমিই বা আর বসে থেকে কী করব? আমার দেখা ত শেষ হয়ে গেল এই অন্তিমকালের বিছানায়। এক সময় বললুম, এবার আমি উঠি বউদি?

যাও—

বললুম, রোজ আমি একবার করে এসে আপনাকে দেখে যাব।

না, আর দেখো না, আর এসো না তুমি।—তারপরেই আবার তিনি যেন বিজ-বিজ করে বললেন, খুনী, খুনী……সবাই খুনী……

আমি শান্তভাবে উঠে দরজাটা খুলে বেরিয়ে চলে গেলুম। আমারও যেন তাই মনে হচ্ছিল, দুর্গাঠাকরুণের চারিদিকে আমরা যারা রয়েছি, সবাই আমরা খুনী! আমরা মেয়েদেরকে সম্মান ও শান্তি দিইনে, অন্ন-বস্ত্র আশ্রয় দিইনে, রোগে দুঃখে-দুর্দশায় কোনও সাহায্যের হাত বাড়াইনে। তাকে দিয়ে শুধু সকল কাজ করিয়ে নিই, কাজ ফুরোলে তাকে আখের ছিবড়ের মতো জঞ্জালে ফেলে দিই!

এরপর মাস দেড়েক ছিলেন দুর্গাঠাকরুণ, তারপর প্রভাসের চিঠিতে জানলুম, তিনি কদিন আগে সজ্ঞানে মারা গেছেন। কিন্তু আমরা কয়েকজন তাঁর কাছে চিরদিন খুনী হয়ে রয়ে গেলুম এবং এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি চলে গেলেন।

প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর বছরখানের মধ্যেই প্রভাস আবার বিবাহ করে। সে বিবাহে আমি উপস্থিত থাকতে পারি নি।

যাই হোক সেবার কলকাতায় ফিরে বাড়িতে ঢুকে প্রথম যাকে দেখামাত্র আঁতকিয়ে উঠলুম সে আমার সেই সর্বনাশিনী ভাগ্নী, তরুণী বিধবা বুলি।

রাজেন্দ্রাণীর মতো বুলির চেহারা। অপরিসীম কঠিন স্বাস্থ্য, সুন্দর মুখশ্রী, কুঞ্চিত ঘন চুলের রাশি পিছন দিকে কতদূর পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। দুই চোখে যেন নধর ভাবাবেশ। রূপের গৌরবগর্ব এখন বুলিকে মানায়। বুলির বয়স এই মাত্র বছর সতেরো। কিন্তু আমি ওকে আমাদের এখানে দেখেই রেগে উঠলুম। চেঁচিয়ে বললুম, আবার তুই মরতে এসেছিস মামার বাড়িতে? তোকে না বলে গিয়েছিলুম, তোদের খিড়কির পুকুরে ডুবে মরতে?

মরব কোন্ দুঃখে?—বুলি ঝাঁঝিয়ে উঠল, পুকুরে তিরিশবার এপার ওপার হতুম! সাঁতার জানলে কেউ ডুবে মরে?

মা দাঁড়িয়েছিলেন সামনে হাসিমুখে। আমি বললুম, বেশ, না হয় বেঁচেই রইলি। কিন্তু দুবেলা দুমুঠো খেয়ে মা-বাপের কাছে পড়ে থাকলিনে কেন? সেখানে চার চারটে গরু, দশ বারো সের খাঁটি দুধ, অঢেল খাবার দাবার, সে সব ছেড়ে এলি কি জন্যে? এখানে যে আধপেটাও জুটবে না!

মা বললেন, আচ্ছা, এসে পড়েছে ছেলেমানুষ……থাক কদিন।

তুমি জানো না মা ও আবার এসেছে আমাদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাবে!

বেশ করব—বুলি জিদ ধরল। তারপর হাতের কাছে কিছু না পেয়ে একখানা গামছা পাকিয়ে ছুঁড়ে মারল। তাতেও হল না, পোড়ারমুখী ছুটে এসে আমার চুলের মুঠি সজোরে পাকিয়ে ধরল।

উঃ ছাড়, লাগছে! আচ্ছা আর কিছু বলব না, ছেড়ে দে।

মা বললেন, বুলি সেই একই রকম, এতটুকু জ্ঞানগম্যি হয় নি।

আমাদের বাড়িতে মাত্র তিনটি শোবার ঘর, একটি রান্নাঘর এবং তেতলায় একটি ছোট্ট ঘর—ভাঁড়ার আর ঠাকুরঘর মিলিয়ে। দুই দাদা আর আমি তিনটি ঘরই নিয়ে থাকি। ওদের রয়েছে ছেলেমেয়ে কাচ্চাবাচ্চা। আমার ঘরটি ছোট্ট। ওরই মধ্যে লেখাপড়া, গড়াগড়ি, ওরই মধ্যে মালপত্রাদি। এর মধ্যে বুলি কোথায় ঢুকবে, ভেবেই পাইনে। মেয়েটা ওর মা-বাপের কাছে পালপাড়ার ওই বন, বাগান, ক্ষেত-খামার আর পুকুরধারে পড়ে থাকতে চায় না। সে নিজেই জানে না, কী নিয়ে তার জীবন কাটবে! কী উদ্দেশ্য নিয়ে সে বাঁচবে! বুলি এ জীবনে বোধ হয় এক ফোঁটাও লেখাপড়া শেখে নি—বড়জোর দুচার লাইন ভাঙ্গাভাঙ্গা বাংলা লিখতে পারে। সেই তখনকার কালের শ্লেটপেন্সিলের দাগা বোলানো। বামুন-পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে সে। এগারো বছর বয়সে তার বিয়ে হয়, ফুলশয্যার পরের দিন স্বামী চলে যায় মধ্যপ্রদেশে—আর ফেরেনি। দেড় বছরের মধ্যে সেই ছেলেটা জংলী জ্বরে মারা পড়ে। বুলি রয়ে গেল সেই কিশোরী কুমারী। স্বামীকে একখানা চিঠি পর্যন্ত লেখার বিদ্যে তার হয়নি।

বুলি অত্যন্ত দুরন্ত, ভয়ানক আমুদে এবং সাংঘাতিকভাবে সুস্থ। কিন্তু সুগন্ধী কৌমার্যে এমন একটি শুচিশুভ্র ও পবিত্র তার চেহারা যে, দেখলে কেমন যেন সম্ভ্রম বোধ হয়। এ যেন এক প্রকার আরণ্যক এবং অমার্জিত সৌন্দর্য—যা পরিপাটি প্রসাধনের তিলমাত্র ধার ধারে না! এক পয়সার সাবান, এক পয়সার নারকেল তেল, একখানা চিরুনি—এর বাইরে আধুনিককালের কোনও প্রসাধন সামগ্রী ওদের চোখেই পড়ে না! কিন্তু ওতেই চেয়ে দেখো যেন মহীয়সী জগদ্ধাত্রী! চেয়ে দেখো, পুরাণ আর মহাকাব্যের ভিতর থেকে উঠে এসেছে এক ভুবনমনোমোহিনী মহামায়া! ষোল সতেরো বছরের মেয়েকে দেখলে মনে হয় যেন বাইশ চব্বিশ বছরের।

আমার মাথার উপরে রয়েছেন সপরিবারে দুই দাদা, আমার সর্বংসহা শান্তিময়ী মা, আমার বড় বোনেরা, বুলির মা বাবা ভাই বোন, রয়েছে তার শ্বশুরবাড়ির অনেকে। কে নেই বুলির? চারিদিকে তার গিজগিজ করছে সবাই। কিন্তু কারও প্রতি কোনও আকর্ষণ নেই বুলির। সে সুবেশা হতে চায় না, শ্রেষ্ঠ কোনও আহার্যবস্তুতে তার লোভ নেই, অলঙ্কারাদি তার কাছে সম্পূর্ণ মূল্যহীন, গৃহ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সে ভ্রুক্ষেপও করে না—এবং সে কী চায় নিজেও সে জানে না! আমার সামনে আবার সে এসে দাঁড়াল যেন এক বিরাট জিজ্ঞাসার মত। আমার জীবনে সে যেন আর একবার একটা সঙ্কট ঘনিয়ে তুলল।

মা? ঘুমিয়েছ?—আমি ডাকলুম।

মা জেগে উঠে বসলেন। বুলি নিচের তলায় তার মামীর সঙ্গে গল্প করছে।

বললুম, আচ্ছা, বুলি যে আবার এল, ও থাকবে কদ্দিন? এখানে থাকার কত অসুবিধে, তুমি ত জানো, মা। চোখের সামনে ওইটুকু মেয়ে একবেলা হবিষ্যি করে

শুকিয়ে মরবে, এ কি সহ্য করতে বলো ?

মা বললেন, আমি কি করব বল্ ? বুলিও নাতনীদেরই একজন। মা-বাপের কাছে ওই পাড়াগাঁয়ে তার মন টেঁকে না।

এখানে বুলি কী নিয়ে পড়ে থাকবে বলতে পার ?—আমি বললুম, আমি নিজে মন বসিয়ে কাজকর্ম করতে পারব মনে করো ? ওই বিধবা মেয়েকে নিয়ে তুমিই বা কি করবে ? কত দিন কত কাল ওকে পুষবে ? ওর সমস্ত জীবনই ত ওর সামনে পড়ে রয়েছে। ওর দুই বড় মামারও তো কোনও গ্রাহ্য নেই !

মা চিন্তিত মুখে চুপ করে রইলেন।

দিনে-দিনে লক্ষ্য করে দেখলুম, সমস্ত সমস্যা ও প্রশ্ন যেন আমার ঘাড়ে চাপিয়ে চারিদিকের সবাই পরম নিশ্চিন্ত মনে চুপ করে গেল। আমার জীবনে এত বড় বিবেক-সঙ্কট বুলি সৃষ্টি করবে এ অভাবনীয় ছিল। কে না জানে আমার কিশোর বয়সে ওকে আঁতুড় থেকে তুলে পলতে করে দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে এসেছি—ওর মা ছিল তখন সূতিকারোগে প্রায় মৃত্যুশয্যায়। দর্জিপাড়ায় যখন আমরা নিবারণ দাসের বাড়িতে থাকি, তখন বুলির পিছন দিকে পশ্চিমা ফোঁড়া হয়। সেই আমি আড়াই বছরের মেয়েকে নিয়ে ডাঃ সুন্দরীমোহনের ওখানে ছুটোছুটি করি। আমাদের কাছে ছাড়া বুলি কোথাও থাকত না, তাই বুলি ছিল আমার খেলার পুতুল। রবারের বল ছুঁড়ে দিলে প্রভুভক্ত বাচ্চা কুকুর যেমন ছুটে গিয়ে সেটা মুখে করে আনে বুলি সেইভাবে আমার সঙ্গে খেলা করেছে ! ওর এগারো বছর বয়সে আমিই সেই সাংঘাতিক দুর্যোগের রাত্রে বর নিয়ে গিয়ে বুলির বিয়ে দিয়েছি। তার পরের ঘটনাবলী ভাবতে গেলে আজও আমার গা শিউরে ওঠে। অতঃপর সৈন্য দপ্তরে চাকরি নিয়ে আমি যেন পালিয়ে বেঁচেছিলুম ! আজ আমার চার বছর পরে ওকে দেখে নতুন করে আতঙ্কিত হয়ে উঠলুম। এ বুলি সেই কিশোরী বিধবা বুলি নয়। এ মেয়ে এখন বৈধব্যকে এবং সেই এক রাত্রির দেখা স্বামীকে ভুলে গেছে, এ মেয়ে হয়ত সেদিনকার দুরন্তপনাও ভুলেছে !

বুলি, তুই ইস্কুলে ভর্তি হবি ?

ইস্কুলে ?—বুলি ভেংচিয়ে উঠল, খেয়ে দেয়ে আমার যেন কাজ নেই ? কিচ্ছু করব না আমি।

কিছুক্ষণ ভেবে আমি বললুম, এক কাজ করা যাক। চল তোকে 'নাট্যমন্দির'-এ ব্যবস্থা করে দিয়ে আসি। বেশ ত, থিয়েটার করবি ? নাচবি ধেই ধেই করে ?

বুলি উগ্রকণ্ঠে বলল, তার চেয়ে আমাকে বিষ খেতে দাও না কেন ? তোমার কোনও কথা আমি শুনব না !

আমি হাসছিলুম। বললুম, আচ্ছা, এবার তাহলে মাথা ঠাণ্ডা করে শোন যা বলি। একবার ভেবে দেখ্ দেখি তোর নিজের মোটর গাড়ি, কথায় কথায় ড্রাইভারের সেলাম, নিজের ফ্ল্যাট বাড়ি, গায়ে মণিমুক্তোর গয়না, সব চেয়ে দামি পোশাক, টাকার বাণ্ডিলের ওপর তুই বসে আছিস ! কি রকম লাগে বল্ ত ? তোর চারিদিকে সবাই

হাতজোড় করে বসে আছে! সবাই তোর হুকুমের চাকর! তোর সোনার খাটে গা, রুপোর খাটে পা!

বুলি চোখ পাকিয়ে বলল, তুমি বুঝি তোমার মামার মতন গ্যাঁজা ধরেছ?

না রে, সত্যি বলছি। তোর যা চেহারা দেবকী বোসকে একবার বললেই হল, তোকে মাথায় তুলে নিয়ে যাবে। ছবিতে তুই নামবি, হইহই পড়ে যাবে চারিদিকে! চিত্রজগতের নতুন তারকা শ্রীমতী—

তোমার মুখে আগুন—মুখ ঝামটা দিয়ে বুলি চলে গেল।

গলা বাড়িয়ে বললুম, তা হলে বলে যা কি চাস তুই?

বুলি আবার ফিরে এল। বলল, এক পা এ বাড়ি থেকে নড়ব না। গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়ালেও আবার ফিরে আসব।

আমি চুপ করে গেলুম। কিন্তু হঠাৎ পিছন থেকে বুলি আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল—ছোট মামা, তুমি চিরকাল ধরে আমাকে দুঃখ দিচ্ছ, আমাকে সব বিপদের মধ্যে তুমি ঠেলে দিয়েছ, আর আমাকে তুমি তাড়িয়ে দিয়ো না!

লাবণ্যপ্রভা দত্তকে আমি মা বলতুম, কিন্তু তিনি আমাকে 'আপনি' বলে সম্ভাষণ করতেন। ওঁদের বাড়িতে বহু মেয়ে এবং বহুর আনাগোনা, সেজন্য আমি সতর্ক থাকতুম। বড়দিদি উষা এবং শ্রীমতী শোভা—এঁদের সঙ্গে আমার 'আপনি-আজ্ঞে' সুবাদ। ছেলেরা সবাই আমাকে 'আপনি' বলে। ও-বাড়ির দরজায় পা দেবার আগে আমার সর্বপ্রকার 'বদ্অভ্যাস' আমি পথে ফেলে যেতুম।

১৯৩১ পেরিয়ে ৩২-এ পড়ছে। আমার 'স্বদেশ' গেছে, 'বিজলী' কবেই গেছে। উপাসনা, দুন্দুভি গেছে। এখন আমি ঝাড়া হাত-পা।

লাবণ্যপ্রভা বললেন, বলুন ২৬শে জানুয়ারী কি ভাবে পালন করব আমরা! আমরা শ' দেড়েক মেয়ে যোগাড় করতে পারব। ফ্ল্যাগ তুলব চৌরঙ্গী আর কর্পোরেশন স্ট্রীটের মোড়ে কার্জন পার্ক ঘেঁষে। আমরা ট্রাম বাস বন্ধ করব। আমাদের মেয়েরা দক্ষিণ কলকাতার দল।

শোভা বললেন, দেড়শ মেয়েতে হবে না। আমি পুণ্যাশ্রম আর আনন্দমঠ কুড়িয়ে একশ' দেবো।

এবার বললুম, আমি কেবল একটিমাত্র মেয়েকে দেবো, মা যদি অনুমতি দেন।

ওঁরা বললেন, কে সে মেয়ে?

সে নতুন, সে অজ্ঞান, তার এতটুকু জাগতিক অভিজ্ঞতা নেই। সে আমার অতি-প্রিয় ভাগ্নী, একমাত্র আপনাদের হাতেই তাকে ছেড়ে দিতে পারি।

মা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কই আগে এর কথা বলেননি ত?

বললুম, বলতে ভাল লাগেনি এত বেদনাদায়ক! আপনারা তাকে দেখলেই ভাল-বাসতে চাইবেন। আমার বিশ্বাস, সে আপনাদের কাছে নিরাপদে থাকবে।

ওঁদের কাছে সেদিন আমি বুলির আগাগোড়া কাহিনীটি বলেছিলুম।

আমার প্রস্তাবটি শুনে ওঁদের বাড়ির মধ্যেই একটা আনন্দ ও উদ্দীপনার হুজুগ উঠল। প্রায় গত দু'বছর ধরে আমি এ বাড়িতে অবিশ্রান্ত আনাগোনা করছি, এ আমার এক নেশা,—কিন্তু ওঁরা কেউ আমার পারিবারিক পরিচয় বা পটভূমি জানেন না। ওঁদের ধারণা আমি এক ধনাঢ্য পরিবারের ছেলে এবং আমার পোশাক ও পরিচ্ছদে এবং চালচলনে ও'রা সম্ভবত ওইটিই ধরে নিতেন। আমার কোনও ভান বা ভণিতা ছিল না। আমি ও'দের অনেক ফরমাশ খেটে দিতুম, কিন্তু কখনও অরক্ষণীয় প্রতিশ্রুতি দিতুম না! আমার বয়স অল্প বলেই আমাকে সর্ববিষয়ে কড়া সংযম পালন করতে হত! ও'রা এই সূত্রে যেদিন শুনলেন আমি নিতান্তই স্বল্পবিত্ত পরিবারের লোক এবং প্রতি মাসে বিশে-বাইশে তারিখের পর আমাদেরকে দৈনন্দিন বাজার খরচের কথা ভাবতে হয়, তখন ও'রা একেবারেই আমার কথা বিশ্বাস করেননি! ও'দের ধারণা এ আমার অতি-বিনয়। আমার দিকে চেয়ে-চেয়ে আমার আরাধ্যাদেবী শ্রীমতী শোভা বলতেন, আপনি আগাগোড়া মিথ্যুক, সব আপনার ধাপ্পা! যদি এতই আপনি গরীব, তাহলে পকেটে হাত দিলেই টাকা পাই কেন?

হাসিমুখে বলেছিলুম, আমার সন্দেহ, আপনি আমার পকেটে লুকিয়ে দু'পাঁচ টাকা রেখে দেন!

উনি আমার পরিহাস বুঝতে না পেরে বললেন, আমি? আমি টাকা পাবো কোথায়?—গম্ভীর মুখে শ্রীমতী বললেন, আপনি কি আজও বুঝতে পারেননি যে, মা আর আমি থাকি জামাইবাবুর আশ্রিত হয়ে? আপনি কি জানেন, চারজন জেঠতুতো ভাই এ বাড়িতে থাকে তাদের অতগুলো সমস্যা নিয়ে? কিচ্ছু জানেন না আপনি, জ্ঞান-বিবেচনা কিছুই আপনার হয়নি। এসব কথা কোনও দিন কি আপনি শুনতে চেয়েছেন?

বাধা দিয়ে বললুম, থাক, আর নয়। এইটুকু শোনাই যথেষ্ট। আমার নিজের কথাটা বলে রাখি। এখন আমি সাহিত্যকর্মের মজুরি কিছু কিছু পাই, ওতে আমার চলে যায়। পাবলিশার ঠেঙিয়ে যা জোটে তাতেই আমার নবাবী, তার থেকেই যা কিছু খয়রাতি!

উনি ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। আমার কথায় কান দিলেন না।

আমার ভাগ্নীকে আমি এ বাড়িতে আনছি, এটা এ বাড়িতে সেদিনের মস্ত খবর। দিদি, মা, বিষ্ণুপ্রিয়া, সুধা, হরেন, মেজবউদি, কমলা—এদের সকলের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে কুণ্ঠিতভাবেই স্বীকার করি, ও'দের পরিমণ্ডলের মধ্যে সকলে আমাকে যা ভাবতেন, ইংরেজীতে তাকে বলে 'গ্ল্যামারাস'।

রাত্রে বাড়ি ফিরে সেদিন অনেক চিঠি পেলুম পর-পর। তার সঙ্গে প্রুফ—গুরুদাসে বই ছাপা হচ্ছে। আনন্দবাজার থেকে দোল সংখ্যার চিঠি। আনন্দের কথা, গুরুদাসের 'দুই আর দুয়ে চার' নাকি ভাল বিক্রি হচ্ছে। ওদের সঙ্গে কথা হয়ে আছে, 'ভারতবর্ষে' একটি উপন্যাস আরম্ভ করব। ঢাকা থেকে 'সোনার বাংলা' এসেছে। চট্টগ্রাম থেকে 'পাঞ্চজন্য', এটা-ওটার সঙ্গে আবার সেই মালদহের থেকে

রমলা দেবীর চিঠি পর-পর চারখানা। ওর সঙ্গে আবার রাঁচীর সেই নীলিমা চট্টোপাধ্যায়। চোখে কখনও দেখিনি রমলাকে। কিন্তু ও'র প্রত্যেক চিঠির সারমর্ম কি, আমি জানি। উনি আমার কাছে সামান্য ভরসা পেলে কলকাতায় আসতে চান, নিজের পায়ে দাঁড়াতে চান, স্বাধীন জীবনযাপন করতে চান। এই সব মহিলাদের প্রভাবিত করেছেন তরুণী রাজনীতিক নেত্রীরা! আমি নিজে না দেখেছি রমলা রায়কে, না বা নীলিমা চট্টোপাধ্যায়কে। ও'দের কি পরিচয়, বয়স কত, গুণপনা কিরূপ, কোন্ কাজের যোগ্য—কোনটাই আমার জানা নেই। এখন পর্যন্ত ও'দের দুজনের কাছ থেকে অন্তত খান পঞ্চাশেক চিঠি এসেছে বইকি। 'বিজলী'কে আমি ভুলতে বসেছি, 'স্বদেশ' আমার কাছে হারিয়ে গেছে, কিন্তু এরা আমাকে ছাড়ে না কেন? আমার কাছে ওদের চিঠি জমেই যাচ্ছে, চিঠি আর খোলা হয় না! সর্বাপেক্ষা বিপদ, রমলা দেবী আমার সেই কাগজ-থেকে-কাটা ছবিখানা কোথায় পেয়েছিলেন, তাই নিয়ে এখনও চিঠিতে আধিক্যেতা করেন! সেই যে শেক্সপীয়ারের কোন্ নাটকে যে একটি শব্দ আছে 'কট্‌কোয়েন', ঠিক তেমনি। আমি যেন মেয়েছেলের কাজ নিয়েই চিরদিন ব্যস্ত থাকি! আমার যেন অন্য কাজ না থাকে। আমাকে ধিক্, শতোধিক! কিন্তু উপায় নেই, একজন চার-পাঁচখানা চিঠি লিখলে ভদ্রতার খাতিরে অন্তত একখানারও জবাব দিতে হয়!

এর মধ্যে আর এক উৎপাত, মা আবার আমার বিয়ের কথা তুলছিলেন। তিনি দেখছিলেন আমার মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়, তারপর মেয়েছেলেদের এত চিঠিপত্র আনাগোনা—মায়ের ধারণা, আমি বোধ হয় নষ্ট হয়ে যাচ্ছিলুম। কিন্তু আমার অভ্যাস এই, মায়ের কাছে গোপন করার কিছু নেই আমার। আমার বয়স এখন ছাব্বিশ। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার কোনও প্রকার প্রণয়ঘটিত ব্যাপার নেই। এ জীবনে একখানিও প্রণয়পত্র লিখিনি! কোনও দিন কোনও মেয়ের পেছনে ধাওয়া করিনি। কোনও মেয়ের সঙ্গে সঙ্গোপনে বেড়াতে যাইনি, এবং এমন একটি কথাও কারোকে বলিনি যাতে তাদের মনে কোনও প্রকার ভাবান্তর ঘটে। এখন পর্যন্ত এইটিই চলে আসছে। কিন্তু অন্য দিকে আমি দেখছি, কোন-কোনও মেয়ে আমাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না! ওদের অনেকে চাইছে আমার ঘুম ভাঙ্গাতে, আমাকে কতকটা অকুলে ঠেলে দিতে, নানা অছিলায় আমাকে বাইরে টেনে নিয়ে যেতে এবং ওদের অনেক ব্যক্তিগত জটিল সমস্যায় আমাকে ডুবিয়ে রাখতে! মাঝে মাঝে আমি অতিশয় যন্ত্রণা বোধ করছিলুম!

যাই হোক, অবিলম্বে একদিন বুলিকে শিখিয়ে-পড়িয়ে মাকে সব কথা বুঝিয়ে নিয়ে চললুম হাজরা রোডে। তখন আমি থাকি আর-জি কর হাসপাতালের পাশের রাস্তায়। ওখান থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত হাঁটা, তারপর দোতলা বাস, বাসের মাথায় ছাদ নেই। বর্ষাকালে দোতলায় বৃষ্টি হয়, তাই যাত্রীরা নিচের তলায় নেমে আসে। গ্রীষ্মকালে শিখ কন্‌ডাকটররা যাত্রী ডাকে চেঁচিয়ে খোলা দোতলাটা দেখিয়ে—"হাওয়া-ওয়ালা, হাওয়াওয়ালা!" অর্থাৎ দক্ষিণের ফুরফুরে হাওয়া যদি খেতে চাও, শিগগির

উঠে এসো! তখন শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট ভাড়া হল দু'আনা। বুলিকে নিয়ে যাতায়াত করার অর্থ দু'জনের আট আনা! আট আনায় তখন ভাল ট্যাটলার সিগারেট চার প্যাকেট! বত্রিশটা শক্ত আম সন্দেশ আট আনায় মেলে। এক সের শ্রেষ্ঠ কাটা রুই মাছ—যেটা বিয়েবাড়ি ছাড়া কখনই খেতে পাইনে—তার দাম আট আনা। আমাদের দৈনিক বাজার-হাট আট আনার বেশি লাগে না।

এর মধ্যে মায়ের নির্দেশে বুলিকে খান দুই ভাল তাঁতের শাড়ি, জামা-সায়া, পাদুকা শিল্পসদন থেকে পছন্দসই একজোড়া চটি—এসব এনে দিয়েছি। ওতেই আমার সর্বনাশ। একটা ছোট গল্পের দরুন পনেরো টাকা আমার বেরিয়ে গেল! বুলি হল গুরু-পুরুতের ঘরের মেয়ে, তায় আবার কড়ে-রাঁঢ়ি। দুখানা সরুপাড় মিলের শাড়ি, তার দাম বড় জোর সাত সিকে—তাই নিয়ে ওর খড়তুতো ভাই হারুর সঙ্গে মামার বাড়ি এসেছে। হাতে শুধু দু'গাছা কাচের চুড়ি। কিন্তু ওই একখানা নতুন তাঁতের শাড়ি আর একটা সাদামাটা জামা পরে সে যখন হাসিখুশী মুখে আমার আগে আগে চঞ্চল পায়ে বাসে উঠল, এবং ওর জীবনে এই প্রথম ভদ্র ও রুচিশীল সমাজের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবার সুবিধা পেল, তখন ওর আনন্দ আর ধরে না। ওকে নিয়ে যাচ্ছি দুপুরবেলায় যখন পথঘাটে লোক কম, বাসে যাচ্ছে মাত্র দু'চার জন, এবং আমার যখন অবসর। কিন্তু দুনিয়ার লোক যেন চোখ ভরে দেখে নিচ্ছে বুলিকে। বাসে তখনও মেয়েছেলে বড় একটা ওঠে না! যদি বা ওঠে তারা ঘরনী গৃহিণী জাতীয় মেয়েছেলে। কলেজের ছাত্রী সংখ্যা তখন একেবারেই কম। এ পাড়ার মেয়ে কখনও ও-পাড়ার অচেনায় যায় না। কুমারী মেয়ে কখনও একা বাসে ওঠে না, অথবা কোনও যুবকের সঙ্গে পাশাপাশি বসে কোনও বেহায়া তরুণী বাস-ট্রামে ভ্রমণ করে না। তবে কিনা এটা হল গান্ধীযুগ, এসব বেলেল্লাপনা আজকাল একটু-আধটু পথেঘাটে ঘটছে বইকি!

বুলি তার জীবনে ধর্মতলা চৌরঙ্গী কখনো দেখেনি। দেখল এই প্রথম। হাওড়া স্টেশন দেখেছে, যখন বিয়ের কনে হয়ে কাশী যায় এগারো বছর বয়সে। আবার হাওড়া স্টেশন সে দেখে সাড়ে বারো বছর বয়সে—যখন বিধবা বুলিকে নিয়ে আমি ফিরে আসি। বুলি হয়ত গড়ের মাঠ শুনেছে, কিন্তু সেই প্রান্তরের উদার আকাশ আর দিগন্তজোড়া মুক্তি বুলি দেখছে এই প্রথম।

ওটা কী ছোটমামা? ওই যে অনেক উঁচু?

ওটা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল!

কাছে যেতে দেয় না? একদিন দেখাবে আমাকে?

বললুম, আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে। এখন চল ত।

ভবানীপুর ছাড়িয়ে হাজরার মোড়ে এসে নামলুম শীতের রোদ্রে। বাঁ হাতি চললুম দু'জনে। বুলি এক সময় বলল, ছোটমামা, এটা কি কলকাতার বাইরে? যেমন আমাদের বরানগর?

বললুম, হ্যাঁ, এখন চল—

হনহনিয়ে এসে লাবণ্যপ্রভা দেবীর বাড়ির সরু গলিটিতে ঢুকে স্বস্তিবোধ করলুম। পথেঘাটে মেয়েছেলে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অভ্যাস তখনও আমার তেমন হয়নি। যাই হোক, বুলি যখন এ বাড়ির দোতলায় আমার সঙ্গে উঠে এল, তখনকার নাটকীয় পরিস্থিতি স্মরণীয়। সহসা বাড়িসুদ্ধ সবাই যেন রুদ্ধবাক ও ম্লান হয়ে গেল। বুলি যে এত সুন্দর, ওঁরা কেউ ভাবেননি। দিদি এবং মা বুলিকে জড়িয়ে ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন। শোভারানী হাসিমুখে শুধু বললেন, আপনার ভাগ্নী এত সুশ্রী আগে বলেননি ত? এর বয়স কত?

এই সতেরোয় পড়েছে।

মনে হচ্ছিল চট করে ও'রা কেউ বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, বুলির বয়স মাত্র সতেরো! অন্যান্য বোনেদের মতো বুলির গায়ের রং ধবধবে শাদা নয়, কিন্তু হিমালয়ের গৌরীগঙ্গা যেন তার দেহবর্ণের উপর এসে ছায়া ফেলেছে। বুলি যদি কখনও আমাদের যোগাসীন শিল্পী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সামনে দাঁড়ায়, তবে তিনি হয়ত বুলির ওই ভাবতন্দ্রিত চক্ষুতারকার ছবি আঁকতে পারেন!

শ্রীমতী শোভা আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন পশ্চিমের ছোট ঘরখানার দিকে। ও-ঘরটা অনেক সময় আমাদের পরামর্শ সভার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ওখানে কতক্ষণ আলোচনার পর স্থির হল, বুলি এখানে দু'-তিন দিক থাক। এখানে সে ভালই থাকবে। মা আছেন, দিদি আছেন—অসুবিধে কিছু নেই।—ফের অমনি করে আমার দিকে তাকাচ্ছেন? চোখ দুটো গেলে দেবো যদি ফাজলামি করেন!—সেই কবিতাটা একটু বলুন ত? কাল থেকেই ভাবছি ওটা শুনব আপনার মুখে—

কোনটা?

সেই যে "যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে—" একটু গলা নামিয়ে বলুন।

হাসিমুখে বললুম, ও-কবিতা শুনতে গেলে আপনাকে এ-ঘরে ঘুমোতে হবে। আমি কানে কানে বলব কবিতা।

আবার ফাজলামি হচ্ছে, কেমন? বলুন শুনি—

এবার আমি নিজেই উঠে দরজাটা ভেজিয়ে দিলুম। উনি শান্ত, অবিচল। ওঁর বাইরেটা হিসেবী, কিছুটা কর্কশ, অনেকটাই বস্তুতান্ত্রিক। কিন্তু ওঁর অন্য চেহারা একটা আছে, যেটা ফল্গুনদী,—যেটা গুপ্তস্রোত। সেখানে তিনি একাকিনী, বিজন-বাসিনী। আমি তারই কাছে এগিয়ে গেলুম, এবং কিছু আবেগের সঙ্গে বলতে লাগলুম, "যে-কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে, সে কাঁদনে সেও কাঁদিল যে-বাঁধনে মোরে বাঁধিছে সে বাঁধনে তারে বাঁধিল/পথে পথে তারে খুঁজিনু, মনে মনে তারে পূজিনু/সে পূজার মাঝে লুকায়ে আমারেও সে যে সাধিল—"

অন্যদিন আবৃত্তি শোনার পর শ্রীমতী শোভা বাইরে চলে যান, কিন্তু আজ নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন। আমার একটু অবাকও লাগল, কৌতূহলও হল। যে-কথাটা অনেক দিন ধরে মনের আনাগোনা করেছে, সেটি আজ মুখ ফুটে হঠাৎ বলেই ফেললুম—ক্ষমা করবেন, আজ একটা কথা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে—

উনি মুখ তুললেন। আমি বললুম, মেয়েদের বিয়ে হয় সাধারণত ষোল আঠারো বছর বয়সের মধ্যে। আপনি সেদিন বললেন আপনার বয়স চব্বিশ—

আমার বিয়ে হয়নি কে বললে ? আপনি কি আমাকে কোনদিন জিজ্ঞেস করেছেন ? কোনদিন জানতে চেয়েছেন, আমি নিজের কপালের সিঁদুর মুছে কেন একদিন চলে এসেছি ?

ওঁর কথার সঙ্গে সঙ্গে সেদিন আমি আমার 'প্রিয় বান্ধবী' উপন্যাসের সম্পূর্ণ নকশাটা তড়িৎ শিখার মতো পলকের মধ্যে আকাশপটে দেখতে পেয়েছিলুম ! কিন্তু ওঁর গলায় কাঁপন লেগেছিল। আমি চুপ করে গেলুম।

উনি নিজেই উঠে বাইরে গেলেন, এবং আমি ওঁর পিছনে পিছনে এসে বড় ঘরে ঢুকলুম যেখানে মস্ত আসর বসেছে। আজ ওই আসরের কেন্দ্র হল বুলি।

মা বললেন, এ দুটি মেয়ে এসেছে আপনাকে দেখতে, সেই কখন থেকে বসে আছে। ওরা হেমপ্রভা দেবীর মেয়ে অরুণা আর বরুণা।

হেমপ্রভা মজুমদার হলেন কুমিল্লা কংগ্রেসের প্রসিদ্ধ নেতা বসন্তকুমার মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রী। অসহযোগ আন্দোলনকালে পুলিস ইন্সপেক্টার পূর্ণ মুখার্জির লাঠালাঠির মধ্যে পড়ে তিনি আহত হন, এবং সম্ভবত বাঙ্গলায় তিনিই প্রথম পুলিস-লাঞ্ছিতা মহিলা নেত্রী ! তাঁর কপালের চওড়া সিঁদুর, চওড়া রাঙ্গাপাড় খদ্দরের শাড়ি, তাঁর স্নেহশীল আচার-ব্যবহার এবং সর্বোপরি তাঁর মাতৃরূপিণী মূর্তি সেদিনের সকল সভা সমিতি, সম্মেলন ও জনসমাবেশকে দেশানুরাগের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করে তুলত। আমি তাঁকে মাসিমা বলতুম, সেই কারণে এই দুটি কিশোরী তরুণী কন্যাকে আমি আমার ভগ্নির মতোই গ্রহণ করলুম এবং বয়সে এরা অনেক ছোট হলেও 'আপনি' বলেই সম্ভাষণ করলুম। তখন বসন্ত মজুমদার মহাশয় একজন সর্বজনমান্য ব্যক্তি।

মেয়ে দুটি দেখতে প্রায় একই রকম, এবং একই পোশাক, যেন একটি জুড়ি। ওর মধ্যে অরুণা বড় এবং উভয়ের মধ্যে ছোট মেয়ে বরুণা অধিকতরো স্বাস্থ্যবতী, তার চোখে চাঞ্চল্যের ভাষা আছে। অরুণা শান্ত এবং বিনীত। এরা দু'জনেই প্রায় বুলির সমবয়সী এবং দু'জনেই প্রায় বড় বড় কংগ্রেসী সভা ও সমাবেশে স্বেচ্ছাসেবিকার কাজ করে এসেছে। আগামী ২৬ জানুয়ারী এরা সম্ভবত স্বাধীনতার মহিলা মিছিলে যোগদান করবে। এদের মা-বাবার স্বদেশী শিক্ষা এইভাবেই এদেরকে তৈরি করেছে।

বুলিকে ঘিরে সবাই যেন আনন্দের হাট বসিয়েছে। মা হাসিমুখে বুলিকে ধরে আছেন। স্নেহশীলা দিদি ও তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঘিরে রয়েছে সবাইকে। বুলি এবার এসেছে নতুন জগতে, নতুন সমাজে এবং একটা আলোকোজ্জ্বল জীবনে। বুলি ওখান থেকেই উদ্দীপ্ত হাসিমুখে বলল, ছোটমামা, আমি থাকব এখানে দু'-তিন দিন, তুমি দিদিমাকে বলে দিয়ো, কেমন ?

আমি যেন পরম স্বস্তির সঙ্গে বুলির দিকে তাকিয়ে সম্মতি জানালুম। কিন্তু সেই লগ্নে বুলির ভাগ্যবিধাতা অন্তরীক্ষে হয়ত আরেকবার বক্র হাসি হাসলেন, যেমন তিনি ছয় বছর আগে শ্রাবণ-সংক্রান্তির সেই দুর্যোগের অবিস্মরণীয় মধ্যরাত্রে শ্রীমতী

-বুলির দিকে চেয়ে হেসেছিলেন!

পিছন থেকে নিঃশব্দে হেরম্ব এসে দাঁড়াল। শ্রীমতী শোভা তার দিকে একবার দৃষ্টি নিবন্ধ করলেন। হেরম্ব কি যেন দু'একটা কথা বলল তামাশার। দিদি এবার উঠলেন সবাইকে ছেড়ে। তারপর সহাস্যে পশ্চিমের ঘরের দিকে গেলেন।

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, শ্রীমতী শোভা ঠায় আমাকে নিরীক্ষণ করছিলেন। তিনি জানবার চেষ্টা করে এসেছেন, এ বাড়িতে হেরম্বর আনাগোনা আমি কিরূপ চক্ষে দেখি।

* * *

২৬ জানুয়ারী, ১৯৩২। গত বছরের সেই রক্তাক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা দিবসের তারিখটি আজ আবার ফিরে এসেছে। তা আসুক, বাঙ্গালী এটি একান্ত মনে চায়। এখন উত্তাল হয়ে উঠেছে জাতীয়তাবাদ, সুতরাং আবার সেই অবরোধ ভাঙ্গার কথা উঠেছে। এখন শুধু ভাঙ্গো, ১৪৪ ধারা ভাঙ্গো, পুলিসের কর্ডন ভাঙ্গো—যা কিছু ব্রিটিশ প্রশাসন, সব ভেঙ্গে চূর্ণ করো। সুতরাং আবার সেই লক্ষ লক্ষের অভিযান। দূর-দূরান্তর থেকে মিছিলের পর মিছিল আসছে এসপ্ল্যানেডের দিকে। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে সেই নাদধ্বনি, বন্—দে—এ মাতরম!

এই বিপুল জনসমারোহের মধ্যে একজন মাত্র ভীরু ব্যক্তি চৌরঙ্গীর পূর্ব ফুটপাথ ধরে এসপ্লানেডের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, সে আমি! আমি এপার থেকে লক্ষ্য করছিলুম, ট্রাম লাইনের ধার দিয়ে দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে আসছে প্রায় চারশ' মহিলার মিছিল। তাদের পুরোভাগে ফ্ল্যাগ উঁচিয়ে আসছেন লাবণ্যপ্রভা দত্ত, বিমল-প্রতিভা, কল্যাণী দাস, আরতি মুখার্জি, হোসেন আরা বেগম, বিষ্ণুপ্রিয়া এবং নব-সজ্জায় সজ্জিতা বুলি! ওই মস্ত মিছিলের সমস্ত মেয়েরা আজ পুলিসের ব্যূহ ভেদ করবে। ওরা কারাবরণ করতে প্রস্তুত। বুলির দিকে চেয়ে দেখলুম সে গৌরব-গর্বিতা।

কিন্তু ওই শত শত মেয়ের মধ্যে মাত্র কয়েকজন ছাড়া আর কে জানে যে, এই মিছিলটির পিছনে এই ভীরু ব্যক্তিটি তার সব পুঁজি খুইয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে? না, আমার আর কিছু নেই। সব শুষে নিয়েছে ওই ওরা—যাদের নিয়ে আজ ধন্য ধন্য রব উঠেছে! ওদের অনেকে পেট ভরে জল-খাবার খেয়ে এসেছে, সেই আমার আনন্দ! আমি এখান থেকে বাড়ি ফিরব, তার জন্য পকেটে আছে আনা দুই। অদূরে নব-প্রতিষ্ঠিত চৌরঙ্গী গ্রীল, ওখানে বসে যে এক আনায় একখানা চিংড়ির কাটলেট চিবোব, কিংবা দু পয়সায় এক পেয়ালা চা খেয়ে নেবো—তার সংস্থানও আর নেই। শুধু শুকনো মুখে এক পয়সা দামের 'স্বরাজ' মার্কা একটা সিগারেট টানতে টানতে ফিরব।

শত শত লাল-পাগড়ি লাঠি নিয়ে আগে একটু তাড়া করার চেষ্টা পেল। কিন্তু মেয়েমহলে তালিম দেওয়া ছিল, কিছুতেই যেন ভয় না পায়। যেই লাঠি উঁচিয়ে আসে, অমনি 'বন্—দে—এ মাতরম!' অবশেষে ব্যূহভেদ করল কয়েকজন।

পুলিসের গাড়ি প্রস্তুত ছিল আশেপাশে। চারিদিকের ওই জনারণ্যের ভিতর

দিয়ে সবটা ভাল করে দেখতে পেলুম না। বহু মেয়ে গ্রেপ্তার হল। আমি দেখলুম লাবণ্যপ্রভার সঙ্গে বুলিও উঠল পুলিসের গাড়িতে।

বাঁচলুম আমি। ওদের নিয়ে গেল প্রেসিডেন্সি জেলে। পরদিন ওদের বিচার। বিচার না ছাই! এক একজনের ছ'মাস করে কারাদণ্ড হল। মাত্র দিন কয়েক পরে মেয়েদেরকে কলকাতা থেকে হিজলি জেলে নিয়ে গেল। আমি নিশ্চিন্ত, বুলি একটা নতুন জীবনের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

কুসংস্কার, কুশিক্ষা, মূঢ়তা, অজ্ঞান—সব ছাড়িয়ে অন্ধ রক্ষণশীলতা—এদের হাত থেকে বুলি অন্তত কিছু দিনের জন্য বাঁচুক।

॥ ৩৫ ॥

শ্রীমতী রমলা দেবী গত দুবছরের অর্থাৎ সেই বিজলীর আমল থেকে, অন্তত একশ' চিঠি আমাকে লিখেছেন এবং আমিও কমপক্ষে কুড়ি-পঁচিশখানা লিখেছি। তাঁর চিঠি সর্বদাই খামে, আমার চিঠি সকল সময়েই পোস্টকার্ডে। তাঁর প্রতি-চিঠিতে একই সম্ভাষণ 'প্রীতিস্পদেষু', কিন্তু আমার চিঠিতে তিন প্রকার সম্ভাষণ, সবিনয় নিবেদন সুচরিতাষু ও করকমলেষু। এই তিনটির মধ্যে 'সবিনয় নিবেদন' দেখলেই উনি ক্ষুব্ধ হন এবং আমি তাঁর প্রতি সম্পূর্ণই বিরূপ কিনা, এটি তিনি জানবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেন। তখন আমি চিঠি লেখা বন্ধ করি। আমার সময় কম।

এ মহিলাকে আজও আমি চোখে দেখিনি।

সম্প্রতি দিন দুই আগে আবার তাঁর চিঠি এল মালদহ থেকে। তাঁর বাবা বিশিষ্ট এক সরকারী কর্মচারী, তিনি বুঝি বদলি হয়ে যাচ্ছেন বগুড়ায়। কিন্তু সে-খবরে আমার কী প্রয়োজন থাকতে পারে? শ্রীমতী রমলা ওরই মধ্যে লিখেছেন, তিনি কলকাতায় আসছেন এবং ভবানীপুরে বকুলবাগানের কোথায় যেন শ্রীমতী লাবণ্যলতা চন্দ-র ওখানে উঠছেন। তিনি শ্রীমতী চন্দর ঠিকানা দিয়ে আমাকে বিশেষ অনুরোধ করেছেন আমি যেন একটু খোঁজ খবর রাখি। শ্রীমতী চন্দ ছিলেন তৎকালে জনৈকা গান্ধীবাদিনী সমাজসেবিকা এবং বোধ হয় 'অভয় আশ্রম'-এর মহিলা কর্মী।

কিন্তু তখন 'প্রিয় বান্ধবী' উপন্যাসটির রচনা নিয়ে আমার যে প্রাণ যায়! গত বছর এই বইয়ের প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদ ছাপা হয়েছিল 'স্বদেশ'-এ—তখন এর নাম ছিল 'আঁকাবাঁকা'। কিন্তু আঁকাবাঁকা নামটা এখন হাতে থাক, ওটার জন্য পরে নতুন ছক কাটব। এখন 'প্রিয় বান্ধবী' লেখা চলুক।

শ্রীমতী দুর্গারানী-বৌদির শোচনীয় মৃত্যু আমার পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক ছিল। ওটা আমি ভুলতে পারছিলুম না। বোধ হয় এই বেদনাবোধের থেকেই আমার নতুন প্রেরণা এসেছে উপন্যাসটি একমনে লিখে যাবার। প্রকৃতপক্ষে বেদনাবোধের থেকেই

তো কাব্য বা সাহিত্যের সৃষ্টি। অনুপ্রাণিত আবেগ বোধ করি তার প্রাণরস।

জানিনে কেন এই সময় আমার মধ্যে ঘোরতর অসন্তোষ এবং ব্যর্থতাজনিত একপ্রকার ভয়াবহ নৈরাশ্যবোধ কাজ করেছিল। যাঁর কাছাকাছি থাকলে আমি সর্বাপেক্ষা উল্লসিত বোধ করি, সেই শুচিস্নিগ্ধচরিত্রা শ্রীমতী শোভার ওখানে যেতেও যেন আর মন ওঠে না। সেই আমার 'ভাষাহীন দিন কুয়াশায় লীন মলিন উষার স্বর্ণ/কল্পনা যত বাদুড়ের মতো ওড়ে কালো বর্ণ—।" নৈরাশ্যবোধ আমাকে যেন পঙ্গু করছিল।

আমার সামনে এই সুদীর্ঘ রাত্রির অন্ধকারে যে সকল কালোবর্ণ বাদুড় আমার এই ছোট্ট ঘরটির মধ্যে উড়ে বেড়ায় তারা আমার অলীক কল্পনা, না বাস্তব সত্য? ওই বাদুড় দলের মধ্যে শত শত ভগ্নপ্রাণ বুভুক্ষিত, হতাশাগ্রস্ত, উৎপীড়িত ও ব্যর্থ জীবন কী নেই? ওদেরই মধ্যে কি নেই সেই প্রেতায়িতা, সাধ্বী, শুচিশুভ্রা ও নিত্য হাস্য-মুখী দুর্গারানী?

লিখে যাচ্ছিলুম 'প্রিয় বান্ধবী'। দারিদ্র্যে উপবাসে জর্জর হয়েও সর্বপ্রকার শারীরিক অযত্নের ভিতর দিয়ে যখন লিখে যাচ্ছিলুম, তখন আমার কল্পভাবনার চারি-পাশে এসে দাঁড়াত সেই ছায়াচারীরা। যারা সর্বাধুনিক কালের বুভুক্ষু পুরুষ, নৈরাশ্যবাদে ও দারিদ্র্যে যারা জর্জর, যাদের চোখের সামনে ভবিষ্যৎ নেই, আলো নেই, আশা নেই, আশ্বাস নেই—যারা তাদের রক্তচক্ষে ডাক দিচ্ছে বিপ্লবকে আর জীবন-বিধাতাকে। তারা যেন আমার আশেপাশে পদচারণা করত। তাদের সকল স্বপ্ন চূর্ণ হচ্ছে, সকল রঙিন কল্পনা ধূলিসাৎ হচ্ছে। তারা মার খাচ্ছে বিনা অপরাধে, পিপাসায় তাদের কণ্ঠতালু শুকিয়ে যাচ্ছে। কোথায় অলক্ষ্যে ঘোরতর একটা অবিচার এবং পরোক্ষ উৎপীড়ন তাদের যৌবনশক্তিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করছে! তাদের পাশে পাশে রয়েছে সেই মেয়েরা—যারা সমাজনীতির শাসনে, নিরক্ষরতায় অজ্ঞানে, অন্ধ সংস্কারে উৎপীড়িতা। যাদের দুরাশার ডাক কেউ শোনে না, যারা কেবলমাত্র শাসন শৃংখলে বন্দী, যাদের চারিদিকে রক্ষণশীল রক্তচক্ষুর পাহারা, যারা এ জীবনে বৃহত্তর জীবনের কোনও আস্বাদ পায়নি—তারা যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল এই ঘন গভীর রাত্রে আমার চোখের সামনে। 'প্রিয় বান্ধবী' উপন্যাসটি লিখে যাচ্ছিলুম।

সেই নিশুতি অন্ধকারে কেরোসিনের আলোটা রেখে মেঝের উপর শুয়ে বুকে বালিশ দিয়ে উপুড় হয়ে আমি বলছিলুম, ওরে, তোদের সঙ্গে আমিও যে কাঁদছি। আমি কাঁদছি তিন হাজার বছর ধরে—যতদিন এই মানব-সভ্যতা! নির্যাতিত উৎপীড়িত মানব বংশপরম্পরার জন্য কল্পে কল্পে যুগে যুগে আমিও ত তোদের মত চোখের জল ফেলতে ফেলতেই এতদূরে এসেছি। আমিও তোদের মত চেয়েছি দেশজোড়া রক্ত-বিপ্লব। পুরাতনের বিরুদ্ধে তোদের প্রচণ্ড বিদ্রোহ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোদের মরণপণ সংগ্রাম—আমি আছি তোদেরই সঙ্গে। শুধু কাঁদিসনে, বরং জেগে ওঠ। শুধু জেগে নয়, উঠে দাঁড়া। শুধু দাঁড়িয়ে থাকিসনে, আগে আপন আপন পায়ের শৃংখল কেটে দে—।

শ্রীমতী শোভার জীবন থেকে যেমন 'প্রিয় বান্ধবী'র একটি ইশারা লাভ করেছিলুম,

তেমনি আজ ও-বইটি লেখবার কালে আমার চোখের সামনে ভাসছিল, দুরারোগ্য যক্ষ্মায় অন্তিমশয্যাশায়িনী কঙ্কালিকা শ্রীমতী দুর্গারানী—যাঁর পিতাকে একদা আমি বাধ্য হয়ে ঈষৎ প্রতারণা করেছিলুম। কিন্তু দুর্গারানীর কাহিনী একটু অন্যরকম। সামাজিক উৎপীড়ন, অন্যায়ের আস্ফালন, নিষ্ঠুর অবহেলা, শালীনতাবোধের প্রতি অনাচার—এগুলি তাঁর বিক্ষুব্ধ বিবাহোত্তর কালে মর্মে মর্মে আঘাত করেছে! আজ এই অন্ধকার রাত্রে যদি সেই প্রেতিনী সামনে এসে আবির্ভূতা হত, তাহলে চেঁচিয়ে বলতুম, ওরে, তোর এলোচুল ফিরিয়ে বাঁধ, রক্তলোভাতুরা সিংহিনীর মতো মাথা তুলে গর্জিয়ে ওঠ, সমস্ত সমাজের বিরুদ্ধে বিপ্লবকে ডাক দে। বল, স্বীকার করিনে এই অসম্মান, এই অনাচার, নিরুপায় দুর্বল নারীর বিরুদ্ধে বলদর্পীদের এই ষড়যন্ত্র!

'প্রিয়-বান্ধবী'তে আমি মহাকালীর উদ্যত খড়্গকে তুলে নেবার জন্য ডাক দিতে চেষ্টা পাচ্ছিলুম। আমার বিদীর্ণ কণ্ঠে যেন রক্তের ধারা ছুটছে। উপন্যাসটির মধ্যে আমি যখন এই মেজাজটি সঞ্চার করবার চেষ্টা পাচ্ছিলুম, তখন একদিন রাত্রে লক্ষ্য করে দেখি আলোটায় আর তেল নেই! ওটা কেরোসিনের অভাবে আস্তে আস্তে নিবে যাচ্ছে।

এদিক ওদিক খুঁজে কেরোসিনের খালি বোতলটা হাতে নিয়ে গায়ে কোনও মতে জামাটা চড়িয়ে পায়ে চটি দিয়ে নীচে নেমে এলুম। বাইরের দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বড়দা সাড়া দিলেন—কে কে?

আমি, বড়দা।

ঘর থেকে বড়দা বেরিয়ে এলেন—কোথা যাচ্ছ এত রাত্রে? প্রায় একটা বাজে!

এই যে, এই যাব আর আসব। তুমি ঘুমিয়ে পড় বড়দা, তুমি এত রাত জেগে নাই বা মহাভারত পড়লে? আমি কেরোসিন আনতে যাচ্ছি—

আমি বেরিয়ে গেলুম সরু গলিপথ দিয়ে। বিপত্নীক বড়দা মুখের একটা শব্দ করে দরজাটা বন্ধ করলেন। তখন শীতের রাত।

পা-দুটো যেন ঠিকে পড়ছে না। কিন্তু আমি সঠিকভাবে ত অসুস্থ নই! আমি জীবনদর্শী, আমি কবি,—নিরঙ্কুশা কবয়ঃ! 'আমি কবি যুগে যুগে আসি তব তপোবনে। দুর্জয়ের জয়মালা পূর্ণ ক'রে মোর ডালা। ব্যথার প্রলাপে তার গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী—"

থমথম করছে রাত। চারিদিক নিশুতি। কেউ কোথাও জেগে নেই। হাস-পাতালের গা বেয়ে জনশূন্য পথ ধ'রে এগোচ্ছিলুম। কিন্তু বিড়বিড় করে বকছিলুম নিজের মনে—"তাঁর জটপট করে বাঘছাল তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে/তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল যত ভুজঙ্গদল তরজে/তাঁর ববম্ ববম্ বাজে গাল দোলে গলায় কপালাভরণ/তাঁর বিষাণে ফুকারি ওঠে তান, ওগো মরণ, হে মোর মরণ।"

আরে, কি ভাগ্যি আমাদের! বড়বাবু যে,—আসুন, আসুন বড়বাবু। আহা, কদ্দিন পরে দেখা! না, না, কিচ্ছু রাত হয়নি, বড়বাবু। সকাল হতে এখনও চার ঘণ্টা—

আমাকে এক বোতল কেরোসিন দাও মতি, বড্ড দরকার—

এক বোতল ?—মতি পাল আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, আপনার হুকুম পেলে অমন বিশ বোতল বার করে দেবো, বড়বাবু। আসুন, আসুন, ভেতরে একবারটি পায়ের ধুলো দিন।

টলতে টলতে মতি পাল বলল, ওরে মালিনী, ওরে পোড়ারমুখী বিজনবালা,—কে এসে দাঁড়িয়েছে দ্যাখ···ছদ্মবেশী নারায়ণ! নে নে, পায়ের ধুলো নে! আজ তোদের ভাগ্যি দেখে আমারই হিংসে হচ্ছে!

এটা লোহালক্কোর আর কাঠের কারখানা। ভিতরে সব রকমের তেলের পিপে-বোঝাই। এরই মধ্যে কয়লার ডিপো, কেরোসিন বিক্রি—এইটি আমার জানা। আমি অনেক সময় সমস্ত রাত জেগে কাজ করি। সুতরাং রাত দশটা আর রাত দুটো—আমার কাছে একই কথা। কিন্তু গভীর রাত্রে যে এই আড়তের চেহারা বদলায়, মালিক মতি পাল যে টলে, মালিনী আব বিজনবালারা যে এখানে 'ছদ্মবেশী নারায়ণ-দের' জন্য উৎসুকভাবে অপেক্ষা করে, এতটা ঠিক জানতুম না। সর্বাপেক্ষা কৌতুকের বিষয়, আমার কেরোসিন নিতে আসাটাকে মতি পাল ছলনা মনে করেছিল।

ওধার থেকে একটা মেয়েছেলে বলল, গোসাই বুঝি খোঁজখবর নিয়েই এসেছে ?

আমি হাসছিলুম। কিন্তু কথাটা মতি পালের কানে গিয়েছিল। এইটুকুর মধ্যেই সে ঢুলছিল। এবার সে হঠাৎ ঝাঁজিয়ে বলল, এত বড় আস্পদ্দা তোর ? বড়-বাবুর মুখের উপর কথা বলছিস ? তুই কেন বেরিয়ে এসেছিস ঘর থেকে ? তোদের ঘরে না পান-বসন্ত ঢুকেছে ? যা দূর হ—

মেয়েটা বলল, তা ত যাবই ! কিন্তু তুমিই বা কেমন মোড়ল, দুদিন পেটে আমার অন্ন যায়নি—তার খোঁজ রেখেছ ? টাকাটা সিকেটা রোজগার না হলে কাল থেকে খাবো কি ? ছেলেটা ওদিকে মরে কি বাঁচে !

দেখলেন ত বড়বাবু, দেখে নিন—মতি পাল আবার গর্জিয়ে উঠল, তুই যে মরদ ধরতে পারিসনে, সে কি আমার দোষ যে, হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গতে এলি ? বুঝলেন বড়-বাবু, ছোট জাতকে কখনো মাথায় তুলতে নেই।

মেয়েছেলেটা অন্ধকারে ভিতর দিকে দাঁড়িয়ে তখনও গরগর করছিল।

ওদের বচসা মিটমাট করার জন্যই আমি দু'পা এগিয়ে এসে বললুম, তোমার নাম কি ? চলো দেখি তোমার ঘরে—

মেয়েছেলেটা বলল, আমার নাম সুশীলা। তোমাকে দেখেছি রাস্তাঘাটে, ঠাকুর-মশাই। তুমি ত থাকো হাসপাতালের ওই অমন বাগে—

ঝোপড়া ঘরের দরজার কাছাকাছি এসে সুশীলা বলল, ওই দ্যাখো ঠাকুরমশাই··· ছ' বছরের ছেলেটা সাদা কাগজের মতন বিছানায় মিশে রয়েছে।—তার চোখ ঝাপসা হয়ে এল।

কী হয়েছে ওর ?

এই তিন মাস হল রক্ত-আমাশা চলছে ! ছেলে বোধ হয় আর উঠবে না।

প্রশ্ন করলুম, ওর বাপ কোথায় ?

বাপ ?—বাপ গেছে যমের বাড়ি। ঠিক যেন কেঁদে উঠল সুশীলা,—কিন্তু কে সে বাপ কেমন করে জানব ঠাকুরমশাই ? পাঁচজনের সেবা করেছি, হিসেব কি তার আছে কিছু ?

আমি চুপ করে গেলুম। ঘরের ভিতরে দেখলুম আরেকটা মেয়েছেলে সর্বাঙ্গে মুড়ি দিয়ে পড়ে রয়েছে। সুশীলার মতো ওরও সর্বাঙ্গে গুটি দেখা দিয়েছে। এবার একটু চাপা গলায় সুশীলা বলল, আমার গায়ে যদি 'মার অনুগ্র' না ফুটত, তা হলে মোড়লের কি আর পরোয়া করতুম ?

এদিকটা এই লোহালক্কড় আর কাঠ-গোলার ময়লা জল নিষ্কাশনের নর্দমার ধার। কিন্তু আমি উন্নাসিক নই যে, চারদিকের এই অধঃপতিতা স্ত্রীলোকদেরকে বলে যাব, ওরা নৈশ জীবনের নারকীয় পিশাচী, অথবা বলে যাব এটা হ'ল বীভৎস জীবন ! এই দুর্গত অভিশাপগ্রস্ত জীবনটাই ত তৎকালের কলকাতায় সর্বত্র ছড়ানো ! সুতরাং আমি জানি, কেরোসিন তেলের বোতলটা হাতে নিয়ে আমি অন্ধকারে ঠিক কোন্ স্থলটিতে দাঁড়িয়েছিলুম।

এবার বললুম, শোন সুশীলা, আমি এক বোতল তেল আনতে বেরিয়েছিলুম ছ'টা পয়সা দিয়ে। তুমি যদি কারোকে সঙ্গে দিতে পারো তবে তোমার ছেলেটার জন্যে কিছু সাহায্য দিতে পারি !

পুরুষ মানুষকে ওরা চিরকাল অবিশ্বাস করে এবং নিরাসক্ত পুরুষকে দেখলে ওরা যেন কতকটা ভয় পায়। সুশীলা বলল, সত্যি বলছ গোসাঁই, ঠিক দেবে তুমি !

সঙ্গে একজনকে দাও, আমি এগোই।—এই বলে অগ্রসর হয়ে মোড়লের কাছে এসে বোতলে তেল ভরে নিলুম এবং ছ'টি পয়সা সামনে রেখে বাইরে বেরিয়ে এলুম। গভীর রাত সাঁ সাঁ করছিল।

বাড়ির কাছাকাছি এসে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করলুম, তোর নামই বুঝি মালিনী ? সুশীলা তোকে বিশ্বাস ক'রে পাঠালো, তুই যদি তাকে ঠকাস ?

কাঁচপোকার টিপ-পরা মেয়েটা বলল, এ আবার কি কথা গো ? সুশীলা আমার নিজের দিদি—

আচ্ছা, একটু দাঁড়া এখানে—

আমি ভিতরে গিয়ে কড়া নাড়লুম। বড়দা তাঁর মহাভারত নিয়ে তখনও জেগে। তিনি এসে দরজা খুলতেই আমি বললুম, বড়দা বাড়ি ভাড়ার টাকা থেকে আমাকে দশটা টাকা দাও ত ?—এই বলে বোতলটা এক স্থলে রাখলুম।

দাঁড়াও, ব্যস্ত হয়ো না, এনে দিচ্ছি। হুঃ···যত সব··· !

আমার সম্বন্ধে বড়দার চিরকাল একটা অদ্ভুত ধারণা। আমি অতিশয় বিপজ্জনক ব্যক্তি, সাংঘাতিক বেপরোয়া, কিন্তু আমার স্বভাব-চরিত্র নাকি চাঁদে কলঙ্ক, এবং আমি নাকি তাঁর দেবতুল্য সহোদর !

টাকাটা নিয়ে মালিনী গড় হয়ে প্রণাম করল। আমি বললুম, তুই যদি পারিস

ছেলেটাকে নিয়ে কাল সকাল ন'টায় হাসপাতালে আসিস। আমার সঙ্গে ওদের একটু চেনা আছে, আমি বলে দেবো।

মালিনী চলে গেল। আমি স্নানে নামলুম। 'প্রিয় বান্ধবী'র ভূত ততক্ষণে আমার মাথায় উঠেছে।

কিন্তু ওখানেই ও-ব্যাপারটা শেষ। ছেলেটাকে নিয়ে ওরা হাসপাতালেও আসেনি, এবং মালিনী-সুশীলাকেও আর কোনদিন দেখিনি।

১৯৩২-এর বসন্ত কাল। ডালহাউসী বোমার মামলার আসামী দীনেশ মজুমদার ও চট্টগ্রামের কল্পনা দত্ত পালিয়ে বেড়াচ্ছে। শ্রীমতী কল্যাণীর ছোট বোন বীণা সেনেট হাউসে গভর্ন'র জ্যাকসনকে মারতে গিয়ে হাত ফসকেছে। হাসান সুরাবর্দি ওকে ধ'রে ফেলেন। কর্তা লোম্যানকে হত্যা ক'রে বিনয় বোস এখন পলাতক।

রাত দশটার পর প্রায়ই আমার বাড়িতে আসে শিবু আর অনাথ। অনাথ হল ডাঃ অমর মুখুজ্যের ছোট ভাই। হাজরা রোডেই ওদের বাড়ি। ডাঃ আমার মুখুজ্যে সৌখিন লোক, পরে উনি ডেপুটি মেয়র হন। ওরা চুপি চুপি এসে দশ, পনেরো, বা আরো বেশি টাকা আমার কাছ থেকে নিয়ে যায়। আমি তখন সবেমাত্র কাত্যায়নী বুক স্টলের গিরীন সোমের কাছে দাদন নিচ্ছি মাঝে মাঝে। আমার তখন ঈষৎ খ্যাতিও হয়েছে। ডি-এম, কাত্যায়নী, গুরুদাস, বরেন, নাথ ব্রাদার্স,—এরা আমার প্রকাশক হচ্ছিল একে একে। সম্প্রতি এম-সি সরকার একখানা উপন্যাস নিয়েছেন।

কল্যাণী দাসরা জানতেন পলাতক দীনেশ আর কল্পনা কোথায় থাকে। একজন টালিগঞ্জের এক বস্তিতে, অন্যজন সম্ভবত শ্রীরামপুরের এক গৃহস্থ ঘরে। দীনেশ অসুস্থ এবং যক্ষ্মারোগাক্রান্ত—এই কারণে একটি বাড়ির অংশ বিশেষ ভাড়া নেওয়া হয় এবং শ্রীমতী কল্যাণী দীনেশকে দেখাশোনা করার জন্য তথাকথিত ভগ্নী সুবাদে সুতপা নামক একটি মেয়েকে টালিগঞ্জের বাড়িতে মোতায়েন করেন। আমার ওই সামান্য চাঁদা চলে যেত লেক অঞ্চলের নলিনীপ্রভাদের পুরনো বাড়িতে। সেখান থেকে টালিগঞ্জ বা শ্রীরামপুরে সেই চাঁদা গিয়ে পেঁছিত কিনা খবর পাইনি কোনদিন।

ভাগ্যের বিদ্রূপ ছিল দীনেশ মজুমদারের ওপর। একদা যে যক্ষ্মা ছিল তার অজুহাত মাত্র, সেই যক্ষ্মা রোগই তাকে ধরেছিল এবং পাছে পুলিসের চোখে পড়ে সেজন্য তার চিকিৎসাও তেমন করা হয়নি। ধরা পড়ার কালে সে চার্লস টেগার্টের পুলিসের সঙ্গে পিস্তল নিয়ে ঘরের ভিতর থেকে যখন লড়াই করছিল, তখন সে খুবই রোগাক্রান্ত, তার উপরে গায়ে বেশ জ্বর। একদা শেষ রাত্রে যখন তার ফাঁসী হয় তখন সবেমাত্র সে-রাত্রির মতো তার জ্বর ছেড়েছিল।

কিন্তু এসব অন্য ইতিহাস।

এই সময়ে একদিন অজাতশত্রু পবিত্র গাঙ্গুলী আমাদের কয়েকজন লেখককে ধরে নিয়ে গেল শ্রীরামপুরে। এখানে আমার দুঃখ-দুর্যোগের বহু কাহিনী জমা আছে। পবিত্র নিয়ে গেল ঠাকুরদাসবাবু লেনে শ্রীমতী লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ীতে। লীলা ছিলেন লেখিকা, 'স্বদেশ'-এ ওঁর একাধিক লেখা আমি ছেপেছি। উনি বিধবা,

এবং ওঁর দুটি নাবালক পুত্র রয়েছে। ওদের নাম চনু আর মনু। চনু বড়, বয়স বছর বারো-তেরো, কিন্তু এখনই সে সাহিত্যোৎসাহী। লীলারানীর এখানে প্রায়ই আসেন শরৎচন্দ্র। ছেলেরা তাঁকে বলে বড় মামা। আমরা সবাই সেদিন লীলারানীর আতিথেয়তায় ও চনু-মনুর উদ্দীপনায় খুবই আনন্দ পেয়েছিলুম। শ্রীমতী লীলা আমার চেয়ে বয়োজ্যেঠ, কিন্তু আসবার সময় আমাকে তিনি ধরলেন, আমি যেন এখন থেকে তাঁকে 'তুমি' সম্ভাষণ করি এবং তিনিও আমাকে 'তুমি' বলে চিঠিপত্রাদি লিখবেন। মেয়েমহলে আমি চিরকালই লাজুক ও মুখচোরা, সুতরাং তাঁর কথায় রাজি হয়ে গেলুম। সেই বছর থেকেই আমি চনু ও মনুর দ্বিতীয় মামা হয়ে রইলুম! আমার কাশী যাতায়াতের পথে দেরাদুন একসপ্রেস ট্রেনে শেষ রাত্রে নামতুম শ্রীরামপুরে, একটা দিন কাটাতুম লীলারানীর ওখানে, সাবলীল একটা আন্তরিক আতিথেয়তার আস্বাদ পেতুম, এবং ছেলেদের নিয়ে কাটাতুম সারাদিন। যেন অনেকটা ওদের সুখ-দুঃখে আমি জড়িয়ে গিয়েছিলুম। আমার একসেট ধুতি ও পানজাবি লীলা দেবী রেখে দিতেন। মনে আছে ওঁদের বাড়িতেই প্রথম এক প্রিয়দর্শন ও মিষ্টভাষী কিশোর কবিকে দেখি, তার নাম হরপ্রসাদ মিত্র। পরবর্তীকালে হরপ্রসাদ একজন বিশিষ্ট কবি, অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদ হয়ে ওঠে।

আমি দুর্বলচিত্ত, কিন্তু অতিশয় অধ্যবসায়ী। আমি ভীরুপ্রকৃতি, কিন্তু আমার কায়িক শক্তি ও স্বাস্থ্য প্রবল। অতিশয় সৌজন্য ও শালীনতা আমার,—কিন্তু রাগলে চণ্ডাল। আমার বাবার ডাকনাম ছিল 'বাঙ্গাল', আমিও সেই বাঙ্গালের ভগ্নাংশ! বাঙ্গালী মেয়েদের মতো সরষে বাটা ও কাঁচালঙ্কা দিয়ে গোয়ালন্দর তাজা ইলিশের ঝাল,—আমারও প্রিয়। বস্তুত, লঙ্কা ও সরষে বাঙ্গালীর চরিত্র নির্মাণে কাজ করেছে অনেক! একটায় ঝাল, অন্যটায় ঝাঁঝ। যাই হোক, এইসব এলোমেলো কথা যখন ভাবছি, তখন একদিন হঠাৎ সন্ধ্যার সময়ে 'চিত্রমন্দির'-এ গিয়ে রতি পালিতের কাছে শুনলুম, আমার অতি প্রিয় বন্ধু অনিল ভট্টাচার্য আজ দুপুর থেকে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছে।

অনেক অনেকদিন থেকে যোগাসন করছিল একান্তে। সে যখন নিরাসক্ত মনে আমার পকেট থেকে পয়সা তুলে নিয়ে খরচ করত এবং আমার অভিযোগের উত্তরে নিবিড় মধুর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতো, তার সেই চাহনির মধ্যে আমি দেখতুম, কত ক্ষুদ্র ও কত ক্লিন্ন আমি! ওর বিষয়াসক্তি ছিল না, সিল্ক হোম থেকে রোজগারপাতি বন্ধ করেছে, তরুণী স্ত্রী ও নবজাত কন্যার বিষয়ে তিলমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই,—কেবল আমার আশেপাশে ঘুরঘুর করে এবং সকলকে ছেড়ে এই চিত্রমন্দিরে রাত কাটায়। আজ সকাল থেকে অন্তত বারো-চোদ্দ ছিলিম ছোট কলকের তামাক সে টেনেছে। এতক্ষণে তাঁর বুঁদ হয়ে থাকার কথা। কিন্তু যদি পথঘাটে কোথাও দৈবাৎ গাড়ি চাপা পড়ে? আমি যখন তাকে ছেড়ে গেছি বেলা তিনটে নাগাত, সে তখন বেহুঁশ হয়ে ছিল। সুতরাং আমি তার সন্ধানে সিল্ক হোমের দিকে ছুটলুম।

অতঃপর রাত্রের দিকে ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস থেকে খবর পেলুম, অনিলের

পকেটে ছিল মাত্র এক আনা পয়সা। তার ওপর সে পণ্ডিচেরী যাবার ট্রেন ভাড়া যোগাড় ক'রে আজ বিকালের মাদ্রাজ মেলেই নিঃসম্বল অবস্থায় কলকাতা ত্যাগ করে গেছে! সেদিন তা'র বিরহে আমার চারিদিকে শুধু খাঁ খাঁ করেনি, সে যেন আমার জন্য রেখে গেল এক অপরিসীম শূন্যতা ও তার সঙ্গে একটা বিষাদের ছায়া! ফিরবার পথে বিড়বিড় ক'রে বলছিলুম, "গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়/হে বন্ধু বিদায়।" আমি ক্ষুদ্রচিত্ত, তাই সেদিন আমার চোখে জল এসেছিল। অতঃপর অল্প কয়েক বছরের মধ্যে খবর পেয়েছিলুম, পণ্ডিচেরীতেই এই মহৎপ্রাণ বন্ধুর অকাল-মৃত্যু ঘটেছে।

কিন্তু আর না, এবার আমিও ছুটি চাইব কিছুকালের জন্য। আমার সব চেয়ে বড় স্বস্তি, বুলি মাস ছয়েকের জন্য কারাগারে গেছে! বছর পাঁচেকের জন্য যদি তার জেল হতো আমি আরও খুশী হতুম। আমি তা'র হাত থেকে আপাতত মুক্তি চাইছি! তার মা-বাপ, ভাই-বোন, দুই মামা, লাবণ্যপ্রভা, শোভা, প্রিয়া এবং আরও অনেকে রইল, তারাই যা হয় করবে। বুলি এখন আর একা নয়। এবার সে লেখাপড়া শিখুক, রামায়ণ মহাভারত পড়ুক, ধর্ম-কর্মে মন দিক।

রাত্রে ফিরে ঘরে ঢুকেছি, আবার সেই বন্ধ-খামে রমলা দেবীর চিঠি। লিখেছেন বকুলবাগান থেকে। "প্রীতিস্পদেষু, আমি খদ্দর প্রচারের নানা প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হয়ে কাজে নেমেছি। শ্রীমতী চন্দ আমাকে খুবই সাহায্য করছেন। কিন্তু আপনি আমার সামনে এসে দাঁড়ান, আপনাকে দেখলে আমি সাহস ও শক্তি পাবো। আপনি আমার জীবনকে অনুপ্রাণিত করুন।"

এসব কী রে বাবা! এই ধরনের চিঠির নামই ত প্রেমপত্র! প্রীতিস্পদেষু লিখেছে নিতান্ত অচেনার খাতিরে, 'প্রেমাস্পদেষু' বসাতে পারেনি বলে বোধ হয় দুঃখিত। কিন্তু আমি অত বোকা কেন? আমি কেন বুঝতে পারছিনে যে, একটি মহিলা আজ প্রায় দু'বছর ধ'রে আমার দিকে এগিয়ে আসছে? আমি নিজে অদ্যাবধি এ ধরনের চিঠি কোথাও কোনও মেয়েকে লিখিনি। ও-ব্যাপারে আমি একেবারেই অপারগ। হৃদয়োচ্ছ্বাস আমার নেই। আমি গরীব, আমার চালচুলো নেই, উপার্জন নিয়মিত নয়, বন্ধন আমি ভালবাসিনে। ওইসব সেন্টিমেন্টাল চিঠিপত্রের আদানপ্রদান আমার দু'চোখের বিষ। শেষকালে কিসের থেকে কী হবে কে জানে। স্ত্রীলোকের ব্যাপারটা বড়ই জটিল।

পরদিন সকালে উঠে চিঠির জবাব দিলুম, সবিনয় নিবেদন, আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। আমি নিজে বহু প্রকার কাজে লিপ্ত। সম্প্রতি বাইরে চলে যাচ্ছি। আপনার কর্মজীবনের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। ইতি—

যাক, এখন আমার মন পরিষ্কার, আমি পরম নিশ্চিন্ত, আমার ঝাড়া হাত-পা, এবং আমি এখন বিশুদ্ধচিত্ত। এতকাল পর্যন্ত আমি কোনও নীতিবিগর্হিত কাজ করিনি, কারও মুখের গ্রাস কেড়ে নিইনি, কারোকে কোনও ব্যাপারে ঠকাইনি, ক্ষতি করিনি কারও—বরং সাধ্যমতো আমি একে-ওকে অল্পবিস্তর সাহায্যই করেছি। এখন

আমি নিষ্পাপ, নিরঙ্কুশ, আমি অমৃতের পুত্র! আমি নিজেকে বার-বার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে বিশুদ্ধ করেছি, এবং বার বার ফিরে এসেছি নবজীবনে। প্রত্যেক দিন প্রত্যূষে যখন রক্তিম সূর্যোদয় দেখার জন্য ছাদে উঠি, রজনীশেষের তারারা যখন একে একে বিদায় নেয়, যখন শুকতারাটি সূর্য-সম্ভাষণের জন্য জ্বলজ্বলে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আমি ওই আকাশপথে দেখি, আমারই যেন এক নবজন্ম ঘটছে! সন্দেহ নেই, মাঝে মাঝে আমার শিকলছেঁড়া বাঁধনহারা প্রবৃত্তি উন্মত্ত অশ্বের মতো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে, খুঁজে বেড়াচ্ছে আপন পরিতৃপ্তি। কিন্তু সে ত আমার "লোয়ার ভাইটালস", সে ত জৈবিক, সে ত সৃষ্টিলোকের পরমাশ্চর্য শক্তির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। তাকে বাদ দিয়ে আমি কোথায়? কে আমি? কতটুকু আমি? কোন্ শক্তি নিয়ন্ত্রিত করছে আমাকে?

মা এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে।—হ্যাঁ রে, তুই যেন কোথায় যাবার যোগাড় করছিস? জামা কাপড় গোছাচ্ছিস, ঝোলা একটা কিনেছিস দেখছি,—কোথা যাচ্ছিস?

আমি খুব হাসলুম। বললুম, কোথা যাব মা তোমাকে ছেড়ে? যেখানেই যাই, তুমি থাকবে সঙ্গে সঙ্গে।

মা বললেন, কিন্তু আমার এখানে যে সেই ভদ্রলোক দু'জন দু'একদিনের মধ্যেই আসছেন, তাঁরা কথাবার্তা বলতে চান—

মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। তিনি পুনরায় বললেন, সেই যে ভবানী-পুরের লাহিড়িরা—ওই যে সেই জজের মেয়ে—

আবার আমি হাসলুম।—মা, সেই নির্বোধ জজের মেয়ে এলে এ বাড়িতে কি ধরবে?

তবে কি বিয়ে তুই করবিনে, মুখপোড়া?

হাসি মুখে বললুম, যে কাজ সবচেয়ে সহজ, সে কাজ থাক না কেন স্থগিত? আমাকে ভয় পাও কেন মা? আমাকে বিশ্বাস করলে তুমি ঠকবে না!

—এখন যাচ্ছিস কোথায়?—মা প্রশ্ন করলেন।

—শোনো মা—আবার আমি বললুম, আমার চারদিকে জঞ্জাল জমেছে, অনর্থক নানা কারণে হয়রান হচ্ছি—এবার কিছুকাল ঘুরে আসি। আজ আমি কাশী যাচ্ছি, তারপর যাবো হরিদ্বার। তুমি কিছু ভেবো না, যেখানেই যাই তোমাকে চিঠি দেবো।

মা নিজেই আমার এটা ওটা গুছিয়ে দিতে লাগলেন। লালিমলির একটা ফুল-হাতা সোয়েটার কিনেছিলুম আড়াই টাকায়। ফিতাসুদ্ধ ঝোলাটা এক টাকা। এক-খানা ভাল গামছা ছয় আনা। এক জোড়া কেডস চোদ্দ আনা। সঙ্গে অতিরিক্ত এক সেট পুরনো ধুতি, পানজাবি আর ফতুয়া। মায়ের হাতে সর্বপ্রকার খরচপত্র দিয়ে আমার মোট হাতে রইল পঁয়ষট্টি টাকা।

বৈশাখের প্রথম সপ্তাহ শেষ হচ্ছিল। রৌদ্রে দগ্ধ হচ্ছিল বাঙলা, বিহার আর যুক্তপ্রদেশ। তখন যুক্তপ্রদেশের নাম ছিল আগ্রা ও অযোধ্যাকে জড়িয়ে। পরদিন আমি কাশীতে গিয়ে নামলুম।

আসবার আগে লাবণ্যপ্রভা দেবীর ওখানে গিয়েও আমি শ্রীমতী শোভার সঙ্গে

দেখা করে আসিনি। শোভা এখন অনেকটা একা, নিঃসঙ্গ। তাঁর সহকারিণীরা প্রায় সবাই জেলে গিয়েছে।

'পুণ্যাশ্রম'-এর প্রতি আমার বিরক্তি এসে গেছে। 'আনন্দমঠ'-এর উন্নতির কথা আর ভাবতে ভাল লাগছে না। এ যেন আমার চারিদিকে শুধু 'পেটিকোটে'র ভিড়। মেয়েলী পোশাক, মেয়েলী প্রলাপ, মেয়েলী রাজনীতি, মেয়েলী ব্যবস্থাপনা, ভিড়ের মধ্যে মেয়েলী প্রসাধনের গন্ধ,—এবং আমি নিজে মেয়েলী অনুরোধের আজ্ঞাবাহী ক্রীতদাস—এর থেকে আমার নিষ্কৃতি পাবার দরকার ছিল।

কাশীতে ভূতেশ্বরের গলিতে কয়েকটা সিঁড়ি উঠে একটা মঠের একটি ঘরে আমি আশ্রয় নিয়েছিলুম, দু'একজন হিন্দুস্থানী সাধু-সন্ত, জন দুই পাণ্ডা,—এরা ছিল মঠে। এবার আমি আত্মীয় পরিজনদের মুখ বিশেষ দেখব না, সেজন্য আমাদের কাশীর বন্ধু অধ্যাপক অপূর্বচন্দ্র ভট্টাচার্য আমার জন্য এ ঘরটি ঠিক ক'রে দিয়েছিল। সামনেই কালীতলা আর দশাশ্বমেধ, সুতরাং অসুবিধা কিছু নেই। বাজারে দু'আনার ভাত বা রুটি প্রাণধারণের জন্য। আমি আত্মনিগ্রহের মধ্যে যাবার চেষ্টা পাচ্ছিলুম। একবেলা আহারই যথেষ্ট, কেন না আমার পুঁজিও কম। দুধ, দই, মালাই, রাবড়ি, খোয়া সন্দেশ—এসব থই থই করছে আমার দু'হাতের মধ্যে, কিন্তু এবার আমার জিভে আর জল আসছে না। দু'পয়সার গিরিমাটি এবং সাবান কিনে আমার ধুতি-পাঞ্জাবি ছুবিয়ে নিয়ে গেরুয়ার রং ধরালুম। ওই দেখে ও-ঘরের জনৈক জটাধর বাবাজি বলল, কাপড়ে কা রাং আওর দিলকা আনন্দ সাথি মিলনা চাহি। জয় শম্ভো। রোটি খা চুকা ক্যা?

বাবাজিকে বুঝিয়ে বললুম, আমি একটু অবেলায় খাই, যাতে রাত্তিরে ভুখ না লাগে!

বাবাজি একটা দুর্বোধ্য উপনিষদের শ্লোক আউড়িয়ে চলে গেল।

রাত্রে এখানে কোনও আলোর ব্যবস্থা নেই, এটি আমার পক্ষে আনন্দদায়ক। রুদ্র বৈশাখের কালে ঠাণ্ডা ঘরের মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে রাত কাটানো আমার বেশ ভাল কাটে। অতি প্রত্যুষে চলে যাই দশাশ্বমেধ ঘাটে। প্রথম প্রভাত সূর্যকে দেখা আমার দরকার। প্রায় গলা-জলে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখলে ওর রশ্মির থেকে রেডিয়ম নির্গত হয়ে আমার দুই চোখের ভিতর দিয়ে শরীর-মধ্যে সঞ্চালিত হয়। এটা প্রথম শিখে-ছিলুম বিপ্লব-নেতা যোগজীবন ঘোষের কাছে। আমি সর্বপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধন এবং আত্মনিগ্রহে রত ছিলুম। অন্ধকার রাত্রে একাকী মেঝের উপর গড়িয়ে আমার মনে কোনও প্রকার কুচিন্তা না আসে, সেজন্য আমি সতর্ক থাকতুম। আমি একবেলা বিনা লবণে আধপেটা হবিষ্যির পাক খাচ্ছিলুম, এক-একদিন। নিজকে শাস্তি দিচ্ছিলুম পদে পদে। পাশের দুটো ঘরের পাণ্ডা আর বাবাজিরা আমার প্রতি অপরিসীম স্নেহবশত আমাকে অহোরাত্র ধূমপান করিয়ে বুঁদ করে রাখার চেষ্টা পেত এবং ওর ফলে নাকি আমার চৈতন্যবিন্দু ঊর্ধ্বপথে উঠে গিয়ে পরম চৈতন্যের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে ফিরে আসত।

আমি ব্রহ্মচর্যাশ্রমী অক্ষত কৌমার্যের প্রতীক, আমি অপাপবিদ্ধ ঊর্ধ্বরেতঃ—এগুলি আমার উপলব্ধির মধ্যে নিত্য বিরাজমান। আমি প্রতিপদে শুচি, প্রতি কর্মে অনাসক্ত, প্রতি ধর্মে নিরাসক্ত, আমি বেদব্রহ্মের মধ্যে তদ্‌গত, এবং আমি দেবলীন। আমি অনায়াসে চেঁচিয়ে বলব, কোনও পাপ দুর্নীতি, সামাজিক অন্যায়, স্খলন আর পতন,—কিছুর মধ্যেই আমার মনঃসংযোগ ছিল না। কোনটা আমাকে স্পর্শমাত্র করেনি, কোনটায় আমি বশীভূত হইনি। দিকচিহ্নহীন অন্ধকার সমুদ্রে একদা আমার ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে আছাড়ি পিছাড়ি করেছিল, মেরিনার্স কম্পাসের কাঁটা কতবার ছটফট করে ঘুরেছিল,—কিন্তু ওই কাঁটা সকল দুর্যোগের প্রান্তে এসে দেখিয়েছিল ধ্রুবতারা ঠিক কোন্‌দিকে। আমার পথও ওই ধ্রুবতারকার পথ। আমি অকিঞ্চন, কিন্তু আমি জীবনবিপ্লবী। আমার সমস্ত চিন্তা চলিত ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা। আমি সর্বপ্রকার সামাজিক শাসনের বিরোধী, জন্মের থেকে 'নিহিলিস্ট', জীবনধর্মে আমি 'পেগান'। পাছে পিতার শাসন আমার জীবনে কোনও কাজ করে, সেজন্য তাঁকে মরতে হয়েছে আমার শৈশবে। শুধু আমার বিশ্বজননী বিশ্বেশ্বরীর সকরুণ আশীর্বাদ আমার সকল কর্মে চলে আসছে আমার পিছু পিছু—যতদূর আমি যাই।

বাড়িতে আমি চিঠি লিখেছিলুম: মা, তুমি কাশীর মেয়ে, কাশীতেই তোমার জন্ম। তাই এই কাশীতে দাঁড়িয়েই তোমাকে ব'লে যাই, আমি যাচ্ছি এবার তীর্থপথে। যাচ্ছি আমি দুঃসাধ্য জীবনে। যেখানে যত দুর্গম আছে, আছে যত অগম্য,—বিজনতায় ভীষণতায় যেখানে অভিযাত্রীরা নিত্য প্রাণভয়ে ভীত, আমি সেই পথ ধ'রে যাচ্ছি। তোমার নিজের আশীর্বাদকে তুমি বিশ্বাস করো। যতদিন তুমি জীবিত, ততদিন কোনও বিপদ আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করবে না, কোথাও কোনও একটি কাঁটাও আমার পায়ে ফুটবে না।

কাশীতে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে আমার আত্মীয়, স্বজন, কুটুম্ব, ভাই-বোন-ভগ্নিপতি ও বন্ধুবান্ধব। এ ছাড়া রয়েছেন দাদামশায় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এমন কি সর্ববরেণ্য সুধাংশু মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত। কিন্তু আমার এই নিভৃত কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন ছিল। আমি চাইছি নিঃসঙ্গবাস, আমি চাইছি নিজেকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করে দেখা। শ্রেষ্ঠ দর্শন হল আত্মদর্শন। আমার পক্ষে একা থাকার দরকার।

দশ দিন পরে আমি উঠে দাঁড়ালুম। তারকেশ্বরে হত্যা দিয়ে লোকে যেমন দৈব ঔষধ হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে যায় আমিও তেমনি দশ দিনের দিন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে নিজের মনে বললুম, হ্যাঁ এবার আমি তৈরি। আজই যাব। এখনই যাব।

দেরাদুন এক্সপ্রেসে আমার ওই ঝোলাটা নিয়ে যখন তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় চড়ে বসলুম তখন আমার হাতে আছে বাহান্ন টাকা। তখন মধ্যাহ্নকাল। নিজেকে দেখে আমার অবাক লাগছে। সহস্র বন্ধনে যেন বাঁধা ছিলুম কলকাতায়। কিন্তু সেই সব চিন্তার বন্ধন যেন গত দশ দিনে একে একে খসে মিলিয়ে গেছে। এখন যেন আর কারোকে মনের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছিনে। আমি লেখক, এ আমি ভুলে গেছি। ছাইভস্ম

কি লিখেছি এতদিন কিছু মনে নেই। আর ওই ত সব ইনিয়ে-বিনিয়ে লেখা। মিথ্যা গল্প, মিথ্যা উপন্যাস, অলস ও অসম্পূর্ণ যত আজগুবি কল্পনা—তাদের নাম কবিতা। মিথ্যা দিয়ে মনোহরণ করলে নির্বোধ পাঠকরা তাই পয়সা দিয়ে কেনে। ওরই মধ্যে আবার ভাবাবেগের মোচড় দু'-চারটে দিতে পারলে মেয়েদের এলোচুলের তলায় মাথার বালিশ চোখের জলে ভিজে যায়।

শেষ রাত্রে লাকসার ছেড়ে প্রত্যূষে পৌঁছলুম হরিদ্বারে। এ আমার চেনা জগৎ। আমি পটলডাঙ্গার গলিঘুঁজি সব চিনিনে কিন্তু হরিদ্বারের সব চিনি। আমি যাব টিহরি গাড়োয়ালের পথে। আমি উঠলুম ভোলাগিরির ধর্মশালায়। দুর্গম পথে পা বাড়াবার আগে ওখান থেকেই এক আবেগরসাত্মক চিঠি দিলুম বেহালার বন্ধুবর ভবানী মুখুজ্যেকে।

তখন হরিদ্বার জনবিরল, তখনও সন্ধ্যায় এক আধটা তেলের আলো জ্বলে। আশেপাশে বনময় অঞ্চল। ওপারে ঘন বাবলার বন, তার ওপারে মূলগঙ্গার ধারা। চণ্ডীর তলায় তলায় দেরাদুন জেলার অন্তহীন তরাই অরণ্য। ওখান থেকে বেরোয় হাতী, ভালুক আর নরখাদক বাঘ। অপরাহ্নের পর ও-অঞ্চল জনশূন্য হয়ে যায়।

আমি নিজের হাতেই গেরুয়া ধারণ করলুম। আমি পাগড়িপরা সন্ন্যাসী। অন্য কে দেবে আমাকে সন্ন্যাস? কে আমার গুরু? আমার গুরু ত আমিই—আমার মধ্যেই ত আমার পরম গুরু বাস করছে। আমার নাসিকা দিয়েই ত সেই গুরু শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে, আমার দুই চোখের জানালা দিয়ে সে দেখছে, আমার কান দিয়ে সে ভাবছে। সেই আমার গুরু, সেই আমার দীক্ষাদাতা। সেই আমাকে বলছে চরৈবেতি, চরৈবেতি।

সুতরাং বাইরের কোনও গুরু আমার দরকার নেই। আমার দরকার গৈরিক বসন। আমি ভুল করে আমার মন যদি রাঙ্গিয়ে না থাকি, বসনই না হয় রাঙ্গিয়ে নিলুম—ক্ষতি কি? থাক না গেরুয়ার সঙ্গে পৈতের গোছা। যদি একগাছা রুদ্রাক্ষের মালা এই সঙ্গে গলায় ঝুলিয়ে নিই, কে নিষেধ করছে? লোহা বাঁধানো লাঠি একগাছা হাতে মানাবে বই কি। এবার একখানা কম্বল আর লোটা সংগ্রহ করো বাজার থেকে। তারপর হৃষিকেশ পর্যন্ত চাকার গাড়ি। তারপর থেকে গতিরস্তম্। "হে ভবেশ হে শঙ্কর, সবারে দিয়েছ ঘর, আমারে দিয়েছ শুধু পথ—।"

॥ ৩৬ ॥

গহন গভীর হিমালয়ের মধ্যে দিনে দিনে পায়ে হেঁটে যেন নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছিলুম। মানব সভ্যতা এখানে আজও পৌঁছয়নি। আধুনিক যুগ এখনও বহুদূর পিছনে। আমাকে যেন চারিদিকের জনশূন্য স্তব্ধতা ঘিরে দাঁড়াল। দেখতে পাচ্ছিলুম হাজার হাজার বছরের প্রাচীন অতীত কী যেন বলতে চায় আমার কানে-কানে। এটা ব্রহ্ম-পুরার তপোলোক। আমি যেন প্রথম পদার্পণ করেছি এক নগণ্য মানবক,—দিশা-হারা পরিচয়হারা। আমার পায়ের শব্দে ওদের না ঘুম ভাঙে,—যারা অশরীরীর

মতো স্থির হয়ে রয়েছে আমার চারিপাশে।

নন্দার নদী আপন মনে এসে মিলেছে বিরহী নদীর সঙ্গে। ব্যাসগুহার ধারে এসে ঝোলা নামিয়ে আসন নিলুম। নদীর ধার থেকে অনামা রঙ্গীন পাখীরা উড়ে গেল চিড়বনের দিকে। আমি একা নই, তুমি আছ আমার সঙ্গে। তুমি ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ করছো নিজেকে আমার মধ্যে। ঘন বনপথে, উত্তুঙ্গ চূড়ায়, উদয়স্বর্ণাভায়, উপলাহত স্রোতস্বতীতে,—তোমাকেই দেখছি, আর তুমিই আমাকে নিয়ে যাচ্ছ তোমার অজানায়, তোমারই অনামায়।

এখানে সভ্যতা নেই। সে আছে অনেক নিচে নরলোকে। এখানে শত শত বর্গমাইলের মধ্যে সামান্য এক টুকরো কাগজ নেই, আজও এখানে আগুন জ্বালায় চকমকি পাথরে। পথ বলতে কিছু নেই, আছে পাথরে চাটানু—বৃষ্টি-বর্ষণের আঘাতে যে নালিপথগুলো নিজেই তৈরি হয়। চারিদিকে আদিম আরণ্যভূমি। আমি এগিয়ে চলেছি নদীর পর নদী, পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে। একা দুর্বল-চিত্ত, আমি ভয়ে-ভাবনায় কম্পিত। কিন্তু তুমি আছ, তাই আছি আমি সত্য হয়ে। তুমি আমার গুরু, তুমিই আমার পথ। তপোলোক ছাড়িয়ে তুমি আমাকে নিয়ে যাচ্ছ দেবলোকে, ভয় কি আমার? তুমি কথা বলছ আমার সঙ্গে তাই আমি নিঃসঙ্গ নই।

উখীমঠ পার হয়ে যাচ্ছি দূর-দূরান্তরে গভীর থেকে আরও যেন গহনলোকে। তুমি খুলে দেবে স্বর্গদ্বার আমার জন্য। আমি দেখব আকাশগঙ্গা আর পাতালগঙ্গা, আমি গিয়ে দাঁড়াব চীরবাসা ভৈরবে। অন্ধকারে অচেনায় অজানায় দুর্গমে অসাধ্যে, —তোমার মতন আমিও একা।

রুদ্রপ্রয়াগে তুমিই আমাকে নিয়ে গিয়েছিলে। সেই নারায়ণগিরি মায়ির আশ্রমে গঞ্জিকার ধুমের মধ্যে দেখলুম সোনি আর রূপিকে। ওদের সর্বাঙ্গে লজ্জাবাস কম। কিন্তু ওই দুই সংসারহারা যুবতী সেদিন জানিয়ে দিল, দেহ নয়, দেহাতীত। ভুরার সঙ্গে চরস—নারায়ণগিরি মায়ির প্রসাদ। সেই ধোঁয়ার মধ্যে আমার নিবিড়রসের চক্ষু তন্দ্রাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দেখে নিল পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর গর্জমান বন্যাশোভা। আমার বুকের ভিতর থেকে ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে গেল এক রাজহংস শ্বেতপক্ষ মেলে। নারায়ণগিরি মায়ি বলে দিলেন, কৈলাস যাওগে বেটা? সিধা রাস্তা। বেটা, ডরো মৎ! তুম চলোগে তব কৈ না কৈ তুমারা হাত পকড় লেগা।

দেবলোক ছেড়ে পেরিয়ে যাচ্ছিলুম ব্রহ্মলোকে। তুষার সমাকীর্ণ চারিধার। নিচে-নিচে তার সেই আদিম অরণ্য। সেদিন অন্ধকারে আমি একা। মেঘমলিন আকাশে ঘোলাটে জ্যোৎস্না। পথের সেই রেখা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। চন্দ্রা আর মন্দাকিনীর সঙ্গমের তীরে এসে আর কোনদিকে আশা-আশ্বাস খুঁজে পাচ্ছিলুম না—"এসেছে নিবিড় নিশি, পথরেখা গেছে মিশি/সাড়া দাও, সাড়া দাও আঁধারের ঘোরে/হে মহাজীবন, হে মহামরণ, লইনু শরণ, লইনু শরণ।"

আমি কি কখনও বিশ্বাস করেছি অলৌকিক বা অবাস্তবকে? কখনও কি নির্ভর করেছি অদৃশ্য শক্তির উপর যার নাম দৈব? হোক না কেন আমার সন্ন্যাসসজ্জা। আমি

ত বসন রাঙিয়েছি, মনে কি কখনও রং ধরেছে? কখনও কি বুকফাটা আর্তনাদ করে চেঁচিয়েছি, 'অপারে মহাদুস্তরে অত্যন্তঘোরে বিপদ-সাগরে মজ্জতাম দেহভজ্জাম/ত্বমেকা গতির্দেবী নিস্তারনৌকা, নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে—'?

পিছন থেকে সহসা পার্বতী উমা ডাকলেন, কৌন্ হ্যায়?

চমকিয়ে তাকালুম পিছনে। অলৌকিক, কিন্তু অতি বাস্তব। তরুণী এক ভৈরবী। মঙ্গোলীয় ধাঁচের মুখ চোখ। মাথায় ময়ূরকেতন। কণ্ঠে, হস্তে রুদ্রাক্ষের মালা। কমণ্ডলু এক হাতে, অন্য হাতে শিঙা। নগ্নপদ। স্বপ্নিল দুই চক্ষু। বয়স আর কত? বছর আঠারো কুড়ি?

কী বলব আমি? কলকাতার কোনও নাটমঞ্চ হলে বলতুম, গ্রীনরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে এক মেয়ে ভৈরবীর সজ্জায়! কিন্তু এ যে জনহীন অন্ধকার পর্বতপ্রান্ত! চারদিকে নিশ্চুপ বনস্থলী। সামনে ও পাশে চন্দ্রা আর মন্দাকিনীর সংযোগস্থল,—আমার দিশা কোনও দিকে নেই। অগস্ত্যমুনিকুণ্ড ফেলে এসেছি তিন মাইল পিছনে। শুনেছি এই নদীপথে কোথায় যেন আছে চন্দ্রাপুরী চটি।

—ক্যা দেখতা, সাধুজী?

অবাক বিস্ময়ে ওর দিকে চেয়ে কণ্ঠে স্ফুরিত হল, রাস্তা ছুট গৈ।

—চ্ছা পরদেশী। আও মেরে সাথ—

সেদিন ওই মেয়ের পিছনে পিছনে পায়ে হেঁটে গিরিনদী চন্দ্রা পার হয়েছিলুম। তারপর সে গেল ডানদিকে, আমাকে দেখিয়ে গেল বাঁদিক! না, তাকে থামতে বলিনি, অনুরোধ কিছু করিনি। সে ওই গিরিনদীর ধার দিকে ধূমেল জ্যোৎস্নার রহস্য কুয়াশায় এক সময় আমার চোখের স্থির দৃষ্টি থেকে মিলিয়ে গেল। কিন্তু পলকের জন্যও আমার আধুনিক মন একথা ভাবেনি, আমার জীবনে এক আশ্চর্য অলৌকিককে সুস্পষ্ট ও সুপ্রত্যক্ষভাবে দেখে গেলুম! এই কাহিনীটি শুনে পরবর্তীকালে আমার মা কেবলমাত্র আমারই হাতের রান্না খেতেন।

ত্রিযুগীনারায়ণ, গৌরীকুণ্ড, রামওয়াড়া, তারপর তুষার রাজ্য কেদার। তারপর উখীমঠ, পোথিবাসা, চোপতা, তুঙ্গনাথ। অতঃপর সুদূর লালসাঙ্গা বা চামোলি।

কোথাও চাকার গাড়ি নেই। চাকা কোথাও ঘোরে না, চলে না। কালের চাকাও স্তব্ধ, মহাকাল অনিমেষ চেয়ে রয়েছে। জনচিহ্ন যা চোখে পড়ে, তারা পাহাড় আর পাথরের গায়ে-গায়ে পোকার মতো লেগে থাকে। ছিন্নভিন্ন তালিমারা কম্বলের জামা, মাথায় চাঁদি টুপি, সম্পূর্ণ দুখানা পা ও পাছা উলঙ্গ। তারা ভেড়া ছাগল চরায়, বর্ষায় ভুট্টা বানায়। মেয়েরা জ্বালানি সংগ্রহ করে। ঘরে জন্তুর চর্বির আলো জ্বলে। না, সমতল ভারতের সঙ্গে কোনও যোগ তাদের নেই।

দুর্দশার দহনে আমি দগ্ধ, কৃচ্ছ্রসাধনে শীর্ণ ও অর্ধাশনে ক্লান্ত আমি। নিজকে পঙ্গু করার প্রয়োজন ছিল এবং শরীর ও স্বাস্থ্যকে ভেঙ্গে দেবার জন্য প্রতিশ্রুতি ছিলুম। আমার চেহারার আকর্ষণই আমার শত্রু। আমি সন্ন্যাসের দীক্ষা নিয়েছি নিজেরই কারণে। আমার প্রার্থনা আমি যেন পুণ্যকর্মের সঙ্গে তথাকথিত পাপকর্মেও লিপ্ত

হতে পারি। আমি চিরকাল সামাজিক দুঃসাহসে যেন বাধা না পাই। কিন্তু তুমি বসে থাকো আমার বুকের মধ্যে, স্বামী হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে নামবো সকল কাজে, সকল চিন্তায়, সকল সাধনায়। আমার অসংযমে, দৈন্যে কুরূপে, পঙ্কমধ্যে, লোভে ও লালসায়—তুমি থাকবে আমার সহচর। সেই আমার একান্ত আনন্দ। আমার ভয়ে, লজ্জায়, যন্ত্রণায়, অপকর্মে, সকল অপরাধে, সমস্ত ঘৃণ্য জীবনে—তুমি থাকবে আমার আনন্দের সঙ্গী। আমি যদি প্রেত-পিশাচের ভূমিকা নিয়ে সব লণ্ডভণ্ড করি, তুমি ভিতর থেকে আমাকে উদ্দীপ্ত ক'রো।

বদরিনাথ মন্দির ছাড়িয়ে অদূরে একটি দোকানে আমার মায়ের জন্য এক শিশি শিলাজতু ও পূজার জন্য একটি ছোট্ট চামর কিনছিলুম, কিন্তু সেই সূত্রে সংঘর্ষ হল যার সঙ্গে তার কথাবার্তায় মনে হয়েছিল, এক হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক। পরবর্তী ত্রিরাত্রি বসবাসকালে জানলুম, সে কাশীবাসিনী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কন্যা। তার সেই ধূলিধূসর যত্নবর্জিত চেহারা যেন ছাইচাপা ছিল সেদিন। সন্ধ্যার দিকে দেবারতির কালে দূরের থেকে তার পরিচ্ছন্ন চেহারা দেখে জেনেছিলুম, বিধবা হলেও বয়স কম। আমি ভুরা তামাকে বন্দি হয়ে অন্যত্র গিয়েছিলুম।

ছোট্ট বাজার তখন বদরিনাথের যেটুকু জনতা সেটুকু তৃতীয় শ্রেণীর তীর্থযাত্রীতে ভরা। এই দুঃসাধ্য পথে ভদ্রসমাজের দু-চারজন তখন ফোড়নের মতো ছিটকিয়ে আসে মাত্র। পরদিন ওই মহিলা এক ফাঁকে আমাকে একা পেয়ে এক প্রকার জিদ ধরে জানিয়ে গেলেন, আপনার কৈলাস যাওয়া কিছুতেই হবে না। আপনাকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। এই আমি বলে রাখলুম।

আমি নারায়ণগিরি মায়ির মন্ত্র জপ করছিলুম। তিনি পথের নির্দেশ দিয়েছেন, কর্ণপ্রয়াগ থেকে গোয়ালদম, তারপর গরুড় হয়ে বাগেশ্বর,—তারপর সোজা কাপ-কোটের দিকে। অতঃপর পথ অবারিত। 'বেটা, জায়দি সে জায়দা হো তব পানুশ' মিল! ভিখ্ মাঙ্গো, বহুৎ মিলেগি।—বেটা, আপনা পেটকো ভাওনা দুনিয়ামে কাহি নেই! চকাচক চলোগে।'

এক নারী পথ দেখালো অন্য নারী পথ ভোলালো। কর্ণপ্রয়াগে এসে ব্রাহ্মণ-কন্যা তার মস্ত দলবলকে এড়িয়ে সঙ্গোপনে আমাকে ডেকে বললেন, কাশীর পথ সব সোজা পথ। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরবো।

কে তুমি? কী পরিচয় তোমার? কেউ আমরা কারোকে চিনিনে। তোমার-আমার এক পথ নয়। কথাবার্তা না বলে' আমি সেখান থেকে সরে, গেলুম।

নাটকটা ছিল পরে। সিরোলি চটিতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বৃক্ষচ্ছায়ার নিচে তিন চারটে চালা। ওখানেই তার প্রথম পরিচয় পেয়ে চমকিয়ে উঠেছিলুম। ওর পিতা ছিলেন পুলিস ইন্সপেক্টর যাঁকে চাঁদপুরে গুলী করে মারে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, এবং যার ফাঁসীর পূর্বরাত্রের কথা 'স্বদেশ' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখার ফলে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওঁরা জনাইয়ের মুখুজ্জে।

আমি স্তব্ধ, আড়ষ্ট। এ যেন নিয়তির বিদ্রূপ। এ অভাবনীয়।

পাইন বনের ভিতর দিয়ে ঘোড়া যেত আমাদের। আমরা পাশাপাশি। অন্তহীন-কাল উত্তুঙ্গ চূড়াপথে অরণ্যে-অরণ্যে রক্তিম দিনান্তে আমাদের পটভূমি রচনা করে-ছিল। উনি ওঁর প্রথম পোশাকী নাম বললেন, সাবিত্রী এবং ওঁর ডাক নাম টুনু। হাসিমুখে পুনরায় তিনি বললেন আমার সত্যবানটি মাস ছয়েকের বেশী বাঁচেনি। বিয়ে হয়েছিল পনেরো বছরে। এই আট বছরের কথা বলছি।

পরদিন সাবিত্রী প্রথম কবিতা বললেন রবীন্দ্রনাথের, 'রাজপথ দিয়ে আসিয়ো না তুমি, পথ ভরিয়াছে আলোকে, প্রখর আলোকে/সবার অজানা, হে মোর বিদেশী তোমারে না যেন দেখে প্রতিবেশী/হে মোর স্বপন বিহারী/তোমারে চিনিব প্রাণের পুলকে/চিনিব সজল আঁখির পলকে/চিনিব বিরলে নেহারি পরম পুলকে/ এসো প্রদোষের ছায়াতল দিয়ে, এসো না পথের আলোকে প্রখর আলোকে।"

সেই প্রদোষের ছায়াতলে দাঁড়িয়ে ওঁর দুই কালো চোখের ভিতরে আমি পরম অমৃতের আস্বাদ পেয়েছিলুম। আমি ওঁকে ঘোড়ার পিঠ থেকে দুই হাতে ধরে নামিয়েছিলুম। সাবিত্রী আমার কানে-কানে বললেন, আমার নাম তুমি দিয়ো 'রাণী'।

আমার কৃচ্ছ্রসাধন শেষ হয়ে গেল! বিগত প্রায় দু'মাস কালের যে কঠোর চিত্ত সংযম সেটা যেন হারিয়ে যেতে বসল। সাবিত্রী তাঁর নিজের হাতে আমার ময়লা গেরুয়া-সজ্জা রামগঙ্গার ঘাটে সাবান দিয়ে কেচে তার রং হালকা গোলাপের রঙে রূপান্তরিত করলেন! মেহলচোরিতে এসে সুগন্ধী সাবান আমাকে দিলেন স্নানের জন্য! এক ফাঁকে আমার জটাজটিল মাথা আঁচড়িয়ে দিলেন। সন্ধ্যায় দেখলুম শান্ত, আত্মসমাহিত সাবিত্রী রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে জপে বসেছেন। যেন তাঁর দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে চেয়ে রয়েছে চারিদিকের আরণ্য প্রকৃতি। আমার মুগ্ধ দুই চোখ শ্রদ্ধানিবিড় হয়ে ছিল।

আমরা যেন অনাদি-অনন্তকালের সেই দু'জন—যেন বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার পাঁজরের থেকে বেরিয়ে আমরা জন্ম-জন্মান্তরেব পথ ধরে চলছিলুম। যে ভাষায় মাঝে মাঝে আমরা কথা বলছিলুম, সে ভাষা লৌকিক নয়, সেই ভাষা তার স্বগোত্র খুঁজে পেয়ে-ছিল তুষারে, পাথরে, অরণ্যে, গিরিখাদে, নির্ঝরিণীতে—সে যেন এক দৈব ভাষা, তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল ঐশী অনুরাগ।

পাহাড়ী ঠাণ্ডায় আমার পরিচ্ছদসজ্জা ছিল কম। একদা মধ্যরাত্রে সাবিত্রী নিঃশব্দে এগিয়ে এসেছিলেন একখানি কম্বল হাতে নিয়ে আমার উপর চাপা দেবার জন্য। কিন্তু পাছে কেউ জেগে ওঠে তাই লোকনিন্দার ভয়ে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন। পরদিন প্রত্যূষে আমার হাতে দিলেন মহাকবির একটি কবিতা—"মোর মরণে তোমার হবে জয়, মোর জীবনে তোমার পরিচয়/মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল আজ ঘিরিল তোমার পদতল/মোর আনন্দ সে যে মণিহার, মুকুটে তোমার বাঁধা রয়/মোর ত্যাগে যে তোমার হবে জয়, মোর প্রেমে যে তোমার পরিচয়/মোর ধৈর্য তোমার রাজপথ, সে যে লঙ্ঘিবে বন পর্বত/মোর বীর্য তোমার জয়রথ, তোমার পতাকা শিরে বয়।"

কয়েকদিন পরে বিদায় নেবার প্রাক্কালে তাঁর মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। তিনি

জানতে চেয়েছিলেন, তাঁর জীবন সত্যই কি ব্যর্থ? জপতপ অনুষ্ঠান সাধনার বাইরে আর কি কোনও সার্থকতার পথ ছিল না?

তাঁর কণ্ঠে চিরবিচ্ছেদের ধ্বনি অনুরণিত হচ্ছিল। বোধ হয় আমার দুই চোখও শুষ্ক ছিল না। বললুম, তোমার সঙ্গে দেখা না হলেই ভাল ছিল সাবিত্রী। আমরা দু'জনেই হয়ত দগ্ধ হবো চিরদিন।

কিন্তু সাবিত্রী নিজের মনেই প্রশ্ন করছিলেন, তুমি কি বিশ্বাস করো ইহকাল আর পরকাল? বিশ্বাস করো কি পুনর্জন্ম, আর প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী?

অকপটেই বলব, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের উভয়ের ভাবাবেগ সকল বাঁধন ভেঙ্গে দিয়েছিল। বিদায়ের পূর্বরাত্রে বেরিলী থেকে লখনৌর দিকে দ্রুতগতিতে গাড়ি ছুটে যাচ্ছিল। শেষ রাত, সবাই অঘোরে নিদ্রিত। উনি বসেছিলেন আমার দিকে চেয়ে। দৃষ্টি তাঁর একাগ্র, নিমেষ-নিহত। ওঁর দুই চোখে জলের ধারা নামছিল। সহসা চোখের ইঙ্গিতে উনি আমাকে কাছে ডাকলেন। গাড়ির মধ্যে আলো জ্বলছে। সবাই ঘুমে অচেতন।

আমি এদিক থেকে উঠে গিয়ে নিঃশব্দে চলন্ত গাড়ির দরজা খুলে ওঁর দিকে মুখ বাড়ালুম। তখন গাড়ির জানলায় গরাদ থাকত না। উনিও জানলার বাইরে মুখ বাড়ালেন। আমি আমার রুদ্রাক্ষের মালাটা ওঁর গলায় পরিয়ে দিলুম। উনি দু' হাত দিয়ে আমার মাথাটা টেনে নিলেন। ক্ষণকাল পরে সেই দ্রুতগতি ট্রেনের বাইরে ওই নিশুতি রাত্রির পিছনে দাঁড়িয়ে যিনি জীবনদেবতা, তিনি দেখলেন আমাদের দু'-খানা তরুণ মুখমণ্ডল একাকার হয়ে গেছে পরস্পরের পীড়নে, এবং অবিশ্রান্ত চোখের জলে সেই দু'খানা মুখ ক্ষণে ক্ষণে পিচ্ছিল হচ্ছিল!

আমাদের এই বেদনা সমগ্র হিমালয়কে সেই রাত্রে বিচ্ছেদবিধুর ও শোকচ্ছায়াময় করে তুলেছিল।

বলাবাহুল্য, সেই কালে শ্রীমতী সাবিত্রী যেন নিয়তির নির্দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন আমার সামনে। তিনি আমার ঝুটো-বৈরাগ্য, মিথ্যা সন্ন্যাস ও লোক দেখানো গেরুয়া হরণ করেছিলেন তাঁর যাদুস্পর্শে।

আমি অনেকদিন পর্যন্ত সহজ ও সামাজিক জীবনে ফিরে আসতে কিছু কষ্ট বোধ করেছিলুম।

* * *

লেখক সমাজের সারথি শ্রীমান ভবানীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় তখনও পুরোপুরি পেশাদার লেখক হয়ে ওঠেনি। তখনও ঘষাঘষি আর শান-পালিশ চলছে। একদিন চকচকে হবে।

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ধরে একদিন কবি হেম বাগচীর নতুন বই প্রকাশনার এক ছোট্ট দোকানের দিকে আসছিলুম আমি আর ভবানী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সামনে দিয়ে। দেখছি ভেতরে বেশ ভিড় আর হইচই। আজ এখানে 'সুনীতি সঙ্ঘের' প্রথম উদ্বোধনী সভা। বড় বড় সব বক্তা আজ উপস্থিত। সুতরাং কিছু কৌতূহল হল বই কি।

আমরা ভিতরে ঢুকে জায়গা নিয়ে বসলুম এক পাশে। যাঁরা ব্রাহ্ম সমাজের তৎকালীন নেতৃস্থানীয়, তাঁরা আধুনিক সাহিত্যের উপর বক্তৃতা করছেন। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ভাষায় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের কড়া সমালোচনা চলছে। এই সীতা-সাবিত্রীর দেশে তাঁর পক্ষে চোখের বালি, ঘরে-বাইরে, বউ-ঠাকুরাণীর হাট, চিত্রাঙ্গদা কাব্য এসব লেখা উচিত হয়নি। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বাঙলা সাহিত্যের সর্বনাশ করতে উদ্যত। তার 'পাপের ছাপ', 'কাঁটার ফুল'—ইত্যাদি উপন্যাস বাঙলার সমাজ ও পারিবারিক জীবনের ধ্বংস সাধন করতে উৎসাহী। বক্তার পর বক্তা ঠিক যেন পাখিপড়া বুলির মতো গালমন্দ, ধিক্কার, ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও কঠোরতর সমালোচনা করে যাচ্ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিরূপ হবার অন্যতর কারণ, তিনি তাঁর নানা রচনায় হিন্দুর দেব-দেবীর উল্লেখ করেন অলঙ্কারস্বরূপ। শরৎচন্দ্র হলেন সর্বাপেক্ষা অপরাধী। তিনি সেই তাঁর 'চরিত্রহীন' থেকে আরম্ভ করে তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'শেষপ্রশ্ন' পর্যন্ত এক-টানা ভাবে সমাজের সকল নীতিধর্ম ও নৈতিক শুচিতাকে জলাঞ্জলি দিতে চাইছেন। তিনি শক্তিমান, কিন্তু সে হল আসুরিক শক্তি!

পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় উঠে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বললেন, আমি রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুরের বয়োজ্যেষ্ঠ, তাঁকে উপদেশ দেবার নৈতিক এবং সামাজিক অধিকার আমার আছে। তিনি কবি, তিনি তাঁর কাব্যপ্রচেষ্টা নিয়ে থাকলেই আমরা সুখী হই, কিন্তু বাঙ্গালীর সমাজজীবনকে ধ্বংস করার রাইট তাঁর নেই। তাঁর এই স্বেচ্ছাচারী অপ-চেষ্টার থেকে তিনি বিরত হোন, এই উপদেশই আমরা তাঁকে দিতে পারি।

এই সৌম্যদর্শন, সুপণ্ডিত ও ঋষিতুল্য ব্যক্তি ওখানেই থামলেন না, তিনি তাঁর নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে লাগলেন শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সম্বন্ধে। উচ্চকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন, আমার এক নিকট-বন্ধুর কন্যা এই প্রকাশ্য রাজপথ ধরিয়া একদিন এক যুবকের সহিত হাত ধরাধরি করিয়া কলহাস্য করিতে করিতে যাইতেছিল। আমি আর্তনাদ করিয়া ডাকিলাম, মা, তোমার এইরূপ শোচনীয় দুর্দশা কি প্রকারে হইল আমাকে বলিয়া যাও। কন্যাটি বলিয়া গেল, পণ্ডিত মশায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যপাঠ করিয়া আমরা এই প্রকারে নষ্ট হইতে বসিয়াছি।

সভায় প্রবল করতালিধ্বনি শোনা গেল। ভবানীর ঘ্রাণশক্তি বেশ ধারালো। আমার কানে কানে সে বলল, হাওয়া খারাপ রে। এর পেছনে থেকে একটা দল বোধ হয় কাজ করছে!

পণ্ডিত সীতানাথ ওখানেই থামলেন না। তিনি শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কঠিন বাক্য উচ্চারণ করছিলেন। পুনরায় তিনি বললেন, সম্প্রতি তাঁর একখানি উপন্যাস পরম আগ্রহ সহকারে রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া একমনে পাঠ করিয়াছি, ছাড়িতে পারি নাই। ওই উপন্যাসটি যেন মাদকের প্রভাবের মতো মস্তিষ্ককে অভিভূত করে। উহা এমনই ভাল লাগিল, যেন উহার প্রতি পৃষ্ঠা আমি পাগলের মতো লেহন করিলাম। আমি স্বীকার করিব আমার মন আনন্দরসে আপ্লুত হইতেছিল—

সভাস্থ জনতা উৎকণ্ঠায় একেবারে স্তব্ধ।

হঠাৎ পণ্ডিত মশায় এবার তাঁর কণ্ঠস্বর তুলে বললেন,—আমার বয়স কত, আপনারা মনে করেন ? আমার বয়স এখন ছিয়াত্তর বৎসর। 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসটি পাঠ করিয়া এই ছিয়াত্তর বৎসরের বৃদ্ধের মন যদি এইরূপ নারকীয় আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া থাকে, তাহা হইলে পঁচিশ বৎসর বয়স্ক যুবক-যুবতীরা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে তাহারা পাপের পথে তলাইয়া যাইবে কিনা আপনারাই চিন্তা করুন।

সভাস্থ সকলে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে 'শেম শেম' ধ্বনি ও কানফাটা করতালিতে যেন ফেটে পড়ল। ভবানীর সঙ্গে আমি বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় পলকের জন্যও একথা ভাবিনি যে, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নরেশ সেনগুপ্ত—এঁদেরকে শাপ-শাপান্ত করলেও এঁদের কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করবে। অথচ আমার পক্ষে সেদিন এটি অভাবনীয় ছিল যে, ব্রাহ্ম সমাজ পরিচালিত এই 'সুনীতি-সঙ্ঘ' প্রকাশ্যে সাহিত্য-অধিপতিদের গালি দিলেও গোপনে আমার মতো চুনোপুঁটিকে বধ করার জন্য তাদের খড়্গে শান দিচ্ছে।

পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের বক্তৃতার সারমর্ম পরদিন কোন কোনও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

কিছুকালের মধ্যেই আমার বিরুদ্ধে বডি-ওয়ারেন্ট বেরোল এবং আমার বাসস্থান তছনছ করে খানাতল্লাসী চলল। পুলিসের শুধু নোটিস পড়ল অচিন্ত্য ও বুদ্ধদেবের ওপর। অচিন্ত্যর 'বিবাহের চেয়ে বড়'—যেটি আমিই ছেপেছিলুম 'বিজলী'তে এবং বুদ্ধদেবের 'এরা ওরা এবং আরও অনেকে'—সেটিও আমিই ছেপেছিলুম 'স্বদেশ' মাসিকপত্রে, এবং আমার নিজের উপন্যাস 'দুই আর দুয়ে চার'—এই তিনখানা উপন্যাস ওদের চক্ষুশূল হয়েছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, অচিন্ত্য ও বুদ্ধদেব তাদের সব বই বাজার থেকে তুলে লালবাজারে জমা দিয়ে এল! একজনের সরকারী চাকরি হচ্ছে—তার জন্য সুনাম অব্যাহত থাকা দরকার। অন্যজনের দুর্নাম ঘটলে প্রফেসারী না মিলতে পারে—সম্ভবত এই ছিল আশঙ্কা।

আমি দু'কানকাটা সেপাই! আমার 'ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়'। আমার অনুপস্থিতিতে পুলিস আমারই বাড়ি খানাতল্লাসী করেছে, পাড়াময় হইচই। গত বছরে আমার বিরুদ্ধে ছিল ১২৪-ক ধারায় রাজদ্রোহের মামলা। তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল ৩০২/১১৭-র হত্যা প্রচেষ্টার অভিযোগ। এবার বুঝি এল ২৯২/২৯৩ ধারার অভিযোগ। অর্থাৎ সাহিত্যে দুর্নীতি!

আমার বিরুদ্ধে ছিল 'বডি-ওয়ারেন্ট'! সকালের দিকে গিয়েছিলুম 'নাট্যমন্দিরে' বেলা এগারোটায় ফিরে দেখি, বাড়িসুদ্ধ ভয়ে কাঁপছে! পুলিস অফিসার নাকি বলে গেছে, এবার বছরখানেক ওঁকে পাথর ভাঙতে হবে। উনি অশ্লীল সাহিত্যের মস্ত পাণ্ডা। ওঁর দুর্নীতিতে সাহিত্য ভরা।

আহারাদি সেরে একটা পান মুখে দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে সোজা চললুম লালবাজারে পুলিস আপিসে। ওদের কয়েকজন কর্তা আমাকে চেনে, কারণ বার বার এর আগে আমাকে ধরেছে। কয়েকজন গোয়েন্দা বা টিকটিকি আমাকে ভালই চেনে বারীন

ঘোষের 'বিজলী'র আমল থেকে। তারা আমার হাজরা রোডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার খবরও রাখে। সম্প্রতি আনন্দমঠ-এর পিছনে ওরা লেগে রয়েছে, খবর পাচ্ছি। সেখানকার পাঠাগার আমিই একপ্রকার সৃষ্টি করেছি, এবং সেখানকার প্রায় প্রত্যেকখানি গ্রন্থ আমার নামাঙ্কিত। এ ছাড়া গত বছরে 'স্বদেশ'-এর রাজদ্রোহের মামলা ছিল আমার বিরুদ্ধে।

তখন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার ছিলেন শান্তি চক্রবর্তী। সোজা তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। আমাকে দেখে ভদ্রলোক প্রসন্ন মিষ্ট মুখে বসালেন। তাঁকে জানালুম, আমার বিরুদ্ধে 'বডি-ওয়ারেণ্ট', সুতরাং আমাকে গ্রেপ্তার করুন। জামিন আমার নেই। কিন্তু এই মামলা আমি লড়ব। হাইকোর্ট পর্যন্ত যাব।

শান্তিবাবু প্রবীণ বয়স্ক। তিনি হাসছিলেন। বললেন, না, গ্রেপ্তার করব না আপনাকে। এখন আমরা বিপ্লবী দলের ব্যাপার নিয়ে অত্যন্ত নাজেহাল হচ্ছি। আপনাদের এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমাদের নেই। কিন্তু আমাদের ওপর চাপ দিচ্ছে 'সুনীতি সঙ্ঘ'।—এই বলে তিনি একখানা মোটা ফাইল আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এখানা উল্টে-পাল্টে দেখতে পারেন।

ইংরেজ আমলে পুলিস মহলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা অতিশয় নিন্দনীয় এবং কলঙ্কস্বরূপ ছিল। তখন ভদ্রসমাজে কোথাও পুলিস ঠাঁই পেতো না। পুলিসে যারা চাকরি করত তাদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের বিয়ে-থা দেওয়া অতীব কঠিন সমস্যা ছিল। অন্যদিকে পুলিস অফিসাররাও ভয়ে কাঁপত, কে কখন বিপ্লবীদের হাতে খুন হয়। অনেক অফিসার বিপ্লবীদেরকে নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে, এমন খবরও আমরা পেতুম।

যাই হোক, ফাইলটা নাড়াচাড়া করতে গিয়ে প্রথমেই কয়েকজন ব্যক্তির স্বহস্তে লেখা চিঠি পেলুম। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন একজন নামী লেখক—যিনি 'শিশির' সাপ্তাহিকের মালিক শিশির মিত্র মহাশয়ের অনুগ্রহপুষ্ট মজুমদার মশায়। এঁরা এখন 'সুনীতি সঙ্ঘ'-এর এজেন্ট। লেখক-লেখিকা যাঁরা আছেন এই সঙ্ঘে, তাঁদের অনেকের নামের তালিকা রয়েছে। এঁরা এখন নতুন লেখকদের শত্রু।

চক্রবর্তী মশায় আবার হাসিমুখে বললেন, কেমন হল ত? এবার নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যান। আমরা গুরুদাস চ্যাটার্জি অ্যাণ্ড সন্স-এর সঙ্গে যোগাযোগ করছি। পরে আপনি খবর পাবেন।

আমি বিদায় নিলুম।

লালবাজার পুলিস আপিস থেকে সেদিন আমি সোজা চলে গিয়েছিলুম লিবার্টি ও বঙ্গবাণী আপিসে। এই আপিসের মধ্যেই 'নবশক্তি' সাপ্তাহিকের দপ্তর। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তখনও 'নবশক্তি'র সম্পাদক। ওখানে প্রায়ই আসেন ওই সব লেখকদের কেউ কেউ যাঁরা আমার নামে অভিযোগ করেছেন পুলিসের কাছে। কিন্তু ওখানে কেবল শচীন সেনগুপ্তকেই পেলুম। আমি তখন উত্তেজনায় দাউ দাউ করে জ্বলছিলুম।

যাই হোক, পরদিন 'আনন্দবাজারে' সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় সাহিত্যের উপর পুলিসের এই জুলুম নিয়ে তাঁর প্রথম সম্পাদকীয় রচনায় বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টকে প্রচণ্ড-ভাবে আক্রমণ করেছিলেন, এবং আমি সেই দিন 'বঙ্গবাণী' অ্যাপিসে গোপাললাল সান্যালকে জানিয়ে জর্জ বার্ণার্ড শ'কে একখানা প্রি-পেড টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলুম। ব্রিটিশ-বিদ্বেষী আইরিশ মনীষী বার্ণার্ড শ' তাঁর পৃথিবী ভ্রমণ উপলক্ষে বেরিয়ে তখন বোম্বাই বন্দরে জাহাজে অবস্থান করছিলেন। কলকাতার সেনট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস যেন কার অলক্ষ্য ইঙ্গিতে টেলিগ্রামটি চেপে গিয়েছিল। আমার টাকাও ফেরত দিল না।

অশ্লীলতা যদি চিত্তগ্রহ, আনন্দদায়ক, মনোজ্ঞ এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়, তবে সে তার পরিচয়কে উজ্জ্বল করে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা মহাকবি কালিদাসের ঋতু-সংহার এবং আরও বহু—এরা নিত্য সৌন্দর্যের আকার। শক্তিমানদের হাতে 'অশ্লীল' হয়ে ওঠে পরম সুন্দর। মহাভারতে কুন্তী, মৎস্যগন্ধা, অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা—এদের সঙ্গে পরাশর বা বেদব্যাস যে প্রকার আচরণ করেছিলেন সেগুলি রিরংসার চিত্র-রচনা—কেননা বেদব্যাসের মনে কুখ্যাত হবার মোহ ছিল না, পাঠক সমাজের কাছে তিনি বাহাদুরি লাভ করতে চাননি, কিম্বা রিরংসার চিত্রে মশলা যোগ করে তিনি উপার্জনের প্রশস্ত পথও খোঁজেননি। কিন্তু ওই একই বেদব্যাস মহাভারতের পরবর্তী বহু পর্বে অশ্লীলতাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও মহিমাময় করে তুলেছিলেন।

যাই হোক, আমি সাহিত্য বিচারক নই এবং নীতিবিদও নই—সুতরাং এসব কথা এখন থাক।

সেদিন রাত্রে আমার মা দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তায় যখন কাঠ হয়ে বসেছিলেন, আমি লালবাজারে আত্মসমর্পণ করতে গিয়েছিলুম—এ সত্ত্বেও আমি বাড়ি ফিরেছি সুস্থ দেহে ও মনে—এটি সকলের পক্ষেই বিস্ময়। আমার মনে তিলমাত্র উদ্বেগ নেই এটি লক্ষ্য করে মা নিশ্চিন্ত হলেন। তাঁর ধারণা, আমি এ জীবনে কখনও অন্যায় কর্মে লিপ্ত হইনে, এবং আমার ধারণা, মা জীবিত থাকতে কোনও বিপদ আমাকে স্পর্শ করবে না। ইতিমধ্যে আমি বহুবার উচ্ছন্নে গেছি, বহু নোংরায় ডুবেছি, কিন্তু মা'র ধারণা—আমি একেবারেই উচ্ছন্নে যাইনি এবং কোন নোংরাই আমাকে স্পর্শ করেনি।

রাত্রে মা আমার কাছে বসে বললেন, ওরে, সেই মেয়েটি আবার আজকে তোকে খুঁজতে এসেছিল—

মায়ের মুখের দিকে তাকালুম। মা বললেন, সেই যে সেই রমলা, যার চিঠি ক'খানা তুই আমার কাছে রেখেছিস? মেয়েটা তোকে এত খুঁজছে কেন রে?

তুমি তাকেই জিজ্ঞেস করতে পারতে, মা?

মা বললেন, আমার সঙ্গে অনেক কথা বলছিল। আহা মেয়েটার মা নেই, কিন্তু বাপের অবস্থা ভাল। সিপসিপে মেয়ে। মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো চুল, চোখের চাহনি এমন মিষ্টি যেন সরস্বতীর মুখ। আমার পছন্দ হয়েছে। একখানা চিঠি

রেখে গেছে আমার কাছে।

মা আমাকে চিঠিখানা দিলেন।

শ্রীমতী সাবিত্রী তখন আমার মনের চতুর্দিগন্তকে আচ্ছন্ন করে রয়েছেন। তাঁকে আমি ঠিক মানবীর চেহারায় আর দেখতে পাচ্ছিনে। আমার ভিতরে একটা গুপ্ত অধ্যাত্ম চিন্তার তিনি উদ্বোধন করে গেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার যে রোমান্স, যে দৈব-প্রণয়, যে আকুলতা ও উন্মাদনা—সেটা যে জৈব বাসনায় রঙ্গীন এ আমি স্বীকার করিনে। তাঁকে আমি লাভ করতে চাইনে, কিন্তু চিরদিন পূজা করতে চাই। তাঁর সঙ্গে আমার যৌগিক মিলনের জন্য প্রয়োজন ছিল উত্তরাখণ্ডের সমগ্র হিমালয়ের গিরিনির্ঝরের, তুষার নদীর, চীড় আর পাইন অরণ্যের। সাবিত্রী ছিলেন সেই বিরাটের সঙ্গে মিলিয়ে বিশ্বজোড়া বৃহতের পরিব্যাপ্তির মধ্যে। আমি সামান্য, নগণ্য, তুচ্ছাতিতুচ্ছ,—কিন্তু সাবিত্রী আমাকে দেবোপম ক'রে তুলেছিলেন। তিনি আমার শিরা-উপশিরায়, প্রতি রক্তকণিকায়, প্রতি অস্থে-তন্ত্রে, প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে—আমাকে জড়িয়ে ছিলেন। আমি যেন পৃথিবীমতী শ্রীরাধাকে নিয়ে ওঙ্কারের মধ্যে বাস কর-ছিলুম। আমার উজ্জীবন ঘটেছে সাবিত্রীর আরাধনায়।

চিঠিখানা আমি সযত্নে পড়লুম মধ্যরাত্রে। এক মনে নিবিড়ভাবে পড়লুম। এখনও পর্যন্ত বিস্ময় এই, আমি আজও এ মহিলাকে চোখে দেখিনি! উনি ঠিকানা যোগাড় করে আমার এখানে দু'দুবার এসেছেন, এবং মা'র সঙ্গে আলাপ করে গেছেন। কিন্তু শ্রীমতী রমলার এই আকুলতা একটু অভিনব বইকি। চিঠিতে উনি কেবলই লিখছেন, আমি যেন ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকি, সেই জোরে উনি আপনি জীবন রচনা করবেন। শুধু দাঁড়াবো, আর কিছু নয়। প্রণয়, ভালবাসা, প্রেম, অনুরাগ, বন্ধুত্ব—কোনও কথাটাই উনি স্পষ্ট করে বলছেন না। শুধু চাইছেন আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াই! অনেক রকমের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আমাকে আসতে হয়েছে, কিন্তু বিগত দু'বছর ধরে আমার একখানা ছবির কাটিং নিয়ে এক অপরিচিত মহিলা এইভাবে আমার পিছনে ছুটছেন—এ যেন মনে হচ্ছে তাঁর নিয়তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেন! মেয়েদের অন্ধ হৃদয়াবেগ আমার কাছে ভয়ের বস্তু।

আজকের চিঠিতে দেখছি উনি আমাকে একান্তভাবে অনুরোধ করেছেন, আগামী-কাল বিকাল ঠিক সাড়ে পাঁচটায় আমি যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। রিচি রোডের গায়ে যে নতুন পার্কটি হয়েছে তার উত্তর দিকের ঠিক মাঝের অংশে তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করবেন।

এবার আমি প্রস্তুত। পরদিন দুপুরবেলায় আগে গেলুম হাজরা রোডে। বুলি জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে বেশ পাকাপোক্ত তরুণীতে পরিণত হয়ে। তার বন্ধু জুটেছে অনেকগুলি মেয়ে ও মহিলা। তাদের মধ্যে কল্যাণী দাস, আরতি মুখার্জি, হোসেন আরা বেগম—ফিলিপসের পি কে রায়ের স্ত্রী সান্ত্বনা রায়। শ্রীযুক্তা সান্ত্বনা রায়ের কাছে বুলি প্রকৃত মাতৃস্নেহ লাভ করেছিল। যাই হোক, ওরা বুলিকে নিয়ে লোফালুফি করছে, এবং এখানে ওখানে নেমন্তন্ন করে নিয়ে যাচ্ছে। আমার সর্বাপেক্ষা আনন্দ এই, মা লাবণ্যপ্রভা, দিদি ও শ্রীমতী শোভা বুলিকে যেন সোনার চক্ষে

দেখেছেন। বুলি কয়েকদিন থেকে ওঁদের কাছেই রয়েছে। শ্রীমতী শোভার কাছে সেদিনের মতো বিদায় নিয়ে আমি পূর্বপথে হাজরা রোড ধরে সোজা এসে রিচি রোডে পড়লুম। এ রাস্তা আমার চেনা। এই মাত্র কয়েকদিন আগে এই রাস্তারই এক বাড়িতে বরিশালের অবিসম্বাদিত নেতা সতীন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম। সঙ্গে ছিলেন লাবণ্যপ্রভা ও প্রিয়া। সতীন সেন মহাশয় পলাতক অবস্থায় কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর পেশীবহুল স্বাস্থ্য, দীর্ঘাকায় চেহারা ও অমায়িক ব্যবহার আমাকে সেই রাত্রে অভিভূত করেছিল। ওঁর পটুয়াখালির সত্যাগ্রহ এবং অনশন ধর্মঘট স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

আজ পার্কে ঢুকলুম ঠিক সাড়ে পাঁচটায়। গাছের ডালপালা দিয়ে কেয়ারী করা এই পার্কের উত্তর অংশ দেখতে বেশ নতুন ধরনের। তারই মাঝামাঝি এক স্থলে বেঞ্চের উপরে যে তরুণী মহিলা বসেছিলেন, এবার তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি রমলা।

উভয়ে নমস্কার বিনিময় করলুম। উনি যেহেতু আগে এসেছেন সেই হেতু আমাকে বসতে অনুরোধ করলেন। আমি একটু ফাঁক রেখে বসলুম। বললুম, আপনি আমার বাড়িতে গিয়ে মা'র সঙ্গে দিন দুই আলাপ করে এসেছেন শুনলুম। কিন্তু আমি থাকি বাইরে-বাইরে—

রমলা বললেন, আপনাকে আমার খুবই দরকার। আপনি আমাকে সব কাজের মধ্যে টেনে নিন। আমি বাবার ওখান থেকে সব ছেড়ে চলে এসেছি।

অপরাহ্ণের আলো তখনও রয়েছে। সেই আলোয় ওঁকে আমি প্রথম দেখলুম। আমার চাহনিতে কোনও কুণ্ঠা বা আড়ষ্টতা ছিল না। আমার ধারণা, মহিলার বয়স বছর চব্বিশের কম নয়। মাথার মাঝখানে সাদা সিঁথি, দু'দিকের চুল কিছু কুঞ্চিত। চোখ দুটো একটু টানা। মুখখানকে সুশ্রী না বললে আমার নিন্দে হবে। গায়ের বর্ণ অনেকটা মালদহের গঙ্গার মতো। ওঁর বাবা এক বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারী, ইনি তাঁর একই সন্তান—আদরে লালিত। পিতা বদলী হয়েছেন বগুড়ায়, কন্যা সাহিত্য প্রচেষ্টায় কিছুকাল কাটিয়ে পিতার ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে এবার বেরিয়ে পড়েছেন। উনি কলকাতায় এসে লাবণ্যলতা চন্দর ওখানে উঠেছেন।

আমি বললুম, আপনি আপনার বাবার বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। সেসব ছেড়ে আপনি এভাবে চলে এলেন কেন?

রমলা বললেন, আমি এসেছি আপনার কাছে। আপনি আমাকে পথ বলে দিন, আমাকে শক্তি দিন, আমাকে সাহায্য করুন।

আমি হাসলুম। বললুম, আমি সামান্য এক লেখক এবং আমার একমাত্র পরিচয় হ'ল, 'আমি ছুঁচের গোলাম চামচিকে'!

এবার উনিও ঈষৎ হাসলেন। বললেন, আমাকে কিছু বলেই আপনি বোঝাতে পারবেন না। আপনার পরিচয় আপনার চেয়েও আমি বেশি জানি।

এগুলি আমার কানে অনেকটা যেন চাটুবাক্যের মতো শোনাচ্ছিল। কিন্তু প্রতিবাদ জানালুম না, কারণ ওঁর কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতার আভাস ছিল। আমি

নতমুখে চুপ করে রইলুম। পুনরায় উনি বললেন, আমি কি লাবণ্যলতার ওখানে খদ্দর প্রচারের কাজ নিয়েই এখন থাকব?

স্ত্রীলোকের এই প্রকার আত্মসমর্পণের চেহারার সঙ্গে আমার কোনও কালেই পরিচয় নেই। আমি শুধু বললুম, সেটা আপনারই বিবেচনা, মিস রায়।

॥ ৩৭ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ এইরূপ একটি উপমা দিয়ে বলেছিলেন, নষ্ট মেয়ে যেমন সংসারের সব কাজ করে, কিন্তু উপপতির দিকে তার মন পড়ে থাকে, তেমনি সকল কাজের মধ্যে থেকেও ঈশ্বরের জন্য উৎকীর্ণ হয়ে থাকবি!

আমি সাবিত্রীর চিঠির জন্য সকল কাজের মধ্যেও ডাকপিওনের দিকে উৎকর্ণ হয়ে দিন কাটাতুম। কথা ছিল, প্রতি শনিবারে যেন একখানা করে চিঠি পাই—এবং উভয়ের চিঠিতে থাকবে তীর্থযাত্রার টুকরো টুকরো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা, পরস্পরের মানসের অভিব্যক্তি—যা অনেক সময় অধ্যাত্ম অনুরাগের রঙে রঞ্জিত। আমি নিজে চিঠির প্রারম্ভে লিখতুম, কল্যাণীয়াসু এবং পরিশেষে লিখতুম, আমার শ্রদ্ধানুরাগ গ্রহণ করো। ইতি 'স্বামীজি'।

উনি একদা আমার গেরুয়া বসনাদি দেখে এই নামটি দিয়েছিলেন। কিন্তু উনি আমাকে যে তিন চারটি বিভিন্ন শব্দের দ্বারা প্রিয়-সম্ভাষণ করতেন, আমি সেগুলির যোগ্য ছিলুম কিনা, এটি অনেকবার বিচার করেছি। ওঁর চিঠি আসতে এক-আধ দিন দেরি হলে আমি বিনিদ্র রাত কাটাতুম। মনে হত আমি যেন সেই উত্তুঙ্গ হিমালয়ের কোনও এক চূড়ার সমগ্র পাইন বনের ঝুঁটি ধরে নাড়া দিচ্ছি এবং আমার নৈরাশ্য-সঞ্জাত অশ্রুর আভাসকে মনে হত গহন হিমালয়ের কোনও সঙ্গোপন গিরিনির্ঝরিণী আমার দুই চোখের ভিতর দিয়ে ছুটে আসতে চাইছে! যখন তাঁর চিঠি আসত তখন ভাবতুম, এ আমার সুকঠোর সাধনারই সিদ্ধি! প্রসন্না দেবী যেন সুললিত কণ্ঠে আমাকে উজ্জীবন মন্ত্র দান করেছেন। উনি প্রকৃতই বিদুষী ও বিদ্যাবতী। উনি আধুনিক কালের বিদগ্ধাদের কেউ নন। একবার সাবিত্রী বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক কবিতা আমার কাছে স্তব-পাঠের মতো! একবার একখানা চিঠিতে আমি বলেছিলুম, সাবিত্রী, প্রথম তোমাকে দেখেছিলুম তুমি তখন জ্ঞানযোগিনী, এখন দেখছি আমার জীবনে তুমি জ্ঞানদায়িনী হয়ে এসেছ। তোমাকে নমস্কার করি।

পুজোর প্রাক্কালেই আমি গিয়েছিলুম কাশীতে। ওঁদের বাড়ি শিবালার দিকে। উনি একটি প্রতিষ্ঠান চালাতেন। দুঃখী গরীব মেয়েরা সেখানে সেলাই-মেসিনে সেলাই ইত্যাদি শিখত, সাবিত্রী তার খরচ যোগাতেন। বাঙ্গালী মেয়েদের জন্য উনি একটি পাঠাগার তৈরি করেছিলেন এবং তার জন্য কাশীবাসী একটি তরুণ বয়স্ক

ছোকরাকে একবার কলকাতায় আমার বাসস্থানে পাঠিয়েছিলেন। ছেলেটির নাম শ্রীতারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। এই যুবক পরবর্তীকালে শ্রীময়ী নামক এক উপন্যাস লেখে, সেটি ডি-এম-লাইব্রেরি প্রকাশ করে। ফলে, সাহিত্যে দুটি তারাশঙ্কর হয়। সুতরাং আমাদের বন্ধু 'গণদেবতার' তারাশংকরকে তাঁর 'শ্রী' অক্ষরটি পরিত্যাগ করতে হয়!

সাবিত্রীর পাঠাগারের জন্য আমি কিছু বইপত্র দিয়েছিলুম।

যাই হোক, কাশীতে গিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগের অসুবিধা ছিল না। ওঁর অগ্রজ সম্পর্কে ছিলেন আমার এক বন্ধু গঙ্গা ঘোষাল। গঙ্গা থাকতেন হারার-বাগে। তিনি অতি নিষ্ঠাবান ও জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন।

সেবার কাশীতে ছিলেন সুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। সেই তাঁর ফরিদ-পুরার বাড়িতে আমাদের আসর বসে যেত জমজমাট। কিন্তু একদিন ওঁর ঘরে কেউ ছিল না। সকাল তখন দশটা। উনি এক কলসী পানীয় জল সকল সময়েই সামনে রাখতেন। ওঁর ধারণা, যারা অতিশয় মদ্যপানে অভ্যস্ত তাদের পক্ষে প্রচুর ঠাণ্ডা জল পান করা উচিত। উনি কিছু নিউরটিক, সেই কারণে হঠাৎ নাটকীয়ভাবে উঠে এক একবার এখানে-ওখানে ঘুরে নিতেন। দিবারাত্রির অধিকাংশ কাল তিনি রবীন্দ্র-কাব্যময় হয়ে থাকতেন এবং বাকি অল্পাংশকাল পৃথিবীর সকল দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সঞ্জাত দর্শনতত্ত্ব নিয়ে একপ্রকার বেহুঁশ অবস্থায় সময় কাটাতেন।

এক কলসী জল ও একটি গেলাস সামনে রেখে সুধাদা বললেন, তুমি যে হিমালয়ে গিয়ে সাড়ে চারশ'-পাঁচশ' মাইল হেঁটে তীর্থযাত্রা করে এলে, বলো তো কেমন লাগল? কী দেখলে? দু'মাস ধরে কীভাবে কাটালে?

সুধাদা সেদিন প্রস্তুত ছিলেন। আজ নিরিবিলিতে তাঁকে পেয়ে আমি আমার তীর্থযাত্রার অভিজ্ঞতার আনুপূর্বিক কাহিনী অকপটে বলে গেলুম। কাহিনীটি শেষ করতে বেলা আড়াইটে বেজে গেল, এবং অবাক হয়ে লক্ষ্য করলুম, সুধাদা অবিচল ভাবে এই দীর্ঘ সময় আমার দিকে স্তব্ধ ও নিমেষনিহত চক্ষে চেয়ে স্থির হয়ে বসে-ছিলেন। হঠাৎ এক সময়ে তিনি তাঁর নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন, তুমি ঠিক যেভাবে আমাকে আগাগোড়া বললে, ঠিক এইভাবে সবটা লিখে ফেলতে পারবে?

চমকিয়ে উঠলুম। ভ্রমণ করেছি বহু, তার ইতিবৃত্ত লিখব, একথা কখনো ভাবিনি। সাবিত্রীকে অবশ্য লেখবার কথা বলে রেখেছিলুম, এবং তিনি তাঁর নিজের ছদ্মনাম দিয়েছিলেন 'রানী', কিন্তু তার অনেকটাই ছিল আমার স্তোকবাক্য। হঠাৎ আজ সুধাদার প্রস্তাব শোনামাত্র আমার যেন তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল।

আমি জবাব দিলুম, হ্যাঁ, পারব।

সেবার কলকাতায় ফিরে লিখতে বসে গেলুম। সুধাদাকে বলবার সময় নিজের কাহিনী নিজের কানে নতুন করে শুনে যেন মুখস্থ করে রেখেছিলুম। লেখাটা অনর্গলভাবে চলতে লাগল।

তখন লেখকদের একটা বৈঠক মাঝে মাঝে বসত 'সাহিত্য সেবক সমিতি'তে। এটি ঠিক একটি প্রতিষ্ঠান নয়, এটি ছিল কবিরাজ রমেশচন্দ্র সেনের কবিরাজী বৈঠক।

কয়েকজন কবিরাজ তখন সাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন। তাঁদের মধ্যে 'অবতার' সম্পাদক অমরেন্দ্র রায়, 'পরিচয়' গোষ্ঠীর জীবনময় রায়, এবং সাহিত্য সেবক সমিতির রমেশচন্দ্র। লেখকদের মধ্যে বিনামূল্যে চা বিতরণ করতেন রমেশবাবু। এখানে আসত পবিত্র গাঙ্গুলী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ রায়চৌধুরী, শিবরাম চক্রবর্তী, সুবল মুখুজ্যে, হেম বাগচী, শৈলজানন্দ, হীরেন মুখুজ্যে ও বাঁড়ুয্যে, মধ্যে-মাঝে অচিন্ত্য, এবং আরও অনেকে। কবিরাজ রমেশচন্দ্রের একটি চোখ নষ্ট ছিল। তিনি একজন লেখক হতে চাইছেন এবং সকল লেখককেই তিনি সমাদর করতেন।

রমেশচন্দ্র একদা আমাকে একটি স্বচরিত রচনা পাঠের জন্য 'সাহিত্য সেবক সমিতি'র তরফ থেকে আমন্ত্রণ করলেন। আমি প্রকাশ্যে কখনও স্বচরিত রচনা পাঠের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিনি—যেমন অনেক লেখকই করে। ওটা অনেকটা যেন পরীক্ষা দেবার সামিল মনে করতুম এবং এড়িয়ে যেতুম। কিন্তু এবার আমি ও'দের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলুম। স্থির করলুম ভবানী মুখুজ্যে আমার সঙ্গে থাকবে।

ইতিমধ্যে ভবানী আমার রচনায় বর্ণিত অনেকগুলি চরিত্রের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচিত হয়েছিল। তারা ছিল আমার তীর্থযাত্রার সঙ্গী—যেমন গোপাল ঘোষ, চারুর মা প্রভৃতি। এরা কলকাতার এখানে ওখানে থাকত।

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ও মুক্তোরামবাবু স্ট্রীটের মোড়ের কাছাকাছি—কয়েক পা মুক্তোরামের ভিতরে ঢুকে বাঁ হাতি রমেশ কবিরাজের দোকানঘরের আড্ডা। কিন্তু রমেশচন্দ্র জানতেন, আমি আজ আমার হিমালয় ভ্রমণ কথার একটা অংশ তাঁর ওখানে পড়ব। তখন হিমালয় সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞান খুবই কম, সেই কারণে ঔৎসুক্য ছিল বেশি। এই ঔৎসুক্যের ফলেই হোক বা আমার ভ্রমণের প্রতি কৌতূহলের জন্যই হোক, সেদিন লেখকরা ছাড়াও বহু বাইরের লোক এসেছিল। ফলে, রমেশবাবুকে তাঁর দোকানের বিপরীত দিকে ঘোড়ার গাড়ির আস্তাবল গায়ে বড় বাড়িটার একটি হল নিতে হয়েছিল। সেদিন বিস্মিত হয়েছিলুম, 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত দাস, সুবল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ওদেরই কয়েকজন বন্ধু শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে। সজনী আমাকে বলল, তোর লেখা ভাল না লাগলে কিন্তু গালি দেবো, মনে রাখিস। —আমি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলুম, ভাল লাগলেও তুই গাল দিবি, কারণ ওটাই তোর পেশা!

আমার সমগ্র লেখার মাত্র একটা কিস্তি লিখেছিলুম, সেইটিই সেদিন পাঠ করে সবাইকে শোনালুম। ওদের মধ্যে যারা পরিচিত নিন্দুক, তারা একটু গায়ে পড়েই বলে গেল, মন্দ হয়নি, তবে নতুন ধরনের। সজনী বলে গেল, আমার বেশ ভাল লেগেছে। অ্যাটমসফিয়ারটা করেছিস বটে!

গ্রন্থখানি প্রকাশিত হবার পরে সজনীকান্ত তাঁর 'শনিবারের চিঠিতে' এ বইটিকে বহু ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছিলেন। যাই হোক, পরবর্তী মাঘ মাস থেকে এই ভ্রমণকাহিনীটি 'ভারতবর্ষ' মাসিকপত্রে ছাপা হতে থাকে 'মহাপ্রস্থানের পথে' এই শিরোনামায়। এই গ্রন্থের চতুর্থ কিস্তি নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে বসে লিখেছিলুম। মাত্র পাঁচটি কিস্তিতে এই বই বেরোয়। প্রথম কিস্তি থেকেই এই বই যেন পাঠক মহলে আগুন

ধরিয়ে দেয় এবং যে অভিজ্ঞতা আমার কোন দিনই ছিল না—তাই দেখলুম শ্যাম-বাজার ও কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে। রাস্তার আলোর নিচে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে একজন 'ভারতবর্ষ' পড়ছে এবং দশ-পনেরোজন শুনছে!

১৯৩৩-এর মে মাসে গুরুদাস চ্যাটার্জির দোকানে গিয়ে দাঁড়ালুম। ওঁরা বললেন, ও-বই আমরা ছাপতে যাব, আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ভ্রমণ-কাহিনী কেউ পয়সা দিয়ে কেনে? ওই যে পাঁচ কিস্তির দরুন পঞ্চাশ টাকা দিয়েছি, ওই তো যথেষ্ট পেয়েছেন! আমি ফিরে গেলুম। অতঃপর অনেক ভেবে-চিন্তে অনেক হিসেব কষে এবং অনেক সঙ্কোচ কাটিয়ে আর্য পাবলিশিং হাউসের তরফ থেকে বন্ধুবর শশাঙ্ক চৌধুরী বইখানা ছাপল। শরৎ চাটুয্যে মশায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এ বইয়ের ভূমিকা তিনি লিখবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একখানা চিঠি আমাকে লিখে তিনি সরে দাঁড়ালেন। নতুন লেখকদের সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের ঔদাসীন্য আমাদের অনেকেরই জানা ছিল।

কিন্তু আমি ১৯৩২-এর কথা এখনও শেষ করিনি।

এই বছরেই শরৎচন্দ্রের অনুরাগীরা টাউন হলে 'শরৎ বন্দনা'র আয়োজন করেন এবং বন্দনার আয়োজন নির্দিষ্ট দিনে লণ্ডভণ্ড হয়। এ আলোচনা আগেই আমি করেছি। হিজলী জেলের বন্দীদের উপর অমানুষিক গুলীচালনার ঘটনা ঠিক এক বছর আগে অনুষ্ঠিত হয়। পরের বছরে ঠিক সেই তারিখটিতে 'শরৎ বন্দনা'র আয়োজন গান্ধীপন্থী ছাত্র মহলের ভাল লাগেনি। শরৎচন্দ্র ছিলেন দেশবন্ধু ও সুভাষপন্থী এবং শরৎ বন্দনার আয়োজনের মধ্যে ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, নির্মল-চন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি। যে-ছাত্রমহলটি এই বন্দনাকে ভণ্ডুল করে দিল তারা ছিল সেন-গুপ্তপন্থী। যাই হোক, গভর্নমেণ্ট হাউসের কাছাকাছি শরৎচন্দ্রের গাড়ি যখন এল —দেখলুম সেই গাড়িতে রয়েছেন বেহালার জমিদার মণীন্দ্র রায়। তিনি আমাকে তাঁর গাড়িতে তুলে নিয়ে সেদিন বেহালায় ফিরলেন। শরৎচন্দ্রের নিরাপত্তার প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল।

আমার গলার ভিতরে তখন দুটি কই-মাছের কাঁটা ফুটেছিল। বড় কাঁটাটি হল, সদ্য কারাগার মুক্ত আমার বিধবা ভাগ্নী বুলি এবং ছোট কাঁটাটি হল শ্রীমতী রমলা রায়—যিনি আমার জন্য তাঁর পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করেছেন। এই দুটি বাঁকা ধরনের কাঁটা গলার মধ্যে এমনভাবে বিঁধেছে যে, গলায় আঙুল দিলে বমি বরং হয়, কিন্তু ঢোক গিলতে গেলেই গলার মধ্যে খচখচ করে! সুতরাং এ দুটিকে তুলে না ফেললে উপায় নেই।

আমার উপার্জন কিছু কিছু বেড়েছে বই কি। একজন এম এ পাস করা ভাল ছেলে পঁচিশ টাকা মাসিক মাইনে পেলে বেঁচে যায়, সেই সময় আমার গড়পড়তা রোজ-গার চল্লিশ পঞ্চাশ টাকায় উঠেছে, এ কি সোজা কথা। ওর মধ্যে থেকে আবার শ্যাম-বাজার পোস্ট অফিসের সেভিংস-এ কিছু কিছু জমাচ্ছি বই কি। কে জানে, কখন

কোথায় যেতে হয়। তখন আমি রাহাখরচ পাব কোথায়? তবে হ্যাঁ, সাহিত্য মন দিয়ে খাটো, মনোহর ও চিত্তগ্রাহী কথা লেখো মৌলিক এক স্টাইলে—তোমার আখের ভালো। কিন্তু খাটতে হবে। প্রতিভার সঙ্গে কপালের ঘাম জড়িয়ে থাকে। দেখছ না রবি ঠাকুরকে তাঁর এই একাত্তর বছর বয়সে? পরিশ্রম, অধ্যবসায়, ঘাম, অর্ধাহার, বিনিদ্রা—বড় প্রতিভার পিছনে এরা থাকে লুকিয়ে। ওর সঙ্গে আবার মিলিয়ে থাকে শারীরিক বিকলন এবং যকৃতের ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার গণ্ডগোল। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য অনেক দুঃখে সৃষ্টি হয়।

আমি ওই কই-মাছের কাঁটা গলা থেকে বার করে দেবার মতলব আঁটছিলুম। চেষ্টায় ছিলুম বুলির আবার বিয়ে দেবো। তৎকালে গৃহস্থঘরের কুমারী মেয়েরেই পাত্র জুটতে চায় না, ঘরে ঘরে তখন আইবুড়ো মেয়েদেরই গাদাগাদি, এর ওপর বুলি আবার বিধবা। বিধবাকে বিয়ে করে কে তার জাত ধর্ম, মান সম্ভ্রম খোয়াতে চায়? মেয়ে সুন্দরী হলে কি হবে, সমাজনীতির শাসন সেখানে অনেক বড়। কোনও মেয়ে যদি কারও হাত ধরে পালিয়ে যায়, সব পরিচয় মুছে দিয়ে যদি নিরুদ্দেশ হয়, তাহলে মা-বাপের জাতিচ্যুতি ঘটে, ঢি ঢি নিন্দা রটে, কারও কোনও শুভকর্মে তাদের ডাক পড়ে না, তারা মুখ দেখায় না ভদ্রসমাজে। এই যে রমলা রায় বাপের বাড়ির অবাধ্য হয়ে বেরিয়ে এসেছেন, ওঁর ভবিষ্যৎ ত অন্ধকার। মেয়েছেলের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যের জন্য রবিঠাকুরকেও ত চিৎকার করে বলতে হয়েছে, "নারীরে আপন ভাগ্য জয় করিবার, কেন নাহি দিবে অধিকার হে বিধাতা—"

সুতরাং বুলির দ্বিতীয়বার বিয়ে ছিল আমার পক্ষে স্বপ্নবৎ। তবু আমি আমার বড়দা ও মার সঙ্গে একদিন গোপনে আলোচনায় বসলুম। বুলির স্বাস্থ্যশ্রী ও বয়সোচিত তারুণ্যের সঙ্গে তার হাস্যমুখর প্রাণচাঞ্চল্যই তার শত্রু। তার মা-বাপ তার সম্বন্ধে হাত ধুয়ে বসে আছে। তার বিবাহিত বোনেরা, পিসি ও খুড়িরা, মাসিরা—কেউ তাকে ঠাঁই দিতে চায় না। তার একমাত্র আশ্রয় হল তার এই মামার বাড়ি—যেখানে তাকে এক কোণে শুতে দেবার মতোও জায়গা নেই। এই সব কারণ পরম্পরা বিবেচনা করে আমার মা—যিনি রক্ষণশীল ব্রাহ্মণকুলের আচারনিষ্ঠা বিধবা এবং আমার সদ্যবিপত্নীক বড়দা এঁরা দুজনে বুলির পুনর্বিবাহে রাজি হলেন। বুলি যদি সুখী হয়, যদি তার ভবিষ্যৎ নিরাপদ হয়, এই তাঁদের ইচ্ছা। সেদিন এই প্রকার একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অর্থ সমাজ বিপ্লবকে ডাক দেবার মতো ছিল। তরুণী বিধবার প্রতি স্নেহ, ভালোবাসা, দাক্ষিণ্য—এগুলোর কানাকড়িও দাম ছিল না, বরং সেখানে রক্ষণশীল সমাজমন আপন মর্মস্থলে আঘাত পেয়ে বিষধর ফণা তুলে একে একে সকলকে ছোবল মারবে, এই আতঙ্কই ছিল সর্বাপেক্ষা প্রবল। কিন্তু আমি সেক্ষেত্রে ছিলুম মরিয়া, এবং আমার মা জানতেন আমার মারমুখী শাসন, রুক্ষকণ্ঠের তিরস্কার, প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়ী প্রবলতা—যেগুলি অনেকের পক্ষে ভয়ের বস্তু ছিল। সেদিন আমার মা ও বড়দার সম্মতিলাভ করে প্রবল উৎসাহ পেয়েছিলুম। আমি নিজে চাচ্ছিলুম সমস্তটা ভেঙ্গে দিতে। পুরনো আচার বিচার কুসংস্কার কুশিক্ষা অন্ধতা এগুলো চারিদিক থেকে চিরকাল আমাকে যেন বেঁধে রেখেছিল, আমি এদেরই জঞ্জাল ঠেলতে

ঠেলতে এগিয়ে যাচ্ছিলুম।

একদিন আমি স্থির করলুম, শ্রীমতী শোভার কাছে এই ব্যাপারটা নিয়ে কেঁদে পড়ি। তিনি আমার ভাবনেত্রী, এবং তাঁর প্রতি আমার মন অনুরাগ-রঞ্জিত। তিনি নিজে তাঁর ব্যবসায়ী স্বামীকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করেছেন, সুতরাং তিনি হয়ত বলতে পারেন বুলি যেমন আছে তেমনি থাক, ওকে বরং কোন সমাজকর্মে লাগিয়ে দিন। কিন্তু তখন সাহিত্যকর্মে যেমন লেখকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় ভরা, ঠিক তেমনি সমাজকর্মেও মেয়ে বা পুরুষের ভবিষ্যৎ অনির্দিষ্ট। প্রকাশকের দরজায় দরজায় লেখকও যেমন ঘুরবে, প্রতিষ্ঠানের দরজায় দরজায় সমাজকর্মী মেয়ে-পুরুষ ও তেমনি ঘুরবে। দেশের নিয়তি এই।

সেদিন লাবণ্যপ্রভা দেবীর ওখানে গিয়ে দেখি বাড়িটা থমথম করছে। আমার পথ কিন্তু অবারিত। সোজা দোতলায় উঠে শোভারাণীর ঘরে ঢুকলুম। রবিবারের দুপুর। আহারাদির পর যে যার ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছে। মা একা রয়েছেন অন্য ঘরে খান দুই সংবাদপত্র নিয়ে। আমি তাঁর ঘরেই এলুম। আমার সঙ্গে তাঁর মাতা-পুত্র সুবাদ হলেও একটা সম্ভ্রমের সম্পর্ক প্রচলিত। তিনি কারাগার থেকে বেরিয়ে মেয়ে মহলের অন্যতমা নেত্রী বলে স্বীকৃত হচ্ছেন। কোন্‌দিক থেকে তাঁর নেত্রীত্বের যোগ্যতা বিচার করা হচ্ছে অতটা কেউ ভেবে দেখেনি। লেখাপড়া তিনি সামান্যই জানেন, বক্তৃতাদি তাঁর তেমন আসে না, মৌলিক চিন্তাধারার দিক থেকে তাঁর কনট্রিবিউশন তেমন কিছু নেই, রাজনীতির মধ্যে এক গান্ধীবাদ তাঁর আশ্রয়, যেটি তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা শোভা একেবারেই উড়িয়ে দেন। তবু তাঁকে যে নেত্রী বলে মেয়েরা স্বীকার করে নিচ্ছে, তার বড় কারণ হল তাঁর আন্তরিকতা, স্নেহশীলতা, সৌজন্য, স্বভাবমিষ্টতা এবং মধুর ব্যবহার। এর সঙ্গে কাজ করেছে তাঁর শান্তগৌরবর্ণা মূর্তি ও পূজা-অর্চনার প্রতি তাঁর অনুরাগ।

মায়ের কাছে বসে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলছি, এমন সময় পিছন থেকে 'জমাদারনি' হাঁক পাড়লেন, এ ঘরে আসুন।

বারীন ঘোষ মশায় শ্রীমতী শোভার নাম রেখেছিলেন 'জমাদারনি'।

আমি তৎক্ষণাৎ উঠে এ ঘরে এলুম। গত কয়েক দিন আমি এখানে আসিনি, সেই খোঁটা দিয়ে শ্রীমতী বললেন, মাঝে মাঝে আপনার পায়ে ধরে না আনলে বুঝি আসতে ইচ্ছে হয় না?

বললুম, পায়ে ধরবার আগেই আজ এসে পড়েছি। এখন যদি কেউ পায়ে ধরে খুশী হই।

—ধরছি, ভাল করেই আজ ধরব।—এই বলে শ্রীমতী শোভা ভিতর থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। শুধু পুবদিকের বাগানের জানলা দুটো খোলা রইল। উত্তরে প্রতিবেশীর দিকের জানলা এমনিতেই বন্ধ থাকে। কিন্তু এই প্রকার নিশুতি দুপুর বেলায় ওঁর এবম্বিধ অভিনব আচরণ লক্ষ্য করে আমি ভয়ে কাঠ। ওঁকে আমি ভয় করি, সম্মানও করি। ওঁর সামনে সিগারেটও খাইনে।

উনি এসে জানলার ধারে বসলেন প্রায় আমার গায়ে-গায়ে। ওঁর মুখে-চোখে

উত্তেজনা। উনি কোনদিন আমার এত নিকটে বসেন না। এবার উনি বললেন, আপনাকে নিয়ে আমার এতে জ্বালা কেন বলুন দেখি?

জ্বালাটা কি প্রকার আগে শুনি?

আমি শোভারানীর মুখের দিকে তাকালুম। তিনি পুনরায় বললেন, আপনি নাকি পরশু দিন কোনু এক রাস্তার নর্দমার ধারে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন?

এবার আমি হাসলুম। বললুম, আপনি কি সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন?

উনি থমকে গেলেন। বললেন, আমি কেন, আপনারই 'চ্যালাকাঠ' কবিবন্ধু এসে চুপি চুপি বলে গেছেন দিদির কাছে। এটা আশ্চর্য, আপনি আপনার যতগুলো বন্ধুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, সবাই আপনার প্রতি বিদ্বেষে জরোজরো। ওই 'চ্যালাকাঠ' যখন আপনার কথায় কাঠফাটা হাসি হাসেন, সেই হাসির সঙ্গে গলগল করে বিষ বেরোয়! আপনি ত ওদের নিন্দে করেন না কখনও?

হাসিমুখেই আমি বললুম, দাঁড়ান, আগে কথাটা পরিষ্কার হোক। আমার রাস্তার ধারের নর্দমায় গড়াগড়ি দেওয়া আপনারা বিশ্বাস করলে আজ আমার এই গায়ে গায়ে আপনি বসতেন না! দ্বিতীয়, আমার মুখে চোখে সামান্য লোভ বা অশুচিতার ছায়া থাকলে আপনি দরজায় খিল আটতেন না! পুরুষের লোভের চক্ষু মেয়েরা ঠিকই চেনে। আরেক কথা, আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আর অনুরাগ কি প্রকার, এ নিশ্চয় আপনি জানেন। কিন্তু যেদিন শুনব, আপনারা আমার চরিত্ররক্ষার অভিভাবক, তার পরের দিন থেকে আপনাদের ছায়া মাড়াবো না। ক্ষমা করবেন, যদি নিজের কথা দু-একটা বলি। আমার নৈতিক চরিত্র সব সময়ই ভাল থাকে না। কিন্তু সব মিলিয়েই আমি। আমি শিব ও শক্তির পুজোও জানি, এবং তন্ত্রসাধনার চেহারাটাও আমার অজানা নয়। আমার প্রবৃত্তির রাশ মাঝে মাঝে যদি আলগা হয়, সেটাকে আমি যথেষ্ট পরিমাণ পাপ বা অপরাধ মনে করিনে। নিন, দরজা খুলুন, আমি বেরোব।

শ্রীমতী বোধ করি একমনে আমার কথা শুনছিলেন। কিন্তু তিনি একটুও নড়লেন না। আমার হাঁটুর ওপর একখানা হাতের ভর দিয়ে উনি একভাবেই বসে রইলেন। এক সময় উনি বললেন, আপনি কাদের কথা বলছেন আমি বেশ জানি, আপনার চোখ যে কিছু এড়ায় না—তাও আমার জানা। কিন্তু তার জন্যে আমি কেন এ বাড়িতে অপমান হই, বলতে পারেন? আমার কোনও উপায় থাকলে আমি কি আজকের এই অপমান মুখ বুজে সইতুম?

বিগত আড়াই বছরকাল ধরে যে বিপ্লববাদিনীর কঠিন ও নির্মম প্রকৃতির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়, ফাঁসি হত্যা-অপমৃত্যু-পুলিসী উৎপীড়নে যে মেয়ে একের পর এক প্রিয়জনকে ছেড়ে দিয়েছে দ্বিধাহীন মনে, আজ হঠাৎ দেখি তার দুই চোখ জলে ভরো-ভরো। আজ তিনি অকপটে বলতে আরম্ভ করলেন, এ বাড়িতে থাকা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক। তিনি ও তাঁর মা শুধু পরাশ্রিতই নয়, তাঁরা নিঃসম্বল। তাঁদের দিন চলে না, খরচ জোটে না, নানা লোকের সহায়তা না পেলে তাঁদের পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকার উপায় নেই। তাঁর মা'র সম্মান কিভাবে তিনি এই নিরুপায় অবস্থার

মধ্যে দাঁড়িয়ে রক্ষা করবেন, এটি সমস্যা।

এক সময় উনি চোখ মুছে সোজা হয়ে বসলেন। তারপরেই এই আত্মসচেতন নারী আপন সাময়িক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে হাসলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, আপনি বুঝি এতক্ষণ ভাবছিলেন, আপনার পায়ে ধরে কাঁদতে বসেছি?

আমি কিছুই ভাবছিনে। আমি শুধু দেখছিলুম, উত্তেজনায় কথা আরম্ভ হয়েছিল এবং চোখের জলে তার শেষ হল।

উনি উঠে গিয়ে এবার দরজা খুলে গলা বাড়িয়ে বাইরেটা দেখলেন, পরে আবার দরজা একটু ভেজিয়ে রেখে কাছাকাছি বসলেন। আমি এবার বুলির কথা পাড়লুম, এবং শ্রীমতী কল্যাণী দাস সম্প্রতি একটি পাত্রের সন্ধান দিয়েছেন, সেই সংবাদ জানালুম। শোভা বললেন, আমরাও বুলিকে নাড়াচাড়া করে দেখলুম কিছুদিন। আপনি যদি তার বিয়ে দেন, তার আপত্তি হবে না। বাকিটা আমি ব্যবস্থা করে দেবো। যদি কল্যাণী আপনাকে কোনও পাত্রের কথা বলে থাকে, তবে সে পাত্র ভালই হবে। বুলিকে কল্যাণী খুবই ভালবাসে।

শ্রীমতী শোভার এ কথায় উৎসাহিত হয়ে আমি কল্যাণী দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলুম। অতঃপর তাঁরই প্রস্তাবিত এক পাত্রকে আমি দেখি। পাত্রের দাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। পাত্র রূপবান, গুনবান এবং উপার্জনশীল। বুলির সঙ্গে বেশ ভালই মানাবে। কল্যাণীর কাছে খবর নিয়ে পাত্র নিজেই আমার বাসস্থানে একদিন আলাপ করতে গেলেন। পাত্র দেখতে চান পাত্রীকে। আমি আমার বন্ধু সাঁতারু শান্তি পালকে বলে শিয়ালদার 'ছবিঘর'-এ ব্যবস্থা করলুম। যতদূরে মনে পড়ে, বোধ হয় আমার সঙ্গে ছিলেন, নরেন্দ্র দেব ও রাধারানী। দোতলায় একটি বক্সে বুলি গিয়ে বসল রাধারানীর সংগে। বুলি তখনও জানে না যে, তাকে দেখাবার জন্যই এই আয়োজন। পাত্র সেদিন পাত্রীকে খুবই পছন্দ করে আমাকে এক প্রকার পাকা কথাই দিয়ে গেলেন।

কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যে বুলির ভাগ্যের চাকাটা একটু অন্যদিকে ঘুরে গেল। হয়তো কেউ ভাংচি দিল, কেউ নিষেধ করল, কেউ ঈর্ষান্বিত হলো, কেউ বা হয়তো সরে দাঁড়াল। আমি জানিনে ঠিক কারণটি কি।

আজ হাওয়া ঘুরেছে, ইতিহাস পালটেছে, সেদিনের সমকালীন জীবনে যাঁরা আমার আশেপাশে নড়াচড়া করতেন তাঁদের অনেকেরই জেল্লা কমে গেছে। কিন্তু জীবনের যেগুলি নির্ভুল সত্য ঘটনা আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা কারও গৌরব এবং কারও অপযশ বহন করছে বইকি।

সেদিন আমার সমস্ত প্রকার অধ্যবসায় কিছুকালের জন্য নষ্ট হতে বসেছিল।

শ্রীমতী শোভা সবই জানতেন, এবং তাঁর অনুচরবর্গের কাছে সব খবরই পেতেন। তিনিও বিশ্বাস করলেন, আমি প্রতারিত হয়েছি। কিন্তু আমার এই অনর্থক হয়রানির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে তিনি একদিন বললেন, আপনাকে বলতে সাহস হয় না, আপনারা যে ব্রাহ্মণ। পাত্র যদি কায়স্থ হয়, আপনাদের আপত্তি আছে কি।

—কি রকম পাত্র?

—পাত্রের বয়স প্রায় আটাশ। গুজরাটে এক টেক্সটাইল মিলে কাজ নিয়ে শীঘ্রই সেখানে চলে যাচ্ছে। পাত্রের বাবা ছিলেন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট। অবস্থা মোটা-মুটি। সম্পত্তি কিছু নেই। আপনারা যদি রাজি থাকেন, আমি কথা বলতে পারি। বুলিকে ওরা পছন্দ করবে।

শ্রীমতীর প্রস্তাবটি নিয়ে সেদিন বাড়ি ফিরেছিলুম। সেটি ১৯৩২-এর নভেম্বর। কিন্তু সেদিনকার বিবেক-সঙ্কট ও সমাজ জীবনের সংগ্রাম স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। প্রথমত বুলি ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা, তার পুনরায় বিবাহ দেওয়া সমাজ-বিরোধী কাজ। দ্বিতীয়ত, তৎকালের বিচারে অব্রাহ্মণ পাত্র মানেই শূদ্রজাত! হোক না কেন ভাল চাকরি, হোক না কেন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলে এবং সম্ভ্রান্ত পরিবার—শূদ্র ত বটে! এখানে সম্মান, সুনাম, জাতি, ধর্ম, সমাজ, ইহকাল, পরকাল—সমস্তই যে বিপন্ন! এ যে একসঙ্গে অনেকগুলি পরিবারের সাত পুরুষ নরকস্থ হওয়া! এমন কাজ তুই কেন করতে যাচ্ছিস? তার চেয়ে বুলির মৃত্যু হোক, ওকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেল্। ওকে না হয় বনজঙ্গলে কোথাও ছেড়ে দিয়ে আয়। ওর যেদিকে দু' চোখ যায় চলে যাক।

বললুম, সেই ভাল, ওকে গুজরাটের জঙ্গলের দিকে ছেড়ে দেওয়া যাক। সেখানে সিংহের জঙ্গলে গিয়ে ও মরুক।

পাত্রটি হল শ্রীমতী শোভার জেঠতুতো ভাই শ্রীমান সুবোধ। শ্রীমতী তাকে সেজদা বলেন, এবং সুবোধ আমার চেয়ে সামান্য বড়। স্থির হলো, এই চলতি অগ্রহায়ণেই এ বিয়ে হবে। ছেলের পক্ষে শোভা হলেন কর্ত্রী, এবং মেয়ের পক্ষে আমি হলুম কর্তা।

কিন্তু বিয়ের খরচ? কন্যাপক্ষের খরচ কে দিচ্ছে? মেয়েকে ত ত্যাগ করেছে মা-বাপ-ভাই-বোন-মাসি-পিসিরা। তার ওপর জেলখাটা মেয়ে তার জাত খুইয়ে এসেছে। বড় দুই মামার একফোঁটা সঙ্গতি নেই। আমি ছোট মামা, আমার 'টিকে ধরাতে জামিন লাগে'! সুতরাং বিয়ের খরচ কে যোগাচ্ছে? তা ছাড়া এ বিয়ের সবাই বিরোধী। কোনদিকে কোনও উৎসাহ বা সহানুভূতি নেই।

বিয়ের তারিখ নির্দিষ্ট হল বোধ হয় ২৭ অগ্রহায়ণ, অর্থাৎ ডিসেম্বরের বোধ হয় ১২ বা ১৩ তারিখ। আমার তখন 'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল'! আমি তখন শুধু ছুটছি পথে পথে। সর্বাগ্রে আমি "প্রিয়-বান্ধবী'র পাণ্ডুলিপিখানা বগলে নিয়ে গুরুদাসে গিয়ে হাজির হলুম। গুরুদাসের অন্যতম মালিক সুধাংশু চাটুজ্যের মনে ভয় ছিল, এ বই আবার পুলিস ধরবে কিনা। ওঁদের দোকানের ইতিহাসে পুলিস হামলা করল এই প্রথম আমার বই নিয়ে। সুতরাং ওঁরা এবার থেকে খুব সচেতন।

কিন্তু ওঁরা 'প্রকৃত' ব্যবসায়ী। হৃদয়হীন বলব না, কারণ ওঁরা অসময়ে টাকা দিয়ে থাকেন। লেখকরা যখন দুঃসহ দারিদ্র্যে ছটফটিয়ে ওঁদের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ে, ওঁরা তখন নিরাশ করেন না। শুনেছি শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ-বৌ' আর 'বিন্দুর ছেলে' ওঁরা নাকি এক-একশ' টাকায় সর্বস্বত্ব অর্থাৎ সম্পূর্ণ অল্-রাইটস কিনেছেন। শুনেছি

কান্ত কবি রজনী সেন যখন হাসপাতালে মুমূর্ষু—ওঁরা তাঁর 'বাণী ও কল্যাণী' নামক সুপ্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ ওইভাবে কিনেছেন মাত্র পঞ্চাশ টাকায়! ওঁরা জেনেছেন, আমার বাজার-মূল্য খারাপ নয়, সুতরাং আমার কাছে ওঁরা একখানির পর একখানি বই-এর অল-রাইটস কিনতে চান। আজ ওঁরা ভাল করেই জেনেছেন যে, ওঁরা ছাড়া আমার অন্য উপায় নেই, অতএব ওঁরা মাত্র তিনশ' পঁচিশ টাকায় 'প্রিয়-বান্ধবী'র কপি-রাইট কিনে নিলেন! তখনকার দিনে কপি-রাইট বা গ্রন্থের সর্বস্বত্ব বলতে শুধু গ্রন্থস্বত্বই বোঝাতো। তখন সিনেমা চিত্র, বেতার, গ্রামোফোন, নাটক বা ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ প্রভৃতি কোনও কথাই উঠত না। যাই হোক, বহুকাল পরে জেনেছিলুম, 'প্রিয়-বান্ধবী' উপন্যাসের কম-বেশি পঁয়ত্রিশটি সংস্করণ ওঁরা একে একে প্রকাশ করেছেন, এবং সমস্ত খরচ-খরচা বাদ দিয়েও ওঁরা বহু সহস্র টাকা লাভ করেছেন। আমি তবুও কৃতজ্ঞ, ওঁরা অসময়ে টাকা দিয়েছিলেন!

কাত্যায়নী বুক স্টলের মালিক গিরীন সোমের কাছে অগ্রিম দেড়শ' টাকা আদায় করতে আমার একজোড়া জুতো ছিঁড়ল। তারপরে রইল দেব সাহিত্য কুটীরের সুবোধ মজুমদার, ওয়েলিংটনের নাথ ব্রাদার্স, সাঁতরাগাছির ভাগ্নী, এবং আমার পোস্ট অফিসের খাতায় তেষট্টি টাকা!

কিন্তু শোভারানীর নির্দেশ মত সম্পূর্ণ হাজার টাকা কোনমতেই যোগাড় করা গেল না। শেষ পর্যন্ত বড়দার কাছে কেঁদে পড়লুম, তোমার আপিস থেকে শ' দেড়েক টাকা ধার করে এনে দাও, বড়দা।

যখন এইভাবে বুলির বিয়ের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে আসছিল তখন বুলির দুর্ভাগ্য-বিধাতা আরেকবার বুলির দিকে তাকিয়ে তাঁর গোঁফে তা দিচ্ছিলেন, যেমন তিনি ছ' বছর আগে বুলির প্রথম বিয়ের রাত্রে কৌতুকরঙ্গে হেসেছিলেন!

বুলির বিয়ের আসর বসল একটি মস্ত সামিয়ানার নিচে প্রায় সাড়ে তিনশ' নিমন্ত্রিতের উপস্থিতিতে। আমার বহু-সংখ্যক বন্ধুর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কবি-শেখর কালিদাস রায় এবং তাঁরই সহায়তায় আমি পুরোহিতরূপে পেয়েছিলুম তৎকালীন প্রসিদ্ধ আচার্য পণ্ডিত গিরিজাকান্ত সাংখ্যবেদান্ততীর্থকে। আসর বসেছিল কালীঘাটে, অপূর্ব মিত্র রোডের কোণে—শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার বাসস্থানের সংলগ্ন এক এক প্রাঙ্গণে। আমার পক্ষে বড়দা এই বিবাহের মস্ত সমারোহে উপস্থিত থেকে কন্যা সম্প্রদান করলেন। বিয়ে হয়েছিল গোধূলি লগ্নে।

বাংলার বিপ্লববাদীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত একটি অতিশয় চাঞ্চল্যকর ঘটনা—যার জন্য কলকাতায় তখন উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনা ছিল প্রবল। শ্রীমতী শোভা এই বিবাহ বাসরে উপস্থিত ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে কোনও জনসম্মেলনে তিনি যোগদান করেন না। কারণটি রাজনৈতিক। দু বছর আগে ১৯৩০-এ ঠিক এক সময় অর্থাৎ ৮ই ডিসেম্বর' তারিখে তিনজন যুবক আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে নিয়ে রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ করে। তারা কারাবিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল লেঃ কর্নেল সিমসনকে তাঁর আপিসের মধ্যে গুলী করে হত্যা করে। অতঃপর যুবকদের চেষ্টা ছিল এই, যতগুলি সম্ভব দায়িত্বশীল ইংরেজ কর্মচারীকে তারা একই দিনে শেষ করে যাবে। তারা কঠোর প্রতিজ্ঞা সহ

উন্মত্ত উত্তেজনায় যখন প্রত্যেকটি কক্ষ খোঁজাখুঁজি করছে তখন জুডিশিয়াল সেক্রেটারি মিঃ নেলসন ছেলেদেরকে বাধা দিতে এসে তাঁর উরুতে গুলীবিদ্ধ হন। অনেক আমেরিকান ড্রেন-পাইপের সাহায্যে পালিয়ে বাঁচেন।

প্রবল উত্তেজনা, চিৎকার, হইচই এবং ছুটোছুটির মধ্যে তিনটি যুবক তাদের পলায়ন পথের নকশায় বোধ করি একটু ভুল করে থাকবে। কিন্তু ওরা ছিল বিপ্লবের নির্ভীক সাধক। ওরা ওই রাইটার্স বিল্ডিং-এর মধ্যেই ধরা পড়ার আগে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। ফলে তিনজনের মধ্যে বাদল গুপ্ত নামক যুবকটি ওখানেই মারা যায়। বাকি দুজন নিজেরাই পিস্তলের গুলীর দ্বারা নিজেদের মাথার খুলি বিদ্ধ করে। সেই আহত অবস্থায় তাদেরকে পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্ট কড়া পুলিস পাহারায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। ওই দুই যুবকের নাম বিনয়কৃষ্ণ বসু ও দীনেশ গুপ্ত। বিনয় ছিল ঢাকায় মিঃ লোম্যানের হত্যাকারী এবং পলাতক। ইংরেজ তার ওপর বাজি ধরেছিল প্রচুর। তাকে সুস্থ করে তুলে যথাসময়ে ফাঁসী দেবে, এই ছিল তাদের ঐকান্তিক বাসনা। কিন্তু তখন পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন বা ওই ধরনের 'সন-ফিন' জাতীয় কোনও ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি। ওই দুই যুবকের 'প্রাণ-রক্ষা'র জন্য বাংলার গভর্নমেন্ট রাজোচিত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু দিন চারেক পরে শেষ রাত্রে হাসপাতালেই বিনয়ের মৃত্যু ঘটে। অতঃপর দিনে দিনে দীনেশ গুপ্ত সুস্থ হয়ে ওঠে এবং বিচারের পর যথাকালে তার ফাঁসী হয়। শ্রীমতী শোভা এই তারিখটিকে দু' বছরেও ভুলতে পারেনি।

যাই হোক, বুলির এই বিধবা-বিবাহ আমার জীবনে তুলেছিল একটা ঝড়। পদে-পদে পথে-পথে আমার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকত অপমান, লাঞ্ছনা, অনাদর এবং দুর্ব্যবহার। অনেকে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, অনেকে আমার মুখ দেখতে চায়নি, অনেকে বুলির জেলে যাবার জন্য চরিত্রদোষ রটিয়ে বিবাহ বাসরের ঠিকানা খুঁজে বেড়িয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই আমার বন্ধু, আত্মীয়, কুটুম্ব এবং স্বজন।

আমি যখন রাত্রের দিকে ক্লান্তি, অবসাদ ও উপবাসে শীর্ণ সেই সময় বাসর থেকে নবদম্পতি আমার সামনে এসে দাঁড়াল। বুলির সর্বাঙ্গে নতুন স্বর্ণালঙ্কার, মাথায় মুকুট ও টায়রা, গলায় দু' গাছা হারের মধ্যে একটিতে দামী পাথর বসানো। হাতভরা চুড়ি আর বাজুবন্ধ। পরনে অতি মূল্যবান বেনারসী ঝলমল করছে।

এ সব আমি দিইনি। সব দিয়েছেন শোভারানী। আমার টাকা সামান্য, তার বহুগুণ খরচ করেছেন বুলির নতুন শ্বশুরবাড়ি। আমি কেউ না—ওঁরাই সব।

নবদম্পতি আমার পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াল। সুবোধ বলল, আজ থেকে আপনার ভাগ্নির নতুন নামকরণ হল, সবিতা।

বুলি কেঁদে বলল, ছোট মামা, এবার বোধ হয় তুমি মুক্তি পেলে, কেমন?

না, মুক্তি আমি পাইনি। বুলির জন্মলগ্নে বোধ হয় সবগুলি দুষ্টগ্রহই কাজ করেছিল। তার ভাগ্যনিয়ন্তা আরেকবার তার উপরে বজ্রাঘাত হানল। কিন্তু এবার আমি বুলির প্রসঙ্গ শেষ করব।

দ্বিতীয়বার বিবাহের সাড়ে সাত বছর পরে বুলি আরেকবার বিধবা হয়। তখন সে সন্তানের জননী। আমেদাবাদে থাকাকালীন শ্রীমান সুবোধ ডবল নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে একাদশ দিনে মারা যায় এবং তার ছোট ভাই সেখানে গিয়ে বুলিকে ফিরিয়ে আনে। আনন্দের সংসার ছারখার হয়ে যায়। কলকাতায় ফিরে বুলির কোলেব শিশুটির মৃত্যু ঘটে। কিছুদিন ছিন্নবাধা হয়ে এখানে ওখানে সেখানে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুমহলে বুলি ঘোরাফেরা করে। তার দুই চোখের বন্য চাহনিতে অশ্রুর আভাস বা বেদনার কারুণ্য দেখা যেত না। মাঝে মাঝে শুধু চোখে পড়ত বাঁকা কটাক্ষের থেকে বজ্রাগ্নির আভাস। অবশেষে একদিন জানা গেল, সে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েছে। অতঃপর সে যখন শ্বশুরালয়, পিত্রালয় ও মাতুলালয়—কোথাও আশ্রয় পেলো না, আমি তখন ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। সুন্দরীমোহন ছিলেন একজন বিশিষ্ট জনহিতব্রতী, সমাজসেবী ও হৃদয়বান ব্যক্তি। তাঁর 'বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনামচা' নামক গ্রন্থখানি তখন জনসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত। আমার আকুলতা দেখে তিনি কাঁকুড়গাছিতে 'ন্যাশন্যাল ইনফার্মারি হাসপাতালে' বুলির থাকা ও চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করে দেন।

কাঁকুড়গাছি তখন বন-বাগান ও জঙ্গলে আকীর্ণ। ওর বাইরে পূর্ব-কলকাতার অস্তিত্বই কম। যানবাহন কোথাও কিছু নেই। রেলপুলের নিচে দিয়ে নিরিবিলি খোয়ার রাস্তা চলে গিয়েছে জঙ্গল-জটলার দিকে। তারই ভিতর দিকে একটি জরাজীর্ণ বাড়ির নিচের তলায় প্রশস্ত এক উঠোনের সামনে দরদালানে আরও কয়েকজন রোগিণীর পাশে বুলি তার শেষ শয্যা পাতলো।

ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ কাটছিল। সেই ধু ধু রৌদ্রে আমাকেই নিয়ে যেতে হচ্ছিল ফলমূল, ঔষধপত্র ও বিবিধ খাদ্যসামগ্রী। তখন যক্ষ্মারোগীর ত্রিসীমানায় কেউ যেত না, কিন্তু পাছে বুলি আঘাত পায় এজন্য আমি তার বিছানার একধারে বসে তাকে এটা ওটা খাওয়াতুম এবং বাড়ি ফিবে স্নান করতুম। তখন আমার একমাত্র কামনা, বুলিব শেষ হোক!

সেই জ্যৈষ্ঠেরই কোন্ একটা তারিখে মধ্যাহ্নকালে যখন ঘর্মাক্ত অবস্থায় খাদ্যসামগ্রী নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে কাঁকুড়গাছির হাসপাতালে পেঁছিলুম, শুনলুম বুলি গতরাত্রে মারা গেছে!

বুলির এই অপমৃত্যু সেদিন আমার মনে একপ্রকার অস্বাভাবিক স্বস্তিবোধ এনেছিল।

॥ ৩৮ ॥

বেদে এবং পুরাণে দেবরাজ ইন্দ্রের লাম্পট্য বহুবার বর্ণিত হয়েছে। তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী শচীদেবী জাজ্বল্যমানা থাকা সত্ত্বেও তাঁর স্বর্গলোকের নৃত্যসভা উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, চিত্রলেখা প্রমুখ বহু অপ্সরার আনন্দের কেন্দ্র ছিল। একই পুরুষ বহু নারীর দ্বারা সমাদৃত, এটি ভারতীয় পুরাণে যেখানে-সেখানে পাই। এ ছাড়া মদ্য, গোমাংস, শূকরভক্ষণ, বহুনারী সম্ভোগ—এগুলি বেদ বা পুরাণে নিষিদ্ধ ছিল না। বরং এগুলোর ঢালাও ব্যবস্থা ছিল।

সুতরাং দেবরাজ একদা স্থির করলেন তাঁর পক্ষে ঋষি গৌতমের গৃহস্থাশ্রমে গিয়ে তাঁর পরম রূপবতী স্ত্রী শ্রীমতী অহল্যার ধর্মনাশ করা দরকার। অতএব শুভস্য শীঘ্রম্। গৌতমের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তিনি রূপবান প্রেমিকের বেশে এসে আশ্রমের উপান্তে অহল্যার কাছে দাঁড়িয়ে নারীপ্রশস্তি আরম্ভ করলেন তাঁর মধুর মায়াবী কণ্ঠে "কিশোর মন্দার পুষ্প পারিজাত গন্ধ এত মধুর নহে, যে-গন্ধ তোমার অস্ফুট প্রণয়বাণী-মিশ্রিত নিঃশ্বাসে। ত্রিদিব ভান্ডারে মোর এত সুধা নাই, ও রক্তঅধরে যত—"

কঙ্কাবতী গলে গেলেন, শিশির ভাদুড়ী জয়লাভ করলেন। ডি-এল-রায়ের 'পাষাণী' অভিনীত হচ্ছিল নাট্যমন্দিরে।

আরেকদিন দেখছিলুম ভগ্নকণ্ঠে আর্তনাদ করছে 'জীবানন্দ': "অলকা অলকা, আমি ঘর চাই, সংসার চাই, স্ত্রী চাই, সন্তান চাই, মানুষের মধ্যে মানুষের মতন বাঁচতে চাই—"

দর্শকরা আবেগে ও বেদনায় ডুকরিয়ে উঠছিল। শিশিরবাবুর মা দোতলায় তাঁর জন্য সংরক্ষিত 'বক্সটিতে' শান্ত ও অবিচলভাবে উপবিষ্ট। বিপত্নীক শিশির ঘর-ছাড়া সংসার-হারা। যেন অনেকটা ওই জীবানন্দেরই কার্বনকপি!

নাট্যমন্দিরে যে কোনও নাটকের যে কোনও অঙ্কের অভিনয়কালে আমি গুটিগুটি ভিতরে ঢুকে কাছাকাছি কোথাও বসে খানিকটা অভিনয় দেখে চলে যেতুম। সেদিন 'সীতা' হচ্ছিল। অঙ্কের পর অঙ্ক দেখে যাচ্ছিলুম। বাঙ্গলার নাট্যশালার ইতিহাসে 'সীতা'র জুড়ি কম। মুগ্ধচক্ষে চেয়ে ছিলুম মঞ্চের দিকে। "রামচন্দ্র দন্ডকবনে 'স্বর্ণসীতা' নির্মাণ করে তার স্তবে বিভোর: সীতা, সীতা, সমস্ত দন্ডকবন আজি সীতাতীর্থ!"

এই 'সীতা' দেখে আমাদের অচিন্ত্য একটি কবিতা লেখে, "দীর্ঘ দুই বাহু মেলি আর্তকণ্ঠে ডাক দিলে সীতা, সীতা, সীতা—পলাতকা গোধূলি প্রিয়ারে—"

হঠাৎ পিছন থেকে পিঠের ওপর আঙ্গুলের টিপ পড়ল। ফিরে দেখি, দৌবারিক মিঃ ব্যানার্জি। আমাকে বাইরে যেতে ইঙ্গিত করলেন।

বাইরে এসে দেখি মূর্তিমান শ্রীমান ধীরেন চক্রবর্তী। সোজা আমার পায়ের ধুলো

নিয়ে হাসিমুখে সে বলল, আপনার বাড়িতে গিয়েছিলুম। শুনেলুম আপনাকে হয়ত এখানে পাব। আমি চারদিন হল জেল থেকে বেরিয়েছি।

আমি খুব হাসলুম। হাসতে হাসতে ধীরেনকে নিয়ে বাইরে এলুম। কিন্তু আমার হাসির কারণ ছিল। গত বছর এক রাজনীতিক সভায় ধীরেনকে একটি আবৃত্তি করতে বলা হয়। তার কণ্ঠস্বর ছিল দরাজ। কিন্তু আমাকে সে তার মুরুব্বি ঠাউরিয়েছিল, এবং আমাকে দিয়ে সে তিন-চারবার রবীন্দ্রনাথের 'সুপ্রভাত' কবিতাটি আবৃত্তি করিয়ে নেয়। অতঃপর তার সেই আবেগমিশ্রিত উচ্চকণ্ঠের তেজোব্যঞ্জক 'সুপ্রভাত' আবৃত্তি কর্তৃপক্ষ বরদাস্ত করেনি! সেই রাত্রেই ধীরেনকে টেনে নিয়ে যায়! বিচারে তার জেল হয় এক বছর।

—ব্যাপার কি শুনি? রাত দশটা বাজে—!

ধীরেন বলল, শোভাদি পাঠালেন। আপনি সাত আট দিন ওদিকে যাননি। আপনাকে বিশেষ দরকার—কথা আছে অনেক—

ধীরেন একখানা ছোট্ট চিঠি আমার হাতে দিল। চিঠিখানা একটি কাগজের টুকরো মাত্র। নিচে নামসই নেই, উপরে সম্ভাষণ নেই! শুধু তাঁর হাতের দু' লাইন লেখা: 'বামুন উপস্থিত না হলে ষষ্ঠী, শেতলা, মনসা—কোনও পুজোই হয় না!'

হাসিখুশি মুখে ধীরেন বিদায় নিয়ে চলে গেল। ওকে বলে দিলুম, বলো সামনের মঙ্গলবারে যাব।

আমি অতিশয় দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলুম। বিশেষ করে বুলির বিয়ে দিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছি। তার ওপর কোনও কোনও প্রকাশকের কাছে অগ্রিম নিয়েছি, উপন্যাস লিখে সেই দেনা শোধ করতে হবে। এ ছাড়া বড়দা আমার কথায় তাঁর আপিসে দেনা করেছেন, সে-দেনা আমারই। এর আগে পর্যন্ত দিনে চার-পাঁচটা সিগারেট খাচ্ছিলুম পানের দোকানে দড়ির আগুনে ধরিয়ে, কিন্তু এখন বিড়ির পয়সাও জুটছে না। আমি এখন আশাহত, ভাগ্যবিড়ম্বিত এবং অনেকটা তিতবিরক্ত। আমার ঔদাসীন্যের অন্যতম কারণ, সাবিত্রী আমার হৃৎপিণ্ডের রক্ত-চলাচলের মধ্যে নিত্য সঞ্চালিত রয়েছেন,—বিষয় বৈভব, অর্থচিন্তা, সামাজিকতা বা অন্য কোনও পার্থিব কিছু আমার কাছে আর প্রিয় মনে হচ্ছে না। সাবিত্রী আমার মধ্যে এনেছেন একপ্রকার অধ্যাত্ম পিপাসা, যেন আমাকে আর স্থির থাকতে দিচ্ছে না ঘরের মধ্যে। আমাকে ডাকছে হিমালয় অহর্নিশ, ডাকছে সেই রামগঙ্গা আর মেহলচৌরি, ডাকছে কর্ণপ্রয়াগ আর সিরৌলি চটি, ডাকছে যোশীমঠ, ভিকিয়াসেন আর বিরহী নদীর কোলে ব্যাসগুহা। আমি সেই বিরাট হিমালয়ের গহনলোকে কীটানুকীটের মতো মিলিয়ে যেতে চাই! কিন্তু জানিনে, এ আমার একপ্রকার শ্মশান-বৈরাগ্য কিনা।

অনিচ্ছুক মন নিয়ে যাচ্ছিলুম হাজরা রোডের দিকে। অনিচ্ছার অন্যতম কারণ, সম্প্রতি পর-পর দু'তিনটে 'স্বদেশী' ডাকাতি হয়ে গেছে বিপ্লববাদী ছেলেদের খরচপত্র চালাবার জন্য। একটি ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়েছে প্রায় হাজার তিরিশেক টাকার। তাই নিয়ে হইচই চলছে প্রচুর। এর সঙ্গে একাধিক মহিলা যাঁরা জড়িত রয়েছেন, তাঁরা অনেকে

আমার বিশেষ পরিচিত। আমার অনিচ্ছার আর এক কারণ, মহিলা সমাজের ফাইফরমাশ খাটতে যাওয়া সকল সময়েই কিছু ব্যয়সাপেক্ষ।

শ্রীমতী শোভা পাছে তাঁর দিদির মতো মোটা হন্ বা তাঁর মেদবৃদ্ধি ঘটে এজন্য সতর্ক থাকেন। তাঁর আহার্যের পরিমাণ কম। একটি বাটি নিয়ে নিজের হাতে সামান্য ভাত-তরকারিসহ একটুকরো মাছ—এই তাঁর মধ্যাহ্নভোজন। ওই ভোজনটি সেরে দুপুর দুটো নাগাদ তিনি সেদিন উপরে উঠছিলেন, এমন সময় আমি গিয়ে হাজির। উনি এখন আমার কুটুম্ব—আমার ভাগ্নির ননদ। আমি এখন ওঁর নমস্য।

আমাকে দেখামাত্রই উনি চোখ বেঁকিয়ে কূটনীতিক হাসি হাসলেন। বললেন, রমলা রায় কে বলুন ত?

থমকিয়ে গেলুম। বললুম, নাম শুনে মনে হচ্ছে এক মহিলা!

—আপনাকে তিনি এত খুঁজছেন কেন?

তৎক্ষণাৎ মুখে জবাব এল, মেয়েরা প্রাণের দায়ে পুরুষকে খোঁজে।

শোভা আমার মুখের দিকে তাকালেন। পরে বললেন, চালাকি হচ্ছে, কেমন? কেমন? ওপরে চলুন—

—আপনি আগে উঠুন—

ওঁর পিছনে পিছনে দোতলায় উঠলুম। উনি আমাকে সোজা ডেকে নিয়ে গেলেন পশ্চিমের ছোট ঘরে। শীতের দুপুরে উনি চুল এলিয়ে বসলেন পশ্চিমের জানলায়। পরে হাসিমুখে বললেন, আপনাকে নিয়ে আজ পার্কে যাব। এখন শুনি, রমলা রায় আপনার এত খোঁজ করছেন কেন? আপনার বাড়িতে উনি যাচ্ছেন, আপনার মার সঙ্গে ভাব করছেন,—ব্যাপারটা কি? আপনি আমাদের এখানে আসেন, উনি জানলেন কেমন করে?

আমি অকপটে রমলা দেবীর ব্যাপারটা বলে গেলুম শোভার কাছে। আমার বিশ্বাস, উনি আমাকে অবিশ্বাস করলেন না। আমার পক্ষে গোপন করার মতো কিছু ছিল না। রমলা চান একটা অর্থকরী কোনও কাজ। তিনি চান আমাকে সামনে দাঁড় করিয়ে তাঁর জীবনব্যবস্থা গুছিয়ে নিতে। তাঁর আরেকটি চেহারা লক্ষ্য করার মতো। তাঁর মধ্যে স্বভাব-চটুলতা বা প্রজাপতিবৃত্তি নেই। তিনি সংযত প্রকৃতির মেয়ে এবং কতকটা রক্ষণশীলও বটে। আমার মা বোধ করি এই কারণেই রমলার প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন। রমলা প্রণয়, ভালোবাসা বা প্রেম—এসবের খেলায় মেতে উঠতে চান না। পুরুষের সঙ্গ নিয়ে যৌবনচাঞ্চল্যে মেতে ওঠা বা পুরুষের সংসর্গে জরোজরো হওয়া—এসব তাঁর একেবারেই পছন্দ নয়। সেদিকে তাঁর রুচি, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও শালীনতা—সমস্তই আভিজাত্যের পরিচয় দেয়। তিনি এক সম্ভ্রান্ত সমাজের কন্যা। মালদহে তাঁর পিতার অবহেলা ও ঔদাসীন্য বরদাস্ত করতে না পেরে তিনি কলকাতায় এসে মরীচিকার পিছনে ছুটছেন।

শোভা তাকালেন আমার দিকে—মরীচিকা কেন?

জবাব দিলুম, উনি আমাকে সমগ্রভাবে পেতে চান। ওঁর একমাত্র কাম্য, আমি ওঁকে বিবাহ করি। উনি আমাকে নিয়ে ঘরকন্না গড়ে তুলতে চান।

—আপনি রাজি হচ্ছেন না কেন?—শোভা একপ্রকার অনুযোগ জানালেন।

—খুব সহজ কথা। আমি বললুম—আমি লেখক, সাহিত্যের কাজ করি। আমার ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। আশা, আশ্বাস, সংস্থান, সামাজিক প্রতিষ্ঠা—কিছু নেই আমার। প্রতিদিনের অন্ন মুখে তোলার সময় পরের দিনের অন্নসংস্থান আছে কিনা আমাকে ভাবতে হয়। আমি দেখতে দেখতে এসেছি দারিদ্র্য-দৈন্য-দঃখ-দুর্দশা-দুর্গতি কাকে বলে। আমি জানি গরীব-গেরস্থ ঘরের বউ-ঝিরা পুরুষের থালা সাজিয়ে দিয়ে নিজেরা কী খায়। লেখক হওয়াটা এ দেশে অভিশাপ। চেষ্টা করলে এক আধটা অর্থকরী কাজ পেতে পারিনে তা নয়। কিন্তু সাহিত্যের কাজ ছেড়ে ভিন্ন ধর্মে আমার মন যাবে না। অনেক লেখকই চাকরি করে, তাই সাহিত্য তাদের কাছে গৌণ, অনেকটা অবসর-বিনোদনের ক্ষেত্র।

শ্রীমতী শোভা স্তব্ধ চক্ষে আমার দিকে চেয়ে বসেছিলেন। এবার তিনি বললেন, তাহলে কি আপনি কোনদিনই বিয়ে করবেন না?

এবার আমি হো হো করে হেসে উঠলুম। বললুম, আসল কথায় এবার এসেছেন দেখছি। তাহলে শুনে রাখুন—আমি বরং উচ্ছন্নে যাব, বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরবো—কিন্তু কোনও ভদ্র পরিবারের মেয়েকে কেবলমাত্র দুঃখ-দুর্গতিতে ডুবিয়ে দেবার জন্য ঘরে এনে তুলব না! এদেশে সাহিত্যের পথ আজও কুসুমাস্তীর্ণ হয়নি।

—কিন্তু রমলা যদি আপনাকে চেপে ধরেন?

—তাহলে তিনি পাথরেই মাথা ঠুকবেন, পাথর ভাঙবে না!

ও ঘর থেকে এতক্ষণ মাঝে মাঝে মেয়েদের কলরব শুনতে পাচ্ছিলুম। এবার দিদির ছোট মেয়েটি দরজার কাছে এসে বলল, মাসিমণি, ওরা ডাকছে।

—হ্যাঁ যাচ্ছি!—শোভা বললেন, শুনুন, ওরা এসেছে আপনার সঙ্গে দেখা করতে। বসে আছে সেই বেলা বারোটা থেকে। হেমপ্রভা মজুমদারের মেয়ে দুটিকে আপনি চেনেন। ওদের সঙ্গে 'পুণ্যাশ্রম'-এর আরেকটি মেয়ে এসেছে। কিন্তু মনে রাখবেন, মেয়েটার একটু মাথার ছিট আছে, একটু লক্ষ্মীছাড়া টাইপ। আপনার ভাগ্নিই সঙ্গেই জেল খেটেছিল। কল্যাণী ওকে পুণ্যাশ্রমে রেখেছে। মেয়েটা গান গায় ভাল। চলুন, কিন্তু একটু সাবধানে কথা বলবেন।

ফিরে দাঁড়ালুম—সাবধানে কেন?

—চলুন না, নিজেই দেখবেন।—শোভা এগিয়ে গেলেন।

এ ঘরে তখন মস্ত আসর। দিদি, প্রিয়া, কমলা, অরুণার পাশে বরুণা এবং ওই নতুন মেয়েটি। অরুণা প্রথমেই বলল, একে আপনি দেখেছেন আপনার ভাগ্নির বিয়ের দিন। এর নাম সাধনা সেন।

হঠাৎ মেয়েটা সঙ্কোচ কাটিয়ে সহজ গলায় বলে উঠল, মহারাজ, সেদিন বিয়ের ভিড়ে তোমার পায়ের ধুলো নিতে গেলুম, তুমি হাত ধরে সরিয়ে দিলে!

সবাই হেসে উঠল ওর 'মহারাজ' সম্ভাষণ শুনে। শ্রীমতী শোভা একটু ক্ষুন্ন হলেন! বললেন, পাগলামি করিসনে। আমরা সবাই ওঁকে আপনি বলি, মা পর্যন্ত বলেন! আর তুই বললি, তুমি? ছি—

তাই বটে—সাধনা বলল, তোমরা ওঁকে কেউ দ্যাখোনি চোখ খুলে। আমি দেখলুম সেইদিন। কাছের মানুষকে তোমরা কাছে ডাকতে চাও না, তাই আপনি-আজ্ঞে বলে দূরে সরাতে চাও! মহারাজ, আজ তোমাকে আমি গান শোনাতে এসেছি!

আমি হাসছিলুম। কিন্তু লক্ষ্য করেছি, সবাই ওকে পাগল-ছাগল বলেই ধরে নিয়েছে। সকলের মুখেই কৌতুক পরিহাসের হাসি। সাধনা ওদের ওই হাসি গ্রাহ্যও করল না। নিজের মনেই সে গান ধরল।

"তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ ওগো ঘুমভাঙানিয়া/বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাক, ওগো দুখ জাগানিয়া—"

আমি অবাক হয়ে মেয়েটার কণ্ঠের আশ্চর্য সুরমাধুর্যের দিকে তাকিয়ে ছিলুম। ঘরসুদ্ধ এবার সবাই চুপ। মেয়েটার বয়স হবে বছর কুড়ি-একুশ। অরুণা-বরুণার চেয়ে বয়সে বড়। গায়ের রং মাঝারি, চোখ দুটো একটু যেন বন্যভাবের আভাস দেয়। সর্বাঙ্গে কণামাত্র অলঙ্কার নেই। স্বাস্থ্যটা সাঁওতাল মেয়ের মতো কঠিন। আমি হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলুম। আমার মন ছুটে গিয়েছিল কোনও এক দিনান্তকালের হিমালয়ে —যেখানে পাইনবনের তলায় তলায় সাবিত্রী আর আমার চিরবিচ্ছেদের বেদনা ফুঁপিয়ে উঠেছিল।

"আমায় পরশ করে প্রাণ সুধায় ভরে তুমি যাও সে সরে/বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাক ওগো দুখ জাগানিয়া।"

সন্দেহ নেই, সেদিন মেয়েটার গান শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম। ওর মুখে পর পর তিন-চারটি গান শুনে মনে হয়েছিল, ওর মন দেহতত্ত্বের দিকে ঘেঁষা। ও যখন একটি গানের অন্তরাতে ধরল, "ডাকিলে তারে যায় না পাওয়া, ভাবিলে বোঝা যায় না তারে/ শুধু কাঁদিলে তারে মিলিতে পারে/তেমন করে কাঁদতে পারে গো কজন—"

আমি ওর কণ্ঠের সুরলহরী শুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। বরুণা বলল, সাধনাদি কিন্তু হারমোনিয়ম বাজাতে জানে না, ও এমনিই গায়।

এতক্ষণ পরে আমি কথা বললুম, তুমি গান শিখেছ কার কাছে?

কে শেখাবে, মহারাজ?—সাধনা বলে উঠল, সব শুনে-শুনে শেখা। জেলে ছিলুম এক বছর তিন মাস, সবাই সেখানে গান গাইতে বলত। আমিও গলাটা শানিয়ে নিতুম।

জেলে গিয়েছিলে কেন?

হেসে উঠল সাধনা। বলল, ওই শুনুন না শোভাদির মুখে। ওঁদের দলের টেররিস্টদের পাল্লায় পড়ে হ্যান্ডবিল বিলি করছিলুম হাজরা পার্কে। আর যাবি কোথা? রেলিং টপ্‌কিয়ে পালাতে গেলুম কিন্তু গ্যাঁক করে পুলিস গলা টিপে

ধরল। কী ছিল হ্যান্ডবিলে, নিজেও পড়িনি। কিন্তু ওতেই বিচার হল—ছ'মাস জেল।

তাপপর ?

এবার কিন্তু সবাই হেসে উঠল। শোভা বললেন, ওর কোনও গুণে ঘাট নেই। জেলের মেট্রনকে মেরে জঞ্জালের বালতির মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল! তাইতে ওকে 'সলিটারি সেল'-এ রাখে ন' মাস।

সাধনা হেসে বলল, মেট্রন-মেয়েছেলেটাকে মেরেছিলুম কেন বললে না ত শোভাদি? আমার ওপর কি ধরনের অত্যাচার করেছিল ভুলে গেছ?

এই, চুপ কর,—তোর কি লজ্জাশরম কিছু নেই?—শোভা ওকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, ওর কথা ধরবেন না। ওর এতটুকু জ্ঞানগম্যি হয়নি!

দিদির সঙ্গে অন্য মেয়েরা হাসি চেপে উঠে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ অল্পবিস্তর সবাই জানে। সাধনা বলল, বাঃ শাস্তি পেলুম আমি আর লজ্জা পেলে তোমরা? শোন মহারাজ, আমি দুদিন ছট্‌ফট করেছিলাম যন্ত্রণায়—। পেটে লঙ্কাবাটা ঘষে দিয়েছিল!

শ্রীমতী শোভা রাগ করে উঠে গেলেন। ওঁরা বোধ হয় ভয় পাচ্ছিলেন, সাধনার মুখে কিছু আটকায় না। মেয়েটা না জানে সামাজিক ভব্যতা, না জানে পালিশ-করা কথালাপ। ওর সমস্ত আচরণটাই অমার্জিত।

পুণ্যাশ্রমে তুমি কতদিন আছ?

বোধ হয় মাস দুই হবে—সাধনা বলল, কিন্তু আমি কল্যাণীদিকে বলেছি, ওখানে আমার মস্ত অসুবিধে। আমি ওদের কেউ না। ওরা শুধু মেয়ে। আমি মেয়ে নই, মহারাজ।

সাধনার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। সে আবার বলল, বিশ্বাস করো মহারাজ, আমি মেয়ে নয়, মেয়ে হতে চাইনে! আমি তোমার মতন ছেলেই থেকে যেতে চাই—

কিন্তু তোমার দৈহিক লক্ষণগুলি আগাগোড়া যে মেয়ের! ওগুলো বাদ দেবে কেমন করে?

হেসে উঠল সাধনা। বলল, মহারাজ, এসব একটাও আমার নয়, এ হ'ল সেই কারিগরের! আমার মধ্যে আমি, সেই ত আসল আমি! তোমার ওই চোখ দুটোর মধ্যে দেখছি এক মেয়েকে, বলো ত সত্যি কিনা? তুমি তখন শোভাদির পেছনে-পেছনে ঘরে ঢুকলে, দেখলুম পা থেকে মাথা পর্যন্ত তুমি কোথাও পুরুষ নও! নিজেকে তুমি কতটুকু জানো মহারাজ?

মেয়েটা এসব কী বলে রে? আমি ওর কথায় যেন খোঁচা খাচ্ছিলুম। কিন্তু প্রথম আলাপ, সেজন্য আমি সতর্ক ছিলুম। শুধু বললুম, তোমার গান খুব ভাল লাগল। আরেকদিন শোনবার ইচ্ছে রইল।

না, মহারাজ—সাধনা বলল, পাঁচজনের পাঁচালির মধ্যে গান শুনতে চেয়ো না। তুমি

একা শুনবে, আমি একা গাইব! দল বেঁধে দরবারী গান। কিন্তু কাঁদতে গেলে একা বসে কাঁদো! সে-কান্না অনেক দূরে পৌঁছয়।

সে-গান কোথায় বসে শুনব?

সাধনা বলল, চুপ করে থাকো, আমি তোমায় খুঁজে বার করে নেবো।

ওদিক থেকে শ্রীমতী শোভা তাড়া দিচ্ছিলেন। উনি এদের জলযোগের আয়োজন করেছিলেন। শীতের বেলা পড়ে এসেছে।

এক সময় অরুণা-বরুণাকে সঙ্গে নিয়ে মেয়েটা চলে গেল।

একদা বিজলী আপিসে যাঁরা আমার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিলেন সেই দত্তবংশীয়রা এখন বৈবাহিক সূত্রে আমার কুটুম্ব মহলে পরিণত। এখন আমি এখানে মামাশ্বশুর এবং লাবণ্যপ্রভা এখন আমার বেয়ান। সুতরাং আমার আচার-ব্যবহার ও সর্বপ্রকার কথায় ও কাজে শালীনতা, শোভনতা ও সংযম থাকা দরকার। এখানে হাসি-পরিহাস বা চটুল-বাক্যালাপ অনেকটাই ইদানীং কমিয়ে দিয়েছি এবং আমার আনাগোনাও কতকটা কমেছে। আমার বিশ্বাস, এসব ব্যাপারে আমি ঈষৎ প্রাচীনপন্থী। কিন্তু আমার জীবন-বিধাতার বোধ হয় ইচ্ছা নয়, কারও প্রতি আমার অনুসন্ধিৎসু মন স্থির হয়ে থাকে! সেই কারণে আমার মন ছিন্নশৃঙ্খল হয়ে বেরিয়ে পড়ে একের মন থেকে অন্যের মনে। আমার দরকার, মন নিয়ে জানাজানি। আজ আমি উপলব্ধি করছি আমার মন, আমার চিন্তাধারা—সব সরে গিয়েছে সাবিত্রীর দিকে! আমি যেন তদ্ভাবে ভাবিতমৃ। তিনি আমাকে দেখিয়ে গেলেন শান্ত-শুচিতার পথ। তিনি যেন বলে গেলেন, নীল পদ্মের সন্ধান তুমি পাবে, যদি তুমি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহাকাশলোকে ভ্রমরের মতো অন্বেষণ করে বেড়াও!

সন্ধ্যার সময় শ্রীমতী শোভা পার্কে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন এবং আমাকে নিয়ে উনি বেরিয়ে এলেন। আমি চললুম পিছু পিছু। নিচে নেমে সদর দরজার বাইরে সরু গলিতে পড়ে উনি বললেন, গোয়েন্দার নজর থাকে, সাবধান। আমি আগে আগে যাব, আপনি হাঁটবেন খানিকটা ফাঁক রেখে। উনি আমাকে দেখাতে চান্ আধুনিক স্বাস্থ্যবতীরা কেমন করে হাঁটে।

ল্যান্সডাউন রোডে পড়ে উনি বাঁ হাতি বেঁকলেন। এ পথ নিরিবিলি এবং আলোকসজ্জা কম। শীতের শেষ দিক, রাত তখনও ঠাণ্ডা। কিন্তু ওঁর পরনে সুন্দর বাসন্তী রংয়ের খদ্দরের শাড়ি, ওতে ঠাণ্ডা লাগে না। উনি হাঁটতে হাঁটতে এসে বাঁ হাতি ছোট্ট পার্কে ঢুকলেন, তারপর আমাকে ডেকে বললেন, আসুন, এখানে একটু বসি।

মুখোমুখি আমরা বসলুম। উনি গায়ে ঢাকা দিলেন। পরে বললেন, এ শাড়ি আপনারই উপহার দেওয়া—বুলির বিয়ের নমস্কারী! এবার শুনুন, রমলা দেবী আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে গেছেন, আপনি অ্যাডভোকেট গিরিজানাথ মুখার্জির সঙ্গে একবারটি কথা বলবেন। তিনি কি এক প্রতিষ্ঠান গড়ছেন, সেখানে রমলা কাজ নিতে চান। ওঁর জন্যে আপনি নিশ্চয় চেষ্টা করবেন।

বেশ, কথা দিলুম।

শোভা বললেন, আচ্ছা, আপনার সেই হৃষীকেশে গিয়ে আশ্রম গড়বার আইডিয়া কোথায় গেল? সেই যে আমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন সেখানে?

হাসি মুখে বললুম, না, আমি শূন্যে ফানুস ওড়াবার কথা ভেবেছিলুম! বরং আপনি যদি পারেন আপনার সেই পুরীর আশ্রম-জীবনে ফিরে যান।

আপনার এ কথার মানে কি?

মানে আমার কাছে স্পষ্ট, আপনি হয়ত স্বীকার করবেন না।

কী শুনি?

আমি এই রক্তবিপ্লবের ভবিষ্যৎ কিছু খুঁজে পাচ্ছিনে। কোথায় যেন অঙ্কের ভুল থেকে যাচ্ছে। কয়েকজন ইংরেজকে খুন করলে ভয়ে তারা দেশে ছেড়ে পালাবে, এ আমার মনে হচ্ছে না।

শ্রীমতী শোভা হেসে উঠলেন। তাঁর দেশাত্মবোধের বৈপ্লবিক আদর্শে তিনি শুধু অবিচলই নন, ইস্পাতের ফলার মতো তিনি কঠিন। পরিত্রাণায় সাধুনাং এবং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং—এই ধর্মনীতিবোধ তাঁকে সর্বক্ষণ অনুপ্রাণিত করে চলেছে। আমার সামান্য দু'একটা কথায় তাঁর তিলমাত্র বিচলিত ভাব আসবে না। বলা বাহুল্য, ও'র ওই অটলতাই আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে! আমাকে উনি বার বার খোঁটা দিয়ে সেই একই কথা বলেন, বারীনদা ঠিকই বলেছিলেন! আপনি মনে মনে গান্ধীর চেলা!

আমি রাগ করে বললুম, তা হতে পারে। কিন্তু গান্ধীর পথে বরং কিছু আলো পাই, আপনাদের পথ অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে।

শ্রীমতী শোভা চুপ করে কি যেন ভাবলেন। পরে বললেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, স্পষ্ট জবাব দেবেন। দেবেন ত?

বলুন—

কম-বেশি মাস ছয়েক হতে চলল, আপনার মনোভাব একটু বিগড়েছে, এ কি সত্যি?

এর জন্যে আপনিই দায়ী।—আমি বললুম, আপনাদের বাড়ির কয়েকটি অপ্রিয় ঘটনার কথা আপনিই আমাকে বলেছেন।

উনি বললেন, এই সব কারণেই আমরা শীগগিরই বাড়ি বদলাচ্ছি, আপনি কি জানেন?

জানি—আমি বললুম, আপনারা অনেক বড় বাড়ি ভাড়া নিচ্ছেন এবং আপনাদের অবস্থা ফিরে যাচ্ছে! আপনারা কোন্ কোন্ দোকানে ফার্নিচার অর্ডার দিয়েছেন, তাও আমার জানা! চলুন, এবার উঠি—

আপনি ত সাংঘাতিক লোক?—এই বলে উনি হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালেন।

এবাব উনি প্রায় আমার গা ঘেঁষে চললেন, কারণ সন্ধ্যার পর থেকে এ পাড়ার চেহারাটা খারাপ হতে থাকে। আমি যখন ও'কে ও'র বাড়ির গলিতে ছেড়ে চলে যাচ্ছিলুম উনি বললেন, না, এখন যাওয়া হবে না। ওপরে চলুন—

কথায় কথায় চিঠি চালাচালি করা আমার ধাতে নেই। ও আমি পারিনে। রমলা দেবীর চিঠি একের পর এক পাচ্ছিলুম, কিন্তু প্রতি চিঠির জবাব দেবার দায় আমি স্বীকার করিনে। সুতরাং শ্রীমতী শোভার নির্দেশমতো এবং আমার সুবিধামতো ভবানীপুরের বকুলবাগানের ওদিকে একদিন বিকালের দিকে শ্রীমতী লাবণ্যলতা চন্দর বাসস্থানে গিয়ে উপস্থিত হলুম। এখানে থাকেন রমলা।

শ্রীমতী লাবণ্যলতা একজন প্রসিদ্ধ সমাজসেবিকা। তাঁকে এবং রমলা দেবীকে বাড়ির নিচের তলাতেই পাওয়া গেল। লাবণ্যলতা আমার চেয়ে কিছু বয়োজ্যেষ্ঠা এবং আমাকে উনি নামে চেনেন। উনি অবিবাহিতা, এবং ওদিক থেকে সম্ভবত তিনি ব্রতচারিণী। কিন্তু আমি ঠিক জানিনে, সম্ভবত রমলা ওঁকে আমার সম্বন্ধে এমন কিছু বলে থাকবেন, যার জন্য লাবণ্যলতা প্রথমেই আমাকে বললেন, রমলাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করা আপনারই দায়িত্ব এবং আপনারই কর্তব্য।

লাবণ্যলতা একজন বিশেষ শ্রদ্ধেয়া মহিলা। কিন্তু তাঁর মুখ থেকে একপ্রকার প্রচ্ছন্ন উপদেশ শোনবার জন্য আমি আসিনি, সেজন্য আমি দুঃখিত বোধ করলুম। ওঁর সঙ্গে এই আমার প্রথম আলাপ। কিন্তু এইটুকুতেই আমার মনে হল উনি কতকটা 'প্রেজুডিস্ট' হয়ে আছেন। আমি হাসিমুখে বললুম, ক্ষমা করবেন, আপনার তুলনায় আমি সামান্য ব্যক্তি। কিন্তু আমি আমার কর্তব্য ও দায়িত্বের শিক্ষা নেবার জন্য গাড়িভাড়া খরচ করে এতদূরে আসিনি। আমার অন্য কাজ ছিল।

রমলা দেবী নতমুখে বসে ছিলেন। বুঝতেই পারছিলুম আমাকে জড়িয়ে এই অপ্রিয় পরিস্থিতি তিনিই সৃষ্টি করেছেন।

লাবণ্যলতা ঈষৎ জোর দিয়েই বললেন, আপনাব সঙ্গে রমলার তিন বছরের ঘনিষ্ঠতা। অথচ উনি যখন আজ এইভাবে বিপন্ন বোধ করছেন, তখন আপনার নিশ্চয়ই উচিত ওর পাশে দাঁড়ানো।

ক্ষমা করবেন, শ্রীমতী চন্দ—আমি বললুম, ঘনিষ্ঠতার কথা একেবারেই সত্য নয়। কিন্তু আপনার বাড়িতে বসে আপনাকে কঠিন বাক্য বলে যাওয়া আমার রুচিতে বাধে। আমাকে না জেনে আমার প্রতি আপনি অহেতুক বিরক্তি পোষণ করছেন এ আমি জানতুম না। আচ্ছা, আজ উঠি।

না না, বসুন, রাগ কববেন না—আমি আপনাদের ভালোব জন্যই বলছি—

কে আমরা?—ক্ষুব্ধ কণ্ঠে আমি বললুম, কতটুকু আমাদের চেনা-জানা? ওঁর প্রতি আমার কিসের কর্তব্য? কেনই বা দায়িত্ব পালনের কথা ওঠে? আমাকে ওঁর সমস্যায় জড়াবারই বা এ চেষ্টা কেন? এ সব দুর্বোধ্য প্রশ্ন রয়েছে আমার সামনে! ইংরেজী 'ব্ল্যাক-মেইল' কথাটার বাংলা আমি জানিনে, কিন্তু ওটা যদি আমার মনে আসে, ক্ষমা করবেন। আচ্ছা নমস্কার—

আমি উঠে দাঁড়ালুম। আমার গায়ে জ্বালা ধরেছিল। পুনরায় বললুম, আর একবার ক্ষমা করবেন, মিস চন্দ। শুনেছি আপনি একজন বিশিষ্ট সমাজসেবিকা। তা

হবে। তার মেয়ে-সমাজে এ ধরণের লেকচার আপনি দিতে পারেন যে, বেশি বয়স পর্যন্ত কুমারী হয়ে থাকলে মেয়েরা অনেকে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে!—নমস্কার—

আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলুম।

সোজা হাঁটতে হাঁটতে এসে ট্রাম রাস্তা পেরিয়ে ভবানীপুর থানায় দাঁড়িয়ে যখন বাসের জন্য অপেক্ষা করছি, দেখি রমলা দেবী আমাকে একপ্রকার দ্রুতপদে অনুসরণ করে বড় রাস্তা পেরিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। আমি বললুম, দেখুন, এ সব বাজে বিতর্কের মধ্যে আমাকে টানাটানি করবেন না! আপনাকে আবার বলছি, আপনি মরীচিকার পিছনে ছুটছেন। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি মালদায় বা বগুড়ায় আপনার বাবার কাছে ফিরে যান।

সেই লোক-চলাচলের মধ্যে দাঁড়িয়ে রমলা বললেন, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন থাকলে আমার অনেক সমস্যার সুরাহা হয়ে যায়।

আমি অপ্রসন্ন কে বললে? কিন্তু আমি জড়িত হতে পারব না আপনার সমস্যায়। আমি স্পষ্টই বলি, কোনও মহিলা আমার পিছু নেন, এ আমার পছন্দ নয়। আপনার এবং আমার পথ এক নয়।

রমলা কি যেন ভাবলেন, পরে বললেন, আপনি দয়া করে আমাকে গিরিজা মুখার্জির ওখানে একবারটি নিয়ে চলুন, তিনি আপনাকে ভালোই চেনেন। তাঁর প্রতিষ্ঠানে আমি হয়ত একটা কাজ পেতে পারি। আপনার একটু সময় হবে কি?

চলুন দেখি—। আমার মনে বেশ বিরক্তি ছিল।

চক্রবেড়িয়ায় এসে গিরিজাবাবুর বাড়িতে ঢুকলুম। উনি বোধহয় জানতেন আমি আসব। তখন সন্ধ্যাকাল। এক প্রবীণ বয়সী ভদ্রলোক সামনে এসে বিশেষ সমাদর সহকারে আমাদেরকে অভ্যর্থনা করে বসালেন। উনি আমার কিছু কিছু রচনার সঙ্গে পরিচিত এবং একটা বিশেষ সূত্র ধরে এইভাবে আমার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটবে, এ তিনি আশা করেননি। উনি ওঁর স্ত্রীকে ডাকলেন এবং আমাদের জলযোগের আয়োজন করলেন।

শ্রীমতী রমলা গিরিজাবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই আলাপ আলোচনা করতে বসলেন। আমি পাশেই বসেছিলুম। কিন্তু ওই মহিলা প্রথম থেকেই যেভাবে আমাদের উভয়কে নিরীক্ষণ করছিলেন, সেটি আমার পক্ষে যথেষ্ট আনন্দদায়ক হচ্ছিল না। ওঁর চোখের মধ্যে বিশেষ এক অনুমানের আভাস ছিল।

গিরিজাবাবুরা মেদিনীপুর জেলায় একটি প্রতিষ্ঠান গড়তে যাচ্ছেন, যার প্রধান উদ্দেশ্য যে-সমস্ত শিশু-বালক-বালিকা মানসিক পঙ্গুতায় জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, তাদেরকে ওই প্রতিষ্ঠানে রেখে প্রতিপালন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। তিনি নিজে হাজার কয়েক টাকা নিয়ে নামছেন এবং সরকারী সাহায্যের জন্য ইতিমধ্যেই আবেদন করেছেন। প্রতিষ্ঠানটির নাম হবে 'বোধনা নিকেতন'!

আমি উৎসাহ বোধ করলুম এবং গিরিজাবাবুর নিকট আবেদন জানালুম, শ্রীমতী

রমলা রায়কে যদি উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গভর্ণের্স বা মেট্রন নিযুক্ত করেন, তবে আপনাদের পরিচালনা ব্যবস্থার সুবিধা হয় কিনা।

গিরিজাবাবু খুশী হয়ে বললেন, আপনার প্রস্তাব উত্তম। তা ছাড়া আপনি নিজে যখন রমলা দেবীকে সঙ্গে করে এনেছেন, তখন ওঁকে অবশ্যই নেবো 'বোধনা নিকেতন'-এ।

॥ ৩৯ ॥

১৯৩২ সাল শেষ হল। এই বছরটাকে কাবার করতে আমার হাড়ে দুর্বো গজিয়ে গেল। ইংরেজিতে বলে, যে পাথর গড়িয়ে যেতে থাকে, তার গায়ে শ্যাওলা ধরে না! কিন্তু আমি যখনই কলকাতায় স্থাণু হয়ে যাই, তখনই আমার পায়ে-পায়ে জঞ্জাল জমে ওঠে। আমি একদম বেকার, তাই আমাকে দিয়ে নানান কাজের টানাটানি। আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলুম।

কনকনে ঠাণ্ডায় দার্জিলিঙে কেমন বরফ পড়ে, এ দৃশ্য আমার দেখা দরকার। দার্জিলিঙে আসল ঠাণ্ডা জানুয়ারীতে আরম্ভ। কিন্তু দার্জিলিং আমার অতি পরিচিত। বছরে দুবার প্রায়ই আসি। ওখানে আমার কুটুম্ব মন্মথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের এক-চেটিয়া মোটর যানবাহনের কারবার। তাঁর প্রতিষ্ঠানের নাম 'দার্জিলিঙ মোটর সার্ভিস'। নানা ধরণের মোটর কার, প্রাইভেট ট্যাক্সি, লরী ও ট্রাক, মোটর বাস ইত্যাদি সামগ্রির মালিক তিনি। বাংলার বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁকেই চেনেন। দার্জিলিঙে তাঁর তিন-চারখানা বাড়ি, কয়েকটি গ্যারেজ, একটি অতিথি ভবন ইত্যাদি। তিনি ফিটফাট সাহেব। কয়েকটি নাবালক ছেলেমেয়ে তাঁর। তারা সবাই আমার নাতি-নাতনী সুবাদ। চৌধুরী সাহেবের বাড়ি চাঁদমারি বাজারের সামান্য একটু নিচে—লাইব্রেরি আর থিয়েটার হলের সামনে। উনি আমার জামাই সুবাদ হলে কি হবে,—আমার বাপ-খুড়োর বয়সী উনি। এমন সজ্জন, মিষ্টভাষী, অমায়িক এবং অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি তখন দার্জিলিঙে কমই ছিল। আমার বাঁধা বরাত ছিল ওঁর বাড়িতে। এর ওপর উনি ছিলেন বিলেতী চালচলনের একনিষ্ঠ অনুরাগী। সাহেবী লাঞ্চ বা ডিনারে যখন তখন তাঁর ডাক পড়ত।

জলাপাহাড় ও বার্চ হিলের ডগায় তখন জুঁই ফুলের মতো তুষারপাত হচ্ছিল। টাইগার হিল তখন বনময় পথ। ঘুম-শহরে ঠাণ্ডা প্রচুরতরো। দার্জিলিঙে তখন আমাদের তরুণ কবিবন্ধু ও সৌম্যদর্শন অচ্যুত চট্টোপাধ্যায় ওকালতি প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছে কিনা আমার মনে পড়ছে না।

আমার চেষ্টা ছিল দার্জিলিং দিয়ে নেপালের কাঠমাণ্ডু শহরে পেঁছানোর সহজ পথ আছে কিনা এটির খোঁজ-খবর নেওয়া। তখন কোনও মতে থার্ড ক্লাসের টিকিট কেটে শিয়ালদা থেকে রওনা হওয়া! ট্রেন যেত তখন কুষ্টিয়ার ভিতর দিয়ে সাঁড়া ব্রিজ পেরিয়ে পার্বতীপুর হয়ে সোজা শিলিগুড়ি। যাতায়াত মিলিয়ে টাকা পনেরোর মধ্যে দার্জিলিং ভ্রমণ আমার হয়ে যেত। তখন আর্থিক দারিদ্র্য ছিল প্রচুর, কিন্তু খাদ্য-সামগ্রীর প্রাচুর্যে দেশ ভরে থাকত। দৈনিক জীবনযাত্রা কোথাও জটিল সমস্যায় কণ্টকাকীর্ণ ছিল না। ছিল শুধু অনড় অবিচল অর্থাভাব।

দিন দশেকের মধ্যে ফিরে এলুম কলকাতায়। পরবর্তী কয়েক দিনের ভিতরে তিন-চারটে ছোট গল্প লিখে ফেললুম। ওগুলো হাতে থাক। ওরই ভিতরে হঠাৎ একদিন এক যুবক এসে হাজির। তাঁর নাম অক্ষয়কুমার সরকার। তিনি এক সাপ্তাহিক বার করেছেন বা করছেন। নাম খেয়ালী। তাঁর কণ্ঠস্বর একটু মেয়েলী ধরনের। আমার কাছে তাঁর আসবার খেয়াল কেন চাপলো—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বিশদভাবে তাঁর বক্তব্য বর্ণনা করলেন। তাঁর সম্পর্কে মামা হলেন সুভাষচন্দ্র বসু এবং তাঁরই রাজনীতিক আদর্শের অনুপন্থী হল এই 'খেয়ালী'। সম্প্রতি সুভাষচন্দ্র বন্দী অবস্থায় ভাগিনেয়কে এক পত্রে জানিয়েছেন, অমুক অমুক লেখকের কাছ থেকে লেখা নাও, এবং তাদেরকে পারিশ্রমিক দাও—সে যত সামান্যই হোক। আমি নাকি সেই প্রস্তাবিত লেখকদের অন্যতম। বলা বাহুল্য, আমি অক্ষয়বাবুর অনুরোধ স্বীকার করে নিলুম এবং কথা দিলুম, প্রতি সপ্তাহের 'খেয়ালী' সাপ্তাহিকে আমি ছোট ছোট ভ্রমণ-কাহিনী লিখব এবং প্রতি কিস্তির জন্য ওঁরা আমাকে দশটি করে টাকা দেবেন। মন্দ নয়, সুভাষবাবুর একখানা চিঠিতে আমার অবস্থা ফিরে গেল। পরবর্তীকালে এই ছোট ছোট লেখা একত্র করে যে বইখানা ছাপা হয়, তার নাম 'দেশ-দেশান্তর'। যাই হোক, অক্ষয়বাবুকে কথা দিলুম, নেপাল থেকে ফিরে আপনাকে জানাব, কবে আমি লিখতে আরম্ভ করব।

সুভাষবাবু সম্বন্ধে এখানে দু-এক কথা বলি। তিনি দীর্ঘকাল ধরে ব্রিটিশ ভারত গভর্নমেণ্টকে 'জ্বালিয়ে পুড়িয়ে' খাচ্ছিলেন! এই সম্প্রতি কিছুকাল আগে (১৯৩০) তিনি কলকাতার জেলে আমরণ উপবাস আরম্ভ করেছিলেন। চারিদিকে হই-চই, ইঁট-পাটকেল, লাঠি চার্জ, ১৪৪ ধারা! তখন কাঁদানে গ্যাস জন্মায়নি। কিন্তু এত বড় স্পর্ধা 'ব্রিটিশ কুক্কুরের' যে, নব্য বাঙ্গলার তারুণ্যের প্রতীক সুভাষচন্দ্র তাদের অত্যাচারে না খেয়ে মরবেন? সুতরাং আলীপুরে সেণ্ট্রাল আর প্রেসিডেন্সী জেলের চারিদিক ঘিরে নব্য বাঙ্গলা দিবারাত্র চিৎকার করতে লাগল, বন্-দে-এ মাতরম্!

১৯৩০-এ সুভাষচন্দ্রের অনশন কালে অনেকের সঙ্গে একে একে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী শোভা জেলে গিয়ে সুভাষবাবুকে খাদ্যগ্রহণে রাজি করানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র ভিন্ন ধাতুর তৈরী, ওঁরা বুঝতে পারেননি। শ্রীমতী শোভা সেদিন সুভাষচন্দ্রের সামনে খুব কান্নাকাটি করেছিলেন। কিন্তু মোমবাতির আগুনে লোহা গলেনি! অতঃপর সম্পূর্ণ নয় মাস পরে সুভাষচন্দ্র মুক্তিলাভ করেন।

আমি জানতুম, তৎকালীন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ একটি নিগঢ়ে কারণে বিপ্লববাদিনী শোভাকে জেলের মধ্যে ঢ়ুকে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একান্তে দেখা-সাক্ষাতের অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সেই চাতুরী ব্যর্থ হয়! শ্রীমতী শোভার ওখানেই এ কথাটি শুনেছিলুম।

আমার সঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় সেটি ১৯৩১, যখন বাঙ্গলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদে সুভাষচন্দ্রকে বসাবার জন্য তুমুল হই-চই ওঠে। বাঙ্গলা কংগ্রেস হবে গান্ধীপন্থী, না সুভাষচন্দ্রের কর্মধারাপন্থী? সুতরাং আত্মকলহ ও উত্তেজনাপ্রিয় বাঙ্গালী সেদিন কাগজে কাগজে উভয়পক্ষের প্রচারকার্যের রস পেতে লাগল। সুভাষচন্দ্রকে ভোটে জিতিয়ে দেবার জন্য শ্রীমতী শোভা প্রচুর সংখ্যক কংগ্রেস সভ্য সংগ্রহ করেছিলেন। সেই আমি প্রথম কংগ্রেসের চার-আনার প্রাথমিক সভ্য হই। সেই বছরেই প্রথম বুঝতে পারি, সাহিত্যকর্মীর পক্ষে রাজনীতি স্বাস্থ্যকর নয়। সেবার সুভাষচন্দ্রই জয়লাভ করেন।

আমার পক্ষে তখন স্বস্তির কারণ ছিল এই, শ্রীমতী রমলা আমাকে মুক্তি দিয়ে 'বোধনা নিকেতন'-এ কাজ নিয়ে চলে গেছেন। সেখানে তিনি মাসিক হাতখরচ তিরিশ টাকা করে পাবেন। গিরিজা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে আমাকে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ওঁদেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে হয়েছিল। কিন্তু আসলে অনুরোধটি ছিল রমলার—ওটা গিরিজাবাবুর মুখ দিয়ে এসেছিল।

ওঁরা যে-অঞ্চলে গিয়ে 'বোধনা নিকেতন' প্রতিষ্ঠা করলেন, সে অঞ্চল আমার বিশেষ পরিচিত। এটি ঝাড়গ্রামের কাছাকাছি। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে আমি স্থির করেছিলুম, কলকাতা থেকে দূরে কোথাও গিয়ে নিরিবিলি কোনও বনপ্রান্ত খুঁজে নিয়ে এক আশ্রম বানাবো! পাশে থাকবে জলাশয়, সেখানে ফুটে থাকবে রক্তকমলের দল। আশ্রমের উপান্তে হরিণ ছুটবে, ময়ূর চরবে পেখম মেলে এবং 'কোকিলের কুহু রবে আতুর হবে মধ্যাহ্ন।'

সুতরাং আমার এই আশ্রম রচনার সহায়স্বরূপ সাঁতরাগাছি থেকে আমার ভাগিনেয় সম্পর্কে বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রীমান ধনুকে সঙ্গে নিয়েছিলুম। ধনুরা লৌহ ব্যবসায়ী এবং ধনাঢ্য। কিন্তু সে মামার উপযুক্ত ভাগে। সে বলল, আমি দেবো তোমার আশ্রম রচনার উপযুক্ত জমি। মেদিনীপুর জেলায় আমাদের অনেক জমি আছে। আগে চলো ঝাড়গ্রামে। সুতরাং ধনুর প্রস্তাবে সেই প্রথম গেলুম ঝাড়গ্রামে। তখন ঝাড়গ্রামে অন্ধকারের যুগ। স্টেশনের পাশে বড় বড় শালগুঁড়ির আড়ৎ। চারিদিক জুড়ে আছে অরণ্য। জনবসতি অতি সামান্য। আদিবাসী, সাঁওতালী আর জংলীদের দেখা যায় এখানে ওখানে। পূর্বদিক ধরে একটি পথ গিয়েছে রাজবাড়ির দিকে। রাজার নাম নরসিংহ মল্লদেব 'উগলষণ্ড'। রাজ-এস্টেটের ম্যানেজার হলেন দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। সেইকালে আমি দেবেনবাবুর সঙ্গে গিয়ে রাজার সঙ্গে আলাপ করি এবং আমার মনের কথা বলি। রাজা অতি অমায়িক, সুভদ্র, বন্ধুবৎসল এবং হাস্যপ্রিয়। লক্ষ্য করলুম

তিনি প্রায় আমারই সমবয়সী। তিনি আমাকে এই কাছাকাছি একশ' বিঘা শালবন বিনামূল্যে দিতে চাইলেন। তবে দেবেনবাবু জানালেন, প্রতি বিঘায় আমাকে মাত্র তিন টাকা বাৎসরিক খাজনা দিতে হবে। বন্দোবস্ত হবে চিরস্থায়ী। আমরা জলযোগ সেরে উঠে এলুম।

আমি তখন সর্বহারা। বছরে তিনশ' টাকা খাজনা জোগাব কোত্থেকে? সুতরাং সেলাম ঠুকে সেবার পালিয়ে বাঁচলুম। মাথায় থাক আমার আশ্রম!

যাই হোক, এই ঝাড়গ্রামেরই কাছাকাছি রেলপথের নিকটবর্তী জঙ্গলের ধারে গিরিজাবাবু তাঁর 'বোধনা নিকেতন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ওখানেই 'বোধনা হল্ট' নামক একটি স্টেশনও কালক্রমে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু গিরিজাবাবুর ভাগ্য ছিল বিরূপ। একদা সেই 'বোধনা নিকেতন' ও 'বোধনা হল্ট' কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেল। একালে ওটার নাম হয়েছে 'বাঁশতলা'। ওটা রাজ-এস্টেটেরই অন্তর্গত। আমার সেদিনের রোমান্টিক রসকল্পনাও ওই শালবনের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেছে!

'চিত্রমন্দির'-এর রতিকান্ত পালিতকে সঙ্গে নিয়ে যখন শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে পশুপতি-নাথ তীর্থে যাব স্থির করেছি এবং এই তীর্থযাত্রায় যাতায়াতের রাহাখরচ ও খাইখরচ সব মিলিয়ে মোট টাকা ত্রিশেকের বেশি লাগবে কিনা—এই সব নিয়ে যখন তাঁর ফটো-গ্রাফির কেন্দ্র দোতলায় ক'দিন ধরে আলোচনায় বসেছি, তখন একদিন হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন শ্রীমতী কল্যাণী দাস এবং তাঁর সঙ্গে সেই সুগায়িকা মেয়েটি যার নাম সাধনা। স্পষ্টত, আমার এই আড্ডার ঠিকানাটা কল্যাণী পেয়েছেন শ্রীমতী শোভার কাছে। কল্যাণী দাস তখনও 'ভট্টাচার্য' হয়ে ওঠেননি।

সাধনা আমাকে দেখামাত্রই উদ্দীপ্ত হয়ে বললে, মহারাজ, মনে আছে? সেই প্রথম দিন যে বলেছিলুম, তোমাকে আমিই খুঁজে নেবো—সে কথা কি ভুলেছ?

আমাকে একপ্রকাব নিকট-সম্ভাষণ করে 'তুমি' বলছে একজন মেয়ে, এটি কল্যাণী বা রতিবাবুর পক্ষে অভাবনীয় ছিল। ওঁরা দুজনেই অবাক হলেন। কিন্তু আমি হাসি-মুখে বললুম, না, ভুলিনি। তোমার সেই প্রথম গানটিও ভুলিনি।

মিষ্টভাষিণী ও শান্তমুখী কল্যাণী সহাস্যে বললেন, আপনি কিছু মনে করবেন না, সাধনা অমনি করেই কথা বলে। ও একটু পাগল!

কিন্তু গানগুলো তো ঠিক পাগলের গাওয়া নয়?

উচ্চকণ্ঠে হেসে আনন্দে ও উল্লাসে সাধনা আমাদেরকে যেন প্রাণবন্ত করে তুলল। রতিবাবু এমন নতুন ধরনের মেয়ে দেখে ঈষৎ হতচকিত। আমি বললুম, হঠাৎ এলেন যে? কিছু বলবার আছে?

হ্যাঁ, বিশেষ জরুরী—কল্যাণী তাকালেন রতিবাবুর দিকে।

ইঙ্গিতটি বুঝে আমি রতিবাবুকে বললুম, আপনার কাজ রয়েছে অনেক ডার্করুমে। মিনিট পনেরো সময় দিচ্ছি, কাজ সারুন গে।

ইঙ্গিত রতিবাবুও বুঝলেন, এবং তিনি ডার্ক-রুমের দিকে চলে গেলেন।

এবার কল্যাণী বললেন, ধরুন, কল্পনা করুন, আপনাদের এই হলটায় প্রায়ই

লেখকরা আসেন! অন্নদাশঙ্কর, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত সেনগুপ্ত, শৈলজাবাবু—সবাই আসেন! আমরা কেউ কেউ যদি এখানে আনাগোনা করি, সে শুধুমাত্র আপনাদেরকেই দেখবার জন্যে। সুতরাং পুলিশ যদি কিছু জানতে চায়, এইটিই জানবে! আপনারাও সেটি মনে রাখতে পারবেন।

বেশ, তারপর?

আপনাদের ঠিক সামনে ট্রাম রাস্তার ওপারে 'চিত্রা' সিনেমার ঠিক অপোজিটে যে উঁচু বাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন, ওর টপ ফ্লোরে একটি ছেলে এসে থাকবে, আপনি তাকে জানেন।

আমার গা একটু রোমাঞ্চ হল। উনি না বললেও বুঝতে পারছি, উনি দীনেশ মজুমদারের কথা বলছেন। সে এখনও পলাতক অবস্থায় টালিগঞ্জে রয়েছে, এবং যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

বললুম, সে দক্ষিণ ছেড়ে উত্তরে আসতে চায় কেন?

সে চায় না—কল্যাণী বললেন, আমরা চাইছি! ওখানে ডাক্তার আর ওষুধপত্র আনা-নেওয়ার জন্য একটু জানাজানি হয়েছে আশেপাশে। ওকে শীঘ্রই সরানো দরকার, দিনের বেলায় ওর খাবারের বন্দোবস্ত হয়েছে এই নতুন জায়গায়। কিন্তু ওর রাত্রের খাবারটা পেঁৗছিয়ে দিয়ে যাবে সাধনা। টিফিন ক্যারিয়ারে আনবে, আবার ওটা খালি করে ফেরত নিয়ে যাবে। সাধনা হয়ত মাঝে মাঝে আপনাদের এখানে আসতে পারে। রান্না করা খাবার আমাদের বালীগঞ্জের বাড়ী থেকেই পাঠাবে।

বললুম, কিন্তু রতিবাবু আর আমি দু'জনে শীঘ্রই যাচ্ছি নেপালে—কিছুদিন আমরা এখানে থাকব না—

সাধনা বলল, নেপালে যাচ্ছ? কেন মহারাজ?

আমি হাসলুম—মাঝে মাঝে মাঝে আমাকে ভূত ছাড়াতে যাচ্ছি।

কিভাবে যাবে?

হাসিমুখে বললুম, ভাগ্যবিধাতা দু'খানা ঠ্যাং দিয়েছেন, এরই ভরসা। লোটা-কম্বল নিয়ে তীর্থে বেরিয়ে পড়ব।

কল্যানী বললেন, আবার যাচ্ছেন পাহাড়ের দেশে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটা আমার নেশা। সে যাই হোক, আপনারা যা ব্যবস্থা করবেন তাই হবে। এখানে অবশ্য কেউ-না-কেউ থাকবে। সাধনা মাঝে মাঝে এসে দু-এক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে যেতে পারবে।

অসুস্থ দীনেশ সম্বন্ধে কথাবার্তা স্থির হবার পর আমি ধরে বসলুম, সাধনা, তোমার সেই সেদিনের গানের কথা আমি ভুলিনি। আজ একটা গান গেয়ে শুনিয়ে যাও না কেন?

হেসে উঠল সাধনা। বলল, মহারাজ, তুমি আমাকে খুনী মেয়ে বলেই ধরে নিয়েছ। কিন্তু সেদিন তোমার চোখের মধ্যেই আমার গানের সুখ্যাতি দেখেছিলুম।

আচ্ছা, আজ পুরনো একটা গান শোন—বলতে বলতে সাধনা গুনগুনিয়ে একটা গান ধরল— "নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে/তারই মধু কেন মন-মধুপে খাওয়াও না—"

গান শুনে রতি পালিত এসে অদূরে দাঁড়ালেন। কল্যাণী নতমুখে চুপ করে রইলেন। আমি গায়িকার কণ্ঠে আন্তরিক ব্যাকুলতার আর্তকণ্ঠ শুনতে পাচ্ছিলুম। মেয়েটা যখন উচ্চতানে ধরল, "বিশ্বকমল ফুটে চরণ চুম্বনে/সে যে তোমার মুখে মুখ তুলে চায় উন্মনে/আমার চিত্তকমলটিরে সেই রসে কেন তোমার পানে নিত্য চাওয়া চাওয়াও না ?"

সবাই বলবে মেয়েটা জাত আর্টিস্ট, তা বলুক। আমি নিজে সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ নই। কিন্তু আমার দুই কানের মধ্য দিয়ে মেয়েটার সুরমাধুর্যের আকুলতা যেন মর্মের মধ্যে ঠাঁই নিল। ওর গানের সঙ্গে নামটিও মেলে।

এবার আমি বললুম, কল্যাণী দেবী, পুণ্যাশ্রমে এত মেয়ে থাকতে আপনি একে নিলেন কেন আপনাদের এই কঠিন কাজে ? অথচ সেদিন শুনে এলুম, সাধনাকে অনেকে পাগল ঠাওরায় ?

শ্রীমতী কল্যাণী সস্নেহে সাধনার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, ওকে পাগল বললে ও খুশী থাকে ! আমি জানি সাধনা আমার সবচেয়ে বিশ্বাসী আর সবচেয়ে দুঃসাহসী !

সাধনা এবার খুব হেসে উঠল। বলল, আমিই বলছি মহারাজ। মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানো ? আমার মধ্যে পুরুষের পরিমাণ বেশি !

রতিবাবু পর্যন্ত হেসে উঠলেন। বললেন, কিন্তু গানে যে আপনি এক দুর্লভ মেয়ে, আপনি মহাবিদ্যা ! আপনার তুলনা আমি দেখিনি।

ওঁরা দু'জন সেদিন বিদায় নেবার আগে আমি বলে দিলুম, আমাদের যাবার এখনও দিন কয়েক দেরি। তবে ফিরে আসতে আমাদের হপ্তা তিনেক লাগবে।

অতঃপর কয়েকদিন আমি লেখাপড়ার কাজ নিয়ে বসে গিয়েছিলুম। 'ভারতবর্ষ'-এ এ মাস থেকে আমার কেদার-বদরী নিয়ে লেখা ভ্রমণকাহিনী ছাপা হচ্ছে। ওটার নাম দিয়েছি 'মহাপ্রস্থানের পথে'। ওটা যেন আমার আগাগোড়া মুখস্থ, সেজন্য অনর্গল ঝরঝরিয়ে লিখে যাচ্ছি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তিও 'ভারতবর্ষ' অপিসে গচ্ছিত করে দিয়ে যাবার চেষ্টা রয়েছে। ওর উপরে আরও গোটা দুই ছোট গল্প লেখার ফরমাস আছে। টাকাকড়ি কিছু পাব নিশ্চয়ই। কিন্তু যাবার আগে অনেক রকমের খরচা চালিয়ে হয়ত দশ-পনেরো টাকা হাতে থাকবে। ওতে দু'পিঠের রাহাখরচ ত দূরের কথা। মোকামায় গিয়ে গঙ্গা পার হবো, তারপর উত্তর বিহারের ভিতর দিয়ে সগৌলি। সেখান থেকে আবার রক্সোল। তারপর বীরগঞ্জ, অমলেকগঞ্জ ভীমপেড়ি। অতঃপর পাহাড়ের পর পাহাড়।—লিখতে লিখতে আমি ভাবছিলুম, হয় পথে ঘাটে অর্থাভাবে না খেয়ে মরব, আর নয়ত বাগমতীর ঠাণ্ডা জল খেয়ে বাঁচব ! কিন্তু যেতে আমাকে হবেই। হিমালয় টানলে অন্য কিছু আর আমাকে

টানে না!

শিবরাত্রির আর কয়েকদিন মাত্র বাকি। সুতরাং দিন আষ্টেক পরে রতিবাবুকে একবারটি তালিম দিতে গেলুম। আজ মঙ্গলবার, সামনের শুক্রবারে আমাদের যাত্রা। এবার তৈরি হোন, মশাই।

রতিবাবু দেখি হাসিখুশীতে গদগদ। বললেন, বলি বলি ওহে মশাই, ওই গাইয়ে মেয়েটার কানে আপনি কী বীজমন্ত্র ফুঁকেছেন বলুন দেখি?

বললুম, কেন, কি হয়েছে?

কাল পর্যন্ত মেয়েটি তিনবার আপনার খোঁজে এল। হয়ত আজও আসতে পারে।

কারণ কি?

তাই যদি জানব তা হলে তো হাত গোনা শিখতুম! রতিবাবু বললেন, প্রথম দিন এসেই আপনার কথা তুলল। বলল, লোটা-কম্বল নিয়ে ত সান্নিসিরা যায় চিমটে বাজিয়ে। ও'র সম্বল বুঝি কিছু নেই? আমি হেসে বললুম, লেখকরা ত দিন-ভিখিরি! তাদের আবার সম্বল কিসের? ও'র ওসব পথেঘাটে উপোস করার অভ্যেস আছে!

বললুম, কিন্তু এতবার খোঁজ করছে কেন আমায়? কাজের কথা কিছু বলে গেছে?—আমার ঔৎসুক ছিল অন্য কারণে।

আহ্লাদে-আমোদে রতিবাবু যেন গলে পড়েছিলেন। বললেন, কথাই ত তাই মশাই। আপনি পথেঘাটে না খেয়ে মরবেন, একি তার সহ্য হয়? আমার কাছে গতকাল কেঁদে-কেটে,—এই দেখুন না, আপনার সব ব্যবস্থা করে গেছে। এই দেখুন—

রতিবাবু নিজের গলা থেকে এক ছড়া সোনার সরু বিছে-হার খুলে আমার সামনে ধরলেন। ওজনে হয়ত দেড় বা দু'ভরি হতে পারে।

এ আবার কি?—আমি বললুম, সোনার হার নিয়ে আমার কি হবে? আপনি ওটা নিতে গেলেন কেন?

নিলুম কি মশাই?—রতিবাবু আবার বললেন গদগদ কণ্ঠে, নাঃ আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না! আপনি একেবারে কাঠখোট্টা। বুঝলেন মশাই, 'রমণীর মন সহস্র বর্ষের সখা, সাধনার ধন।' উনি কাকুতিমিনতি করে এটি আমার হাতে গুঁজে দিয়ে গেলেন,—আপনার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য! গরীব লেখক আপনি, কপাল আপনার ফিরে গেল। তা বেশ, এটা এখন আমিই রেখে দিই। পড়ে যাওয়া চৌদ্দ আনা ত বটে। এ আপনারই সাধনার ধন!

রতিবাবু সযত্নে ও সানন্দে হারগাছটা নিজের গলায় প'রে নিলেন।

যাই হোক, যথানির্দিষ্ট দিনে আমরা দু'জন নেপালের উদ্দেশে রওনা হই এবং পথঘাট তৎকালে আদিম অবস্থায় থাকার জন্য অনেক দুঃখ দুর্যোগ পরিশ্রম ও অর্ধা-হারের মধ্য দিয়ে কাঠমাণ্ডুতে গিয়ে পেঁছিই। তখন শিবরাত্রির কাল, এবং পশুপতি নাথ দর্শনের হুড়োহুড়ি। দেবদর্শনান্তে সেখানে দিন দুই থাকার পর আমি বোধ

করি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হই। আমার রোগের অবস্থার ক্রমশ খারাপ লক্ষণ দেখে তখনকার কাঠমান্ডু হাসপাতালের ডাঃ সুধীন্দ্রলাল দাশগুপ্ত ও নরেন্দ্রলাল মুস্তফী—এঁরা দু'জন আমাকে কুড়ি টাকা ধার দিয়ে এক 'ঝাম্পানে' তুলে দেন। সেটা প্রায় মড়ার খাটের মতো। আমি অর্ধচেতন অবস্থায় চিত হয়ে শুয়ে যখন 'শিশাগড়ি' ও চন্দ্রাগড়ি' পাহাড় পেরোচ্ছিলুম, তখন আকাশ থেকে ঈশ্বর আমার চিদানন্দময় মূর্তি দর্শন করে পুণ্যসঞ্চয় করছিলেন! রতিবাবু কাঠমান্ডুতে থেকে গেলেন তাঁর গলায় হারগাছটা ঝুলিয়ে।

ভীমপেড়িতে আমাকে বাগমতীর ঘাটে নামিয়ে কুড়িটা টাকা আমার মাথার তলা থেকে নিয়ে কুলীরা চলে গেল। আমি বেপরোয়ার মতো বাগমতীর বরফ গলা জলে স্নান করে নিউমোনিয়া সারালুম এবং উক্ত ডাঃ দাশগুপ্ত ও মুস্তফী—যাঁরা আমার আরোগ্যলাভ কল্পনাও করেননি—কলকাতায় ফিরে তাঁদের টাকা মনি অর্ডার যোগে পাঠিয়ে দিলুম। অতঃপর কিছুকাল পরে সেই হারটি গলায় পরেই রতিবাবু দেশে ফিরলেন। শ্রীমতী সাধনা বহু হয়রানির পর সেই হারগাছটি কিভাবে রতিবাবুর হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন, সে এক হাস্যকর কাহিনী। যাই হোক, এর আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত আমি 'দেবতাত্মা হিমালয়' গ্রন্থে আলোচনা করেছি।

নেপাল থেকে ফিরে লেখাপড়ায় যখন মনঃসংযোগ করছিলুম তখন কানে এল, আমার ওই কেদার-বদরীর ভ্রমণকাহিনীর প্রথম কিস্তি তার নতুনত্বের জন্য একটা সাড়া তুলেছে! ভ্রমণকাহিনী তখন বাঙ্গলা সাহিত্যে খুবই কম এবং কতকটা গতানুগতিক তবু ওর মধ্যে জলধর সেনের 'হিমালয়' এবং প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক 'হিমালয়ের পারে কৈলাস ও মানস সরোবর'—এ দুটি বই খুবই মূল্যবান। ওঁরা দু'জন পথিকৃৎ সন্দেহ নেই। সেক্ষেত্রে আমি আমার বাহাদুরি একেবারেই স্বীকার করিনে। তবে এটি লক্ষ্য করছিলুম, 'মহাপ্রস্থানের পথে' ভারতবর্ষে প্রতি মাসে এক এক কিস্তি বেরোয়, আর পাঠক মহলে যেন ঝড় ওঠে। বইখানা বোধ হয় গতানুগতিকতার পথ ধরে চলেনি, তাই সম্ভবত সাহিত্য-সমাজপতিদের তন্দ্রা ছুটে গিয়েছিল। এই সময়ে বাঙ্গলা সাহিত্যের 'বীরবল' প্রমথ চৌধুরী মহাশয় আমাকে একখানি সুদীর্ঘ প্রশস্তিপত্র লেখেন, যেটি আমার পক্ষে তখন অভাবনীয় ছিল।

আমি আমার আশ্রম-রচনার চিন্তা কতকটা ছেড়েছি, কিন্তু বাগান-বাড়ি বানাবার কল্পনা আমাকে পেয়ে বসেছিল। পাখি আকাশে উড়ুক, তার ডানায় যত জোর আছে তাই নিয়ে ঘুরুক শূন্যে-শূন্যে। কিন্তু কোথাও কোনও অরণ্যে, কান্তারে, কোথাও এক বৃক্ষচূড়ায় তার একটি নীড় বাঁধা থাক্। এই রসকল্পনা মনে নিয়ে যখন নিঃসম্বল অবস্থায় এখানে ওখানে ঘুরছি তখন আমার সাংবাদিক বন্ধু বিজয় ভূষণ দাশগুপ্ত একটি খবর দিলেন। বরিশালের হরিদাস মজুমদার মহাশয়—যিনি কোনও একটি স্টেটের ম্যানেজার—তাঁর বাড়ি আছে দমদম বিমান ঘাঁটির গায়ে পূবদিকে—ওটার নাম নারায়ণপুর। ওখানে তিনি আমাকে কিছু জায়গা দিতে পারেন। খবর শুনে পরদিনই বিজয়বাবুকে নিয়ে পাতিপুকুর স্টেশন থেকে ছোট

ট্রেন ধ'রে মাত্র কয়েক মাইল গিয়ে নারায়ণপুরে নামলুম। নিরুম সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন গ্রাম। মশা, ডোবা, ম্যালেরিয়া—এসব নেই। সাদা শালুক ফুটে রয়েছে বড় বড় স্বচ্ছ দীঘিতে। কলকাতার অতি সন্নিকট। ওখানে হরিদাসবাবু সাদর অভ্যর্থনা করে তাঁর সুবৃহৎ অট্টালিকায় তুললেন। তিনি অতি ভদ্র, সৌম্যদর্শন এবং মিষ্টভাষী। 'অমৃত সমাজ' এবং 'গীতাভবন'-এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা। তাঁরই 'অমৃত' নামক সাময়িক পত্রের সম্পাদক হলেন বিজয়বাবু। এ ছাড়া হরিদাসবাবু কড়েয়া রাসমণি বাজারের ওদিকে একটি মহিলা-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন—সেখানে সহায় সম্বলহীন মহিলারা থাকতে পারেন। হরিদাসবাবু উচ্চশিক্ষিত এবং এম-এ, বি এল। তিনি যখন সামান্য অবস্থার মানুষ তখন কলকাতায় এসে পূর্বোক্ত স্টেটে চাকরি নেন।

এখানে নারায়ণপুরে তিনি আমাকে একটি চমৎকার তিন বিঘার প্লট বিনামূল্যে দিতে চাইলেন এবং একটি বাংলো তৈরির সর্বপ্রকার উপকরণ ও মালমসলা তিনি সরবরাহ করবেন ও তাঁরই মিস্ত্রির মজুর আমার সব কাজ করে দেবে, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি আমাকে জমিটি দেখালেন। বাংলোটি নির্মাণের জন্য আমার যে ঋণ হবে, হয়ত হাজার দুই আড়াইয়ের মতো—সেটা ধীরে-সুস্থে পরিশোধ করলেই চলবে। এমন লোভনীয় প্রস্তাব তিনি করছেন কেন—আমার এই সোজাসুজি প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন, আপনাকে এখানে এনে বসাতে পারলে আমি আট-দশটি পার্টিকে প্রভাবিত করে এই গ্রামে এনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। আপনি রাজি হয়ে যান। বলা বাহুল্য, আমি হরিদাসবাবুর তিনতলা অট্টালিকার উপরে উঠে ওরই গায়ে বিস্তীর্ণ বিমানঘাটির সুন্দর দৃশ্যে দেখে তখনই রাজি হয়ে গেলুম। যদি কখনও এদেশে যুদ্ধ বাধে এবং এই বিমানঘাটি আক্রান্ত হয়, তবে প্রথম মৃত্যু হবে আমার। ইংরেজসাম্রাজ্য রক্ষার জন্য আমার সেই গৌরবজনক অপমৃত্যুর সম্ভাবনা স্মরণ ক'রে আমার রোমাঞ্চ পুলক হচ্ছিল!

যাই হোক আমার এই রাজি হবার সংবাদটি পেয়েছিলেন আমার বন্ধু রবি রায়——যিনি নাট্যমন্দিরের এক বিশিষ্ট অভিনেতা। তিনি ও তাঁর ভাই গিয়ে নারায়ণপুরে জমি নিয়ে ঘর তুলে বসবাস আরম্ভ করেন। আমার কপাল পোড়া হরিদাসবাবুর স্নেহের দান আমি নিতে পারিনি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে এই সূত্রে আমার বন্ধুত্ব স্থায়ী হয়ে গেল। আমার মধ্যে বৈরাগ্য ও বিষয়াসক্তি একই সঙ্গে কাজ করছিল। আজ যেটা পরম আসক্তির সঙ্গে প্রাণপণে আঁকড়িয়ে ধরি, আগামীকাল সেটা আমার কাছে তার সব অর্থ হারায়! আমি সম্ভোগের মধ্যে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসের কথা ভাবি।

যতদূর মনে পড়ছে এমনি একটা সময়ে দার্জিলিঙে লেবং-এর রেসকোর্সে বাঙ্গলার তদানীন্তন গভর্নর স্যার জন অ্যান্ডারসনকে গুলী করে হত্যা করার চেষ্টা করতে গিয়ে দুটি তরুণ যুবক ধরা পড়ে যায়। তাদের মধ্যে একটি ছেলের নাম রবীন ব্যানার্জি। ওদের সঙ্গে একটি মেয়েও জড়িত ছিল। তার নাম উজ্জ্বলা মজুমদার। এই সংবাদটি শোনার পর আমি আপাতত আমার নতুন কুটুম্ব শ্রীমতী শোভার ওখানে যাতায়াত বন্ধ করেছিলুম।

এর মধ্যে কিছুকাল আগে আমার দু'খানা নবপ্রকাশিত বই 'নিশিপদ্ম' ও 'কলরব' অসীম সাহসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলুম—যেমন অনেকেই তখন পাঠাতো। তখনকার দিনে কালিকলম, কল্লোল ও প্রগতির লেখকগোষ্ঠীর রচনাকে 'তরুণ সাহিত্য' বলা হ'ত। এই সাহিত্যের তথাকথিত 'দুর্নাম' ছিল প্রচুর। কিন্তু সম্প্রতি নব্যলেখক ও কবিদের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ ও গল্প-উপন্যাস প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করার ফলে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছিল।

কবিকে বই পাঠিয়েছি বেশ কিছুদিন হয়ে গেল। প্রথমটা আমার বুক দুরু দুরু করছিল, এখন সে অস্বস্তি সয়ে গেছে। বই নিশ্চয় তাঁর হাতে পড়েনি, নয়ত তাঁর আশেপাশের লোক তাঁকে পড়তে মানা করেছে। আর নয়ত তাঁর বিশ্বজোড়া কাজের মধ্যে আমাব সামান্য বই কোথায় তলিয়ে গেছে। আমি ভাবছিলুম, কবিকে বই না পাঠালেই হ'ত।

এমনি সময় বৈশাখের প্রারম্ভে একদিন হঠাৎ একখানা খামের চিঠি এল। উত্তরায়ণ, শান্তিনিকেতন থেকে লিখেছেন শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী। চিঠিখানা এই প্রকার। সবিনয় নিবেদন, কবি মনে করেছিলেন আপনাকে কিছু না জানিয়ে প্রথমেই আপনার বই সম্বন্ধে তাঁর প্রশংসা বাক্য কাগজে বার করবেন। "পরিচয়" পত্রিকা কি আপনার হাতে পৌঁছয়নি? তাতে উনি অন্য প্রসঙ্গে আপনার বই সম্বন্ধে বলেছেন। আপনার লেখা তাঁর বিশেষ রকম ভালো লেগেচে। আমার প্রীতি নমস্কার গ্রহণ করুন। ভবদীয়…" ১।৪।৩৩।

কবি অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় তখন রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি। খামের চিঠিতে তখন ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জ মার্কা এক আনা অথবা এক আনা তিন পাই দামের স্টাম্প মারা হ'ত। সে সময়ে কলকাতার সরকারী আপিসে খাঁটি তামার পাই-পয়সা চলত। বারো পাই হলে এক আনা হ'ত।

সে যাই হোক, তৎকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তরুণ সাহিত্যের মানসপ্রকৃতি ও সাহিত্যনীতি নিয়ে এখানে-সেখানে আভাস-ইঙ্গিতে একটু-আধটু মন্তব্য করেছেন মাত্র। কিন্তু সেদিন অবধি কোনও তরুণ লেখকের কোনও বিশেষ বই নিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ-ভাবে কোথাও সমালোচনা বা আলোচনা করেছেন' কিনা আমার মনে পড়ছে না। সেই কারণে আমার বই দু'খানাকে কেন্দ্র করে তরুণ-সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ওই প্রথম প্রত্যক্ষ অভিমত একটি ছোটখাটো ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল, তাই জন্য তাঁর সমালোচনার ওই অংশটা এখানে তুলে দিচ্ছি:

"ঠিক এই সময়েই প্রবোধ সান্যালের 'কলরব' আর 'নিশিপদ্ম' বই দুটি আমার হাতে পড়ল। এরা সম্পূর্ণ অন্য জাতের। এরা নিছক আধুনিক।

"রিয়ালিজম এবং আইডিয়ালিজমকে প্রাকৃতিকতা এবং ভাবিকতা নাম দেওয়া যেতে পারে। এই দুটোকে নিয়েই মানুষের কারবার। প্রকৃতিকেও সে স্বীকার করতে বাধ্য, তার সঙ্গে তার আপন ভাবের সৃষ্টিও আপনি এসে মেশে। দুইয়ে মিলেই তার রিয়ালিটি। কোনো একটা সাহিত্যিক মতবাদ নিয়ে বলা চলবে না যে

মহাভারতের শকুনিই সত্য আর অর্জুন তা নয়, কিম্বা কর্ণের মধ্যে যে অংশে নীচতা সেই অংশে তা রিয়ল, যে অংশে মহত্ত্ব সেই অংশটাই বানানো।

'মহাভারতে প্রাকৃতিক এবং ভাবিক অনায়াসে মিশে গেছে, এমন কি অপ্রাকৃতও আপন জায়গা নিয়েচে বিনা কৈফিয়তে। অত বড় সর্বগ্রাহী গল্প জগতের আর কোনো সাহিত্যে লেখা হয়নি। ওর মধ্যে সাহসের সীমা নেই।

'কিন্তু নবীন মতবাদওয়ালাদের সাহিত্যে ভীরুতা আছে যথেষ্ট। এরা সুন্দরকে ভয় করে পাছে কেউ গাল দিয়ে বসে এসব মন ভোলাবার ছল, ভালোকে সরিয়ে ফেলে পাছে সেটাতে গুরুগিরির অপবাদ লাগে। এমনি ক'রে এরা কিছুতেই অসংকোচে সহজ হতে পারে না। সাহিত্যে ভালোটা মন্দর চেয়ে ভালো এমন কথা যদি বা অশ্রদ্ধেয় হয় তবু সাহিত্যে ভালোমন্দর একই দর অন্তত এও তো মানতে হবে। কিন্তু এমন ব্যবহার করলে তো চলবে না যে মন্দটার দর ভালোর চেয়ে বেশি— যেহেতু মন্দটাই রিয়ল। সাহিত্যে এরা এমন একটা জাল পাততে চায়, যে জালে চুনোপুঁটি পড়ে, এড়িয়ে যায় রুই কাৎলা। রুই কাৎলাকে গাল দিয়ে বলে ওগুলো উঁচ-কপালে সৌখীনদের মাছ। কোনো কারণে কোনো ভোজে বা কোনো তরকারিতে চুনোপুঁটির যদি বিশেষ ফরমাস থাকে তাহলে আপত্তি করব না কিন্তু কুলবন্ধনের নতুন নিয়মে বড়ো মাছকে যদি একঘরে করা হয় তা হলে বলতেই হবে খাঁটি রিয়ালিজম্ এ নয়, এটা বিশেষ দলের ঘরগড়া রীতি, অর্থাৎ কনভেশন নীচতাকেই কৌলীন্যের একমাত্র মর্যাদা দেওয়া। এটাকে বাইরে দেখতে মনে হয় সাহসিকতা কিন্তু বস্তুতই এটা ভীরুতা। এটা বাঁধা রাস্তার আধুনিকতাগিরি।

"প্রবোধ সান্যালের 'কলরব' পড়লুম। পড়ে তাঁর রচনা ও কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতে হোলো। এই বইয়ে নানা চরিত্র ও নানা ঘটনার ভিড়। কোনটাকেই মনে হয় না যে বেঠিক। এতগুলো মেয়ে পুরুষকে স্পষ্ট করে গড়ে তুলতে ক্ষমতা দরকার। সে ক্ষমতা আছে লেখকের।

"লেখক ইচ্ছে করেই এই বইয়ে দেখাতে চেয়েছেন, একটা বাড়িতে অত্যন্ত সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার একটা ঘোলা আবর্ত! তারা পরস্পর কাছাকাছি আছে এই পর্যন্ত, কিন্তু তার চেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাদের নেই। যেমন অনাদৃত গলি যত রকম আবর্জনায় নোংরা দুর্গন্ধ এবং অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে এ বাড়িতে তেমনি বহু- লোকের চিত্তদৈন্য ও অবস্থাদৈন্যের যত কিছু উচ্ছিষ্ট স্তূপাকার হয়ে বাতাসকে মলিন করে তুলেচে। এর মধ্যে অসামান্যতা কোনো চরিত্রে কিছুমাত্র নেই তা নয়—কিন্তু সে কেমন, হাসপাতালে মাঝে মাঝে যেমন দেখা যায় নার্স কিম্বা ডাক্তার কিম্বা ছাত্র। তারা মুখ্য নয় তারা গৌণ।

"হাসপাতালটা সাধারণ সংসারের প্রতিরূপ নয়। সাধারণ সংসার স্বাস্থ্যে অস্বাস্থ্যে মেলানো ; সেইটাকেই বলা যেতে পারে রিয়ল। হাসপাতাল রিয়ল নয়, অর্থাৎ স্বাভাবিক নয়, ও একটা ছেঁকে আনা জিনিস। তবু ওর ওর স্বীকৃতির দাবী আছে, কেবল প্রয়োজনের দিক থেকে নয়, অস্তিত্বের দিক থেকে। ওটা একটা-কিছু

হয়ে দাঁড়িয়েচে অতএব সেই মূল্য তাকে দেওয়া চাই। 'কলরবে'র বাসখানাও নিছক অমূল্যদেরই বাসা। সংসারে তারা এ-গলিতে ও-গলিতে ছড়িয়ে থাকে। তাদের ছেঁকে এনে একটা জায়গায় সংহত রূপ দেওয়া হয়েছে—অর্থাৎ যা ছিল ক্ষেতের মধ্যে তাকে টিনের মধ্যে বিশেষ জারক রসে ডুবিয়ে প্যাক করা হলো আচ্ছাতাই সই।

"হাসপাতাল সংসার থেকে দূরে জিনিস, স্বতন্ত্র করা তার সত্তা। সেই দূরের দৃশ্য বিশেষ দিনে দেখতে যাওয়া চলে, রোগীরূপে নয়, ডাক্তাররূপে নয়, নিরাসক্ত দর্শকরূপে। সেই হিসাবে এই হাসপাতালী গল্পটাকেও কি রোমান্স বলব না। কিন্তু যদি বলি রোমান্টিক তাহলে আধুনিক মতওয়ালার লজ্জা পাবেন, কেননা ও শব্দটাকে তাঁরা পছন্দ করেন না। উপায় নেই, পাঠক গল্প শুনতে চেয়েচে, লেখক গল্প জুগিয়েচে নিত্যনৈমিত্তিক সংসার থেকে দূরের দৃশ্যে। মনটা ছুটিতে দূরে যেতেই চায়—গল্প ছুটির জন্যেই। এই দূরের হাওয়া বিচিত্রবর্ণ বসন্তের হতে পারে, হতে পারে ফ্যাকাশে রঙের দরিদ্র শীতের।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৪০

রাজনীতির দিক থেকে এই সময়টা তখন খুব ঘোরালো।

বাঙলার বিপ্লববাদকে শুধু দমন নয়, ওটাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার জন্য বাঙ্গালার বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। ওর সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলেছে ইংরেজ বণিক সম্প্রদায়। বস্তুত তৎকালে বাঙ্গলার লাট, বাঙ্গলার গভর্ণমেণ্ট, লালবাজারের পুলিস ঘাঁটি, ফোর্ট উইলিয়মের বৃটিশ সামরিক অফিসার, বৃটিশ ব্যবসায়ী সমাজ এবং ইলিশিয়ম রো-র গোয়েন্দা বিভাগ—এরা সবাই একযোগে বাঙ্গলার বিপ্লববাদকে শায়েস্তা করার জন্য সর্বপ্রকার কৌশলকর্মে লিপ্ত হয়েছিলেন। এঁদের গোপন বৈঠক বসত রাত্রের দিকে গভর্ণমেণ্ট হাউসের নিভৃত অংশে। এঁরা বিশ্বাস করতেন বাংলার এই বিপ্লববাদী এবং বৃটিশ-বিরোধী চিন্তাধারাকে যদি উচ্ছেদ করা যায় তবে সর্ব ভারতকে মুঠোর মধ্যে আনা সহজ হবে। বাঙ্গলা হ'ল নাটের গুরু। বাঙ্গালীকে ঠাণ্ডা করে দিতে পারলে ভারত নিজের থেকেই জুড়িয়ে যাবে।

সেই কারণে বাঙলায় দমননীতির চেহারা এ বছরে ছিল প্রচণ্ড। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, রাজনীতিক সম্মেলনের উপর কড়াকড়ি, বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার সংবাদ কাগজে না বেরোয় তার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারী, কাগজের জামানত কথায় কথায় বাজেয়াপ্ত করা, সামান্য সন্দেহে যে কোনও ছেলেকে গ্রেপ্তার করে গোয়েন্দা বিভাগে নিয়ে যাওয়া এবং সর্বোপরি রাজনীতিক বন্দীদের উপর নির্দয় উৎপীড়ন। এগুলি সব একত্র করে যা দাঁড়ায়, সে হ'ল একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব। বিপ্লববাদীরা যখন হাসিমুখে জেলে ও দ্বীপান্তরে যাচ্ছে, যখন হাসিমুখে ফাঁসীর দড়ি গলায় নিচ্ছে, ইংরেজের চক্ষু তখন প্রতিহিংসায় রক্তবর্ণ!

একদিকে এইভাবে সমগ্র বঙ্গভূমি যখন রক্তে, আগুনে, আত্মবিসর্জনে, দেশাত্মবোধের উন্মাদনায়, জাতীয় ভাবাবেগে এবং নির্দয় উৎপীড়নে আলোড়িত তখন অন্যদিকে দেখি একই কালে বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জয়যাত্রা। রবীন্দ্রনাথের নবতম রসের

চিত্রকলা, সংগীত ও নাট্যাভিনয়, শশী অধিকারীর যাত্রা, অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনী, নিউ থিয়েটার্সের এক-একটি সাফল্যমণ্ডিত সবাক চিত্র, নাট্যমন্দির ও আর্ট থিয়েটারের যুগান্তকারী এ-একখানি নাটক, উদয়শংকরের অপরূপ নৃত্যসভা, শরৎচন্দ্রের একটির পর একটি মনোরম উপন্যাস, নজরুলের চিত্তাকর্ষক শ্যামাসঙ্গীত, এবং কল্লোস-কালিকলম-প্রগতির প্রত্যেক লেখকের কবিতায়, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, নব নব সাহিত্য ও জীবনচিন্তার মৌলিক অভিব্যক্তি—সমগ্র বিদগ্ধ বাঙ্গালীর মনকে অভিভূত করে তুলেছে।

এই বছরটি ছিল রাজা রামমোহনের মৃত্যুশতবার্ষিকী উদ্যাপনের বছর। শুধু বাঙ্গলায় নয়, ভারতের বহু অঞ্চলে এবং বিলাতের ব্রিস্টল নগরের উপান্তে যেখানে রামমোহনের সমাধিক্ষেত্র—সেখানেও রাজা রামমোহনের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দানের আয়োজন করা হয়। যতদূর মনে পড়ছে, রবীন্দ্রনাথ বোধ করি এই উপলক্ষে 'ভারত পথিক রামমোহন' নামক তাঁর প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ রচনা করেন। কলিকাতা নগরী রামমোহনের প্রসঙ্গে সর্বত্র মুখরিত হয়েছিল। চারিদিকে রামমোহনের উদ্দেশে ওই শ্রদ্ধাঞ্জলির মধ্যে আমারও শ্রদ্ধা যোগ করেছিলুম একটি বেতার ভাষণে। লেখাটি ছাপা হয়েছিল দু'একটি কাগজে।

অন্য দিকে এই বছরের প্রারম্ভে ব্রিটিশ শক্তির উৎপীড়ন যখন চরমে ওঠে সেই সময় কংগ্রেস ঘোষণা করে কলকাতায এই জাতীয় মহাসভাব ৩৭তম অধিবেশন বসবে এপ্রিলের প্রথমে। তখন গান্ধীজী প্রমুখ বহু সর্বভারতীয় নেতা কারাগারে এবং বাঙ্গালার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বন্দী অবস্থায় এবং অসুস্থ দেহে পুলিস পাহারায় রয়েছেন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। বলা বাহুল্য, ১৯৩৩-এর এই কংগ্রেস অধিবেশনকে ছিন্নভিন্ন করার জন্য কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর। তৎকালীন পুলিসের সর্বোচ্চ কর্তা ছিলেন মিঃ রবার্টসন এবং তাঁর খ্যাতি ছিল এই, তিনি নাকি দুর্ধর্ষ। তাঁর নির্দেশ ছিল, এই অধিবেশন উপলক্ষে কোথাও প্যাণ্ডাল বা আটচালা বাঁধা চলবে না।

এইপ্রকার জাতীয় সংকটকালে তৎকালীন নিখিল বঙ্গ ছাত্র সম্মেলনের অসমসাহসিক কর্মীরা অগ্রসর হযে এসেছিলেন, কিন্তু প্রথমেই তাদের অনেককে 'বঙ্গীয় নিরাপত্তা আইনে' গ্রেপ্তার করা হয়। এই ছাত্র সম্মেলন ও 'ছাত্রী সংঘের প্রথম জন্ম ঘটে ১৯২৮ সালে এবং তাদের মুখপত্রটির নাম দেওয়া হয় 'ছাত্র'। এদের উভয়ের সম্মিলিত প্রথম অধিবেশনে পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র যোগদান করেন—এই খবরটি পেয়েছিলুম আমি যখন রাওয়ালপিণ্ডি জেলার পার্বত্য শহর মারী পাহাড়ে বাস করছিলুম। এই ছাত্র সম্মেলন ও 'ছাত্র' কাগজের সঙ্গে লিপ্ত ছিল আমাদের তরুণ কবিবন্ধু গিরিজা মুখোপাধ্যায়। সে ছাত্রদলের অন্যতম নেতা। ১৯৩১ সালে সে লণ্ডনে যায় এবং সেই থেকে একপ্রকার নিরুদ্দেশ জীবনযাপন করে। তার নাটকীয় জীবনকথা পরে আলোচনা করব। যাই হোক, ছাত্র সম্মেলনের প্রথম সভাপতি ও জেনারেল সেক্রেটারী নির্বাচিত হন যথাক্রমে প্রমোদকুমার ঘোষাল,

শচীন্দ্রনাথ মিত্র ও বীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত। অতঃপর 'ছাত্রী সঙ্ঘে'র সভানেত্রী ও সেক্রেটারি নির্বাচিত হন যথাক্রমে শ্রীমতী সুরমা মিত্র, কল্যাণী দাস এবং তাঁদেরই সঙ্গে যুক্ত হন বীণা দাস, ইলা সেনগুপ্ত, রেণুকা সেনগুপ্ত প্রভৃতি। কালক্রমে এই দুই সুপরিচালিত প্রতিষ্ঠান জাতীয় আদর্শে, অনুপ্রাণিত হয়ে বিপুল কর্মশক্তির পরিচয় দেয়।

ইংরেজ পুলিশ ১৯৩২ সালের দিল্লীর কংগ্রেসে ভেঙ্গে দেয়। প্রত্যেক নেতাকে জেলে ঢোকায়। অর্থাৎ বিগত ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারিতে যখন লাহোর কংগ্রেসে প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষণা করা হয় এবং করাচীতে সেই বছরের ছোট কংগ্রেসে সেই দাবি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন থেকেই ব্রিটিশ রাজশক্তি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা দুই নির্দয় বড়লাট ও ছোটলাটকে পাঠায় দিল্লীতে ও কলকাতায়। একজনের নাম লর্ড উইলিংডন, অন্যজনের নাম স্যার জন অ্যাণ্ডারসন। রবীন্দ্রনাথ এই সময় বোধ হয় তাঁর কালান্তর নামক প্রবন্ধে একটু তামাশা করেছিলেন, "দিল্লীশ্বরোবা উইলিংডনেশ্বরো বা।"

যাই হোক এটি ১৯৩৩। এ বছরে দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ শাসকদের হাতে একটির পর একটি অর্ডিনান্স, একটির পর একটি জনবিরোধী আইন। তারা এখন প্রবল পরাক্রান্ত, নির্মম, দানবীয়, মারমুখী ও হত্যাগ্রহী। তারা ২৬শে জানুয়ারির প্রতিটি মিছিল, সভাসমিতি, জনসমাবেশ ইত্যাদিকে বলপ্রয়োগের দ্বারা ছারখার করেছে এবং রক্ত ঝরিয়েছে অনেক। আবার দুমাস পরে এই কংগ্রেস অধিবেশন। কথা ছিল, এই অধিবেশনের মূল সভাপতি হবেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। ওঁরা সবাই ট্রেন-যোগে আসছিলেন কলকাতায়। এম-এস-আনে, জওয়াহরলালের জননী স্বরূপরাণী, ডাঃ সইয়েদ মাহমুদ, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, রফি আহমেদ কিদোয়াই, কে ডি মালবীয়, চন্দ্রভান গুপ্ত এবং আরও অনেকে। তাঁদের সবাইকে মাঝপথেই গ্রেপ্তার করা হয়। অন্য দিক থেকে হাজারে-হাজারে প্রতিনিধি কলকাতায় বিভিন্ন প্রকার যানবাহন, এমনকি পায়ে হেঁটেও জড়ো হতে থাকেন। এই অগণিত সংখ্যক প্রতিনিধিদের জন্য বাঙলার ছাত্র ও ছাত্রী সমাজ কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে মোট ৪৫ খানা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল। বলাবাহুল্য, ভারতের মধ্যে গোয়েন্দা পুলিসের সর্বপ্রধান কেন্দ্র হল কলকাতার ইলিসিয়ম রো ওরফে লর্ড সিংহ রোড এবং ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দারা হলেন বাঙ্গালী! বাঙ্গালীর অপরাজেয় প্রতিভা একদিকেও সর্বজন-স্বীকৃত কিন্তু এদের চক্ষুকেও ফাঁকি দিয়ে ছাত্রসমাজ সংগোপনে এই অধিবেশনটিকে সাফল্য-মণ্ডিত করার চেষ্টা পেয়েছিল।

ব্রিটিশ প্রশাসন অনেক আগে থেকে এই কংগ্রেস বা যে কোনও স্থলের জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করেছিল। দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ চতুর, গোয়েন্দাবিভাগ চতুরতর, কিন্তু কংগ্রেসী ছাত্রসমাজ চতুরতম! ইতিমধ্যে তারা সেনগুপ্তের পত্নী নেলী সেনগুপ্তাকে মূল সভাপতির পদে নির্বাচিত করে রাখে। স্বনামধন্যা অ্যানি বেসান্ত সকল জাতি ও সমাজের উর্ধ্বে ছিলেন—যেমন ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয়া মাদাম ব্লাভাটস্কি

আজ এক ইংরেজ মহিলা সকলের মাঝখানে এসে উপস্থিত হলেন এই জাতীয় সঙ্কট-মুহূর্তে।

আজ এই নাটকটি বিয়োগান্ত হবে কিনা, অথবা কি প্রকারে শেষ হবে এই উৎকণ্ঠায় ধর্মতলা ও চৌরঙ্গীর মোড়ে ব্রিস্টল হোটেলের দোতলায় উঠে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালুম। এটা নিরাপদ, তবে পুলিস কর্তৃক আক্রান্ত হবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

আমার ঠিক সামনে চৌরঙ্গীর মোড়ের কাছেই তখন ট্রামওয়ে কোম্পানীর ছয়-চালা গুমটি। ওর ঠিক পাশেই বসবে কংগ্রেসের অধিবেশন—এই সংবাদটি গোপন রাখা হয়েছিল। ঠিক বেলা তিনটার সময় তারস্বরে এক বিউগল বেজে উঠল এবং তারই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে হাজারে-হাজারে প্রতিনিধি ও শত শত ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক পিলপিল করে ছুটে চলল গুমটির দিকে এবং দেখতে দেখতে আশে-পাশে লাখ দুই জনসাধারণ। ট্রাম, মোটর, ট্যাক্সি, ট্রাক—সমস্ত আটকিয়ে গেল। শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল মতি শীলের গলিতে। তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন ট্রাম-গুমটির দিকে। 'বন্দে-এ-মাতরম!'

সেই ক্ষণের মুহুর্মুহু বন্দেমাতরম্ ধ্বনি ও চারিদিকের জাতীয় পতাকার শোভা পুলিস কমিশনার মিঃ কলসনের কম্পিত হৃৎপিণ্ডে প্রচণ্ড রক্তের পিপাসা জাগিয়ে তুলেছিল। মেয়েরা গিয়েছিল কোলে-কাঁকালে শিশুকে নিয়ে। পুলিস তখন বক্তৃতারস নেলী সেনগুপ্তা ও গোপিকাবিলাস সেনকে গ্রেপ্তার করে গাড়িতে তুলে নিল। অতঃপর প্রহার-নাট্যের আরম্ভ। যখন এক-একজন প্রতিনিধি প্রস্তাব-বাক্য পাঠকালে পুলিসের লাঠির আঘাত খাচ্ছিলেন এবং লাঠির ঘায়ে কপাল বেয়ে রক্তধারা নামছিল, তখন দেখা যাচ্ছিল একখানা হাত ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে অসীম মন্ত্রণার মধ্যেও অন্য হাতে কাগজ ধরে তাঁরা শপথ-বাক্য পাঠ করছিলেন। এ দৃশ্য দুর্লভ। অমন একটির পর একটি। অবিমিশ্র অহিংসার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড হিংসার সেই আক্রমণের ফলে সেদিন যে-রক্তস্রোত বয়েছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সেটি স্মরণীয়।

॥ ৪০ ॥

ফরাসী চন্দননগরে মতিলাল রায় মহাশয় 'প্রবর্তক সঙ্ঘ' নামক এক সর্বার্থসাধক প্রতিষ্ঠান নির্মান করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালীর গৌরবের সামগ্রী হয়ে উঠেছিল। খাদ্য বস্ত্র কুটীরশিল্প ইত্যাদি সকল বিষয়ে এঁরা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বনির্ভর ছিলেন। চন্দননগরে ওঁদের এক আশ্রম ছিল, হয়ত এখনও আছে, সেখানে বহু অধ্যাত্মসাধক এবং বোধ করি সাধিকারাও থাকতেন। কর্মীরা কেউ বেতনাদি নিতেন না, তাদের সর্বপ্রকার ব্যয়ভার বহন করেন 'প্রবর্তক সঙ্ঘ'।

এই সঙ্ঘেরই জনৈক সাধক কর্মীর হাতে 'প্রবর্তক' মাসিকপত্র। এঁর নাম রাধারমণ চৌধুরী। চৌধুরীমশায় আমাকে প্রবর্তকের নিয়মিত লেখক করে তোলেন

এবং সেই সূত্রে ওঁদের বহুবাজারের আপিসে আমার যাতায়াত ছিল। ওই যাতায়াতের কালেই এক তরুণ সুদর্শন যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তার নাম প্রতুল। সে তখন সবেমাত্র এসেছে মনময়সিংহ থেকে। সে আমাকে প্রথম দিনেই নিজের আঙুলে লম্বা এক টুকরো দড়ি বেঁধে দেশলাই জেবলে দড়ির মাঝখানটা পুড়িয়ে দিতে বলল। আগুনে পুড়ে দড়িখানা দুখণ্ড হয়ে গেল। কিন্তু ভোজবাজির কৌশলে সেই আবার জোড়া লেগে একখানাই হয়ে উঠল! আমি চমৎকৃত হলুম। যুবকটি পকেট থেকে একটি নোটবই বার করে বলল, আপনার ভালো লেগেছে, এটুকু লিখে দিন? চৌধুরীমশায়ের সামনেই আমি সোৎসাহে প্রতুলের খাতায় আমার স্তুতিবাদ লিখলুম।

এই যুবক পরবর্তীকালে আপন যোগ্যতা ও প্রতিভায় হয়ে ওঠে যাদুসম্রাট পি. সি. সরকার! যাদুবিদ্যার প্রচারকার্যে প্রতুল সিদ্ধহস্ত ছিল। সে কালক্রমে পৃথিবীর সকল দেশে তার যাদুবিদ্যার প্রতিভা প্রকাশ করে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিল।

যাই হোক, আমি প্রবর্তকের নিয়মিত লেখক হয়ে উঠেছিলুম। ওই একটা সময়ে মতিলাল রায় মহাশয়ের সঙ্গে আমি পরিচিত হই। তিনি তখন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে একপ্রকার কঠোর ব্রতচারণে ব্যাপৃত থাকতেন এবং আমার বিদ্যা সামান্যই—আমি শুনতুম উভয়ে বিভিন্নরূপ তন্ত্রসাধনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন। শুনেছি একদা রায় মহাশয় শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে একত্র বসবাস করেছেন এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগর থেকেই পণ্ডিচেরীর উদ্দেশ্য যাত্রা করেন। মতিলাল রায় মহাশয় আমার স্নেহশীল হয়ে উঠেছিলেন এবং আমার সাহিত্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে সেটি প্রবর্তকে প্রকাশ করেন।

শুধু প্রবর্তক নয়, আমি তখন নিয়মিত লিখি ভারতবর্ষে এবং প্রায়ই প্রবাসীতে। ভারতবর্ষে তখন আমার উপন্যাস 'নবীন যুবক' বেরোচ্ছে এবং তার মধ্যে স্বদেশীয়ানার গন্ধ থাকার জন্য পাবলিক প্রসিকিউটর লাল-নীল পেন্সিলের দাগ দিয়ে বিশেষ বিশেষ সংখ্যার 'ভারতবর্ষ', গুরুদাসে ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন।

এমনি একটা সময়ে আমার সঙ্গে হৃদ্যতা ও ঘনিষ্ঠতা ঘটে দুটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং অন্যজন হলেন কবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র। এঁরা উভয়েই তখন থাকতেন আলিপুরের 'পশ' অঞ্চলে—যাঁদের বাড়ির চাকর বা বাবুর্চিদের বাজার-হাট করার জন্য দ্বিতীয় মোটরকার মোতায়েন থাকত এবং তারা আলিপুরের ব্রিজ পেরিয়ে ময়দানের ভিতর দিয়ে গিয়ে হগ-মার্কেট থেকে রসদ কেনাকাটা করে আনত।

রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় তখন প্রবীণবয়স্ক এবং পক্ককেশ। তিনি অতিশয় ভদ্র, অমায়িক ও মিষ্টভাষী। তাঁর আচার-আচরণ ও আপ্যায়নে অভিজাত বাঙ্গালীর সহজাত সংস্কৃতির স্বাদ পেতুম। যে সুবৃহৎ বাগান-ঘেরা বাড়িতে তিনি বাস করতেন, সেটিকে অট্টালিকা না বলে একটি প্রাসাদপুরী বললেই মানায়। স্যার

আশ্বতোষ চৌধুরীর পুত্র সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী আর্যকুমার চৌধুরী রণেন্দ্রমোহনের কন্যা কবি শ্রীমতি লীলাকে বিবাহ করেন। তৎকালে শ্রীমতী লীলা দেবী কলকাতার অভিজাত মহলে সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী ও সুদর্শনা হিসাবে বর্ণিতা ছিলেন। আর্যকুমার চৌধুরী মহাশয় তৎকালে নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত মাসিক পত্র 'মানসী ও মর্মবাণী'তে শ্রীমতী লীলা দেবীর বহু 'মুড' সম্বলিত একটির পর একটি ছবি প্রকাশ করে বাঙ্গলার পাঠক সমাজকে আনন্দে অভিভূত করতেন। তাঁর মুখশ্রী ও সৌন্দর্যের সঙ্গে একটি অনৈসর্গিক লাবণ্য দেখতে পেতুম।

এই পরিণত-যৌবনা মহিলা তখন আমার চেয়ে প্রায় বছর দশেকের বড় ছিলেন। তাঁর অন্যতম কাব্যগ্রন্থ 'কিশলয় থেকে আমি একেকটি কবিতা আবৃত্তি করে যখন তাঁকে শোনাতুম, তিনি অনুপ্রাণিত কণ্ঠে বলতেন, এ কবিতা আমার নয়, আপনার!

তাঁর এই কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা লেখেন ডাঃ স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয়। তিনি 'মানসী ও মর্মবাণীর যুগে বঙ্গ সাহিত্যের একজন কেউ-কেটা ছিলেন এবং এই ভূমিকায় তিনি ঠারে-ঠোরে রবীন্দ্রনাথকে ইষৎ খোঁটা দিয়েছিলেন। এটি ১৯২১ খৃষ্টাব্দের কথা। এই সময় সর্বাধিকারী মহাশয় একটি ভ্রমণকাহিনী লিখছিলেন 'ভারতবর্ষ'-এ—"ইউরোপে তিন মাস"। কিন্তু তাঁর এই ভ্রমণকাহিনী যখন পরবর্তী তিন বছরেও শেষ হচ্ছিল না, তখন একটি ঠোঁট-কাটা কুমারী মেয়ে সম্পাদক জলধর সেনের নিকট একটি চিঠি পাঠিয়ে প্রশ্ন করে, "সর্বাধিকারী মহাশয় কি গোরুর গাড়িতে চড়ে ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন?"

অতঃপর মাস দুয়েকের মধ্যে এই ভ্রমণবৃত্তান্তটি বন্ধ হয়ে যায়।

কবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় আমাকে প্রায়ই আমন্ত্রণ জানাতেন তাঁর আলিপুরের বাড়িতে। তাঁর ধারণা আমি কাব্যচর্চার অধিকারী এবং আমার ধারণা এর বিপরীত। তিনি একদা বাঙ্গলার শিক্ষাবিভাগের সর্বোচ্চ পদাধিকারী ছিলেন, এখন অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁর সংসারটি ছোট। স্বামী, স্ত্রী ও একটিমাত্র কন্যা—এই নিয়ে পরিবার। তরুণী ও সুশ্রী মেয়েটির নাম নোটন। সুরেনবাবু আপাতত কোন এক স্টেটের ট্রাস্টির চেয়ারম্যান।

'বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগ'-এর কর্তা দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় হলেন সুরেনবাবুর কনিষ্ঠ সহোদর। তিনি আমার বিশেষ পরিচিত। ভদ্রলোক শৌখীন, প্রবীণ ও সুপুরুষ। কিন্তু তাঁর একটি চোখ ছিল কাঁচের তৈরি।

আমার মুখ থেকে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর মতো সুরেনবাবুও তাঁর কবিতার আবৃত্তি শুনে আনন্দ পেতেন। তিনি বোধ করি ব্রাউনিং দম্পতির কবিতা প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করেন,—কিন্তু এটি আমার সঠিক মনে নেই। আমি নিজে রবার্ট ব্রাউনিং বা এলিজাবেথ ব্রাউনিং-এর কবিতা যথেষ্ট অনুরাগ নিয়ে পড়তুম না। ওঁদের কাব্যভাবনা ও গুরুভার ভাষার জটিলতা আমাকে পীড়া দিত। যেমন মাঝে মাঝে পীড়া দিত আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু সুধীন্দ্রনাথ দত্তর কবিতা। সুরেনবাবু ব্রাউনিং দম্পতির প্রতি শ্রদ্ধানুরাগে মুখর হয়ে যখন তাঁদের সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর

তুলনা করতেন, তখন আমার সঙ্গে বচসা বেধে যেত! আমার জ্ঞান ও বিদ্যা কম। কিন্তু একথা জানতুম, ইংরেজ আমলে ইংরেজ শিক্ষাবিদ্‌দের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কলকাতার এক শ্রেণীর ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ইংরেজ কবি চসার, কারলাইল, ওয়ার্ডসওয়ার্থ টেনিসন, শেলী, বায়রণ প্রভৃতির সমাদর করতে গিয়ে এমনই লালাসিক্ত হতেন যে, আমাদের পাশের বাড়ির রবি ঠাকুর তাঁদের কাছে আমলই পেতেন না। এক রবি ঠাকুর সব ইংরেজ কবিদেরকে যে গিলে খেয়ে বসে আছেন, এটি সেই অধ্যাপকরা কতকটা স্বীকার করলেন যখন তাঁরা 'দয়া করে' বাঙলা সাহিত্য পড়তে আরম্ভ করলেন। 'কল্লোল'-এ একদা রবীন্দ্রনাথের একটি ছোট চিঠি ছাপা হয়েছিল, তাতে তিনি এই মর্মে বলেছিলেন, আমার কবিতা বুঝার জন্য ইংরেজি সাহিত্যের কোনও অধ্যাপকের দরজায় যেয়ো না। নিজে নিজেই প'ড়ো!

যাই হোক, কবি সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন কাব্য ও রসসাহিত্যের একজন পরম রসিক। তিনি মাঝে মাঝে তাঁর ওখানে নজরুলকে নিয়ে যেতেন। হাস্যে পরিহাসে গানে গল্পে আমোদে নজরুল ওঁদেরকে মাতিয়ে তুলতো।

এমনি একটা সময়ে হঠাৎ একদিন একখানা চিঠির সঙ্গে এক ছাপা আবেদনপত্র পেলাম। আবেদনপত্র বললে একটু ভুল হবে, ওটা অনেকটা যেন সাহিত্যনীতির একটি 'ম্যানিফেস্টো'। দুটোতেই নাম সই রয়েছে শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য। আগে এঁর নাম আমি শুনিনি। পরম্পরায় জানলুম ইনি প্রসিদ্ধ এক ব্যবসায়ী এবং কর্মবীর। গৌহাটি-শিলং বাস সার্ভিসের ইনিই মালিক,—ওটি তাঁর একচেটিয়া ব্যবসায়। যেমন শিলিগুড়ি-দার্জিলিঙ মোটর সার্ভিসের একচেটিয়া ব্যবসায়ের মালিক মন্মথ চৌধুরী। এছাড়া শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্ক ও ইনস্যুওরেন্সের সর্বাধিনায়ক। সুতরাং এ হেন বিশিষ্ট ব্যক্তি যদি ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সাহিত্যের ক্রমোন্নতির সহায়ক হন্ তাহলে আনন্দেরই কথা। রামায়ণ-মহাভারত ও সীতা-সাবিত্রী আদর্শ সামনে রেখে সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ নৈতিক শুচিতা নাকি সকলের কাম্য। আধুনিক বা তরুণ সাহিত্যের যথেচ্ছাচার থেকে সৎসাহিত্যকে বাঁচানো প্রয়োজন। যে দেশে বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহন করেছেন সেই দেশে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভট্টাচার্য মহাশয় 'বঙ্গশ্রী' নামক মাসিকপত্র বার করলেন। সম্পাদক হলেন সজনীকান্ত দাস। সজনীর জায়গায় 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক হলেন চিরনিরীহ রসিক শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী। বঙ্গশ্রীতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল সরোজ, কিরণ রায় এবং ওদের সঙ্গে দুই বিভূতিভূষণ ও তৎকালে স্বল্পখ্যাত তারাশংকর। আশেপাশে যারা এসে দাঁড়াল তাদের মধ্যে শক্তিমান নব্যলেখক মানিক ও সাহিত্য-বিদূষক প্রমথ বিশী। ভাগলপুরবাসী বনফুল বা বলাইচাঁদের নামও ওদের সঙ্গে যুক্ত হল। বঙ্গশ্রী আপিসটি বসল এম্পায়ার রেস্তোরাঁর পাশেই।

'বঙ্গশ্রী'র আসর জমে উঠল শক্তিমান লেখকদের সমাগমে।

বাঙলাদেশে তখন শিশুমৃত্যুর হার হ'ল দেড় মিনিটে একটি। ওরই সঙ্গে সমান তাল রেখে মরেছে এক-একখানি সাময়িক পত্র। চোখের সামনেই দেখলুম রূপ ও রঙ্গ, বসুন্ধরা, অভ্যুদয়, নবযুগ, কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, ধূপছায়া, বাঁশরী উদয়ন, দুন্দুভি, উপাসনা, বিজলী, স্বদেশ প্রভৃতি একে একে মারা পড়ল। একালের কোনও কাগজই বাঁচবে না, কেননা সামনে আসছে নতুন কাল, অভিনব একটা যুগ। সে যুগের চেহারা কেমন কেউ জানে না, আমিও না। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি সামনে এগিয়ে আসছে দেশজোড়া অসন্তোষ ও নৈরাজ্যবাদ। দেখতে পাচ্ছি অদূরবর্তী সমাজবিপ্লবের চেহারা—আসছে যেন আমাদের দিকে সে এক অশ্বারোহীর মতো ঘোড়া ছুটিয়ে আর ধুলো উড়িয়ে। চোখের সামনে ভেঙ্গে পড়ছে যৌথ পরিবার আর সমবায় পরিবার। দেখতে পাচ্ছি মেয়ে সমাজে বারুদ জমেছে, ওরা শৃঙ্খল ছিঁড়েছে, পুরনো নীতিকে ওরা মানতে চাইছে না, পুরুষ শাসিত সমাজকে ভাঙ্গতে চাইছে ওরা। ছেলেরা ঘুষি পাকাচ্ছে, চোখ লাল করছে, শাসন বাঁধন পরোয়া করছে না, প্রতিবাদ জানাচ্ছে চলতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। ওদের সামনে পথ নেই, প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা নেই, উপযুক্ত অন্ন নেই ওদের মুখে, নিজদেরকে বড় করে তুলবার সম্ভাবনা ওরা দেখতে পাচ্ছে না। ওদেরকে শুধু রক্তচক্ষু আর উপদেশের দ্বারা ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছে ইস্কুল, কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক কনভোকেশনে ওরা শুনে আসছে অর্থহীন অপদার্থ আদর্শের বুলি, এবং গাউন পরে সঙ সেজে গিয়ে চান্সেলারের কাছে হিতোপদেশ শুনে পথে গিয়ে নামছে! যাও, এবাব চাকরি খোঁজগে—যেখানে খুশি যেদিকে খুশি। সংস্কৃত শিখেছ, লজিক ফিলজফি পড়েছ, ইংরেজি ভাষায় রপ্ত হয়েছ,—এবার যাও মেসোপিসেকে ধরো, মামা বা ভগ্নীপতির পায়ে পড়ো, সদাগরি আপিসের দরজায়-দরজায় কেঁদে বেড়াও—যদি কুড়ি-পঁচিশ টাকার গোলামী জোটে! এই নৈরাশ্যবাদ আর অসন্তোষের তলায় বিপ্লবের বীজ লুকিয়ে রয়েছে—যথাসময়ে সেটি অঙ্কুরিত হবে এই ধারণা অনেককে পেয়ে বসেছে।

'প্রিয়-বান্ধবী' উপন্যাসটি এই মনোভাব থেকে লেখা হয়েছিল এবং বইটির বিক্রি বাজার দেখে প্রকাশক গুরুদাস খুশি হয়ে উঠল। ও'রা যখন এ-বই বিক্রি আরম্ভ করলেন আমি তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি! কেননা ও'দের কাছে ও-বইয়ের কাপিরাইট বিক্রি করেছি তিনশ পঁচিশ টাকায়—সেই টাকা বিধবা বুলির খরচে গেছে! হিমসাগর আমের সমস্ত শাস খেয়ে খোসা পর্যন্ত চুষছে গুরুদাস আর আমি শুধু ওর খ্যাতির শুকনো আঁটিটার দিকে চেয়ে রয়েছি।

সর্বাপেক্ষা বিস্মিত হলুম একটি কারণে। 'প্রিয়-বান্ধবী' উৎসর্গ করেছিলুম শ্রীমতী শোভারানী দত্তকে—তাঁর প্রতি আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধানুরাগের চিহ্নস্বরূপ। তিনি উপন্যাসটি মন দিয়ে পড়ে বললেন, অসম্ভব, এরকম মেয়ে হয় না! এ মেয়ে সমাজেও নেই, দেশেও নেই। এমন মেয়ে দেখেছেন কোথাও?

আমি হাসলুম, অদূরে ভবিষ্যতে এ মেয়ে আসছে! তারই সম্ভাবনা নিয়ে লেখক

লেখে। হাতের কাছেই নমুনা,—আপনি নিজে কী?

উনি আর কথা বাড়াননি।

আমি যখন অক্ষয় সরকারের সাপ্তাহিক 'খেয়ালী'র জন্য প্রতি সপ্তাহে দশ টাকার বিনিময়ে একেকটি লেখা লিখছি, তখন একদা সাহিত্যক্ষেত্রের সংবাদদাতা শ্রীমান্ ভবানী মুখুজ্যে জানাল, 'বঙ্গশ্রী'তে নানা মতবাদ ও আদর্শের লেখকরা এসে জড়ো হয়েছে যাদের মধ্যে পারস্পরিক মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে। সুতরাং এই কাগজের অদূর ভবিষ্যতের কথা আলোচনা করে আমরা দু'জনেই হাসছিলুম। কিন্তু তেল আর জলে মিশ খায়, যখন তরকারিটা রান্না হয় ভালো! বঙ্গশ্রীতে যে-তরকারি রান্না হচ্ছিল, নেহাৎ কুস্বাদ নয়। আমি নিজে বিভূতিভূষণ আর তারাশংকর সম্বন্ধে উৎসাহিত ছিলুম। তারাশংকর সাহিত্যের ঐতিহ্যবাহী, পরিশ্রমী এবং নিজের রচনাদিতে সে সামাজিক ও নৈতিক শুচিতাবোধ মেনে চলে। সজনীকান্ত আমার সর্বাপেক্ষা পুরনো বন্ধু। সে বন্ধুবৎসল। দেখতে পাচ্ছিলুম, সে তারাশংকর ও বিভূতিভূষণকে যত্নে লালন করছে। খবর পাচ্ছিলুম সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য মশায় ওকে বিশ্বাস করেন।

এমনি একটা সময়ে অনেকদিন পরে একখানা চিঠি এল শ্রীমতী নীলিমা চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। সেই আমাদের 'বিজলী ও স্বদেশ'-এর আমলে ইনি মধ্যে মাঝে লেখা পাঠাতেন এবং চিঠি দিতেন। এবার অনেককাল পরে ও'র খবর পাওয়া গেল। চিঠিখানা বড় কিন্তু পড়ে আমি একটু দুঃখিতই হলুম। উনি ঠাউরিয়ে নিয়েছেন আমি হয়ত ও'র দুর্দশার কালে ও'র কোনও কাজে আসতে পারি। ও'র স্বামী বিহার সরকারের অধীনে কাজ করতেন ফরেস্ট অফিসে—চক্রধরপুর ডিভিশনে। কিন্তু বিগত দেড় বছর থেকে তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে একপ্রকার পঙ্গু। ও'র শিশুপুত্র সন্তানটি মারা যায় প্রায় এক বছর আগে। ও'র বাবা পাটনার উকিল। ওঁর স্বামীর সরকারী মাসোহারা কিছু থাকলেও ও'র বাবা কন্যা-জামাতার সাংসারিক খরচপত্র অধিকাংশই চালান। এটি ও'র পক্ষে সংকোচের কারণ। এখন উনি স্বনির্ভর হতে চ ন। উনি যদিও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাইভেট পরীক্ষা-দেওয়া গ্রাজুয়েট কিন্তু রাঁচী শহর বাঙ্গালীপ্রধান হলেও এখানে বাঙ্গালী সমাজের কোনও মহিলা বাড়ির বাইরে গিয়ে বিশেষ কাজকর্ম করেন না। উনি প্রায়ই দরখাস্ত পাঠান, শেষকালে উনি লিখেছেন, এখন আমার সংসারে আমরা মোট চারজন। স্বামী, বিধবা ননদ, একটি চাকর ও আমি। আমি কলকাতায় গিয়ে যদি কোনও অর্থকরী কাজ পাই, তাহলে খুবই উপকৃত হই।

চিঠিখানা নিয়ে আমি শোভার কাছে গেলুম। তিনি প'ড়ে বললেন, পুণ্যাশ্রমের বাসিন্দা রয়েছে অনেক মেয়ে গ্রাজুয়েট, কিন্তু কাজ কই? সরকারী আপিসে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, ব্যাংক-পোস্টাপিসে—কোথায় মেয়েদের জায়গা নেই। তবে শুনছি নাকি রেলওয়েতে মেয়ে-ইন্সপেক্টর নিচ্ছে আজকাল,—দেখুন. না চেষ্টা করে। অনেক জায়গায় মেয়েরা চরকাও কাটছে। তা ছাড়া উনিও ত গ্রাজুয়েট।

শোভার কথাবার্তার ধরণে যথেষ্ট উৎসাহ পাওয়া গেল না, এবং শ্রীমতি নীলিমাকে চিঠির জবাব কি দেবো তাও বুঝতে পারলুম না। সুতরাং আমি এক-প্রকার চুপ করেই যাচ্ছিলুম।

সিমলা-কাঁসারিপাড়ার ওদিকে তখন থাকতেন ডাঃ বি. সি. ঘোষ। তিনি সৌম্য-দর্শন সুপুরুষ এবং অমায়িক ও ভদ্রব্যক্তি। তিনি বিলাতে প্রবাসকালে এক ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁদের একমাত্র পুত্রসন্তানের নাম ছিল 'হ্যারি ঘোষ'। বস্তুতে আমাদের বাল্যকালে স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও ডাঃ বি, সি, ঘোষ—এঁরা থাকতেন খুবই কাছাকাছি। ডাঃ ঘোষের নিকট-আত্মীয় ও স্নেহভাজন সরোজ মিত্র তখন আমার বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও খুবই পরিচিত। ঠিক মনে পড়ছে না, সরোজবাবু বোধহয় ছিলেন একজন 'জে-পি', অর্থাৎ 'জাস্টিস অফ দি পীস'। তাঁকে বোধ হয় জুরীতেও গিয়ে বসতে হ'ত। তিনি দু'একটি প্রতিষ্ঠানেরও পরিচালক ছিলেন। তাদের মধ্যে একটি মহিলা-সেবা প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'সরযু-সদন'। সরোজ মিত্র তখন একজন পরিণত বয়সের যুবা। আমার সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল, আমি নাকি একজন সমাজসেবক। সুতরাং আমি একদিন শ্রীমতী নীলিমা চট্টোপাধ্যায়ের চিঠিখানা নিয়ে গিয়ে তাঁকে দেখালুম।

সেই প্রথম জানলুম, ডাঃ বি সি ঘোষ মহাশয় বিদ্যাসাগর কলেজ ও তার হস্টেল-গুলির একজন পরিচালক। অতটা আনুপূর্বিক জানা না থাকলেও এটি জানতুম মেয়েদের জন্য ছিল তখন বেথুন হস্টেল এবং স্কটিশ মিশনের অধীনে ডাণ্ডাস হস্টেল। এখন শুনলুম বিদ্যাসাগর কলেজের অধীনে রয়েছে দুটি ছাত্রী হস্টেল। তার একটি রয়েছে বোধ হয় সুকিয়া স্ট্রীটের কোথায় যেন, অন্যটি আমার পুস্তক প্রকাশক বরেন্দ্র লাইব্রেরীর উপর তলায়।

সরোজবাবু নীলিমা দেবীর সম্বন্ধে খুঁটিয়ে জানতে চাইলেন। আমি বললুম, কয়েকখানা মাত্র চিঠির বাইরে তাঁর সম্বন্ধে আর কিছুই জানিনে, এবং অদ্যাবধি গত তিন বছরের মধ্যে তাঁকে আমি চোখেও দেখিনি। তবে চিঠিপত্রাদি পড়ে মনে হয়েছে তিনি সুশিক্ষিতা এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা।

সরোজবাবু জানালেন, সুকিয়া স্ট্রীটের ওদিকে তাঁদের ছাত্রী-হস্টেলের জন্য জনৈক মেট্রনের দরকার। আহারাদি ও বাসস্থান ছাড়া টাকা পঁচিশেক হয়ত হাতখরচ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই মেট্রনের পক্ষে দরকার কঠোর ব্যক্তিত্ব, গাম্ভীর্য ও আত্ম-প্রত্যয়। তাঁকে হতে হবে নিরপেক্ষ, মিষ্টভাষী ও স্নেহশীল। হস্টেল প্রশাসনের সর্বপ্রকার সুব্যবস্থা তাঁর হাতেই থাকবে। আজকালকার ছাত্রীরা কড়াকড়ি বিশেষ মানতে চায় না, সেদিকেও তাঁকে সতর্ক-সচেতন থাকতে হবে। তিনি রান্না-ভাঁড়ার ইত্যাদি দেখাশোনা করবেন এবং তিনিই হবেন সর্ববিষয়ের পরিচালিকা। আপনি তাঁকে এ বিষয়ে লিখতে পারেন।

সেদিন বাড়ি ফিরে এসে আমি সবিস্তারে একখানা চিঠি লিখলুম নীলিমা দেবীকে

এবং ওই সঙ্গে সরোজ মিত্র মহাশয়ের ঠিকানাও দিয়ে দিলুম। আমার কর্তব্য ওখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

বোধহয় দশ-বারো দিন পরে নীলিমা দেবী আরেকখানা চিঠি দিলেন। আমাকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, সরোজ মিত্র মহাশয় তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেছেন এবং পঁচিশ টাকার পরিবর্তে তাঁকে তিরিশ টাকাই দিতে চেয়েছেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি কলকাতায় আসছেন। তবে যেহেতু তাঁদের পরিবারে মেয়েছেলের পক্ষে একা যাতায়াতের রেওয়াজ নেই, সেই কারণে তিনি একজন উপযুক্ত সঙ্গীর জন্য চেষ্টাচরিত্র করছেন।

এমনি একটা সময়ে একদিন সকালে 'চিত্রমন্দির' থেকে রতিবাবু তাঁর সহকারীর মারফৎ একখানা চিঠি পাঠিয়ে আমাকে ডাকলেন। রতিবাবুর দাদা থাকেন পণ্ডিচেরীতে এবং আমার ধারণা, রতিবাবু তাঁর ফটোগ্রাফির কাজের ফাঁকে তাঁর ডার্করুমের পাশের ঘরটিতে বসে জপতপ বা ধ্যানধারণা করেন। তিনি ঈষৎ খর্বকায়, গুম্ফশোভিত ও শুষ্কদর্শন। তাঁকে নিয়ে আমি নেপালে গিয়েছিলুম এবং তাঁর সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট আনন্দদায়ক হয়নি।

আমি গিয়ে ওঁর দোতলায় উঠে সামনে হাজির হলুম।—ডেকেছেন কেন? কি হুকুম, বলুন?

রতিবাবু খুব হাসলেন। বললেন, একদম ডুব মেরেছেন, দেখাসাক্ষাৎ নেই। দাঁড়ান, আগে একটু চা খান, তারপর বলছি সব।

আমি হাসিমুখে বললুম, বলুন, আপনার যোগাযোগ কেমন চলছে!

মিনিট কয়েকের মধ্যে ওঁর সহকারী দু'পেয়ালা চা এনে রাখল এবং আমি কাঁচি-সিগারেটের প্যাকেট বার করলুম।

সিগারেট ধরিয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে রতিবাবু হাসিমুখে বললেন, আরে মশাই, আপনারা যে আমার এখানে এক কেউটে সাপ ছেড়ে দিয়ে গেছেন, এ কি আগে আমি জানতুম?

কেন, হয়েছে কি?

সেই ত সেবার কল্যাণী দেবী আর আপনি মিলে ব্যবস্থা করে গেলেন যে, শ্রীমতী সাধনা টিফিন-ক্যারিয়ারে করে রোজ বিকেলের দিকে কোন এক বাড়িতে খাবার পেঁছে দেবে, আর যদি দরকার হয়, আমার এখানে মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিয়ে যাবে, এই তো? যাই হোক, নেপাল থেকে ফিরে দেখছিলুম, মেয়েটা ওই কাজ নিয়েই রয়েছে। আমার কাছ থেকে যেমন করেই হোক আপনার ওই শ্রীমতী সাধনা হারগাছটা আদায় করে নিল!

আমি হাসছিলুম—শ্রীমতী সাধনা আমার নয়, রতিবাবু।

নয়ত কি মশাই?—রতিবাবু হাস্যমুখর হয়ে বললেন, আপনি হলেন তার মহারাজ, আমরা সব অপোগণ্ড প্রজা! সে যাই হোক, একদিন আমি বললুম, সাধনা দেবী, তুমি তো ঘটা করে সেদিন হারগাছটা ফেরত নিয়ে গেলে! আজ

আমাকে একটা ভজন গান শুনিয়ে যাও দেখি ?

মেয়েটি প্রথমে বলল, রতিবাবু, আজ আমি ভয়ে-ভয়ে এসেছি। বোধহয় পুলিশ ইনফরমার আমাকে ক'দিন থেকে লক্ষ্য করেছে। আজ আমার গলা খুলবে না। আপনি এই চিঠিটা মহারাজকে পাঠিয়ে দেবেন দয়া করে।

রতিবাবু আমার হাতে ছোট একখানা চিঠি দিলেন। চিঠিখানার তারিখ পুরনো। অনেকটা যেন অনিচ্ছার সঙ্গেই তিনি চিঠিটা দিলেন।

হাসিমুখে বললুম, কিন্তু কেউটে সাপের কাহিনীটি কি প্রকার ?

হো হো করে হাসলেন রতিবাবু। বললেন, আরে সেই কথাই বলছি, মশাই। উপরোধে লোকে ঢেঁকি গেলে। উনিও গাইবেন না, আমিও তেমনি নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত ভজন একটা গাইয়ে ছাড়লুম ! মেযেটার গলা কিন্তু চমৎকার !

আমারও তাই ধারণা।

কিন্তু আমায় বোধ হয় একটু ভুলই হয়েছিল। ঠিক অতটা ভাবিনি।—রতিবাবু বললেন, আমার একটু 'ফিলিংস' হয়েছিল, মশাই। মেয়েটার কাঁধে দু'খানা হাত রেখে আমি একটু আদর জানাতে গিয়েছিলুম—

আমার মুখে ঈষৎ গাম্ভীর্যের ছায়া পড়ছিল।

তবে হ্যাঁ, মেয়েটি খুব নরম নয়—রতিবাবু বললেন, ওদিকেও বেশ হিসেবী। বললে, রতিবাবু, আমি একটা মিশন নিয়ে এ পাড়ায় আনাগোনা করি। আমাকে অন্য কিছু মনে করবেন না। আমার গায়ে কেউ হাত দেয় এ আমি পছন্দ করিনে। আপনি সরে দাঁড়ান—

রতিবাবু তেমনিই হেসে বললেন, ভাবলুম মেয়েরা অমন বলেই থাকে ! কুড়ি বাইশ বছরের মেয়ে তো আর নেহাৎ অজ্ঞান নয়। কিন্তু এখানেই আমার ভুল হয়ে গেল। মেয়েটি হঠাৎ আমাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে ছিটকিয়ে দিল। একেবারে পপাত ধরণীতলে।

বললুম, তারপর ?

খুব হাসলেন রতিবাবু। পরে বললেন, মেয়েটা কিন্তু যাবার আগে আবার শাসিয়েও গেল ! বললে, মনে রাখবেন রতিবাবু, আমি এমনিভাবেই আবার আসব। রোজই আসব—যতদিন আমার আসার দরকার। আমি ভয় পাবার মেয়ে নয়, মনে রাখবেন।

আমি আসবার সময় সহাস্যে বলে এলুম, রতিবাবু, আমাদের সকলের পক্ষেই একথা মনে রাখা দরকার, বিপ্লবী মেয়েরা ভিন্ন ধাতুতে গড়া। যারা জীবনের পরোয়া করে না, বিপদে ভয় পায় না, সামাজিক জীবনের প্রতি যারা মোহ রাখে না—তাদের সঙ্গে বিশেষ সতর্ক হয়ে আদান-প্রদান করতে হয় ! স্বয়ং ইংরেজও এই কেউটে সাপকে সমীহ করে চলে।

বাড়ি এসে চিঠিখানা খুলে দেখি, সামান্য তিনটে কথা। কিন্তু চিঠির তারিখটা পেরিয়ে গেছে পাঁচ-ছ'দিন আগে। সাধনা লিখেছে, আমার এক দিদিকে বলো

রেখেছি আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। আপনি এলে দু'একখানা গানও শোনাতুম। ইতি—

তারিখ পেরিয়ে গেছে, তবু গেলুম। ঠিকানাটা ভবানীপুরের প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের। বিকেলের দিকে গেলুম। গলিঘুঁজির মধ্যে ঢুকে বাড়ি খুঁজে বার করতে সময় নিল অনেক।

শেষ পর্যন্ত একটা ডাঙ্গাল ছোট মাঠ পেরিয়ে গলির ভিতরে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের পল্লী ঘেঁষে যেখানে গিয়ে দাঁড়ালুম সেটা দোতলা পাকাবাড়ি। ডাঙ্গাল মাঠের কাছাকাছি রয়েছে ট্যাক্সি ও ট্রাকচালক কয়েকজন পাঞ্জাবী শিখের আড্ডা। তখনকার ট্যাক্সির আকার ছিল অনেক বড়। একালের বেবি ট্যাক্সি তখন জন্মায়নি।

যাই হোক, এখন প্রায় সন্ধ্যা। এর মধ্যে এক ছাট পাতলা বৃষ্টিও হয়ে গেল। ওখানে দাঁড়িয়ে নম্বর মিলিয়ে দেখলুম—হ্যাঁ, এই বাড়িই তো বটে। একটি মেয়েকে খুঁজতে এসেছি, এজন্য আমার আড়ষ্টতা ছিল প্রচুর। তবু কড়া নাড়ানাড়ি করলুম। একটু পরে ভিতর থেকে যে দরজা খুলল, সেও একটি মেয়ে এবং প্রায় সাধনার সমবয়সী। সংকোচ কাটিয়ে আমি সাধনার কথা জানতে চাইলুম। মেয়েটি বলল, দাঁড়ান, আমি ডেকে দিই।

মিনিট তিন-চার পরে যিনি এলেন তিনি এক বয়স্কা মহিলা। তিনি আমাকে দেখেই কি জানি কেন হাসিখুশী মুখে বললেন, আসুন আসুন, ভেতরে আসুন। ক'দিন আগেই আপনার আসার কথা, সাধনা বলে রেখেছিল। আমিই তার সেই দিদি। আমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করবেন আসুন—

মহিলা আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন দোতলায় একেবারে ওঁদের শয়নকক্ষে। এক প্রবীণ ভদ্রলোক আমাকে অভ্যর্থনা করলেন হাসিমুখে। বললেন শুনুন মশাই, আমার নাম মৃত্যুঞ্জয়, কিন্তু আমাকে সবাই ডাকে কেষ্টবাবু। কারণ আমার গায়ের রং কালো! আর আমি কি ছেড়ে কথা কই? ওই দেখুন না আমার স্ত্রীর রং ফর্সা, কিন্তু নাম মলিনা। আমি ওঁকে ডাকি, ময়লাবাবু।

ভদ্রলোকের হালকা চালের পরিহাসে সাহস পেয়ে এবার বসলুম।

মলিনা দেবী বললেন, সাধনা থাকে পুণ্যাশ্রমে। গতকালও সে এসেছিল আমাদের এখানে। আসছে কাল আবার আসবে। ওর গান নাকি আপনার ভালো লেগেছে -বলছিল। আজ আপনার সঙ্গে আলাপ হল, এই আমাদের লাভ। কাল আসবেন আপনি?

বললুম, কাল আর বোধ হয় পারব না, আমি সামনের সপ্তাহে বুধবার আসব।

বেশ আমিও তাকে বলে রাখব। সাধনা আসে বেলা ঠিক তিনটের পর। আমিও সেই সময় হাসপাতাল থেকে ফিরি। আপনি চারটের সময় এলে আমাদের ঠিকই পাবেন।

যে মেয়েটিকে প্রথম দেখেছিলুম দরজার সামনে, সে এবার একটি কাঁচের গেলাসে করে চা এনে হাজির করল। কেষ্টবাবু এই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন, একে দেখে রাখুন, এর নাম অমিতবাবু।

মেয়েটা হেসে উঠে বোধ করি নিজের ভরন্ত স্বাস্থ্যটাকে একটু লুকোবার জন্য মলিনা দেবীর আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। বুঝলুম, এ মেয়ে অন্যপ্রকার।

মলিনা দেবী বললেন, এর নাম অমিতা। এদের বাড়ি ফরিদপুর। এও এসেছিল কলকাতায় আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিতে। ছ'মাস জেল খেটে ফিরেছে। পুণ্যাশ্রমে ওর জায়গা হয়নি। সাধনা ওকে রেখে গেছে আমার এখানে। বছর দুই আগে ওর স্বামীটি মারা গেছে।

সেদিন বিদায় নেবার আগে দেখলুম বছর দুয়েকের একটি শিশুপুত্র এখানে ওখানে গুটগুট করে ঘুরছে এবং তাকে সামাল দিচ্ছে বছর দশ-বারো বয়সের একটি ঘাগরাপরা রোগাটে বালিকা ঝি। কিন্তু সকলের সৌজন্য ও মিষ্ট ব্যবহারে সেদিন খুবই আনন্দ পেয়ে ফিরেছিলুম।

পুজো সংখ্যার লেখার জন্য তাগাদা আসছিল একটির পর একটি। বলা বাহুল্য, ছোট গল্প লিখতে হবে অনেকগুলি এবং দু-তিনটি ভ্রমণকথা। এদের সঙ্গে আছে বেতার কেন্দ্রের দুই-একটি ফরমাস। আমি এখন নিঃস্ব বটে, কিন্তু আগামী মাস দুই যদি নিয়মিত পরিশ্রম করি তবে পুজোর ঠিক আগে ও পরে আমি ধনাঢ্য ব্যক্তি!

আমি যখন কোমর বেঁধে কাজ করতে বসে গিয়েছি, সেই সময় একদিন শ্রীমতী শোভা তাঁর জেঠতুতো ছোট ভাইকে হঠাৎ আমার কাছে পাঠালেন। তখন প্রায় মধ্যাহ্নকাল। ভাইটি বলল, ছোড়দি বলে দিয়েছে এক্ষুনি আপনাকে নিয়ে যেতে। দুদিন ধরে ছোড়দি অপেক্ষা করছে। আমার সঙ্গেই চলুন।

বললুম, কী এমন জরুরী দরকার? আমকে তৈরী হতে হবে তো? তাঁকে গিয়ে বলো আমার একটা বিশেষ কাজ আছে আজ। সেটা সেরে তবে যাব।

ছেলেটি একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই চলে গেল। ওরা এখন আমার কুটুম্ব, সুতরাং আমার ধমক দেবার অধিকার আছে।

একটা ছোট গল্প শেষ করছিলুম। তাইতে গেল প্রায় ঘণ্টা দুই। স্নানাহার সেরে যখন বেরোলুম তখন প্রায় তিনটে বাজে। সোজা গিয়ে শ্যামবাজারের মোড়ে বাস ধরলুম। আমি যাচ্ছিলুম জনৈক ছোটখাটো প্রকাশকের কাছে। তিনি আমাকে অত্যন্ত কড়া একখানা চিঠি দিয়েছেন রেজেস্টারী যোগে। তাঁর কাছে আমি খেপে-খেপে কমবেশি তিনশ টাকা নিয়েছি। হয় এবার পুজোর মধ্যে তাঁর টাকা ফেরত দেবো নয়ত উপন্যাস লিখে দেবো—এই হ'ল চুক্তি। তাঁর চিঠিতে প্রচ্ছন্ন হুমকি ছিল। তাঁর সঙ্গে তারিখের উল্লেখ করে চুক্তি হয়েছিল।

যাই হোক, ঘণ্টাখানেক ধরে অনেক অনুরোধ-উপরোধ করা সত্ত্বেও তিনি আরও মাস ছয়েক সময় দিতে চাইলেন না। তখন শুধু বেগতিক নয়, অন্ধকার

দেখলুম। আমার সাহিত্য-জীবনে বড় একটা কথার খেলাপ হয় না। প্রতিশ্রুতি দিলে পালন করি, নির্দিষ্ট তারিখ মেনে চলি এবং সম্পাদক বা প্রকাশককে কখনও হয়রান করিনে। সামান্য একটা কলম আর একখানা খাতা—এই তো আমার মূলধন! এর ওপরে শুধু আমি নয়, প্রত্যেক লেখকই দাঁড়িয়ে থাকে। সুতরাং অসময়ে যে প্রকাশক বা কাগজের মালিক অগ্রিম টাকা দিয়ে তোমাকে বিপদের থেকে উত্তীর্ণ করে দেয়, তার বিশ্বাসকে তুমি নষ্ট করবে? তুমি লেখক, নিত্য-অভাবগ্রস্ত, তোমার অসময় কি আর আসবে না বলতে চাও?

সুতরাং আমি বললুম, গিরীনবাবু, রাগ করবেন না। আগামী একমাসের মধ্যে হয় আপনার নগদ তিনশ টাকা, আর নয়ত একখানা নতুন লেখা উপন্যাস আপনার হাতে দিয়ে যাব। আমার ভাগ্নির বিয়েতে যে অসময়ে আপনি টাকা দিয়েছিলেন সে আমি ভুলিনি।

গিরীনবাবুর লম্বা মুখখানা লম্বাই হয়ে রইল। আমি চলে গেলুম।

সুকিয়া স্ট্রীটের মোড় থেকে আবার বাসে উঠলুম। এখান থেকেও কালীঘাট দু' আনা। যেতে যেতে পটলডাঙ্গার মোড়ে একটা সিগারেট ধরালুম। তখন চলন্ত বাসের মধ্যে সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ নয়। পথের দিকে চেয়ে নিজের মনে ধূমপান করা মানে দুশ্চিন্তার মধ্যে ডুবে যাওয়া। তিনশ টাকা! বস্তুত, তিনশ টাকা একসঙ্গে জীবনে কবারই বা দেখেছি? সুতরাং চৌরঙ্গী দিয়ে যাবার সময় আরেকটা সিগারেট ধরিয়েছিলুম!

হাজরা রোডের মোড়ে নেমে যখন শ্রীমতী শোভার ওখানে গিয়ে পৌঁছলুম তখন সন্ধ্যা ছ'টা বাজে। আমার মেজাজটা ভাল ছিল না।

আমি যখন ওঁদের বাড়ির দোতলায় উঠে এলুম শ্রীমতি শোভা আমাকে একবার নিরীক্ষণ করলেন। পরে বললেন, এত দেরি করলেন যে? সেই পাগল মেয়েটার ওখান থেকে হয়ে এলেন বুঝি?

ওঁর দিকে ফিরে দাঁড়ালুম। ওঁর কথায় শ্লেষের আওয়াজ ছিল। সুতরাং আমার মুখে এসে পড়ল—সেখানে গেলে কি আর এত সকাল-সকাল ছেড়ে দিত? বসে বসে তার গান শুনতুম।

শ্রীমতী শোভা উঠে আমার সঙ্গে তাঁর ঘরে এসে ঢুকলেন।

॥ ৪১ ॥

মেয়েদের মধ্যে প্রকৃত বিপ্লববাদিনীর সংখ্যা তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে ছিল প্রচুর। যে যুগে সামাজিক অনুশাসনে ও বহুপ্রকার কুসংস্কারে বৃহত্তর নারীসমাজের বন্ধন জর্জর মন মুক্তির পিপাসায় আকুলি-বিকুলি করত, সেইকালে বিপ্লববাদিনী মেয়েরা বিশেষ এক দেশাত্মবোধের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভিতরে ভিতরে কাজ করে গেছে। এই অসমসাহসিকা ও শিক্ষিতা মেয়েরা আপন আপন কর্মব্যস্ততার মধ্যে বোধ হয় অতটা তলিয়ে দেখেনি যে তারা তাদের অজ্ঞাতে ভবিষ্যৎ কালের নারী-সমাজের সামনে

কি বিপুলাকার সমাজবিপ্লবের অবদান রেখে যাচ্ছিল। তাদের আত্মত্যাগ, দুঃখবরণ, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিমুখতা, গৃহজীবনের প্রতি অনাসক্তি—এগুলি তাদেরকে এক মহৎ জীবনে উন্নীত করেছিল। তাদের সেই নিঃস্বার্থ কর্মজীবন একদা অনুপ্রেরণার বস্তু ছিল। নারীসমাজ উদ্দীপ্ত হয়েছিল তাদের উদাহরণে।

তারা দেশ বলতে জানত দেশমাতৃকা—যাঁর কোটি কোটি সন্তান পরাধীনতায় পঙ্গু। তারা বিপ্লবী ছেলেদের মতোই পরাধীনতার জ্বালার মধ্যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল। তারা ভাবতো শৃঙ্খলতা, উৎপীড়িতা দেশজননীকে রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করাই তাদের জীবনের একমাত্র ব্রত। সেই কারণে ছেলেই হোক বা মেয়েই হোক —বিপ্লববাদের মধ্যে খুঁজে পেত আত্মোৎসর্গের এক অপার মহিমা।

যাই হোক, এবার আগের কথায় ফিরে আসি। রাজনীতির ক্ষেত্রে এই সময়ে একটা চিন্তাসংকট দেখা যাচ্ছিল। বাঙ্গলায় অহিংস ও গান্ধীবাদ তখন কতকটা মন্দীভূত, অন্য দিকে বাঙ্গলার বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তার প্রচণ্ড আসুরিক শক্তির দ্বারা তাদের বর্ণিত 'সন্ত্রাসবাদের' মূলোচ্ছেদ করতে সচেষ্ট। এক দিকে তাদের বলদর্প ও হিংস্রতা অন্য দিকে বিভিন্ন নবপ্রবর্তিত আইনেরকাঠিন কড়াকড়ি এবং সংবাদ পত্রাদির কণ্ঠরোধ। এই সমস্ত একত্র মিলে বাঙ্গালীর মানসলোকে কেমন একটা বিভ্রান্ত দেখা যাচ্ছিল, এবং এই হিংসাবাদের ও অহিংসাবাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে আরেকবার আত্মবিচার করছিল। এই আত্মবিচারের স্থিতিশীলতার মাঝখানে যখন মেয়ে ও পুরুষ বিপ্লব-বাদীদের দীর্ঘবিলম্বিত বিচার-প্রহসন চলছে, তখন বাঙ্গালীর মনে আরেক দুর্ভাবনা দেখা দেয়—বৃটিশ গভর্নমেণ্ট বিপ্লবী মহিলাদেরকে আন্দামান দ্বীপান্তরে নির্বাসিত করতে যাচ্ছেন কিনা! বোধ হয় যাচ্ছেন—এইরূপ একটা সিদ্ধান্তের কথাই শোনা যাচ্ছিল। তখনকার দিনে আন্দামান 'সেলুলের' জেলের একটা আন্তর্জাতিক অখ্যাতি ও কলঙ্ক প্রচলিত ছিল। সেখানে যে কোনও শ্রেণীর কয়েদীই হোক না কেন, তাদের মানইজ্জত, মনুষ্যত্ব, মর্যাদা,সংস্কৃতি—সমস্তই ধ্বংস হয়ে যায়। সেখানকার প্রশাসন ব্যবস্থা এইপ্রকার যে, কয়েদীকে দিনে দিনে তিলে-তিলে পশুপ্রকৃতিতে পরিণত করা হয়। শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির বিভিন্ন রচনায় ও গ্রন্থে আন্দামান সেলুলের জেলের বীভৎস চিত্র বর্ণিত ছিল এবং এই জেলের সম্বন্ধে সকলের মনে একটা স্বাভাবিক আতঙ্ক দেখা যেত।

বোধ হয় এই সময়েই বাংলার গভর্নর স্যার এণ্ডারসন শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবির সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। এই আলাপ আলোচনার আগে মহাকবি তাঁর অপূর্ব উপন্যাস 'চার অধ্যায়' রচনা করেছিলেন। এই উপন্যাসটি রচনার ফলে কেউ কেউ কবির কাছে অনুযোগ জানিয়েছিলেন বলে শুনেছি, কিন্তু এই বইটির ভিতরে যে মনোরম বাক্যবিন্যাস ও কাব্যচ্ছটা প্রকাশ পেয়েছিল, সেটির জন্য কাব্য ও সাহিত্যরসিক পাঠক মহলে এ বইটি তখন মুখে মুখে ফিরত। প্রকৃত-পক্ষে 'শেষের কবিতা' ও 'চার অধ্যায়' বাংলা সাহিত্যে গদ্য রচনার একটি নতুন রীতির প্রবর্তন করেছিল।

যাই হোক, ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত সমাজের কয়েকজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলা বিপ্লবীকে আন্দামানে নির্বাসিত করার খবরটি যখন প্রচারিত হয়েছে, তখন মাতৃপূজারী বাঙ্গালীর মনে প্রবল উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের কাছে যান। রবীন্দ্রনাথও তখন এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। তিনি বোধ করি বৃটিশ গভর্নমেন্টের এই অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত নিয়ে অবিলম্বেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

পরবর্তীকালে দেশবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল—যখন শুনল মহিলা বন্দীর কারোকে আন্দামানে পাঠানো হচ্ছে না!

তখন উপমহাদেশ ভারতবর্ষের ভৌগোলিক আকার অতি বৃহৎ ছিল। তার এই সুবৃহৎ আয়তনের সঙ্গে বর্মা, মালয়, সিঙ্গাপুর, সিংহল, বালুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, সম্পূর্ণ কাশ্মীর ও চিত্রল এবং উত্তর-পূর্ব দিকে বর্মার প্রান্তে চীন সীমান্ত—এই বিস্তৃত ভূ-ভাগকে মিলিয়ে তখন বলা হ'ত ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার বা ভারত সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের মধ্যে শুধু ছিল কয়েকটি ফরাসী ও পর্তুগীজের ছোট ছোট উপনিবেশ—যারা ইংরেজের সঙ্গে মন মিলিয়ে থাকত। ইংরেজ আঠারো শতকে খুইয়েছিল আমেরিকাকে, কিন্তু উনিশশতকে নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর থেকে পৃথিবীব্যাপী ক্রমবর্ধমান বৃটিশ সাম্রাজ্যের আকাশপথে নাকি সূর্য অস্ত যেত না!

কিন্তু এই ভারত সাম্রাজ্যের ভিতরেই ছিল দু-তিনটে ভাগ। তার একটা ভাগ হ'ল বৃটিশ ভারত, দ্বিতীয় ভাগ সামন্ত ভারত, তৃতীয় ভাগে পড়ত কাশ্মীর, হায়দরাবাদ প্রভৃতি। কিন্তু ইংরেজদের বশংবদ না হয়ে তাদের গত্যন্তর ছিল না। যাই হোক, এই ব্রিটিশ ভারতে তখন গান্ধীজীর অহিংসাবাদী রাজনীতি আপন প্রভাব ও আদর্শকে চারিদিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং তারই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে খান আবদুল গফুরখান সীমান্তের প্রদেশ ও উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে অহিংসাবাদে প্রভাবিত করেন। তাঁর নাম হয় 'সীমান্ত গান্ধী'।

একমাত্র বাঙ্গলা ছিল এর কিছু ব্যতিক্রম। এই প্রদেশে সাধারণভাবে গান্ধীবাদ বা অহিংসা কতকটা যেন দুর্বল ছিল এবং এই নিয়ে সর্বভারতের সঙ্গে বাঙ্গলার চিন্তাধারার মাঝে মাঝে সংঘর্ষ বেধে উঠত। বাঙ্গালী মার খেলে শান্ত থাকে না এবং আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত হানতে চায়—তার এই স্বভাবধর্মের সঙ্গে গান্ধীর রাজনীতির অমিল ঘটত পদে পদে। তখন কেবলমাত্র পাঞ্জাব বাঙ্গালীর বীরোচিত চরিত্রের তারিফ করত। অত বড় আত্মত্যাগী, সর্বদেশের মাননীয় নেতা, বিরাট পুরুষ জে. এম. সেনগুপ্ত—বাঙ্গালী তাঁকে প্রণাম জানালো বটে, কিন্তু যাঁকে মাথায় তুলে নিয়ে বাঙ্গালী সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসল তিনি সুভাষচন্দ্র বসু। ভালবাসা সকল যুক্তি-তর্কের অতীত। সেই ভালবাসা যুগে যুগে বেড়েই চলেছে।

এই সব কথা নিয়ে যখন তোলপাড় হচ্ছিল তখন একদিন শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভার ওখানে কয়েকজন বিপ্লববাদীর সমাবেশ হয়েছিল। ওঁদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা উভয়েই ছিলেন। যত দূর মনে পড়ছে—সেদিন উপস্থিত ছিলেন বিপিন গাঙ্গুলী

মহাশয়। তিনি দীর্ঘকায়, বলবান ও সৌম্যদর্শন পুরুষ। চোখে মোটা চশমা এবং প্রসন্ন মুখ ও স্বল্পভাষী ব্যক্তি। তাঁর সম্বন্ধে তখন বহু রকমের রোমাঞ্চকর কাহিনী প্রচলিত। তাঁর অসমসাহসিক বিপ্লবী অভিযান নাকি সুদূর দক্ষিণ প্রাচ্যেও প্রসারিত। তিনি নানাবিধ ছদ্মবেশ ধারণ করে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে নিঃশব্দে ভিতরে ভিতরে বহু কাজ করে যান—এই ধরনের অসংখ্য জনশ্রুতি রয়ে গেছে তাঁর সম্বন্ধে। তিনি বোধ করি সকল সময় প্রকাশ্য রাজনীতিতে এসে পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়াতে চাইতেন না এবং তাঁর মুখ থেকে তার আত্মকাহিনী সম্পূর্ণভাবে কেউ কখনও শোনেনি। তিনি কখনই যেখানে সেখানে মুখ খুলতে প্রস্তুত হতেন না। তাঁকে সেই প্রথম দেখে আমি অভিভূত হয়েছিলুম।

বিপিনবাবু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতুল সম্পর্কীয় ছিলেন এবং সেদিন অনেকের মুখেই শোনা যেত শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসের 'সব্যসাচী' চরিত্রে বিপিন গাঙ্গুলী মহাশয়েব ছায়া পড়েছে! যাই হোক, তখন বিপিনবাবু বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসের চোখে একজন অতিশয় শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

প্রকৃত বিপ্লববাদ নিত্য নবীন জীবনের প্রগতিকে ববণ করে চলে, যেটি বৃহত্তর-মানবসমাজের কল্যাণের অনুকূল। সেই বিপ্লববাদ যে-কোনও স্বাধীন দেশেও মাথা তুলতে পারে। কিন্তু পরাধীন দেশের প্রথম বিপ্লব হ'ল রক্তমুখী, কেননা, বিদেশীর শৃঙ্খল ছেদন করে সর্বাগ্রে তার মুক্তি পাওয়া দরকার। বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায় হ'ল প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা—যেটির অপর নাম হ'ল অন্তর্দ্বন্দ্ব! তৃতীয় পর্যায়ের বিপ্লব শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে—যার প্রভাবে জাতির মূঢ়তা. কুসংস্কার, অজ্ঞান, নিরক্ষরতা এবং পুরনো চিন্তাভ্যাসকে দূর করা যায়। চতুর্থ পর্যায়ের বিপ্লব, দেশজোড়া সংগঠন ও অর্থনীতির সর্বাধুনিক প্রয়োগ ও বণ্টন ব্যবস্থা।

সেদিনের আলোচনা ছিল এই, আমরা এখন বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে রয়েছি। এখন আমাদের জীবন বিসর্জন দেওয়ার গৌরবময় যুগ চলছে!

এই বছরেই জুলাই মাসে রাঁচিতে বন্দীদশার মধ্যে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ের মৃত্যু ঘটে। তিনি তৎকালে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা জে এম সেনগুপ্ত নামে পরিচিত এবং ভারতীয় কংগ্রেসের অন্যতম অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এই সৌম্যদর্শন, দীর্ঘাকার ও নির্ভীক দেশনেতার আকস্মিক মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জওয়াহরলাল নেহেরু প্রভৃতি অতিশয় মর্মাহত হয়েছিলেন। সেই দেশনেতার শোকযাত্রায় প্রায় দশ মাইল দীর্ঘ পথে বন্ধুবর সুধীন্দ্র নিয়োগীর সঙ্গে আমিও হেঁটেছিলুম।

বোধ হয় ওই দিনই অপরাহ্ণকালে সুধীন্দ্রর আমন্ত্রণে শ্রীমতী সাধনা এসেছিল ওঁদের মোহনলাল স্ট্রীটের বাড়িতে। এই বিপ্লববাদিনী মেয়েটিকে আমরা দেখছি প্রায় কয়েক মাস ধরে। এ মেয়ের ভয়-ডর স্বাভাবিক কুণ্ঠা, কথাবার্তা ও আচার-আচরণে মেয়েলী জড়তা ইত্যাদি দেখা যায় না। সাধনা নিজের পোশাকী নামটি

আর ব্যবহার করছে না। 'সাধনা'বলেই চলছে! তাদের গ্রামে এই নামেই সে পরিচিত। সে যাই হোক, ওর প্রথম দিনের সেই কণ্ঠসঙ্গীত আমার পক্ষে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

সাধনার আরেকটি গুণ, সে তার জানা-জগতের ভিতর থেকে একেকটি চিত্তাকর্ষক সত্য কাহিনী যখন বলতে থাকে, আমরা অবাক হয়ে শুনি। সেদিন সুধীন্দ্র ধরে বসল, না আজ গান নয়। আমরা শুনব বলে বসে আছি। বলুন আপনার সেই কেষ্টবাবু আর মলিনাদির খবরটা।

সাধনা আমার দিকে তাকাল। আমি বললুম, ও'রা স্বামী-স্ত্রী আমার বিশেষ পরিচিত। তবে কাল রাত্রের ঘটনাটা খুবই মর্মান্তিক। তোমার বলার মধ্যে পরনিন্দার ছোঁয়াচ না থাকলেই আমি খুশী হবো।

সাধনা সংক্ষেপেই বলতে আরম্ভ করল,—শুনুন সুধীনবাবু, মলিনাদি হলেন চেৎলার এক গরীব গৃহস্থের মেয়ে। তিনি প্রথমবার বিধবা হন একটি ছেলেকে নিয়ে। পরে আবার বিয়ে করেন। দ্বিতীয়বার মলিনাদি বিধবা হন একটি মেয়েকে নিয়ে। কিন্তু ওই দুটি সহোদর ছেলেমেয়েকে মানুষ করে তোলার জন্য তিনি চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে নার্সের কাজ নেন। এর আগে আমার সঙ্গে মলিনাদির জেলে আলাপ হয়। যাই হোক, সেবাসদনে একবার এক ভদ্রলোক রোগী হয়ে আসেন। তাঁর গায়ের রং খুব কালো তাই তাঁকে সবাই বলত কেষ্টবাবু। মলিনাদির সঙ্গে কেষ্ট-বাবুর আলাপ পরিচয় হয় ওই সেবাসদনেই। কেষ্টবাবুর তখনও বিয়েহয়নি। তিনি তখন চাকরি করেন বার্ড কোম্পানিতে। কেষ্টবাবু কেঁদে-কেটে রাজী করান মলিনাদিকে। দুজনের বিয়ে হয়। কিন্তু মলিনাদি চেপে যান তাঁর প্রথম বিয়ে আর ওই ছেলে! ছেলেটার বয়স যখন চোদ্দ, আর ওই দশ বছরের মেয়েটা—যাকে তুমি দুবার দেখেছ মহারাজ, ওর নাম বুনি। এর পর বছর দুয়েকের মধ্যে মলিনাদির তৃতীয় সন্তান হ'ল আরেকটি ছেলে। ছেলেটি এখন বছর দুয়েকের—তুমি তাকেও দেখেছ। কেষ্টবাবু বুনিকে ভাত-কাপড় দিতে রাজী হলেন এই শর্তে যে সে বাচ্চা ছেলেটার ঝি হয়ে থাকবে আর ঘরদোরের কাজ করবে। মলিনাদির চাকরি আছে সেবাসদনে। তিনি বাড়ি আসেন বেলা তিনটের মধ্যে, কেষ্টবাবু আপিস থেকে ফেরেন বেলা সাড়ে পাঁচটা ছটায়। এরই ফাঁকে ফাঁকে বড় ছেলেটা সেই চেৎলা থেকে ছুটকিয়ে আসে মাকে দেখতে মাঝে মাঝে। ছেলেটা খুব মিষ্টি, খুবই ভদ্র। কিন্তু মাকে আর বোনকে না দেখে সে থাকতে পারে না। অনেক সময় লুকিয়ে এসে মলিনাদির কাছে কান্নাকাটি করে যায়। ছোট বোন বুনি তার বড়ই প্রিয়। কিন্তু কেষ্টবাবুকে সে বাঘের মতন ভয় করে।

সুধীনবাবু, এইবার শুনুন শেষটুকু। আজ দিন পনেরো হতে চলল বুনির টাইফয়েড হয়েছে। ওর চিকিৎসা বোধ হয় কিছু নেই। তিন-চার দিন হ'ল বুনির অবস্থা ভাল নয়। ওর ভাইটাকে দু-এক দিন ও-বাড়ির আশেপাশে দেখে কেষ্টবাবুর সন্দেহ হয়, বোধ হয় ছেলেটা ছিঁচকে চোর! আর বুনির অবস্থা দেখে মলিনাদি কেঁদেকেটে কেষ্টবাবুকে দিন তিনেক আপিস যেতে দেয়নি। আমিও জানিনে গত

কয়েক দিনের ঘটনা।

আমরা দুই বন্ধু চুপ করে তাকিয়েছিলুম সাধনার মুখের দিকে। সাধনা বলল, আজ সকালে খবর নিতে গিয়ে দেখি, পুলিস ঘেরাও করেছে ওদের বাড়ি। ওখানে দাঁড়িয়েই সবটা শুনে এলুম। কাল মাঝরাত্তিরে বড় ছেলেটা আর থাকতে পারেনি! রাত বারোটার পর ওর দিদিমাকে লুকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সেই চেৎলা থেকে এসেছে! ছোট বোনটা বোধ হয় বাঁচবে না সে শুনেছে। তখন অনেক রাত। কেষ্টবাবু ছিঁচকে চোরের ভয়ে লাঠি নিয়ে সজাগ হয়ে থাকবেন কে জানত? ছেলেটা রেন-পাইপ বেয়ে দোতলার বারান্দার ধার পর্যন্ত যখন প্রায় উঠেছে, এমন সময় পিছন থেকে তার মাথার উপর দড়াম করে পড়ল লাঠির ঘা! ছেলেটা দোতলার উঁচু থেকে পড়ল নিচের শান বাঁধানো গলিতে। একেবারে রক্তগঙ্গা। চারদিকে হইহই। চোরকে মেরেছে কেষ্টবাবু! মলিনাদি তখনও কিছু বুঝতে পারেনি। তারপর পুলিস এল, ছেলেটাকে তুলল। নিচে নেমে এসে মলিনাদি পুলিসের টর্চের আলোয় দেখল নিজের ছেলেকে! চিৎকার করে মলিনাদি ছেলেটার ওপর পড়ল বটে, কিন্তু ওর সাড়া না পেয়ে ওখানেই জ্ঞান হারালো। আজ ভোররাত্রে ছেলেটা মারা গেছে। বুনি আজও আছে, আসছে কাল বোধ হয় আর থাকবে না।

পুলিসের কাছে আজ সকালে মলিনাদি বলেছে, যে ছেলে মারা গেল সেই ছেলেই আমার! কোলের ছেলেটা আমার কেউ নয়! ওটা ওই রাক্ষসের,—হাসপাতাল থেকে ওটাকে কুড়িয়ে এনেছে!

সকালবেলা আমি গিয়ে ঢুকতেই কেষ্টবাবু চেঁচিয়ে বলল, তোমাকে বলে রাখলুম সাধনা, মলিনাকে আমি তাড়াবো! আমার বাচ্চাটাকে মানুষ করবার জন্যে আবার আমি সেবাসদনের একটা ঝিকে বিয়ে করে আনব। এ-কথা জানিয়ে দেবো, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নেই!

ঘটনাটা আমাদের সামনে একটি করুণ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ওঁরা সকলেই আমার পরিচিত। বুনি ও বুনির ভাই, মলিনাদি ও কেষ্টবাবু—এদের সকলের মধ্যে সম্পর্কের এই জটিলতাটা কেবল আমার জানা ছিল না।

এই মর্মন্তুদ ঘটনাটি আমার পক্ষে এমনি অবিস্মরণীয় ছিল যে, এর কুড়ি-একুশ বছর পরে একদা বোম্বাইতে বসে চিত্রনির্মাতা নীতীন বসু মহাশয়কে এই কাহিনীটি কথায় কথায় বলি এবং তিনি এই গল্পটির নাম রেখেছিলেন, 'রেন পাইপ'।

যাই হোক, আরেকদিন এখানেই সুধীনের সঙ্গে সাধনার বিতর্ক বেধেছিল। সাধনা বলেছিল, কিছু মনে করবেন না, কয়েকজন মহিলা ও পুরুষ সম্পর্কে আপনাদের চোখে ঠুলি বাঁধা আছে!

সাধনা তৎক্ষণাৎ তিন-চারজনের নাম করল, এবং আমার দিকে ফিরে বলল, তুমি জান না মহারাজ, চোরাবালির ওপর দিয়ে তুমি হেঁটে যাচ্ছ! সত্য কথাটা নিন্দে নয়, মহারাজ। শুনতে অপ্রিয়, কিন্তু সত্যটা সত্যই থাকে।

সুধীন্দ্র বলল, সব সময় সত্যি বলতে আপনার ভয় করে না ?

ভয়!—সাধনা যেন দপ করে উঠল,—চোদ্দ বছর বয়সে দেশ-গাঁ ছেড়ে পালিয়ে আসি। রাত্তিরে নৌকোয় নদী পেরোই একা। অন্ধকারে পথ চিনে চার মাইল হেঁটে একা যাই রেল-স্টেশনে। সঙ্গে ছিল একটা পুঁটলি। তাই নিয়ে অত রাত্তিরে বিনা টিকিটে কলকাতার ট্রেনে উঠি। সেই মেয়েকে ভয়ের কথা বলছেন, সুধীনবাবু ?

সুধীন্দ্র বোধ করি ঠিক জায়গায় ঘা দিয়েছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে এল এক বেপরোয়া তেজস্বিনী মেয়ে। সাধনা পুনরায় বলল, তোমার মধ্যে বিশ্বাসের জোর নেই, মহারাজ। এবার তুমি সব বাঁধন কেটে বাইরে এসে দাঁড়াও।

বেশ, তাহলে একটু সৎ পরামর্শ দাও দেখি !

আমার পরিহাসের ভঙ্গী দেখে সাধনা হেসে উঠল। তবুও বলল, তোমরা লেখক, সাহিত্য নিয়ে তোমাদের কাজ। তোমরা হয়তো অনেক জানো। কিন্তু বাইরের রঙ্গীন খোসা দেখে ভেতরের শাঁসের বিচার নাই করলে। আমাকে তোমরা দেখেছ অনেকবার কিন্তু জানতে চেয়েছ কি—জেল-খাটা বিপ্লবী মেয়ে ছাড়া আমার আরো কিছু ইতিহাস আছে ?

আমি চুপ করে রইলুম। সুধীন বলল, কিসের ইতিহাস ? আপনি দেশ-গাঁ ছেড়ে এসেছেন ছোটবেলায়,—এ ছাড়া অন্য কিছু ?

সাধনা এবার হেসে উঠল। আমার দিকে ফিরে বলল, মহারাজ, তুমি একদিন বলেছিলে তোমার সাহিত্যের কারবার কল্পনা বা স্বপ্ন নিয়ে নয়, প্রত্যক্ষ জীবন নিয়ে। সেদিন থেকে আমি ভেবে এসেছি আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আর অভিজ্ঞতা একদিন হয়তো তোমার কাজেও লাগতে পারে। দেড় বছর না হয় জেল খেটেছি, কিন্তু পাঁচ-ছ' বছর ধরে এই অচেনা কলকাতায় একা মেয়ের জীবন ঠিক সোজা পথে হাঁটেনি, মহারাজ।

সাধনা হাসছিল।

সুধীন্দ্র বলল, বাঁকা পথ কত দূর পর্যন্ত গিয়েছিল, একটু না-হয় বলেই যান ?

সাধনা বলল, যত দূর পর্যন্ত আপনাদের কল্পনার দৌড়। তবে মনে রাখবেন, নিরুপায় ছেলে পথে- পথে ভিক্ষে করে, রাস্তার কলে চান করে নেয়, রাত্তিরে ফুটপাথে শোয়, দরকার হলে পকেট মারে, নয়তো ছিঁচকে চোর হয়। কিন্তু চোদ্দ-পনেরো বছরের নিরুপায় মেয়ে,—তার কোন্ পথ খোলা ছিল সেদিন ? কলকাতার হালচাল কতটুকু সে জানত ? ছেলেদের দায় শুধু প্রাণ বাঁচানো, মেয়েদের দায় প্রাণ বাঁচানোর সঙ্গে মান বাঁচানো ! বলুন না সুধীনবাবু, সেই সেদিনের মেয়েটার মানসম্ভ্রম কিছু বাঁচলো কি ?

আমরা চুপ করে সাধনার দিকে চেয়ে রইলুম।

হাসিমুখে সাধনা বলল, না মহারাজ, বোধ হয় বাঁচেনি, বাঁচানো যায়নি তাকে কেউ একজন হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিল অন্ধকার পাতালের নিচে, যেখানে অচেনা

জন্তুরা চার পাশে কিলবিল করে।

ক্ষমা করবেন—সুধীন বলল, ঠিক বুঝতে পারছিনে। আপনার কথায় আমাদের মনে নানা প্রশ্ন আসছে। পাতালের নিচে কারা সেই জন্তু?

আবার হেসে উঠল এই বিপ্লববাদিনী। বলল, সেই জন্তুদের দুটো হাত আর দুটো পা। তারা রোগে-দুঃখে কাঁদে, ভাত-কাপড়ের জন্যে কাঁদে, দুর্দশায় আর অপমানে কাঁদে, অবাঞ্ছিত সন্তানরা যখন কোলের মধ্যে শুয়ে না খেয়ে মরে—তখন কাঁদে ঘরের কোণে বসে। সে ঘরে আলো জ্বলে না, ডাক্তার আসে না, ওষুধ-পথ্যি পেঁছয় না। সেই ঘর কি আপনারা দেখেছেন কখনো, সুধীনবাবু? কিন্তু আমি সেই মেয়ে-জন্তুদের মধ্যে এক মাস বাস করে এসেছি। মেয়েদের অপমানের জগৎ একটু অন্য রকম, মহারাজ! বলো তো সত্যি করে, মেয়েরা কবে স্বাধীন হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবে? এই যে আমি পড়াশুনো ছাড়তে বাধ্য হয়েছি, কিন্তু আমি তো একেবারে মুখ্যু নই;—তবু আমার বাঁচবার কি কোনও পথ কোথাও খোলা আছে?

বললুম, তুমি একটা ভাল দেখে বিয়ে করো, সাধনা।

বিয়ে!—সাধনা বলল, বিয়ে যারা করবে না, তাদের কি বাঁচবার কোনও অধিকার নেই? আর বিয়ে যারা করবে তারাও কি পুরুষের পায়ে ধরে চিরকাল ভাতকাপড় আদায় করে চলবে? কথার জবাব দাও, মহারাজ!

সুধীন্দ্র তর্ক করতে গেল, সাধনা থামিয়ে দিল। বলল, ভদ্রঘরের মেয়েদের কথা রাখুন, সুধীনবাবু। তারা পরের খায়, পরের আশ্রয়ে থাকে, পরের পয়সায় নবাবি করে, পরের পায়ে ধরে বাঁচে! হয় বাপ, নয় ভাই, নয় স্বামী, নয়তো মাসী-পিসী, আর নয়তো বোন ভগ্নিপতির ঘরকন্না—এই তাদের ভরসা। কিন্তু এরা সবাই যদি তাড়িয়ে দেয় তবে বাড়ির মেয়ে বেরিয়ে পড়ে ঝি-গিরি কিংবা রাঁধুনীগিরির কাজ খুঁজতে। আবার কাঁচা বয়সের নিরক্ষর মেয়ে যদি স্বাধীনভাবে হাতের কোনও কাজ নিয়ে বাঁচতে চায়, তবে কোন্ কাজের যোগ্য হবে সে? সে চাইছে ভদ্রজীবন। কিন্তু পথের কুকুরের কামড় কথায় কথায় সামলাতে গিয়ে সে কি কখনো নিরাপদ জীবন খুঁজে পায়? সুতরাং তখন শুধু থাকে তার কাঁচা বয়সের দেহখানা!—ওই দিয়েই সে বাঁচতে চায়, ওইটেই তার মূলধন! মহারাজ, আমি বহু ভাল মেয়ে দেখেছি, বহু আদর্শবাদী বেকার মেয়ের মধ্যে বাস করেছি। তাদের অধিকাংশ মেয়ের স্বভাব চরিত্র শুচিশুদ্ধ। এরা দেশের কল্যাণে জীবন দিতে প্রস্তুত। তারা শিক্ষিত, ভদ্র—কিন্তু তাদের একজনও কেউ আমার এই গল্প শুনলে নাক সিঁটকোয় না। কারণ তারা জানে মেয়েদের অন্ন-বস্ত্র সংস্থানের বিশেষ কোনো পথ কোথাও খোলা নেই।

অবাক হয়ে সাধনার অকুণ্ঠ আলাপ শুনছিলুম। এবার বললুম, আচ্ছা সাধনা, তুমি কি ঝগড়াঝাঁটি করে দেশ ছেড়ে চলে এসেছিলে?

হাসিমুখে এবার সাধনা বলল, না, ঝগড়া কেন করব? হঠাৎ একদিন আমি সন্ধ্যের পর নিরুদ্দেশ হয়েছিলুম।

তোমাকে সাহস দিয়েছিল কেউ?

সাধনা সোজা তাকালো আমার দিকে। বলল, না কেউ না। নিজের মধ্যেই সাহস খুঁজে পেয়েছিলাম মহারাজ! তাছাড়া আমি ভেবে দেখেছি, আমার মধ্যে আধখান হ'ল ছেলে!

সুধীন হেসে উঠল। তারপর তার এক প্রশ্নের উত্তরে সাধনা বলল, না, গয়না আমি ছুঁইনে! সঙ সাজিনে। যে-হাতে খাঁড়া থাকার কথা, সে-হাতে চুড়ি হ'ল বাঁধন, বশ মানা, দাসীপনা! আচ্ছা সুধীনবাবু, এবার দেখুন না কত বাজলো!

সুধীন তার হাতের দিকে তাকিয়ে বলল, প্রায় সাতটা।

সাধনা উঠে দাঁড়াল। আর নয়, এবার তাকে যেতে হবে। হাসিমুখে সুধীন বলল, একটা কথা কিন্তু বাকি থেকে গেল।

কি বলুন?

আপনি যে মাসখানেকের জন্য পাতালবাসিনী হয়েছিলেন, সেই ইতিবৃত্তটি কবে শোনাচ্ছেন?

ওঃ, সেই গল্প!—সাধনা বলল, সে প্রায় সাত-আট বছর হতে চলল। বেশ তো বলব একদিন!

সাধনা সেদিনের মতো চলে গেল।

আমরা কতক্ষণ চুপ করে রইলুম। এই ছন্নছাড়া মেয়েটিকে যতবারই দেখেছি এবং ওর মুখ থেকে যতবারই ব্রহ্মসঙ্গীত বা দেহতত্ত্বের গান শুনেছি—আমাদের শ্রদ্ধানুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ওর সংযম, চরিত্রবল ও সকল বিষয়ে নিরাসক্তি সেদিন অনেককেই মুগ্ধ করেছিল।

সেদিন আমি যাচ্ছিলুম আমার ভ্রমণকাহিনীতে বর্ণিত "রাধারানী"র সঙ্গে দেখা করতে—যিনি নিজেকে "বেশ্যা" বলে অভিহিত করে আমাকে তাঁর ঠিকানা দিয়েছিলেন এবং মাথার দিব্যি দিয়ে আমন্ত্রণ করেছিলেন।

তাঁর সঙ্গে যখন আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে, তখন আমার পরনে ছিল গেরুয়া, সেই গেরুয়ার সম্মানরক্ষার্থে তাঁর সংসর্গ এড়িয়ে গিয়েছিলুম। তিনি আমার বিদায়কালে সাশ্রুচক্ষে তাঁর পরলোকগত সহোদরকে স্মরণ করে তাঁর জননীর সম্মুখেই আমার সঙ্গে ভাই-ভগ্নীর পবিত্র সম্পর্ক পাতিয়ে ছিলেন। আজ ওদের সকলের সঙ্গেই দেখা হবে।

বেলা তিনটে সাড়ে-তিনটে। কুমোরটুলি ছাড়িয়ে উত্তরে চিৎপুর রোডের পশ্চিম ফুটপাথে এক পুরানো আমলের বাড়ি—বেশী বৃষ্টিতে জল জমলে যে-বাড়িতে জল ঢুকতে পারে! ভিতরে পা বাড়াতেই দেখি দুই তিনটি মেয়েছেলে অবেলায় তাঁদের কাজকর্ম সারতে ব্যস্ত। আমার দিকে চেয়ে তারা থমকিয়ে গেল। এখনও রোদ পড়েনি এমন অসময়ে 'বাবুরা' তো আসে না! ওদের মধ্যে একটি মেয়েকে প্রশ্ন করলুম, এখানে রাধারানী বলে কোনও মেয়ে থাকে?

মেয়েটা তৎক্ষণাৎ ঈষৎ উদাসীন হয়ে গেল। বলল, ও হ্যাঁ, এখানেই থাকে! ওই পশ্চিম দিকের মহলে!

অন্যজন বলল, তার তো বাঁধা বাবু আছে!

আমি ভিতরের দিকে ঢুকে গেলুম।

রাধারানীর বিধবা জননী সামনেই ছিলেন। কিন্তু আজ আমার পরনে গেরুয়া পোশাক নেই দেখে আমাকে চিনতে তাঁর ক্ষণকাল দেরি হল। পরে হাসলেন—আমাদের কথা মনে ছিল?

আমিও হাসলুম, বললুম, তীর্থযাত্রার সঙ্গীকে কেউ ভোলে না, মা।

এসো বাবু, এসো। মা বললেন, ওপরে চলো। আমরা থাকি এই মহলে। মাঝখানের দরজাটা বন্ধ করে দিলে আমাদের সব আলাদা।

অঘোরবাবু কোথায়?

অঘোর আসবে সন্ধ্যের পরেই—তাঁকে তো আবার দু দিক সামলাতে হয়।

উপরে উঠে এলুম। আমাকে দেখামাত্র চমকিয়ে হেসে উঠল সে সুদূর পার্বত্যলোকে আমাদের অন্যতম সঙ্গিনী রাধারানী। আমরা কত আপন, আমাদের কতদিনের নিবিড় আত্মীয়তা, আজ যেন উভয়ের দেখা যুগযুগান্ত পরে, যেন জন্মান্তরে! রাধারানী বলল, মনে আছে আমি তোমার হাত ধরে বলেছিলুম, ঠিক তোমার মতন ছোট ভাইটিকে আমি হারিয়েছি? সেই থেকে মা রয়েছেন নিরুপায় হয়ে আমার কাছে।

মেঝের উপর আসন পেতে মায়ের সঙ্গে আমরা বসলুম।

রাধারানীর চেহারায় এখন আর সেদিনের সেই রুক্ষ ধূলিধূসরতা নেই। আজ নতুন করে চেয়ে দেখলুম তার দিকে। ক্লান্ত পথচারিণীর সেই নির্জীবতা নেই, পা খুঁড়িয়ে সেই পাহাড়ের চড়াই উৎরাইয়ের কণ্টকর হাঁটা নেই, আহারাদির সেই কৃচ্ছ্রসাধনাও নেই। আজ সে সতেজ, জীবন্ত, উৎসাহে উজ্জ্বল। বয়স কত আর, বছর তিরিশেক হবে। তার পরনে কেবল একখানা চওড়া শান্তিপুরী শাড়ি। আমরা উভয়ে ভাই-বোন পাতানো, সুতরাং এই সুশ্রী নারীর অন্যান্য বর্ণনা আমার পক্ষে বেমানান। আমাদের গল্প ঘনিয়ে উঠল সেই দুঃসাধ্য তীর্থপথের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে। আমরা ফিরে গেলুম সেই হিমালয়ে। সেই যেন আমাদের প্রতিদিনের চলমান সংসার, সেই আমাদের আপন জগৎ। সেই দুঃখে দুর্যোগে, দুর্গতিতে—আমরা পরস্পরের পরমাত্মীয়। এই বেশ্যাবাড়ি আর এই চিৎপুর রোড—এসব আমাদের চোখে অলীক।

মা আনালেন গরম-গরম কচুরি আর মিষ্টান্ন। অতঃপর তিনি যখন রাত্রিকালের রান্নাবান্নার কাজে গেলেন, আমরা দুজনে তখন গুছিয়ে বসলুম।

রাধারানী অসংকোচে বলল, আমার মা কিন্তু সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। আমার মামারা মস্ত লোক। বাবা কিন্তু মদ আর মেয়েছেলে ছাড়া থাকতে পারতেন না। আমার ভাইটি মারা যায় বছর পাঁচেক আগে। সেই ভাই ছিল মায়ের ভরসা। আমি ছোটবেলা থেকে বাবার খেয়াল অনুযায়ী গান-বাজনা-কীর্তনে খুব পটু ছিলুম। ভাই মারা যাবার প্রায় ছ বছর আগে কি যে খেয়াল হয়েছিল, দুটো ছেলের সঙ্গে

আমি পালিয়ে যাই। তারা আমাকে নিয়ে কিছু দিন নাড়াচাড়া করে আমাকে ফেলে পালালো। তখন আমি তিন মাসের পোয়াতি। সেই বিপদের মধ্যে খোঁজ-খবর করে আমি এক বেশ্যার কাছে উঠলুম।. তারই সাহায্যে পেটের বাচ্চাটাকে নষ্ট করে বেঁচে গেলুম। তখন থাকতুম নাথের বাগানে।

তারপর ?

হাসিমুখে রাধারানী বলল, তখন থেকেই পাকাপাকি এই লাইনে। সুবিধে ছিল, আমার গান-বাজনা।' ওতে আমার বেশ নাম হয়েছিল। আমি ভাবলুম, রোজ রোজ পাঁচজনের সঙ্গে মাতামাতি এ যেন অরুচি আনে! সবাই বলল, তোমার চেহারার খোলতাই আছে। পাঁচালি করলে তোমার পয়সা খায় কে? কথাটা মন্দ লাগল না। সেবার পুজোর সময় শোভাবাজারের রাজবাড়িতে পাঁচালির ডাক পেয়ে গেলুম। সেজেগুজে গয়নাগাটি চড়িয়ে সেখানে গিয়ে গান করতে বসলুম। ওরা তবলচিদের আনল, খোল-করতাল আনলো,—আসর বসল নবমীতে দিনদুপুরে। খুব গান করলুম। আমার তালজ্ঞান, ঘরানা, আমার রেওয়াজ —এসব দেখেশুনে অনেক লোক ভাল বলল। প্যালা পড়ল অনেক। চিকের আড়ালে বসে মেয়েরা আমার জন্য ভাল ভাল শাড়ি পাঠালো। আমি একশ' টাকায় গান গাইতে গিয়েছিলুম. কিন্তু কামিয়ে এলুম প্রায় চারশ টাকা। বাড়িতে এসে পেঁছিল রাশি রাশি মিষ্টি, দু-একটা রুপোর বাসন, পুরনো আমলের সব চীনা পুতুল ঘর সাজাবার। আমার মাথুর শুনে নাকি অনেক কেঁদেছিল। তারপর থেকে আমি মুজরো করতে যেতুম অনেক জায়গায়।

রাধারানীর আত্মকথা শুনলুম মনোযোগ দিয়ে।

রাধারানী বলতে লাগল, অমনি একটা সময় ভাই এক ভদ্রলোক এসে সামনে দাঁড়াল আমাদের নাথের বাগানের বাড়িতে। দেখলুম ভদ্রলোকের খালি পা, হাতে আসন, পরনে সাদা থান, চাদর, কাছা গলায়, মাথায় রুক্ষ চুল—উনি আশৌচে আছেন, ওঁর বাবা মারা গেছেন। ওঁর ইচ্ছে আমি ওঁর বাবার শ্রাদ্ধে কীর্তন গান করি। আমি রাজি হয়ে গেলুম। তখন তো আমার জ্বলজ্বলাট অবস্থা, যেখানে সেখানে ডাক।

দু'জন খোল, দু'জন করতাল—এই নিয়ে গেলুম শ্রাদ্ধবাড়ি। ওদের বাড়ি কাঁসারি পাড়ায়। বেশ ভাল ওদের অবস্থা। ওদের চকমেলানো বাড়ির দুর্গাদালানের নিচে মস্ত উঠোনে চাঁদোয়ার তলায় কীর্তনের আসর বসল। আমার সঙ্গে চুক্তি ছিল শ্রাদ্ধ আর কীর্তন একসঙ্গেই চলবে। ওদের নাকি 'বৃষোৎসর্গ দানসাগর' হবে। আমার গামলায় সেদিন অনেক টাকা পড়ল। আমাকে দেখবার জন্য পাড়াসুদ্ধ সব মেয়েপুরুষ এসেছিল। দশটায় কীর্তন আরম্ভ, বেলা দেড়টায় শেষ। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বিদ্যাপতি—তখন সব আমার মুখস্থ।

রাধারানীর কথার মাঝখানে ওর মা এসে আবার হাসিমুখে বসলেন।

রাধারানী বলছিল, কীর্তনের শেষে বহু লোক আমাকে ধরল, যদি আমি একটু

ভেতর-বাড়িতে মহিলাদের মধ্যে যাই। চিকের আড়ালে যত মেয়েরা বসে কীর্তন শুনছিল, এটি তাদেরই অনুরোধ। কিন্তু আমি তো অশুচি! শুধু অশুচি নয়, সকলের চোখেই আমি আমি অদ্ভুত এক জীব! বেশ্যাকে কাছাকাছি এনে চোখে দেখছে অনেকে এই প্রথম। ওরা দেখছে আমার জড়তা নেই, চলাফেরা কথাবার্তা সবই আমার সহজ। আমি হাসছি, কথা বলছি, পাঁচজনের কথার জবাব দিচ্ছি,—এ দেখে ওরা অবাক। ওরা বড়লোক, কিন্তু পুরনো কালের লোক। মনে হচ্ছিল, মেয়ে মহলে আমরা তো সেই একই পাখি! কিন্তু আমি হলুম বনের পাখি আর ওরা থাকে খাঁচার মধ্যে।

ভদ্রলোক সেদিন আমাকে খুবই আদর-অভ্যর্থনা করেছিলেন। আমাকে মেয়েরা ধরল একটু মিষ্টিমুখ করে যেতে হবে।

আমি যখন খাচ্ছিলুম, মেয়েরা তখন আমাকে ঘিরে ছিল। সেই সময় ভদ্র লোকের স্ত্রী বেরিয়ে এসে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত চেয়ে চেয়ে দেখে স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, ওর সঙ্গে তোমার কোথায় ভাব হয়েছিল? ওর বাড়িতে?

স্বামী বললেন, ওঁর বাড়িতে গিয়েই তো ওঁকে পেয়েছিলুম।

ওঁর স্ত্রী রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তখন আমরা একটু আড়ষ্ট হয়েছিলুম বটে, কিন্তু একটুও সন্দেহ করিনি যে, এমন কাজ কখনও উনি করতে পারেন! রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে উনি আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি কবে থেকে আমার ঘর ভাঙতে বসেছ শুনি?

অবাক হয়ে বললুম, আমি? আপনার ঘর ভাঙবো? কেন?

ওঁর কথা শুনে আমি হাসতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু আমাকে সময় না দিয়ে উনি হঠাৎ এক তাল লঙ্কা বাটা আমার মুখখানায় মাখিয়ে দিলেন।

চারিদিকে সবাই হাঁ হাঁ করে উঠল। সবাই চেঁচামেচি ঠেলাঠেলি। মেয়েরা তাদের বউদিদিকে কড়া কথা শোনাতে লাগল। গিন্নীমা ছুটে এলেন। উনি বললেন, বেশ করেছি!

আমি ততক্ষণে বসেপড়েছি জ্বালাযন্ত্রণায়। আমার দুই চোখের মধ্যে লঙ্কা-বাটা গিয়ে যন্ত্রণায় বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আমি তো অশুচি মেয়েছেলে! কোন্ মেয়ে আমাকে ধরে তুলবে? কে করবে সাহায্য? যে ছোঁবে তার জাত মান সম্ভ্রম সবই তো ঘুচবে! এমনি সময় ঐ ভদ্রলোক ছুটে গিয়ে এক বালতি জল এনে আমার মুখ চোখ সব ধোয়াতে বসলেন। দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে কারা যেন কি সব ওষুধ নিয়ে এল। ও বাড়ির একজন ঝি এসে আমার মুখে ওষুধ মাখাতে লাগল। আমি যখন যন্ত্রণায় কাঁদছিলুম তখন চোখের ডাক্তার কালী বাগচীকে আনা হ'ল। ওষুধ দিয়ে সেদিন আমার চোখ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।

সেদিন বেলা চারটের সময় ওই ভদ্রলোকই আমাকে নাথের বাগানের বাড়িতে নিয়ে এলেন। মা তখন ছিল না আমার কাছে। ওই বাড়িরই অন্য মেয়ের আমাকে ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামাল। আমি তখনও মুখ-চোখের যন্ত্রণায়

কান্নাকাটি করছিলুম।

এতক্ষণ শুধু সমবেদনার সঙ্গে আমি ভগ্নীর কথা শুনছিলুম। মা চুপ করে নত মুখে আমার পাশে বসেছিলেন। আমি মনে মনে রাধারানীকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছিলুম।

সেদিন রাত যখন এগারোটা বেজে গেছে তখন চোখের যন্ত্রণা যেন একটু কমল। —রাধারানী বলছিলেন, তোমাকে সত্যি বলছি ভাই, আমার মন তখন খুব খারাপ। ওই ভদ্রলোক বসে বসে আমার মাথার হাত বুলোচ্ছিলেন। আমি বললুম, এবার আপনি যান, অনেক রাত হয়েছে। সেই প্রথম জানলুম ভদ্রলোকের নাম অঘোরবাবু। উনি বললেন, হ্যাঁ বাড়ি যাব। সেখানে আমার ছোট ছোট দুটি ছেলেমেয়ে আছে। কিন্তু আমি আমায় স্ত্রীর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই—।

অঘোরবাবু কথাটা পরিষ্কার করলেন না। আমি বললুম, স্ত্রীর ওপরে রাগ করলে তো আপনার চলবে না। তিনি যদি একটা ভুল হঠাৎ করে ফেলে থাকেন, আপনি কেন তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে যাবেন? তা ছাড়া তাঁর ধারণা, আপনার সঙ্গে আমার নাকি অনেক দিনের চেনা-পরিচয়!

রাধারানী আবার বললেন, তোমাকে বলব কি ভাই, অঘোরবাবুর স্ত্রীর ওপর আমার রাগ আর রইল না। মনে হচ্ছিল, এ শাস্তি আমার যেন পাওনাই ছিল। গেরস্থ ঘরের গিন্নীরা কেনই বা আমাকে সহ্য করবে?

কেন? তুমি তো কোনও দোষ করোনি!

করেছি ভাই করেছি—রাধারানী ঈষৎ হেসে বললেন, সকলের পায়ের নিচেও যে-মেয়ের জায়গা নেই, তাকেই তো পতিতা বলে! কেন আমি পতিত হলুম কে শোনে সে কথা! আমি মেয়ে নই, আমি কারোর স্ত্রী নই, মা নই, বোন নই—আমি নাকি 'পতিতা'! তা হবে! নিজের পরিচয় তলিয়ে আমি ভাববো তেমন বিদ্যে-বুদ্ধির তো নেই আমার। আমি সামান্য মেয়ে!

আমি রাধারানীর দিকে চেয়েছিলুম। আমার মনে হচ্ছিল তার মন যেন সর্বক্ষমাশীল। কারও মধ্যেই সে দোষ খুঁজে পায় না। জীবনে কোনও নালিশ নেই। সমস্ত জীবনের মধ্যে তার যেন একটি বাণীই নিহিত রয়েছে, সে সামান্য, সে নগণ্য!

আমি হেসে বললুম, তারপর? অঘোরবাবু কি প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করলেন?

বুঝতেই পারছ—রাধারানী হাসিমুখেই বললেন, সেই প্রথম রাত্তিরে উনি বাড়ি গেলেন তখন রাত একটা। পরদিন সকাল এগারোটায় উনি গাড়ি করে নিয়ে এলেন আমার আগের দিনের সব মজুরি। ভাল ভাল শাড়ি বাসনপত্র, দুখানা গিনি, নগদ প্রায় পঁচিশ টাকা। তার ওপর অঘোরবাবু দিলেন আরও হাজার টাকা—আমার ঘরদোর সব ভরে উঠল। আর অঘোরবাবু নিজে? উনি এক মাস ধরে আমার মাথার কাছে বসে আমার সব দায়িত্ব নিয়ে আমায় সুস্থ করে তুললেন। আজ পাঁচ বছর হতে চলল উনি কোন নিজের বাড়িতে রাত কাটাননি। আমি যদি বলি, এ তুমি কি করছ? স্ত্রী না হয় রাগের মাথায় একবার অন্যায় করেছেন,

সেজন্য তিনি ক্ষমা পাবেন না? উনি বলেন, আমি দিনের বেলায় বাড়ি ফিরে সব কর্তব্য করে আসব, কিন্তু রাত্রে কোন দিন বাড়িতে থাকব না। উনিই আমার মাকে এখানে আনিয়ে রেখেছেন। মায়েরও তো আর কেউ নেই!

আর নয়। এবার আমি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। রাধারানী হাসি-মুখে বললেন, গান-বাজনা, বেতন-মুজরো—সব ছেড়ে দিয়েছি, ভাই। উনি আমাদের প্রতি-বছরে নানান্ তীর্থে ঘুরিয়ে আনেন। সামনের বছরে যাব পশুপতিনাথে। উনি আমাদের কোন অভাব রাখেননি!

রাধারানী নিচে পর্যন্ত এলেন। বললেন, বড় বোনকে ভুলে যাবে না তো ভাই? আবার কবে আসবে বলো, আমি ওঁকে বলে রাখব। উনি খুব খুশী হবেন।

নমস্কার জানিয়ে হাসিমুখে আমি চলে যাচ্ছিলুম, রাধারানী আরও দু পা এগিয়ে এসে বললেন, কি জানো ভাই, আগে নিজেই নিজেকে বেশ্যা বলে জানতুম, এখন মনে হচ্ছে ওটা যেন একটা গালাগাল! ওটা শুনতে ভাবতে এখন যেন খারাপ লাগে।

আমি বললুম, তুমি কোন দিনই বেশ্যা ছিলে না, কোন দিনই তোমার গায় কোনও কাদা লাগেনি। তোমার মনের শুচিতাই তোমার আসল পরিচয়।

হাসিমুখে আমি বাইরে চলে গেলুম।

॥ ৪১ ॥

আমাদের তরুণ বয়সের চোখে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন এক অনন্য-সাধারণ ব্যক্তি। তিনি এমন এক রহস্যে আচ্ছাদিত থাকতেন যার সব সময় হদিস পাওয়া যেত না। এর ফলে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে সম্ভব-অসম্ভব, বাস্তব-অবাস্তব, এবং বিভিন্ন প্রকার আজগুবী গল্প নানা মহলে ছড়িয়ে থাকত। প্রথম দিকে কেউ বলত তিনি সন্ন্যাসী, তাঁর মাথায় জটাজুট। কেউ বলত তিনি লুঙ্গি পরে একটি নেড়ি কুকুর সঙ্গে নিয়ে কলকাতার এখানে ওখানে ঘোরেন! অনেকে জানত তিনি থাকেন শিবপুরের ওদিকে কোথায় যেন এবং কোনও ভক্ত যদি তাঁর বাড়ি চিনে যেতে পারে তবে তিনি নাকি তার সঙ্গে দেখা না করেই তাড়িয়ে দেন। কতকগুলো নিন্দুক রটনা করে বেড়াত, তিনি নাকি নেশাভাঙ নিয়ে থাকেন। তিনি সংসারধর্ম পালন করেন কিনা, বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত, তাঁর নৈতিক জীবন কি প্রকার—এগুলি নিয়ে লেখক ও পাঠক সমাজ যখন তোলপাড় হয়ে উঠত, তখন তাঁর এক-একটি যুগান্তকারী গল্প বা উপন্যাস সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবল ঝড় বইয়ে দিত। বাঙ্গালীর অতি পরিচিত ঘরোয়া ও প্রত্যক্ষ জীবনের ভিতর থেকে এক মহৎ শিল্পীর মতো তিনি একেকটি ছিলেকাটা হীরকখণ্ডের মতো চরিত্র নির্মাণ করে তুলতেন—ভারতীয়

কোনও সাহিত্যে যার তুলনা পাওয়া যেত না। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে অল্প-কালের মধ্যে অত্যাশ্চর্য জনপ্রিয়তা লাভ করেন শরৎচন্দ্র এবং তাঁর সঙ্গে নজরুল ইসলাম—এবং উভয়ে প্রায় একই কালের। স্বল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণের মনে শরৎচন্দ্র যেরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন—সেটি যে কোনও দেশের লেখকের পক্ষেই দুর্লভ সৌভাগ্য।

প্রথম দিকে শরৎচন্দ্র তাঁর ছোট বা বড় উপন্যাসগুলির পাণ্ডুলিপি একটানা লিখে সম্পূর্ণ করে দিতেন একই সঙ্গে। কিন্তু তাঁর 'চরিত্রহীন' বা 'গৃহদাহ' সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। তাঁর অনেক ছোট বা বড় গল্প বেরিয়েছে নানা সময়ে নানা সাময়িকপত্রে। অতঃপর তাঁর রচনা প্রকাশিত হতে থাকে 'ভারতবর্ষে'। তিনি সাধারণত কোনও সম্পাদকের চিঠির জবাব দিতেন না এবং লেখা চেয়ে পাঠালে সে-অনুরোধ এড়িয়ে যেতেন। কোনও সভা সমিতিতে তাঁকে সচরাচর পাওয়া যেত না। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র রাজার মতো তিনি যেন একটা জালের আড়ালে বাস করতেন!

ইদানীং তাঁর কাছে কোনও লেখা বা উপন্যাসের পরবর্তী কিস্তি আদায় করা ছিল এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তিনি বলতেন, পাঁচজনকে পাঁচরকম কথা না হয় 'দিতেই' পারি, কিন্তু সব রকম কথাই যে 'রাখতে' হবে এ কথা কে বললে?

যে দু'একজন সম্পাদক তার প্রিয়পাত্র ছিলেন তাঁদের মধ্যে 'ভারতবর্ষে'র বৃদ্ধ জলধর সেন ও 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকার তরুণ-বয়স্ক পরিচালক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম প্রথমেই মনে আসে। উমাপ্রসাদ এবং বিশেষ করে রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখন শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' নামক বিপ্লবমতি উপন্যাসটি তাঁদের বঙ্গবাণীতে প্রকাশ করে তৎকালে অসমসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। বিপ্লববাদীরা এ বইটি সাদরে গ্রহণ করে। কিন্তু এই বইটি প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যেই বৃটিশ সরকার এটিকে নিষিদ্ধ করেন। এই সময়টুকুর মধ্যেই বইগুলি নানা কেন্দ্রে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এরই সাত-আট বছর পরে নতুন ভারত শাসন আইন প্রবর্তনের ফলে মৌলভী ফজলুল হক সাহেব বাঙ্গলার মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন এবং তিনি অতঃপর 'পথের দাবী'র উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। ঘটনাটা আমার মনে আছে এই কারণে যে, এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ব্যাপারে সিটি কলেজের এক মস্ত সভায় আমি আমার এক বৃটিশ-বিরোধী বক্তৃতায় 'তুবড়িবাজি' করেছিলুম!

যাই হোক, শরৎচন্দ্র শিবপুরে কোথায় থাকতেন সেটি আমার জানা ছিল। ও অঞ্চলটার নাম ছিল বাজে-শিবপুর। ওখানে নীলকমল কুণ্ডু লেনে পণ্ডিতপ্রবর শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয়ের পৌত্র এবং আমার সহপাঠী বলাইচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়েরা যে-বাড়িতে থাকতেন, তার পাশের বাড়িতে থাকতেন শরৎচন্দ্র। বলাই তখন নতুন কলেজের ছাত্র। শরৎচন্দ্রের বহু ফাইফরমাশ বলাই সানন্দে খেটে দিত এবং শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন রচনার পাণ্ডুলিপি সযত্নে পকেটে নিয়ে কলকাতায় সম্পাদকের

কাছে পেঁছিয়ে দিয়ে আসত। বয়সে অল্প হলেও বলাই ছিল শরৎচন্দ্রের খুবই প্রিয় এবং অন্তরঙ্গ। পরবর্তীকালে বলাই হাওড়ার একজন বিশিষ্ট আইনজীবী হয়ে ওঠে এবং সে তার বংশের ঐতিহ্যের ধারানুসারে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে প্রচুর প্রতিষ্ঠালাভ করে। একদা কিশোর বয়সে বলাই আর আমি সারাদিন বড়বাজারের ঘাট থেকে সেই দূরে শিবতলার ঘাট পর্যন্ত গঙ্গায় নিয়মিত ভেসে বেড়াতুম স্টীমারে!

রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্যের মধ্যগগনে দেদীপ্যমান তখন তাঁর বইয়ের কাটতি ছিল না বললেই হয়। উচ্চবিত্ত সমাজের যাঁরা উচ্চশিক্ষিত তাঁরা ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যের ভক্ত। যাঁরা বাঙ্গলা কাব্য সাহিত্যের রসিক, তাঁরা বিশেষ বই কিনতেন না। গৃহস্থঘরের স্বল্পশিক্ষিত বউ-ঝিরা সস্তারসের সহজবোধ্য উপন্যাস পড়ত, রবীন্দ্রসাহিত্যের দিকে ঘেঁষতো না। সে-সময়ে সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, নারায়ণ ভট্টাচার্য, ফণীন্দ্র-যতীন্দ্র-ধীরেন্দ্রনাথ পাল, দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতি প্রিয় ছিলেন মেয়েমহলে। কিন্তু ভারতী গোষ্ঠীর লেখকরা—যাঁরা কবি ও ঔপন্যাসিক—তাঁদের মধ্যে কৃতী ও প্রতিভাবান ছিলেন অনেকেই। প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবক্ষেত্রকে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। শরৎচন্দ্রের অনন্যসাধারণ লিখনভঙ্গী, গল্পের বাঁধুনি, তাঁর অভিনব ধরনের নারীচরিত্র সৃষ্টি, তাঁর ছোট ছোট পার্শ্বচরিত্র, তাঁর কৌতুক-পরিহাসের পাশেপাশে হৃদয়য়াবেগের আকুলতা—এগুলি সমগ্র বাঙালী জাতির মনকে নিঃসংশয়ে জয় করেছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশার মধ্যেই শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয় ও অন্তর্ধান ঘটে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের গল্পসাহিত্য ওই বাইশ-চব্বিশ বছরের মধ্যে যে দুর্লভ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল সে সগৌরবে অদ্যাবধি অম্লান হয়ে রয়েছে!

সঠিক জানিনে, শিবপুরে বোধ তিনি ঘরভাড়া নিয়ে থাকতেন। ওখানে তিনি একা থাকতেন কিনা, অথবা তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর প্রকাশচন্দ্র ও সন্ন্যাসী 'বেদানন্দ' তাঁর সঙ্গে বসবাস করতেন কিনা তাও আমি জানিনে। শুধু নরেন্দ্র দেব মহাশয়ের কাছে শুনেছি, শরৎচন্দ্র বর্মা থেকে কলকাতায় ফিরে বড়বাজারের মোড়ে এমন একটি বাড়িতে ওঠেন, যেটির তৎকালে কিছু কুখ্যাতি ছিল। নরেন্দ্র দেব সেই বাড়িতেই প্রথম শরৎচন্দ্রকে দেখেন। যাই হোক, অবস্থা বিবর্তনের ফলে শরৎচন্দ্র শিবপুর হাওড়া জেলার অন্তর্গত শামতাবেড় পানিত্রাসে একটি পল্লীভবন নির্মাণ করেন এবং সেখানে তিনি তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী হিরন্ময়ীকে নিয়ে ওঠেন। এই পল্লীভবনটি রূপনারায়ণের পাড়ের ধারে অবস্থিত, এবং এটি দেখে শরৎচন্দ্রকে একদা আমি বলেছিলুম, এমন 'তটস্থ' হয়ে এখানে কত কাল থাকবেন?

'তটস্থ' শব্দটা শুনে শরৎচন্দ্র রস পেয়েছিলেন!

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের উপার্জন প্রচুর পরিমাণে এই সময়ে বেড়ে ওঠে। তাঁর বই থেকে সিনেমা-চিত্র ও রঙ্গালয়ে তাঁর নাটকের পর নাটক হতে থাকে। তখন তিনি কলকাতায় অশ্বিনী দত্ত রোডে একখণ্ড জমি কেনেন এবং দোতলা বাড়ি নির্মাণ করান। তাঁর গাড়ি বা টেলিফোন ছিল কিনা, অতটা আমার মনে পড়ছে না। তবে তাঁর

গল্পগুজবের কেন্দ্র ছিল দুটি জায়গায়। একটি হল নরেন্দ্র দেব মহাশয়ের বাসস্থান, অন্যটি কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'রসচক্র'। কবি রাধারানী বা নরেন্দ্র দেবের ওখানে প্রমথ চৌধুরী ও শরৎচন্দ্র নিয়মিত অভ্যাগত ছিলেন। আমাদের বন্ধু ও 'বাতায়ন'-সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল ওই আড্ডার আনন্দদায়ক সংবাদগুলি আমাদের অনেকের কাছে পৌঁছিয়ে দিত!

লেখকদের আড্ডা সাধারণত বসে দৈনিক বা সাময়িকপত্রের আপিসে, সম্পাদকের ঘরে অথবা প্রকাশকের দোকানে। এইপ্রকার আড্ডার প্রথম মধুর স্বাদ আমি পেয়েছিলুম বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটে ফরোয়ার্ড ও বাঙ্গলার কথা আপিসে—যেখানে প্রিয়দর্শন তরুণ সম্পাদক গোপাললাল স্যান্যাল ছিলেন অনেকটা মধ্যমণির মতো। তাঁর মিষ্ট ব্যবহার আকর্ষণের বস্তু ছিল।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক ছিল 'রসচক্রের' মজলিস। এটি কবিশেখর কালিদাস রায় ও তাঁর সহোদর রাধেশ রায়ের বাসস্থান। তখন কালিদাস রায়ের বৃদ্ধ পিতা জীবিত, এবং তাঁদের একতলা নতুন বাড়িটি ছিল রাজা বসন্ত রায় রোডের দক্ষিণ প্রান্তে—যার পরেই অনুন্নত বনবাঁদাড়। ওই মজলিসের যাঁরা প্রধান আকর্ষণ, তাঁদের মধ্যে তৎকালীন প্রসিদ্ধ গল্পলেখক বিশ্বপতি চৌধুরী হলেন সকলের প্রিয়। তখন বিশ্বপতি ও মণীন্দ্রলাল বসু 'প্রবাসী'র লেখক হিসাবে খুবই খ্যাতিমান। ওই মজলিসে এসে বসতেন শরৎচন্দ্র, শিল্পী সতীশ চন্দ্র সিংহ, কুমুদ রায়চৌধুরী, নুটবিহারী মুখুজ্যে, 'সম্মিলনী'র সম্পাদক কালীমোহন বসু এবং আরও অনেকে। কবিশেখর তখন খুবই জনপ্রিয়, মজলিসী ও মধুরস্বভাব ছিলেন। শরৎচন্দ্র নিয়মিত আসেন না, তবে যখনই আসেন,—তাঁকে ঘিরে সরস খোশগল্প আরম্ভ হয়ে যায়। একবার ওঁর খোশগল্পের ফাঁদে আমি ধরা পড়েছিলুম। উনি আমাকে দেখেই বললেন, তুমি এত দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াও, অথচ রানাঘাটের সেই বিখ্যাত পাঁচিলটা তোমার চোখে পড়েনি?

বললুম, পাঁচিল? সে আবার কি?

ওই দ্যাখো! বাঙ্গলা দেশের কিছুই জানো না তুমি! 'চাইনীজ ওয়াল' ত শুনেছ? তেমনি রানাঘাটের সেই পাঁচিল চার মাইল লম্বা—একেবারে গঙ্গার ধার পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। আমারই মামার গুষ্টির ক্যাদার গাঙ্গুলির পাঁচিল—সেখানে সবাই জানে। হাজার হাজার লোক দেখতে যায়।

শরৎচন্দ্রের কথা শুনে পরদিনই আমি রানাঘাট রওনা হই। কিন্তু সেখানে একশ' বর্গমাইল চৌহদ্দির মধ্যে কেদার গাঙ্গুলী নামধারী কোনও ব্যক্তিকে কেউ চেনে না এবং পাঁচিল দূরের কথা, একটি ইঁটের পাঁজাও আমার চোখে পড়েনি। ওটা যে 'রসচক্রে'র খোশ গল্প, সেটা আগে ভাবিনি। কিন্তু আমি যে হদ্দ বোকা বনে গিয়েছিলুম, সেটা অন্য কারোকে আর বলিনি। 'সেয়ান ঠক্‌লে বাপকেও বলে না!'

শরৎচন্দ্র আরেকদিন আরেকটা গল্প বলেছিলেন।—বুঝলে ভাই কালিদাস, আমি যে সামান্য একটু-আধটু লেখাপড়া জানি, এটি শিবপুরের পাড়াপল্লীতে কেউ বিশ্বাস

করত না। একদিন আমার সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় বুড়ি ক্ষেত্রমণি আমার সামনে দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। আমি ডাকালুম পিছন থেকে।

অ বুড়িমা, হন্তদন্ত ছুটছ কোন্ বাগে?

থামো বাছা, পেছন থেকে ডেকো না—বুড়ি বলল, জামাইবাড়ি থেকে টেলিগেরাম এসেছে, তাই পড়াতে যাচ্ছি—

দাও না বুড়িমা, আমি পড়ে দিচ্ছি—

তুমি?—বুড়ি থমকিয়ে দাঁড়াল। বলল, পোড়াকপাল, তুমি আবার লেখাপড়া শিখলে কবে?

বুড়ি চলে গেল।

সমগ্র 'রসচক্র' হইচই করে হেসে উঠল। শরৎচন্দ্র হাসিমুখে আবার বললেন, ওখানেই শেষ নয় রে ভাই, আরও আছে। সেই যে আমাদের মতি ময়রার কথা বলেছিলুম মনে আছে ত? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরই সেই মোটাসোটা কাঁদলা-কেঁদলা গিন্নি বিনোদিনী। একদিন ওর ঘরে গিয়ে ঢুকেছি, দেখি মতি ময়রা ছোট ছেলেটাকে ঠেঙাচ্ছে—তার পড়াশুনোয় মনোযোগ নেই বলে। আমি হাঁ হাঁ করে উঠলুম। ওদিকে বিনোদিনীও চেঁচিয়ে উঠল,—ছেলেটাকে আধমরা করে ছাড়ছে দেখেছ ত দা'ঠাকুর? আমি বলি লেখাপড়া কি সকলেরই হয়, তুমিই বলো ত? এই ত চোখের সামনেই দেখছ দাদাঠাকুরকে! আমি বলি ছেলেটার যদি লেখাপড়া কিছু না হয় নাই হোক, আখেরে দা'ঠাকুরের মতন দুখান বই লিখেও ত খেতে পারবে।

'রসচক্রে' সেদিন তুমুল হাস্যধ্বনি উঠেছিল।

নুটবিহারীকে শরৎচন্দ্র 'মুরারি' বলে ডাকতেন। অপর কোনও একদিন শরৎচন্দ্র বললেন, তা হলে শোন্ ভাই মুরারি, মনে আছে ত পাঁচকড়ির সেই যে বোনটা—সেই যে তোমার সরলা! সে যেদিন বিধবা হল, কী আছড়িয়ে কান্না! সে কান্না যে শোনেনি সে বিধবার দুঃখ বুঝবে না। তিন দিন সরলা মুখে জল দিল না, কেঁদে কেঁদে একেবারে পাগল! বলব কি ভাই, বনের পশুপক্ষীও তার দুঃখে কেঁদে যায়!

তারপর দাদা?

তারপর যেমন হামেশা হয়!—শরৎচন্দ্র বললেন, বোধ হয় মাস তিনেক হবে। হঠাৎ একদিন শুনলুম সরলা তার স্বামীর বয়সী আইবুড়ো সেই বোনপোটাকে নিয়ে কোথায় যেন পালিয়েছে আবার ঘর বাঁধবে বলে।

সে কি দাদা, এ ত ঠিক মিলছে না? এত কান্নাকাটি, এত—

হাসিমুখে শরৎবাবু বললেন, মিলছে ভাই, মিলছে! ও দুটোই সত্যি। সরলার কান্নাটাও সত্যি, বোনপোকে নিয়ে পালানোটাও সত্যি। কাব্যের সত্যি আর জীবনের সত্যি—এরা দুটো এক বস্তু নয় রে ভাই!

বিশ্বপতির অনর্গল পরিহাস এবং কৌতুক বাক্যবাণে হাসির ফোয়ারা ছুটত 'রসচক্রে'। সেই তামাশার ফলে কারও মুণ্ড কাটা যাচ্ছে, কেউ লজ্জায় মুখ লুকোচ্ছে,

কারও সাহিত্যিক খ্যাতির সর্বনাশ ঘটছে এবং কালীদার প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বিপর্যস্ত হচ্ছে! কিন্তু কেউ রাগ করছে না, কারও মানহানি ঘটছে না, কেউ মামলা তুলছে না—যে যার বাড়ি চলে যাচ্ছে রাত্রে হাসিমুখে।

'রবিবাসর' সাহিত্য সভা কিন্তু একটু অন্যরকম ছিল। এর সভাপতি ছিলেন জলধর সেন মহাশয়। এই সভায় গুরুগাম্ভীর্য বজায় থাকত, এবং এখানে গল্প কবিতা প্রবন্ধাদি পাঠ করা হত। 'বাঁশরী' মাসিকপত্রের সম্পাদক ও সুলেখক নরেন্দ্রনাথ বসু 'রবিবাসরের' স্থায়ী পরিচালক ছিলেন। এর বৈঠক বসত একপক্ষকাল পর পর রবিবারে। সাহিত্যের এই আসরে বহু লেখক সাংবাদিক সম্পাদক চিত্রশিল্পী কবি অধ্যাপক, এমন কি জজ-ব্যারিস্টার পর্যন্ত 'রবিবাসরে' এসে সাহিত্য আলোচনায় যোগ দিতেন। এই সভার একান্তে এসে বসতেন ভদ্রচিত্ত ও মিষ্টভাষী প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়। আসতেন অনেক নামকরা ব্যক্তি। এই বৈঠকের নিয়ম ছিল এক ব্যক্তি পালাক্রমে তাঁর নিজের বাড়িতে বৈঠক ডাকবেন এবং আহারাদির আয়োজন করবেন। রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, নরেন্দ্র দেব, নরেন্দ্রনাথ বসু এবং তৎকালে প্রবীণ যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সকলেই একে একে রবিবাসরের বৈঠক ডেকেছেন। একবার শরৎচন্দ্র তাঁর নতুন বাড়িতে 'রবিবাসর' ডেকে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করলেন। সেই আসরে মহাকবি যে মনোজ্ঞ ভাষণটি দিলেন সেটি স্মরণীয়। যতদূর মনে পড়ছে, শরৎচন্দ্র সেই দিনটিকে তাঁর নতুন বাড়ির একটি বিশেষ উৎসব বলে অনেককেই ভুরিভোজের দ্বারা আপ্যায়ন করেছিলেন।

সেই ভোজের আসরে আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং শরৎচন্দ্রের পরম অনুগত সেবক অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল,—আমরা দুজন পাশাপাশি লুচি-মাংস গোগ্রাসে গিলছিলুম। শরৎচন্দ্র ঘুরে-ঘুরে পরিবেশনের তদ্বির-তদারক করছিলেন। সেই সময় আমাদের তরুণ সাহিত্যকে 'ছাগ-সাহিত্য' বলে বর্ণনা করা হত! কেন জানিনে, শরৎচন্দ্রকে হঠাৎ কৌতুকবুদ্ধি পেয়ে বসল। তিনি একসময়ে এসে আমাদের কলাপাতের সামনে উবু হয়ে বসলেন, তারপর সহাস্যে ঈষৎ মুখ ফিরিয়ে তামাশা করে বললেন, ওহে অবিনাশ, 'স্বজাতি'র মাংস কেমন খাচ্ছ?

তৎক্ষণাৎ বুঝলুম তাঁর পরিহাসের লক্ষ্য কে! আমি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে বলে ফেললুম, বড় চমৎকার রান্না হয়েছে আজ আপনার মাংস!

শরৎচন্দ্র একবার অপাঙ্গে আমাকে লক্ষ্য করে হাসিখুশী মুখে উঠে অন্যত্র গেলেন। তামাশায়, পরিহাসে ও রসবোধে তিনি অনন্য ছিলেন।

পালাক্রমে একবার আমার উপর এসে চাপল 'রবিবাসর'। নব্যতরুণ বিশু মুখোপাধ্যায় শাসালো, এবার আর তোমার নিস্তার নেই। সাহিত্য ইত্যাদি ওসব পরের কথা। আপাতত তোমার খরচে এবার চল্লিশ-পঞ্চাশজন রাজসিকভাবে আহারাদি করবেন। তবে খরচের একটা অংশ তুমি পেয়ে যেতে পারো!

সেদিন আমি অন্ধকার দেখেছিলুম। তখন কোথাও কিছু নেই আমার। তৎকালে একটি নতুন আমদানি করা শব্দ অনুযায়ী আমি 'প্রোলেটেরিয়েট্'। তবুও যা হোক করে সেবার দায়োদ্ধার হয়ে কাশী রওনা হয়েছিলুম।

পুজোর মরসুম বাঙ্গালীর মনে চিরকাল উদ্দীপনা আনে। আমিও তার ব্যতিক্রম নয়। আশ্বিনের দুর্গাপুজোর গন্ধে-গন্ধে সমগ্র ভারতের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালীর ডানায় আসে চাঞ্চল্য। সাদা মেঘ আর নীল আকাশ দেখে বাঙ্গালীই বলে ওঠে, "ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী—"

মহালয়ার ঠিক পর থেকেই তখন হাজার হাজার বাঙ্গালী পরিবার ছুটত কলকাতার কর্মস্থল থেকে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আপন আপন গ্রাম ও শহরের বাস্তুভুমিতে। তখন কেবল একটা কথাই শোনা যেতঃ 'বাড়ি যাচ্ছি'। সেই অধিকাংশ 'বাড়ি'র পুজোর উৎসবে জাতিবর্ণের কোনও ভেদ ছিল না। পুজো সকলেরই। প্রতিমা গড়া, চালচিত্র বানানো, ডাকের সাজ তৈরি, কাঠামো নির্মাণ—সব কাজের মধ্যে সবাই। সমস্ত উৎসবটা সকল সম্প্রদায় মিলে ভাগ করে নিত।

সেই যুগে বাঙ্গালীর সর্বপ্রধান শত্রু ছিল ম্যালেরিয়া। শরৎকালে যখন সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সোনার বাঙ্গলার সৌন্দর্য দেখে সবাই মুগ্ধ হচ্ছে তখন দেখা দিত ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, নিউমোনিয়া, আমাশয় বা টাইফয়েড। ওগুলো আবার বিশেষভাবে বেড়ে উঠত, যখন শরৎকালের পর থেকে জল কমতে আরম্ভ করত—অর্থাৎ কার্তিক-অগ্রহায়ণে ওর প্রকোপ দেখা দিত বেশি। তৎকালে প্রায় প্রত্যেক পোস্ট অফিস থেকে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে কুইনিনের শাদা গুঁড়ো বিলি করা হত, এবং এই রোগের হাত থেকে জেলাকর্তৃপক্ষেরও রেহাই ছিল না। এই সব কারণে ধীরে ধীরে বাঙ্গালীর মন ছুটতে লাগল সাঁওতাল পরগনার মধুপুর, দেওঘর, মিহিজাম, গিরিডি প্রভৃতি অঞ্চলে। ওদিকে জলকাদা, পচা-ডোবা, পানা-পুকুর, ম্যালারিয়াবাহী মশা, নদীনালার সোঁতা—এগুলো কম এবং জল হাওয়া স্বাস্থ্যের অনুকুল। বিংশ শতকের প্রারম্ভে শুধু নয়, সাঁওতাল পরগনা যেহেতু বাঙ্গলার মধ্যেই ছিল—সেই হেতু এই ভুভাগে বাঙ্গালীর বসবাস চিরকালই চলে এসেছে। সুতরাং পুজোর মরসুমে সাঁওতাল পরগণাও মুখরিত হয়ে উঠত।

এর পরে দেখছি স্বাস্থ্যোন্নতি লাভের আশায় বাঙ্গালী যেতে আরম্ভ করল আরও এগিয়ে পশ্চিমের দিকে। পশ্চিমকে মন দিয়ে ওরা চিনতে লাগল। বায়ু বদলের জন্য ওরা প্রথম বেছে নিল যুক্তপ্রদেশ। এখানে হাওয়া শুষ্ক, জল স্বাস্থ্যদায়ক, খাদ্যসামগ্রী সস্তা—এর ওপর উপরি পাওনা হল কতকগুলি তীর্থস্থান এবং মোগল পাঠানের বিভিন্ন স্থাপত্যসৌধ। বাঙ্গালী যতদূর গেল, দুর্গাপুজোকে সঙ্গে নিয়ে গেল। সমস্ত শরৎ ও হেমন্তকালটাকে ওখানে এখনও বলা হয়, 'বাঙ্গালী সিজন্'।

কাশীতে বাঙ্গালীর প্রাধান্য রানী ভবানীর আমল থেকে।. কিন্তু পুজোর মরসুম থেকে 'বাঙ্গালী সিজন্' আরম্ভ। ইদানীং এই 'বাঙ্গালী সিজন্' দেখা যাচ্ছে কাশ্মীরে, হিমাচলে, রাজস্থানে এবং কতকটা পাঞ্জাবেও। একশ্রেণীর বাঙ্গালী এখন সমস্ত হেমন্তকাল ধরে উত্তর ভারতের সর্বত্র টাকাপয়সা ছড়িয়ে দিয়ে আসে। ভারতীয় রেলওয়ে বাঙ্গালীর উপার্জনের অনেকটা অংশ পেয়ে যায়।

যাই হোক, পুজোর মরসুম অনেকটা আমার মধ্যেও কাজ করছে। আমি সেবার

গিয়ে গণেশমহল্লার গলিতে আমাদের 'কমিউনে' উঠলুম। হ্যাঁ, কমিউন' বইকি। ১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউনের পর আমাদের নিকট-বন্ধু সারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এই বাসস্থানে বোধ করি দ্বিতীয় কমিউন পরিচালনা করছেন! কিন্তু এটি একটু ভিন্ন ধরনের। এই দোতলা বাড়ির যে কোনও ঘরে কম্বল বিছিয়ে আশ্রয় নিলে কেউ প্রশ্ন করে না। কেউ কাজ করতে বলে না বা কেউ খরচের কথা তোলে না। বন্ধুদের যে কেউ এসে মধ্যাহ্ন ভোজের আসরে বসে যাও, পেট ভরে গরম-গরম ডাল, ভাত, মাংস বা রুই মাছের কালিয়া, দই বা চাটনি খেয়ে যাও। অমুক-অমুক বন্ধু, অমুকের চেনা অমুক বন্ধু—ভাল কথা, পাত পেড়ে বসো। আজ কি রান্না হয়েছে হে?—হ্যাঁ, 'গরম গরম'—ভুনি-খিঁচুড়ি নতুন ওঠা ফুলকপি দিয়ে, আর গঙ্গার ইলিশ—চার-পাঁচ আনা জোড়া! টক দইয়ের সঙ্গে কাশীর চিনি। হাপুস-হুপুস করে খাও!

বন্ধুবর সারনাথ ওরফে শটাই তাঁর চারটি ছোট ভাই—শিশু, নাবালক ও কিশোর—এদেরকে খাইয়ে ধুইয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে প্রতিপালন করেন। কলকাতা থেকে বড় ভাই টাকা পাঠান। ওঁদের পিতামাতা কেউই জীবিত নেই। শটাই আমাদের কর্ণধার। তার এক হাতে রান্না, বাটনা, জল তোলা, বাসন মাজা, এঁটো পাড়া, বাজারহাট করা, ঘর-দোর ঝাড়া—এবং আরও কি কি, সেই শুধু জানে। অন্যদিকে সে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। পাড়ার লোক এবং বন্ধুমহলে সে বিনামূল্যে ঔষধপত্র দিয়ে আসে। অসহায় রোগীদের জন্য আবার সযত্নে দুধ-বার্লি তৈরি করে তাদের বাড়িতে নিয়ে যায়। এদিকে সে নাকি একজন 'কমিউনিস্ট'। কিন্তু তার বাড়ির ভিতরকার মস্ত কালীমন্দিরের পুজোর জন্য তাকে নৈবেদ্য ও ভোগ সাজাতে হয়। সম্প্রতি সেই চতুর্ভুজা কালীমূর্তির একটি হাতে সে কাস্তে-হাতুড়ি মার্কা একটি ফ্ল্যাগ আটকিয়ে দিয়েছে। সন্ধ্যার আগে সে নতুন পার্টি আপিসে গিয়ে 'স্টাডি সার্কেলে' যোগ দেয়।

'কমিউনিস্ট' শটাই দেবদ্বিজ বা পুজো-অর্চনায় পরম ভক্তিমান। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ ও গান্ধীজীর প্রতি সে অতিশয় শ্রদ্ধাশীল। ওদিকে লেনিন, ট্রটস্কি, স্টালিন এবং মার্কস এঞ্জেলের প্রতিটি রচনা তার মুখস্থ। রুশ বিপ্লবের আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত, তার ব্যাখ্যা, প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত, লেনিনের আগাগোড়া ইতিহাস এগুলি ১৯৩৩-এ প্রথম আনুপূর্বিক শুনি এই কমিউনে। কিন্তু শটাই বাঙমুখর নয়। সে শান্ত স্বল্পভাষী, সংযত ও সেবাপরায়ণ। কিন্তু আরেক দিকে সে অত্যন্ত ঠাণ্ডা। তার কোনও দুঃখ, ভাবাবেগ, বেদনাবোধ, শোকতাপ, স্নেহপ্রীতির উচ্ছ্বাস—কিছু নেই। রোগীর সেবা করবে সে অক্লান্ত, কিন্তু রোগীর মৃত্যু ঘটলে সে মৃত ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে শুধু ভাববে, অন্তিমকালের কোন্ কোন্ উপসর্গে কি-কি ওষুধ কাজ দিতে পারত! তার একপ্রকার মিশনারি করুণা দেখতে পাই—যেটা শীতল নিরুদ্বেগ, নির্মোহ, কিন্তু অকৃত্রিম সেবাপরায়ণ। শটাইয়ের চোখে কখনও জল দেখিনি, এবং সর্বাপেক্ষা নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুতেও তার চোখ

ঝাপসা হয়নি। স্ত্রীলোক এবং পুরুষ তার কাছে একই 'মেসিন', শুধু 'অর্গানিক' পার্থক্য মাত্র। কাব্য-সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে তার কোনও ঔৎসুক্য নেই, কিন্তু শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথির গ্রন্থগুলি সে রাত জেগে পড়াশুনা করে। আমাদের সকল কাজে ও সকল প্রয়োজনে শটাই ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা দুঃসময়ে শটাইকে ডাকে, হিন্দু মহাসভার লোকরা তাকে সালিশী মানে, মদনপুরার মুসলমান কর্তারা তার সাহায্য চায় এবং পাড়ায় পাড়ায় কোথাও ঝগড়াঝাঁটি হলে সকলের আগে শটাইয়েরই ডাক পড়ে। সে নিজে নিঃস্ব তার একটি পয়সাও পুঁজি বা উপার্জন নেই, অথচ তার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও কিছু নেই। না উপার্জন, না সংস্থান—শুধু তার বড় ভাই তাকে কলকাতা থেকে প্রায়ই মনিঅর্ডার করেন।

সুতরাং শ্রীমান সারনাথের ওই বাড়িটিকে তার প্রত্যেক বন্ধুবান্ধব নিজের বাড়ি মনে করে এবং ওখানে আমাদের জন্য বিনামূল্যে ডাল-ভাত, মাছ-মাংস বাঁধা থাকে। তখনও কাশীতে কাটা রুই মাছ ও খাসির মাংস চার-পাঁচ আনা সের। শটাইয়ের রান্না উপাদেয়।

ওর ওখানেই শতরঞ্জি বালিশ নিয়ে থেকে গেলুম। না, এবার আর বড় বাড়িতে উঠব না। খবরটা কানে উঠলে আমার ভাই প্রভাস রাগ করবে জানি, কিন্তু ভাই-বোন, মাসী-পিসি এখন আর ভাল লাগছে না।

সেই বছর অর্থাৎ ১৯৩৩এ ন্যাশনাল সোসালিজমের স্লোগান তুলে এডলফ্ হিটলার বিশাল জার্মানির অধিনায়করূপে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং সমগ্র ইউরোপ, ইংল্যাণ্ড ও সোভিয়েট ইউনিয়ন তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখছে। আমরা আদার ব্যাপারী, ইংরেজের পদপীড়িত, আমাদের বিয়ে খবরের কাগজ পর্যন্ত। শুধু জওয়াহরলাল একটু-আধটু বিদেশী রাষ্ট্রের কথা বলেন, এই মাত্র। এই বছরেই আমি নেহরুর দুই-একটি প্রবন্ধের তর্জমা করে বাঙ্গলা সাময়িকপত্রে ছাপি। তাঁর রচনাগুলি সাহিত্যপ্রধান, সেজন্য রস পেতুম। ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় এই সময়টায় তিনি তাঁর কিশোরী কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরাকে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে রাখেন।

যাই হোক, এবার বড় বাড়িতে উঠিনি বটে, কিন্তু সকলের সঙ্গে আমার প্রায় প্রতিদিনের যোগাযোগ ছিল। কিশোরদা তখন বাঙ্গালীটোলা স্কুলের হেড মাস্টার। তাঁর বড় ছেলে ভোমল বোধ হয় এবার ম্যাট্রিক দেবে দেবে। একদিন কিশোরদা আমাকে বললেন, আমাদের ইস্কুলে এবার ঘটা করে বিজয়া সম্মেলনী হবে। তুই নিশ্চয় আসবি। তোকে অনেকে দেখতে চায়। এবারেও কোজাগরীর দিনেই হবে।

পুজোর দিন সকালে গেলুম হারারবাগের দিকে। ওই দিকেই গঙ্গা ঘোষালের বাড়ি। তার মাথাটা অকালপক্ক, এরই মধ্যে চুল পেকেছে। কিন্তু সে ছেলেমহলের প্রিয়। তার স্নেহমধুর আচরণ ও কথাবার্তা এবং হাসি-হাসি ভাবের জন্য অনেকেই তার সুখ্যাতি করে। সে কাঁধে হাত রেখে অন্তরঙ্গের মতো আলাপ করতে জানে। ইদানীং তার সঙ্গে আমার খুবই ঘনিষ্ঠতা। সাবিত্রীদের বাড়িতে সে আত্মীয়েরই

মতো। কিন্তু সাবিত্রীই যে আমার ভ্রমণকাহিনী গ্রন্থে 'রানী' নামে পরিচিতা, গঙ্গা এটি জানেও না, এবং বইটিও পড়েনি। আমাকে দেখেই গঙ্গা বলল, তোমার চিঠি পেয়েছি। তুমি যে সেই একগাদা বই পাঠিয়েছিলে, তাই দিয়ে টুনু এক লাইব্রেরি আরম্ভ করেছে। সে তোমার সব বই পড়ে। তুমি কি যেন এক ভ্রমণকাহিনী লিখেছ 'ভারতবর্ষে',' টুনু তাই নিয়ে সারাদিন কাটায়।

আমি হাসছিলুম। সাবিত্রীর ডাক নাম টুনু। আমার 'জলকল্লোল' গ্রন্থে এই নামটিই ব্যবহার করেছি।

গঙ্গা বলল, শিবালার ওদিকে টুনুর এখন খুব নাম। ওর খরচে অনেক মেয়ে লেখাপড়া করে, শেলাইয়ের কল চালায়, অনেকে আবার কাপড়-চোপড় আর মাসোহারাও পায়। টুনুর নিজের অবস্থা বেশ ভাল। ওর স্বামীর ইনস্যুওরেন্সএর দরুন অনেক টাকা পেয়েছে। তাছাড়া জানো ত —

কেউ কোথাও আমাদের কথা শুনছে না, তবু গঙ্গা আমার কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বলল, টুনুর বাবাকে গুলী করে মেরেছে বাঙ্গলার বিপ্লবীরা, তিনি পুলিসের ইনসপেক্টর ছিলেন ত—সেইজন্য তাঁর বিধবা মেয়েকে গভর্নমেন্ট মাসোহারা দেয়! যাক্, খুব খুশী হলুম তুমি এসেছ। টুনুও শুনলে খুশী হবে। তুমি আছ কদ্দিন?

কয়েকদিন আছি এখন।

বেশ, আবার দেখা হবে। শোন, কোজাগরীর দিনে এবার 'বিজয়া সম্মেলনী' হবে ঘটা করে। আমি অরগানাইজ্ করছি—এসো। তোমার নেমন্তন্নর চিঠি যাবে প্রভাসদের ওখানে। আচ্ছা, এখন আসি।

গঙ্গা চলে গেল চৌমহানির দিকে। আমি ঢুকলুম সোনারপুরার গলিতে। এ গলি দিয়ে কিছু দূর এগিয়ে গেলেই বাঁ-হাতি ফরিদপুরার গলি। ফরিদপুরার বাড়িতে সুধাংশু মুখুজ্যে মশায় এখন নেই। তিনি আছেন কলকাতায়। সকাল দশটায় তিনি যান ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন কার্জন পার্কে। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি এখন এসপ্লানেড নর্থের বড় অট্টালিকায় স্থানান্তরিত। ওই কার্জন পার্কের একটি বিশেষ গাছতলায় সুধাদা প্রায়ই সন্ধ্যা কাটান আমার সঙ্গে। ছেলেদের পড়াশুনোর ব্যাপার নিয়ে এখন তিনি পাইকপাড়ায় তাঁর ছোট ভাইয়ের ওখানে থাকেন—সেখানে তিনি পূজ্য ও আরাধ্য। এখনও তাঁর আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভাল। কিন্তু তাঁর ধুতি, পাঞ্জাবি, বেনিয়ান, পায়ের চটি —সব ছেঁড়া। চোখের চশমার একটা ডাঁটিতে সুতো বাঁধা। তিনি চট করে নতুন সামগ্রী গ্রহণ করতে পারেন না,—পুরনোর সঙ্গে তাঁর মন মেলানো থাকে। ওঁর কাশীর বাড়িতে ঘরের কড়িকাঠ থেকে যে ঝুলটি ঝোলে, সেটি ওঁর কল্পনার একটা আশ্রয়! ভাঙ্গা পেয়ালাও কুঁজো, নস্যের পুরনো টিনের কৌটো, পায়াভাঙ্গা টুল, ছেঁড়া মশারি সীট—ছেঁড়া বেতের চেয়ার, নড়বড়ে তক্তা—এগুলি তাঁর অতি পরিচিত বলেই অতি প্রিয়।—এগুলি হঠাৎ বদলিয়ে দিতে গেলে তাঁর মন উৎকেন্দ্রিক হয়ে যায়, এবং নিজেকে

বাস্তুচ্যুত মনে করেন। তিনি দরিদ্র এবং সর্বহারা—এই চিন্তাবিলাসটি তাঁর একান্তই দরকার।

কোজাগরীর আগের দিন প্রভাস আমার হাতে আমন্ত্রণপত্র দিল। আমার তরুণ বয়সে সেদিন আমার পক্ষে এটি অভাবনীয় ছিল যে, ওই বাঙ্গালীটোলী ইস্কুলে আমার জন্য একটি নাটকীয় পরিস্থিতি অপেক্ষা করে রয়েছে! আমার যাবার উৎসাহ ছিল কম। কারণ ওই বিজয়া সম্মেলনীতে যাঁরা আসেন, তাঁরা সাধারণত প্রবীণ-বয়স্ক এবং কাশীস্থ পণ্ডিত সমাজ। সেখানে আমি অনেকটাই বেমানান। তাছাড়া দু'চারজন এমনও আসেন, যাঁরা তরুণ লেখকদের প্রতি যথেষ্ট প্রসন্ন নন। শুনেছি আমার ভাই প্রভাস আমার প্রতি স্নেহশীলতাবশত ওদের কোন কোনও ব্যক্তিকে দুচারটে কড়া, কথাও শুনিয়ে দেয়। সেদিন প্রভাসের অপ্রিয় সত্য ভাষণ অনেকের পক্ষেই ভীতিজনক ছিল। কিন্তু লক্ষ্য করেছি কাশীতে প্রভাস বোধহয় কিশোরদের চেয়েও জনপ্রিয়।

যাই হোক, আমার উৎসাহের অভাব থাকা সত্ত্বেও গেলুম বিকালের দিকে বাঙ্গালীটোলা স্কুলে এবং সভাস্থলের পিছন দিকে একান্তে গিয়ে একখানা চেয়ারে বসলুম। সভাপতির আসনে দেখছি, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রথমনাথ তর্কভূষণকে। উনি আমাদের সকলের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন এবং পথে-ঘাটে কোথাও ওকে দেখলে আমরা নতনমস্কার জানিয়ে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াই। সভাপতিকে ঘিরে আশেপাশে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ছাড়াও তিনজন মহামহোপাধ্যায় —পঞ্চানন তর্করত্ন, ফণীভূষণ তর্কবাগীশ ও যাদবেশ্বর তর্করত্ন। রয়েছেন পণ্ডিত বটুকনাথ ভট্টাচার্য, কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, রায় বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন সিংহ, ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জি, হরিহর শাস্ত্রী, ফণীন্দ্র ও মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ডাঃ শিশিরকুমার মৈত্র এবং আরও বিশিষ্ট কয়েকজন, যাঁদের অনেককে আমি সেদিন চিনিনে।

এক-একজন বক্তা সুন্দরভাবে কাশীর বাঙ্গালী-সংস্কৃতি এবং বিজয়া সম্মেলনীর তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করছিলেন, এমন সময় গঙ্গা তার স্বভাবসিদ্ধ হুজুগ নিয়ে কাছে এসে আমার কানে কানে বলল, টুনুকে এনেছি আমার সঙ্গে। ও তোমাকে দেখবে। তোমার বক্তৃতা শুনবে। ওই যে, ওই কোণের দিকে বসেছে।

বক্তৃতা! আমি অবাক—আমি কেন বক্তৃতা দেবো?

বাঃ তুমি হলে টুনুর প্রিয় লেখক! তোমার কথা শুনবে না সে একটু?

এমন সময় কে যেন উঠে গিয়ে সভাপতি মহাশয়কে কি যেন বলল। তৎক্ষণাৎ বক্তৃতারত এক পণ্ডিতকে থামিয়ে সভাপতি মহাশয় ঘোষণা করলেন, আপনাদের কাছে আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, এখানে এমন এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছেন, যাঁর পুণ্য লেখনী হিমালয়ের দুর্গম ও দুঃসাধ্য তীর্থ কেদারনাথ ও বদরিনাথকে আমাদের সম্মুখে মূর্ত করে তুলেছে!

সভায় কেমন একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। এপাশে ওপাশে সবাই খুঁজতে লাগল সেই ব্যক্তিকে! আমি আড়ষ্ট হয়ে উঠলুম।

মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ বলছিলেন, এই তরুণ লেখক প্রকৃতই সংসার-বিরাগী, নিষ্কাম নিরাসক্ত ব্রহ্মচারী। তিনি তাঁর তীর্থযাত্রায় দেখা পেয়েছিলেন এক আচারনিষ্ঠা পরম পুণ্যবতী রমণীকে—যাঁর তপশ্চর্যা, সংযম, শালীনতা—সমগ্র হিমালয়কে প্রাণবন্ত করেছিল। গ্রন্থকার জানিয়েছেন, এই সদাচারপরায়ণা বিধবা যুবতীটি নাকি কাশীবাসিনী! তিনি কোথায় থাকেন লেখক তা জানেন না, কিন্তু আমরা সেই দেবকন্যাকে আশীর্বাদ করি। আপনাদের সকলের অনুমতি ক্রমে আমি 'মহাপ্রস্থানের পথে'র লেখককে স্বাগত সম্বর্ধনা জানিয়ে অনুরোধ করি, তিনি আমাদের সামনে এসে দু'একটি কথা বলুন।

ভাগ্যবিধাতার সেই নাটকীয় কৌতুক সেদিন আমাকে মেনে নিতে হয়েছিল। শ্রীমতী সাবিত্রী সভার শেষ প্রান্ত থেকে শান্ত চক্ষে আমার দিকে চেয়েছিলেন। আমি যেন বিবশ, অসাড় এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত বোধ করছিলুম।

এক সময়ে কলের পুতুলের মতো উঠে গিয়ে সভাপতিকে নত নমস্কার জানিয়ে মুখ খুললুম। আমার বক্তৃতার মাঝে মাঝে শ্রীমতী সাবিত্রীর সেই সম্মোহিত কালো দুটো চোখের দিকে তাকাচ্ছিলুম। তিনিই আমার অনুপ্রেরণা! আমার ভাষণে এনে হাজির করেছিলুম বিশ্বপতি ব্রহ্মাকে, সপ্তর্ষিমণ্ডলকে, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের আদিম নিয়মকে, মানুষের চিরকালীন তীর্থযাত্রার ঐশ্বরিক পিপাসাকে, জীবনধারণের মূল ব্যঞ্জনাকে—অর্থাৎ হাতের কাছে যা পেয়েছিলুম তাই নিয়েই পেশাদার বক্তার মতো কথার মালা গেঁথে যাচ্ছিলুম।

এর পরে আমার ভাষণে এলো তিনটি নারী। একটি স্খলিতচরিত্রা কিন্তু স্নেহধর্মপরায়ণা 'রাধারাণী', দ্বিতীয়টি অন্ধকার পার্বত্য নদী-সঙ্গমে পথপ্রদর্শিকা ঈশ্বর-প্রেরিতা ভগবতী 'ভৈরবী', তৃতীয়টি হলেন শুচিশুদ্ধা, নিষ্ঠাবতী ও কল্যাণময়ী 'রানী'—যাঁর চরিত্রগৌরবের মহৎ সান্নিধ্য সকল তীর্থযাত্রাপথের ক্লান্তি, অবসাদ, দুঃখ-দুর্যোগ—সব ভুলিয়ে দেয়। শ্রীমতী 'রানী' হলেন সেই প্রজাপতি ব্রহ্মার নিত্যসৃজনের আনন্দ রূপ—যে আনন্দে বিষ্ণুগঙ্গা তার ধারাস্রোতে মুখর হয়, উত্তুঙ্গ তুষারশৃঙ্গ দেবাদিদেবের চূড়ায় পরিণত হয়, যে-আনন্দে চিড় আর পাইনের অরণ্য মহৎ বেদনায় আর ঈশ্বরলাভের অনন্ত পিপসায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে!

আরও কত কি বলে যাচ্ছিলুম। অদূরে একান্তে বসে রয়েছেন সেই আমার ইষ্টমন্ত্রদাত্রী ভাবাপ্লুতা শ্রীমতী সাবিত্রী—আজ যিনি শুধু 'রানী' নন, যিনি সর্বাণী—যাঁর চোখ দিয়ে এবার ঝরঝরিয়ে জল নেমেছে, এবং যাঁর তিন-চারজন সঙ্গিনী অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন। সাবিত্রীর সত্য পরিচয় সম্বন্ধে আমি অতিশয় সতর্ক ছিলুম।

পেন্‌সনভোগী বৃদ্ধরা এবং পণ্ডিত মহল সেদিন 'সাধু সাধু' বলে আমার ভাষণকে অভিনন্দিত করেছিলেন। এর ফলে হ'ল এই, 'তরুণ সাহিত্য' রচনার জন্য আমার যে অপযশের পরিচয় কাশীতে চলে আসছিল, তার অনেকটাই সেদিন বাষ্পের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল।

সভাশেষে কোলাকুলির পালা। আমার সমবয়স্কের সংখ্যা কম—চারদিকে চেয়ে দেখি আমার 'বাবারা'! একসময় গঙ্গা এসে আমাকে ধরল—সে হবে না, টুনুকে ওই বারান্দায় দাঁড়াতে বলেছি। সে তোমার ভক্ত পাঠিকা, একবার গিয়ে দাঁড়াবে চলো!

গঙ্গা একপ্রকার হিঁচড়িয়ে আমাকে টেনে নিয়ে গেল ইস্কুলের দক্ষিণ-পশ্চিম বারান্দার কাছে। তিন-চারজন বয়স্কা সঙ্গিনীর মধ্যে সাবিত্রী হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। গায়ে তাঁর রেশমী চাদর, মাথায় ঈষৎ ঘোমটা। না, আমি তাঁকে চিনিনে, জীবনেও তাঁকে দেখিনি! আমি কাঠের পুতুলের মতন হাত জোড় করে দাঁড়ালুম স্মিত মুখে। তখন রক্ষণশীল কাল, অপরিচিতা কোনও তরুণী বিধবার সঙ্গে কথা বলার রেওয়াজ হয়নি। গঙ্গা মাঝখানে দাঁড়াল। সে ওঁদের ঘরের লোক। গঙ্গার কাছে অনুরোধ পেয়ে এবার শ্রীমতী সাবিত্রী মৃদু বিনীত স্বরে বললেন, গঙ্গাদার অনুরোধে আপনি কতগুলি বই দিয়েছিলেন, সেগুলি আমাদের লাইব্রেরীতে সাজিয়ে রেখেছি।

আমি নিজে নিশ্চল কাঠের পুতুল এবং অপর তিনজন মহিলা হলেন মিশরের মমি! শুধু গঙ্গা একসময় ছটফটিয়ে বলল, টুনু, তুমি যে বলছিলে ওঁর সঙ্গে কখনও দেখা হলে তুমি কি যেন জানতে চাইবে? এবার ওঁকে জিজ্ঞেস করো?

সাবিত্রী আমার দিকে তাকাতে পারছিলেন না। কারণ সুস্পষ্ট। কিন্তু উনি সেই সন্ধ্যার কোজাগরী পূর্ণিমার আলোয় আমার দিকে বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে মধুর মিহি কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, আপনি ওই বইতে যে সব কি সত্যি?

নারীর সহজাত সূক্ষ্ম বুদ্ধি এবার আমাকে নাড়া দিল। গলা পরিষ্কার করে বললুম, ওই বইতে যাঁর নাম 'রানী', তিনিই সব জানেন!

রানী কে? কাশীতে তিনি কোথায় থাকেন? তাঁর আসল নাম কি?

ক্ষমা করবেন, আমি কোনটাই জানিনে। তিনি ত বিদায় নেবার সময়ে আমাকে ঠিকানা দিয়ে যাননি!

গঙ্গা একসময় বলল, টুনু, এমন একজন লেখকের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিলুম, কই—পায়ের ধুলো নিলে না?

এবার প্রবীণা এক সঙ্গিনী বাধা দিয়ে বললেন, না গঙ্গা, টুনু যে এবার চাতুর্মাস্য ব্রত করছে, কারও পা ছুঁতে নেই!

টুনু বোধ হয় হাত বাড়াচ্ছিল, কিন্তু চাদর দিয়ে ডান হাতখানা আবার ঢেকে নিল। ওঁর উপরে এইপ্রকার পারিবারিক শাসনের কথা আমি সবই জানতুম।

গঙ্গার সঙ্গে একসময়ে ওঁরা বিদায় নিলেন।

প্রসঙ্গত বলি, বিজয়া সম্মেলনীর এই সূত্রে আমার প্রতি স্নেহশীল হয়ে উঠেছিলেন দুইজন ব্যক্তি—পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ও 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' নামক গ্রন্থের লেখক রায় বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন সিংহ। রক্ষণশীল সমাজ কি প্রকার দৃষ্টিতে তৎকালে সাহিত্যের আদর্শ বিশ্লেষণ করত, এবং কি প্রকার সাহিত্য সৃষ্টি করে এই নীতিজ্ঞানহীন আধুনিক যুগকে সৎপথে আনা যায়—এরই মোটামুটি আলোচনা ওই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ছিল।

সিংহ মহাশয় থাকতেন হারারবাগে আমারই এক কুটুম্ব ডাঃ জগবন্ধু চৌধুরীর বাড়িতে। ওখানে তিনি আমাকে বার বার আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। পরবর্তীকালে এই বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি তাঁর দেশ ফরিদপুরের বাড়িতেও আমাকে সমাদরে আহ্বান করেছিলেন।

শটাইয়ের 'কমিউনে' সেবার বড় আনন্দে কয়েক দিন কাটিয়ে, বাড়ি ফিরেছিলুম।

বাড়ি ফিরে দেখি, কয়েকখানা চিঠি আমার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। প্রথম চিঠিখানা আনন্দদায়ক। শান্তিনিকেতন থেকে লিখেছেন অনিলকুমার চন্দ—তিনি তখন রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি। তিনি লিখছেন, "কবি কিছু দিন নদীর উপরে বাস করবেন। বোধ হয় পড়াশুনোর দিকে এখন মন নেই। তবে জানতে পারলুম একখানা মাত্র বই নিয়েই তিনি নৌকায় উঠেছেন। সে বইটি আপনার "মহাপ্রস্থানের পথে'।"

দ্বিতীয় চিঠি লিখেছেন, শ্রীমতী নীলিমা চট্টোপাধ্যায়। তিনি লিখছেন, সবিনয় নিবেদন, আপনার নির্দেশমতো সরোজ মিত্র মহাশয়ের কাছে আমার আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলুম। ডাঃ বি সি ঘোষ মহাশয় আবেদনপত্র মঞ্জুর করেন এবং ত্রিশ টাকা বেতন ধার্য করেন। আমি গত দশ দিন আগে মেট্রনের কাজ নিয়ে কলকাতায় এসে কাজে যোগদান করেছি। যে ব্যক্তি আমাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, সে আবার রাঁচিতে ফিরে গেছে। আমি ভালই আছি। তবে স্বামী অসুস্থ হয়ে রয়েছেন সেজন্য মনে দুশ্চিন্তা আছে। আমার এই কর্মসংস্থান আপনার জন্যই হয়েছে। আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন। ইতি—

তৃতীয় চিঠি কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি লিখছেন, তুমি পুজোর আগে "আনন্দরাজার' আপিসে বসে প্রফুল্লবাবুর কাছে জেনেই গিয়েছিলে আমাদের এখান থেকে নতুন সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দেশ' শীঘ্রই বেরোবে। কিন্তু তুমি সেই থেকে চুপচাপ। আশা করি তোমার লেখাটা শেষ হয়েছে। আসছে শনিবার সকালে বাড়ি থেকো, আমি যাব। ইতি—বিজদা।

॥ ৪৩ ॥

'দেশ' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় বাঙ্গালা সন ১৩৪০ এবং ইংরেজী ১৯৩৩-এ কালীপুজোর দিন প্রথম সংখ্যা বেরোয়। আমরা ভেবেছিলুম স্থিরবুদ্ধি ও শান্তপ্রকৃতি প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় সম্পাদক হবেন। কিন্তু তাঁর বদলে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারই হলেন 'দেশ'-এর প্রথম সম্পাদক।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় প্রথম প্রবন্ধে কথায় কথায় তখন বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় তুলতেন। তাঁর কাব্যময় বাঙ্গলা ভাষার প্রচণ্ডতা, তেজোব্যঞ্জনা, অগ্নুদ্গার এবং যাকে বলে রেটরিক—এগুলির জন্য কলকাতার ইংরেজ ঘাঁটি রাইটার্স বিল্ডিং, গভর্নমেণ্ট হাউস, ব্রিটিশ ব্যবসায়িক সমিতি প্রভৃতি মহলে

স্বৎকল্প দেখা দিত। বাঙ্গালী জাতি তাঁর রচনায় খুঁজে পেতো শৌর্য, বিক্রম, আবেগ-প্রবণতা, আত্মোৎসর্গের উদ্দীপনা, জাতীয়তাবাদের প্রতি একাগ্র নিষ্ঠা ও দেশপ্রেম। আমাদের কাছে তিনি ছিলেন অতিপ্রিয় সত্যেনদা। কিন্তু ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রবল বিরোধী এবং স্বামী বিবেকানন্দের অভয়মন্ত্রের সাধক এই রণোন্মত্ত তুরঙ্গকে যিনি প্রতিদিন রাশ টেনে সংযত রাখতেন, তিনি প্রফুল্লকুমার সরকার স্বয়ং। বাঙ্গলার সাংবাদিক সমাজে সত্যেন্দ্রনাথ এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব!

এই সময় কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়—যিনি বাঙ্গলা সাহিত্যে বোধ হয় সেই প্রথম 'সর্বহারা' শব্দটি ব্যবহার করে 'সর্বহারার গান' নামক কাব্যগ্রন্থ এবং 'বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ' লিখে খ্যাতি অর্জন করেন, তিনি 'দেশ' পত্রিকা দেখাশোনার ভার নেন্। তাঁর সহযোগী ছিলেন আমাদের পরম সুহৃদ্ ও চিরনিরীহ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং সুপণ্ডিত যোগেশচন্দ্র বাগল। এঁরা আমাদের বন্ধু। কিন্তু ওঁদের মধ্যে বিজয়লাল ছিলেন একান্তই আদর্শনিষ্ঠ। রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, পরমহংস, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ,—এঁদের পূজা করতে করতে তিনি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন এবং বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ঘুষি পাকিয়ে পৃথিবীকে চ্যালেঞ্জ করেন। আমার ঠিক মনে নেই, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট বিজয়লালের তেজস্বী ও অগ্নিগর্ভ বক্তৃতায় ক্রুদ্ধ হয়ে কয়েকবার তাঁকে জেলে পাঠিয়েছিলেন। আমরা বিজয়লালের প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিলুম। তিনি যখন 'বাঙ্গলার কথা' বা 'বঙ্গবাণী'তে ছিলেন, তখন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-দুর্যোগ অভাব-অনটন কোনও কিছুর পরোয়া করতেন না। তিনি বলতেন, দেশের জন্য এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য এই ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে।

'দেশ'-এর প্রথম সংখ্যায় আমার একটি ছোট উপন্যাস আরম্ভ হবে—বিজয়দা এটি আমাকে বলে রেখেছেন। কিন্তু অতি দ্রুত কলম চালিয়েও সেটি শেষ হল না, দুই তিন দিন বুঝি দেরি হয়ে গেল। দ্বিতীয় সংখ্যায় আমার একটি গল্প বেরুল—নাম "চিতার আলোয়'। এর ঠিক পরেই 'জয়ন্ত' নামক একটি ছোট উপন্যাস ছাপা হয়।

প্রথম সংখ্যা 'দেশ' বেরোবার আগে বিজয়দা শুধু বলেছিলেন, তোমার জন্য একটি সু-খবর আছে! সেটি ব্যক্তিগত হ'লেও সবিনয়ে বলি, সেই বছরের পূজা সংখ্যা 'প্রবাসী'তে আমার 'অবিকল' নামক একটি গল্প ছাপা হয় এবং সেটি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কবি তাই নিয়ে 'কোষ্ঠীর ফলাফল' 'ভাদুড়ী মশায়' প্রভৃতি রসোপন্যাসের লেখক শ্রদ্ধেয় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে একখানি পত্র লেখেন। কেদারবাবু সেই চিঠিকে কেন্দ্র করে একটি প্রবন্ধ পাঠান 'দেশ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার জন্য। কিন্তু সেটি ছাপা হয়নি কি কারণে আমার জানার কথা নয়। বিজয়লালও আর কিছু বলেননি।

ওই সময়েই আমার মন উল্লসিত হয়ে ওঠে একটি বিশেষ কারণে। শান্তিনিকেতনে কবির সচিব অনিলকুমার চন্দ মহাশয়ের চিঠিখানি যখন আমার অধীরতার মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছিল, সেই সময় রবীন্দ্রনাথের একখানা চিঠি পেলুম। চিঠিটা এই ঃ

"কল্যাণীয়েষু,

আজকাল বসে বসে বই পড়ার মতো অবকাশও পাইনে, উদ্যমেরও অভাব—মনটা উড়ো পথে চলতে চায়, শরীরটা কর্মবিমুখ। কিন্তু তোমার 'মহাপ্রস্থানের পথে' বইখানি অনুরোধের দায়ে নয়, পড়ার গরজেই—কিছু তাতে কাজেরও ক্ষতি ঘটেচে। এই বইয়ে তোমার দৃষ্টি, তোমার মন, তোমার ভাষা সমস্তই পথচলিয়ে পাঠকের মনকে রাস্তায় বের করে আনে। তোমার লেখা চলেছে শাস্ত্রিক পথ দিয়ে নয়, ভৌগোলিক পথ দিয়ে নয়, মানুষের পথ দিয়ে।

"কত শতাব্দী ধরে দুঃসাধ্য সাধনরত দুর্গম যাত্রার প্রয়াস নিরবচ্ছিন্ন বয়ে চলেছে। —এই তীর্থযাত্রা তারই প্রতীক। কিছুদিন সেই টানে তুমি চলেছিলে। ঘরে ঘরে সকল মানুষই পূর্বমানুষ পরম্পরার নিরবচ্ছিন্ন অনুবৃত্তি; ছড়িয়ে আছে বলে তার সূত্রটা ধরতে পারা যায় না, কিন্তু ঐ সঙ্কীর্ণ গিরিপথে সঙ্কীর্ণ লক্ষ্যের আকর্ষণে এই চিরকালীন মানবপ্রবাহের বেগটা সুপ্রত্যক্ষ। একই বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠতায় তারা সুদূর অতীত ও অনাগত যুগের সঙ্গে নিবিড় সংশ্লিষ্ট। এরা নানা প্রদেশের নানা ঘরের, এরা বহু বিচিত্র অথচ এক—এদের সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে সুখ ও দুঃখ, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, জীবন ও মৃত্যুর ঘাত সংঘাত,—এই যুগযুগান্তর পথের পথিক মানবচিত্ত আপন অশ্রান্ত ঔৎসুক্যের স্পর্শ সঞ্চার করেছে তোমার লেখায়—তার কৌতুক ও কৌতুহল পাঠককে স্থির থাকতে দেয় না।

"তোমার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে যে সকল ঘটনা তুমি বিবৃত করেছ তার মধ্যে একটিতে তোমার স্বভাবকে ক্ষুণ্ণ করেছে। এই তীর্থপথে তুমি যে লোকযাত্রায় যোগ দেবার সুযোগ পেয়েছিলে তার মধ্যে শিক্ষিত, মূর্খ, সাধু, অসাধু সকল রকম মানুষেরই সমাগম ছিল—মানুষকে এত কাছে এত বিচিত্রভাবে স্বীকার করে নেওয়া কম কথা নয়। তবে কেন বেশ্যাকে বেশ্যা জানবামাত্র এক দৌড়ে দূরে চলে গেলে? কেন সাহিত্যিকের উপযোগী বৃহৎ নিরাসক্তির সঙ্গে নির্বিকার কৌতুহলে তাকে দেখে নিলে না? যেসব নিষ্ঠাবতী বুড়ি তোমার ভক্তি ও আচারের শৈথিল্য দেখে তোমাকে মানুষ বলে আর গণ্যই করলে না, তুমি কেমন ক'রে নিজেকে তাদেরই শ্রেণীভুক্ত করতে পারলে? এমন করুণা আছে যা পবিত্র, এমন কৌতুহল আছে যা সর্বত্রই শুচি—সাহিত্যিক হয়ে তোমার ব্যবহারে কেন অশুচিতা প্রকাশ পেলে? তোমার বর্ণনা পড়ে স্পষ্টই বোধ হলো অধিকাংশ ধার্মিক যাত্রীর চেয়ে এই মেয়েটির মধ্যে স্নেহসিক্ত মানবধর্ম পূর্ণতর ছিল, এ নিজে সকলের চেয়ে নীচে পড়ে গিয়েছে বলেই কোনো মানুষকেই অশ্রদ্ধা করতে পারেনি—যে মানুষ সকলের উপরে তারো এই স্বভাব। আমার এক এক সময় সন্দেহ হয় তুমি সব কথা স্পষ্ট করে লেখোনি, লিখলে তোমার ব্যবহারের কৈফিয়ৎ ঠিক মতো পাওয়া যেত।

"আর একটি ছোট্ট কথা বলব। দেখলুম তুমি বাংলা খবরের কাগজের সূতিকাগারে সদ্যোজাত "ক্লান্ট" শব্দটা অসঙ্কোচে ব্যবহার করেচ। বাংলা ছাড়া আর কোনো

প্রদেশে ভাষায় এমন কুশ্রী অপজনন ঘটেনি। অন্যত্র "সংস্কৃতি" শব্দটাই প্রচলিত—এটা ভদ্র সমাজের যোগ্য।

"যাই হোক, তোমার এ বইখানি নানা লোকের কাছেই সমাদর পেয়েছে, আমারও সাধুবাদ তার সঙ্গে যোগ করে দিলেম। ইতি ৫ নভেম্বর, ১৯৩৩।

শুভাকাঙ্ক্ষী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

কবির এই পত্রখানি 'ভারতবর্ষে' (পৌষ, ১৩৪০) প্রকাশিত হবার পর থেকে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে 'সংস্কৃতি' শব্দটার প্রচলন বেড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু এ চিঠি পড়ে আমি একটু বিমর্ষ হয়েছিলুম এই কারণে যে, কবি "রাধারানীকে" তারিফ করেছেন, কিন্তু তিনি রবীন্দ্রানুরাগিণী শ্রীমতী "রানী" ওরফে সাবিত্রীর সম্বন্ধে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি।

দাঁড়াও! কয়েকদিনের মধ্যে কোমর বেঁধে কবিকে একখানা চিঠি দিলুম এবং যথাসময়ে তাঁর জবাব এল—"তোমার সঙ্গে দেখা হলে সুখী হব। পথে যদি বাধা পাও তবুও চলে এসো।"

পর পর কবির সেই দু'খানি চিঠি পেয়ে সেদিনকার হর্ষরোমাঞ্চর কথা আজও ভুলিনি। যাই হোক, প্রথম বড় চিঠিখানা পকেটে নিয়ে সেইদিনই দুপুরবেলায় ভবানীপুরের দিকে বেরিয়ে পড়েছিলুম।

ট্রামে যাচ্ছিলুম। কিন্তু এসপ্লানেড থেকে ভবানীপুরের পথ যেন আর ফুরোতেই চায় না। লিণ্ডসে স্ট্রীট, মিউজিয়ম, পার্ক স্ট্রীট, আর্মি-নেভি—কতক্ষণ পরে এলগিন রোড পার হয়ে আবার ট্রাম চলল। কিন্তু জগুবাবুর বাজারের ওখানটা পেরোতে গিয়ে হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়িখানা থামল। সামনের সমস্ত পথ জুড়ে রয়েছে অসংখ্য লাল-পাগড়ি ও শ্বেতকায় সার্জেন্টরা। আমি গাড়ি থেকে নেমে পড়লুম। দেখি চারদিকে লোকে লোকারণ্য। কিন্তু সেই মুহূর্তেই ফুটপাথের ভিড়ের ভিতর থেকে যে ব্যক্তি খপ করে আমার হাত ধরল সে শ্রীমান শিবু। তখনই আমাকে বাজারের দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে শিবু বলল, না, ওদিকে আর এগোবেন না, এখান থেকেই ফিরুন। ···'আনন্দমঠ' সার্চ হচ্ছে! আপনার নাম সই করা বহু বই রয়েছে আনন্দমঠে···শীগগির পালান।

পালিয়ে যাবো কোন্ চুলোয় ?

শিবু হেসেই অস্থির। বলল, সোজা বাড়ি ফিরে যান।

পথের দু-দিকেই তখন যানবাহন বন্ধ। শিবু নিজেই আগেভাগে গা-ঢাকা দিল। ও নিজে 'আনন্দমঠে'র একজন কর্মী।

আমার আর অন্য উপায় নেই। বড় রাস্তাটা ছেড়ে মোহিনীমোহন রোড ধরে সোজা গিয়ে এলেনবি রোডের ভিতর দিয়ে আমি হনহনিয়ে চললুম। কোথায় যাচ্ছিলুম তা জানিনে, কিন্তু দক্ষিণে আর নয়, এবার সোজা উত্তরে। ওদিকে তখন

মোটর বাস হয়নি, সুতরাং প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটতে হাঁটতে মল্লিকবাজারের মোড়ে এলুম। সেখান থেকে ট্রামে শিয়ালদা এবং শিয়ালদা থেকে ৩নং বাসে শ্যামবাজার। হেমন্তের অপরাহ্ণ, তখনও চারটে বাজেনি। আমি বাড়ি যাচ্ছিলুম। কিন্তু আর-জি-কর হাসপাতালের সামনে পুলের পথ যখন পার হচ্ছি, হঠাৎ দেখি বড়দা হন্তদন্ত হয়ে আসছেন। আমাকে দেখেই রুদ্ধ স্খলিত কণ্ঠে বললেন, তুমি এখুনি রাত্তিরের গাড়িতে কোথাও চলে যাও—!

কেন বড়দা ?

কেন, চল বলছি।—কয়েক পা এগিয়ে বড়দা রক্তচক্ষে বললেন, তোমার জন্যে কাল আমাদের দুই ভাইয়েরই চাকরি যাবে তা জানো? দশ-বারোজন পুলিস এসে এতক্ষণ আমাদের বাড়ি ঘেরাও করে ছিল…তোমার ঘর তচনচ করল…আমি আপিস থেকে ফিরে অবাক! এখন বাজারে যাচ্ছি—রান্নাবান্না চড়েনি। ওরা আবার আবার আসবে তোমার জন্যে! তুমি নাকি কোন্ লাইব্রেরীতে 'স্বদেশী' বই দিয়েছ? যাও, এখন বাড়িতে ঢুকো না। আমি বলেছি সে ভুবনেশ্বরে গেছে—

বড়দা হাঁপাচ্ছিলেন। আমি পালালে তিনি বাঁচেন!

তাড়াতাড়ি আমার পকেট থেকে রবিঠাকুরের চিঠিখানা বের ক'রে বড়দার হাতে দিয়ে বললুম, এখানা তোমার দেরাজে তুলে রেখো। দামী চিঠি, সাবধান। তোমাদের কোনও ভয় নেই, বড়দা। আমি ঠিক সময়ে ফিরব।—এই বলে আমি দ্রুতপদে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটের দিকে হনহনিয়ে চললুম।

পুলিস বা গোয়েন্দারা ভাল করেই বোধ হয় জেনে এসেছে, আমি অপদার্থ। কিন্তু আনন্দমঠের বইয়ের গাদা ঘেঁটে-ঘুঁটে তারা এতক্ষণে বুঝেই নিয়েছে আমার বাসস্থান থেকে সাত-আট মাইল দূরে আনন্দমঠেরই বা আমার এত বইপত্র যায় কেন? তারা দেখতেই পাবে, অনেকগুলো নিষিদ্ধ রাজনীতিক বই, পুরনো বিপ্লবীদের ইতিহাস, নিষিদ্ধ বই 'পথের দাবী', রজনী গুপ্তর সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, বলশেভিক যুদ্ধ ও বিপ্লব, ডি ভ্যালেরার রাজনীতিক সংগ্রাম, মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসী, কাজীর লেখা দু'একখানা নিষিদ্ধ বই ও 'ধূমকেতু'র ফাইল ইত্যাদি আরও অনেক। যত ভাবছি ততই ভয় পাচ্ছিলুম।

কিন্তু ভয়েব মধ্যেও একটা ভরসা ছিল এই, রাজপুরুষেরা লেখকদেরকে গ্রাহ্য করে না এবং মানুষ বলে ধরে না। নব্যকালের লেখকদের কোনও সামাজিক পরিচয় আছে, এ তারা স্বীকার করে না। সাহিত্যের কাগজ তারা ওলটায় না। বড় বড় সরকারী কর্মচারী প্রায় সবাই উন্নাসিক। বাঙ্গলা ভাষা পড়বার সময় বা রুচি তাদের নেই। তবে হ্যাঁ, তাদের কোন-কোনও বাড়ির মেয়েমহলে নাকি এক-আধখানা বাঙ্গলা সাময়িক পত্রপত্রিকা দেখা যায়। রবি ঠাকুরের কথা উঠলে তারা ডিনারের টেবিলে বসে প্রশ্ন করে, তিনি কি মিলটন, শেক্সপীয়র, থ্যাকারে—এসব কিছু পড়েছেন? হ্যাঁ, তার অবশ্য ইংরেজি গীতাঞ্জলি একখানা আছে বুঝি। সে যাই হোক, তাদের ধারণা লেখকরা হ'ল পরগাছা। তাদের না আছে সামাজিক

মর্যাদা, না অর্থনীতিক প্রতিষ্ঠা, না কিছু। অন্য দিকে রাজনীতিক মহলেও নতুন লেখকরা কলকে পায় না। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর অনন্যসাধারণ জনপ্রিয়তার জন্য একদা দেশবন্ধুর খুবই প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন। শুনেছি সেই পরিবেশের মধ্যে খোসগল্পেরও একটা আড্ডা ছিল। সেখানে থাকতেন কিরণশঙ্কর রায়, কুমুদশঙ্কর রায়, হেমন্তকুমার সরকার এবং আরও অনেকে। সে যাই হোক, শরৎচন্দ্রের রাজনীতিক বিচক্ষণতা অপেক্ষা সাহিত্যকর্মের জনপ্রিয়তাই ছিল বেশি। তিনি ঠিক রাজনীতিক নন, আসলে তিনি ছিলেন বৈঠকী লোক।

গৌরীবেড়ের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাচ্ছিলুম। কিন্তু যাচ্ছি কোথায় আমি জানিনে। অন্ততপক্ষে তিন-চারটে রাত আমাকে কোথাও-না-কোথাও কাটিয়ে যেতে হবে, নচেৎ 'ভুবনেশ্বরে' যাবার কৈফিয়ত পাওয়া যায় না। আত্মীয়-কুটুম্বের দিক থেকে বরাহনগর, বালি-উত্তরপাড়া, বহুবাজার, গড়পার, এমন কি হাতের কাছে হাতিবাগানও আছে। কিন্তু না, ওসব ক্ষেত্রে সুখের দিনে যাব, সংকটকালে ওসব পথ মাড়াব না। ওদিক থেকে আমি একটু আত্মাভিমানী। আমি অসময়ে, দুর্দিনে, বিপাকে, বিপদে, অভাব-অভিযোগে—অদ্যাবধি আত্মীয়দের কারও সাহায্য নিইনি! সেখানে আমি সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও সরিয়ে রাখি।

অনেককাল পরে বিডনস্ট্রীটে নুটু বসাকের সেই পান-বিড়ি আর মনিহারীর দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালুম। অনেকগুলি বছর এর মধ্যে পেরিয়ে গেছে আমার জীবনের নানা ঘাত-সংঘাতের উপর দিয়ে। নুটুর সেই দোকান এখন মস্ত বড় হয়েছে। সরু গলিটা এখন শান-বাঁধানো। মুখের কাছে সেই সুস্বাদু তেলে-ভাজার দোকানটা আর দেখতে পাচ্ছিনে। সেই যুগ অনেকটা বদলিয়ে গেছে। নুটুর এই বড় দোকানের নাম হয়েছে "বসাক স্টোরস"।

মস্ত বড় দোকানে চার-পাঁচজন লোক বেনে-মশলা ও মুদি-মনোহারি সামগ্রী বেচা-কেনায় ব্যস্ত। তখন সন্ধ্যার আলো জ্বলছে। ধূপ-ধুনো দিচ্ছে গণেশ ও গৌরাঙ্গর পটের নিচে। দোকানে দেখছি অনেক খদ্দের। ইলেকট্রিকের আলোয় চোখে পড়ছে একখানা সরু বোর্ডে লেখা, 'ধার চাহিয়া লজ্জা দিবেন না'।

দোকানের ভেতরে ঢুকে দেখি, ছোট একখানা চৌকির ওপর বড় ক্যাশ বাক্স নিয়ে নুটু হিসাব মেলাতে ব্যস্ত। আমি হাসিমুখে তাকে ডাকলুম। নুটু মুখ তুলে সহসা আমাকে দেখে চট্ করে চিনতে পারল না। কিন্তু কতক্ষণ আমাকে নিরীক্ষণ করে বলে উঠল, আরে, মামাবাবু যে?

নুটু তাড়াতাড়ি চৌকি থেকে নেমে আমার পায়ের ধুলো নিল। আমি বললুম, নুটু, তোমাকে সেই রোগাটে দেখেছিলুম। এত মোটা হলে কোত্থেকে?

আপনাকেও আর চেনা যায় না, মামাবাবু।—নুটু বলল, আপনার সেই চেহারা একদম বদলে গেছে। আসুন, আসুন—বসুন—আজ কী সৌভাগ্য আমার, ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো পড়ল—

নন্টুর গায়ে খদ্দরের চাদর, গলায় বৈষ্ণবের পাঁচনরী কণ্ঠী। মনে হচ্ছে তার কারবারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেবদ্বিজের প্রতি সে অধিকতর ভক্তিমান হয়েছে!

বিয়ে-থা করেছ, নন্টু?

আজ্ঞে হ্যাঁ, মামাবাবু, মাসী ধরে বেঁধে ও-কাজটাও করিয়ে নিয়েছে! মাসীর আশীর্বাদেই তো দাঁড়িয়ে গেছি।

এবার একটু ভরসা পেয়ে বললুম, ওপরের সেই ঘরটায় মাসী তোমার আছেন ত?

নন্টু আমার মুখের দিকে তাকালো। কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, তা আপনিই বা কেমন করে জানবেন! ওরে কানাই, আমি একবারটি ওপরে যাচ্ছি মামাবাবুকে নিয়ে—এই বলে সে ক্যাশের চাবি বন্ধ করে আমাকে বলল, আসুন, দু-দণ্ড আপনাকে নিয়ে বসি। কতকাল পরে দেখা—

বহুদিন পরে আজ কেষ্টদাসীর সঙ্গে আমার দেখা হবে। কেমন করে সে আমাকে সম্ভাষণ ও আপ্যায়ন করবে, এটি ভেবে কৌতুক বোধ করছিলুম। মুখে বললুম, তোমার ভেতরবাড়ির চেহারাও যে ফিরিয়ে দিয়েছ দেখছি। একেবারে ঝকঝকে নতুন। দোতলা করলে কবে?

সবই আপনাদের আশীর্বাদে, মামাবাবু।

দোতলায় উঠে হকচকিয়ে গেলুম। সেই ছাদ, কলতলা, কেষ্টদাসীর সেই রান্নার চালা, শোবার ঘর—সব ভোজবাজীর মতন মিলিয়ে গেছে। এখন বড় বড় ঘর, বারান্দা, স্নানাগার ইত্যাদি চোখে পড়ছে। নন্টু আগে আগে গিয়ে ভিতর দিকে খবর দিল। ভেবেছিলুম আমার খবর শোনামাত্র কেষ্টদাসী দৌড়ে আসবে, কিন্তু এসে দাঁড়াল নন্টুর বউ আর বছর চারেকের একটি ছেলে। মেয়েটির দিকে চেয়ে আমি বললুম, মামা সুবাদে তুমি আমার বউমা হও! বেশ, বেশ, বড় খুশী হলুম। তোমার নামটি কি বউমা?

বউমার বয়স বছর কুড়ি-একুশ। হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিল বটে, কিন্তু ঈষৎ শ্যামবর্ণ মুখখানা কিছু অপ্রসন্ন। তার দিকে অলক্ষ্যে তাকিয়ে নন্টুই বলল, আপনার বউমার নাম সুমতি!

বেশ চমৎকার নাম। কই, দাসীদিকে দেখছিনে যে?

এবার বউমাই জবাব দিল, তিনি এখানে থাকেন না!

ও, নেই এখানে? কিন্তু তিনি তো এখানেই থাকবেন জানতুম?

নন্টু বলল, নিশ্চয়, এখানেই মাসীর থাকার কথা বইকি। সবই আমার ভাগ্য।

ও-ঘর থেকে হঠাৎ এক বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক এবার এসে দাঁড়ালেন। স্পষ্টত, নন্টুর শাশুড়ী। তিনি ঈষৎ কর্কশ কণ্ঠেই বললেন, ভাগ্য বলছ কেন, নন্টু? সতাতো বোনপোর ঘরকন্নায় অত ঝগড়াঝাঁটি, দিনরাত মন-কষাকষি—আমার মেয়ে কেনই বা অত সহ্য করবে!

নন্টু ফস করে বলল, মাসীর একলা দোষ নয়!

এবার হঠাৎ ফণা তুলল বউমা। ঝাঁঝিয়ে বলল, তুমি থামো দেখি। তোমার

আন্ধকারাতেই তো তোমার মাসীর মাথা বিগড়েছে! নতুন মানুষ এসেছে বাড়িতে, বলব নাকি সব খুলে?

শাশুড়ী বললেন, দুধকলা দিয়ে তুমি সাপ পুষেছিলে, নুটু!

উত্তেজিত হয়ে নুটু বলল, আপনি আমাদের সব কথায় থাকছেন কেন? বলো, কী খুলে বলবে বলো! মাসী ছিলেন আমার অন্নপূর্ণা, তাঁর আশীর্বাদেই আমি করে খাচ্ছি! তোমরাই তাঁকে তিষ্ঠোতে দাওনি! বুঝলেন মামাবাবু, জামাইয়ের সংসারে শাশুড়ীর আধিপত্য হলে সে-সংসারের শান্তি থাকে! আসুন, নিচে যাই—

পিছন থেকে বউমা চেঁচিয়ে উঠল, মুখ সামলে কথা বলো!

শাশুড়ী তৎক্ষণাৎ করুণ কণ্ঠে বললেন, মেয়ের মুখ চেয়েই এসব অপমান সহ্য করছি!

দোকানে ঢুকে বিক্ষুব্ধচিত্ত নুটু আবার ক্যাশে বসল। পরে বলল, আপনি কি মাসীর সঙ্গে দেখা করে যেতে চান?

হাসিমুখে আমি বললুম, এতদূরে যখন এসেছি, একবার দেখেই যাই! কতকাল তোমাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই!

ভিতর মহলের দোতলায় তখনও ঝড় চলছে। নুটু চিন্তিত কণ্ঠে বলল, আপনি যাবেন বটে, তবে শুনেছি সেটা এক বস্তির কোথায় যেন। বুঝলেন মামাবাবু, এদেরই জন্যে মাসীর মানসম্ভ্রম বাঁচলো না! ওহে বিন্দাবন, ভেতর থেকে রাসমণিকে একবার ডাকো তো?

বৃন্দাবন ভিতরে গিয়ে ওদের ঝিকে ডেকে নিয়ে এল। নুটু বলল, রাসমণি, একবারটি মামাবাবুকে নিয়ে মাসীর ওখানে যাও তো। আমি চিনিনে, নইলে আমিই যেতুম।—তারপর গলা নামিয়ে সে পুনরায় বলল, বুঝলেন মামাবাবু, মাসী যাই করুক যেখানেই থাকুক, আমি মাস-মাস তিরিশটে টাকা তাঁকে ঠিকই পাঠিয়ে দিই। ওদের গায়ের জ্বালা ওই জন্যেই!

আমি রাসমণির পিছনে পিছনে চললুম। কালোয়ারদের গদি পেরিয়ে উল্টো-ডিঙির কাছাকাছি এক বস্তিতে ঢুকলুম। পথে আলো নেই। নালা-নর্দমা পেরিয়ে এক চালাঘরের উঠোনে ঢুকে আধাবয়সী রাসমণি একটু দূরের থেকেই কেষ্টদাসীর ঘরখানা দেখিয়ে দিল।

চারিদিকের চেহারা দেখে আমি একটু অবাকই হয়েছিলুম।

রাসমণি চলে যাবার পর ওই অন্ধকারে অভাবনীয় পরিবেশের মাঝখানে মিনিট খানেকের জন্য দাঁড়ালুম। সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে আর আমার কিছু বাকি নেই। উঠোনের চারদিক তিন-চারখানা গোলপাতার চালাঘর। কিন্তু কোন ঘরই জনশূন্য নয়। আমি ওই উঠোনেই একান্তে প্রেতচ্ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে ওরই মধ্যে লক্ষ্য করলুম, দু'জন জোয়ান পুরুষ দুটো ঘরে এসে ঢুকল এবং দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কেষ্টদাসীর দরজা এতক্ষণ বন্ধ ছিল, এবার খুলল। দূর থেকে লক্ষ্য করলুম, একটি লোক নতমুখে নিরীহ প্রকৃতির মতো বেরিয়ে গেল। লক্ষ্যপথের বাইরে দাঁড়িয়ে আমি

সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলুম। আমার বিশ্বাস, নুটু এতটা জানে না। জানলে কখনোই সে আমাকে এখানে পাঠাতো না। এতক্ষণ পরে আগাগোড়া ব্যাপারটার জটিলতা আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হচ্ছিল, এবং আমি ফিরে যাবার কথাই ভাবছিলুম। পা দু'খানা আমার ভারি হয়ে উঠেছিল।

এবার আমি এক এক পা করে কেষ্টদাসীর দরজার কাছে এসে একবারটি থমকিয়ে গেলুম। তাকালুম এদিক ওদিক—কিন্তু চারিদিকই যেন ভৌতিক চেহারায় নিঃসাড়। ঘরের ভিতরের আলোটা মৃদু। কিন্তু ওই অস্পষ্ট আলোয় লক্ষ্য করলুম, কেষ্টদাসীর দরজার দিকে পেছন ফিরে বোধ হয় হিসেব মেলাচ্ছে এবং পিঠের দিকটা তার ঢাকা নয়।

আমি সাড়া দিলুম।

মুখ ফিরিয়ে কেষ্টদাসী তাকাল এবং অন্যমনস্কভাবে নবাগতর উদ্দেশে কতকটা বিরক্তির সঙ্গে বলল, ওদিকে যান, এ ঘর নয়।

বোধ হয় সে দরজাটা বন্ধ করতেই হাত বাড়িয়েছিল, কিন্তু তাকে সেই সুযোগ না দিয়ে আমি ঘরের মধ্যে ঢুকলুম এবং ওইভাবেই ওই অতি মৃদু আলোয় নিজেই ভিতর থেকে দরজাটা একটু ভেজিয়ে বললুম, আমি দাসীদি, চিনতে পারছ না?

কে?—চট করে কেষ্টদাসী ল্যাম্পের আলোটা বাড়িয়ে আমার দিকে এমন ভয়ার্ত চোখে আপাদমস্তক তাকালো যেন আমি এক ডাকাত! কিন্তু সে ক্ষণকাল মাত্র, তারপরেই এই আতঙ্কিতা ও বজ্রাহতা মোহিনী মায়া আঁচল দিয়ে নিজকে ঢাকবার চেষ্টা করে চেঁচিয়ে উঠল, রাম! তুই?

এক পলকে কেষ্টদাসী আলোটা নিবিয়ে দিল এবং সেই অন্ধকারে তাকে নড়াচড়া করতে দেখে বুঝতে পারলুম, নিজকে সে গুছিয়ে নিচ্ছে! আজ ওকে কতদিন পরে দেখছি আমার আর মনে পড়ছে না।

আবেগ এবং উত্তেজনায় মুখ ঢেকে কেষ্টদাসী কাঁদছিল। এক সময় আমি বললুম, কিছু মনে করো না দাসীদি, কান্না তোমাকে মানাচ্ছে না!

কেষ্টদাসী বলল, তুই হারিয়ে গিয়েছিলি সেই ভাল ছিল। আবার কেন সামনে এলি? কে ডেকেছিল তোকে? আমাকে কি অপমান করতে এলি?

হাসিমুখে আমি বললুম, ছিঃ দাসীদি, আমি কেন তোমাকে অপমান করব? ও কথা যদি ভাবো তা হলে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি এখনই চলে যাচ্ছি!

কেষ্টদাসী কিছু বলল না, শুধু আমার হাতখানা ছেড়ে দু'পা এগিয়ে ভেজানো দরজাটা খিল এঁটে দিয়ে আবার ফিরে এলো। তারপর চোখ-মুখ মুছে বলল, আমাকে এ অবস্থায় দেখে ঘেন্না হচ্ছে না তোর?

ঘেন্না? সে কি? ছোটবেলা থেকে তোমাকে দেখে আসছি! কখনও দেখেছ ঘেন্না করেছি তোমাকে?—আমি বললুম, তুমি যা ভাল বুঝেছ তাই করেছ, আমি কেন তোমাকে ঘেন্না করতে যাব? তুমি যদি এইভাবে জীবন কাটাতে চাও—

আমার বলবার কী আছে? অনেককাল পরে আজ আমি শুধু তোমার খোঁজ নিতে এসেছিলুম।

কেষ্টদাসী বলল, তোকে না দেখলে আমার মনেই পড়ত না যে, লোকসমাজে মুখ দেখাবার আর কিছু আছে আমার। প্রায় তিন মাস হতে চলল এই ঘরটায় আছি। এখানেও আমি স্থায়ী হয়ে থাকব না। একবার ভাসলে ভেসেই যেতে হয়, রাম!

ঘরটা ঝুপসি, কতকটা যেন শ্বাসরোধী। কেষ্টদাসী এই পরিবেশের মধ্যে এমন নোংরা জীবন যাপন করতে পারে, এ আমার পক্ষে অভাবনীয় ছিল। আমি কতক্ষণ মাথা হেঁট করে ভাবছিলুম, কেষ্টদাসীর এই পরিণামের জন্য সবাই যেন আমরা অপরাধী! কিন্তু আমার ওই ধরনের বিক্ষুব্ধ চিন্তার মধ্যেই কেষ্টদাসী এবার যেন কতকটা নিজেকে সামলিয়ে শান্ত হয়ে বসলো। সে আমার চেয়ে বয়সে বড়। ধমকিয়ে কিছু বললে আমাকে মেনেই নিতে হয়। আমার কৈশোর জীবনে তার মধুর স্নেহচ্ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকতুম।

কেষ্টদাসী বলল, এ ঘরটা অন্য এক মেয়ের। কিন্তু সে আমাকে বড় অসময়ে ঠাঁই দিয়েছিল।

আমি ওর মুখের দিকে কি জানি কেন তাকাতে পারছিলুম না। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে সে আবার বলল, প্রথম মাসটা শুধু কেঁদেই কেটে গেছে নুটুদের জন্য। ওর ওই বাচ্চা ছেলেটাকে আমি সেই আঁতুড় থেকে কোলে পিঠে নিয়ে বড় করেছিলুম। কিন্তু ছেলেটাকে ওরা একদিন কোল থেকে কেড়ে নিয়ে গেল! মনে আছে তোর, তুই একদিন বলে গিয়েছিলি, নুটুর বিয়ে দিতে চাইছ বটে, কিন্তু ভাল ঘর বেছে মেয়ে এনো। এখন দেখছি বিয়ে শুধু জুয়াখেলা! আগে থেকে কে কতটুকু জানে! বউটা ঘরে এলো, কিন্তু আমাকে প্রথম দিনেই বিষ নজরে দেখল!

এবার মুখ তুলে বললুম, তোমার চেহারাই তোমার শত্রু, দাসীদি।

তা জানিনে, হয়তো তা হতেও পারে। কেষ্টদাসী করুণ কণ্ঠে বলল, ওই বোনপো নুটুকেও ছোটর থেকে বড় করেছি, জানিস্ তো? আমাকে ছাড়া নুটুর চলত না। কিন্তু ওর শাশুড়ি যেদিন থেকে ওর নতুন দোতলায় জাঁতা হয়ে বসল, সেদিন থেকেই দুর্গতি আরম্ভ। গঙ্গায় চান করতে গিয়ে আমি বসে বসে শুধু কাঁদতুম। গোয়াবাগানে শেতলার মন্দিরে গিয়ে সারাদিন কাটিয়ে দিতুম। আমি নিরুপায়। শুধু আমার এক মাসী আছে নবদ্বীপে, কিন্তু নুটুর বাচ্চাটাকে ফেলে সেখানে যেতে মন ওঠে না। চেয়ে দেখছি আমার পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই! এ অবস্থায় নুটুর শাশুড়ী দিনরাত আমার গায়ে কাদা ছিটিয়ে যাচ্ছে। আমি নাকি নুটুকে কি যেন খাইয়ে বশীকরণ করেছি! রাম, সেই সব নোংরা কথা বছরের পর বছর ধরে সহ্য করে যাচ্ছিলুম!

আমি চুপ করে ছিলুম।

হঠাৎ দরজায় গোটা দুই টোকা পড়তেই আমি চমকিয়ে উঠলুম। কেষ্টদাসী তক্তা ছেড়ে নেমে গিয়ে কান পাতলো ভিতর থেকে। আমি আড়ষ্ট।

দরজায় আবার আওয়াজ হ'ল। চেয়ে দেখলুম, কেষ্টদাসীর মুখচোখে ভয় বা

আড়ষ্টতার একটুও চিহ্ন নেই! সে যেন জেনেই নিয়েছে তার এইপ্রকার জীবনের আনুষঙ্গিক রীতিনীতি ওইরূপই। সুতরাং সে এবার আলোটা কমিয়ে দিয়ে আবার ফিরে এল এবং দরজায় আরও দু-একবার টোকা পড়ে একসময় থেমে গেল।

সে যখন কাছে বসল তখন আমি মুখ খুললুম। বললুম, দাসীদি, তবে শোন। বিশেষ একটা কারণে আমার পক্ষে তিন-চার দিন বাইরে-বাইরে কাটানো দরকার। ভাবতে ভাবতে তোমার কথাই মনে এল। মন্দ কি, যদি তোমার আর নুটুর অতিথি হই তিন-চার দিনের জন্যে? তাই তোমাদের খোঁজখবর নিতে এসেছিলুম। কিন্তু তোমার এই পরিণাম স্বপ্নেও ভাবিনি, দাসীদি! আর—তোমার ওপর রাগ করব, সে কোন্ অধিকারে? যাই হোক, একটা কথা আমার মনে আসছে, শুনবে তুমি?

কেষ্টদাসী নতমুখে বসেছিল, এবার মুখ তুলল।

আমি বললুম, রাগ করো না, দাসীদি—তোমার মনে চিরকাল একটা অতৃপ্তি ছিল। আমার সেই অল্প বয়সেও তোমার হাবভাবে টের পেতুম। তোমার স্বামী সেই নিবারণ বোরেগী মানুষ ছিল না। তুমি তোমার সেই অসন্তুষ্ট জীবন নিয়ে শুধু তার অনাচারই সয়ে এসেছ। কিন্তু আমি কি ভাবছি জানো? কতকাল ধরে তুমি দিনের পর দিন এই জীবন যাপন করবে! এ কি চিরকাল ভাল লাগবে? বুড়ো হলে সবই ত ঘুচবে! তখন ত আখের ছিবড়ে! কেউ তোমার খোঁজ নেবে না, কোথাও ঠাঁই পাবে না! ধরো, তুমি যদি গান-বাজনা জানতে, কিছু হাতের কারিগরি কাজ শিখতে, কিম্বা ধরো কিছু লেখাপড়া—তুমি ত কোনটাই জানো না দাসীদি! শুধু একখানা দেহ? হঠাৎ যদি বসন্ত রোগ হয়, যদি তাতে তুমি বাঁচো—এই দেহের কী চেহারা হবে, সে ত ভাবতেও ভয় করে!

এ সব ভাবিনি, রাম! আমার ভাববার সময়ও ছিল না।

আমি শান্ত কণ্ঠে বললুম, কি জানো দাসীদি, অনেক মেয়ে মরে গিয়ে বাঁচে, কিন্তু বেঁচে থেকে প্রতিদিনের মৃত্যু—সে ভয়ঙ্কর!

অন্ধকারে কেষ্টদাসী তক্তাখানার এ কোণে মুখ গুঁজে আবার বোধ হয় কাঁদছিল। সে নিরুপায়, এ আমি গত ষোল বছর থেকে তাকে দেখে আসছি। আজ রাত্রে তার এই কান্না দেখে মনে হচ্ছিল, ঝড়ের ঝাপটায় বিপর্যস্ত এক ভীরু পাখি যেন সকল আকাশপথ পরিক্রমা করে কোনও এব বৃক্ষনীড়ে নিরাপদ একটি কোটর খুঁজছে!

এক সময় সে ভাবাবেগে ফুলে উঠল—তুই বিশ্বাস কর রাম, আমি বেশ্যা নই! আমাকে কোন দিক থেকে কেউ বাঁচতে দিচ্ছে না, আমি তাই—

সে আর বলতে পারল না, ফুঁপিয়ে উঠল। একটু থেমে বলল, এ ঘর আমার নয়, অন্য মেয়ের। আমি কেবল খরচের টাকা দিই—তাও ওই নুটু পাঠিয়ে দেয় রাসমণির হাত দিয়ে। আমি যদি এখান থেকে চলে যাই, পাশের ঘরের মেয়েগুলো খুশী হয়! আমার জন্যে ওদের নাকি ক্ষতি হচ্ছে!

আমি বললুম, কোথাও যাবার সুবিধে আছে তোমার? বেশ ত চল না কেন নবদ্বীপে তোমার মাসীমার কাছে? আছেন তিনি সেখানে?

কেষ্টদাসী বলল, হ্যাঁ, এখনও আছেন। কিন্তু আমি কোন্ মুখে গিয়ে দাঁড়াব তার কাছে?

কেন?—আমি বললুম, তুমি পাঁচজনের অন্যায়ে মুখ থুবড়ে পড়েছ, এই ত? এবার যদি নিজের শক্তিতে মাটির ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াও, কে রোখে তোমাকে? তুমি নিজের জীবনের সব জঞ্জাল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে যদি আবার নতুন ক'রে মাথা তোল, তবে বাধা দিচ্ছে কে? তুমিই তোমার পথ কেটে চলবে, দাসীদি।

আমি নিজেও ভাবাপ্লুত হচ্ছিলুম। কেষ্টদাসীর চোখের জল, আকুলতা, তার জীবনের নিত্য গ্লানি আর দ্বন্দ্ব—সব মিলিয়ে এই মধ্যরাত্রে যেন গোলপাতার ঘরখানা রুদ্ধকণ্ঠ হয়ে উঠেছিল!

একসময় হঠাৎ মাথা তুলে গলা পরিষ্কার করে কেষ্টদাসী বলল, যদি আমি নবদ্বীপে যাই, তুই নিয়ে যাবি আমাকে?

যাব, নিশ্চয় যাব। তুমি এই নরক থেকে শুধু মুক্তি নাও, দাসীদি।

কিন্তু মাসীমা যদি জানতে চান তোর পরিচয়?

এবার আমি হাসলুম—তুমি কিচ্ছু ভেবো না। তার জবাব আমিই দেবো। আমি না হয় নবদ্বীপে থেকেও যাব দু-একদিন।

মনে হল কেষ্টদাসী অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত হয়ে চুপ করে গেল।

* * *

শেষ রাত্রের ঠাণ্ডায় দু'জনে বেরিয়ে পড়েছিলুম। কেষ্টদাসী সঙ্গে নিল শুধু একটা গামছা বাঁধা পুঁটলি। ওকে সঙ্গে নিয়ে সকালের গাড়িতে কেষ্টনগর যাব। সেখান থেকে আবার ট্রেনে স্বরূপগঞ্জের ঘাট। তারপর গঙ্গা পেরোলেই নবদ্বীপ। ওসব আমার চেনা পথ।

পথে পথে তখনও আলো জ্বলছে।

গৌরীবেড়ের মোড়ে এসে এক ঘুমন্ত রিক্সাওলাকে ডেকে তুলে দু'জনে তার গাড়িতে উঠলুম। আমরা সকলের আগে আহিরিটোলার ঘাটে গঙ্গাস্নান সেরে নিতে চাই।

কেষ্টদাসীকে আমি বোঝাতে বোঝাতে যাচ্ছিলুম—তুমি চিরকাল এক ভক্তিমতী মেয়ে। তোমার পুজো-আর্চা, স্তবপাঠ, ঠাকুর-সেবা—কতদিন ধরে দেখে এসেছি। সেই হ'ল তোমার আসল পথ, দাসীদি। তুমি দেখে নিয়ো, ওই পথেই তুমি একদিন মনের মানুষ খুঁজে পাবে। সেইদিন তুমি আবার তোমার সিঁথিতে সিঁদুর তুলে নিয়ো!

কেষ্টদাসী প্রসন্ন মুখে আমার প্রস্তাবে সম্মতি জানাচ্ছিল।

॥ ৪৪ ॥

রবীন্দ্রনাথের অনুমতিপত্র পেয়ে তাঁর সঙ্গে যেদিন প্রথম দেখা করতে যাচ্ছিলুম—সেই দিনটি আমার জীবনের পক্ষে একটি লাল তারিখ! যাবার আগে কত ভয়-ভাবনা আনন্দ সঙ্কোচ উদ্দীপনা—সবগুলো একই সঙ্গে যেন মনের ভিতরে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছিল! অল্পবয়স্কা নবোঢ়া মেয়ের মনের চেহারা কবির ভাষায় যেমন "প্রথম প্রণয়-ভয়ভীতা—।" আমার সেই অবস্থা দেখা দিয়েছিল!

তব্ যাচ্ছিল্ম জড়িত পদক্ষেপে।

তখনকার জোড়াসাঁকো বলতে অনেক ধনাঢ্য গোষ্ঠীকে বোঝাতো। যেমন ছিল জোড়াসাঁকোর রাজবাড়ি, শীল ও মল্লিকদের বহ্ পরিবার, নতুন বাজারের গায়ে টেগোর কাস্ল্, এপাশে ডি গ্প্ত, আরেকটু এগোলে রমানাথ ঠাকুর আর পাথ্রেঘাটার জমিদারব্রা, ওপাড়ার এদিকে কোম্পানি বাগানের (অধ্না রবীন্দ্র কানন) এপাশে-ওপাশে রামবাগানের দত্তরা, চাষা-ধোবা পাড়ার গায়ে চোর বাগানের মিত্তিররা, ওদিকে সেই হাটখোলার দত্তরা—এমনি আরও অনেক। এই প্রায় দ্ই বর্গমাইলের মধ্যে এই অঞ্চল প্রাচীন কলকাতার বহ্ ক্রোড়পতির অগণিত সংখ্যক অট্টালিকা ও প্রাসাদে পরিপ্র্ণ ছিল। প্রকৃতপক্ষে মধ্যোত্তর কলকাতা ছিল আদি সভ্যতা ও সাংস্কৃতির নাভিকেন্দ্র। অন্য দিকে দেখা যায় এই স্ব্হৎ অঞ্চল সর্বাপেক্ষা নোংরা, ঘিঞ্জি, জনবহ্ল, ঘন বিপণিবেসাতিপ্র্ণ এবং সর্বপ্রকার যান বাহনে হাটে-বাজারে দিবারাত্র পরিকীর্ণ। আবার যতগ্লি অঞ্চলের নাম করল্ম এদেরকে চারিদিক থেকে ঘিরে থাকত অগণিত সংখ্যক বারবনিতালয়। ওরা চিরকাল ধনী সমাজের দ্বারা প্ষ্টিলাভ করে এসেছে। আদি কলকাতার কাহিনীর মধ্যে দেখি বড় বড় দেবস্থান, দান-খয়রাতের বড় বড় কেন্দ্র, মস্ত এক-একটি জনকল্যাণের প্রতিষ্ঠান, আবার তাদেরই আশেপাশে অভিজাতশ্রেণীর বারবনিতাদের বসবাসের স্ব্যবস্থা—যেগ্লি বহ্ বিত্তশালীর অবদান! সে যাই হোক, এই স্ব্হৎ একটি জনসমাজের মধ্যস্থলকে চিরে স্দ্র উত্তর থেকে দক্ষিণে লালবাজার পর্যন্ত যে অপ্রশস্ত ও দ্র্গত রাজপথটি চলেছে, তার নাম চিৎপ্র রোড। সমগ্র কলকাতার মধ্যে এটি সর্বাপেক্ষা অনধিগম্য পথ!

স্থানীয় অধিবাসী যারা তারা জানে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি মানে প্রানো আমলের বড় জমিদার বাড়ি। ওই বিশেষ ব্হৎ অট্টালিকাগ্লি যে জগৎপ্রসিদ্ধ কবি শিল্পী দার্শনিক ধর্মপ্রচারক সমাজ-সংস্কারক শিক্ষাবিদ প্রভৃতির একটা বড় পীঠস্থান—এ সম্বন্ধে তাদের উদ্বেগ ও ঔৎস্ক্য কম। বাঙ্গলা ও ভারতের বহ্ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও-বাড়িতে আসে যায়, প্থিবীর বহ্ দেশের বহ্ মনীষী ওখানে যখন-তখন আনাগোনা করে—কিন্তু স্থানীয় সাধারণের ধারণা, ওটা জমিদার বাড়ি ছাড়া অন্য বিশেষ কিছ্ নয়। কারণ সেই বিশেষ অন্য পরিচয় তাদের কাছে পেঁছয় না। ওই বাড়ি থেকে সেই প্রথম স্বদেশী য্গে রবীন্দ্রনাথ পায়ে হেঁটে যখন কলকাতার নানা অঞ্চলে যেতেন তখনকার দিনের কথা ভাবতেও অবাক লাগে। তাঁর মনের অবস্থা কির্প দাঁড়াত, সেটি হয়ত প্রকাশ পেয়েছে তাঁর 'বাঁশি' কবিতার সেই 'কিন্ গোয়ালার গলিতে'।—"গলিটার কোণে কোণে জমে ওঠে পচে ওঠে আমার খোসা ও আঁঠি, কাঁঠালের ভ্তি, মাছের কানকা, মরা বেড়ালের ছানা—ছাইপাঁশ আরো কত কী যে।"

আমি আসছিল্ম বেলগাছিয়ার দিক থেকে ধর্মতলার ট্রামে। নামব ঠিকই সেই

কিন্তু গোয়ালার গলির মুখে। আমি যাচ্ছি ঠাকুর-দর্শনে। যাচ্ছি তীর্থমন্দিরে। আমি সদ্যস্নাত।

কিন্তু সমস্ত পথটা নিজেকে শাসাতে শাসাতে আসছিলুম। খবরদার, এলিয়ে গদগদ হসনে যেন। চাটুবাক্য একটিও না। হাত কচলাবিনে। প্রসাদভিক্ষু হতে চাসনে—খবরদার। যদি তুই লুলিত কুণ্ঠিত বা সংকুচিত হয়ে কুঁকড়িয়ে থাকিস তবে মরেছিস। যাঁকে দর্শন করতে যাচ্ছিস তিনি কেবল কবি-সম্রাটই নন, তিনি বিষয়ী, বস্তুতান্ত্রিক, বাস্তববাদী, পুরনো জমিদার, বিরাট একটি প্রতিষ্ঠানের স্রষ্টা, পৃথিবী-জোড়া তাঁর অনুরক্তের সংখ্যা, গান্ধীজী তাঁকে বলেন গুরুদেব! তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির দ্বারা তোর মতন আধ পয়সার লেখককে চিনে নিতে তাঁর আধ মিনিটও সময় লাগবে না। মনে রাখিস আজ তুই গিয়ে প্রথম ঢুকছিস উজ্জীবন্ত এক পশুরাজ কেশরীর গুহায়। খুব সাবধান।

সোজা গলির ভিতর দিয়ে এসে বড় উঠান পেরিয়ে বাঁ-হাতি বেঁকে ছোট সিঁড়িটি ধরলুম। কেউ কোথাও নেই, নিষেধ করছে না কেউ, চারিদিক জনবিরল। কবির দ্বিতীয় চিঠি আমার সঙ্গেই আছে। তিনি লিখেছেন, বাধা পেলেও চলে এসো। আমি উপরে উঠে এলুম। কিন্তু এই অট্টালিকার হাওয়ায় মহাকবির সুগন্ধ ছড়ানো ছিল। সুতরাং মৌমাছি ঠিকই জানে ফুলটি কোথায় ফুটে রয়েছে। একসময় করিডর পেরিয়ে নগ্নপদে যে ছোট ঘরটির দরজায় এসে দাঁড়ালুম, দেখি সেই ঘরে কবি একটি ডেকচেয়ারে বসে কাছেই খোলা জানলার বাইরে আলোকোজ্জ্বল অনন্ত নীলিমার দিকে চোখ মেলে রয়েছেন—যেন দুটি কালো বিরাগী ভ্রমর নিভৃত নীল পদ্ম লাগি সাম্প্রতের সকল আবরণ ছিন্ন করে শূন্যের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

আমার পদসঞ্চার ছিল লঘু ও নিঃশব্দ। আগে থেকে আমার ভাবা ছিল, যদি দেখি তিনি ধ্যানস্তিমিতনেত্র, আমি ফিরে আসব। কিন্তু মানুষের সঞ্চার ঘটলে বায়ুতরঙ্গে তার কম্পন আসে। কবি আমার দিকে চোখ ফেরালেন। শান্ত দুই চোখ যেন দুটি পদ্মকোরক! আমি দু'পা এগিয়ে হাসিমুখে দুই হাত ওঁর দুই পায়ে বুলিয়ে মাথায় ঠেকালুম। ওরই মধ্যে দেখে নিলুম নধর পা দু'খানি টকটকে ফর্সা, পায়ের গোছ মোটা ও নিটোল, সুন্দর নখগুলি অনেকটা যেন গঙ্গাবর্ণ। কার কাছে কবে যেন শুনেছিলুম, ডাঃ রাম অধিকারী মহাশয় ওঁর দুই পায়ে মোলায়েমভাবে হাত বুলিয়ে কবির কাছে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালুম। কিন্তু ওইটুকুর মধ্যেই আবার দেখে নিলুম কবির পক্ক কেশরাশি বাবরির মতো পিছন দিকে ওলটানো, দুই পাশে চুলের ঝালর নেমেছে। এখন ওঁর তিয়াত্তর বছর বয়স। পরনে খদ্দরের লম্বা গৈরিক জোব্বা। হাতের আঙুলগুলো বড় বড়—কনক চাঁপার মতো মোটা থেকে সরু হয়ে এসেছে।

বসো। কবির কণ্ঠস্বরে যেন যোগতন্দ্রাভঙ্গের আভাস পেলুম।

আমি একটি নিচু চৌকিতে বসলুম, যেখানে বসলে ওঁর মাথাটি উঁচুতে দেখা যায়। কবি প্রথম প্রশ্ন করলেন, তোমার বয়স কত?

গলাটা পরিষ্কার করে বললুম, আটাশ বছর !

কবির চোখে-মুখে যেন অস্পষ্ট কৌতুকের আভা খেলে গেল। আমি একটু নার্ভাস বোধ করলুম। উনি মধুর মৃদু কণ্ঠে পুনরায় প্রশ্ন করলেন, তুমি কি সন্ন্যাস নেবার জন্য গৈরিক বসন ধরেছিলে ?

তৎক্ষণাৎ বললুম, আজ্ঞে না, ওটা শখের গেরুয়া ছিল। পাহাড়-পর্বতে গেরুয়া ময়লা হলে ঠিক বোঝা যায় না। বরং একটু খাতিরও জোটে।

কবি নিজের মুখখানায় হাত বুলিয়ে বললেন, তোমার দুঃসাহস ত কম নয় !

দুঃসাহস ! মুহূর্তের মধ্যে ভয়ে আমার পেট-ব্যথা করে উঠল !

কবি বললেন, তুমি নিজের জীবনকথা লিখেছ, এদেশে এটি দুঃসাহসের কথা বইকি। তোমার বইটির শেষ দিকে "রানী" মেয়েটি কে ? ওর পরিচয়টি কিরূপ ?

এবার আমি জোর পেয়ে শ্রীমতী সাবিত্রীর পারিবারিক পরিচয় আগাগোড়া বলে গেলুম। ওই সঙ্গেই ধরিয়ে দিলুম, তিনি আপনার কাব্যের বিশেষ অনুরাগিণী। তাঁর কথা আমি অকপটেই বলেছি।

প্রসঙ্গত বলি, কবির এই অতি মূল্যবান কৌতুহলটুকু আমি আমার ভ্রমণকাহিনী গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় উল্লেখ করেছিলুম।

এবার কবি বললেন, নিজের জীবনের সত্য ঘটনাকে প্রকাশ করার মধ্যে কিছু দুঃসাহস থাকে। সে তোমার আছে।

আমার জবাব মুখে-মুখেই ছিল। বললুম, বইটি লেখার সময় আমার মনেই হয়নি, আমি সাহসের পরিচয় দিচ্ছি। সহজেই আমি লিখেছি।

বোধ হয় আমার সম্বন্ধে কবির সামান্য ঔৎসুক্য ছিল। সেই কারণে তাঁর এক-একটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছিলুম। সেগুলি ব্যক্তিগত।

কবির সঙ্গে এই আমার প্রথম মুখোমুখি, মাত্র হাত তিনেকের ব্যবধান। সেজন্য আমার প্রচুর আড়ষ্টতা, হৃৎকম্পন, বেফাঁস কিছু বলে ফেলার ভয়, কথায়-কথায় থতিয়ে যাওয়া—এগুলির আশঙ্কা ছিল মনে।

কবি একসময় বললেন, তুমি হাঁটতে জানো। হাঁটতে হাঁটতেই তুমি জীবনকে দেখতে পাও। তোমার মন চলমান। বন্ধ জলায় তুমি বাঁধা থাকতে চাও না।

তাঁর প্রত্যেকটি উক্তি যেন আমার পক্ষে রোমাঞ্চ শিহরণের মতো। কিন্তু এইটুকুর মধ্যেই আমার একটু সাহস বেড়েছিল। মুখ ফুটে একসময় বললুম, আপনার নিজের বিরাট জীবন সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছে ! কিন্তু আপনার হাত দিয়ে আপনার মন দিয়ে সেই পৃথিবীকে আমরা ত দেখিনি ! তবে কি 'জীবন স্মৃতি' বইটি নিয়েই আমরা চুপ করে যাব ?

কবি তাঁর শ্বেতশ্মশ্রুতে একবার হাত বুলোলেন। তাঁর দুই কপোলে কি আমি চকিত হাসির আভা দেখলুম ? না, এখন আর আমার মনে নেই। উনি বললেন,

ও বইখানা বিশেষ কালের বিশেষ কয়েক ব্যক্তির ছবি। তুমি ঠিক ধরেছো। ওটা আমার আত্মজীবনী নয়।

কবিসন্দর্শনে আসবার আগে স্থির করে এসেছিলুম, এই বিশাল বিশ্বজোড়া ব্যক্তিত্বকে পনেরো মিনিটের বেশি আমি আটকিয়ে রাখব না। তবু ওরই মধ্যে একবারটি বললুম, তবে কি 'রবীন্দ্রজীবনী'ই আপনার জীবন? ওর বাইরে কিছু কি নেই?

এই প্রশ্নটিতে কবি যে এমন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবেন, এটি তখন ঠিক বুঝতে পারিনি। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন, 'পড়ো না, ও বই তুমি পড়ো না। ওতে জীবন নেই, আছে বিবরণ। আমি প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র, এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র, আর এখানে-ওখানে কিছু হাততালি পাবার খবর,—এই কি আমার পরিচয়?...না, ও বই পড়ো না!'

'যদি আর অন্তত পঞ্চাশ বছর বাঁচি'—কবি বলে যাচ্ছিলেন—'তা'হলে নিজের হাতে নিজের জীবনী লিখে রেখে যাব! তুমি ছাড়া তোমার জীবনকথা অন্যে কেমন করে জানবে? জীবনের কোন্ অংশ তোমার বিচারে শ্রেষ্ঠ, কত দুর্লভ মুহূর্তের ভাবাবেগ, কত ঘটনার ব্যঞ্জনা তোমার হৃদয়ে দ্বন্দ্বের।দোলা আনে, তোমার সত্তার মূল ধরে টানে কত উপলব্ধি,—তুমি ছাড়া এ সংবাদ অন্য কে জানবে?'

স্তব্ধ বিস্ময়ে ওঁর সুন্দর মুখশ্রীর দিকে চেয়ে সেদিন আমি আত্মজীবনী রচনার স্বপ্ন দেখেছিলুম!

মহাকবি বলে যাচ্ছিলেন যেন "ফোয়ারার রন্ধ্র হতে উন্মুখর ঊর্ধ্বস্রোতে—"। তিনি বলছিলেন, 'কাব্যে যেমন—তার জন্মের মূলে বেদনাবোধ, সেইখান থেকে তার উৎপত্তি। জীবন প্রস্ফুটিত হচ্ছে শুধু শুষ্ক ঘটনায় নয়। তার প্রকাশের পিছনে লুকিয়ে থাকে আঘাত, আনন্দ, অপমান, সংঘাত—দুঃখ বেদনা উল্লাস—সব নিয়েই জীবন। সে তার পাওনা পায় ঝড়ে তুফানে, ভূমিকম্পে, বিপর্যয়ে—সে-জীবন থেকে অশ্রু ঝরে, রক্তমোক্ষণ ঘটে। তোমাকে ভাগ্যবান বলব তুমি যদি সেই রণক্ষেত্র দেখে থাকো, সেই দ্বন্দ্ব সংগ্রাম তার দুঃসহ পীড়নের চিহ্ন যদি তোমার মধ্যে রেখে যায়!—কবির কণ্ঠস্বর যেন অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিল।

কথাপ্রসঙ্গে কবিকে জানালুম, আপনার কাব্য, আর সাহিত্য নিয়ে আমরা ক'জন কাশীতে বসে প্রায়ই চর্চা করি। অহল্যাবাঈ ঘাটের শেষ বুরুজটির ওপর আমাদের মজলিস বসে সন্ধ্যাবেলায়। আমাদের মধ্য-মণি হলেন সুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়। আপনার কাব্য ও সাহিত্যের এত বড় গুণগ্রাহী বাঙ্গলায় কোথাও দেখিনে!

কবি প্রসন্নমুখে বললেন, তাঁর কথা আমি শুনেছি।

সেদিন ওঁর মুখের বিভিন্ন আলাপ শুনতে শুনতে যখন আমার ভিতরের এপার-ওপার আনন্দের জোয়ারে স্ফীত হয়ে উঠেছে, তখন একসময় উনি বললেন, তুমি শান্তিনিকেতনে চল, তোমার ভাল লাগবে।

ওই আমন্ত্রণ পেয়ে সেদিন আমার সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হর্ষ দেখা দিয়েছিল। কবির

অতিথি হবো এবং তাঁর বাণী শুনব কাছে বসে,—সুতরাং এই আমন্ত্রণ সেদিন যেন আমাকে সর্বোচ্চ গৌরব এনে দিয়েছিল! ওঁর কাছে ওঁর কবিতা আমি আবৃত্তি করে শোনাবার সুযোগ পাবো, এ আমার দুর্লভ সৌভাগ্য।

এমন সময় হঠাৎ বাইরের থেকে কণ্ঠস্বর এলো—কাকা?

বলতে বলতে এসে ঢুকলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। বললেন, কাকা, এখনই কাগজে দেখলুম, হায়দরাবাদের নিজাম তোমার জন্য এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন—!

কবি রক্তিম উদ্দীপ্ত মুখে একবারটি আমাকে লক্ষ্য করলেন। বুঝলুম, আমি নিতান্ত অপয়া নই! উনি তখনই ভ্রাতুষ্পুত্রের দিকে চেয়ে বললেন, ভাল করেছেন নিজাম, এটি সুসংবাদ।

কবি উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন, এসো—

অবনীন্দ্রনাথকে পিছনে রেখে কবি এগিয়ে চললেন। আমি তাঁর পিছু পিছু যেন ক্ষুদ্র এক মানবক নিচে নেমে এলুম। ওঁর জন্য সামনেই মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে। মোটরের কাছেই অপেক্ষা করছিলেন একটি সুশ্রী ও কৃষ্ণবরণা তরুণী, তাঁর নাম অমিতা সেন। ডাকনাম খুকু। কবি গাড়িতে উঠে আমার জন্য জায়গা রেখে বাঁদিকে সরে বসলেন। খুকু হাত বাড়িয়ে কবির পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন, আপনি ভাববেন না, আমি দু'একদিনের মধ্যে যাচ্ছি।

সেই নাটকীয় মুহূর্ত আমার পক্ষে অবিস্মরণীয়। কবি নিঃসঙ্গ যাচ্ছেন শান্তিনিকেতনে। আমি সঙ্গে থাকলে আলাপচারীর সুবিধা। কিন্তু সেদিন এই হতভাগ্য লেখকের পকেটে ছিল আনা আষ্টেক-দশ পয়সা মাত্র। আমার ঘাড়ে ভূত চাপলো। বললুম, আপনি গিয়ে সুস্থ হয়ে বসুন, আমি শিগগির গিয়ে আবার আপনার পায়ের ধুলো নেবো।

কবি প্রসন্ন মুখে সম্মতি জানালেন। তাঁর গাড়ি বেরিয়ে গেল।

শ্রীমতী অমিতা সেনের রবীন্দ্র সংগীত তৎকালে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। এই অনন্য গায়িকার অকাল মৃত্যু ঘটে তাঁর গৌরবের কালে।

যাই হোক কবির সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারের বহু মূল্যবান বিবরণটি মোটামুটিভাবে তৎকালে 'শ্রীহর্ষ" নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের এক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তার ফলে সর্বজনপ্রিয় রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছুটে গিয়েছিলেন মহাকবির কাছে—আপনি কখন কোন্ মেজাজে কাকে কী বলেছেন তাই ছাপা হয়ে গেল কাগজে! আমার সব পরিশ্রম পণ্ড হতে বসল!

প্রভাতবাবুকে কবি কি প্রকার সান্ত্বনা দিয়েছিলেন আমার জানার কথা নয়। তবে 'রবীন্দ্রজীবনী'র প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় প্রথমেই "জনৈক তরুণ লেখক"— এইভাবে প্রভাতবাবু সেই সাক্ষাৎকারটির উল্লেখ করে রেখেছেন।

এই সূত্রেই বলি, পরবর্তীকালে মহাকবির কাছে আনাগোনায় আমার সব আড়ষ্টতা ঘুচে গিয়েছিল। সেগুলি আমার নানা সময়ের লেখায় সবিস্তারে বর্ণনা করেছি।

কবির সঙ্গে আলাপচারীর কথা নিয়ে যখন বন্ধুবর সুধীন্দ্র নিয়োগীর সঙ্গে তোলাপাড়া করছিলুম তখন একদিন বিকালে হঠাৎ সাধনা এসে হাজির। বিনা নোটিশে বিনা কারণে—এ যেন হঠাৎ আলোর ঝলকানি! কিন্তু আমাদের সেদিন ওঠবার সময় হয়েছিল। সুধীন্দ্র যাচ্ছে ট্যুইশনিতে, আমার যাবার কথা কলেজ স্ট্রীটের দিকে।

নমস্কার বিনিময়ের পর সাধনা মুখোমুখি বসল। কিন্তু সুধীন্দ্র নিয়ম-বাঁধা লোক। তার এ বাড়ির সবাই গেছেন বিয়েবাড়িতে। সে ট্যুইশনি সেরে ফিরে এসে নিমন্ত্রণে যাবে। বেরোবার সময় সে বলে গেল, চাকরটা রইল, যদি চা খেতে ইচ্ছে হয় ওকে বলবেন।

সুধীন চলে যাবার পর আমি বললুম, তোমাদের কাজকর্মে একটু ভাঁটা পড়েছে দেখতে পাচ্ছি। আমি ভাবছিলুম তুমি দেশে ফিরে গেছ!

দেশে! সাধনা বলল, দেশে এখন ফিরব না, মহারাজ। আমি যে পালিয়ে এসেছিলুম একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে! গান্ধীজীর জীবনী পড়োনি? কেন তিনি শবরমতী আশ্রম ছেড়ে এসেছিলেন?

আচ্ছা, সাধনা—আমি বললুম, তোমার চলতি নামটি বদলিয়ে এই নামটি নিলে কেন?

সাধনা বলল, আমাদের গ্রামে এই নামেই সবাই আমাকে জানে। তা ছাড়া আমি নিজের মধ্যেই যেন এ নামটা খুঁজে পাই।

প্রসঙ্গত বলি, আমার 'জলকল্লোল' গ্রন্থে সাধনাকে 'সাধু'—এই নামে উল্লেখ করেছি। সাধনার মধ্যে আমি একটি দুর্লভ সাধুতা সততা ও চরিত্রবত্তা দেখেছিলুম। ওর স্বভাব-স্বাতন্ত্র্য ওকে সকলের থেকে যেন পৃথক করে রেখেছিল। সাধনা মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে জানে। একসময়ে আমি বললুম, তোমার জীবনধর্মই তোমার বিপ্লবধর্ম। আচ্ছা একটা কথা ঠিক করে বলো ত? প্রতিজ্ঞার কথা বলছ! তোমার চোদ্দ বছর বয়সে এমন কোন্ প্রতিজ্ঞা তোমাকে পেয়ে বসেছিল?

সাধনা নত মুখে কতক্ষণ চুপ করে রইল। পরে মুখ তুলে একটু হেসে বলল, এর জবাব সুভাষবাবু দিতে পারেন।

সুভাষবাবু? তাঁর সঙ্গে তোমার যোগ কিসের?

তিনি আমার প্রথম মন্ত্রগুরু।—সাধনা বলল, উনি গিয়েছিলেন আমাদের দেশে কেশবগঞ্জের হাটে বক্তৃতা করতে। ওঁর কথার ফিনকি আমার মনে আগুন ধরিয়ে দেয়। সেই সাংঘাতিক আগুনে আমি যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলুম। উনি ছিলেন স্টীমারে। আমি সেই স্টীমারে উঠে ওঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। আমার মাথায় হাত রেখে সুভাষবাবু বললেন, তুমি ত এখন খুব ছোট! আরেকটু বড় হয়ে কলকাতায় গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো। তোমায় কিছু কাজ দিতে পারব।

মহারাজ, সেদিন যেন আমার প্রথম জন্ম ঘটল! অত লোক স্টীমারে, চারদিকে হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু সকলের মধ্যে আমি একা! একা আমি আর আমার জীবনবিধাতা—দুই মুখোমুখি।

তারপর?

সাধনা হাসতে হাসতেই বলল, শুধু আমাকে পেয়ে বসল তাঁর ওই কথাটা—আমি ছোট! কিন্তু কতখানি ছোট? কার চেয়ে ছোট? কে আমার চেয়ে বড়? চোদ্দ বছরে আমার দিদির বিয়ে হয়নি? ছোট খুড়ীর বাচ্চা হয়নি চোদ্দ বছরে? মহারাজ, সেই রাত্তিরেই আমি ছোট একটা পুঁটলি সঙ্গে নিয়ে পালালুম গ্রাম ছেড়ে চুপি চুপি। কেন চাইব পেছন দিকে? না, আমার পথ সোজা! স্বাধীনতার যুদ্ধে আমি ঝাঁপ দেবো। পৃথিবী আমাকে ডাকছে, ডাকছে যেন একটা নতুন জীবন। নৌকার মাঝি ছিল আমাদের চেনা। সে আমাকে নৌকায় তুলে নিল। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল তখন নদী পার হলুম। মহারাজ, পথে নামলে তবেই ত পথ চিনবে! আমি নতুন পথ আবিষ্কার করতে করতে যাচ্ছি! কে যেন সব দেখিয়ে দিচেছ! কে যেন সঙ্গে সঙ্গে যাচেছ পথ চিনিয়ে! বোধ হয় ঘণ্টা দুই অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে রেল স্টেশনে এলুম। সেই প্রথম দেখলুম রেল স্টেশন। গাড়ি এলো অনেক রাত্তিরে। লুকিয়ে উঠলুম সেই গাড়িতে।

আমি চুপ করে সাধনার দিকে চেয়ে ছিলুম—তারপর?

সকালে নামলুম শিয়ালদায়—বলতে বলতে হঠাৎ হেসে উঠল সাধনা—এবার কিন্তু আমাকে চোর-ছ্যাঁচড় বলো না, মহারাজ। মেয়েই হোক আর ছেলেই হোক, যদি বাঁচা-মরার সঙ্কট দেখা দেয়—সে বোকা হলেও তার বুদ্ধি খোলে! প্রথম এসেছি কলকাতায়,—আমি যেন চারদিকে হারিয়ে যাচ্ছিলুম। টিকিট চাইল, আমি কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললুম, সেজমামাকে খুঁজছি, দেখতে পাচ্ছিনে! ওটাই হ'ল প্রথম কিস্তি, ওতেই মাত। তখন পুঁটলি সঙ্গে নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরছি। ক্ষিধেয় পেট জ্বলছে। স্টেশন থেকে বেরোতে সাহস নেই। অনেকক্ষণ সন্ধান করে প্লাটফরমেই পেয়ে গেলুম এক ইংরেজি হোটেল 'কেলনার'। তখন একটু সাহস বেড়েছে। ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞেস-পড়া করে স্নানের জায়গা দেখলুম। মহারাজ, কল ঘোরালে জল পড়ে, বোতাম টিপলে আলো জ্বলে,—এ কি আগে দেখেছি? ওই হোটেলে সেই প্রথম দেখলুম পাঁউরুটি!

আমি খুব হাসছিলুম। 'অ্যালিস ইন ওয়ানডারল্যাণ্ড!'

শোনো মহারাজ, হেসো না। ওরা আনল ব্রেকফাস্ট, সেই প্রথম দেখলুম পাঁচ আঙুলের মতন কাঁটা আর চামচে। দুধ, কর্নফ্লেক, চিনি, দুটো ডিম ভাজা, দু'চাকলা রুটি আর মাখন,—দু মিনিটে শেষ। আমরা যে মাছ ভাত খাই,—সে সব কই? সাহেবটা উঠে এসে বলল, আর কিছু চাই?—শোন কথা! আমি বললুম, মাছের ঝোল ভাত কই? নেই ওসব?

তখন বেশ বেলা হয়েছে। প্রায় আধঘণ্টা আমাকে বসিয়ে রাখলো সাহেবটা।

তারপর এলো গরম ভাত, ডাল, তিন-চারখানা মাছের দাগা দিয়ে ঝোল, চাট্‌নি দই— এই সব। সাহেবটা দূরে থেকে আমার খাওয়া দেখছিল।

ঘণ্টা তিনেক ছিলুম স্টেশনে। একটা লোককে প্রায়ই দেখছিলুম আমাকে ফিরে ফিরে দেখে যাচ্ছে। উঁকি মারছে দরজার কাছে। খুব হাসি-হাসি মুখ। আঁচিয়ে এসে লোকটাকে ডাকলুম। তক্ষুনি লোকটা কাছে এল,—যেন বড়ই বাধ্য! আমি বললুম, দেখুন, কলকাতায় প্রথম এসেছি, কিছু চিনিনে। সুভাষ বসুর বাড়িটা আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন?

পারিনে? একশ বার পারি। অমন ডাকসাইটে লোক, কে না চেনে ওঁর বাড়ি? —লোকটা বলল, এই যে হোটেলের বিল্‌টা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই দিচ্ছি। আড়াইটে টাকা বই ত নয়! তুমি কিচ্ছু ভেবো না খুকু।

মহারাজ, এখন ভাবতে লজ্জা করে। পরনে আমার খাটো একখানা ধুতি, খালি পা, এলোমেলো মাথার চুল। লোকটা মাঝপথেই আমাকে একজোড়া চটি কিনে দিল। কিন্তু এ চেহারায় কি যাওয়া যায় সুভাষ বসুর কাছে? লোকটা বলল, এ আর এমন কি? সব আছে হাতের কাছে। এ যে কলকাতা! আজব দেশ। শাড়ি, জামা, গয়না,—শুধু হুকুমের অপেক্ষা, বুঝলে খুকু? এসো, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

লোকটা একবর্ণও মিথ্যে বলেনি, মহারাজ। ট্রাম রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে এক গলিতে যে বাড়ির দোতলায় গিয়ে উঠলুম, সে বাড়ির গিন্নি আমাকে আদর ক'রে কাছে টেনে নিল। চারিদিকে থই থই করছে বড় মানুষের জিনিসপত্তর। গিন্নীকে সবাই বলে মাসী! পালঙ্ক, আলমারি, বড় আয়না, পুতুলের দেরাজ, কত রকমের আসবাবপত্র আর প্রসাধন সজ্জা,—সব দেখিয়ে মাসী আদর জানিয়ে বলল, খুকু এ ঘর তোমার। আমি তোমাকে নিজের হাতে সাজাবো। যত শাড়ি আর গয়না দেখছ, সব তুমি পরবে!

ওদিকে সেই লোকটা—সেই মনোহরবাবু নাকি টেলিফোন করতে গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল, সুভাষবাবু গেছেন মফঃস্বলে, সেখান থেকে যাবেন পাটনায়। ফিরতে এখন দিন পনেরো! মহারাজ, ভেবে দেখো সেদিনের কথা। আমার অন্য কোনও উপায় নেই। বেরিয়েছি দুঃসাহসিক অভিযানে। যেন মায়ামৃগের পেছনে ছুটেছি। কোথায় তখন যাব এই নিরাপদ আনন্দের আশ্রয় ছেড়ে? তবে কিনা দিন পনেরো, তার পরেই ত সুভাষ বোস! এই কটা দিন দেখতে দেখতেই কেটে যাবে। এদিকে মাসির কী ভালবাসা! আমার মতন 'কচি মেয়েকে' প্রায় কোলে তুলে নিয়ে মাসী ভোগবিলাসের মধ্যে ডুবিয়ে দিল। সে কী খাওয়ার ঘটা! আমার স্বাস্থ্য ফিরে গেল! পনেরো দিন দূরের কথা, এক মাস হতে চলল।

ও বাড়িতে শুধু মেয়েছেলে থাকে, মহারাজ। কিন্তু দোতলায় শুধু মাসী আর আমি। একদিন মাসী বলল, আজ এক বন্ধু আসবে তোমার সঙ্গে গল্প করতে, তুমি তার সঙ্গে মন খুলে কথা বলো, কেমন খুকু? দেখবে কেমন চমৎকার মানুষ!

মাসীর কথায় সেদিন খুব উৎসাহ আমার। সারাদিন কাটল, সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল,

সেই বন্ধু এল অনেক রাত্তিরে। ও হরি, ও যে পুরুষ-ছেলে! চেহারাটা বেশ ভাল, গায়ে সিল্কের পানজাবির ওপর শাল। লোকটা টলছে, কী যেন খেয়েছে! কাছে এসে হেসে বলল, সারারাত—বুঝলে, সারারাত তোমার সঙ্গে গল্প করব। এই নাও পঁচিশটে টাকা রাখো। হ্যাঁ, হাত পেতে আমি টাকা নিলুম। বেশ মজা লাগল লোকটার চলন-ধরণ দেখে। বললুম, ও ঘরে গিয়ে মাসির কাছে একটু বসুন, আমি সেজেগুজে আসছি। লোকটা খুশী হয়ে বাইরে গেল। ঘরের আলোটা আমি নিবিয়ে দিলুম।

বুঝলে মহারাজ, তিন মিনিট! তিন মিনিটের মধ্যেই মাসির দেওয়া পুতুলের ব্যাগে ভরে নিলুম খানতিনেক শাড়ি, জামা, গামছা, তেল-সাবান-মাজন। মাসি আমার 'ফিগার' তৈরির জন্য স্কিপিংয়ের দড়ি কিনে দিয়েছিল। সেই দড়ি দিয়ে কোমরে ব্যাগটা বেঁধে বারান্দায় এলুম। শীতের রাত, সরু গলিতে কেউ নেই দূরে-কাছে। বারান্দর রেলিংয়ে উঠে রেন-পাইপ ধরে সড়সড় করে নেমে রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়লুম। ব্যাগটা খুলে নিলুম, পায়ে চটি পরলুম। তারপর মোড়ের মাথায় মিষ্টির দোকানের ধারে এসে একখানা রিকশা নিলুম। এখন আমি সব চিনি, সব জানি। এক মাসে আমার বয়স বেড়েছে দশ বছর। এখন আমি যেন ইস্পাতের ফলা। রাত এগারোটায় মেডিকেল কলেজের এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে এসে ঢুকলুম। ওখানেই মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম একখানা বেঞ্চে। মহারাজ, আমার চেয়ে কঠিন মেয়ে সেদিন কলকাতায় আর কেউ ছিল না! পরদিন সকালে একজন নার্স আমার দিকে তাকাল। ওর ধারণা, আমি ছেলেমানুষ! আমার বিশ্বাস, আমি ওর ঠাকুমা! যাই হোক, স্নান করলুম ওখানেই। তারপর তৈরি হয়ে ব্যাগটা নিয়ে বেরোলুম পথে। হাতে প্রায় পঁচিশ টাকা। ভাবনা আছে কিছু? দোকানে খেয়েদেয়ে যখন হাঁটতে হাঁটতে সুভাষবাবুর বাড়িতে এসে পৌঁছলুম তখন সাড়ে নটা।

সেই সুভাষবাবু, সেই সুন্দর মুখ। আমি যেন গুরুদর্শন করে ধন্য হলুম। উনি মিষ্ট কণ্ঠে বললেন আগে তোমার পক্ষে কিছুকাল পড়াশুনো করা দরকার, বুঝেছ?

আমি গ্রামের স্কুলে নাইন ক্লাসে পড়েছি। লেখাপড়ায় মন্দ ছিলুম না। সুভাষবাবু টেলিফোনে সেণ্ট মার্গারেটের সঙ্গে কথা বললেন। ওরাই আমার থাকার ব্যবস্থা করবে। খরচপত্রের ভাবনা কিছু নেই। আমি ফার্স্ট ক্লাসে ভর্তি হলুম। মহারাজ, পাস করে বেরোবার পর আসল জীবন আরম্ভ। বছর তিনেকের মধ্যেই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলুম। সেটাও ওই ১৯২৯। আমার বয়স তখন সতেরো পেরিয়ে যাচ্ছে!

শ্রীমতী সাধনার এই চমকপ্রদ কাহিনীকে কেন্দ্র করে আমি 'ঘুমভাঙার রাত' নাম দিয়ে 'ভারতবর্ষ'-এ একটি ছোট উপন্যাস প্রকাশ করেছিলুম। শুধু উপন্যাসই নয়, পরবর্তীকালে দু'একটি ছোট গল্পও লিখেছিলুম। এ মেয়ের জীবনের

কয়েকটি ছোট ছোট নাটকীয় ঘটনা আমাকে খুবই প্রভাবিত করে। এর কথা পরে আবার আসবে।

অতি প্রত্যুষে গড়ের মাঠের ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছিলুম তক্তাঘাটের দিকে। তখনও তেমন অন্ধকার কাটেনি। পৌষ সংক্রান্তি সমাগত। আমি যাচ্ছিলুম গঙ্গাসাগরে। ১৯৩৪ এর ১২ জানুয়ারী।

আমার কাঁধে একখানা কম্বল, গায়ে পাঞ্জাবির ওপর হাফ-সোয়েটার, হাতে অ্যালুমিনিয়মের একটা ঘটি। খালি পা। আমি যাচ্ছিলুম তীর্থস্থানে। শ্রীমতী সাবিত্রী চিঠি দিয়েছেন কাশী থেকে। ওঁরা সাগরে পেঁছিবেন ১৩ তারিখে। ভারত সেবাশ্রমের কর্মীরা ওঁদের সঙ্গে করে আনছেন। আমার যাওয়া চাই। সাবিত্রীর নির্দেশ অমান্য করতে পারিনে।

হাজার হাজার মেয়ে পুরুষ যাত্রীর অধিকাংশই অবাঙ্গালী। তারা পথে পথে খায়, রাস্তাঘাটে ঘুমোয়, ওলাউঠোয় মরে। সেই বিপুল সংখ্যক ইতর সাধারণের ভিতর দিয়ে পেরিয়ে হোরমিলার কোম্পানির ছোট একটি মালবাহী স্টীমারের ভিতরে জায়গা পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। সুতরাং তারই সঙ্গে লোহার কাছি দিয়ে বাঁধা বড় ভেলাটার উপরে গিয়ে উঠলুম। ভাবলুম নদীমাতৃক বাঙ্গলার প্রাকৃতিক শোভাও দেখব, এবং ওই সঙ্গে শীতের রোদ পোহানোও চলবে। তীর্থযাত্রায় সাধারণত আমি কৃচ্ছ্রসাধন করি, সুতরাং আহারাদির কথা ওঠে না।

সকাল আটটার পর স্টীমার ছেড়েছে এবং আমাদের ভেলাটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এটার নাম নাকি গাধাবোট। 'গাধা' শব্দটা কেন এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে এটি ঠাউরিয়ে নিচ্ছুলুম। শীতের রৌদ্র, বাতাস শীতল, মাথার উপর মহাশূন্য। কিন্তু স্টীমারের বড় বড় সুদর্শন চক্র দুখানা যতই সাংঘাতিক আওয়াজ করে জল কাটছে, আমাদের গাধা বোটখানা ততই ধেই ধেই করে নাচছিল। এটা ঠিক নৃত্যশিল্পীর নাচন নয়। কেউ আছড়িয়ে গামছা কাচলে সেটাকে গামছার নাচন বলা চলে না! আমরা কয়েকজন মূঢ় ও হতভাগ্য যাত্রী প্রাণভয়ে কেবল নিজের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা পাচ্ছিলুম। প্রাকৃতিক শোভাদর্শন সেদিন মাথায় উঠেছিল। সাঁতার জানিনে, সুতরাং ছিটকিয়ে জলের উপর পড়লে একেবারে ঘটি-বাটি! অনেকবারের মতো এবারেও মৃত্যু আমার সঙ্গ নিয়েছে। জলের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে আমার দিকে সে চোখ! আমি সর্বহারাদের মধ্যে বসেছিলুম।

দুপুরের একটা সময়ে মাঝে মাঝে হাওয়ার ঝলকে মূল স্টীমারের দিক থেকে খাঁটি ঘিয়ে ভাজা পুরির সুগন্ধ পাচ্ছিলুম! ছি, তুমি না কপিলের মন্দির দর্শনে যাচ্ছ? আগে ধুলোপায়ে দর্শন, পরে ভোজন। মা গৃধ লোভ করিও না! অতএব অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে গুছিয়ে বসলুম।

অবেলার দিকে পাংশুবর্ণ মেঘ দুর্ভাবনার কারণ ঘটাচ্ছিল। কিন্তু সন্ধ্যার প্রাক্কালে সমস্ত আকাশ ছায়াচ্ছন্ন হয়ে এল এবং সন্ধ্যারাত্রেই বৃষ্টি নামল। এ বৃষ্টি নাকি ফসলের পক্ষে ভাল। পশ্চিমে একে বলে 'হুইট-রেন'। আপাতত এই ঠাণ্ডায়

আমাদের পক্ষে এ বৃষ্টি কষ্টদায়ক। আমাদের মাথা বাঁচাবার উপায় ছিল না। বৃষ্টির সঙ্গে বাতাসের প্রবলতার ফলে যেন সর্বাঙ্গে চাবুক পড়ছিল। অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছিলুম চারিদিকে ধু ধু করছে দুরন্ত উত্তাল জলের লাফালাফি। আমি আমার ভারসাম্য বাঁচিয়ে এবার কম্বলের পাট খুলে মুড়ি দিলুম। এবার কম্বলটি বৃষ্টিতে ভিজতে লাগল। ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির ঝাপট থামবার লক্ষণ দেখছিনে।

কিন্তু মাঝরাত্রের ঘনীভূত দুর্যোগের কালে স্টীমারের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সারেঙ-এর বোধ হয় টনক নড়ে। তিনি 'নেটিভ জন্তুদের' নিরাপত্তার জন্য লোহার পোল খাটিয়ে তেরপল টাঙাবার ব্যবস্থা করলেন। আমরা ততক্ষণে রসগোল্লার মতো সপসপ করছিলুম। এর ওপর আবার তিনি পাগলাঘণ্টা বাজালেন—সেটি নতুন ঝড়ের সঙ্কেত। আমি হেঁটমুণ্ডে কম্বলের মধ্যে বসে রইলুম। যা হয় তাই হোক। শুধু মাঝে মাঝে ঝড়ের বেগের গোঁ গোঁ আওয়াজ শুনছিলুম।

কিন্তু কিছু হয়নি আমাদের। পরদিনের প্রভাত ছিল কিছু বিষণ্ণ, তারপর ধীরে ধীরে রোদ দেখা দিল। এবার আমরা বিস্তীর্ণ সাগরের 'সগর' নামক এক দ্বীপের ধারে এলুম শত শত নৌকার ভিড়ের মাঝখানে। একটি নৌকায় নেমে আমি তীরভূমিতে এসে পেঁছিলুম। বলা বাহুল্য, কাদা পায়ে প্রথমেই গেলুম কপিল মুনি মন্দির। ভিতরে মুনির বিগ্রহ।

জলযোগ সেরে ভারত সেবাশ্রম কেন্দ্রটি দেখে আমি গিয়ে দাঁড়ালুম একস্থলে যেখানে কাকদ্বীপের যাত্রীরা নামছে নৌকা থেকে। আমার উৎসুক চক্ষু এক সময় শ্রীমতী সাবিত্রীদের নৌকা ঠিকই খুঁজে বার করল। কাছাকাছি গিয়ে আমি হাত তুলে দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম। উনি দূরের থেকে আমাকে নমস্কার জানালেন। এ পর্বটি আমি আগেই 'জলকল্লোল' গ্রন্থে প্রকাশ করেছি, সুতরাং এখানে সংক্ষেপেই বলব।

ভারত সেবাশ্রমের ক্যাম্পাসটি বড়, সেখানে ডাক্তার ও ঔষধপত্রের ব্যবস্থাদি সহ সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধার আয়োজন করা ছিল। ওদের ভিতরে গিয়ে আমার ভিজা কম্বলখানা আগেই রৌদ্রে মেলে দিলুম। অনেকগুলি চালাঘরের জটলার মধ্যে মেয়েদের ব্যবস্থা ছিল পৃথক। সাবিত্রীদের দলে চার-পাঁচজন মহিলা ছিলেন। একসময় তিনি স্বামীজীকে সঙ্গে নিয়ে আমার সামনে এলেন এবং হাসিমুখে বললেন, এঁর কথাই আপনাকে বলে রেখেছিলুম স্বামীজি, ইনিই আমার গুরুভাই!

গুরুভাই! নতুন সংজ্ঞা বটে। আমি সকৌতুকে হেসে আলাপ করলুম। স্বামীজী বললেন, আপনি এই ক্যাম্পেই থাকুন, আমরা সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

ব্যস্তসমস্তভাবে স্বামীজী তাঁর সহকর্মীদের নির্দেশ দিয়ে অন্যত্র চলে যাবার পর এবার আমরা দুজন একা। হাসিমুখে বললুম, কপিল মুনি নয়, দেবীদর্শন ঘটবে, তাই ছুটে এসেছি!

আসতে কষ্ট হয়েছিল?—তাঁর রুদ্ধশ্বাসের পিছনে ভাবাবেগ দেখছিলুম।

তিলমাত্র না! আমার কণ্ঠস্বরে ছিল যেন আনন্দসাগরের তরঙ্গ।

হাসিমুখে সাবিত্রী বললেন, তুমি এসেছ, তাই না আমার গঙ্গাসাগর ! শোন, এবার আমি শাসনের ভয় করিনে ! সঙ্গে যাদের এনেছি তারা আমার খুব বাধ্য। দেড় বছর পরে এবার তুমি আর আমি কাছাকাছি এসেছি। এই দেখো তোমার সেই রুদ্রাক্ষের মালা, আমি সোনার চেন্ দিয়ে বাঁধিয়ে নিয়েছি।

অদূরে অন্য এক স্বামীজী আসছিলেন। সাবিত্রী বললেন, শুনুন স্বামীজী, এঁর শরীর ভাল নেই। এঁর স্নানের জন্য গরম জল দেবেন।

স্বামীজী বললেন, কিচ্ছু ভাববেন না, ওঁর সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

মাথায় ঈষৎ ঘোমটা টেনে সাবিত্রী তখনকার মতো বিদায় নিলেন।

সেদিন মধ্যাহ্নকালে সাবিত্রী আমাদের ভোজের আয়োজন করেছিলেন। আমি গুরুভাই, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, গলায় আমার উপবীত গুচ্ছ এবং আমি অতিথি। আমার জন্য এল গালিচার আসন ও মিষ্টান্নের পাত্র। পানীয় জল এল তামার ঘটিতে। কয়েকজন আশ্রমিক সাধু ও ব্রহ্মচারী এপাশে ওপাশে বসলেন। সাবিত্রী আমার পাতায় প্রথম গরম ভাত এবং তারপরে অনেকটা সুগন্ধ গাওয়া ঘি নিজের হাতে ভাতের ওপর ঢেলে দিলেন। হিমালয়ে একটি বিশেষ দিনের ভোজনপর্বে ঘৃতের প্রতি আমার পক্ষপাতিত্বের কথা তিনি জানতেন। অতঃপর আলুসিদ্ধ, সোনামুগের ডাল, পোরের ভাজা, বাঁধাকপির ছক্কা, কড়াইশুঁটির ডালনা, আচার, দই এবং আমার অতি প্রিয় কাশীর প্রসিদ্ধ খোয়াক্ষীরের নাড়ু। ওরই মধ্যে দেখছিলুম সাবিত্রীকে। অল্প ঘোমটার নিচে তাঁর রাঙ্গা মুখ। ওঁর মাথার চুলের ঝুলনটা কাটা—যাকে বলে বব-করা। কেমন যেন একটা অনাদিঅনন্তকালের বেদনা আমার মধ্যে কুণ্ডলী পাকাচ্ছিল। আবার বুকের মধ্যে সেদিন এক বিশ্বজোড়া গঙ্গাসাগর থই থই করে উঠছিল। আমি মুখ তুলতে পারিনি। এই পরম শুচিস্মিতার দুই চক্ষুতারকার নিবিড় মদিরতার মধ্যে আমার সেই ছোটবেলাকার হরিমোহনদের বাড়ির অন্নপূর্ণা দেখতে পাচ্ছিলুম ! আমার প্রাপ্য আমি পেয়ে গেছি। দেবীদর্শনই আমার কাম্য ছিল। আমার তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটি হারিকেন ল্যাম্প হাতে ঝুলিয়ে সাবিত্রী আমার ছোট চালাটির মধ্যে এলেন। হাসিমুখে বললেন, আমি এর মধ্যে দু'বার এসেছি, তুমি অকাতরে ঘুমোচ্ছিলে !

উনি বসলেন আমার কাছাকাছি। বললুম, আজ তোমাকে দেখে অপরিসীম তৃপ্তি পেয়েছি, তাই বোধহয় ঘুমটা ছিল গভীর। শোন সাবিত্রী, তুমি আমার জীবনে প্রথম অধ্যাত্মচিন্তার স্ফুলিঙ্গ ছিটিয়ে দিয়েছ, তোমাকে প্রণাম করতে আমার একটুও সঙ্কোচ নেই।

সাবিত্রী আমার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিলেন। তারপর নতমুখে নম্রকণ্ঠে বললেন, বাইরে তুমি আর নেই ! আমার ভেতরেই তুমি আমার পরম গুরুর মতনই মিলিয়ে রয়েছ ! তুমিই আমার পুজো জপতপ—সব। তোমাকে ছাড়া আমার অস্তিত্বই নেই।

দু'জনেই আমরা চুপ করে রইলুম। বোধ হয় দু'জনের ভেতরেই তখন সমুদ্র মন্থন চলেছে। এক সময় একটু ধরা গলায় সাবিত্রী বলে উঠলেন, কী দরকার ছিল আমার গঙ্গাসাগর আসবার? তুমি আসবে এই আশাতেই ত! কেউ মানবে না, স্বীকার করবে না, বুঝতেও চাইবে না! কিন্তু তুমি আর আমি দু'জনে যে এ পৃথিবীর নই, আমরা হিমালয়ের সন্তান—একথা কে বিশ্বাস করবে? এবার তুমি জেনে যেও, এই দেড় বছরে আমি সম্পূর্ণ বদলিয়ে গেছি। এখন আমিই আমার অভিভাবক। তোমার কাছে আসতে আমি আর ভয় পাইনে।

ঘণ্টাখানেক সাবিত্রী কাছে বসেছিলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কত কথা জমিয়ে রেখেছিলুম তোমাকে বলব বলে। কিন্তু তোমাকে দেখে সব ভুলে গেছি। তুমি এখানে অন্তত দিন দুই থাকো, কেমন? কাল আবার ঠিক এমনি সময় আসব। অনেকক্ষণ থাকব তোমার কাছে। অবিশ্যি কাল সকাল-দুপুরে আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে।

আলোটা রেখে সাবিত্রী চলে গেলেন। আলো সামনে থাকলেও যেন সব আলো নিবে গেল!

রাত্রের দিকে আমি যখন সাধুভাইদের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে গল্পগুজব করছি, এমন সময় মোটা একখানা গঙ্গাবর্ণ তসরের থান পরে সাবিত্রী তাঁদের ক্যাম্পের দিক থেকে এদিকে এলেন। গলায় তাঁর সেই চেন্-বাঁধানো রুদ্রাক্ষের মালা। তিনি এগিয়ে এসে একটি ধূপ জ্বালিয়ে নিয়ে আমার চালার দিকে গেলেন। তাঁর মুখে-চোখে একটি ভাবভঙ্গীর ছায়া দেখে মনে হল, তিনি রাত্রির জপ সেরে এসেছেন।

সেই রাত্রে আহারাদির পর চালার মধ্যে এসে একটু অবাক হয়েছিলুম। বোধ করি সাবিত্রীর অনুরোধেই সাধুভাইরা আমার জন্য সুন্দর শয্যার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আমার নিজের কম্বলটি শুকিয়ে পাট করা রয়েছে পায়ের দিকে। মাথার বালিশের পাশে রয়েছে একটি রক্তগোলাপের গুচ্ছ। বাইরে তখন সমুদ্রের তোড়পাড় চলছিল।

আমার চারিদিকে যেন একটি মোহাবেশ রচিত হচ্ছিল। কি জানি কেন, আমার ভিতর থেকে প্রতিবাদ মাথা তুলছিল। না, এর মধ্যে রয়েছে এক ললিত লাবণ্যের স্পর্শ এ আমার জন্য নয়। আমার মন দুর্বল, কিন্তু আমার নৈতিক দায়িত্ব আমাকে ভিতর থেকেই ক্ষণে ক্ষণে শাসন করে উঠছিল। দুপুরবেলায় নানা আলোচনার মধ্যে সাবিত্রী তাঁর সেই আগেকার প্রিয় কবিতাটাই মৃদুগলায় আমাকে শুনিয়ে গিয়েছিলেন, 'মোর মরণে তোমার হবে জয় / মোর জীবনে তোমার পরিচয় / মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল, আজ ঘিরিল তোমার পদতল—'

সেই রাত্রির সুখের শয্যায় অতিশয় অস্বস্তির সঙ্গে আমার বিনিদ্র প্রহরগুলি কেটেছিল। ভোরবেলায় স্নানাদি সেরে সাবিত্রী এসে দাঁড়াবার আগেই আমি কম্বল ও ঘটিটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। সাধু ভাইদের সঙ্গে মিনিট দুই কথাবার্তা বলে জনারণ্যের ভিতর দিয়ে চলে গেলুম।

জানি এটি ন্যায়সঙ্গত হল না, সাবিত্রীকে বলে আসাই উচিত ছিল। কিন্তু আমি

নিজের দিকে চেয়ে ভয় পেয়েছিলুম, নিজেকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। আমি হনহনিয়ে ভিড়ের ভিতর দিয়ে কোথায় যে যাচ্ছিলুম, নিজেও তা জানিনে।

তবু যত ভাবছি, মনে হচ্ছে এই ভাল! পুজোর ফুল পুজোর জন্যই থাক্। এই নিবিড় আনন্দ, এই কল্যাণকুশল স্পর্শ, এই রোমাঞ্চকর রস-কল্পনা—এ চিরদিন আমার মনে স্বপ্নিল একটা অনুপ্রেরণার মতো হয়ে থাক। আমি চলে যেতে চাই দেহ থেকে দেহাতীতে, জীবন থেকে মহাজীবনে—যেখানে অন্ধকারে, দুর্যোগে, দুর্দশায়, দুর্ভাগ্যে ও বিচ্ছেদের ব্যথায় আমি থাকব চিরদিন যক্ষবিরহীর মতো, এবং মহীয়সী সাবিত্রী বাস করবেন তাঁর অলকায়—আমার সকল নাগালের বাইরে। হ্যাঁ, সেই ভাল।

বেলা দেড়টা দুটোর সময় একখানা স্টীমার যাচ্ছিল ডায়মণ্ড হারবারের দিকে। আমি সেখানায় উঠে নিরিবিলিতে জায়গা নিলুম। এখানা যাত্রীবাহী, তাই বসবার সুবিধা। আমার মন পরিতৃপ্ত, তাই সেদিন অপরাহ্ণ কালের মধুর রৌদ্রে, নীলোজ্জ্বল আকাশে আর দূর-দিগন্তের হরিৎ রেখায় সর্বত্র আমি সাবিত্রীর আসন পেতে-পেতে যাচ্ছিলুম।

ডায়মণ্ড হারবারে নামলুম, তখন রাত। সেখানে মোটর বাস পেয়ে ধর্মতলার কাছে এসে নামলুম মধ্যরাত্রের অনেক পরে। আবার সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে যখন টালাপাড়ায় গিয়ে পোঁছলুম, তখন রাত তিনটে।

পরদিন ১৫ জানুয়ারী। দুপুরবেলায় সেদিন প্রচণ্ড ভূমিকম্পে উত্তর বিহার ও উত্তরবঙ্গের একটা অংশ ছারখার হয়ে গিয়েছিল। সেই ভূমিকম্প ঐতিহাসিক। আমি ছিলুম টালিগঞ্জের ট্রামে। ট্রামখানা কাৎ হয়ে পড়ার ফলে আমাকে লাফিয়ে নেমে পড়তে হয়েছিল!

মাসখানেক পরে শ্রীমতী সাবিত্রীর চিঠি পেয়েছিলুম। তিনি লিখেছিলেন, বড় আনন্দে তোমার সঙ্গে কেটেছিল একটি দিন। তুমি আমাকে না জানিয়ে চলে গিয়ে ভালই করেছিলে! আমার আচরণে হয়ত সামান্য অস্থিরতা তোমার চোখে পড়েছিল। আমি জানি তুমি ক্ষমা করবে। গঙ্গাসাগরেও ভীষণ ভূমিকম্প হয়েছিল। তোমার সেই চালাঘর মড়মড় করে ভেঙ্গে পড়ে! আমরা বাঘের ডাক শুনতে পেয়েছিলুম। শুনলুম তিন-চারশ' নৌকো সমুদ্রে অদৃশ্য হয়ে যায়। সমুদ্রের ঢেউ সুন্দরবনকে তোলপাড় করে। তোমার চিঠি পেলে আবার চিঠি দেবো। ইতি—

ফাল্গুনের শেষ দিকে এবার বাসস্থান বদলিয়ে পাশের বাড়িতে উঠে এসেছি। এতকাল ধরে কেরোসিন তেল জ্বালিয়ে সকল কাজ করতে হয়েছে। তার আগে ছিল রেড়ির তেল আর মোমবাতির যুগ। জীবনে এবার এই প্রথম ইলেকট্রিক আলো। প্রতি সন্ধ্যা থেকে সমস্ত দোতলা বাড়িটা যেন হেসে উঠছে! নতুন আলোয় নতুন প্রাণ এল। বাড়ির মধ্যেই আমরা পরস্পরকে নতুন করে চিনতে লাগলুম। পুরনো যুগ হারিয়ে গেল, নতুন যুগের উদ্বোধন ঘটল। বাড়িতে এল রান্নার ঠাকুর, রাতদিনের চাকর ও ঠিকা-ঝি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্রে 'রাধারাণী'র উল্লেখ করে তাকে অমরত্ব দান করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু রাধারাণীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে আসার পর থেকেই আমার মনে একটি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। কেননা তখনকার দিনে কতকগুলি শব্দ কানে উঠলে আমার মন অতিশয় বিরূপ ও ব্যথিত হয়ে উঠত। যেমন বেশ্যা, বারনারী, বারবনিতা, গণিকা, বারাঙ্গনা, রূপোপজীবিনী, কুলটা, ভ্রষ্টা, অসতী—ইত্যাদি। এ শব্দগুলি সবই কিন্তু পুরুষের সৃষ্টি। পুরুষ-সমাজপতিরা তাদের কথায়, বক্তৃতায়, সংবাদে, সাহিত্যে, কাব্যে—যখন এই শব্দগুলি দরকার মতো ব্যবহার করে তখন পুরুষশাসিত সমাজের মেয়েরা চুপ করে শোনে। কেন চুপ করে থাকে প্রশ্ন সেইখানে। উপরিউক্ত শব্দগুলির একটিও মেয়েদের সৃষ্টি নয়, বলাই বাহুল্য। কিন্তু কেন তারা চুপ করে থাকে, কেন ওই ধরনের আলোচনায় যোগ দেয় না, কেন পতিতা নারীদের জীবন তারা বিশ্লেষণ করতে চায় না—এটি মেয়েরা নিজেরাই জানে। পুরুষ আধিপত্যের বেষ্টনীর মধ্যে দাঁড়িয়ে তৎকালে কোনও মেয়ের এমন সাহস ছিল না যে, তারা মুখ খোলে!

মেয়েদের কপালে সুখ্যাতির তিলক অথবা কলঙ্কের দাগ চিহ্নিত করে দেওয়া একমাত্র পুরুষেরই অধিকার ছিল। তখনকার কাব্য বা সাহিত্যেও এই মূলনীতি পাকা হয়ে থাকত। সেই কারণে একদা রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা, বউ ঠাকুরাণীর হাট, চোখের বালি, ঘরে বাইরে' প্রভৃতি কাব্য ও গ্রন্থ ঝড় তুলেছিল রক্ষণশীল পুরুষ সমাজে, কিন্তু মেয়েরা রবীন্দ্রনাথের এই বইগুলি পড়ে আনন্দ পেয়েছিল। অঙ্গনা মানে মেয়ে এবং তাকে হতে হবে সতী মেয়ে! সে গৃহের গণ্ডির মধ্যে থাকে তাই সে গৃহাঙ্গনা। কিন্তু গণ্ডীর বাইরে গেলেই তার নাম বরাঙ্গনা থেকে হ'ল বারাঙ্গনা। এর পিছনের আইডিয়াটা হ'ল, পুরুষের 'সেন্স অফ পজেশন' এবং সম্পত্তিবাদ। পুরুষ কখনও মেয়েকে বিশ্বাস করেনি এবং একা বাইরে যেতে দেয়নি, পাছে তার ওই 'সেন্স অফ পজেশনে' আঘাত পড়ে, পাছে তার আপন ঔরসজাত 'পুত্র সন্তান' পিতার সম্পত্তি না পায়, পাছে 'ক্ষেত্রজ' অন্য কেউ পায়! এই কারণে মেয়েদেরকে ঘরের মধ্যে পুরে রেখে তাদের ওপর 'দেবীত্ব' আরোপ করা হত। কিন্তু দেবী হওয়া সত্ত্বেও মেয়েরা সম্পত্তি লাভ করত না—সে মেয়ে জননী, জায়া, কন্যা, ভগিনী যেই হোক না কেন। তাদের জন্য থাকত শুধু 'খোরপোষের ব্যবস্থা। নিঃসন্তান মেয়েদেরকে বলা হত 'অবীরা'।

কিন্তু বারবনিতাদের কথা ছিল স্বতন্ত্র। এরাও দেশেরই মেয়ে,—এদের কেউ আকাশ থেকে পড়েনি! এরা পুরুষেরই সৃষ্টি, আবার পুরুষের চোখে ঘৃণ্য! কলকাতার প্রথম পত্তনকালে এদেরকেই সৃষ্টি করেছিল যারা, তারা রাজা, মহারাজা, জমিদার, জড়োয়া জহরৎ ব্যবসায়ী, জাহাজের মালিক, পাটোয়ারী, বৃটিশের প্রথম আমলের যোগানদার এবং তখনকার বিভিন্ন অভিজাত শ্রেণী। এই বারবনিতাদের গর্ভে

এসেছিল হাজার হাজার সন্তান। তারা ভিন্ন পরিচয় নিয়ে কালক্রমে বিবাহসূত্রে নানা সমাজে মিলিয়ে গেছে।

পরবর্তীকালে পতিতাদের মধ্যে বহু মেয়ে এসেছিল ভদ্র ও স্বল্পবিত্ত সমাজ থেকে। তারা তাদের পারিবারিক পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করত, এবং নিজেদের প্রকৃত নাম-ধাম বদলিয়ে রাখত শোভন সুরুচির দায়ে। ওদের মধ্যে বহু মেয়ের ইতিহাস হল উৎপীড়নের, অপযশ রটনার, অভাব-অনটনের, কঠোর শাসনের, অরক্ষণীয় অবস্থার, দুরারোগ্য ব্যাধির, লাঞ্ছনা-গঞ্জনার, পদস্খলনের বা গৃহ-বিতাড়নের। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষ অভিভাবকরা ওদেরকে তাড়িয়েছে। মা কেঁদেছে, ভাই-বোন, আত্মীয়-পরিজন কেঁদেছে,—কিন্তু পুরুষের কঠিন নির্দেশের ফলে নিরুদ্দিষ্ট জীবনের মধ্যে তাদেরকে চলে যেতে হয়েছে। ওদের মধ্যে বহু মেয়ে সুশ্রী ও শিক্ষাসম্পন্ন, বহু মেয়ে সম্ভ্রান্ত সমাজের। পিতার কন্যাদায়, স্বামীর সন্দেহ, শাশুড়ির অনাচার, সতীনের দুর্ব্যবহার, অন্যায়ের আস্ফালন—প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যার ঘাত-প্রতিঘাতে আহত প্রত্যাহত হয়ে মেয়ে বা বাড়ির বউ সঙ্গোপনে বৃহৎ মুক্তির দিকে পা বাড়াতে বাধ্য হয়েছে। এর মধ্যে অর্থনীতিক সমস্যাও কাজ করেছে অনেক। স্বল্পশিক্ষিত বেকার স্বামী বা সহোদর, সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি, পিতা বা শ্বশুরের পুঁজির অভাব, উপার্জনের সুযোগ-সুবিধার স্বল্পতা—এসবগুলি একত্র করলে দেখা যেত ঘরের মধ্যে মেয়েদের ভাগেই উচ্ছিষ্ট অন্নের পরিমাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে গেছে। বলা বাহুল্য, দেশের চারিদিকে জীবনের এই ভয়াবহ পঙ্গুতার মধ্যেও এই দুঃসহ অর্থনীতিক দুর্গতি সকল পারিবারিক সম্পর্ককেই যুগের পর যুগ ধরে নিয়ন্ত্রিত করে চলত। কিন্তু এর প্রধান আঘাত পড়ত পুরুষশাসিত মেয়েদের জীবনে। প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষভাবে মেয়েদের কপালে জুটত নিগ্রহ, কৃচ্ছ্রতা, অসম্মান এবং অনাচার। এগুলির হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য তাদের অনেকে বেরিয়ে পড়ত যেদিকে দু'চোখ যায়। মহাষ্টমীতে, গ্রহণ-স্নানে, পাল-পার্বণে ভিড়ের ভিতর দিয়ে বহু মেয়ের নিখোঁজ হয়ে যাবার ইতিবৃত্ত তৎকালে অনেকেই শুনত।

আরেকটু বলি। কলকাতা বা মফঃস্বলের শ্রেষ্ঠ নাগরিক, সমাজের নামজাদা অভিভাবক, জমিদার বংশের শাখা-প্রশাখা,—এঁদের ভিতর থেকে কত রূপ-লাবণ্যময়ী নিরুপায় নারী 'বেরিয়ে' এসেছে। বন্দিনী অবস্থা থেকে মেয়েরা কেউ মুক্তি নিলে তৎকালে বলা হত 'বেরিয়ে' গেছে। খাঁচার দরজা খুলে সে পালিয়েছে, শিকল ছিঁড়ে বেরিয়েছে, শাসনবাঁধন অস্বীকার করেছে। শাস্ত্রে নাকি বলেছে বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী, প্রৌঢ়ত্বে পুত্র, বার্ধক্যে পৌত্র, এদের দ্বারা রক্ষণা-বেক্ষণের বাইরে মেয়েদের স্বাধীন সত্তা নেই। মেয়েরা হবে পরাশ্রিতা, পরান্ন ভোজিনী, পরপদানুগতা ও পরার্থ সেবিকা,—এই তাদের একমাত্র পরিচয়। ওদের নাম হবে তখন সতীসাধ্বী গৃহলক্ষ্মী! ওরা কদন্ন খাক্, রোগে ভুগুক, সূতিকায় বা যক্ষ্মায় মরুক, অমানুষ স্বামীর অনাচারে নিগৃহীত হোক,—কিন্তু ওরা গৃহলক্ষ্মী। সংসারে ওদের একমাত্র দাবি হল 'খোরপোষ'। অর্থাৎ ভাত আর কাপড়। অর্থ বা সম্পদ থেকে ওরা বঞ্চিত।

অনাহারে বা অনাচারে ওদের যখন অকালমৃত্যু ঘটে, তখন ওদের মাথায় সিঁদুর মাখিয়ে ফুলের তোড়ায় সাজিয়ে চিতায় তোলা হয়। তখন সবাই বলে, আহা পুণ্যেবতী। অর্থাৎ বহু পুণ্যের ফলে এই অপমৃত্যু!

মেয়েদের এই প্রকার দুর্দশার একটি কাহিনীকে অবলম্বন করে একদা একটি ছোট উপন্যাস লিখে নাম দিয়েছিলুম, 'দেবীর দেশের মেয়ে'। এটিকে সিনেমা চিত্রে রূপান্তরিত করার জন্যে ১৯৩৪-এর এক সময়ে সুধীর বসু নামক এক উৎসাহী ভদ্রলোক এটি কিনে নেন।

এই সময়ে একটি তরুণ বালক প্রায়ই আমার খোঁজে আসত। কিন্তু আমি তৎকালে সর্বদাই ব্যস্তবাগীশ। একদিন দুপুরে ছেলেটিকে বাইরের ঘরে বসালুম। ছেলেটি লাজুক, অমায়িক এবং মিষ্টভাষী। বয়স চোদ্দ-পনেরো হবে। সে আসে ভবানীপুর থেকে। এসে এসে ফিরে যায়। তার এই অধ্যবসায় দেখে আমি অবাক হয়েছিলুম। কিন্তু আরও অবাক করল একটি বিষয়ে। সে আমার কোন কোনও বই থেকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা মুখস্থ বলে যেতে লাগল। এই ধরনের স্মরণশক্তি সচরাচর চোখে পড়ে না। বয়সে সে আমার চেয়ে অনেক ছোট কিন্তু সেই থেকে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব জমে উঠেছিল। পরবর্তীকালে এই তরুণ সুকুমার বালক একজন সুলেখক হয়ে ওঠে। তার নাম সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

আরেকদিন আসে একটি নবীন যুবক। তাকে দেখে আমি থমকিয়ে গিয়েছিলুম। এমন রূপবান, স্বাস্থ্যবান, প্রিয়দর্শন ও লাজুক যুবক বোধ হয় এর আগে দেখিনি। ঠোঁট দুটি সুন্দরী নারীর মতো রাঙাটে, দাঁতগুলি ঠিক মুক্তো এবং বড় বড় কচি নধর চোখ। পুরুষের এই সুন্দর শ্রী ও স্বাস্থ্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল। পরিচয় দিল সে আমাদের বন্ধু পবিত্র গাঙ্গুলীর সম্পর্কে ভাগ্নে এবং তার নাম অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়। সে থাকে এই কাছেই এক বস্তিতে একটি কাঁচাপাকা বাড়িতে। কিন্তু তার কথাবার্তার মধ্যেই জানাল ভাগ্যের ভয়াবহ বিদ্রূপ তার সঙ্গেই রয়েছে! পড়াশুনো তাকে বন্ধ রাখতে হয়েছে কারণ তার জীবন-মরণ সমস্যা দেখা দিয়েছে।

আমি আঁতকিয়ে উঠলুম,—কেন?

এই লাজুক ও বিনীতস্বভাব যুবকটি যখন জানাল, সে যক্ষ্মা রোগে ভুগছে, আমি শুনে পাথর হয়ে গেলুম! সে শুনেছে কবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় কোন স্টেটের ট্রাস্টির চেয়ারম্যান এবং এই স্টেটের খরচে দার্জিলিংয়ের লুইস জুবিলি স্যানাটোরিয়মে দুটি বেড নেওয়া আছে। আমি যদি সুরেনবাবুকে এ বিষয়ে একটু বলি। ওখানে চিকিৎসা, ঔষধ-পত্র ইত্যাদির সুবিধা আছে।

আমি সেইদিনেই বিকালে সুরেনবাবুর বাড়িতে হাজির হয়েছিলুম। অমিয়-জীবনের এই সুন্দর রূপ, স্বাস্থ্য, যৌবনশ্রী—এর জন্য সেদিন আমি অনেক দূর যেতে পারতুম! সুরেনবাবু ছিলেন আমার খুবই শ্রদ্ধেয় বন্ধু। তিনি সব ব্যবস্থাই করে দিয়েছিলেন। দার্জিলিংয়ে থাকাকালীন বহুদিন অবধি অমিয়র বাঁচবার আশা ছিল না। লুইস জুবিলি স্যানাটোরিয়মের রেকর্ডে সেগুলি আজও আছে আশা করি। এর

অনুপূর্ব আমি লিখেছি 'দেবাত্মা হিমালয়' গ্রন্থে। তখন কথায় কথায় না ছিল এক্স-রে, না স্ট্রেপটোমাইসিন পেনিসিলিন, না বা ডাঃ সেলম্যান ওয়াকস্-ম্যানের অ্যাণ্টিবায়োটিক কোনও ওষুধ। যক্ষ্মারোগ মানে তখন অবধারিত মৃত্যু। কিন্তু এই নিশ্চিত মৃত্যুর থেকে একদা বেঁচে উঠেছিল অমিয়জীবন। পরবর্তী বহু বছর পরে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁর মুখ্যমন্ত্রীত্বের কালে অমিয়কে নানা লেখাপড়ার কাজ দিয়ে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

এমনি একটা সময় আমার নামে একটি খুব হালকা পার্সেল এল। হাতে নিয়ে দেখি, বিহারের পুসা ইনস্টিট্যুট থেকে পাঠিয়েছেন রমলা দেবী। খুলে দেখি একটি ছোট সাবানের বাক্সর মধ্যে কয়েকটি রক্তনীল বর্ণের গোলাপ ফুল। এখনও বাক্সের মধ্যে কিছু মুখচোরা গন্ধ রয়েছে। ফলগুলির তলায় পাট করা একখানা চিঠি। চিঠির ভিতরকার সেই একই সম্ভাষণ এবং প্রায় একই ভাষা আমার মনে ক্লান্তি এনেছিল। তবু প্রাপ্তি স্বীকার করে একটি পোস্টকার্ড পাঠিয়ে দিলুম। এ মহিলা কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারেন, এই ভেবে আমি আড়ষ্ট হচ্ছিলুম।

এরই মধ্যে একদিন এক সৌম্যকান্তি ও পরিণত বয়স্ক ভদ্রলোক এসে হাসিমুখে যখন বললেন তাঁর নাম হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি তাঁকে সাদরে ঘরে বসিয়ে ক্ষমা চেয়ে জানালুম, আপনার চিঠির জবাব দিতে পারিনি, সেজন্য আমি খুবই লজ্জিত। ভদ্রলোক আমার সাহিত্য ও ভ্রাম্যমান জীবনের নানা খবর রাখেন। এক সময় তিনি কাজের কথায় এলেন। হেমবাবু বর্তমানে নদীয়ার মহারাজার বাড়িতেই থাকেন অনেকটা অভিভাবকের মতো, এবং তাঁদেরই নির্দেশে উনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তাঁদের আমন্ত্রণ যদি গ্রহণ করি এবং এখনই যদি একবারটি সেখানে যাই তবে সকলে খুশী হন। হেমবাবু গাড়ি এনেছেন।

তখন বেলা তিনটে। আমি রাজি হলুম এবং ভিতরে গিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে এলুম। গাড়ির ড্রাইভারের সাজসজ্জা রাজবাড়িরই উপযুক্ত।

আধ ঘণ্টার মধ্যে যে-অঞ্চলে এলুম সেটি আমার খুবই পরিচিত পল্লী। ঝাউতলার ঠিক মোড়ে কবি প্রিয়ম্বদা দেবীর বাড়ির একেবারে মুখোমুখি। গেটের ভিতর দিয়ে বাগান পেরিয়ে গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল পর্চ-এর নিচে। বাড়িটি একতলা বটে তবে বিশাল অট্টালিকা। প্রথমে দেখলুম একটি সুশ্রী কিশোর বালক, মুখখানি যেন হাসির মাধুর্যে ভরা। ছেলেটির নাম সৌরীশ অথবা সৌরেশ। ওরই পিতা মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় মহাশয় কিছুকাল আগে অকালে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর স্ত্রী মহারানী জ্যোতির্ময়ী দেবী এই ছেলেটিকে নিয়ে এই বাড়িতেই থাকেন। আমাকে ওই ছেলেটির কাছে গল্পগুজবে বসিয়ে হেমবাবু অন্দরমহলে গেলেন এবং মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মহারানী এসে দাঁড়ালেন চিকের আড়ালে। এবার মধ্যস্থ হয়ে হেমবাবু বললেন, মহারানী একখানি উপন্যাস লিখেছেন সম্প্রতি, আপনি যদি সেখানি একটু দেখেশুনে দেন।

সবিনয়ে আমি বললুম, এ ধরনের কাজ আমি ত কখনও করিনি, তবে পাণ্ডুলিপিটি হাতে পেলে অবশ্যই পড়ে দেখতে পারি।

মহারানীর হাতেই ছিল দুখানা মোটা ও কালো রংয়ের এক্সারসাইজ খাতা। হেমবাবু সেই দুখানা খাতা এনে আমার সামনে রাখলেন। আমি তার পাতা উল্টিয়ে পড়তে বসে গেলুম। আমি কয়েকবারই সম্পাদকতা করেছি, সুতরাং লেখার ধরণ পরীক্ষা করার অভিজ্ঞতা আমার কিছু আছে। ঘণ্টাখানেক খুঁটিয়ে পড়ে আমি হেমবাবুকে বললুম, মহারানী উপন্যাস রচনায় অভ্যস্ত নন, সেই কারণেই লেখাটা ঠিক জমে ওঠেনি। মাতৃস্নেহ হল এ গল্পের মূল ভিত্তি। তা হোক। যে কোনও বিষয়বস্তু নিয়েই লেখা চলে। কিন্তু প্রকাশের ভঙ্গি বা রচনার দক্ষতাই প্রধান কথা। এই বইটিতে তার একটু অভাব রয়েছে।

হেমবাবু আবার অন্দরমহলে গেলেন এবং মিনিট দশেক পরে ফিরে এসে বললেন, মহারানী খুশী হন যদি আপনি বইটি সংশোধন করেন, কিংবা আরেকটু গুছিয়ে এটিকে তৈরি করে দেন। ওঁর খুব ইচ্ছে যদি আপনি এখানে নিয়মিত এসে কাজ করেন; আমাদের গাড়ি যাতায়াত করবে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে খাতা দু'খানা নাড়াচাড়া করে ভাবতে বসলুম। কাজটি বিনা পারিশ্রমিকের নয়, এবং রাজা-রাজড়ার বাড়িতে তার পরিমাণও কম নয়! আমি রাজী হয়ে গেলুম এবং সপ্তাহে দুই তিনবার আসা-যাওয়া করতে লাগলুম। কাজটি শেষ করে দিতে আমার বহুদিন লেগেছিল। অন্যের গল্প নিজের মনে বসাতে সময় লাগে বইকি। কিন্তু ছুটোছুটিতে সাহিত্য হয় না। অবশেষে মহারানী বিশ্বাস করে খাতা দুখানা আমার হাতে একদিন ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমার বিবেচনা ছিল এই, বইটি ছাপা হবে সম্ভ্রান্ত সমাজের এক মহিলার নামে। সুতরাং এই বইয়ের প্রত্যেকটি শব্দ ও বাক্য আমাকে অত্যন্ত সতর্কভাবে বসাতে হয়েছিল। বলা বাহুল্য, ওই গ্রন্থের বিষয়বস্তু, প্রতিপাদ্য বা পরিণতির সঙ্গে আমার মনের কোনও যোগ ছিল না। কিন্তু মহারানী আমার কাজে খুশী হয়েছিলেন। ওইখানেই আমার সঙ্গে ওঁদের প্রায় দেড় বছরের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। মহারানীকে আমি কোনদিন সুস্পষ্টভাবে চোখেও দেখিনি। শুনেছি অন্যদিকে তিনি রাজা কমলারঞ্জনের ভগ্নি।

এর অল্প কয়েক বছরের মধ্যে চন্দননগরে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের এক অধিবেশন বসে। রবীন্দ্রনাথ তখন ওখানকার গঙ্গার ঘাটে এক সুন্দর নৌকায় বসবাস করছিলেন। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যকার, পণ্ডিত ও অ্যাটর্নি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়। ওই অধিবেশনে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী প্রমুখ কয়েকজন লেখিকা ও বহু লেখক যোগদান করেছিলেন। আমার পাশেই বসেছিল ভবানী মুখোপাধ্যায়। যাই হোক, এই সম্মেলনে সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্য বিশিষ্ট কয়েক ব্যক্তি গঙ্গাতীর থেকে রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসেন। কবি এসে একটি মনোজ্ঞ ও স্মরণীয় ভাষণ দান করেন। সম্মেলনের সেইটিই ছিল সকলের বড় সাফল্য। ওই একই দিনে মণ্ডপের পিছন দিকে একটি পৃথক মহিলাসভা বসে, এবং শ্রীযুক্তা অনুরূপা

দেবী তার সভানেত্রী হিসাবে আমাকে সামান্য কিছু বলার জন্য আমন্ত্রণ করেন। কী বলেছিলুম আমি, এখন আর মনে নেই। কিন্তু তার জন্য আজও আমি অনুতপ্ত এই কারণে যে, সাহিত্যের রক্ষণশীলতার আলোচনায় শ্রদ্ধেয়া অনুরূপা দেবীর সঙ্গে আমার একটি বিতর্ক বেধে ওঠে।

অতঃপর ওই সম্মেলনের সভাপতি দত্ত মহাশয় তাঁর ভাষণে তৎকালীন তরুণ সাহিত্যকে অতি কঠোর ভাষায় সমালোচনা করছিলেন, এবং সেই সূত্রে এই অবজাত সাহিত্যকে 'যৌনপ্রবৃত্তির চণ্ড চংক্রমণ'—এই আখ্যা দেন। তিনি বলেন, সাহিত্যের এই চরম দুর্গতির কালে আশার কথা এই, কোথাও কোথাও মহৎ সাহিত্যও সৃষ্টি হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি তাঁর পরম কল্যাণীয়া নদীয়ার মহারানী জ্যোতির্ময়ী দেবী লিখিত 'মাতৃস্নেহ' (?) উপন্যাসটির উল্লেখ করে তার ভূয়সী প্রশংসা করেন!

ভবানী আমার গায়ে চিমটি কেটে কুল-কুলিয়ে হাসছিল। সে সবই জানতো। তবে মহারানী তাঁর বইয়ের নামটি ঠিক কী দিয়েছিলেন, এটি আমি ভুলে গেছি।

কিন্তু ওই সম্মেলনের সূত্রে রবীন্দ্রনাথের কাছে যাবার সুযোগ আমি ছাড়িনি। অবেলার দিকে সভা যখন বেশ সরগরম, তারই এক ফাঁকে পিছলিয়ে বেরিয়ে আমি সোজা চলে গিয়েছিলুম গঙ্গার ধারে কবির বজরার কাছে। খবর দেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কবি তাঁর অনুমতি পাঠিয়ে দিলেন। আমি নৌকায় উঠে এলুম। ভিতরে কবি একা, একখানা চেয়ারে বসে রয়েছেন। পাশের টিপাইতে কিছু কাগজপত্র রাখা। তখন নব বসন্ত সমাগমে গঙ্গার উপর দিয়ে মৃদুমন্দ সমীরণ বয়ে চলেছে। আমি মাথা নিচু করে ভিতরে ঢুকে নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। বললুম, আপনার আজকের ভাষণটি শুধু সম্মেলনকেই নয়, সমস্ত বাঙালী সমাজকে অনুপ্রাণিত করবে। আমরা যেন গঙ্গায় অবগাহন স্নান করলুম!

কবি প্রসন্ন মুখে একবার তাকালেন। তারপর তাঁরই ভাষণটির সূত্র ধরে বললেন, জীবনের গতি আছে বলেই সাহিত্যের গতিকে দেখতে পাই। মানুষের মন বসে থাকে না। সে এগিয়ে চলে বলেই নিজের খাদ্য খুঁজে পায়!

আমি স্থির হয়ে বসে ছিলুম শতরঞ্চির উপর। আমার সামনে রয়েছে গৌরীশৃঙ্গের চূড়া! সমস্ত আত্মাভিমান ভুলে যেতে হয়, এই বিরাট পুরুষের পায়ের কাছে এসে বসলে—নিজেকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনে হতে থাকে।

সেই অল্পকালটুকুর মধ্যে কবি রাজনীতি, সমাজজীবন এবং সাহিত্যের অন্যান্য আলোচনার কথা তুললেন। মিনিট পনেরো বড় জোর। কিন্তু এই কথাবার্তার মধ্যেও তিনি সর্বাধুনিক সাহিত্যের কথা ভোলেননি। সেই সময়ে তারাশঙ্করের নব প্রকাশিত একখানি ছোট গল্পের বইয়ের খুব নাম হয়েছিল। বইখানি তাঁর হাতে এসেছিল, এবং তিনি গল্পগুলির খুবই প্রশংসা করে এক সময়ে বললেন, তুমি দেখে নিয়ো, এই নতুন লেখক একদিন অনেকের মাথা ছাড়িয়ে উঠবে!

কবির ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে হয়নি!

সেই রাত্রেই আমি তারাশঙ্করকে কবির কথাগুলি জানিয়ে দিয়েছিলুম।

এমনি একটা কোন্ সময়ে রজনী মুখার্জীর সঙ্গে আমার আলাপ হয় এবং সেই আলাপ ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। রাজনীতি বিষয়ে রজনীর পড়াশুনো এবং পাণ্ডিত্য যথেষ্ট। সে তখন রাজনীতিক কর্মী, অতিশয় মিষ্টভাষী এবং অমায়িক। সে বিবাহ করেছে শ্রীমতী আরতিকে—যে মেয়েটি জেলে যাবার আগে বিচারককে কঠিন বাক্য শুনিয়েছিল। আমার ভাগ্নি বুলির বন্ধু হিসাবে আমিও শ্রীমতী আরতির 'ছোট মামা'। রজনী ও আরতি—দুইজনে মিলে ওদের নতুন ঘরকন্না পেতেছে।

ওদের বাসাবাড়িতে সেদিন আমার ডাক পড়েছিল।

ভিতরে গিয়ে ঢুকতেই রজনী হাসিমুখে এগিয়ে এল এবং সামনের ঘরে যে মহিলারা কথাবার্তা বলছিলেন তাঁদের ভিতর থেকে শ্রীমতী আরতি উঠে এসে বলল, আসুন ছোট মামা, এঁদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।

ঘরের মধ্যে শান্ত ও স্থির হয়ে বসে রয়েছেন এক বৃদ্ধা। তাঁর সেই আভিজাত্য-পূর্ণ এবং সম্ভ্রমসূচক ব্যক্তিত্ব একটি মুহূর্তেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর মাথায় ঘোমটা নেই। মাথার সামনের অংশ কতকটা কেশবিরল। তিনি বিধবা। তাঁর পাশে রয়েছেন এক পরিণত যৌবনা মহিলা। তাঁর পরনে সরুপাড় ধুতি দেখে বুঝলাম, তিনিও বিধবা। গায়ে তাঁর রেশমী চাদর। তাঁর বড় বড় চোখে যেন মোলায়েম স্নেহের শান্ত মাধুর্য। সেদিকে তাকালে যেন মুখ ফিরনো যায় না। আমি রজনীর পাশে গিয়ে মেঝের শতরঞ্চিতে বসলুম।

আরতি প্রথম পরিচয় করালো বৃদ্ধার সঙ্গে। বলল, উনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছোট মেয়ে শরৎকুমারী দেবী—

আমার সর্বাঙ্গে সচকিত রোমাঞ্চের চমক লাগল। তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে আমি বৃদ্ধার পায়ের ধুলো নিলুম। বললুম, আজ আমার পরম সৌভাগ্য, আপনার দর্শন পেলুম—

শরৎকুমারী হাসিমুখে যখন আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন তখন আমি স্বয়ং সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের স্পর্শই যেন অনুভব করে ভাবাপ্লুত হয়েছিলুম। ওঁর মুখশ্রীতে বিদ্যাসাগরের ছবিটি যেন মূর্ত।

আরতি আমার সঙ্গে দ্বিতীয় মহিলার পরিচয় করিয়ে বলল, এঁর ভাই আপনার খুব পরিচিত। মানে, আমাদের ক্ষিতীশ মামা—ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগরের পৌত্রী মোতিআলার ছেলে হলেন ক্ষিতীশ মামা—আর ইনি তাঁরই সহোদরা ভগ্নি হাসি দেবী।

নমস্কার বিনিময়ের পর মৃদুমধুর কণ্ঠে হাসি দেবী বললেন, আমি না হাসলে আমার নামের সঙ্গে মেলে না!

সবাই আমরা হেসে উঠলুম।

অতঃপর পারস্পরিক সম্পর্কের হিসাবনিকাশের অঙ্ক নিয়ে আলোচনা উঠল। সর্বাগ্রে বুঝি নৃসিংহরাম, তারপর ভুবনেশ্বর, তারপর রামজয়, তারপর বুঝি ঠাকুরদাস।

ঠাকুরদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র। অর্থাৎ অনায়াসে আড়াইশ' বছর পিছিয়ে গিয়ে মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে আশ্রয় নেওয়া চলে। আমার মাথায় ততক্ষণে বংশানুক্রমিকতার জটিলতা ঢুকে গিয়েছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা কুমুদিনীর পৌত্র ঝাড়গ্রাম রাজ-কলেজের অধ্যাপক সুধাকর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার সাম্প্রতিকালের বন্ধু। তিনিই এই 'বংশ লতিকা' আমার কাছে পাঠিয়ে দেন।

রজনী ও আরতির আন্তরিক আতিথেয়তা সেদিন খুবই আনন্দদায়ক ছিল। কিন্তু সব ছাড়িয়ে শরৎকুমারী দেবীর দর্শনলাভের সেই দিনটি আমার মনে উজ্জ্বল ও পুণ্যময় হয়ে রয়েছে। এজন্য বন্ধুবর রজনী ও শ্রীমতী আরতির কাছে আমার কৃতজ্ঞতা থেকে গেছে।

এই প্রসঙ্গেই রজনীর সম্পর্কে আরও দু'একটা কথা বলা চলে। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার হাস্যকর পরিণতির পর বাঙালীর মন সাম্যবাদ সম্বন্ধে কিছু সচেতন হয়ে ওঠে। সেই সময় যাঁরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা ও মনোযোগ সহকারে পড়াশুনো করছিলেন তাঁদের মধ্যে এই প্রিয়দর্শন ও তরুণবয়স্ক রজনী অন্যতম। রজনীর রাজনীতিক দূরদর্শিতা অনেককেই সেদিন আকৃষ্ট করেছিল। পৃথিবীর নানা দেশে তখন সমাজবাদ, সাম্যবাদ, শ্রমিকবিপ্লব এবং ধনতন্ত্রবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সমস্ত সাহিত্য সৃষ্টি হয়ে চলেছে, সেগুলি আমাদের দেশে আসা একপ্রকার নিষিদ্ধ ছিল, পাছে সেগুলি জনমনকে প্রভাবিত করে তোলে এবং ব্রিটিশ ভারতের পক্ষে নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে। ধনতন্ত্রী এবং সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ তখন এই ধরনের সাহিত্যের ঘোরতর শত্রু। কিন্তু ওরই মধ্যে নানান ফিকির এবং সংগোপনে যে সমস্ত নিষিদ্ধ গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকাদি বোম্বাই বা কলকাতায় এসে পৌঁছত তারই কিছু কিছু রজনীর হাতে আসত। ওই সকল সাহিত্যের ভিতর দিয়েই জানা যেত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নতুন চিন্তার ধারা, সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা, সোভিয়েট জনজীবনের প্রগতিশীল চিত্র ও তাদের বিপুল নির্মাণসজ্জা, জার্মানিতে নবাগত হিটলারের অন্ধ জাতীয়তার আত্মাভিমান, বিলাতে সাম্যবাদী নেতা সাপুরজি শাকলাৎওয়ালা ও রজনী-পাম দত্তর অগ্নিক্ষরা ভাষণ প্রভৃতি। সেদিনকার প্রচণ্ড ইংরেজ শাসনে যখন বাঙ্গলার চিত্ত উৎপীড়িত এবং নির্যাতিত সেই সময় এই সকল সাহিত্য যেন বহির্বিশ্বের জানালা খুলে দিত। রজনী সেই সময় বোঝাতো কংগ্রেসের প্রকৃত স্বরূপ কি প্রকার, গান্ধীজীর আন্দোলনের প্রকৃতি, দেশের স্বাধীনতার মূল ভিত্তি অর্থনীতি কিনা, চাষী ও মজদুর শ্রেণীর কল্যাণ ভিন্ন দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয় কিনা, সামাজিক পরগাছা কাদের বলে, ইত্যাদি নানাবিধ আলোচনার ভিতর দিয়ে তার পাণ্ডিত্য ও দূরদর্শিতার পরিচয় প্রকাশ করত।

এই বিষয়গুলি তখনকার কালে ছিল আনকোরা নতুন এবং এগুলি নিয়ে কেউ জনসমক্ষে বক্তৃতা করতে সাহস পেত না। যতদূর আমার মনে পড়ে এ নিয়ে রজনী ও আরতি তৎকালে বোধ হয় একটি 'স্টাডি সার্কেল' তৈরি করে এবং তারা উভয়েই—বিশেষ করে রজনী—শ্রমিকদলের নেতা বলে পরিচিত হয়।

পরবর্তীকালে রজনীর রাজনীতিক পরিচয় অনেক বড় হয়ে ওঠে এবং সে এম. এন. রায় মহাশয়ের সহকারীরূপে 'র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট' নামক একটি সংস্থার পরিচালক হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে এম. এন. রায় মহাশয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বও ঘনিষ্ঠতা হয়। এঁর বিদ্যাবত্তা, রাজনীতিক দূরদৃষ্টি, সমাজ জীবনের বিশ্লেষণ, বহুমুখী চিন্তাধারা—এগুলি লক্ষ্য করে আমি অভিভূত হই। এঁর জীবনও রোমাঞ্চকর দুঃসাহসে পরিপূর্ণ। এই গ্রন্থের তৃতীয় পর্বে এঁর সম্বন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

॥ ২৬ ॥

১৯৩৪-এর ডিসেম্বরে পাটনা থেকে হীরালাল দাশগুপ্ত মহাশয় চিঠি দিলেন তাঁর অনুপম লিপিদক্ষতায়:—"সামনে বড়দিন। জ্যোৎস্না রাত। 'কাহুডাকের' জঙ্গলে তুমি! 'শিঙার কোঠির' দিক থেকে কী যেন আওয়াজ! নবী আক্‌তার বলল, 'খাঁ-সাব' নিক্‌লা হুয়া! দুটো ডবল ব্যারেল গান্‌, একটা রাইফেল। হলদিছাপরায় বুনো হাঁসের পেছনে ছোটা। চিঠি পেয়েই চলে এসো।—দাদু।"

চিঠিতে নাচের ছন্দ আমাকে নাচিয়ে তুলল। আগামীকাল রাত সাড়ে আটটায় দেরাদুন এক্সপ্রেস ধরব—কারণ আমি এবার পরেশনাথ পাহাড়ের মন্দিরটি দেখে গয়া-জাহানাবাদ হয়ে পাটনায় পৌঁছব।

চিঠি পেয়ে যখন প্রস্তুত হচ্ছি, তখন দুপুরের দিকে দুজন অপরিচিতা মহিলা দেখা করতে এলেন। ওঁদের মধ্যে একজন কিছু বর্ষীয়সী। ওঁরা বললেন, আমরা বাদুড়বাগানের শ্যামমোহিনী দেবীর শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে আসছি।

প্রসিদ্ধ সমাজসেবিকা শ্রীযুক্তা শ্যামমোহিনীর সঙ্গে আমার একদিন মাত্র আলাপ হয়েছিল। আমি ওঁদের অভ্যর্থনা করে বসালুম। বললুম, ওখানে আমার জানা এক মহিলা আছেন তাঁর নাম নীলিমা চট্টোপাধ্যায়।

বর্ষীয়সী মহিলা বললেন, ইনিই সেই!

হাসিমুখে নীলিমা দেবী নমস্কার জানালেন। বললেন, আপনার কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ। অনেক দিন ধবে চিঠি দিয়ে আপনাকে ব্যস্ত করেছি। আপনার সাহায্য না পেলে কলকাতায় আমি দাঁড়াতেই পারতুম না। সরোজ মিত্র মশায়দের ওখান থেকে কিছুদিন আগে কাজ ছেড়ে এখন আমি শ্যামমোহিনী দেবীর ওখানে আছি।

হাসিমুখে আমি বললুম, পাঁচ বছর ধরে চিঠিপত্রেই আমাদের আলাপ হচ্ছিল। আপনাকে চোখে দেখছি আজ প্রথম!

নীলিমা বললেন, ইনি হিরণ্ময়ী দেবী। এঁকে আমি মাসিমা বলি।

আপনার স্বামী কেমন আছেন এখন?—নীলিমাকে প্রশ্ন করলুম।

ভাল নেই। আমি সেই জন্যই আপনার কাছে এসেছি।

বলুন, আমি কি করতে পারি?

নীলিমার হয়ে হিরণ্ময়ী দেবী বললেন, ওর স্বামী একেই ত পক্ষাঘাতে পঙ্গু, তার ওপর রোজ জর আসছে। সেখানে দেখবার এখন কেউ নেই, চাকরটাও জবাব দিয়ে গেছে। নীলিমার পক্ষে রাঁচি ফিরে যাওয়া খুবই দরকার।

বললুম, কিন্তু কলকাতার রোজগার ছেড়ে উনি যাবেন কেমন করে?

এবার নীলিমা দেবী কথা বললেন—আপনাকে সেই কথাই বলতে এসেছি। ওঁর কথা মনে রেখেই রাঁচির গার্ল স্কুলে আমি দরখাস্ত করেছিলুম। খবর পেলুম সেখানে আমার চাকরি হয়েছে। সেই জন্যই আমি রাঁচিতে ফিরে যেতে চাই।

এ ত খুব ভাল কথা—সুসংবাদ।—আমি বললুম, বাস্তবিক, আপনার স্বামীর এই অবস্থা—বাইরে আপনার থাকাই চলে না। এখনই আপনার চলে যাওয়া উচিত।

হিরণ্ময়ী বললেন, আপনাকে একটি অনুরোধ করার জন্যই নীলিমা আমাকে সঙ্গে এনেছে। আপনার জানা কেউ একজন যদি ওঁকে রাঁচিতে পোঁছিয়ে দিয়ে আসে—নীলিমা তা হলে যাতায়াতের রাহাখরচ দিতে পারে।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলুম। পরে বললুম, দেখুন, আমার জানা এমন কেউ নেই যাকে আমি অনুরোধ করতে পারব। রাঁচিতে গেলে এক-আধবার গাড়ি বদলাতে হয়। তা ছাড়া আসছে কাল আমি যাচ্ছি পরেশনাথ হয়ে গয়া। আমি কাকেই বা বলব, কেই বা রাজী হবে। তা ছাড়া আমার সময়ও কম।

নীলিমা দেবী সবিনয়ে বললেন, আপনি যদি আমাকে দয়া করে রাঁচিতে নামিয়ে দিয়ে যান তা হলে আমার খুবই উপকার হয়।

তাঁর এই প্রস্তাব গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ আমার নিজের কাছে বিশেষ-বিশেষ তারিখ অতিশয় মূল্যবান। সুতরাং তিনজনে বসে পরবর্তী প্রত্যেকটি তারিখ মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত স্থির হল আজই রাত্রে তা হলে আমাদের গাড়ি ধরতে হয়। বেশ মনে পড়ছে সেটি ২২শে ডিসেম্বর। নীলিমা দেবী তখনই রাজী হয়ে গেলেন। গাড়ি রাত সাড়ে আটটায়। উনি নিজে হাজারিবাগ রোডের টিকিট করে হাওড়া স্টেশনে ৭নং প্লাটফরমের মুখে আটটার সময় অপেক্ষা করবেন। আমি ঠিক সময়ে গিয়ে পোঁছবো।

আমাকে নানাভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে ওঁরা এক সময় বিদায় নিলেন। সেদিন দুপুরে স্বপ্নেও ভাবিনি, এই মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে আমাকে দু'একটি অভাবনীয় সঙ্কটের মধ্যে পড়তে হবে।

আমি সম্পূর্ণভাবে সেদিনও সামাজিক জীব হয়ে উঠতে পারিনি, সেটি আমার প্রকৃতিগত ত্রুটি। অনেক কর্তব্যের ডাক থাকে অনেক দিক থেকে, কিন্তু আমি সর্বত্র সাড়া দিতে পারিনে। আমার ভ্রমণই আমার জীবন, সেখানে তিলমাত্র বাধা পেলে আমি দুঃখিত হই। শ্রীমতী নীলিমা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সেদিন থার্ড ক্লাস কামরায় উঠে ওঁর সুখ-সুবিধার দিকে আমাকে মনঃসংযোগ করতে হচ্ছিল, এজন্য আমি ঈষৎ ক্ষুব্ধ। কারণ ভ্রমণকালে আমি অন্য মন এবং ভিন্ন চেতনায় বাস করি।

মহিলা কুণ্ঠিত হয়ে এক কোণে বসেছেন। আমি বসেছিলুম মুখোমুখি। ওঁর

বয়স কম, বোধ করি সেই কারণেই আড়ষ্টতা কিছু বেশি। এক সময় সহাস্যে আমি বললুম, সেই 'বিজলী'র আমল থেকে আপনার সঙ্গে আমার পত্রালাপ হয়ে আসছে —প্রায় পাঁচ বছর হতে চলল। দেখা-শোনা এই প্রথম। আপনার তিন-চারটে লেখাও বোধ হয় 'বিজলী'তে ছাপা হয়েছিল।

আমার কথাবার্তা শুনে উনি যেন একটু সহজ হলেন। বললেন, আমি ঠিক লেখিকা নই। শখ করে আপনাদের কাছে লেখা পাঠাতুম। ছাপা হতে পারে এটা কখনও ভাবিনি।

আমরা দুজনেই হাসলুম। বর্ধমান ছেড়ে গাড়ি চলল আসানসোলের দিকে। এবার উনি বললেন, একদিন আপনার চিঠিতে সাহস পেয়েই আমি কলকাতায় এসেছিলুম। আপনার কথাতেই সরোজ মিত্র আর হরিদাসবাবু আমাকে কাজ দেন। সেই দুঃসময়ের কথা আমি ভুলিনি।

আমি বললুম, যাই হোক, সে অবস্থা এখন আপনার বোধ হয় কেটে গেছে। আপাতত আপনার স্বামী সুস্থ হয়ে উঠুন এইটি কাম্য। আপনি গার্ল স্কুলে কাজ পেয়েছেন, এটিও খুব আনন্দের কথা। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আপনি আহারাদি সেরে এসেছেন ত?

ও নিয়ে আপনি কিছু ভাববেন না।

আমি চুপ করে গেলুম। সে রাত্রে প্রচুর শীত পড়েছিল। যখন আসানসোল পার হল, আমি আমার দুটি কম্বলের থেকে একটি ওঁকে গছালুম। বললুম, তা হোক, আমার গায়ে লংকোট রয়েছে। আপনি কম্বল ঢাকা দিয়ে বসুন।

ওঁকে অপেক্ষাকৃত আরামের মধ্যে বসিয়ে আমি চুপ করে গেলুম। ওঁর সঙ্গে শুধু রয়েছে একটি আংটাওলা টিনের বাক্স। আমারও প্রায় তাই। একটি ছোট সুটকেস ও দুখানা কম্বল। এসব আমরা হাতে হাতেই নিতে পারব।

রাত নিশুতি হয়েছে। আমরা ধানবাদ ছেড়ে যখন গোমো পার হয়ে গেলুম, তখন রাত দেড়টা বেজে গেছে। এ গাড়ি 'ইস্রি'তে দাঁড়ায় না, সুতরাং আমরা হাজারিবাগ রোডে নামব। এক সময় নীলিমা দেবীকে আমি সজাগ করলুম। যখন গাড়ি এসে স্টেশনে দাঁড়াল, রাত তখন আড়াইটে।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে দেখি চারিদিক ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। শুক্লপক্ষের চিহ্নমাত্র নেই। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে সেই কনকনে ঠাণ্ডায়। আকাশ ঘন অন্ধকার, কোনোদিকে কিছু দেখা যায় না। স্টেশনে বিন্দুমাত্র আলো বা লোকজন নেই। আমরা কম্বল ও সুটকেস নিয়ে সেই অন্ধকারে খুঁজতে খুঁজতে ওয়েটিং রুম খুঁজে বার করলুম। ভিতরটায় কিছু দেখা যাচ্ছে না। ঘরখানা ঘুপসি। ঠাউরিয়ে

দেখি, স্তূপাকার কী যেন সব মালপত্র। কিন্তু আমরা ছিলুম ক্লান্ত ও শীতার্ত, এবং ঘুমে আমার নিজের চোখ জড়িয়ে আসছিল। সুতরাং আকাশের আলোর আভাসটুকুতে ঘরের দরজার কাছেই যেটুকু খালি জায়গা দেখা যাচ্ছিল, সেইটুকুতেই আমি ও নীলিমা দেবী কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়লুম। দু' মিনিটের মধ্যেই আমি নিদ্রায় তলিয়ে গেলুম।

যখন হঠাৎ ঘুম ভাঙলো, চমকিয়ে উঠলুম। সামনে তিন-চারজন পোশাকপরা আরদালি। হাততিনেক দূরে দু'জন খাস ইংরেজ অফিসার বিছানায় বসে চা-পান করছেন। আমার মাথার কাছে দশ-বারোটা বন্দুক ও রাইফেল দাঁড় করানো। বড় বড় কয়েকটা কাঠের পেটি, তার পাশে পাশে শিকারীর নানাবিধ পোশাকপত্র। গত রাত্রির সূচিভেদ্য অন্ধকারে এসব কোনও কিছুই দেখতে পাইনি। এদিকে ফিরে দেখি, ওখানে নীলিমা দেবীর চিহ্নমাত্র নেই! তিনি তাঁর বাক্সটি ও কম্বলখানা আমার পাশে রেখে যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য! ঘুমের ঘোরে আচমকা উঠে সামনে দুজন ইংরেজ আর অতগুলো বন্দুক দেখে আমি একেবারে হতভম্ব।

সাহেব দুজন হাসিমুখে বললেন, গুড মর্নিং! আপনার ইচ্ছে হলে আরেকটু ঘুমিয়ে নিতে পারেন। আমরা ব্রেকফাস্ট করেই বেরিয়ে পড়ব।

মৃদুহাস্যে আমিও শুভ প্রভাত জানিয়ে বললুম, আপনারা কি শিকারে বেরিয়েছেন?

হ্যাঁ, উনি এখানকার পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল। আমি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। আপনার সঙ্গের লেডি বাইরে গেছেন। এখন সকাল সাড়ে সাতটা।

ওঁদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি উঠে কম্বল দুখানা পাট করে সুটকেস দুটোর ওপর গুছিয়ে রেখে বেরিয়ে এলুম। ভাবছিলুম বাঙ্গালীর অগ্নিবিপ্লবের উগ্রতা সম্প্রতি কমে এসেছে! কিন্তু দু'তিনজন বিপ্লবী যুবক গত রাত্রে এঘরে নিঃশব্দে ঢুকে কী না করতে পারত। আর কিছু না হোক, পাঁচ-সাতটা বন্দুক পাচার ক'রে হাজারিবাগ বা চাতরার জঙ্গলে গা ঢাকা দিতে পারত!

প্লাটফরমের প্রান্তে জলের কলে মুখ ধুয়ে চায়ের দোকানের কাছে এসে দেখি, নীলিমা দেবী অপেক্ষা করে রয়েছেন। কিন্তু আজ সকালে দুজনের আর কোনও গাম্ভীর্য রইল না। পরস্পরকে দেখে আমরা সকৌতুক উল্লাসে হেসে অস্থির হলুম। সন্দেহ নেই, অন্ধকার রাত্রে ঘুমের ঘোরে আমরা বোকা বনে গিয়েছিলুম।

সাহেবরা বিদায় নেবার পর ওদের ওই ওয়েটিং রুমটি আমরা দখল করলুম এবং ওখানেই স্নানাহার সেরে যখন বেরোলুম তখন বেলা এগারোটা। এখান থেকে 'ইট্রি' বা 'উট্রী' পর্যন্ত মোটর বাস পাওয়া যাবে। উট্রী আমার চেনা জায়গা। ওখানকার

জঙ্গলে উশ্রী জলপ্রপাতটি খুব চিত্তাকর্ষক দৃশ্য। যাই হোক উশ্রীতে পৌঁছে অনেক চেষ্টায় একখানা টাঙ্গা পাওয়া গেল। আমরা নিমিয়াঘাটের পাশ কাটিয়ে যখন পরেশনাথ পাহাড়ের ঠিক নিচে এসে এক জঙ্গলের ধারে নামলুম, দেখলুম খানিকটা পথ হেঁটে গেলে জৈনদের দুটি মস্ত ধর্মশালা। একটি তার শ্বেতাম্বরী অন্যটি দিগম্বরী। বেলা তখন প্রায় চারটে। চারদিক নিঝুম। আজ আকাশ পরিষ্কার। গাড়িখানা ছেড়ে দিয়ে আমরা হাঁটতে হাঁটতে এসে ধর্মশালার ভিতরে ঢুকলুম। কিন্তু প্রথমেই একটি লোকের কাছে বাধা পেলুম এবং তর্ক বাধল। ওরা আশ্রয় দিতে নারাজ। যাই হোক আমরা সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী, এ কথাটি কর্তৃপক্ষকে উত্তমরূপে বুঝিয়ে তবে বাইরের ফটকের পাশে একটি ঘরে আশ্রয় পেলুম। কর্তাদের একজন জানালেন, এখন কাছাকাছি কোথাও খাবার কিনতে পাওয়া যায় না সম্প্রতি। এদিককার জঙ্গলে-জঙ্গলে জানোয়ারের উৎপাত বেড়েছে। নরখাদক বাঘের উপদ্রবে নাকি সবাই আতঙ্কিত। আমরা থাকি সেই ভিতর দিকে। আপনাদের আসা উচিত হয়নি!—আমরা যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর ধমক খেলুম।

লোকটা আমাদের তাড়াতে পারলে বাঁচে! কিন্তু আমরা টাঙ্গা ছেড়ে দিয়েছি, এখন যাবো কোথা? শেষ পর্যন্ত নীলিমা দেবীর অনুরোধে ওরা দুটি টাকার বিনিময়ে একটি হ্যারিকেন ল্যাম্প, রুটি-তরকারি-রাবড়ি এবং পানীয় জল দিতে রাজি হ'ল। কাল সকালে পাহাড়ে উঠে পরেশনাথ দর্শন ক'রে আমরা চলে যাব। প্রণামী দিয়ে যাব বইকি।

লোকটার কথা শোনার পর থেকে একটু গা ছমছম করছিল। তবু ফটকের বাইরে এসে এদিক ওদিক দু'পা ঘুরে দেখছিলুম। চারিদিকে ঘন বন, সামনে মস্ত এক বৃক্ষ। জনমানব কেউ কোনও দিকে নেই। নিঝুম বনস্থলীর দিকে এই আসন্ন সন্ধ্যায় তাকালে দুর্ভাবনা আসে। আমরা ভিতরে চলে এলুম। এবার একটা লোক এসে ভাঙ্গা পুরনো ফটকটা বন্ধ করে সোজা ভিতর দিকের পথ ধরে চলে গেল। যাবার সময় বলল, বাহারমে মৎ খাড়া হো। ভিতরে রহো!

সন্ধ্যা তখন সমাগত। ঘরের ভিতরটা সম্পূর্ণ শূন্য, একটিও আসবাবপত্র নেই। মেঝেটা কনকনে ঠাণ্ডা। চারিদিকের জনশূন্যতার মধ্যে এই ন্যাড়া ঘরখানায় রাতটা কেমন করে কাটিয়ে পালাবো এই কথা যখন ভাবছি, তখন ভিতর দিকের দীর্ঘলম্বিত পথ ধরে দুটো লোক এসে শালপাতায় আহার্যসামগ্রী, একটি ছোট জলের বালতি ও তার সঙ্গে একটা টিনের ঘটি রাখল। অন্যজন হ্যারিকেনটি দিল। ওদের কাজ ওখানেই শেষ। নীলিমা দেবী সেগুলি গুছিয়ে ভিতরে এনে রাখলেন। লোক দুটো আবার চলে গেল।

সন্ধ্যার পরে পরিষ্কার জ্যোৎস্না দেখা দিয়েছিল। ঘরের দরজাটা খুলে রেখে হারিকেন ল্যাম্পটা সামনে বসিয়ে আমরা গল্প করছিলুম। নীলিমা দেবী পাটনা ও রাঁচির মেয়ে। ১৯২৭-এ উনি প্রাইভেটে বি-এ পাস করেন। বিবাহের পর একটি বাচ্চা হয়ে মারা যায়। কিন্তু কলকাতার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বর্ণনায় উনি হেসে খুন হচ্ছিলেন। এক সময় উনি বললেন, এবার খেয়ে নিন—

অতঃপর মিনিট পনেরোর মধ্যে আহারাদি সেরে বাইরের বারান্দায় বালতির জলে আঁচিয়ে আমরা ঘরে এলুম। উনি দরজাটা বন্ধ করে কাঠের হুড়কোটা লাগিয়ে দিলেন। ঠাণ্ডা পড়েছে প্রচুর। ওঁর গায়ে গরম চাদর, আমার লংকোট। কম্বল মাত্র দু'খানা। একখানা ওঁকে দিলুম। আধখানা উনি পাতবেন, বাকি আধখানা গায়ে দেবেন। আমারও তাই। ওইভাবে আমরা রাতটা কাটাবার ব্যবস্থা করে নিয়ে যখন ঘরের এধারে ওধারে কুণ্ডলী পাকিয়ে মেঝের উপর পড়েছি, তখন কেরোসিনের অভাবে আলোটা ধীরে ধীরে কমে এল। জৈনরা একটু হিসেবী সন্দেহ নেই।

বোধ হয় রাত তখন এগারোটা। ঘরের বাইরে পৃথিবী তখন নিঃসাড়। ঠাণ্ডায় কুঁকড়িয়ে কম্বলের ভিতরে আমার ঘুম আসছিল। এমন সময় ওধার থেকে নীলিমা চাপা গলায় ডাকলেন, শুনছেন?

ধড়মড়িয়ে উঠলুম। উনি বললেন, বাইরে কিসের আওয়াজ হল!

আমি উঠে সমস্ত দরজা ও জানলা পরীক্ষা করলুম। সবগুলো বন্ধ, কিন্তু সবগুলোই পুরনো, একেবারে ঝাঁঝরা। ওগুলোর ফাটলের ভিতর দিয়ে বাইরের চাঁদের আলো দেখা যায়। জানলার গরাদগুলো এমন ক্ষয়ে গেছে যে, ধাক্কা দিলেই ভেঙ্গে পড়ে। দরজাটায় হুড়কো আছে, কিন্তু খিল নেই।

'হঠাৎ একটা বড় আওয়াজে আঁতকিয়ে উঠলুম। মুহূর্তেই আমার হৃৎকম্প দেখা দিল। সরে এসে মহিলাকে চুপি চুপি শুধু বললুম, বাঘ! খুব সম্ভব!

বাঘের প্রকৃতি সম্বন্ধে সেদিনও আমি অনভিজ্ঞ। নরখাদকরা যে জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শিকারের গতিবিধি নিরীক্ষণ করে, এটি তখনও জানতুম না। এখন মনে হচ্ছে সন্ধ্যার ঠিক আগে ফটকের বাইরে ঘোরা-ফেরা করা আমাদের পক্ষে ভাল হয়নি। লোকটা ঠিকই বলেছিল। নীলিমা দেবী ভয়ে কাঠ হয়ে অন্ধকার কোণে বসেছিলেন। দ্বিতীয়বার ঝপাৎ করে ঝাপটার মতো একটা শব্দ হলো জানলার ঠিক নিচে। ঠিক তার পরে বন্ধ জানলায় যখন দু'একবার আঁচড় পড়ল, তখন আমরা সাহস হারালুম। বাঘ আক্রমণশীল হয়, যখন সে নরখাদক হয়ে ওঠে। পুরনো জানলাটা ভাঙ্গতে ওর এক সেকেণ্ডও লাগবে না। তবে?

তবে কি আমার জননীর আশীর্বাদ সব মিথ্যে? তিনি যে বলেছেন, তিনি জীবিত থাকতে আমার পায়ে কুশাঙ্কুরও ফুটবে না! আমি মহিলার কাছে এসে হেঁট হয়ে দেখি, তিনি কম্বলে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন এবং চাপা জড়িত কণ্ঠে বললেন, ওঁর সঙ্গে আর দেখা হল না!

অপরাধ আমারই। ওঁকে আগে রাঁচিতে পৌঁছিয়ে দেওয়া আমার উচিত ছিল। কেন এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন হলুম? কেন আমার এই সর্বনাশা আত্মপরতা? ধিক আমার জীবনে। আগে ওঁকে স্বামীর কাছে দিয়ে এলে আমার অরণ্যযাত্রা একটুও কি ক্ষুন্ন হত?

ফটকের দিকে হুড়মুড় করে একটা আওয়াজ হতেই আমি থরথরিয়ে কেঁপে উঠলুম। অন্ধকারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে জানলা-দরজাগুলো দেখছিলুম। এমন সময় সহসা বাইরের বারান্দায় জলসুদ্ধ বালতিটা ঝন-ঝনাৎ করে উঁচু থেকে আছড়িয়ে পড়ল নিচে শানের উঠানের ওপর। তখন আমি বেপরোয়ার মতো এগিয়ে প্রাণপণে ঘরের দরজা ভিতর থেকে ঠেলে ধরলুম। না, আর উপায় নেই। এবার নিশ্চিত মৃত্যু!

অন্ধকারে পলকের মধ্যে লক্ষ্য করলুম, কম্বল-মুড়িসুদ্ধ হুমড়ি খেয়ে মুখ গুঁজড়িয়ে নীলিমা দেবী দেওয়ালের কোণে পড়ে ক্ষীণস্বরে গোঁ গোঁ করছেন। মনে হচ্ছে আতঙ্কে তার দাঁতি লেগে গেছে। কিন্তু তাঁরই মাথার কাছের জানলায় যখন পুনরায় আঁচড়ের আওয়াজ পেলুম তখন আর স্থির থাকতে পারলুম না। দরজাটা ছেড়ে ওঁর ওই মুখের আওয়াজটা বন্ধ করার জন্য এগিয়ে গিয়ে কম্বলসুদ্ধ ওঁকে পাশ ফিরিয়ে শোওয়ালুম এবং আমার পকেটের ছুরিখানার বাঁট ওঁর দাঁতের দুই পাটির মাঝখানে একটু প্রবেশ করালুম—যাতে ওঁর মুখের ওই শব্দটা কমে। না, উনি একেবারেই অচেতন। আমি ঠকঠক করে কাঁপছিলুম, উত্তেজনায় আর আতঙ্কে। ওঁর মতো আমিও যেন হতচেতন অবস্থায় যন্ত্রবৎ এগুলো করে যাচ্ছিলুম এবং উৎকণ্ঠিত আতঙ্ক ও প্রাণভয়ে ভীত হয়ে নিশ্চুপ প্রেতের মতো আমি নড়বড় করছিলুম। নীলিমা দেবীর গোঁ গোঁ শব্দটা সম্পূর্ণ থামেনি, তবে পাশ ফিরিয়ে শোওয়ানোতে আওয়াজ কিছু কমেছিল। ভদ্রমহিলার গলা টিপে ওই আওয়াজটা বন্ধ করার জন্য আমার হাত নিসপিস করছিল। এবার আমি তাঁর মুখ থেকে ছুরিখানা সরিয়ে নিয়ে অন্য পাশ ফিরিয়ে দিলুম। তারপর উঠে এসে আবার দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ালুম। বোধ হয় আকাশের চাঁদ ততক্ষণে অনেকটা ঘুরেছে। তিনটে বন্ধ জানলার ফাটলগুলো দিয়ে তার আলো ঠিকরিয়ে ভিতরে আসছে।

সমস্ত রাত্রির সেই আত্মরক্ষার প্রাণপণ সংগ্রাম আমার কাছে এখন যেন উপকথার

মতো। সে কি নরখাদক বাঘ? সে কি কোনও অরণ্যবাসী অতিকায় নরাসুর, নাকি সে একটা ভাল্লুক? কিন্তু ভাল্লুকের ত ল্যাজের ঝাপট নেই? তার ত কোনও 'গ্রাউলিং' নেই। অথচ নিজের চোখে সে জন্তুকে আমি দেখিনি সেই রাত্রে!

রাত চারটের পর সমস্ত আওয়াজ থামল। প্রবল উত্তেজনা ও আতঙ্কের পর আমার অপরিসীম ক্লান্তি আর অবসাদ আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দিল না। ওই দরজা চেপেই বসে হেলান দিয়ে চোখ বুজলুম। এর মধ্যে কখন নীলিমা দেবীর জ্ঞান ফিরেছে এবং কখন তিনি অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছেন আমি জানিনে।

হঠাৎ আমার হাত ধরে সকালবেলা হিঁচড়িয়ে টান পড়াতে আমি চমকিয়ে জেগে উঠলুম। নীলিমা দেবী উত্তেজিত হয়ে বললেন, সরে যান্ সরে যান্—আপনার কানের পাশে মস্ত কাঁকড়া বিছে—

সরে এলুম। চেয়ে দেখি ঘন কালোবর্ণ ইঞ্চি ছয়েক লম্বা একটা কাঁকড়া বিছা আমার কানের পাশে দেওয়ালে আমারই মতো রাত থেকে ঘুমোচ্ছিল! মহিলা বললেন, পালিয়ে যাবে—শিগগির মারুন, ওই জুতোটা দিয়ে ঠুকে মারুন। কালো কাঁকড়া বিছে কামড়ালে কেউ বাঁচে না!

উনি যত চঞ্চল, আমি ততই স্থির। ঘড়িতে তখন বেলা সাড়ে সাতটা। উনি এর মধ্যে জানলাগুলি খুলেছেন। বাইরে বেশ রোদ উঠেছে। সুন্দর প্রভাতকাল!

মারলেন না বিছেটাকে?

হাসিমুখে বললুম, ওটা বোধ হয় ঘুমোচ্ছে, থাক্ না ঘুমিয়ে?

আমার বড্ড ভয় করে। ওটাকে মারুন আপনি।

না—আমি বললুম, যেটাকে সহজেই মারতে পারি, সেটার প্রাণ নষ্ট নাই করলুম! এটা জৈন ধর্মশালা!

চার হাজার ফুট উঁচুতে পরেশনাথ পাহাড়ের মন্দির। আমি একাই গেলুম। বিগ্রহদর্শন শেষ করে যখন ফিরে এলুম তখন সাড়ে এগারোটা। নীলিমা দেবী এর মধ্যে স্নানাদি সেরে পরিচ্ছদ বদলিয়ে মাথায় সিঁদুর দিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। গত কালকের মতো তিনি ভিতরে গিয়ে আহারাদির কথাও পাকা করে এসেছেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা বেরিয়ে পড়ব। সন্ধ্যার আগে ওঁকে রাঁচিতে পোঁছিয়ে আমি রামগড়ে ফিরে রাঁচি রোড স্টেশনে গাড়ি ধরব। এযাত্রায় আমার খুব শিক্ষা হল।

নীলিমা দেবী বললেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে আপনার খুবই বিপদে কাটল। আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনার সঙ্গে এই প্রথম পরিচয় আমার চিরকাল মনে থাকবে। আমি সঙ্কোচ আর লজ্জা নিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।

আমি হেসে বললুম, আমি নিজেই খুব অনুতপ্ত যে আপনাকে আগে রাঁচিতে রেখে আসিনি। আমারই ক্ষমা চাওয়া উচিত। আপনার স্বামী কেমন থাকেন এবং স্কুলের কাজ আপনার কেমন লাগে—এসব চিঠিতে জানালে আমি খুশী হব।

আহারাদি সেরে আমরা এক সময়ে বেরিয়ে পড়লুম।

আর নয়, এবার কিছুকালের জন্য সরে যেতে চাই সামাজিক জীবনের বাইরে। যেতে চাইছি একটা বন্য জীবনে—সেটা দুর্বার বা বর্বর হলে ক্ষতি নেই। এবার থেকে আমি অরণ্যে-অরণ্যে। বাঘের দাঁত, ভালুকের থাবা, হরিণ-শম্বরের দৌড়, বন্য কুকুরের চক্রান্ত—ওদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখব অরণ্যের গহন রহস্যকে। পরবর্তী সাত বছর কাল অবধি জঙ্গলের নেশায় যখন-তখন হীরালাল দাশগুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে আমার বনজঙ্গলে কেটেছে। তিনি তাঁর 'মায়ামৃগ' বইটি আমার নামে উৎসর্গ করেন। ওই কালের মধ্যেই আমি আমার 'অরণ্যপথ' বইটিতে লিখি, হে অরণ্য, এবার থেকে তুমি কথা বলো আমার কানে কানে।

আমার অরণ্য ভ্রমণের প্রথম কাহিনী 'হে অরণ্য, কথা কও'—এটি প্রকাশ করি সেই বছরের 'দোল সংখ্যা' আনন্দবাজার পত্রিকায়।

[প্রথম পর্ব শেষ খণ্ড সমাপ্ত]